সমগ্র গল্প সংগ্রহ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মডেল পাবলিশিং হাউস ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০৭৩

SAMAGRA GALPA SANGRAHA

by

Bibhutibhusan Mukhopadhaya

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা জানুয়ারী ১৯৬০

প্রকাশক ঃ জয়দেব ঘোষ মডেল পাবলিশিং হাউস ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক ঃ রাম জীবন ঘোষ দি গৌতম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬।

প্রচ্ছদ ঃ সত্য চক্রবর্তী

দুটি কথা

আমার সাহিত্যিক জীবন একটি বিশেষ ধারায় এগিয়ে এসেছে, যার জন্যে আমাকে প্রায় ১৯৪০ সাল পর্যন্ত গল্প লেখাতেই বেশী সময় দিতে হয়েছে, ফলে কথা সাহিত্যে অন্যান্য বিভাগের তুলনায় গল্পের সংখ্যাই আমার বেশী দাঁড়িয়ে গেছে। এগুলি বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক পাঠক-পাঠিকাদের হাতে পৌঁছেছে, বিভিন্ন গল্প গ্রন্থের আকারে। এগুলির মধ্যে অনেকগুলি গ্রন্থ নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং আমি সেই গ্রন্থের প্রকাশকদের এ বিষয়ে উৎসাহিত করতে পারছি না। অবশেষে মডেল পাবলিশিং হাউসের শ্রীজয়দেব ঘোষকে এ বিষয়ে স্ব-ইচ্ছায় তৎপর হতে দেখে আমি তাঁকে সব গল্পগুলি একত্র করে প্রকাশ করবার ভার দিলাম। উদ্দেশ্য, আমার এই মানস সন্তান-গুলিকে বাঁচিয়ে রাখা। এর সঙ্গে পাঠক-পাঠিকাদের আগ্রহ এবং সহযোগ থাকলে, এই উদ্যমটি সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করব।

ব. ভ. ম.

সমগ্র গল্প সংগ্রহ

প্রথম খণ্ড

স্বতন্ত্র কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ

বিভূতিভূষণের সাহিত্যকর্ম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। তাঁর গল্পের চরিত্রচিত্রণ গতিবিধি, কর্মধারা সবকিছুতেই দেখা যায় বাস্তবের ছোঁয়া। তাঁর শিল্পচেতনায় তাই জীবন খুব স্পষ্ট। খুব পরিচিত। আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চেনা জানা। পাঠক অতি সহজেই বিভূতিভূষণের লেখার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এর সামনে পেছনে কোন বাধা নেই, সহজ সরল অনাড়ম্বর সে গতি। যদিও লেখক বিভুতিভূষণের গতিপথ ততটা সহজ ছিল না। স্বভাবিকভাবেই তাঁকে অতিক্রম করে এগিয়ে আসতে হয়েছে দীর্ঘ বন্ধুর পথ। বাস্তব জীবনের নানা জটিল সমস্যা। স্বদেশভূমির পরাধীনতা বিভূতিভূষণকে বাদ সেধেছে। মানসিক নির্যাতনে তিনি হয়ে উঠেছেন অস্থির। তারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর বিভিন্ন গল্পে ও লেখার মধ্যে।

বিভূতিভূষণের কাছে পল্লীজীবন পরিচিত তাঁর জীবিকার সূত্রে। তাই তাঁর লেখায় তথাকথিত শহরের নাগরিক জীবন অনুপস্থিত। শিল্পাঞ্চল কিংবা শহরের কর্ম-ব্যস্ততাময় জীবনের সঙ্গে সেভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ তিনি পাননি। তার ফলে লেখার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে গোষ্ঠিবদ্ধ গ্রামীন সমাজজীবন। তাদের খুঁটি-নাটি, প্রাত্যহিক জীবনের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান। দূর থেকে এই জীবনধারাকে তেমন কিছু মনে না হলেও কাছে যেয়ে পেঁছিতে পারলে বোঝা যায় এর স্বাতন্ত্রতা ও বৈশিষ্ট্য। আর বিভূতিভূষণ এই স্বাতন্ত্রতার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পেরে হয়ে উঠেছেন একজন সার্থক শিল্পী। গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রচনা করেছেন বিভিন্ন সব চরিত্র। পড়তে পড়তে সব সময় মনে হয় যেন কোন এক স্পষ্ট চিত্রকল্প।

সমাজ ও সমাজের মানুষের কথা নিয়ে স্পষ্ট হয় গল্প এবং উপন্যাস। তাই সাহিত্যে চরিত্রচিত্রন স্বাভাবিকভাবেই লেখকের হাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে [অন্তত সং সাহিত্যিকের কাছে]। কেননা তাঁর গভীর সমাজবোধ, মনন এবং বীক্ষা—সবকিছুতেই প্রতিফলিত হতে থাকে সত্যাদর্শ। লেখকের চেতনায় ধরা দেয় সামাজিক মানুষের প্রকৃতি ছাড়াও সমাজের গতি প্রকৃতি এবং সামাজিক মানুষের সম্পর্কে সমাজের ভূমিকা। কিন্তু এই সমাজ? এটা বড় এক কঠিন জায়গা। মানুষ এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে না চলতে পারলেই সে নিষ্পেষিত হয়ে পড়ে। অবহেলিত হয়ে সে হারিয়ে ফেলে তার আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ। এবং এক সময় তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়েন। দীন

হয়ে যায়। এ সমস্ত সময়গুলোতে সমাজসংস্কারক হিসেবে এক একজন সাহিত্যিক আবির্ভূত হন। তাই সমাজটা থমকে থাকে না। সচলতা বজায় রেখে অন্যদিকে বাঁক নেয়।

বিভূতিভূষণ কোন আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা না নিলেও তিনি যে বিভিন্ন আন্দোলনেরই শরিক তার প্রমাণ রেখেছেন বহু লেখার মধ্যে। শরৎচন্দ্রকে তিনি স্মরণ করেছেন তাঁর সাহিত্য চেতনার পুরোধা হিসেবে। তিনিও বিশ্বাস করেন নারীর অধিকার এবং নিরাপত্তা সমাজের কাছে এক জরুরী বিষয়।

সমাজ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এক সঙ্গে গমন অর্থাৎ চলা। যদি কোন সময় কোন দিক থেকে আঘাত পায় সমাজ, তখন প্রত্যাঘাত দেওয়ার জন্য সে দণ্ডনীতি রচনা করে রাখে। তাই বলা হয় এই দণ্ডনীতি সামাজিক ক্রোধের বিধিবদ্ধরূপ। দণ্ড প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে বিধি-বিধান ভঙ্গকারীদের ওপর বর্তায়। রুজু করেন, যারা সমাজের রক্ষক। সাহিত্যিক যে জীবনের কথা বলেন সেখানে থাকে দু' জীবনই বর্তমান। ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন। এই দু' জীবনের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী।

কথাসাহিত্যিক বিচারকর্তা বা সমাজ রক্ষক নন, সমাজের মানুষ হিসেবে সমাজের বিধি-বিধানের জন্য তাঁর আগ্রহ থাকেই কিন্তু তাঁর মনোযোগ বেশি নিবদ্ধ হয় ব্যক্তিমনের গতি প্রকৃতির ওপর। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কথা সাহিত্যিকের নিজস্ব একটা দৃষ্টি-ভঙ্গিই তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য-নির্ণায়ক। সমাজ যখন তার স্থিতির রূপ হারাতে শুরু করে। মানুষের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা যখন চারদিকের বিচিত্র ধাক্কায় শৃঙ্খলাহীন হয়ে পড়ে, পরিচিত মূল্যবোধে সন্দেহ যখন দানা বাঁধে, সেই অবস্থায় একশ্রেণীর শক্তিশালী সাহিত্যিক চেষ্টা করেন জগৎ ও জীবনের পাল্টে যাওয়া ছবিকে এঁকে তার মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখতে। তাঁরা প্রমাণ করেন সত্য ও সুন্দর কখনো পুরনো হয় না এবং তাকে বাতিল করাও যায় না। এই জীবনবোধের বিশ্বাস লেখকদের সজীব করে রাখে। সচল করে দেয় তাদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া।

বিভূতিভূষণের বিশ্বাস জীবনধর্মে। তাই তিনি ঘুরে ফিরে তাঁর লেখার মধ্যে বার বার করে নিয়ে এসেছেন পারিবারিক জীবন। পারিবারিক বিভিন্ন সব চরিত্র। যার মধ্যে রয়েছে বাৎসল্যরস ভরা। আবার প্রয়োজনমত তাঁর গল্পের চরিত্রকে করে তুলেছেন কঠোর কিংবা কখনো কখনো সহানুভূতি আশ্রিত। কেননা এসব চরিত্রই সমাজের অঙ্গ। কাউকে বাদ দিয়ে এগুনোর অর্থ সমাজকে অস্বীকার করা।

দেশকাল এবং সমাজ ইতিহাসের যে প্রচলিত ধারা আছে সেখানে কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের চলার পথ একটু স্বতন্ত্র। অন্য ধরনের। গতানুগতিকতা চাপ তাকে ভারাক্রান্ত করে তুলতে পারেনি। তিনি খুব সহজেই এবং সাবলীলভাবে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে উত্তরণ ঘটিয়েছেন রসতীর্থে। সেখানে বিভূতিভূষণ একজন সার্থক শিল্পী। একজন অনন্য।

গল্পকার বিভূতিভূষণ

বিভূতিভূষণের সাহিত্যসাধনায় গল্প প্রবন্ধ এবং উপন্যাস এর হিসেব খতিয়ে দেখলে যে ছবি মেলে সে শুধুই অসংখ্য গল্পের জগৎ। তার মধ্যে ছোটদের জন্য গল্প লেখা নিয়ে তিনি সাহিত্য জীবনে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পান। 'রানুর প্রথম ভাগ' গল্পটি বিভূতিভূষণের জীবনের সম্পূর্ণ মোড় ঘুরিয়ে দেয়। গল্পটির জন্য তিনি পুরস্কৃত হন প্রবাসী থেকে এবং এর পর থেকেই ছোটগল্পকার বিভূতিভূষণ ক্রমশ সাহিত্যের রাজ্যে নিশ্চিত স্থায়ী জায়গা করে নেন।

বিভূতিভূষণ প্রথম যে গল্প লেখা দিয়ে জীবন শুরু করেন সে গল্পের নাম মনে নেই। প্রথম গল্পের জন্যও তিনি পুরস্কৃত হয়েছিলেন। কুন্তলীন পুরস্কার। কিন্তু সে লেখার এখন কোন হদিস নেই। নাম'ত দূরের কথা। শুধু মনে আছে সে গল্পের বিষয় ছিল ভালবাসা। তবে প্রথম যে গল্প বিভূতিভূষণের প্রথম রচনা বলে চিহ্নিত তার নাম 'অবিচার'। প্রকাশিত হয় প্রবাসীতে [১৯২৬]। বি. এ. পাশ করার পর তিনি এ গল্প পাঠিয়েছিলেন। মোটামুটি এ মুহূর্তে বিভূতিভূষণের সাহিত্যকর্মের যে ছবিটা স্পষ্ট তা হচ্ছে তাঁর ছোট গল্প সম্পূর্ণ সাহিত্যকর্মের পঁচাত্তোর অংশ। বাকিটুকু উপন্যাস কিছু প্রবন্ধ, আত্মজীবনী ও চারটি নাটকের মধ্যে আবদ্ধ। এই গল্পগুলো সবই নিজের নিজের বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। শ্রেণীবিভাগের পর্যায় সারণী করলে দাঁড়াবে :

ছোটদের গল্প

সমস্যাপ্রধান গল্প

ভালবাসার গল্প

হাস্যরসের গল্প

ভ্রমণের গল্প

নিজের লেখা সম্পর্কে বলতে যেয়ে বিভূতিভূষণ নিজেই তাঁর গল্পের যে মূল্যায়ন করেছেন সেটা আমাদের এক বড় পাওয়া : 'আমার লেখায় হাস্য-কৌতুকরস বেশ খানিকটা স্থান পেয়েছে; বাটখারা দিয়ে ওজন করলে বোধহয় এটাই বেশী হবে। তাই থেকে ধারণা হওয়ার কথা, তবে হাসিই বোধহয় সাহিত্য-সত্তার অন্তরতম জিনিষ। কিন্তু বিচার করে দেখলে তাই বা দাঁড়ায় কোথায়?······নিজেকে যতোটা জানি, বিষণ্ণতাই আমার মনের গঠনের যেন মূল উপাদান' [আমার সাহিত্য-জীবন রচঃ ১]

আবার অন্য আর এক জায়গায় তাঁর অকপট স্বীকৃতিঃ 'আমার সাহিত্য-সাধনার মূল প্রেরণা—'নারী-সৌন্দর্য, নারী-মাধুর্য নারী-বিস্ময়'…[জীবনতীর্থ]। এই সব মিলিয়েই বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। তিনি একজন আদর্শনিষ্ঠ জীবন-প্রেমিক। জীবনের ক্ষুদ্রতম মূল্যবোধটুকুও তাঁর লেখায় ধরা পড়েছে। এবং তা খুব সহজেই। সরল এবং স্বাভাবিকভাবে।

চাতরা থেকে পাণ্ডুল হয়ে দ্বারভাঙ্গায়

বিহারের দ্বারভাঙ্গা শহরের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত পান্ডুলগ্রাম। শহর থেকে দূরত্ব হবে বারো মাইল। এখানে বিভূতিভূষণ জন্মগ্রহণ করেন। তারিখঃ ২৪শে অক্টোবর, ১৮৯৪ খৃীস্টাব্দ।

পিতা বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়ও এই পাণ্ডুলেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার আগে এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের বাস ছিল পশ্চিমবঙ্গে—হুগলী জেলায় চাতরা শ্রীরামপুরে। বিভূতিভূষণের দাদু মধুসূদন পৈতৃক ভিটে ছেড়ে প্রবাস যাত্রা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কেননা শুধু পুজোচ্চর্ণা করে সংসার চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। বিভূতিভূষণের মায়ের নাম গিরিবালা দেবী। আট সন্তান এবং দু কন্যার জন্মদাত্রী। বিভূতিভূষণ মেজ ছেলে। ওর অনুজ অহিভূষণ খুব ছোট বয়েসে মারা যায়। জ্যেষ্ঠ শশিভূষণ মারা যান ১৯৪৭-এর ১৮ই জানুয়ারী। তারপর থেকে বিভূতিভূষণ পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুরুষ।

মধুসূদন পাণ্ডুলে এসেছিলেন নীলকুঠিতে কর্মসংস্থান করে। ক্রমে ক্রমে তিনি কুঠির বড়বাবু হয়েছিলেন। পুত্র বিপিনবিহারী চাকরী জীবন শুরু করেছিলেন পাণ্ডুলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানে থাকা সম্ভব হয়নি। পাণ্ডুলের চাকরী চলে যাওয়ার পর বিভূতিভূষণের পিতা সপরিবারে দ্বারভাঙ্গায় এসে বসবাস শুরু করেন। স্বজনহীন এই প্রবাসে খুব কষ্টে দিনাতিপাত করতে হয়েছিল।

বিভূতিভূষণের ছোটবেলা কাটে চাতরায়। কেননা পাণ্ডুল বাংলা ভাষা শিক্ষার পক্ষে মোটেই প্রশস্ত ছিল না। তাই দাদা শশীভূষণের সঙ্গে চাতরায় চলে আসতে হয়। এখানে তখন থাকতেন পিতামহী নিস্তারিণী দেবী।

দাদা ভর্তি হয়েছিলেন সিদ্ধেশ্বরী স্কুলে আর বিভূতিভূষণ পড়াশোনা শুরু করেন মহাদেব মাস্টারের পাঠশালায়। পাঠশালা বসত দিনে দুবার। একবার সকালে এবং একবার বিকেলে। সকালে যতটা নিশ্চিত হয়ে পড়াশোনা করতে যেতে খুশি হতেন

বিকেল এলে সেটা যেত পাল্টে। কিছুতেই আর পাঠশালায় আসতে মন বসত না। এর জন্য মহাদেব মাস্টারের কাছ থেকে কম মার খেতে হয়নি। কিন্তু এখানেও শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেননি বিভূতিভূষণ। ফিরে আসতে হয় দ্বারভাঙ্গায়। কারণ দ্বারভাঙ্গায় তখন বসবাসের স্থায়ী বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন পিতা বিপিনবিহারী।

প্রথমে দ্বারভাঙ্গায় এসে রাজ স্কুলের বাংলাশাখায় ভর্তি হন বিভূতিভূষণ অষ্টম মানের ছাত্র হিসেবে।

সেই স্কুলের বর্তমান নাম 'দি পিতাম্বরী বেঙ্গলী মিডল স্কুল'। এখানে বছর পাঁচেক কাটিয়ে সরাসরি এসে ভর্তি হন রাজস্কুলে এবং সেখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন প্রথম বিভাগে [১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে]।

বিভূতিভূষণের কলেজ জীবনের পড়াশোনা শুরু হয় কলকাতায় রিপণ কলেজে। কলেজে যাতায়াত করতেন হাওড়ায় মামারবাড়ী থেকে। রিপন কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করেন ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র এবং সংস্কৃত নিয়ে। কিন্তু তিনি বি. এ. পাশ করেন পাটনায় বি. এন. কলেজ থেকে। বিষয় ছিল সংস্কৃত আর দর্শনশাস্ত্র। তখন অনার্স পাঠক্রম চালু হয়নি কলেজে। তাই অনার্স নিয়ে পাশ করা হয়নি।

বি. এ. পাশ করার অল্প কিছুদিনের মধ্যে বিভূতিভূষণ কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। দ্বারভাঙ্গায় মাড়োয়ারী স্কুলে শিক্ষক হয়ে যোগ দেন কর্মে। পুরোপুরি এক বছরও তাঁর কাটেনি এ স্কুলে। তার আগেই একটি নিয়োগের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর ঘটে এবং তিনি পদত্যাগ করেন। কাউকে না জানিয়ে তিনি মজঃফরপুরে মুখার্জী'স সেমিনারীতে এসে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। এখানেও বিভূতিভূষণ ছিলেন মাত্র আট নয় মাস। ফিরে আসেন আবার দ্বারভাঙ্গায়। এবার কর্মক্ষেত্র রাজ স্কুল। এখানে ক্রমে ক্রমে তিনি পেয়েছিলেন অস্থায়ী প্রধান শিক্ষকের পদ। এই শিক্ষকের পদের মেয়াদ ছিল মাত্র তিন বছর। কারণ স্কুল পরিচালনায় মতের অমিল। এরপরের কর্মস্থল আর স্কুল নয়। বিভূতিভূষণ নিযুক্ত হন রাজার একান্ত-সচিব হিসেবে। কিছুদিন এ পদে বহাল থাকার পর হঠাৎ করেই একদিন ইস্তফা দিয়ে দেন। কারণ মনের সঙ্গে অমিল। তারপরে আট বছর বিভূতিভূষণের অস্থায়ীভাবে কিছু কিছুদিন করে এখানে ওখানে লেগে থাকা। কখনো দেখা যায় গৃহশিক্ষক হিসেবে কখনো স্কুল শিক্ষক হিসেবে। মজঃফরপুর থেকে পাণ্ডুল পর্যন্ত তাঁর পরিসীমা।

বার বার তিনবার—এ যেন তিনের সঙ্গে কোন সু-এর এক গভীর সম্পর্ক আছে। তাই দু বার এর পর আবার বিভূতিভূষণের ডাক পরে দ্বারভাঙ্গার রাজ-এ। এতদিনে মহারাজা রমেশ্বর সিং-এর দেহান্তর হয়েছে। পরবর্তী মহারাজার নাম কামেশ্বর সিং। তিনি বিভূতিভুষণকে পেয়ে খুশি। দ্বারভাঙ্গায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে কাজে বহাল করে নেন রাজা।

একের পর এক বিভিন্ন দায়িত্বে বিভূতিভূষণ বহাল হতে থাকেন। এবং এখান

থেকেই তিনি কর্ম থেকে অবসর গ্রহণও করেন। তৃতীয় দফায় কর্মের শুরু হয় গৃহ-শিক্ষক হয়ে। তারপর প্রেসের ম্যানেজার, রাজস্কুলের প্রধান শিক্ষক [তখনকার বাংলা স্কুল ছিল দ্বারভাঙ্গার বাঙালীদের-রাজ্যের বাঙালী চাকুরেদের ছেলেদের বাংলা পড়ানোর সুবিধার জন্য। এ স্কুলের গোড়াপত্তন করেছিলেন। রাজশেখর বসুর পিতা রাজের জেনারেল ম্যানেজার চন্দ্রশেখর বসু।...জীবন-তীর্থ] এবং শেষে পাটনা থেকে প্রকাশিত মহারাজের ইংরেজী দৈনিক 'দি ইণ্ডিয়ান নেশন'-এর ম্যানেজার। পত্রিকাটি ভালভাবেই চলছিল কিন্তু ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের সময় পত্রিকাটি সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে গেলে বিভূতিভূষণ চাকরী জীবন থেকে স্থায়িভাবে অবসর নিয়ে নেন। দীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে শুরু করেন সাহিত্য সাধনা। সেই দিন থেকে আজও পর্যন্ত এই অক্লান্ত কথা সাহিত্যিকের লেখনি ক্রমান্বয়ে লিখেই চলেছে।

পারিবারিক বিভূতিভূষণ

দাদা শশিভূষণের মৃত্যুর পর দ্বারভাঙ্গার সমস্ত দায়িত্ব এসে বর্তায় বিভূতিভূষণের ওপর। সেই দিন থেকেই তিনি পরিবারের প্রধান। যৌথ পরিবারের হাল শক্তভাবে ধরে রেখেছেন বিভূতিভূষণ। লোক লস্কর আত্মীয় স্বজন বাড়ি বাগান সব কিছুতেই সজাগ নজর।

বর্তমানে দ্বারভাঙ্গার বাড়ির [গিরি-বিপিন] দায়িত্ব ক্রমে ক্রমে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন দাদা শশিভূষণের জ্যেষ্ঠ পুত্র অচিন্ত্য মুখোপাধ্যায় [ইনি বাড়ির সবচেয়ে বড় সন্তান]। বিভূতিভূষণ ওকে আদর করে পণ্ডিত বলে ডাকেন।

পণ্ডিতের সংযোজন ঃ

মেজকা খেতে ভালবাসেন লুচি। ভাজা হবে ডালডা ঘি দিয়ে। ভাল ঘি ওঁর পছন্দ নয়। ডালডার গন্ধটা মেজকা'র খুব ভাল লাগে।

মিষ্টি সর্বদিনই উনি পছন্দ করেন। খেজুর গুড়ের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে।

খেলাধুলা পছন্দ এবং নিজেও খেলতেন। খেলা দেখার জন্য দশ পনের দিন কলকাতায় যেয়ে থাকতেন। মাঠে গিয়ে খেলা দেখতেন। প্রিয় টিম 'মোহনবাগান'। নিজে খেলতেন ফরোয়ার্ড লাইনে। দলের অধিনায়ক ছিলেন তিনিই।

মধু ভীষণ ভালবাসেন মেজকা। দিনে দুবার খান। কখনও কখনও মধু হাতে নিয়ে চেটে চেটে খান ছোট ছেলের মত। এ ছাড়া সন্দেশের খুব ভক্ত।

সকালের জল খাবার ঃ চিঁড়ে দুধ ছানা মধু লুচি রুটি। সবই একটু একটু করে।

দুপুরে ঃ মাছ ভাত [একাদশী পূর্ণিমা অমাবস্যায় মাছ খাবেন না। এখন মাংস ডিম খান না।]

রাতে ঃ সব কিছু খাওয়ার পর দুধ ভাত।

খাওয়ার সময় পাতের পাশে আলাদা করে প্লেটে চিনি রাখা থাকে। উনি তরকারি ডাল মাছ সব কিছুতেই নিজের প্রয়োজন মত চিনি মিশিয়ে খান।

মেজকা'র তি-কোণা নিমকি খুব ভাল লাগে।

রঙ পছন্দ ঃ হালকা নীল এবং সবুজ।

শখ ঃ কুকুর পোষা।

রোজ খাওয়ার পর টিয়া পাখিকে খেতে দেন। যদিও এটা ওঁর পোষা পাখি নয়।

প্রতিদিন স্নান করার আগে একটা 'সিগারেট' খান। খাওয়া শেষ করে যান স্নান করতে। দিনে রাতের মধ্যে এই একবারই মেজকা'র নেশা করা।

নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শাক সব্জীর চারা লাগান বাগানে। শশা মুলো কুমড়ো উচ্ছে লাউ ঝিঙে মটর শুঁটি।

চিঠি লিখতে বসেন সকাল দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত। লিখে সঙ্গে সঙ্গে

পোস্ট করতে দেন না। খেতে বসে বলেন চিঠি পোস্ট করার কথা। কিন্তু যদি বিকেলে কোন চিঠি লেখেন শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে বলেন পোস্ট করার জন্য।

এস্রাজ বাজাতে পারেন।

রবীন্দ্র সংগীত শুনতে ভালবাসেন।

গোরা মাঝির সংযোজন :

[গোরার বয়স এখন ছাব্বিশ সাতাস। দ্বারভাঙ্গার এ বাড়িতে ও আছে ওর দশ বছর বয়স থেকে। গোরার আসল নাম গেরা (গণ্ডার)। জাতে সাঁওতাল। বাড়ি জামসেদপুর।]

উনি কোলকাতায় যেতে পারলে সবচেয়ে বেশি খুশি হন। এ বয়সেও ভীড় ট্রামে বাসে উঠতে পারেন। প্রয়োজনে হাঁটতেও পারেন। অনেকদিন শিয়ালদা থেকে হেঁটে কলেজ স্ট্রীট গেছেন।

শখ : বাগান করা। ফুলের মধ্যে গোলাপ পছন্দ। প্রতিদিন ভোরের প্রথম কাজ বাগান দেখা।

দেবব্রত মল্লিক

বিষয়সূচী

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

তৃতীয় পর্ব

চতুর্থ পর্ব



দ্বারভাঙ্গায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বাসস্থান 'গিরি বিপিন'।



বাইরের ঘর। এখানে বসে বিভূতিভূষণ তাঁর সাহিত্য রচনা করেছেন। এখন লেখা লিখি করেন ভেতরে বসে। এর পাশেই রয়েছে অতিথিদের থাকার জন্য ব্যবস্থা।



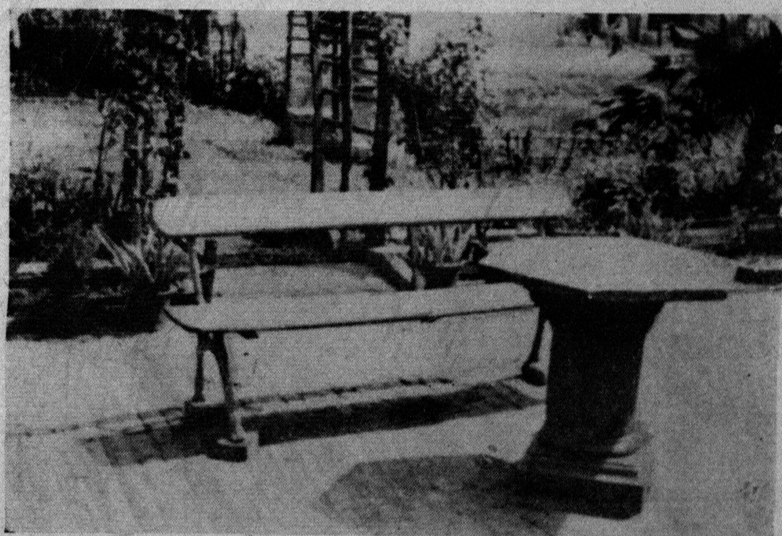
মূল বাড়ীর দেউড়ি। বাবান্দায় ইজি চেয়ারে বসে এখানে বিভূতিভূষণের দিনের বসে থাকার সময়টুকু কাটে।



বাইরের ঘরের টানা বারান্দার শেষাংশ। বিভূতিভূষণের দাদা শশিভূষণের জ্যেষ্ঠ পুত্র অচিন্ত মুখোপাধ্যায়ের বসার জায়গা। দিনের কাগজ পড়া এবং চিঠি পত্র লেখার জায়গা।



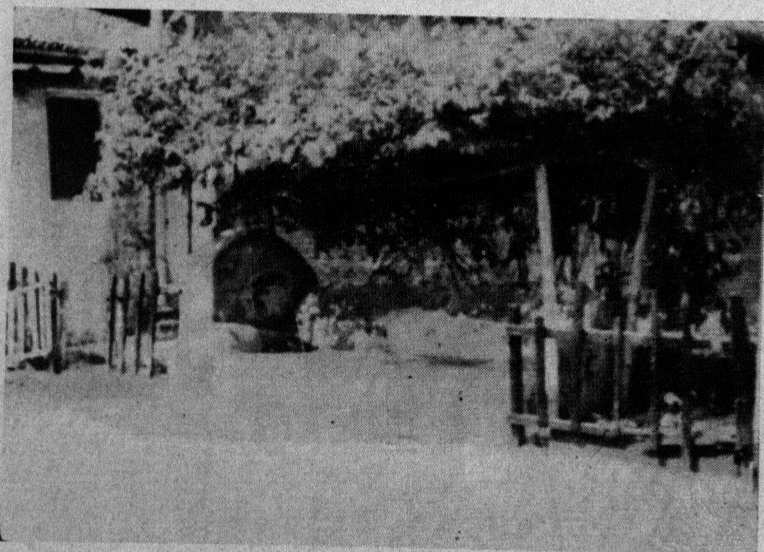
প্রতিদিন স্নান করার আগে বিভূতিভূষণ এই চেয়ার বসে তেল মাখেন। পাশে টেবিলের ওপর রাখা আছে তেলের শিশি সাবান এবং তোয়ালে।



বাইরের উঠোনে বিভূতিভূষণের প্রিয় লোহার বেঞ্চ, তার সামনে বাঁধানো সিমেন্টের টেবিল।



বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও প্রকাশক। মাঝখানে প্রকাশকের বড় ছেলে রাজকুমার ঘোষ।



বাগানের একপাশে মাধবীলতার ছাউনি। নিচে বাঁধানো বিভূতিভূষণের প্রিয় বসার জায়গা।



বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং অচিন্ত মুখোপাধ্যায়ের ছেলে শঙ্কর [নাতি]।



বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রিয় লোহার বেঞ্চিতে বসে আছেন।



[বাঁ দিক থেকে] অচিন্ত মুখোপাধ্যায় রাজকুমার ঘোষ এবং অচিন্ত মুখোপাধ্যায়ের ছেলে শঙ্কর মুখোপাধ্যায়।



রাজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব



হার-জিত

শেখরের সহিত তাহার স্ত্রী অরুণার কলহ বাধিয়াছে। শাস্ত্রকাররা বলেন, দম্পতিদের মধ্যে এ জাতীয় ঘটনা নাকি বিপজ্জনক নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যেন একটু চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিতেছে, কারণ অরুণা কথায় কথায় বলিয়া বসিল, আমি চললাম বাপের বাড়ি—আজই।

শেখর নিশ্চয় একটু ভয় পাইল, কথাটাকে হালকা করিয়া ফেলিবার জন্য একটু রসিকতা করিবার চেষ্টা করিল, বলিল, বেশ, তাই চল।

কিন্তু ফল হইল উল্টা। স্ত্রী রসিকতার জবাব না দিয়া আরও গম্ভীর হইয়া বলিল, আর মণ্টু ডলি কেউ সঙ্গে যাবে না। ভোগো। কেন, আমিই বা সর্বত্র টাঙিয়ে নিয়ে বেড়াব কেন?

শেখর বলিল, না, ওদের মাসী তো আসছেই, ভালও বাসে। কথাটা আমার মনেই ছিল না। তা হ'লে তোমার সঙ্গে যাবার আমারও আর তাড়া নেই।

অরুণা আজ সকালে ছোট ভগ্নীকে আসিবার জন্য তাহার শ্বশুরালয়ে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিল। স্বামীর দিকে কড়া চোখে চাহিয়া বলিল, আমি নেই, অথচ সে এসে থাকবে? বুদ্ধিসুদ্ধি কি লোপ পেল নাকি?

শেখর ঠোঁটে হাসি চাপিয়া বলিল, আমি তো মনে করি, তুমি থাকবে না ব'লেই তার থাকাটা আরও দরকার। একজন প্রতিভূ দিয়ে না গেলে আমারই বা—

অরুণা আর শেষ করিতে দিল না, সংক্ষেপে অথচ দৃঢ়তার সহিত বলিল, স্ত্রী আর মাসী নেই।

শেখর বলিল, না, আমি অভিভাবকের কথাই বলছিলাম। স্বামী এখনও নৌকোটিই হয়ে আছে কিনা, তার অষ্টপ্রহর একটি কর্ণধার না থাকলে—

কান নেহাত চুলকোয়! সরী যখন এর পর আসবে দেখা যাবে। এখন রসিকতা থাক্। আমি চললাম আজ। সেখানে ডাকতে গিয়ে যেন বেহায়াপনা না করা হয়। ঝি!

তার সূত্রপাত তো তুমিই করছ! একে তো সেখানে যাওয়ার কোনও সঙ্গত কারণ নেই, ঝগড়ার সন্দেহ করবেই সব। তবু যেন গেলেই। তারপর তারা যদি দুদিন থাকবার জন্যে জিদ করে, তখন তোমার আমার ওপর টান ধরবে। চোখ রাঙালেই তো হয় না, সত্যি কথাই বলছি। আমার এই আকর্ষণের ক্ষমতাটাতে গৌরব আছে বটে, কিন্তু—

অরুণা আরও জোরে ডাকিল, ঝি! কানের মাথা খেয়েছিস?

ঝি আসিতেই ছিল; একটু পা চালাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। অরুণা বলিল, শোফারকে ডেকে দে নিচে, আর দেখ্, ডলি আর মণ্টুকে একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখ্, ওদের মামার বাড়ি যাবে।

ঝি চলিয়া গেলে শেখর বলিল, এই না অন্য রকম হুকুম হয়েছিল?

খুশি। এতে টিপ্পনীর কোনও দরকার নেই। যদি ভাল না লেগে থাকে—

না, মতটা যে কথায় কথায় বদলায়, সেই কথাটাই মনে করিয়ে দিচ্ছিলাম।

বদলাবার উদ্দেশ্য থাকলে বদলায়। যে দুটোর জন্যে টান, তারা সঙ্গেই থাকবে—বাস্, নির্ঝঞ্ঝাট। আর কারুর জন্যে আমি ভাবি না, একটুও না। এইবারে ভুল ধারণাগুলো বেশ ভাল ক'রে ভেঙে দিতে চাই। এই চাবির থোলো—সব জায়গার চাবি এতেই আছে। আর আমায় জ্বালাতন করবার কোন দরকার নেই।

টেবিলের উপর চাবির গুচ্ছটা ঝনাৎ করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। পর্দার বাহির হইতে ঝি খবর দিল, শোফার নিচে দাঁড়াইয়া আছে। শেখর বিনীতভাবে বলিল, কি বলব?

আমি বলতে জানি, উপকারে দরকার নেই।

বারান্দায় গিয়া শোফারকে বলিল, পাঁচটার সময় গাড়ি তোয়ের থাকবে, চন্দননগর যাবে। দারোয়ানকেও তোয়ের থাকতে বল; আর চট ক'রে বাগবাজারে সরীর বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে আসুক—বিশেষ কাজ থাকায় আমি চন্দননগর যাচ্ছি। আবার না এসে পড়ে, বরং দারোয়ানকে পাঠিয়ে দাও, একটা চিঠি নিয়ে যাক্।

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, শেখর চাবির গুচ্ছটা হাতে লুফিতে লুফিতে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করিল, কি?

শেখর সহজভাবে বলিল, কই, কিছু না তো!

দ্বিগুণ সন্দেহে অরুণা বলিল, নিশ্চয় কিছু, বলতে হবে।

আজ আমি হুকুমের বাইরে এসে পড়েছি না?

অরুণা রাগের উপর আবার অভিমান করিয়া বলিল, ও! আচ্ছা, থাক্।

তবুও দয়া ক'রে বলতে পারি।

কিছু দরকার নেই। উঃ, দয়া!

শুনলে যাওয়ার শখটা আর থাকত না। অনেক হাঙ্গামা পোয়ানো থেকে বাঁচা যেত—উভয় পক্ষেরই।

অরুণা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্ষণমাত্র চিন্তা করিল। বোধ হয়, এখানে হাঙ্গামা পোহানোর অর্থ কি হইতে পারে, নিজের আন্দাজমত স্থির করিয়া লইল; তাহার পর বলিল, থাক্, হাঙ্গামার ভয় আমি করি না; যার ভয় আছে, সে সাবধান হোক।

তা হ'লে দয়া ক'রে শোনই না হয়। আর কিছু নয়, কথাটা হচ্ছে—

না না, আমি দয়া করতে চাই না কাউকে। আমার শরীরে কি দয়ামায়া আছে? আমি কি একটা মানুষের মধ্যে? তা হ'লে কি আমার কথায় কথায় এত হেনস্তা হয়? দয়ামায়া যে মানুষ জীবনে পেয়েছে কখনও, সেই জানে, দয়ামায়া কি! আমি কি কারুর কাছে কখনও—

অরুণা চক্ষে দিবার জন্য হাতে আঁচলের একটা কোণ তুলিয়া লইল। শেখর উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া রহিল, কারণ এসব স্থলে কান্না নামিলে অনেকটা আশা, কিন্তু সে শান্তিজল বর্ষিত হইবার পূর্বেই দারোয়ান আসিয়া বাহিরে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

অরুণা বলিল, দাঁড়াও, চিঠি দিই।

পাশের ঘর হইতে চিঠি লিখিয়া আনিয়া দারোয়ানের হাতে দিয়া তাহাকে দুই-একটা উপদেশ দিয়া বিদায় করিল।

শেখর বলিল, তা হ'লে পাকা হয়ে গেল?

অরুণা তাহার দিকে না চাহিয়াই বলিল, আমার সব কাজই পাকা।

কিন্তু চাণক্য বলছেন—দাম্পত্যকলহে চৈব, খুব পাকাপাকি হ'লেও নাকি—

অরুণা সেই ভাবেই বলিল, চাণক্য ঠিকই বলেছেন, পুরুষেরা গায়ে প'ড়ে মিটিয়ে নেয়। বোধ হয়, কোনও বিশেষ দিনের ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য স্বামীর দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিল, কখনও কখনও পায়ে ধ'রেও।

কে পায়ে এসে পড়ে এইবার, তার বড় রকম সাক্ষী রাখব। কথাটা মনে থাকে যেন।

শেখর নিচে নামিয়া গেল। বৈঠকখানার টেবিলের দেরাজ হইতে টাইম-টেব্‌লটা বাহির করিয়া একবার দেখিয়া লইল।

তিনটা চল্লিশ হইয়া গিয়াছে। চারটা পাঁচে একটা গাড়ি, সেটা পাইবার কোনও আশা নাই। তাহার পরের গাড়িটা পাঁচটা পনেরোয়। অরুণার মোটর যদি পাঁচটার সময়ই ছাড়ে তো তাহার প্ল্যানটা আর খাটে না।

একটু চিন্তা করিল, তাহার পর টেবিলের উপর একটা নিষ্পত্তিসূচক আঘাত দিয়া অস্ফুটভাবে বলিল, হয়েছে।

উপরে গিয়া শোফারকে নিচের উঠানে ডাকিয়া পাঠাইল। অরুণাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল, যেতে আসতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল। গাড়িটা ঠিক আছে তো?

অরুণা আসিয়া উৎকর্ণ হইয়া দুয়ারের নিকট দাঁড়াইল।

মোটর জিনিসটা একেবারে ঠিক কখনও থাকে না। শোফার একটু চিন্তা করিয়া বলিল, চ'লে যাবে হুজুর।

অরুণা 'তা হ'লে' বলিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, শেখর তাহার কথা চাপা দিয়া

বলিল, চ'লে যাওয়া-যাওয়ি নয়। খালি মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছ। এরা সব জিদ করছে বটে, কিন্তু আমি সঙ্গে যেতে পারছি না। এখুনি বিশেষ কাজে বেরুতে হবে, বেশ ক'রে ভেবে দেখ। কিছু হ'লে বাড়িতে যদি টেলিগ্রাম কর তো ঘণ্টা-ছয়েকের আগে আমি পাব না।

এরূপ কথার উপর, ছোটখাটো খুঁত থাকিলেও প্রকাণ্ড হইয়া পড়ে। শোফার বলিল, ব্রেকটা একটা চাকায় যেন একটু আলগা ধরছে, তাতে তো বিশেষ ক্ষতি নেই, আর খুলতে গেলেও ঘণ্টা-দুয়েকের কমে হবে না।

পৌনে চারটা হয়েছে, পৌনে ছটা, ধর ছটাই। হিসাবটুকু সারিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল, এক ঘণ্টা দেরি হ'লে মশাইয়ের রাগ প'ড়ে যাবার ভয় আছে কি? আমি তো ব্রেকটাকে বিশেষ ছোট ব'লে মনে করি না। সেদিন বউবাজারের মোড়ে যা কাণ্ড দেখলাম, মনে হ'লে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, এক গাড়ি মেয়েছেলে ঠাসা, হঠাৎ—

অরুণা ভয় চাপিবার চেষ্টা করিয়া সিধা শোফারকেই বলিল, না না, তুমি একবার খুলে ঠিকঠাক ক'রে নাও, হোকগে একটু দেরি।

শেখর অধর দংশন করিয়া অনেক কষ্টে হাস্যসংবরণ করিল। অরুণা অস্বস্তির সহিত প্রশ্ন করিল, কোথায় যাওয়া হবে বাবুর?

উত্তর না পাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, কখন আসা হবে?

দেখি কখন ছাড়ে, সেখানে তো জোর নেই নিজের।

কোন্‌খানে?

কোনখানেই নয়। যার নিজের স্ত্রীর ওপরেই জোর রইল না—

ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া অরুণা উষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল, বলিল, স্ত্রীর ওপর জোর না করতে পারলে বাবুরা সব হাঁপিয়ে ওঠেন। ইস, জোর! জোরটা কিসের শুনি?

খোসামোদের!

অরুণা হাসিয়া ফেলিল; কিন্তু রাগের সময় হাসিয়া ফেলাটা একটা পরাজয় বলিয়া রাগটা বাড়িয়াই যায়। তাই নিজেকে কষ্টে সংবৃত করিয়া লইয়া বেশি রকম চটাচটি করিবার জন্য বলিল, যেখানে খুশি যাও, আমার দেখা আবার ছ মাস পরে।

শেখর ফিরিয়া বলিল, ছ ঘণ্টার মধ্যে সেধে দেখা করবে।

অরুণা আরও রাগিয়া বলিল, তা হ'লে ছ বচ্ছরের ভেতর যদি এ বাড়ি মাড়াই তো—

শেখর বলিল, আর ছ ঘণ্টা পরে যদি ফিরে না আসতে হয় তো—

অরুণা রাগে গরগর করিতে করিতে দুইটা ঘর পার হইয়া গিয়াছিল, সেইখান হইতেই চেঁচাইয়া বলিল, দেখা যাবে।

শেখর আর জবাব দিল না, বারান্দার রেলিঙে ঝুঁকিয়া মিটিমিটি হাসিতে লাগিল।



চন্দননগরে গঙ্গার ধারে বাড়িটা, পিছনে গঙ্গা, সামনে রাস্তা, বাড়ির সামনে খানিকটা বাগান।

শেখর আধ ঘণ্টা হইল আসিয়াছে। হাত-পা ধুইয়া জিরাইয়া হঠাৎ এই অভ্যুদয় সম্বন্ধে শ্বশুর-শাশুড়ীকে একটা মনগড়া কারণ দর্শাইল, খানিকটা এ-কথা সে-কথা লইয়া গল্প করিল, তাহার পর বড় শ্যালিকাকে বলিল, চল শচীদি, বাগানে একটু পায়চারি করিগে।

শ্বশুর বলিলেন, তার চেয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলে পার, হু-হু ক'রে হাওয়া দিচ্ছে। রাস্তার দিকে থাকাই শেখরের দরকার, বলিল, হ্যাঁ, তাও মন্দ নয়।

কথার মধ্যে অনিচ্ছার রেশটি লক্ষ্য করিয়া শ্যালিকা বলিল, তা হ'লেও বাগানটা একটু ঘুরে আসি, এস; কতকগুলো নতুন গোলাপ বসানো হয়েছে। একটা ব্ল্যাক্‌প্রিন্স যা আনিয়েছি, এ তল্লাটে ও-রকম নেই, না বাবা?

আট-নয় বছরের ছোট শালী মলিনা ভগ্নীপতির হাত ধরিয়া টানিতেই শুরু করিয়া দিল; বলিল, আর আমার করবীর ঝাড়ও দেখবেন চলুন জামাইবাবু, গাছ আলো ক'রে আছে। বলতে হবে, কারটা ভাল, হ্যাঁ! ম্যাগ্‌গে, কালো আবার গোলাপ! প্রিন্স মানে তো রাজকুমার, আমি সে জানি, তা রাজকুমারই হোক আর কোটাল-পুত্তুরই হোক, কালো আবার নাকি ভাল হয়! কি পছন্দ দিদির! ম্যাগ্‌গে!

শচী লজ্জায় রাঙিয়া উঠিতেছিল, মা মুখ ফিরাইলেন, পিতা বিশেষ কিছু না বুঝিয়াই সরল প্রাণে হাসিতে লাগিলেন। শেখর কথাটা আর বাড়িতে না দিয়া বলিল, চল, তোমার করবী দেখিগে।

আসিতে আসিতে আবার মলিনা ব্ল্যাক্‌প্রিন্স সম্বন্ধে তর্ক তুলিতে যাইতেছিল, দিদি ধমক দিয়া বলিল, আচ্ছা, তুই চুপ কর্, ডেঁপো মেয়ে। শেখরকে জিজ্ঞাসা করিল, এত কাছে রয়েছ মুখুজ্জে, অথচ মাঝে মাঝে যে এক-আধবার আসবে—

শেখর, মলিনা যে কথাটি বলিতে যাইতেছিল, তাহারই উত্তর দিল, কি জান গো মলিনাসুন্দরী, যে যেটাকে ভালবাসে, তার কাছে—

বড় শ্যালিকা রাগিয়া বলিল, ওই বাজে কথাই হ'ল বড়, আর আমার প্রশ্নের বুঝি—

ওর মধ্যেই তোমারও জবাব আছে দিদি, তোমার বোনের ভালবাসার অত্যাচারে আর বেরুবার জো আছে! কি চোখেই যে অধমকে দেখেছেন, দু দণ্ড চোখের আড়াল

হবার জো নেই। অমনই জবাবদিহি কর, তাও যদি মনঃপূত না হ'ল তো কান্নাকাটি, রাগ, অভিমান—

কই, এমন তো ছিল না! একটু আবদারে বরাবরই ছিল বটে, কিন্তু—

আজকাল হয়েছে। বন্ধুরা বলে, লাকি ডগ, তোকে দেখে হিংসে হয়। বলি, ক্ষ্যামা দাও ভাই; একদণ্ড বাড়ি ছেড়ে বেরুবার জো নেই, এ ভালবাসা, না, কোণঠাসা ক'রে মারা?

শ্যালিকা ভগ্নীর এইরূপ আদর্শ অনুরাগ সমর্থন করিয়া দুঃখিতভাবে বলিল, তোমাদের, ভাই, প্রাণ খুলে দিলে তোমরা সন্তুষ্ট হও না, আর সঙ্গোপনে দিলে তোমরা তা অনুভবই করতে পার না। ভালবাসা দেওয়ার আর উপায়ই বা আছে কি, স্ত্রী বেচারীরা তো আর ভেবে পায় না।

শেখর বলিল, বুঝলাম শচীদি, সব আমাদেরই দোষ। ইট-পাথরের মত আমরা যে হৃদয়হীন—এ বদনামটা তো চিরদিনই আছে। কিন্তু ধর, এই এখানে এসেছি, কাজটা সারতে চার-পাঁচ দিন লাগবে। ভেবেছি, রোজ যাওয়া-আসা না ক'রে এ কটা দিন এইখানেই থেকে যাই। হঠাৎ তোমার বিরহিণী ভগ্নী বাড়ি-ঘর-দোর বন্ধ ক'রে সব নিয়ে এসে হাজির হলেন, ডবডব করছে চোখ, মুখ ভার, কি রকম আতান্তরে পড়ি বল তো?

শ্যালিকা হাসিয়া বলিল, আমাদের তো লাভই ভাই। অনেক দিন দেখি নি তাদের, তোমাদের যদি কানের টানে মাথা আসে তো মন্দ কি?

শেখর মাঝে মাঝে গোপনে রাস্তার দিকে উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, বলিল, তা সত্যিই তিনি যদি এসে হাজির হন তো আমি মোটেই আশ্চর্য হব না।

মলিনা সব না বুঝিলেও দিদির আসিবার সম্ভাবনায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, প্রশ্ন করিল, কিসে ক'রে আসবেন জামাইবাবু? মোটরে?

শেখর বলিল, তিনিই জানেন। চাই কি, জ্ঞানশূন্য হয়ে 'হা নাথ, হা নাথ' করতে করতে ছুটেও আসতে পারেন।

মলিনা অকৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল, ও বাবা!

দিদি তাহার রকম দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, মরু পোড়ারমুখী, দিদি কি তোর পাগল হয়েছে নাকি?

শেখর বলিল, আমি ভাবছি, যদি সত্যিই এসে পড়ে তো বাবা মা কি ভাববেন?

কি আর ভাববেন? বললেই হবে, ওরা মোটরে বেড়াতে বেড়াতে এসেছে, তোমার রেলপথে একটু কাজ ছিল। কিন্তু কোথায় কি তার ঠিক নেই, মিছে মাথা ঘামানো।

তার আসবার কথা তো তাঁদের বলা হয় নি।

ভুলে গিয়েছিলে। চল্ মলি, তোর করবী দেখাবি চল্।

আগে তোমার গোলাপ দেখুন। তুলে আনি একটা?

দিদি ধমকাইয়া বলিল, না।
শেখর বলিল, পরের জিনিসে এত লোভ কেন মলিনা? ছিঃ!
মলিনা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, ওমা, দিদির জিনিস বুঝি পরের জিনিস হ'ল? বুদ্ধি যা হোক!
শেখর উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, এবং লজ্জিতা হইয়া পড়িলেও মলিনার দিদি না হাসিয়া পারিল না। বলিল, কি হচ্ছে ছেলেমানুষের সঙ্গে?
শেখর বলিল, খুব সলা দিলে তো দিদি! ওঁদের বলব, ভুলে গিয়েছিলুম? নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে এত ভুল, আর সে স্ত্রী আবার ওঁদেরই মেয়ে! তার চেয়ে বললেই হয়—
শচী বিরক্তির ভান করিয়া বলিল, দেখ দেখি পাগলামি! কে আসছে তার ঠিক নেই, ক্রমাগতই বাজে কথা! আমার বোনটিরই দোষ দিচ্ছ, কিন্তু আসা পর্যন্ত তো দেখছি, তার কাছে মনটি প'ড়ে আছে; টান কার বেশি, তা তো বুঝতেই পারলাম না।—বলিয়া মুখের দিকে চাহিয়া একটু ক্রূরভাবে হাসিল।
কথাটা সত্য। মোটরের ভাবনাটা মনের মধ্যে জাঁকিয়া থাকায় শেখর যে ক্রমাগতই স্ত্রীর প্রসঙ্গ চালাইয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে তেমন সতর্ক ছিল না, একটু অপ্রতিভও হইয়া পড়িল।
মলিনা ফুলের তোড়া বাঁধিতেছিল, গম্ভীর মুখে বলিল, মা বলছিলেন না দিদি, আহা, দুটিতে মনের বেশ মিল আছে—ভগবানের ইচ্ছেয়।
শেখরের লজ্জার পালা পড়িয়াছে।
স্নেহভরে ভগ্নীর কাঁধে একটি হাত দিয়া দিদি বলিল, আর বলছিলেন, মলিনারও ওই রকম একটি মনের মিলের বর হয়!
ধ্যাৎ!—বলিয়া মলিনা মাথা নিচু করিল।
শচী বলিল, চল, এবার গঙ্গার ধারে যাই, বাবা বোধ হয় ওই দিকে গিয়েই বসেছেন।
মলিনা বলিল, বাঃ, আর তোমার ব্ল্যাক্‌প্রিন্স দেখালে না? তা হ'লে কি ক'রে বলবেন যে—
সরলপ্রাণা ভগ্নী ও চতুর ভগ্নীপতি মিলিয়া শখের ফুল দেখাইবার মত তাহার আর অবস্থা রাখে নাই। শচী লজ্জিতভাবে বলিল, নাঃ, থাক্‌গে।
ভগ্নী আবদার ধরিয়া বলিল, না না, দেখাবে চল। আচ্ছা বাবু, আমি বলছি, আমার হিংসে হবে না, ভয় নেই।
দিদির ব্রীড়াভারাক্রান্ত চোখ দুইটা অবাধ্যভাবেই একবার ভগ্নীপতির মুখের উপর পড়িল। চকিতে সে দুইটাকে ভূমিনত করিয়া বলিল, পোড়ার বাঁদর মেয়ে!
শেখর হাসিতে হাসিতে বলিল, তোমার হিংসের ভয় করছেন না মলিনা, উনি ভয় করছেন বোধ হয় আমাদের হিংসের।
না, আমি চললাম। তোমরা দুই রসিকে থাক।—বলিয়া কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া শচী যাইবার জন্য পা বাড়াইতেই, উপস্থিতির একটা দীর্ঘ হর্ন দিয়া গেটের সামনে একটা

মোটর আসিয়া দাঁড়াইল।

কে এল ?—বলিয়া শচী গ্রীবা ঘুরাইয়া দাঁড়াইল। মলিনা 'ওমা, মেজদিদি যে!' বলিয়া আগে সংবাদ দিবার জন্য বাড়ির দিকে ছুটিল। শেখর বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, দেখলে তো দিদি ?

শ্যালিকা রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়া একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিল। পরমুহূর্তেই বলিল, দাঁড়াও ভাই, আগে নামাইগে ওদের।—বলিয়া দ্রুতপদে আগাইয়া গেল।

শেখর দুই-একটা গাছের আড়ালে একটু গা-ঢাকা দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

শচী অরুণার কোল হইতে ডলিকে লইল, মণ্টুর হাত ধরিয়া নামাইল, তাহার পর ভগ্নীকে বলিল, এস, অগ্রদূত তোমার হাজির।

অরুণা মোটর হইতে নামিল, ভগ্নীর রসিকতা বুঝিবার কোন চেষ্টা না করিয়া 'সবাই ভাল আছ তো দিদি ?' বলিয়া ভগ্নীর পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য প্রণত হইল।

এই সময়টিতে শেখর ঝোপের অন্তরাল হইতে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্তের মধ্যে মণ্টু 'বাবা, বাবা! ওমা, বাবা গো!' বলিয়া আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং ডলিও মাসীর কাঁধ বাহিয়া বাপের কোলে যাইবার জন্য ব্যগ্রভাবে দুইটি কচি হাত বাড়াইয়া দিল।

অরুণা চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং স্বামী-স্ত্রীতে চোখাচোখি হইল।



দুইজনে দাঁড়াইয়া রহিল যেন বায়স্কোপের দুইখানি ছবি, মুখে রা নাই, উগ্র বিস্ময়ের ভাব মুখ এবং সমস্ত শরীর দিয়া যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বিশেষ করিয়া শেখরের বিস্ময়টা চেষ্টাপ্রসূত বলিয়া আর্ট যেন তাহার মধ্যে মূর্তি ধরিয়া উঠিয়াছে। লোকটির থিয়েটারে নাম আছে, এই অরুণাই কত প্রশংসা করিয়াছে।

শেখরই প্রথমে কথা কহিল, তুমি হঠাৎ ?

অরুণা বেচারীর মুখে কোন কথাই যোগাইতেছিল না। অসহায়ভাবে বলিল, হঠাৎ কি ?

শেখর একবার বক্র ইঙ্গিতে শ্যালিকার দিকে চাহিল। তাহার পর স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, না, ঠিক হঠাৎ না বটে; কিন্তু তোমায় অত ক'রে বারণ ক'রে এলাম।

স্ত্রী বিমূঢ়ভাবে বলিল, কি বারণ করলে ?

মলিনা আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, শেখর এবার তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, এই দেখ মলিনা এ'কেই বলে জ্ঞানশূন্য হওয়া, তোমায় এক্ষুনি বলছিলাম না ? অর্থাৎ আমার আসবার কথায় তোমার দিদির মনটা এমনই বিকল হয়ে গিয়েছিল যে, এক ঘণ্টা ধ'রে যে কত ওকে বোঝালাম, সে সব কথা একেবারেই মনে নেই।

মলিনা আশ্চর্যে হাঁ করিয়া বলিল, ও ব্বাবা! হ্যাঁ দিদি ?

অরুণা শচীর দিকে চাহিয়া বলিল, কি ব্যাপার বল দেখি দিদি ?

শচী স্পষ্ট কিছু না বুঝিলেও কিছু একটা কৌতুকের আভাস পাইয়া বলিল, ব্যাপার তোমরাই জান ভাই। এখন চল, বাবা মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন, পরে বোঝাপড়া হবে'খন।

অরুণার চলিবার অবস্থাই ছিল না। স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি এখানে হঠাৎ যে ?

স্বামী অবিচলিতভাবে বলিল, এটা আমার শ্বশুরবাড়ি।—যেন ভূতগ্রস্তের সঙ্গে কথা বলিতেছে, মেলা কথা বলিবার দরকার নেই।

দুইজনে মুখামুখি হইয়া একটু চুপ করিয়া রহিল। শেখরই মৌনতা ভঙ্গ করিল, যাক, যখন এসে পড়েছ, উপায় নেই। মেলা লজ্জা পেয়েই বা আর কি হবে ? দিদিকে অনেকটা ব'লে রেখেছি তোমার রাগের কথা।

অরুণা সোৎসুক নেত্রে তাহার দিদিকে প্রশ্ন করিল, কি রোগের কথা দিদি ?

শেখর আবার কহিল, তোমার গিয়ে—আসবার সময় চাবি কার কাছে—

অরুণা গ্রীবা বাঁকাইয়া কহিল, চাবি ? চাবি তো তোমার হাতেই দিলাম তখন।

শেখর ঈষৎ হাসিয়া মলিনার দিকে চাহিয়া কহিল, দেখছ তো মলিনা ? স্বামীকে না দেখতে পেলে এই রকমই হয়। অবশ্য তোমাদের বোনের একটু বাড়াবাড়িই দেখছি।

স্ত্রীকে বলিল, তুমি আসবার সময় আমার হাতটাই যে সেখানে ছিল না। অবশ্য মনটা কিছু কিছু ছিল, কিন্তু—

অরুণা দিদির দিকে চাহিয়া ব্যাকুলভাবে কহিল, কি রোগের কথা বলেছে বল না দিদি ? আমি, বাপু, এ লোকের সঙ্গে আর পেরে উঠি না।

দিদি তাহার হাতটা ধরিয়া বলিল, বলছি। আগে চল্ ওদিকে, বাবা মা এগিয়ে আসছেন, কি ভাবছেন জানি না।

চলিতে চলিতে বলিল, রোগ আবার কি ? বাবুদের ওটুকু না হ'লেও দিশেহারা হন, অথচ ঠাট্টাও করা চাই। তুই একলাটি থাকতে না পেরে চ'লে আসবি, সেই কথা আমায় বলা হচ্ছিল। তা এতে আর দোষ কি হয়েছে ? আর তা ছাড়া, এসে ভালই করেছিস ভাই, আমায় একলা পেয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ—

অরুণা গালে চারটি আঙুল চাপিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ক্ষণমাত্র চিন্তা করিল, স্বামীর দিকে সরোষ নেত্রে চাহিল। তাহার পর দিদির দিকে ফিরিয়া বলিল, ও হরি! বুঝেছি। এতক্ষণ পরে সব কথা বুঝতে পেরেছি। কি মতলববাজ লোক ভাই!

এইজন্যেই বুঝি তখন বললে, ছ ঘণ্টার মধ্যে দেখা হবে !

শেখর শ্যালিকাকে মধ্যস্থ মানিয়া বলিল, কি করব শচীদি ? যে রকম কাতরানি, চোখের জল। কাজেই ব'লে আসতে হয়েছিল, আজ রাত্রেই ফিরে আসব, ছ ঘণ্টার বেশি দেরি হবে না। একেবারেই কাছছাড়া হতে দেবে না।

একটা কুটিল জবাব ঠোঁটে আসিল এবং কোন সঙ্গত উত্তর দিতে না পারায় রাগের মাথায় অরুণা সেইটাই দিয়া বসিল, বলিল, হাঁ, ঠিকই তো, এক দণ্ড তোমাদের বিশ্বাস ক'রে ছাড়া চলে না, তোমরা এমনই।

শেখর দুঃখের অভিনয় করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিল, ছিঃ অরুণা, এটা এক হিসেবে যে শচীদিদিকেও বলা হ'ল। কি মনে করবেন উনি বল দেখি ?

বিদ্রুপটা বুঝিতে না পারিয়া অরুণা বিস্ময়ে এবং ভয়ে চক্ষু বড় করিয়া কহিল, ওমা দিদিকে আবার কি বললাম ! দেখ দেখি !

দিদি বুঝিয়াছিল, ওদিকে বাবা মা কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, আস্তে আস্তে বলিল, তোরা একটু চুপ কর্ বাপু, মুখচুজের মুখের কি কোন আড় আছে যে, ওর সঙ্গে তর্ক করছিস অরু ?

মন্টু গিয়া দিদিমার কোল দখল করিয়াছিল। অরুণার পিতা লাঠিতে ভর দিয়া আস্তে আস্তে আসিতেছিলেন, একটু দূর হইতেই বলিলেন, বাঃ, অরুণাও এসেছে ! বেশ হয়েছে। কিন্তু কই, শেখর, আমায় কিছু বল নি তো ?

শচীই উত্তর দিল, অরুর আসবার কোন ঠিক ছিল না বাবা, তাই বলেন'নি। ওর এক বন্ধু বেড়াতে এসেছিল, তাকে বিদায় ক'রে সময় থাকলে অরু মোটরে আসবে—এই রকম কথা ছিল।

এর পরে যে প্রশ্ন হইবে, তাহার উত্তর শেখর পূর্ব হইতেই দিয়া রাখিল, আমিও সঙ্গেই আসতাম। বিকেলে বদ্যিবাটীতে একটু কাজ ছিল, তাই আগেই বেরিয়ে পড়ি।

তাহার জন্যই এই সব মিথ্যার সৃষ্টি—বিশেষ করিয়া দিদির তরফ হইতে। অরুণা লজ্জায় যেন পা উঠাইতে পারিতেছিল না। স্বামীটি পূর্বে আসিয়া আরও কি সব গাহিয়া রাখিয়াছে, সে কথা ভাবিয়া সে নিতান্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। দিদির তো এক রকম ধারণাই জন্মাইয়া দিয়াছে যে, সে স্বামীর টানেই পিত্রালয়ে আসিয়াছে। ছি ছি, সাংঘাতিক লোক—সব পারে !

কথাবার্তা, স্বামীর দিকে কখনও মিনতির নরম চোখে চাহিয়া, কখনও রাগের কড়া চোখ দেখাইয়া খুব সন্তর্পণে চালাইয়া গেল। শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছেও একটু-আধটু বেহায়াপনার ইঙ্গিত করিয়া দেওয়া ওর পক্ষে আশ্চর্য নয়। মনে মনে বলিল, ঘাট হয়েছে বাপু, আর তোমার সঙ্গে লাগব না।

জিরাইয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের পর সকলে গঙ্গার ধারে গিয়া বসিল। পিতা কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া আসিলেন—জ'লো হাওয়া তাঁহার লাগানো মানা। মাতাও একটু পরে উঠিলেন। শেখর হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, এইবার মুখ খুলিবার একটু সুযোগ পাইল।

কহিল, আমাদের হিন্দু-ললনাদের সুখ্যাতি এতদিন ধ'রে যে কীর্তিত হয়ে এসেছে—

অরুণা একবার মুখের দিকে সন্দিগ্ধভাবে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা, হয়ে আসুকগে, তুমি থাম।

না, তোমার আজকের এই পাতিব্রত্যের নিদর্শনটুকু দেখেও যদি সেটুকুর কদর না করি তো ঘোর অকৃতজ্ঞতা—

অরুণা উত্ত্যক্ত হইয়া বলিল, ওগো, আমি হার মানলাম, আমার ঘাট হয়েছে, আর দিদির সামনে বেহায়াপনা ক'রো না, তোমার পায়ে ধরি।

শেখর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, আস্তে আস্তে—যেন নিজের মনেই বলিল, পায়ে ধরাটা শুনেছি নাকি আমাদেরই একচেটে হয়ে গেছে।

আজ বিকালেরই কথা।

অরুণা একটু আড়ে না চাহিয়া পারিল না। কথাগুলো চাপা দেওয়ার জন্য বলিল, আর তোমাদের অন্য কথা নেই দিদি ?

শচী বলিল, মুখুজ্জে আজ আমাদের অতিথি। শুধু তোর চর্চা করতেই যদি আজ পছন্দ হয়ে থাকে তো কি ব'লে নিরাশ করি, বল্ ?

অরুণা বলিল কেন ? আমি তো এইটুকু এসেই কথা কইবার অনেক পেয়েছি। এই জায়গাটার কথাই ধরা যাক না—কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না, খোলা গঙ্গার তীর, কি সুন্দর হাওয়া, আমার তো এই জায়গাটুকুর জন্যে—

শেখর তাড়াতাড়ি বলল, তা ব'লে তুমি যেন আমাদের দুজনকে রেখে টপ ক'রে উঠে যেও না শচীদি। অরুণা সে ভেবে বলছে না নিশ্চয়।

সে হাসিতে লাগিল। শচীও হাসিয়া মুখ ফিরাইল। অরুণা হঠাৎ থমকিয়া দুই-জনের দিকে চাহিল, তাহার পর স্বামীর গূঢ় বিদ্রূপ বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় ও রাগে বলিয়া উঠিল, না বাপু, আমি চললাম। কোনখানে গিয়ে একটু সোয়াস্তি নেই। কে জানত বল, এখানেও আগে থাকতে এসে ব'সে আছে ?

শেখর শ্যালিকার দিকে চাহিয়া বলিল, ওই কথাটি বোঝাবার জন্যে অরুণা কি রকম ব্যস্ত, দেখছ শচীদি ? আমি তখনই ওকে বলেছিলাম, যেও না, লজ্জায় প'ড়ে যাবে। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। বলে, সে আমি সামলে নোব'খন, কেউ বুঝতে পারবে না।

অরুণা জ্বালাতন হইয়া বলিল, বাবা বাবা ! তোমার কি লজ্জা-শরম কিছু নেই গা ?

শেখর কহিল, খুব আছে। তবে কিনা আসল কথাটা যদি না ব'লে দিই তো শচীদির মনে হতে পারে, এদের মধ্যে কিছু একটা হয়েছে। মিছিমিছি ভাবতে পারেন, মুখুজ্জে বোধ হয় ঝগড়াঝাঁটি ক'রে চ'লে এসেছে, তাই বোনটি পেছনে পেছনে ছুটে এসেছে।

অরুণা ভিতরে ভিতরে যেন জর্জরিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার হার তো হইয়াছেই,

যদি স্বীকার করিলে স্বামী অব্যাহতি দেয় তো সে রাজি। কিন্তু তাহার সুবিধা কই? আর ইতিমধ্যে অসহায়ভাবে সে কত বিদ্রূপবাণ সহ্য করিবে?
স্বামীর কথায় দম্ভ করিয়া বলিল, ইস, ছুটে আসবে! সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু দিদির দৃষ্টি এড়াইয়া একবার সকরুণ মিনতির নেত্রে চাহিল।
স্বামী নিষ্ঠুর বিজেতারই মত হাস্যকুটিল দৃষ্টি দিয়া তাহার মৌন উত্তর দিল।
এই সময় পরাজয়-স্বীকারের একটু সুবিধা হইল।
মলিনা, ডলি আর মণ্টুকে লইয়া অদূরে ছুটাছুটি খেলা করিতেছিল, ডলি কোল হইতে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। শচী মলিনাকে ধমক দিয়া ডলিকে তুলিয়া লইবার জন্য ছুটিয়া গেল।
অরুণা একবার চকিতে দেখিয়া লইল, আঘাত কিছু লাগে নাই। তারপর স্বামীর হাতটা খপ করিয়া ধরিয়া বলিল, আমি হার মানছি গো, দয়ামায়া কি নেই একেবারে?
স্বরটা ভারী হইয়া উঠিল।
হাতটা ছাড়িয়া দিয়া একটু সরিয়া গেল, অনুযোগের সুরে বলিল, কি রকম বেহায়াপনা করছ বল দেখি তখন থেকে?
শেখর বলিল, ফিরে যেতে রাজি তো?
কখন?
শেখর হাসিয়া বলিল, ছ' ঘণ্টা পরে।
অরুণা অভিমান করিয়া বলিল, এক্ষুনি চল না তার চেয়ে, বাবা-মার সঙ্গে ভাল ক'রে কথাবার্তাও হয় নি! আমার আবার বাপের বাড়ি আসা!
বেশ, কখন যাবে তুমিই বল না হয়—কাল সন্ধ্যেয়?
পরশু। অনেকদিন আসি নি।
এই কি হারের লক্ষণ?
অরুণা চোখের কোণে চাহিয়া বলিল, ইস, একজনের কাছে আমার হার আছে নাকি?
শেখর একটু হাসিল, বলিল, বেশ, তাই হবে; পরশুই রইল।
মলিনা, মণ্টু ও ডলিকে লইয়া শচী রেলিঙের ধারে দাঁড়াইয়া ছিল। গঙ্গার নৌকা-স্টীমার দেখাইয়া ডলিকে ভুলাইতেছিল, এদিকে দম্পতিকে একটু সুবিধা করিয়া দেওয়াই বোধ হয় মুখ্য উদ্দেশ্য।
খানিকক্ষণ চুপ করিয়া সামনের দিকে চাহিয়া শেখর বলিল, বড় চমৎকার জ্যোৎস্নাটি!
স্ত্রী ঘাড় বাঁকাইয়া একটু আড়ে চাহিয়া বলিল, নাঃ,সে সব হবে না—দিদি এক্ষুনি যদি ফিরে চান?
শেখর পত্নীর কাছে একটু সরিয়া গিয়া তাহার কাঁধ স্পর্শ করিয়া মৃদু স্বরে বলিল, দিদি অতবড় বোকা নয়—এটা বেশ জেনো।



বাদল

চাণক্য যখন লেখেন, 'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ', সে সময় নিশ্চয় আমাদের বাদলের মত ছেলে জন্মগ্রহণ করিত না। ওই একফোঁটা ছেলে, সবে বোধ হয় দুইটা বৎসর পুরা হইয়াছে, অথচ বাড়িসুদ্ধ এতগুলা লোক ওর পিছনে হিমসিম খাইয়া যাইতেছে! ওর ঠাকুরমার কাছে ওর সাতখুন মাপ, এমন কি, প্রতিদিন সত্য সত্য সাতটি করিয়া খুন করিলেও। কিন্তু তাঁহার মুখেও কখনও কখনও শোনা যায়, না, আমাদের কম্ম নয়; আমরা হার মানলাম বাপু, ও ছেলেকে শাসনে রাখবার জন্যে একটা নেটেড়া রাখতে হবে।

অর্থাৎ লালনের ব্যবস্থাটা বাদলের সম্বন্ধে ক্রমেই অচল হইয়া উঠিতেছে। তবে লেঠেড়াতেও যে তাহাকে বেশ আঁটিয়া উঠিতে পারিবে, সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে; কারণ, তাহার দৌরাত্ম্যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এবং তাহার মা প্রভৃতি দুই-একজন বড়দের মধ্যেও গোটাকতক অ্যামেচার লেঠেড়া গড়িয়াই উঠিয়াছে; কিন্তু বাদল তো এখনও ঠিক যে বাদল সেই বাদল!

আমি তো 'তোর যা ইচ্ছে কর্ বাপু' বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছি, এক রকম নিরাশ হইয়াই; কারণ ছোট ছেলেদের, দেশের ভবিষ্যৎ আশাদের, শরীর এবং মনের তত্ত্ব এবং এই দুইটিকে উৎকর্ষিত করিবার উপায় সম্বন্ধে মোটা মোটা দামী ফরাসী, জার্মান, ইংরেজী প্রভৃতি বই হইতে এত পরিশ্রমে যে জ্ঞান এবং ধারণা আহরণ করিয়াছিলাম, তাহা বিলকুল ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। আমার আটাশ টাকার পাঁচখানা অতিকায় বইয়ের কোন পাতাতেই বাদলের কোন অংশ ধরা পড়ে না। কেতাব-লেখকের পাকা ঝুনো মাথায় যে-সবের ধারণাও কস্মিন্‌কালেও আসিতে পারে না, এমন সব নিত্যনূতন অনাসৃষ্টির মতলব এই একরত্তি ছেলেটির মাথায় ঠাসা। এই চরিতাখ্যানের আদ্যোপান্ত পড়িলে বুঝা যাইবে যে, চেষ্টার আমি কসুর করি নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝিয়াছি,

এ ছেলেকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা খালি পয়সার শ্রাদ্ধ, সময় আর উৎসাহের অপব্যয়। ওর যাহা অভিরুচি করুক গিয়া।

তবে ইহার মধ্যে বাড়ির লোকদের বেশ একটু দোষ আছে। প্রথমত—মা। তাঁহার একটা গুমর, ছেলেপিলেদের সম্বন্ধে কোন বেটাছেলে কিছু বুঝে না ; জোর করিয়া বলেন, একেবারে কিচ্ছু নয়, আমার কাছে লিখিয়ে নাও এ কথা।

আমাদের সম্বন্ধে এ রকম হীন ধারণায় রাগ হয়, বলি, তুমি কি বলতে চাও মা, এই সাত টাকা, দশ টাকা দামের বইগুলো সবাই খাতিরে প'ড়ে কিনছে? এতে ছেলেদের—

দুধ জ্বাল হতে পারে পুড়িয়ে। থামু, আর বকিস নি বাপু।

এর পর আর বকিতে ইচ্ছাও হয় না।

কিন্তু ইহাতেও তেমন কিছু ক্ষতি নাই। ক্ষতি হইতেছে এইখানে যে, বিশেষ করিয়া বাদলের সম্বন্ধে আবার দুনিয়ার মেয়েপুরুষ কেহই কিছুই বুঝে না এক তিনি ছাড়া। কি করিয়া এই ধারণা মাথায় বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, ও এক মহাপুরুষ হইবে ; ব্যস্, ওর সাজা নাই, বকুনি নাই, এমন কি ওর দুষ্টামিতে বাধা দেওয়ারও হুকুম নাই বলিলে চলে।

অত্যাচারের আতিশয্যে এক-এক বার যে রাগ দেখান, সেটা একেবারে মৌখিক, আদরেরই রূপান্তর।

সেদিন শিশুদের অনুকরণপ্রিয়তা ও স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ সম্বন্ধে একটা নিবন্ধ পড়িতেছি, হঠাৎ ছেলেমেয়েদের পড়িবার ঘরে হাসিকান্নার একটা মস্ত হট্টগোল উঠিল। একটু পরে বাম হাতে দক্ষিণ হাতটি ধরিয়া রাণু কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিল। দেখি, কব্জির উপর স্পষ্ট চারিটি দাঁতের দাগ, লাল হইয়া উঠিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কে করেছে?

বাদল, রাক্কস ছেলে।

হুঁ, তা বুঝেছি। কোথায় সে, চলু দেখি।

ঘরে গিয়া তদন্তে জানা গেল, গৃহশিক্ষক জগন্নাথবাবু যাওয়ামাত্র বাদল আসিয়া তাঁহার আসনটি অধিকার করিয়া বসে এবং শিক্ষকতার বাজে অংশগুলিতে সময় অপব্যয় না করিয়া একেবারে সার অংশ লগুড়-চালনায় লাগিয়া যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা জাঙিয়া-পরা এই কচি মাস্টারের অভিনব মাস্টারি খানিকটা আমোদচ্ছলে উপভোগ করিল ; কিন্তু তাহার অব্যর্থ সন্ধানের চোটে আমোদের ভাগটা ক্রমেই সাংঘাতিক রকম কমিয়া আসিতে লাগিল। তখন রাণু লগুড়টি কাড়িয়া লয়, তাহার পর এই কাণ্ড।

বাদল একপাশে দাঁড়াইয়া মুখে চারিটি আঙুল পুরিয়া দিয়া অপ্রতিভভাবে সব শুনিতেছিল। হঠাৎ সজাগ হইয়া উঠিয়া গটগট করিয়া আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং মুখটা তুলিয়া বলিল, কাকা, হাম হাম।

রাণু বলিল, অমনই ছেলে ঘুষ দিতে এলেন, ভারি চালাক!

ঘুষ লইবার মত আমার মনের অবস্থা ছিল না। বাদলের হাতটা ধরিয়া বাড়ির ভিতর গিয়া একটু রাগতভাবেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কে এঁকে ওদের পড়বার ঘরে যেতে দিয়েছিল, আমি না পইপই ক'রে বারণ ক'রে আসছি?

মা বলিলেন, যেতে আর দেবে কে? ও কি কারুর হুকুমের তোয়াক্কা রাখে নাকি? তোমাদের এক অদ্ভুত ছেলে হয়েছে, রাজার রেয়ৎ নয়, মহাজনের খাতক নয়, মনে হ'ল ভেতরে রইল, মনে হ'ল বাইরে টহল দিতে গেল; কে ওকে রুকছে বল!

বলিলাম, না, দিনকতক একটু সজাগ থাকতেই হবে মা; দরকার হয়, ওর মার সংসারের পাট করা একেবারে বন্ধ ক'রে দাও দিনকতকের জন্যে। তোমরা বোঝ না, এটা ওদের নকল করবার বয়স কিনা, যত সৎ জিনিসের নকল করতে শিখবে ততই মঙ্গল। এখন যদি বাইরে গিয়ে জগন্নাথবাবুর হুঙ্কার, বেত আছড়ানি, কিংবা ঠাকুর আর চাকরের নিত্য ঘুষোঘুষির নকল করতে যায় তো ও একটি আস্ত খুনে হয়ে উঠবে, এই ব'লে দিলাম। এখন ওদের মনটা—

মা কি বলিতে যাইতেছিলেন, আমি বাধা দিয়া বলিলাম, হ্যাঁ, জানি, আমার কোন কথাই তোমাদের পছন্দ হয় না। কিন্তু এ তো আমার নিজের মনগড়া কথা নয়। এ যে ফরাসী লেখকের বই থেকে তুলে বলছি, সে যে-সে লোক নয়; বইটার এর মধ্যে সাত-সাতটা সংস্করণ—

মা যেন উদ্ব্যস্ত হইয়া বলিলেন আঃ, তুই থামু দিকিন বাপু; কচি ছেলে নকল করতে শেখে—এ কথা জানবার জন্যে নাকি আমায় ফরাসী আরবী বই ওটকাতে হবে, গেলাম আর কি! এই নকলের চোটেই তো গেরস্তকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছে, কিন্তু করা যায় কি? এই তো এক্ষুনি ওর মায়ের ঘরে কীর্তি ক'রে এল। ঘরের মেঝেয় এক বাটি দুধ আর একটা ঝিনুক রেখে বেচারী কি কাজে একটু এদিকে এসেছে। আর আছে কোথায়! লুসীর কোল থেকে তার ছানাটা টেনে নিয়ে গিয়ে, থেবড়ে ব'সে, সেটাকে চিত ক'রে কোলে ফেলে মুখের মধ্যে ঝিনুক পুরে দুধ খাওয়ানোর সে ধুম দেখে কে! ঘরের মধ্যে কেঁউ-কেঁউ শব্দ কিসের? গিয়ে দেখি, ওম্মা! ছেলে দুধের সমুদ্রের মধ্যে ব'সে, আর ওই কাণ্ড! থমকে দাঁড়াতে, মুখের দিকে চেয়ে 'বাদো ভুড়ু'।—তার মানে উনি হয়েছেন মা, লুসির ছানা হয়েছে বাদল, মার বাদলকে দুদু খাওয়ানো হচ্ছে। বাঁচাতে বাঁচাতেও বউমা এসে দিল ঘা-কতক বসিয়ে। এখন বল, চাও এমন সৎকাজের নকল? ওকে বাইরে রাখবে, কি ওর একটা খোঁয়াড় গড়বে, তোমরাই ঠিক কর। বাড়ির সবাই তো হেরে ব'সে আছি।

আমি বলিলাম, আমার উদ্দেশ্য তুমি ঠিক ধরতে পার নি মা, ওর কাছে তো ভাল মন্দ ব'লে প্রভেদ নেই। কাকে নকল করতে হবে, কোনটা নকল করতে হবে, কি ভাবে নকল করতে হবে, আমাদেরই বেছে দেখিয়ে দিতে হবে। নিজের স্বাধীন ইচ্ছে

খাটাতে গেলেই গলদ। চোখে পড়লে আমাদের ধমকে ধমকে শুধরে দিতে হবে। বেশ তো, আজকের দুই দুটো ব্যাপারই এখন রয়েছে,এই দুটো নিয়েই আরম্ভ করা যাক।
বাদল মার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া মুখে চারিটি আঙুল পুরিয়া দিয়া অপরাধীর মত নিজের কীর্তিকাহিনী শুনিতেছিল, আমি হাতটা ধরিয়া সামনে দাঁড় করাইয়া চোখ মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিলাম, বাদল!
আজ ঝোঁকটা বড় বেশি পড়িয়াছে, বাদলের ঠোঁট দুইটি ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সামলাইয়া লইয়া মার ভাবগতিকটা লক্ষ্য করিবার জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। বিষণ্ণ মুখ, সামলাইয়া-লওয়া কান্নার দুইটি বিন্দু অশ্রু চক্ষে ঠেলিয়া আসিয়াছে। আস্তে আস্তে ধরা গলায় ডাকিল, নিন্নী!
বাস্, মা গলিয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি কোলে তুলিয়া লইয়া আদরে চুম্বনে যতক্ষণ না মুখটাতে হাসি ফুটাইতে পারিলেন, ততক্ষণ নিরস্ত হইলেন না।
আমি নিরাশ হইয়া বলিলাম, ওই, স—ব মাটি করলে! কি, না একটু গিন্নী ব'লে ডেকেছে। মনের ওপর নিজের দোষের জ্ঞানটি দিব্যি জ'মে আসছিল, তুমি সব ভেস্তে দিলে। ওই জিনিসটি হচ্ছে অনুতাপের অংকুর। তোমরা নষ্ট করেছ ওকে—তুমি আর দাদা মিলে।
মা ধমক দিয়া উঠিলেন, ক্ষ্যামা দে বাপু, ওইটুকু ছেলের নাকি আবার অনুতাপ, প্রাশ্চিত্তির—অমুঙ্গুলে কথা শোন একবার! ক'রে নিক যত দুষ্টুমি করবে ও; শেষ পর্যন্ত একটা মহাপুরুষ হবেই ব'লে দিচ্ছি। তোরা সব লক্ষণ চিনিস না।
এই অবস্থা। চুপ করিয়া ভাবিতে থাকি; দুঃখ হয়, এঁরা বিজ্ঞানের দিক দিয়া ঘেঁষেন না, মেথড বুঝেন না—ইনি আর দাদা। এ বিষয়ে দাদার গাফিলতি আরও মারাত্মক; কেন না, তিনি আবার বিচার এবং শাসনের অভিনয়ের মধ্য দিয়া সেটা প্রকাশ করেন।



কোর্ট হইতে আসার সঙ্গে সঙ্গে দাদার ঘরে তাঁহার দৈনন্দিন ঘরোয়া কোর্ট বসিয়া গিয়াছে। এক পাল বাদী—রাণু, আভা, ভোম্বল, রেখা, আরও সব। আসামী মাত্র একটি—বাদল। সে বিচার-পদ্ধতির সনাতন ধারা লংঘন করিয়া জজের কোলে বসিয়া লেবেঞ্চুস খাইতেছে এবং অবসরমত মাথা সঞ্চালন করিয়া কি একটা সুর ভাঁজিতেছে।

নানা রকম ছোট-বড় নালিশের চোটে ঘরের মধ্যে হট্টগোল পড়িয়া গিয়াছে। রাণুর হাতে দাঁতের ছাপ, আভার মাথা-ভাঙা কাচের পুতুল, রেখার ছেঁড়া বই, ভোম্বলের ছেঁড়া চুল—এক প্রলয় কাণ্ড! চৌকাঠের বাহিরে লুসীও তাহার পাঁচটি নিরীহ, বিপন্ন, অত্যাচারগ্রস্ত শাবক পাশে লইয়া দীন নয়নে বিচারাসনের দিকে চাহিয়া আছে। দেখিলে এক-এক বার মনে হয় বটে, তাহার সপরিবারে ওই লেবেঞ্চুসটির দিকে লোভ; কিন্তু সে বেচারী ছাপোষা, বাদলের অত্যাচারে উদ্বাস্তু হইয়া ন্যায়ের দ্বারস্থ হইয়াছে, এ অনুমানেও কোন বাধা দেখি না।

এমন জবরদস্ত মকদ্দমা দাদা দুই কথায় শেষ করিয়া দিলেন। পকেট হইতে কাগজ মোড়া খান চার-পাঁচ বিস্কুট বাহির করিয়া আসামীকে প্রশ্ন করিলেন, এগুলো সমস্ত পেলে আর দুষ্টুমি করবে না বাদল?

আমি হাসিয়া বলিলাম, মন্দ বিচার নয়। আমারও একটু দুষ্টুমি করবার লোভ হচ্ছে। কাল আবার দুষ্টুমি করলে জরিমানার পরিমাণ ডবল হয়ে যাবে তো?

দাদা বলিলেন, ও এই সব করেছে ব'লে বিশ্বাস হয়? ওর চোখ দুটো দেখ্ দিকিন। বেঁটে, চওড়া চওড়া গড়ন, একটু ঘাড়ে-গর্দানে, আর এই রকম ধড়ের উপর প্রকাণ্ড একটা মাথা, এগুলো সবই বাদলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ দুইটি সত্যই একটু গোল বাধায় বটে, যদি বাদলের সঙ্গে অষ্টপ্রহর পরিচয় না থাকে। আর সে রকম পরিচয় দাদার বড় একটা নাইও।

সকাল সকাল দুইটি খাইয়া আপিস যান, প্রায় সন্ধ্যার সময় আসেন। ডাক পড়ে, বাদল!

শান্ত-শিষ্ট শিশুটি আসিয়া উপস্থিত হয়। দাদার জন্য বিশেষ করিয়া পরানো পরিষ্কার জামা গায়ে, হাতমুখ যত্ন করিয়া মোছানো। আসিয়াই গোটাকতক চুমা উপঢৌকন, প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া একবার 'একা' একবার 'আনু'-র নাম উচ্চারণ—মানে, রেখা ও রাণুর হাতে আজ সমস্ত দিনটা নির্যাতন গিয়াছে। সান্ত্বনাস্বরূপ লেবেঞ্চুসপ্রাপ্তি।

তারপর জ্যাঠার সেবা। জুতা রাখিয়া দেওয়া, চটি আনিয়া তাঁহার পা দুইখানি পাতিয়া বসাইয়া দেওয়া, হাত-পা ধুইবার সময় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ানো; কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, যেন কোন্ বাড়ি না কোন্ বাড়ির ছেলে।

দাদা তৈয়ার হইলে ভাঁড়ার-ঘরে গিয়া দাদার জলযোগের বন্দোবস্তের জন্য মোতায়েন হওয়া, পানের ডিবা হাতে করিয়া আবার প্রবেশ।

তাহার পর বসিয়া বেশ পরিপাটিভাবে দাদার জলখাবারের রেকাবির ভার লাঘব করা। এই অংশের চতুর্থ অধ্যায়ে দেখা যায়, বাদল দাদার সঙ্গে খানিকক্ষণ হুড়াহুড়ি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পাশে শুইয়া পড়িয়াছে। দাদা আস্তে আস্তে রগের উপর করাঘাত করিতেছেন এবং বাদলের শান্ত অধরে তাহার 'ভাত আসছেন, আমি খাচ্ছেন'-শীর্ষক স্বরচিত প্রিয় গানটি মৃদুতর হইয়া মিলাইয়া আসিতেছে।

আমি বলিলাম, ওর চোখ দুটো তো মারামারির জন্যে হয় নি, ওকে বাঁচাবার জন্যে হয়েছে, বাঁচাচ্ছেও বেশ। কিন্তু ওর হাত পা আর দাঁত—যা ওর অস্ত্র, সেগুলো দেখে তোমার কোন সন্দেহের কারণ আছে? যদি থাকে তো না হয় বাঁখারিগুলোও আনিয়ে দিই।

দাদা হাসিয়া বলিলেন, শুনছ বাদল, বাদীরা নিজের মুখেও নালিশ করলে, আবার ভাল উকিলও রেখেছে। এখন তোমার কি বলবার আছে, বিশেষ ক'রে বাঁখারি সম্বন্ধে?

বাদল দাদার হাঁটু-ঘোড়ার উপর ঘোড়সওয়ার হইয়া বসিয়া ঘোড়াকে চালাইবার নানা উপায় লইয়া ব্যস্ত ছিল; বাঁখারির কথা শুনিয়া সড়াৎ করিয়া নামিয়া পড়িয়া গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল। আমরা তাহার এই হঠাৎ তিরোভাবের কারণ না ধরিতে পারিয়া তাহার পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় বাদল একখানা চওড়া, প্রায় হাত-খানেকের বাঁখারি লইয়া প্রবেশ করিল।

চৌকাঠ না পার হইতেই ছেলেমেয়েগুলা কলরব করিয়া উঠিল। কেহ বলিল, ওটা ওর তরোয়াল, ওই দিয়ে আমার কপালে মেরেছিল, এই দেখ। কেহ বলিল, ওটা আমার রাঁধার হাতা, আমায় দিয়ে দিতে বল। সবচেয়ে ছোট সন্তানবৎসলা আভা প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, না গো না, ওটা হাতা নয়, তরোয়াল নয়, আমার ছেলে, ওর কাপড় কেড়ে নিয়েছে বাদলা।

বাদল এসবের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সটান দাদার কোলে গিয়া বসিল এবং তাহার অচল ঘোড়াটিকে গতিবান করিবার জন্য তাহার এই নূতন আমদানি করা সূক্ষ্ম চাবুকটি উঁচাইয়া ধরিল।

দাদা হাসিয়া উদ্যত চাবুকটি ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, আহা বাদল, ঘোড়া দুটো সমস্ত দিন তোমার জ্যাঠাটিকে ব'য়ে ব'য়ে এলিয়ে পড়েছে, আর এর ওপর ঠেঙিয়ে কাজ নেই।

বাদল দাদার মুখের দিকে চাহিয়া নালিশের সুরে বলিল, ডুট্টু।

দাদা বলিলেন, আহা, কিছু খায় নি কিনা অনেকক্ষণ, তাই দুষ্টু হয়েছে। তোমায় একটা ভাল ঘোড়া কিনে দোব 'খন, কি বল?

আমায় বলিলেন, কালকে ছুতোরকে একটা কাঠের ঘোড়ার কথা ব'লে দিস তো।

বলিলাম, দোহাই, আর উপসর্গ বাড়িয়ে কাজ নেই। যা সরঞ্জাম সব মজুত—

দাদা শেষ না করতে দিয়া বলিলেন, না, কাজ কি? আমার ঠ্যাং দুটো ওই আখাম্বা বাঁশ-পেটা খাক আর কি! এখন ওই ঝোঁক চেপেছে সেদিন রমনায় ঘোড়দৌড় দেখে।

বলিলাম, ছুতোরকে ব'লে দিতে বিশেষ আমার আপত্তি নেই, শুধু ভয় এই যে আর একটা ঝগড়ার ঘর বাড়বে। আর, তা ছাড়া কচি ছেলের ঝোঁকমত সব বিষয়েই যোগান দিয়ে যাওয়াটা ঠিক নয়, তাতে ওদের মন একটা নির্দিষ্ট গতি পায় না। এ কথাটা বেশ

সন্দেশের একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন বিখ্যাত জার্মান লেখক ফন—

দাদা বিরক্তভাবে বলিলেন, তোর ওই কেতাবী বুলি রাখ্ দিকিন। ছেলেপিলের মন এখন হাজার পথে হু হু ক'রে দৌড়বে ও মাঝ থেকে পাহাড়প্রমাণ কেতাবের লাইন ঘেঁটে ঘেঁটে হয়রান হ'ল! বাংলা কথা হচ্ছে, ছোট ছেলের ঘোড়ার শখ হয়েছে, তাকে একটা কিনে দিতেই হবে। না দাও, আমার হাঁটু, তোমার কাঁধ, চেয়ারের হাতল, ছাতের আলসে, যা সুবিধে পাবে ঘোড়া ক'রে ব'সে থাকবে। শেষকালে একটা কাণ্ড ঘটাক আর কি—

আভা বলিল, বা রে, ও আমাদের মারলে, আর ওকেই বিস্কুট দেওয়া হ'ল; আবার একটা ঘোড়া পাবে—

রেখার কথায় ইহার মধ্যেই বেশ ঝাঁজ হইয়াছে। একটু পিছনে ছিল, সেই আড়াল হইতে বলিল, ও ছেলে কিনা; আমরা সব বানের জলে ভেসে—

দাদা রাগ দেখাইয়া বলিলেন, কে রে? রাখী বুঝি? মেয়ে হতে গিছলে কেন?

রেখা আর একটু সরিয়া গিয়া বলিল, বাদলের মার খাবার জন্যে।

দুইজনেই হাসিয়া উঠিলাম। দাদা বলিলেন, একেবারে পেকে গেছে হতভাগা মেয়ে। নাঃ, এরা বেজায় মরীয়া হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, তোদের বিচার ক'রে দিচ্ছি, দাঁড়া। ডাকিলেন, বাদলবাবু এদিকে এস তো, লক্ষ্মীছেলে।

বিচারের আশায় বাদীমহলে একটু চঞ্চলতা, ফিসফিসানি পড়িয়া গেল। বাদল দাদার ঈজি-চেয়ারের পিছনে গিয়া দুলিয়া দুলিয়া বিস্কুট খাইতেছিল এবং রেখার সহিত লুকোচুরি খেলা করিতেছিল; ডাক শুনিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

দাদা রাণুর হাতটা তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, এ কি করেছ বল তো? এ তোমার কে হয়?

গড়পড়তা রোজ এ রকম চার-পাঁচটি বিচার-অভিনয় হওয়ায় বাঁধা গতটি বাদলের খুব রপ্ত। দাদার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতে খাসা নির্বিকারভাবে নিজের কান দুইটি ধরিয়া বলিল, ডিডি অয়।

প্রণাম কর।

হুকুমের পূর্বেই সে অর্ধেক ঝুঁকিয়াছিল, প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সন্ধির স্বাক্ষরস্বরূপ রাণু একটা চুমা খাইল। বাঁধা রীতির আর একটা অঙ্গ।

এই রকম ভাবে দোষের গুরুত্বলঘুত্বনির্বিশেষে পাঁচটি মকদ্দমার এই একই পদ্ধতিতে বিচারকার্য শেষ হইলে দাদা বলিলেন, কেমন, তোমাদের আর কোন দুঃখু নেই তো? বাদলের সাজা মনে ধরেছে? আর কোন নালিশ নেই?

ও বয়সে ভাব করিবার ইচ্ছাটাই প্রবল, সেইজন্যই হউক, কি ইহার বেশি বিচারের আশা নাই বলিয়াই হউক, সবাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না; এক রেখা ছাড়া। তাহার ঐতিহাসিক দৃষ্টিটা বেশ তীক্ষ্ন। বলিল, আবার কাল—

দাদা হাসিয়া বলিলেন, বেশ, কালকের কথা কাল দেখা যাবে। এই চারখানা ক'রে

বিস্কুট নাও সব ; বাদল যদি দুষ্টুমি করে, একটু ক'রে ভেঙে দিও, ঠাণ্ডা থাকবে। যাও, বিচার শেষ।

না বলিয়া পারিলাম না, এই একঘেয়ে নকল-বিচারে ওর মনে কোনও দাগ বসাতে পারে না, এইজন্যেই—

দাদা তাঁহার সেই হাসির হিল্লোল তুলিয়া বলিলেন, দাগ বসাতে হ'লে তো ওরই বিদ্যে শিখতে হয় আমাকেও, রাণুর কব্জিটা দেখেছিস তো? আমার দাঁতে অত জোর-টোর নেই বাপু।

সবাই চেঁচামেচি করিতে করিতে চলিয়া গেল। বাদল দাদার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, দাত্তা, দুচী?

দাদা আমায় কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন ; অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিলেন, হ্যাঁ জ্যাঠা, লুসি। আমি যতদূর দেখছি, শৈলেন—

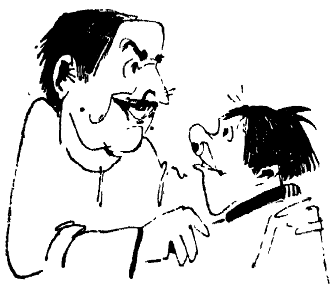
বাদল আধ-খাওয়া বিস্কুটটা লুসির দিকে বাড়াইয়া ডাকিল, আঃ, আঃ।

লুসি আপনার বাচ্চাগুলিকে ঘাড়পিঠ হইতে ঝাড়িয়া দিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে উপস্থিত হইল।

দাদা বলিয়া যাইতেছিলেন, এই তো গ্রামে নিজেদের মধ্যে সম্ভাব, দল পাকাতে পেলে সব ছেড়ে তাতেই মেতে ওঠে, কতটা দুঃখের বিষয় বল্ তো? তুই হাসছিস যে?

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া তিনিও সজোরে হাসিয়া উঠিলেন। বাদল তাঁহার বিচারের ত্রুটিটুকু পূরণ করিয়া দুই হাতে দুইটি কান ধরিয়া লুসির সামনের থাবা দুইটির উপর মাথা দিয়া পড়িয়া আছে এবং লুসি তাহার দীর্ঘ জিহ্বা দিয়া পরম ক্ষমাভরে তাহার মাথা পিঠ চাটিয়া চাটিয়া একশা করিয়া দিতেছে।

দাদার বিচারের সদ্য সদ্য আলোচনা করিবার এমন চমৎকার সুযোগটা আমি নষ্ট হইতে দিলাম না। হাসিতে হাসিতেই বলিলাম, তোমার বিচারের ফার্সটা যেটুকু অসম্পূর্ণ ছিল, বাদল নিখুঁতভাবে সেটা পুরিয়ে দিল দাদা।



পরের দিন সকালে দাদার ঘরে বাদলের কথা হইতেছিল। মা বলিতেছিলেন, ওর তো সর্বজীবে সমান ব্যবহার হবেই, ওসব লক্ষণই আলাদা। স্থির হয়ে এক-এক সময়

যখন ব'সে থাকে, ঠিক পরমহংস দেবের মত মুখের ভাবটি হয়, দেখিস না! তিনিও নিশ্চয় ছেলেবেলায় ঠিক অমনটি ছিলেন। আর তা ছাড়া অমন একটা বড় তীর্থে জন্মেছে, ও একটা মহাপুরুষ না হয়ে যায় না, তোমরা সব—

এমন সময় বারান্দায় চটাস করিয়া একটা প্রচণ্ড চড়ের আওয়াজ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে বাদলের ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিবার আওয়াজ।

মা তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়ে ধমকাইয়া উঠিলেন, ও কি বউমা, ছেলের গায়ে হাত? আর ওই রকম হাত? দিন দিন যে কসাই হয়ে উঠছ!

বউমার চাপা গলার রুদ্ধ স্বর শোনা যাইতে লাগিল, আমি তো আর এই ডানপিটে চোরকে নিয়ে পারি না মা; দেখবে এস, রান্নাঘরে কি কাণ্ডটা করেছে হতচ্ছাড়া ছেলে!

দৃশ্যটি নিশ্চয় খুবই মনোজ্ঞ, সবাই উৎসুকভাবে উঠিয়া গেলাম। সরেজমিনে বাদল মুখের মধ্যে চারিটি আঙুল দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ঝোলে সবুজ হইয়া গিয়াছে, বাম হাতের মুঠার মধ্যে একমুঠা মাছ। কান্না থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু তখনও তাহার মাকে অতিক্রম করিয়া এদিকে আসিয়া পড়িবার মত সাহস যোগাইয়া উঠে নাই।

দাদা একেবারে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, ও মা, তোমার সাধুপুরুষের সর্বজীবে সমভাবের আর একটা নমুনা দেখ, এইখানে এস, ওই জলের টবটার আড়ালে।

সেখানটায় হঠাৎ কাহারও দৃষ্টি যায় না, আর বাদল কিংবা লুসি ভিন্ন কেহ প্রবেশ করিতেও পারে না। সেই অন্ধকার কোণে ঝকঝকে একখানি রেকাবিতে আধ সের পরিমাণ মাছের মুড়া একটা, রেকাবির এধারে ওধারে কাঁটাকুটা দুই-একটা পড়িয়া আছে। লুসি আরম্ভ করিয়াছিল, এখন সভয়ে গুটিসুটি মারিয়া দীন নয়নে আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

দাদা হাসিতে হাসিতে রাঙা হইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন, আবার মাজা রেকাবিতে তোয়াজ ক'রে। ও বাদল, ওটি আমাদের নাতবউ নাকি?

দার্শনিক হিসাবে বাদল একজন সুবিধাবাদী। বুঝিল, আর দেরি করা নয়। যেন মস্ত একটা ইয়ার্কি চলিতেছে, যাহার মর্ম শুধু দাদা আর সে বুঝে, এইভাবে দাদার পানে চাহিয়া, নাতবউ বলিয়া খুব বড় করিয়া একগাল হাসিয়া পা বাড়াইল, কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মার চোখের দিকে নজর পড়ায় থমকিয়া মুখে চারিটি আঙুল পুরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

রেখা হাসিয়া বলিল, ও সাধুপুরুষ! তোমার আবার চুরিবিদ্যে?

মার ধমক খাইয়া আড়ষ্ট হইয়া গেল।

আমরা সরিয়া গেলেই বউমাকে আর রোখা যাইবে না; অন্তত রুখিবার পূর্বেই লুসিঘটিত এই নূতন আবিষ্কারের ঝাল তিনি ঝাড়িয়া লইবেনই। মা তাড়াতাড়ি

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বাদলকে বাহির করিয়া আনিলেন। পরমহংসদেব হইতে একেবারে চুরির দায়ে গ্রেপ্তার, নাতি তাঁহাকে একটু অপ্রতিভ করিয়া ফেলিয়াছে বইকি!
কাহারও দিকে না চাহিয়া বলিলেন, ও আমার ননীচোরা, তাঁরও চুরি ক'রে না খেলে পেট ভরত না। নে, আর জটলা করতে হবে না সব, হাতে-নাতে পাট সেরে নে।
এই রকম একটা কাণ্ডের পর খুব খানিকটা হল্লা-হাসি হয়, যোগদান করি, তারপর বিষণ্ণ হইয়া পড়ি। একটা গোটা ছেলের ভবিষ্যৎ, সোজা কথা নয় তো! এদিকে দেশের এই দুর্দিনে—
মাকে বলিলাম, দেখ মা, এ ঠিক হচ্ছে না। এতে ক'রে নাতি তোমার পরমহংসদেবও যত হবে, ননীচোরাও তত হবে, আর বাবার রোঘো-ডাকাতও খুব হবে। এ'র ঠ্যাঙ, ও'র ধড়, তাঁর মুড়ো নিয়ে কিম্ভূত-কিমাকার যা হয়ে উঠবে, তা দেখবার মত হবে নিশ্চয়। তার চেয়ে দিন-কতক আমার হাতে দাও। বেশ তো, সাধুপুরুষ চাও, সেই রকম ভাবেই—
মা বলিলেন, তোর কাছে সব ছাঁচ আছে নাকি যে, ঢালাই ক'রে যেমনটি চাইবি গ'ড়ে টেনে তুলবি? তা রাখ্ না বাপু, তোর কাছেই। এতগুলো লোককে নাজেহাল ক'রে তুলেছে, পারবি তো একা সামলাতে?
দাদা বলিলেন, কিছু না, ওকে একটা ঘোড়া কিনে দে আপাতত; কিছুদিন ঠাণ্ডা থাকবে 'খন।
বলিলাম, ঘোড়ার খেয়ালটাই মাথা থেকে সরিয়ে দিতে হবে। ওই জিদ ভাঙা দিয়েই আরম্ভ করব।
আর ও-ও তোমার প্ল্যান ভাঙা দিয়ে শেষ করবে, এই ব'লে রাখলাম। কি বাদল, পারবি তা?
দাদা হাসিতে লাগিলেন।
সেইদিন হইতেই আরম্ভ করিয়া দিলাম। ঠিক হইল, এক খাওয়ার সময় ছাড়া বাদল সমস্ত দিন আমার কাছে থাকিবে। সন্ধ্যা হইতে দাদার চাই-ই; অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হইলাম, কিন্তু সমস্ত দিনের অপকীর্তির বিচারের ভারটা দাদার হাত হইতে তুলিয়া লইলাম। বলিলাম, ও ব্যাপারটাকে অত হালকাভাবে নিলে চলবে না, বিচারটা বেশ সূক্ষ্মভাবে ওর সমস্ত দিনের কাণ্ডকারখানার আলোচনা ক'রে করতে হবে; রোজকার রোজ ওর মনের কোনও বৃত্তিকে একটু একটু ক'রে উসকে দিতে হবে, আবার কোনটাকে বা অল্প অল্প ক'রে নিবিয়ে আনতে হবে।
দাদা হাসিয়া বলিলেন, মন্দ হয় না; তা হ'লে শীগগির মনোবৃত্তির একটা টেম্পারেচার-চার্ট তোয়ের ক'রে ফেল্। রোগীটিকে বাইরের ধুলো বাতাস থেকে বাঁচিয়ে কোন্ ঘরে পুরে রাখবি?
রাগিয়া বলিলাম, ঘরে পোরবার দরকার আছে বলছি কি? হাসবে খেলবে, একটু মারামারিও করবে; এমন কি, চুরিও করতে পারে মাঝে মাঝে, তবে একটা সিস্টেমের

মধ্যে। স্পার্টানরা তো তাদের ছেলেদের চুরি করতে—

দাদা আবার হাসিয়া উঠিলেন, অর্থাৎ ছেলেটাকে তুই একটা সিস্টেমেটিক চোর করতে চাস? হাঃ-হাঃ-হাঃ।

দাদাকে পারিবার জো নাই।

পরের দিন সতরো টাকা দামে দুই ভল্যুম বই আনিতে দিলাম। অথর আমেরিকার একজন বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক; সমস্ত জীবন অবিবাহিত থাকিয়া কেবল শিশুমনের আলোচনা করিয়াছেন।

মা শুনিয়া বলিলেন, নে, আর জ্বালাস নি বাপু, যে বিয়েই করলে না, ছেলেপিলের মুখ দেখলে না, সে শিশুদের বিষয় কি বুঝবে? ঢঙ একটা!

দাদা বলিলেন, কেন, এক সময় সে নিজে তো শিশু ছিল!

এসব ঠাট্টায় কান দিলে চলে না। বই দুইখানা সযত্নে মলাট দিয়া আলমারিতে তুলিলাম। আমার অন্যান্য বইগুলোকেও ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া সাজাইয়া রাখিলাম।

দুই-চারি দিন গেল। আমার কেতাবের ছত্রগুলি লাল নীল দাগের উর্দি পরিয়া আমার সাহায্যের জন্য মোতায়েন হইয়া উঠিল। প্রথমটা বাদলকে একচোট অগাধ মুক্তি দিয়া দিলাম, বাড়িতে অষ্টপ্রহর সামাল সামাল রব পড়িয়া গেল। মা বলিলেন, এই কি তোর শাসন হচ্ছে? এর চেয়ে সে যে ঢের ভাল ছিল।

মাকে ছকটা বুঝাইয়া দিলাম, হোমিওপ্যাথি ওষুধে প্রথমে রোগটা একচোট বাড়িয়ে তোলে। আমি ওর সমস্ত দোষগুণগুলো ভাল ক'রে ফুটিয়ে তুলে ওকে ভাল ক'রে চিনে নিচ্ছি আগে, সপ্তাখানেক লাগবে।

মা বলিলেন, তদ্দিনে বাড়ির অন্য ছেলেপিলেদের আর চিনতে পারবে না, কিন্তু, এই ব'লে দিলাম। আজ ঘুমন্ত আভার মুখে পাউডারের সমস্ত কৌটো গেছে, দম আটকে যায় আর কি! ওই গো, আবার বুঝি কি কাণ্ড বাধালে! ওরে, কে আছিস, দেখ্‌ দেখ্‌।

চার দিন গেল, ছয় দিন গেল, দশ দিন গেল, চিনতে অত্যধিক দেরি হইতেছে, উত্তরোত্তর শক্তও হইয়া উঠিতেছে যেন—দুষ্টামিতে বাদলের নিত্য নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়ার জন্য। ক্রমে দেখিতেছি—এবেলা এক রকম, ওবেলা এক রকম। নালিশের চোটে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। দাদা বলেন, শৈলেনের কাছে যা। মা বলেন, শৈলেনের কাছে যা, কিছু বললে আমাদের ওপর চটবে। বউদের মুখেও ওই কথা। আবার তাঁহাদেরও নিজের নিজের নালিশ আছে।

অথচ আমি চটিব না, একটুও চটিব না; কিন্তু সে কথা বলি কি করিয়া? ছেলেপিলেদের মধ্যে যে নালিশ করিতে আসিতেছে, সেই উল্টা মার খাইয়া গেল, এমন ব্যাপারও ঘটিতেছে দুই-একটা। বালি, মাথায় ধুলো দিয়ে দিয়েছে তো ধিক দুদিন; আমায় বই প'ড়ে নেবার একটুও অবসর দিবি নি তোরা?

আসলে ঠিক বই পড়া নয়। বইয়ে দাগ দেওয়া হইতে এখন সমস্ত পাতার উপর

ঢেরা কাটায় দাঁড়াইয়াছে, বোধ হয় রাগের মাথায় দুই-একখানা পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াও থাকিব। আমার মুখ দিয়া কি ইহারা 'না' না বলাইয়া ছাড়িবে না? এদিকে সপ্তাহখানেক ছুটি বাড়াইব বলিয়া যে ঠিক করিয়াছিলাম সে সংকল্প ত্যাগ করিয়াছি, বোধ হয় ছুটি ফুরাইবার সপ্তাহখানেক আগেই চলিয়া যাইতে পারি।

আজ পনরো দিনের দিন। নবীনতম সংবাদ—বাদল বাবার গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিল, বাবার মত ঈজিচেয়ারে হেলান দিয়া। আভা চোখ দুইটা এতবড় করিয়া আসিয়া খবর দিল, একবার দেখবে এস আস্পদ্দাটা!

একটা চড় কষাইয়া দিয়া বলিলাম, আর তুমি কোথায় ছিলে বাঁদরী? ছোট ভাইটিকে একটু চোখে চোখে রাখতে পার না?

অর্থাৎ আভার হাতেও অভিভাবকত্বের ভারটা ছাড়িয়া দিতে রাজি আছি। বলিলাম, ধ'রে নিয়ে আয় হতভাগাকে।

সেটা দৈহিক সম্ভাবনার বাহিরে জানিয়া নিজেই গেলাম। দেখি, একবর্ণও মিথ্যা নয়। অবশ্য কলিকাতে আগুন নাই, কিন্তু টানার ভঙ্গী নিখুঁত, মায় বাবার কাসিটি পর্যন্ত! বাবার প্রতিবেশী বন্ধু উপেনবাবু আসিলে নলটি বাড়াইয়া দেন, সেটুকুও বাদ গেল না; আমি সামনে আসিতেই মুখ হইতে নলটা সরাইয়া 'খুড়ো, এতো' বলিয়া হাতটি বাড়াইতে যাইতেছিল, আমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মাঝপথেই থামিয়া গেল।

খানিকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আমি কানমলা কি ওই রকম একটি ছোটখাটো সাজা দিতে যাইতেছিলাম, একটা কথা ভাবিয়া থামিয়া গেলাম। হঠাৎ মনে হইল, বাদল নিশ্চয় এটা দোষ বলিয়া আগে জানিত না। কেন না, জানিয়া শুনিয়া যে দোষ করা, তাহাতে ধরা পড়িলেই বাদল নিজে হইতেই কান ধরিয়া পূর্বাহ্ণেই হাঙ্গামা মিটাইয়া রাখে। তাহা ছাড়া দোষ বুঝিলে আমাকে দেখামাত্রই ভয় পাইত নিশ্চয়ই; 'খুড়ো, এস' বলিয়া এ ভাবে সটকাটা বাড়াইয়া দিতে সাহস করিত না।

আমি এইটিকে নিছক একটি দৈব সুযোগ বলিয়া ধরিয়া লইলাম। অপরাধটি একেবারে নূতন; কেন না, বাবা কখনও নল বাহিরে ছাড়িয়া যান না, কেমন ভুল হইয়া গিয়াছে। দামী রবারের নল, এখানে পাওয়া যায় না, তাঁহার অত্যন্ত হেফাজতের জিনিস।

এই অপরাধটিকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষা আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাক। এখন হইতেই অপরাধের গুরুত্বটি মাথার মধ্যে এমন করিয়া ঢুকাইয়া দিতে হইবে, যেন এই জাতীয় অপরাধ সমস্ত জীবনে আর না করে।

নিজের ঘরে লইয়া আসিয়া বাদলকে একখানি মাদুরে বসাইলাম এবং সামনে একটি টুলের উপর নলসুদ্ধ গড়গড়াটি বসাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ওই দেখ, আর মুখ দিবি ওটাতে?

এক নূতন ধরনের অভিজ্ঞতায় বাদল একেবারে হকচকিয়া গিয়াছিল, আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়িল।
ঠিক ওই ভাবে ব'সে থাক্, বজ্জাত কোথাকার!—বলিয়া আমি শেলফ হইতে একটা বই টানিয়া লইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িতে লাগিলাম।
একটু পরে আবার ফিরিয়া তাকাইলাম, বাদল জড়ভরতের মত ঠায় সেই ভাবে বসিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, দিবি আর মুখ ওটাতে? পেরেকের মাথায় একটি একটি করিয়া ঘা দেওয়া হইতেছে।
সে সেই রকম মাথা নাড়িল, না।
ব'সে থাক্ ঠিক ওই ভাবে, ওই দিকে চেয়ে।



বইয়ে ঠিক এই ধরনের চিকিৎসার কথা লিখিতেছে; সেইখানটা খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম। বলিতেছে, সাজা কড়া হইবার কোন দরকার নাই; একটি গাম্ভীর্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করিয়া দোষের গুরুত্বটা মাথার মধ্যে অল্পে অল্পে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। বার্লিনের পাঁচটি দুশ্চিকিৎস্য শিশুর কেস দেওয়া আছে; রীতিমত রেকর্ড রাখিয়া দেখা গিয়াছে, সাত বৎসরের মধ্যে তাহারা সে দোষ আর করে নাই, অথচ সব জার্মান-বাচ্চা—কালে হিণ্ডেনবার্গ, লুডেনডর্ফ হইবার কথা।
বিবৃতিটি এতই চিত্তাকর্ষক যে, চোখ ফেরানো যায় না। পড়িতে পড়িতে থাকিয়া থাকিয়া চক্ষু না তুলিয়া তিন-চার বার প্রশ্ন করিলাম, আর দিবি মুখ ওতে?
উত্তর নাই, না দেখিলেও বুঝিতেছি, সেই রকম ভাবে মাথা নাড়িতেছে।
খানিক পরে সমস্ত অধ্যায়টি শেষ করিয়া বইটা মুড়িয়া রাখিলাম। নিজের পরীক্ষার এই আশু সফলতায় মনে মনে তৃপ্তিবোধ হইতেছিল। বেশ নিশ্চিন্তভাবে 'আর ওটাতে দিবি না তো মুখ, অ্যাঁ?' বলিয়া ফিরিয়া উঠিয়া বসিলাম।
কোথায়-বাদল? মাদুর শূন্য, টুলের উপর খালি গড়গড়াটা, সটকা নাই।
হাঁকিলাম বাদল!
ও বারান্দা হইতে উত্তর আসিল, অ্যাঁগ্যোন!
ওর বাবার শেখানো ভদ্রতা, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বাদল ব্যবহার করে।
উঠিয়া গিয়া ব্যাপার যাহা দেখিলাম, তাহাতে তো চক্ষুস্থির!
রবারের নলের আধখানা লইয়া লুসির বাচ্চারা খেলা করিতেছে, আধখানা ঘোড়ার

লাগামের আকারে লুসির মুখে, বাদলের হাতে তাহার খুঁটে দুইটা, মুখে হ্যাট হ্যাট শব্দ চলিতেছে।

লুসি মাংসভ্রমে পরম পরিতোষ সহকারে চিবাইয়া যাইতেছে, এটারও দুইখানা হইয়া যাইতে আর দেরি নাই। বাবার শখের নল, সমস্ত বাজার উজাড় করিয়া বাছিয়া কেনা।

একটুখানির মধ্যেই বাড়িতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল, বাবা আসিয়া সটকার খোঁজ করিতেই। বউমার নির্দয় প্রহারে বাদলের বাড়ি-ফাটানো কান্না, মার বউমাকে বকুনি; এর সমস্তটাই এমন স্বার্থক যে, প্রত্যেকটি কথা আমার উপর একটু বক্রভাবে খাটে; লুসির চীৎকার করিতে করিতে গৃহত্যাগ এবং তাহার বাচ্চাদের গৃহের মধ্যে থাকিয়া অসহায়ভাবে চীৎকার।

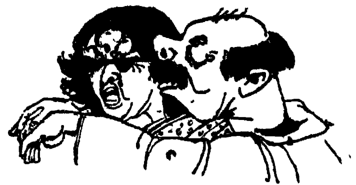
দাদা ক্রমাগতই বলিতেছেন, বলছি ওকে একটা ঘোড়া কিনে দে, সেদিন পই পই ক'রে বুঝিয়ে বললাম।

বাবা 'ন ভুতো ন ভবিষ্যতি' তিরস্কার লাগাইয়াছেন, তাহার মধ্যে সেকাল-একালের তুলনামূলক ব্যাখ্যান আছে, এ সংসারে তামাক ধরার জন্য আত্মাধিক্কার আছে, বিজ্ঞান-মাত্রেরই—বিশেষ করিয়া মনস্তত্ত্বের—শ্রাদ্ধ-কামনা আছে।

বলিতেছেন, ভড়ঙের যেন যুগ প'ড়ে গেছে, ছেলে তো আমিও মানুষ করেছি, একটা আধটা নয়—

মা শেষ করিতে দিলেন না; আমার দিকে চাহিয়া ছিলেন, মুখটা বিরক্তভাবে ঘুরাইয়া লইয়া ঝাঁকিয়া বলিলেন, ছাই মানুষ করেছ, ওই নমুনা দিয়ে আর বড়াই করতে হবে না।

শিশু-মনস্তত্ত্বমূলক সাতখানি নামজাদা পুস্তকের গ্রাহকের জন্য "স্টেটস্‌ম্যানে" বিজ্ঞাপন দিয়া দিয়াছি।



মেঘদূত

এ কাহিনীটি বোধ হয় নিতান্তই কবিকল্পনা, সংজ্ঞা দেখিয়া গোড়াতেই এইরূপ একটা ভুল ধারণা আসিয়া পড়িতে পারে ; তাই বলিয়া রাখি, এর যক্ষরাজ—এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র শ্রীমান অভয়পদ, যক্ষবধূ—শ্রীমতী অণিমা রায়, এবং এর মেঘদূতে—যাক, আপাতত, তিনি একটু অন্তরালেই থাকুন।

অভয়পদর বৈমাত্র ভাই শ্যামাপদর বয়স চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি হইবে, অর্থাৎ তিনি তাদের চেয়ে ন্যূনকল্পে বাইশ-তেইশ বৎসরের বড়। বড্ড রাশভারী পুরুষ। পিতা অবশ্য আরও ঢের বড় ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন বড় ঢিলাঢালা, অতিরিক্ত স্নেহপ্রবণ মানুষটি। তাঁহার বর্তমানে দাদার, কড়া শাসনটাকে একটু পাশ কাটাইয়া আসিতে হইত বলিয়া অনেকটা বাঁচোয়া ছিল, মানে, তবু কিছু স্বাধীনতা পাওয়া যাইত ; এখন তাঁহার মৃত্যুতে সেটুকুও লোপ পাইতে বসিয়াছে।

শ্যামাপদ বলেন, সংসারটা পরীক্ষাগার, হাসিঠাট্টার জায়গা নয়। তাই সবার হাসি-ঠাট্টার পথে কড়া চোখের পাহারা বসাইয়া তিনি নিজের অধীনের জীবগুলিকে পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত করিয়া তুলিতে গম্ভীরভাবে মোতায়েন হইয়া গেছেন। মন লইয়াই আসল কথা ; কিন্তু বিপদ এই যে, মনের গূঢ় তত্ত্বগুলি খোদ মানুষের নিকট হইতে সব সময় ভাল করিয়া আদায় করা যায় না। তাহার কারণ, হয় মানুষকে সব সময় ইচ্ছানুরূপ অবস্থায় ফেলা যায় না, না হয় ফেলিতে পারিলেও আত্মগোপনশীল মানুষের চতুরালি ছিন্ন করিয়া তত্ত্বরত্নগুলি উদ্ধার করাও সময় সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই গুরু সমস্যা সমাধানের জন্য শ্যামাপদ বাড়ির একধারে নিরিবিলি দেখিয়া একটা ল্যাবরেটরি অর্থাৎ বীক্ষণাগার তৈয়ারী করিয়াছেন। সেখানে ব্যাং, টিকটিকি, গিনিপিগ, খরগোশ, বিলাতী ইঁদুর প্রভৃতি যেসব প্রাণীর সঙ্গে মানুষের খুব ঘনিষ্ঠ, সম্বন্ধ তাহাদের খাঁচাবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের প্রয়োজনীয় অবস্থায় ফেলিয়া এবং প্রয়োজন গুরুতর হইলে চিরিয়া-ফাড়িয়াও শ্যামাপদ মানব মনের তত্ত্বরাশি সংগ্রহ করিয়া থাকেন। সেগুলি যথাবিধি নোট-বুকে জমা হইয়া উঠে, তাহার পর মানুষের উপর প্রয়োগ করিয়া তাহাদের যাচাই হয়। শ্যামাপদর বেশির ভাগ সময়ই এই বীক্ষণাগারে কাটে।

পিতার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শ্যামাপদ নিরতিশয় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। কেমন যেন একটা মনমরা ভাব, কিছুতেই স্পৃহা নাই, পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে এবং অত্যন্ত বাধ্য ও সত্যবাদী হইয়া পড়িয়াছে। মনস্তত্ত্বের অনেক পুস্তক উল্টাইয়া এ অবস্থায় একটা নামও বাহির হইল—loss of individuality অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের বিলোপ। জ্যেষ্ঠ একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

গবেষণাগারে পরীক্ষা চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন হদিস পাওয়া গেল না। একটা গিনিপিগের খাঁচা হইতে ধাড়ী দুইটাকে সরাইয়া দেখা গেল, ছানাগুলার তাহাতে মোটেই কোন দুঃখ নাই, এবং খাদ্যের দুইটা বড় বড় অংশীদার স্থানান্তরিত হওয়ায় এবং খাঁচার মধ্যেও চলাফেরা করার খানিকটা সুবিধা হওয়ায় তাহাদের ব্যক্তিত্ব বেশ বাড়িয়া গেল বলিয়াই বোধ হইল। মাথা ঘামাইয়া আরও যেসব গবেষণা করা গেল, তাহাতেও এই ধরনের উল্টা ফলই হইতে লাগিল। তখন খাঁচাবন্দীদের নিকট হতাশ হইয়া শ্যামাপদ গৃহবন্দিনীর দ্বারস্থ হইলেন। স্ত্রী হৈমবতী বিনা চিন্তা এবং গবেষণাতেই বলিলেন, ঠাকুরের কালাশৌচটা গেলে ওর বিয়ে দিয়ে দাও।

শ্যামাপদ হাঁ করিয়া স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

স্ত্রী বলিলেন, ও রকম ক'রে চেয়ে রইলে যে? তুমি তো এই চাও যে, ঠাকুরপো একটু অন্যমনস্ক হোক, মনে একটু ফুর্তি আসুক?

শ্যামাপদ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ঘরের মধ্যে খানিকটা পায়চারি করিলেন। তারপর একটা সোফার হাতলের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, কিন্তু বিয়ে হ'লে ভাবনা বাড়ারই কথা তো! অবশ্য ঠিক কি হয়, তা মনে পড়ছে না।

স্ত্রী বলিলেন, আচ্ছা তো! না মনে পড়লে আমার ভাবনার কথা যে! তা অত বেশি আর তোমায় এগুতে হবে না, আমি কিছু মনে করিয়ে দিচ্ছি, বারো সের ওজনে বেড়ে গিয়েছিলে, আমায় নিয়ে আসবার সময় ইস্টিশানে তৌল হয়ে এসে আমায় জানালে।—মনে পড়ছে?

শ্যামাপদ বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর তুমি বললে, থাক্, ইস্টিশানের লোকদের ওজন বেড়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে কাজ নেই। আমায় তখন পাটের গাঁটরি কি চালের বোরা ভেবেছিলে, কে জানে!

হৈমবতী হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, ভুল হয়েছিল, চালের বোরার মধ্যে তবুও একটা বস্তু থাকে। তারপরে নৈহাটি ইস্টিশানে দিলদরিয়া হয়ে সেই বুড়ী ভিকিরীটাকে গলার মাফলারটা খুলে দিয়ে দিলে। জিজ্ঞাসা করতে বললে—

শ্যামাপদ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে—

ফুর্তির চোটে চলন্ত গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে পা মুচকে—

শ্যামাপদ লজ্জিত হইয়া আর অগ্রসর হইতে দিলেন না। অভয়পদর বিবাহ দেওয়াই সিদ্ধান্ত হইল।



অভয়পদ যেদিন বধূ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল, সেইদিন বিকালে শ্যামাপদ টেরিটি-বাজার হইতে একজোড়া হাড়গিলা কিনিয়া আনিয়া নিজের ল্যাবরেটরিসাৎ করিলেন।
হৈমবতী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলেন, এ আবার কি শখ! কি হবে এ দুটো? ছেড়া-ফাড়া করবে তারও তো মাংস দেখছি না এদের গায়ে!
শ্যামাপদ একটু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, চখাচখীই কেনবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তা পাওয়া গেল না, তাই প্রায় একই জাত ব'লে এই দুটো—
হৈমবতী আরও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, চখাচখীই বা কি হ'ত?
ওই কি যে বলে, ওদের দাম্পত্য-জীবনটা আদর্শ কিনা, এ কথা আমি একাই বলছি না গো, তোমাদের কালিদাসও স্বীকার ক'রে গেছেন, চক্রবাক-চক্রবাকী।
করুন। তারপর?
তাই মনে করলাম, অভয়টার বিয়ে হ'ল, এখন কি ভাবে চললে ওদের দাম্পত্য-জীবনটা আদর্শ হয়ে ওঠে, একে অন্যের জীবনটাকে ভালভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে, সে সম্বন্ধে একটু গবেষণা করা দরকার, তাই—
হৈমবতী গালে তর্জনী স্পর্শ করিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, তাই বাজার থেকে এক জোড়া হাড়গিলে কিনে নিয়ে এলে! অবাক করলে তুমি! অমন সোনার চাঁদ ভাই-ভাদ্দরবউ ওই ল্যাংপ্যাঙে হাড়গিলের সামিল হ'ল! ষাট ষাট। ম্যাগো, একটা আস্ত ব্যাং গিলে ফেললে! দূর হ।
শ্যামাপদ বিপর্যস্ত হইয়া বলিলেন, কি অবুঝ দেখ তো! আরে, ওদের সামিল হবে কেন? কথা হচ্ছে, মনটা উভয় ক্ষেত্রে একই ভাবে কাজ করে, পালক রোঁয়া এসবের মধ্যেই হোক, আর শেমিজ-কামিজের মধ্যেই হোক। যেমন ধর, বুধী গরুটাকে দুইবার সময় সে তার বাছুরটার জন্যে খানিকটা দুধ চুরি ক'রে রাখে, সেটা যে কারণে হয়, ঠিক সেই কারণেই তুমিও খাবার পর খুকীর জন্যে তোমার ভাগ থেকে খানিকটা—
হৈমবতী ধমক দিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, থাম বাপু। শখ থাকে তোমার ভাইকে হাড়-গিলে কর গিয়ে, আমায় বুধীর সঙ্গে তুলনা দিতে হবে না।
বিবাহের পর প্রত্যাশিত ভাবান্তরটুকু বেশ পাওয়া গেল। অভয়পদর মনের প্রফুল্লতা

সুদে আসলে ফিরিয়া আসিয়াছে, ওজনও বাড়িয়াছে ভাল রকমই ; কিন্তু পাঠ্য-জীবনের উপর প্রতিক্রিয়াটা কেমন যেন সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হইতেছে, এবং সত্য-বাদী ভাই যে সেটা গোপন করিবার জন্য ধীরে ধীরে উৎকট মিথ্যাবাদী হইয়া উঠিতেছে, মাঝে মাঝে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। হাড়গিলাকে এঞ্জিনীয়ারিং পড়িতে হয় না বলিয়া তাহার নিকট হইতে এ বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

অবস্থা ক্রমেই সঙ্গিন হইয়া উঠিতে লাগিল। এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে হাতুড়িপেটার কল্যাণে অভয়পদর এতদিন মাথাব্যথা কিংবা পেট-কামড়ানির কোন বালাই ছিল না, এখন ক্রমে ক্রমে এই রোগ দুইটির আবির্ভাব হইতে লাগিল। শ্যামাপদ রোগের জন্য মোটেই চিন্তিত হইলেন না ; দুশ্চিন্তার কারণ এই যে, কোন রকম ঔষধপত্র সেবন না করিয়া শুধু নববধূর সেবার অর্থাৎ উপস্থিতির গুণেই আরোগ্যলাভ হইয়া যায়। ওদিকে তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষার সময় হইয়া আসিতেছে, এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে এ একটা সংকট। শ্যামাপদ মহা ফাঁপরে পড়িলেন, এবং অবশেষে একদিন নেহাত অনন্যোপায় হইয়া কনিষ্ঠকে নিজের ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও কথাটা কি ভাবে পাড়িবেন, সে বিষয়ে মনে মনে একটা খসড়া তৈয়ারি করিতে লাগিলেন।

অভয়পদ প্রবেশ করিলে শ্যামাপদ বলিলেন, তেমন কিছু কথা নয়, ওদিকে কয়েকটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম ব'লে তোমার পড়াশুনোর কথাটা অনেকদিন একেবারেই ভাবতে পারি নি। হ্যাঁ, কেমন প্রিপ্যারশন হচ্ছে ?

অভয়পদ হাতের আংটিটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ধীরে ধীরে বলিল, ভালই।

থার্ড ইয়ারের পরীক্ষাটা আবার এসে পড়েছে কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

অভয়পদ চুপ করিয়া রহিল।

এই পরীক্ষাটা বড় শক্ত কিনা, এটা পেরিয়ে গেলেই আবার দু'বচ্ছর নিশ্চিন্দি।

অভয়পদ চুপ করিয়া রহিল। দাদাও একটু চুপ করিয়া রহিলেন,তাহার পর বলিলেন, ইয়ে, কথা হচ্ছে, কোন রকম ডিস্টারবেন্স হচ্ছে না তো ?

অভয়পদ বলিল, আজ্ঞে না, ঘরটা বেশ নিরিবিলি থাকে।

শ্যামাপদ মনে মনে বলিলেন, সেই তো সর্বনাশের মূল। একটু মৌন থাকিয়া কহিলেন, হ্যাঁ, ওইটিই এখন দরকার। মানে হচ্ছে, যদি এ সত্ত্বেও মনে কর যে, এক-আধজনকে বাইরে সরিয়ে দিয়ে বাড়িটা আরও হালকা, আরও নিরিবিলি করা দরকার তো সে ব্যবস্থাও না হয় করা যায়।

কথাটা জলের মত সহজ ; কিন্তু অভিলষিত ফল পাওয়া গেল না। অভয়পদ স্রেফ বুঝিতেই পারিল না কিংবা পারিয়াও বুঝিল না, বলা শক্ত। যেন খুব গভীরভাবে চিন্তা করিয়া উত্তর করিল, আজ্ঞে না, পিসীমা পড়ার ঘরে এসে একটু গজর গজর করতেন, তা তিনি তো চ'লেই গেছেন কাশী।

শ্যামাপদ উত্ত্যক্ত হইয়া মনে মনে বলিলেন, বাঁচিয়েছেন তোমাদের দুজনকে। প্রকাশ্যত এ প্রসঙ্গটা আর চালাইতে পারিলেন না। ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, তা যেন হ'ল,

কিন্তু তোমার শরীরটার দিকে একটু লক্ষ্য রেখো। তোমার বউদি ব লছিলেন আজ-কাল নাকি প্রায় মাথাব্যথা করছে? ওটা ঠিক নয় তো।

অভয়পদ এ আক্রমণে একটু থতমত খাইয়া গেল, কিন্তু সরলঅন্তঃকরণ দাদা নিশ্চয় দাম্পত্য-শাস্ত্রের প্যাঁচোয়া কথা অতশত বুঝেন না—এই সিদ্ধান্ত করিয়া সহজভাবেই বলিল, হ্যাঁ, ওদিকে পড়াশুনোর একটু চাপ পড়েছিল, তাই দু-এক দিন রাত জেগে—

শ্যামাপদ অসন্তোষের ভাব দেখাইয়া কহিলেন, ওইটি তোমাদের বড় অন্যায়। রাত জেগে পড়াশোনা করাটা—। তারপর দৃষ্টি নত করিয়া কহিলেন, তোমার গিয়ে, যে কোন কারণেই হোক, রাত জাগাটা স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই ক্ষতিকর। আচ্ছা, যাও তা হ'লে। এই সব জিজ্ঞাসা করবার জন্যেই ডেকেছিলাম। না, রাত-টাত জাগার আর ধার দিয়েও যেও না।



ভাইকে সোজাভাবে বাগ মানানো গেল না। দাদা কোন বক্ররীতি অবলম্বন করিলেন কিনা বলা যায় না, তবে হঠাৎ একদিন দেখা গেল, হাড়গিলা দুইটা পৃথক পৃথক পিঁজরায় বন্দী হইয়া অত্যন্ত চেঁচামেচি লাগাইয়াছে, এবং আশ্চর্য যোগাযোগ—ইহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অভয়পদর খুড়শ্বশুর আসিয়া বলিলেন, তাঁহার দাদার শরীর খারাপ, দিন কতকের জন্য কন্যাকে দেখিতে চান।

হৈমবতীর আপত্তি সত্ত্বেও শ্যামাপদ ভ্রাতৃবধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

দিন পনরো সতর্ক পর্যবেক্ষণের দ্বারা জানা গেল, এই বিচ্ছেদের ফলে শুধু গভর্মেণ্টের ডাকবিভাগ দুই হাতে পয়সা লুটিতেছে মাত্র। রোজ একখানি করিয়া ব্যাটরা পোস্ট-আপিসের ছাপ মারা স্ফীতোদর লেফাফা শ্রীমান অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়ের নামে হাজির হয়, একখানি টিকিটে প্রায়ই তাহার ভাড়া কুলায় না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, সেসব পত্রের আধা-আধি ওজনেরও জবাব প্রত্যহ ব্যাটরা অভিমুখে যাত্রা করে, তাহা হইলে পাটীগণিতের সোজা হিসাবে অতি সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, ভাইয়ের কলেজ বা পরীক্ষা—এসব দিকে মন দিবার আর একটুও অবসর থাকে না। আর একটি উপসর্গ জুটিয়াছে, এতদিন অভয়পদর মাথাব্যথা পেট কামড়ানি ছিল, এখন—কি বিধানে বলা যায় না—সে উপদ্রব বধূর শরীরে গিয়া জুটিয়াছে। তিন

দিন তো এমন অবস্থা গিয়াছে, কলেজে গাড়ি পাঠাইয়া অভপয়দকে বধূর শয্যাপার্শ্বে হাজির করিতে হইয়াছে। সুখের বিষয়, উগ্রতাটা বেশিক্ষণ থাকে না, তবে দাদার তরফ হইতে চিন্তার বিষয় এই যে, স্বয়ং ভাইকে এ অবস্থায় সমস্ত দিনরাত ব্যাটরায় থাকিয়া যাইতে হয়।

এর উপর যেদিন সকালে দেখা গেল যে হাড়গিলা-দম্পতি পিঁজরার বাহিরে গলা বাড়াইয়া অর্ধমৃত অবস্থায় নীরবে পড়িয়া আছে, সেদিন শ্যামাপদ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বৈকালেই গিয়া ভ্রাতৃবধূকে গৃহে লইয়া আসিলেন, এবং পুকুরঘাটে নির্জনে বসিয়া ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দারুণ সমস্যা, কাছে থাকিলেও বিপদ ; দূরে থাকিলে বিপদের উপর বিপদ। ওদিকে পরীক্ষার মাত্র আর তিন সপ্তাহ বাকি। অন্তত বধূটি যদি একটু বুঝিত, তবু একটা সুরাহা হইতে পারিত। বুদ্ধি আছে, তবে সঙ্গদোষে সেটা এখন ষোলো আনাই অকাজে লাগিতেছে। মুশকিল এই যে কিছু বলিতে যাওয়াও সম্বন্ধবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তবুও কনিষ্ঠের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এবং সে ভবিষ্যতের সহিত ভ্রাতৃবধূর ভবিষ্যৎ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলিয়া, শ্যামাপদ আর অত অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিলেন না। দিন দুই পরে একবার ভ্রাতৃবধূকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদের নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হইল।

আজকাল কেমন আছ মা ?

ভাল আছি।

শ্যামাপদ মনে মনে বলিলেন, তা জানি।

হ্যাঁ, ব্যাটরাতে বড় সংসারে ছেলেপিলের গোলমাল বেশি, তাই আমি ভাবলাম, শরীরটা যখন এত উপরি উপরি খারাপ হচ্ছে, একটু নিরিবিলিতে থাকাই ভাল। এখানে কোন রকম গোলমাল হচ্ছে না তো ?

না।

হ'লেও তুমি এড়িয়ে চলবে, অভয়টার মতন তো আর নও। দেখ না, সামনে একজামিন, একটু চাড় নেই ; খেলা, কুকুর, এ ও তা—এই সব নিয়েই ব্যস্ত।

বধূ একটু মাথা নিচু করিল, বোধ হয় অনিশ্চিত এ-ও-তার মধ্যে নির্দিষ্ট কাহাকেও স্পষ্ট দেখিতে পাইল।

শ্যামাপদ বলিলেন, একজামিনের আর মোটে তিন সপ্তাহ কিনা। একটু থামিয়া বলিলেন, আর তিন সপ্তাহই বা কোথায় ? এদিকে এই এগারোটা দিন, ওদিকে সাতটা দিন, এই আঠারোটি দিন কুল্লে আছে। তার মধ্যে আগে-শেষে দুটো দিন তো বাদই দিতে হয়, নয় কি ?

হুঁ।

আর কিছু নয়, এটা ওর থার্ড ইয়ার কিনা, তাই একটু সাবধান হওয়া। তা তুমি আমি সাবধান হ'লে কি হবে মা ! ওটার কি আর নিজের চাড় আছে ? দেখতে পাও কি ?

বধূ মুখ নিচু করিয়া ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়িল, না, কোন চাড় দেখিতে পায় না। বিষয়টির গুরুত্ব ভাল করিয়া মাথায় অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া শ্যামাপদ বলিলেন, তাহ'লে যাও মা তুমি, শরীরটা কেমন আছে তাই জিজ্ঞেস করতে ডেকেছিলাম। অনুকূল ডাক্তার বললে, এখন স্রেফ বিশ্রাম আর ঘুম, ঘুমটা একটা মস্তবড় দরকারী জিনিস কিনা। যাও মা।

তিন-চার দিনের পর শ্যামাপদ খবর লইয়া দেখিলেন, ঘুমটা যে অত দরকারী জিনিস, তাহা তাঁহারও জানা ছিল না। ভ্রাতৃবধূ সমস্ত দিনটাই ঢুলিয়া ঢুলিয়া, অথবা সুযোগ পাইলে গভীর নিদ্রায়ই কাটাইতেছে। এদিকে বধূ আসার পর হইতেই অভয়পদ মারাত্মক রকম নিরিবিলি ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সকালে সন্ধ্যায় সমস্ত দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া অমন একমনে পাঠাভ্যাস যে তাহার কোষ্ঠীতে লেখা ছিল, এ কথা পূর্বে কেহ জানিত না। এ রকম নিষ্ঠা, শান্তি, নীরবতা দেখা যায় এক শুধু যোগাভ্যাস অথবা নিদ্রায়।

শ্যামাপদ স্ত্রী হৈমবতীকে ডাকিয়া বলিলেন, হ্যাঁগা, এ তো বড় ফ্যাসাদেই পড়া গেল এদের নিয়ে, সমস্ত রাত দুটোতে জেগে কাটাবে, আর সমস্ত দিন ঘুমুবে!

হৈমবতী মৃদু তিরস্কার করিলেন, চুপ কর। তোমার কি ও রকম ক'রে বলা মানায়?

শ্যামাপদ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কি গেরো! মানায় না ব'লে চুপ ক'রে থাকতে হবে? বেশ, আমার না মানায় তো তুমিই না হয় বল না কেন?

ইস্, আমি হন্তারক হতে গেলাম ব'লে! তা ছাড়া, আমার লাগে ভাল।—বলিয়া, বোধ হয় একটু হাসিয়া ঘুরিয়া চলিয়া গেলেন।

ও!—বলিয়া শ্যামাপদ খানিকটা একভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাবটা এই—বুঝেছি, তুমিও এই চক্রান্তের মধ্যে।

এক নূতনতর বন্দোবস্ত করিয়া দেখা স্থির হইল। বাগানের মধ্যে বীক্ষণাগার হইতে খানিকটা দূরে, বাড়ি হইতে বিচ্ছিন্ন একটা ছোট ঘর ছিল, প্রয়োজনের অভাবে তাহাতে কাঠ-কুটা ভাঙা আসবাবপত্র রাখা হইত। সেই ঘরটি পরিষ্কার করাইয়া, কলি ফিরাইয়া অভয়পদর পড়িবার এবং শয়ন করিবার ঘর নির্দিষ্ট হইল।

শ্যামাপদ বলিলেন, আমি বুঝতে পারছিলাম, তোমার বাড়ির ভেতর সব বিষয়ে অসুবিধে হচ্ছে, অথচ তুমি মুখ ফুটে বলতেও পারছ না। এ বাগানের মধ্যে একটেরেয় দিব্যি হ'ল, না?

অভয়পদ মুখটা গোঁজ করিয়া বলিল, হুঁ।

এখানে তোমাকে দোর জানলা কিছু বন্ধ করতে হবে না; বরং পড়তে পড়তে ক্লান্তি করলে বাগানে খানিকটা এদিক-ওদিক বেড়িয়ে এলে। ফুল তুমি ভালও বাস, ওর চেয়ে মন প্রফুল্ল রাখবার মত কিই বা আছে।

অভয়পদ মুখটা আরও গোঁজ করিয়া, আরও অনুনাসিক সুরে বলিল, হুঁ।

ভাই যেমন সর্বদা বইয়ে মুখে এক হইয়া বসিয়া থাকে, তাহাতে মনে হয় ব্যবস্থাটা

খুব লাগসই হইয়াছে। হইবার কথাই কিনা, নীরব নিথর জায়গাটি যেন কম্বমুনির আশ্রম। দাদা নিশ্চিন্ত হইয়া অনেকদিন পরে বীক্ষণাগারে একটু ভাল করিয়া মন দিতে পারিয়াছেন। হাড়গিলা দুইটারও অনুরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পরীক্ষায় পরীক্ষায় পরিশ্রান্ত হওয়ার দরুনই হউক, কিংবা অদর্শনের হেতু বিস্মৃতির জন্যই হউক, তাহারা আর ততটা গোলযোগ করে না। দিব্য খায়-দায়, যদি নেহাতই তেমন হইল তো দ্বন্দ্ব তারের জালের উপর চঞ্চুর দ্বারা গোটাকতক ঠোক্কর মারে। এসব যথা-রীতি নোটবইয়ে লিপিবদ্ধ হইতেছে। শ্যামাপদ "Love That Defied Science" অর্থাৎ "যে প্রেম বিজ্ঞানকে মানে না" নাম দিয়া মনস্তত্ত্বমূলক একটি নিবন্ধ লিখিতেছেন, কোন বিলাতী কাগজে দিবেন। নূতন প্রেম বৈজ্ঞানিকের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হইল, তাহারই গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস। বিজ্ঞানজগৎকে চমৎকৃত করিয়া দিবে বলিয়া আশা করেন।



পড়িবার ঘর হইতে বাড়িটা দেখা যায়, কিন্তু বাড়ির কাহাকেও দেখা যায় না। সেই-জন্য কেবলই মনে হয়, দুইটি টানা-টানা ব্যাকুল চোখ এই দিকে অনিমেষ চাহিয়া আছে, বই হইতে মুখ তুলিলেই যেন ক্ষণিকের জন্য চোখোচোখি হইবে।

ওদিকে টানা চোখ দুটিও যেন সর্বদা সজল, তাহারা যেন দেখিতে পায়, পাষাণের মত কঠিন বইয়ের পাতার উপর কোথাও একজন মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহাকে উঠায়, একটু 'আহা' বলে, ত্রিসংসারে এমন কেহই নাই।

কল্পনাদেবী এইটুকু মধ্যস্থতা করেন।

আর একটু মধ্যস্থতা করে জিমি। তেতলার ঘরে বসিয়া অণিমা নিচের বিচিত্রতার শূন্যতা দেখিতেছে কিংবা আকাশের মহাশূন্যতায় কত বিচিত্রতার ছবি আঁকিতেছে, সিঁড়ি ভাঙিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিমি আসিয়া উপস্থিত হইল। অণিমা তাড়াতাড়ি সোফা কিংবা চেয়ার হইতে নামিয়া তাহার ঝিকঝিকে কোঁকড়া লোমে ভরা গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া আকুলভাবে প্রশ্ন করে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ পোড়ারমুখী?

জিমি উত্তর দিতে পারে না বলিয়াই তাহার বক্তব্য সম্বন্ধে অণিমার কোন দ্বিধা-সন্দেহ থাকে না; বলে, বুঝেছি তুই কার কাছে ছিলি, তোর চাইবার ভঙ্গীতেই বুঝেছি। কি করছে রে? খুব পড়ছে, না? তুমি বলবে একজামিন, তুমি বলবে ঘুমটা দরকার; ছাই একজামিন, ছাই ঘুম, ওসব কিছু দরকার নেই; তুই যা, বেরো।

একটু ধাক্কা দিয়া আবার কোমরটা সঙ্গে সঙ্গে জড়াইয়া ধরে, বলে, কি দেখলি না ? খুব বুঝি পড়ছে ?

জিমি প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে এই সোহাগটুকু পাইয়া প্রবলবেগে ল্যাজ আর মাথাটা নাড়িতে থাকে। অণিমা উল্লসিত হইয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরে, বলে, পড়ছে না, না ? সে আমি জানি, আমায় ছেড়ে থাকলে ওর নাকি আবার পড়া হয় ! যখন ফেল ক'রে বসবে, তখন বড়ঠাকুরের হুঁশ হবে।

জিমির সামনের পা দুইটা তুলিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করে, কি বলিস ?

জিমি জিব বাহির করিয়া প্রবলবেগে মাথা দুলায়। অণিমা তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলে, না, তখনও হবে না ? আচ্ছা যা, তোকে আর দৈবজ্ঞগিরি ফলাতে হবে না, কালামুখী কোথাকার !

অভয়পদর ঘরে গাদা-করা বই খাতার সোঁদা গন্ধ হঠাৎ চাপা পড়িয়া নববধূর জামা-কাপড়ের পরিচিত এসেন্সের বাসি গন্ধে ঘরটা ভরিয়া উঠে ; সে মুখ ফিরাইয়া চাপা উল্লাসের সহিত বলে, জিমি বুঝি ? কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

কোথায় এতক্ষণ যে ছিল, তাহা জানে বলিয়াই আর উত্তরের প্রয়োজন হয় না। আয়। —বলিয়া তাহার গলাটা জড়াইয়া কাছে টানিয়া লয়। বধূর মত অত আবোল-তাবোল বকে না, মুখের পানে আবেগময় দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে কপালটিতে হাত বুলায়। ওর সমস্ত শরীরটাতে অণিমার স্পর্শ মাখানো আছে, অণু অণু করিয়া যেন সেটা মুছিয়া লইতে থাকে।

আবোল-তাবোল অত বেশি বকে না বটে, তবু এক-আধটা কথা বাহির হইয়াই পড়ে, প্রকৃতিস্থ লোকের মুখ দিয়া যাহা বাহির হইতেই পারে না। বলে, কথা কইতে তুই শিখবি নি জিমি ? দুটো কথাও যদি আমার অণিমার কাছে পেঁৗছে দিতে পারতিস !

একটু থামিয়া বলে, দেখ্ না, তোদের দেশে কুকুরেরা কত বড় বড় কাজ করছে ; কত খুনী আসামী ধরিয়ে দিচ্ছে, কত খবর পেঁৗছে দিচ্ছে, কত—

এই ধরনের প্রাত্যহিক কথাবার্তার মধ্যে অভয়পদ একদিন একটু বেশিক্ষণ থামিয়া কি একটা ভাবিল, তাহার পর বইয়ের গাদা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, টেবিলের উপর একটা শক্ত নীল সুতার বাণ্ডিল ছিল, তাহার খানিকটা ছিঁড়িয়া লইয়া, তাহার মাঝখানে একটা কাগজের টুকরা বাঁধিল, তাহার পর সুতাটা জিমির বুকের চারিদিকে বেড় দিয়া বাঁধিল, সুতাটি ও তৎসংলগ্ন কাগজটি তাহার সুদীর্ঘ কেশরাশির মধ্যে সন্তর্পণে ঢাকিয়া দিল।

দাদার ভাই প্রতি-গবেষণা লাগাইয়াছে।

কিন্তু হায়, সাফল্য-লক্ষ্মী নিতান্তই বিমুখ। পাঁজরার চারিদিকে হঠাৎ এ এক নূতন উপদ্রবে জিমি ঘোর আপত্তি লাগাইয়া দিল। উঠিয়া, পড়িয়া, গড়াইয়া এক মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া দিল, এবং শেষে ছিঁড়িবার চেষ্টায় সুতাটায় সামনের একটা পা

আটকাইয়া যাওয়ায়, তিন পায়ে সমস্ত ঘরটা ছুটাছুটি করিতে করিতে পরিত্রাহি চীৎকার শুরু করিয়া দিল।

দাদা বুঝি আসিয়া পড়ে! সমস্ত ঘরটায় একটা ছুরি কি কাঁচি নাই। অবশেষে নিরুপায় হইয়া অভয়পদ জিমিকে এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়া, সুতাটা সাধ্যমত একটু টানিয়া ধরিয়া, দাঁত দিয়াই ছেদন করিয়া দিল। মুক্তির আনন্দে এবং কতকটা বোধ হয় প্রভুর এই হঠাৎ ভাবপরিবর্তনে অনেকটা সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াও, জিমি আর কালবিলম্ব না করিয়া তীরবেগে বাহির হইয়া গেল।

নিরাশ হইয়া অভয়পদ একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল; অস্ফুটস্বরে নিজেকেই বলিল, একটু ট্রেনিং দিতে পারলে ঠিক চিঠিটা পেঁছে দিতে পারত, কেউ টেরও পেত না; কিন্তু যা হল্লা শুরু ক'রে দিলে! একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

কিন্তু হাজার হউক প্রেমিকের মন, তায় আবার বিরহশানিত, একটি বিফলতাতেই তাহার উদ্ভাবনী-শক্তি লোপ পায় না।

এদিকে একটু সুরাহাও হইল।

সমস্ত দিন তক্কে তক্কে থাকিয়া খবর পাওয়া গেল, খরগোশের জোড়া ভাঙিয়া একটি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, দাদা কাল সকালে টেরিটি বাজারে যাইবেন। অভয়পদ আন্দাজ করিল, অন্তত ঘণ্টাখানেক লাগিবে। বেচারী খরগোশ! তা ভাল হইয়াছে; দাদার হাত হইতে তো পরিত্রাণ পাইয়াছে।

শ্যামাপদর মোটরের আওয়াজ যখন মিলাইয়া গেল, অভয়পদ ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে পা বাড়াইল। দুয়ারের কাছেই ছোট ভাইপোর সঙ্গে দেখা হওয়ায় প্রশ্ন করিল, দাদা কোথায় রে ধলু? তাঁকে আজ সকাল থেকে দেখছি না যে?

ধলু প্রত্যাশিত উত্তরই দিল, জানি না তো।

তবে তোর মা জানে নিশ্চয়, তাকেই জিজ্ঞেস ক'রে আসি। কোথায় আছে বল দিকিন তোর মা?

বড় ঘরে।

ভ্রাতৃজায়ার সন্ধানে অভয়পদ ভিতরে প্রবেশ করিল, এবং যাহাতে তিনি সন্ধান না পান, সেই উদ্দেশ্যে বড় ঘরের দিকের রাস্তাটা বাদ দিয়া একেবারে অণিমার ঘরে প্রবেশ করিল। অণিমা ছিল।

কোয়ার্টার তিনেক পরে বিদায় লইয়া অলক্ষিতে বাহিরে আসিবে, হৈমবতীর একেবারে সামনা-সামনি পড়িয়া গেল। অভয়পদ বলিল, এই যে! দাদা কোথায় জিজ্ঞেস করব ব'লে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমায় সেই থেকে।

হাসির ভাব দেখিয়া থামিয়া গেল। এই সময় মোটরের পরিচিত হর্নের আওয়াজ হইল। ভ্রাতৃজায়া হাসিটাকে গাম্ভীর্যে প্রচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া প্রশ্ন করিল, ওঁকে খুঁজছিলে বললে; যদি জিজ্ঞেস করেন, কেন! কি বলব?

অভয়পদ ক্ষিপ্রগতিতে সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতেই ঘুরিয়া শাসন ও মিনতির

ভঙ্গীতে বলিল, না, খবরদার তোমার পায়ে পড়ি বউদি—যাও—
দাদা আসিয়া দেখিলেন, ভাই পড়িবার ঘরে। একবার ডাকিলেন, উত্তর না পাওয়ায় একাগ্রতায় আর বাধা না দিয়া পা টিপিয়া ল্যাবরেটরির পানে চলিয়া গেলেন।
তিন কোয়ার্টার ব্যাপী কনফারেন্সে কিছু একটা সাব্যস্ত হইয়াছিল নিশ্চয়। সেদিন কলেজ হইতে ফিরিবার সময় অভয়পদ বেশ একটি ডাগর দেখিয়া পিতলের ঘুঙুর কিনিয়া আনিয়া জিমির গলার ব্যাণ্ডে ঝুলাইয়া দিল; তরল ঝুমঝুম আওয়াজে জিমি সমস্ত বাড়িটা মুখরিত করিয়া তুলিল। শ্যামাপদ অভিনবত্বটুকু অনুমোদন করিলেন, কহিলেন, মন্দ করে নি অভয়, ওদের মিউজিক্যাল সেন্সটা যদি ফুটিয়ে তোলা হয় তো মানসিক কোন পরিবর্তন হয় কি না পরখ ক'রে দেখবার বিষয়। অ্যানিম্যাল সাইকলজিতে আমরা একটা নতুন তথ্য দান করতে পারি।
নোট-বুকে তারিখটি টুকিয়া লইলেন এবং সূক্ষ্মভাবে সঙ্গীতকণ্ঠী জিমির গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। নোট-বইটি মন্তব্যে মন্তব্যে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।



বেলা আন্দাজ নয়টা হইবে। ল্যাবরেটরিতে বিশেষ কোন কাজ নাই, তাহা ছাড়া ভাই এত সুবোধ হইয়া উঠিতেছে যে, তাহাকে চোখে চোখে রাখিবার জন্যও আর গবেষণার অছিলায় মিছামিছি বাগানে বসিয়া থাকিতে হয় না। শ্যামাপদ সাফল্যের জন্য বেশ একটি নিবিড় আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছেন, এবং আপাতত উপরের বড় ঘরটিতে নিরালায় তাঁহার "Love That Defied Science" প্রবন্ধটির উপসংহার লেখায় ব্যাপৃত আছেন।
সামনের বারান্দা দিয়া জিমি নিতান্ত ব্যস্তসমস্তভাবে নিচের দিক হইতে আসিয়া ওদিকে অণিমার ঘরের পানে চলিয়া গেল। তাহার ভাবেই মনে হইল, সে বিশেষ একটা কাজে লাগিয়া রহিয়াছে, এদিক-ওদিক চাহিবার ফুরসত নাই।
শ্যামাপদ কলমটা তুলিয়া লইয়া একটু অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, সঙ্গীতে এই একাগ্রতাটুকু আনিয়া দিয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সঙ্গীতে মানুষের মনে যে ঐকান্তিকতা জন্মায়, পশুর মনেও ঠিক সেই রকমই—
হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, ঘুঙুরের শব্দটা যেন ছিল না। তিনি কি রচনায় এতই লিপ্ত ছিলেন যে, শব্দটা তাঁহার কানে গেল না, না অভয়পদ ঘুঙুরটা খুলিয়া রাখিয়াছে?

কেন, খুলিতে গেল কেন? বোধ হয় তাহার পড়াশুনার ব্যাঘাত জন্মায়। ব্যাঘাত আর উহাতে কতটুকু হইবে? তবু, যখন খুলিয়া দিয়াছেই, তখন না হয় আপাতত থাক্, পরীক্ষাটা হইয়া গেলে আবার পরাইয়া দিলেই চলিবে। দেখ ব্যাপার। বৈজ্ঞানিক মেথড জিনিসটাই এই রকম। ওই অভয়পদর মন বই-কেতাব হইতে কি রকম উঠিয়া গিয়াছিল, আর আজ বই আর নিজের মাঝখানে একটা ঘুঙুরের মিহি আওয়াজও আসিতে দিতে সে রাজি নয়।

এই সময় কুকুরটাকে সেই রকম হন্তদন্ত হইয়া ওদিক হইতে নিচের দিকে চলিয়া যাইতে দেখা গেল। গলায় নজর পড়িতেই দেখিলেন, না, ঘুঙুর তো ঠিকই রহিয়াছে।

শিস দিয়া ডাকিতে জিমি বারান্দাতেই দুয়ারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং ব্যস্ততার মধ্যে প্রভুর মন রাখিবার জন্য সমস্ত শরীরটাকে দশ-বারো সেকেন্ড খুব একচোট নাড়া দিয়া সাঁ করিয়া নিচে নামিয়া গেল।

শ্যামাপদ বলিলেন, বাঃ রে! আর এত ব্যস্তই বা কেন?

ধলু উপরে আসিয়াছিল, ডাকিয়া বলিলেন, দেখ তো, কুকুরটার গলার ঘুঙুরের মটরটা বুঝি কি ক'রে আটকে গেছে, বাজছে না; ধ'রে ঠিক ক'রে দাও তো।

আবার লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। ধলু খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কই, তাকে তো বাড়িতে দেখতেই পেলাম না।

ঘুঙুর থাকলে এও একটা সুবিধে, সহজে স্পষ্ট করতে পারা যায়। তোমার কাকার পড়বার ঘর দেখেছ? বোধ হয়—

এমন সময় জিমি সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে আসিল। সেই ব্যস্তবাগীশ ভাব। শ্যামাপদ বলিলেন, ধর তো, আবার ডাকলে আসে না, আ মর! দেখ তো কি হয়েছে ঘুঙুরটাতে।

জিমি ধরা দিতে কিছু আপত্তি করিল, ঘুঙুর স্পর্শ করিতে দিতে আরও আপত্তি করিল। মটর আটকানো নয়, ঘুঙুরের মধ্যে কি একটা সেঁদিয়া গিয়াছে। এমনই বাহির করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। ধলু শেষে ঘুঙুরটাই ব্যান্ড হইতে বাহির করিয়া লইল।

ভিতরে আধময়লা একটা কি, ন্যাকড়া বলিয়া যেন বোধ হয়। বাহির করা মুশকিল। নিব দিয়া টানিয়া বাহির করা গেল না। ধলু বলিল, দাঁড়াও, কাকীমার কাছ থেকে মাথার কাঁটা নিয়ে আসি।—বলিয়া চলিয়া গেল।

শ্যামাপদ চেষ্টা করিতে করিতে একটা কোণ ধরিলেন, তাহার পর অতি সন্তর্পণে সমস্তটাই টানিয়া বাহির করিলেন, মিহি পার্চমেন্ট কাগজের ভাঁজ করা ছোট্ট একটি বান্ডিল। ভাবিলেন, ব্যাপারখানা কি!

আস্তে আস্তে ভাঁজ খুলিয়া দেখা গেল, একটা চিঠি—বেশ দীর্ঘ চিঠি। কাগজ দীর্ঘ নয় বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা মাল মসলায় আগা-পাস্তলা ঠাসা। শ্যামাপদ চশমাটা ভাল করিয়া নাকে বসাইয়া প্রথমেই 'প্রিয়তম—' পর্যন্ত পড়িয়াই অর্ধপথে

থামিয়া গিয়া ছি-ছি করিয়া সামলাইয়া লইলেন। তাহার পর ওটুকু বাদ দিয়া চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিলেন।—

মধুমাখা চিঠি পেলাম। আর যে পারি না—পারি না—পারি না। পড়ার বন্দী-শালায়, পুস্তক-প্রহরীর মধ্যে আমি বন্দী—ইন্সট্রুমেন্টগুলো যেন তাদের নির্মম অস্ত্র। প্রিয়ে, কি অপরাধে দাদা আমায় এ রকম ক'রে স্বাধিকারপ্রমত্ত করলেন? আমি তো বেশ ছিলাম, কই, আমি তো তাঁর কাছে তোমার্নিধি চাই নি; দাদাবিধি যদি দিলেনই তো এমন ক'রে বঞ্চিত করলেন কেন? কি যে আমার দোষ? বোধ হয় আমার ভাল করাই তাঁর উদ্দেশ্য, কিন্তু ওগো আমার অন্তরের অন্তর, প্রাণের প্রাণ, তোমায় এই শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রেই কি তিনি ভাল করার—

ধলু আসিয়া নালিশের সুরে বলিল, বাবা, কাকীমা কোনমতেই মাথার কাঁটা কি একটা সেফ্‌টিপিন দিলেন না। কি যে জিদে লোক!

শ্যামাপদ কাগজটা মুঠার মধ্যে মুড়িয়া লইয়া অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করিলেন, কেন দিলেন না? সঙ্গে সঙ্গে যেন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, তা হোক, তোমার মাকে শীগ্‌গির একবার ডেকে দাও দিকিন।

তাহার পর হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, আর দেখ, ওই কুকুরটাকে সে—ই ওদিককার রেলিঙে ভাল ক'রে ডবল চেন দিয়ে বেঁধে রেখে এস! যেন এদিক না মাড়াতে পারে। তাই তো বলি, এদিক চায় না ওদিক চায় না, দুদিন থেকে খালি ওপর আর নিচ, করে কি? পাজি মেঘদূত হয়েছেন, মেঘদূত! বার করছি তোমার মেঘদূত হওয়া আমি।



মধুলিড়

আমার নূতন প্রতিবেশী গৌরীকান্তবাবু নেহাত সাদামাটা চালের লোক। বিকালের দিকে নির্দিষ্ট নিমতলাটিতে রোজ আমাদের একবার করিয়া দেখা হয়, আমি সে সময় খেলিতে বাহির হই, আর তিনি ফেরেন আপিস হইতে। সেই রেলির বাঁশের বাঁটের ভারী ছাতা, উপরে আবার সাদা কাপড় বসানো, রেলির মোটা জিনের চীনে কোট, জিনের প্যান্ট, দুইটিতে স্থূল উদরের মাঝামাঝি হইতে গোল হইয়া বুকের আর পায়ের দিকে যে যাহার ঘুরিয়া গিয়াছে, পায়ে চীনাবাড়ির জুতা, ফিতা-টিতার হাঙ্গামা নাই।

মনটিও এই রকম নির্ঝঞ্ঝাট। দেখা হইলেই মুখে এবং সমস্ত শরীরটিতে হাসির তরঙ্গ তুলিয়া বলেন, এই যে, টেনিসে চলেছেন! বেশ বেশ, মন্দ নয়, তবে হ্যাপা অনেক, গোড়ালি-চাঁছা জুতো রে, ব্যাটা রে, তার রবাটের জামা রে, ওর চেয়ে একটা বউ পোষা ঢের সহজ। আরও জোরে হাসি উঠে।

তাহার পর প্রায়ই অফিসের কোন একটি গল্প উঠে, আড়ম্বরের সহিত আরম্ভ করিয়া মাঝপথে হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া বলেন, আমি ওসব সাতেও নেই পাঁচেও নেই রে দাদা, খাই-দাই গাজন গাই; বলি অ্যাকাউন্টের দপ্তর হাতে তুলে নিয়েছি, সেখানে যেদিন কোন গলদ দেখবে, ব'লো। যান, আপনার আবার দেরি হয়ে গেল। একদিন আসুন না গরিবের বাসায়, ইয়ে বাবু—কি যে দিব্যি নামটি, আবার ভুলে গেলাম। তাঁহার বিশ্লেষণের ভয়ে সংকুচিত হইয়া হয়তো নামটা মনে করাইয়া দিলাম, গোবর্ধন। ঠিক ঠিক, গোবর্ধনবাবু, গোবর-ধনবাবু; এত লোক আর এত নাম হয়ে পড়েছে যে, আর হিসেব রাখা যায় না। এই এতটুকু শহরটার কথাই ধরা যাক না, কটা ক'রেই বা নাম মিটুচ্ছে বছরে? অথচ কোন্ না শ খানেক ক'রে বাড়ছে ফি বছরে। দশ বছরের সেন্সস মিলিয়ে দেখুন না। সেদিন পিওন ব্যাটা দাঁত বের করে এসে হাজির, ছুটি চাই। কি রে, ব্যাপারখানা কি? ব্যাপার, পনরো দিন হ'ল তার একটি ছেলে হয়েছে, তারই নামকরণ। নিন, এই আর একটি বাড়ল।

অযথা একটা নামের বোঝা ঘাড়ে করিয়া পৃথিবীতে ভিড় জমাইয়া লোককে কি অসুবিধাতেই ফেলিয়াছি, জানিতে পারিয়া অপরাধীর মত মাথা নিচু করিয়া থাকি।

কোন দিন হয়তো বা কথাটা পারিবারিক প্রসঙ্গে আসিয়া ঠেকিল ; গৌরীকান্তবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, পুরুষে অত হাঙ্গামা ক'রে বিয়ে করে কেন মশাই ?
এক কথায় এতবড় সমস্যার কি সদুত্তর হইতে পারে ভাবিতেছি, গৌরীকান্তবাবু নিজেই বলিলেন, একটু জুতসই ক'রে আহার করতে পাবে, এই তো, না, আরও কিছু ?
স্বস্তির সহিত বলিলাম, কই, আর কোন উদ্দেশ্য তো চোখে পড়ে না।
ও'রা কিন্তু মনে করেন, স্বামীর শখের জ্যান্ত আসবাব ঘরে উঠলাম ; বিশেষ ক'রে যদি আবার লেখাপড়ার বালাই থাকে।



আমার মুখের দিকে একটু চাহিয়া রহিলেন ; সপক্ষে কি বিপক্ষে কোন রকম উত্তর না পাইয়া বলিলেন, তবে গোড়া থেকে আপনাকে বলতে হয়। এ পক্ষের ইনি আসবার অনেকদিন পর্যন্ত আশায় আশায় কেটে গেল ; কিন্তু রান্না খোলে না। তারপর টের পাওয়া গেল, কলেজ মাড়িয়ে এসেছেন। আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসলাম রে দাদা। ক্রমে সব একে একে দেখা দিতে লাগলেন—শরৎ চাটুজ্জে, ডি এল রায়, রবিবাবু, কস্মিন কালে যাঁদের সব নামও শুনি নি, একে একে সব ট্রাংক থেকে বেরুতে লাগলেন। তখন বুঝলাম ব্যাপারটা, রান্নার হাত দিন দিন এমন হচ্ছে কেন, কোথায় দিন দিন পাকবে, না—। তা শাজাহান তেল-মসলার খবর দেবে কেন ইয়েবাবু ? তখন থেকে তক্কে তক্কে রইলাম ; যিনি বেরুচ্ছেন তাঁকে আর ঢুকতে হচ্ছে না, বাড়ির ত্রিসীমানার বার ক'রে এসে ট্রাংক হালকা করতে লাগলাম। বেশিদিন আর লুকোনো রইল না কথাটা। দিন কতক রাগ, তম্বি, বাপের বাড়ি, অনেক রকম চলল, কুরুক্ষেত্র কাণ্ড আর কি ! কলকাতার মেয়ে, তায় নতুন রক্তের তেজ ; আমি কিন্তু কড়া ক'রে রাশ টেনে রাখলাম। ক্রমে রসটি ম'রে এসেছে ; বলতে নেই, হে'সেলেরও শ্রী ফিরেছে, আমিও নিশ্চিন্দি হয়ে হাত পা গুটিয়ে, আপনারা যাকে বলেন, পবিত্র দাম্পত্য-জীবন, তাই একটু ভোগ করব করব করছি, এমন সময়—। কি ? বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে, না ? আচ্ছা, থাক্, তা হ'লে ; একদিন বলব 'খন সব কথা, একখানি আস্ত মহাভারত রে দাদা, বলেন কেন !
সেদিন একটা কাজের হিড়িকে পড়িয়া প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল বলিয়া আর বাহির হইলাম না। বাড়ির সামনে খোলা উঠানটিতে একটা আরাম-কেদারা বিছাইয়া পড়িয়া রহিলাম।

পাশে একটি বাগান করিয়াছি। এতটুকু একফালি জায়গা, আমাদের তিনজনের শখে শখে একেবারে নিরবচ্ছিন্নভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, বাড়ির একটিমাত্র মেয়ে যেমন অনেকের স্নেহের নিদর্শনে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। আমার গোলাপ আছে, ম্যাগ্নোলিয়া আছে, বারো-মেসে ডালিয়া আছে, একটা কেয়ার ঝাড় আছে; ওর আছে মল্লিকা, যূথী, মালতী, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, আরও কত কি; আর এরই মধ্যে মার গাম্ভীর্য আর সৌম্যতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে মার শখের সজনেগাছ, বকফুলের গাছ, করঞ্জাগাছ, এবং কুমড়া, লাউ, ঝিঙা, উচ্ছে শত শত হস্তে ফলের ভার তুলিয়া ধরিয়া।
বোধ হয় একটু পরিচ্ছন্নতার অভাব আছে। তা থাক্; ওখানে কিন্তু আমরা—মাতা পুত্র, বধূ তিনজনে সংসারের বাহিরে, প্রচুর মুক্তির মাঝে আর একভাবে মিলিয়া গিয়াছি।
গরমের এই সময়টা সব ফুল ফোটে। একটু বাতাস ছিল, যেন ফুলের গন্ধের নেশা ধরিয়াছে—ভারী, অলস, আর একটু দিগ্‌ভ্রান্ত। সন্ধ্যা গাঢ় হইতে আকাশে চাঁদটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল; বোধ হয় পূর্ণিমা কি ওই গোছের একটা তিথি হইবে।
বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম পৃথিবীটার কথা। এ'কে বুঝিয়া উঠা গেল না; এই সৌন্দর্যও আছে, আবার ওই গৌরীকান্তও আছে। কলেজে-পড়া বিড়ম্বিত জীবটির কথা মনে পড়িল, তাহার পর বোধ হয় এই কথাটাই মনে হইল যে, আমরা নারীকে ঠিকমত পাইতে জানি না। অল্প-বিস্তরভাবে সব পুরুষই গৌরীকান্ত। সুযোগ আসে, অবসর আসে রচিত মাল্য হাতে লইয়া; আমরা বুঝিতেই পারি না—কখন আসিল, কখন ফিরিয়া গেল।
চাকরটাকে বলিলাম, আর একখানা ঈজি-চেয়ার নামিয়ে দিয়ে যা তো এখানে।
চেয়ার বসাইয়া দিলে প্রশ্ন করিলাম, তোর বহুমাঈজী কি করছে রে?
উত্তর করিল, ডেকে দোব নাকি?
সংসার-সংক্রান্ত কোন কাজ নাই কিনা—হাঁ বলিতে কেমন বাধিল একটু। সে ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে কিন্তু।
একটু পরেই সামনের দুয়ারটার পর্দা ঝনাৎ করিয়া এক পাশে সরিয়া গেল। নিজের চেয়ারটা সেই প্রতীক্ষমাণ চেয়ারটার কাছে একটু টানিয়া লইতেছি, এমন সময় পিছনে পুরুষকণ্ঠে শুনিলাম, এই যে ইয়ে-বাবু, কি যে দিব্যি নামটি, আবার ভুলে গেলাম!
সত্য গোপন করিয়া লাভ নাই, একটা যেন বিপর্যয় ঘটিয়া গেল,—কোথায় গেল আলো, কোথায় হাওয়া, কোথায় গন্ধ! একখানি রাগিণীর সমস্ত সুরটিকে বিকৃত করিয়া একটা বিসম্বাদীর পর্দা যেন ঝংকার করিয়া উঠিল। একবার করুণ নেত্রে সেই চেয়ারটার দিকে চাহিলাম, এক মুহূর্তের বিভ্রম মাত্র, তখনই আবার নিজেকে সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, এই যে, আসুন।
গৌরীকান্ত বসিতে বসিতে বলিলেন, আসতেই হ'ল। আপনিও বোধ হয় আমার জন্যেই হাঁ ক'রে ব'সে আছেন, চেয়ার পর্যন্ত মজুত দেখছি যে। ও হতেই হবে কিনা;

রোজকার দেখা-শোনায় একটু অভ্যেস হয়ে গেছে। সেই নিমতলাটিতে আজ আর দেখতে পেলাম না, মনটা বড় খারাপ হয়ে রইল। এ সময়টা আবার প্লেগ-টেগ আরম্ভ হয়ে থাকে; ভাবলাম, হয়তো প্রথম আমাদের বাঙালীকেই ধরলে এবার। ওখান থেকে বাইরে হাওয়ায় ব'সে থাকতে দেখে আপনাকে প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ল, না, যা ভেবেছি তবে তা নয়। তবুও মাঝে মাঝে বগলটা গলাটা টিপে দেখবেন মশাই, সাবধানের মার নেই।

কথাগুলো চরম গালাগালির এত কাছাকাছি যে, কি রকম একটা অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। নিরুপায়ভাবে বসিয়া রহিলাম; গৌরীকান্তবাবু বেশ সরলভাবেই বলিয়া চলিলেন, সাবধানের কথায় কাল সন্ধের কথা মনে প'ড়ে গেল। বেড়িয়ে এসে দেখি, খোলা ছাতে দিব্যি শেতলপাটিটিতে গিন্নী এক রকম গা আদুড় ক'রেই শুয়ে। ওপরে বেশ হাওয়া; আর চাঁদের একটা ঠাণ্ডা এফেক্ট আছে তা তো জানেনই, কাল আবার মশাই পূর্ণিমা ছিল বোধ হয়। জানে, এই সময়টা বাড়ি ফিরি আমি, তবু জেনে-শুনে এই বেয়াক্কেলেপনা। বেড়িয়ে এসে কোথায় একটু আয়েশ করব, না, দেখে তো গা জ্ব'লে গেল মশায়। একলা মানুষ—এই দোরসার সময়, দরকার কি চটাচটি ক'রে? বুঝিয়েই বললাম, ওগো এটি হচ্ছে বেহারে প্লেগের সময়। এবারটা এখনও ভাল আছে ব'লে অতটা এলে দিও না। বড় বিষম রোগ, একবার ধরলে ত্রিসীমানার মধ্যে কেউ ঘেঁষবে না। খদ্দর তো ভালবাস বাপু, তবু ওই পাতলা শেমিজটা প'রে কেন সময় বুঝে? চুল এলো করা মশায়!—গা ধুয়ে এসে শুয়েছে আর কি, চুলে জল লেগে গেছে,—দেখলাম কিনা, চাঁদের আলোয় জায়গায় জায়গায় ঝিকমিক করছে, তাই শুকনো হচ্ছে আর কি। খোঁচা দিতে ছাড়ব কেন ইয়েবাবু, বললাম, সূর্যের আলোতেই তো চুল শুকোয় জানি, চাঁদ বেচারা—। ঠিক এই পর্যন্ত বলেছি; সে রাগ দেখে কে! গটগট ক'রে নেমে গিয়ে রান্নাঘরে খিল দিলে, সেই গরম গুমট ঘর! কথাগুলো তো শুনলেন, রাগের কিছু পেয়েছেন? ফল, ভাত গেল গ'লে, ডাল গেল ধ'রে, তরকারি হ'ল নুনে বিষ। কি, না একটু বুঝিয়ে বলতে গিয়েছিলাম ব'লে। কিসের জন্যে তবে সংসার করা, বলুন না?

আমি বোধ হয় একটু বেশি রকম অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলাম, গৌরীকান্তবাবুর কথাতেই আবার চমক ভাঙিল; বলিতেছেন, আক্কেলখানা দেখে ভাবছেন তো? চুলোয় যাক; কপালের লেখন কে মেটাবে বলুন? আজ যে বেরোন নি?

একটা কথা কহিবার সুযোগ পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম, সন্ধের সময় বেরুতাম, কিন্তু চমৎকার জ্যোৎস্নাটির লোভ—

এতটা বলিয়া হুঁশ হইল, জ্যোৎস্নার তারিফ করিবার খুব লোক পাইয়াছি তো!

গৌরীকান্তবাবু ততক্ষণে কথাটা লুফিয়া লইয়াছেন, বলিতেছেন, হাঁ, দিব্যি জ্যোৎস্নাটা। এ কথা একশো বার স্বীকার করি। তা আপনার আমার আর কি বলুন? লাভ মিউনিসিপ্যালিটির।

সপ্রশ্ন নেত্রে মুখের দিকে চাহিতে আমার মূঢ়তার জন্য সদয়ভাবে বলিলেন, সে খোঁজ বুঝি রাখেন না ? রাস্তার ল্যাম্প-পোস্টগুলোর দিকে চেয়ে দেখুন দিকি—জেনুলেছে একটাও ? স্রেফ হিসেবের খেলা। ওই যে সকালে সিঁড়ি ঘাড়ে ক'রে পোস্টে পোস্টে তেল যুগিয়ে যুগিয়ে বেড়ায়, ওদের বুঝি সোজা ভাবেন ? কি তিথি-জ্ঞান মশায়! আজ এই মাসের এই তিথি,—এতটা তেল লাগবে। চাঁদ উঠেছে কি আলো নিবল, মুখ দেখা-দেখি নেই। ওই যে বললাম, চাঁদ ওঠে মিউনিসিপ্যালিটির বরাতে ; মারা পড়ে কবি, বিরহিণী আর চোর।

একটু গুমট ছিল খানিকক্ষণ, সেটাকে ছিন্ন করিয়া একটা দমকা হাওয়া বহিল। গৌরীকান্তবাবু হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া দ্রুত নিশ্বাস টানার সঙ্গে দুই-তিন বার নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন। অনেকটা যেন নিজের মনেই বলিলেন, ফুলের গন্ধ পাচ্ছি যেন, কাছে-পিঠে বাগান-টাগান আছে নাকি ?

ভয়ে একেবারে কাঁটা হইয়া রহিলাম, সাক্ষাত ফুলের বাগান রাখার লাঞ্ছনা মনে মনে আন্দাজ করিয়া আর কথা কহিতে সাহস হইল না।

এই সময় বাতাসের ঢেউয়ের গায়ে আর একটা ঢেউ ভাঙিয়া পড়িল, আরও বেশি গন্ধ লুটিয়া আনিয়াছে, আরও বিলাসোচ্ছল।

গৌরীকান্তবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া বলিলেন, এ যে রজনীগন্ধার গন্ধ ইয়ে-বাবু, কি যে দিব্যি নামটি, ভুলে গেলাম ; বাগানের শখ আছে নাকি আপনার ?



আমতা আমতা করিয়া বলিলাম, বাগান না ছাই ; ওই পাশে একটুকরো জমি প'ড়ে ছিল, ওরা সব কি দু-একটা ফুলের ডাল বুঝি করে—

নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব লইতে আর সাহস হইল না। গৌরীকান্তবাবু বলিলেন, দুটো একটা ফুলের ডালই বা এ কাটখোট্টার দেশে কে বসাবে বলুন তো ? আমি তো এসে পর্যন্ত হা-ফুল জো-ফুল ক'রে বেড়াচ্ছি। কই, আপনি তো কখনও বলেন নি আমায় ? ইঃ!

আমি তো নিজের চক্ষুকর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না ; এই কি সেই গৌরীকান্তবাবু নাকি ? বিস্ময়ের উগ্রতায় এমন একটা অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি,

মনে হইতেছে, এখনই বুঝি দেবমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বলেন, বৎস, এতদিন তোমায় ছলনা করিতেছিলাম মাত্র।

সেই মানবমূর্তিতেই বলিয়া যাইতেছিলেন, উঃ, কি আপসোস বলুন দেখি! আপনাদের বাড়িতে তা হ'লে দেখছি উল্টো। আপনার স্ত্রীরই শখ। আমার তো তিনি বাড়িতে ফুল দেখলে আগুন হয়ে ওঠেন। আর দুঃখের কথা বলবেন না।

আচ্ছা সমস্যা তো!

ভাবিলাম, হইতেও পারে; লোকচরিত্র বোঝা কঠিন। মনস্তত্ত্ববিৎ হইলে বোঝা যাইত, মস্তিষ্কের মধ্যে সৌন্দর্যজ্ঞানের কোন্ সূক্ষ্ম কোষগুলি এঁর বেশি প্রবুদ্ধ। হইতে পারে, ফুলের উপরেই নিজের প্রীতিধারা এমন নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন যে, অন্য কিছুর উপরই আর রসসিঞ্চন হয় না; বাকি সবই ফিকা ওঁর কাছে।

যাক ওসব বড় কথা। লোকটি তাহা হইলে যে একেবারেই নীরস, তাহা নয়। ইদানীং ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে ক্রমেই এত বিব্রত হইয়া পড়িতেছিলাম যে, মনে মনে একটা স্বস্তি অনুভব করিলাম। সাহস করিয়া, যদিও খুব সন্তর্পণের সহিত, বলিলাম, ওর নাম কি, আমিও বোধ হয় কখনও দু-একটা এ-গাছ সে-গাছ লাগিয়ে থাকব।

তা হ'লে উঠতেই হচ্ছে মশায়; ও যে আমার কি নেশা—কোন্ দিক দিয়ে রাস্তা বলুন দিকি?

দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন। আমি কৃতকৃতার্থ হইয়া গিয়াছি; এ অনাড়ম্বর, প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য-উপাসকের দর্শনেও পুণ্য। কিন্তু রাত্রিকাল—। বলিলাম, এখন না হয় থাক্ গৌরীকান্তবাবু, বাগানটা একটু জঙ্গুলে, তায় গোটাকতক কেয়া ফুটেছে, গরমের রাত্রি—

কেয়াফুল! না ইয়েবাবু, আমার ফুলের বাতিক দেখে আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন। এই মরুভূমির মাঝখানে কেয়াফুল! এ হতেই পারে না।

না, সত্যিই ফুটেছে। এক ঝাড় গাছ করেছি কিনা। এঃ, আপনি ফুলের এত ভক্ত জানলে মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দিতাম; কত ফুলই যে রোজ নষ্ট হয়!

ফুল আমার প্রাণ মশায়; না হ'লে দিন চলে না; ওই যে বললাম, ফুল এক মৌমাছিই চেনে, কি গৌরীকান্তই চেনে; এইটুকু গুমর আমার আছে, হ্যাঁ। কাব্যচঞ্চু মশায় নাম রেখেছিলেন মধুলিড়, মধু লেঢ়ি অর্থাৎ লেহন করে ইতি মধুলিট্ কিনা ভ্রমর—তাই তো—নাঃ, এখন মোটেই বাগানে যাওয়া সমীচীন নয়, কি বলেন? তাঁরা আবার আমাদের চেয়েও শৌখিন, ঘাঁটানো ঠিক নয়।

আস্তে আস্তে আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। এমন সমদরদী কখনও পাই নাই, মধুলিড়ই বটে, বাহিরটাতে কি আসিয়া যায় তাহার? একটা গুমর ছিল; কিন্তু ফুলের আদর তো দেখিতেছি আমরা কিছুই জানি না। এঁকে সামান্য একটুও তৃপ্ত করা যায় না? চাকরটাকে ডাক দিলাম। আসিলে বলিলাম, দেখ্ দিকিন, আজ ফল কিছু তুলেছে কি না, থাকে তো নিয়ে আয়।

প্রায়ই কিছু ফুল তোলা থাকে। একটা তোড়া আর কতকগুলো আলগা ফুল লইয়া আসিল—বেলা, গন্ধরাজ, একটা লবঙ্গলতার গুচ্ছ, হালকাভাবে জলের ছিটা দেওয়া। এত আগ্রহ কখনও দেখি নাই ; গৌরীকান্তবাবু এক রকম লাফাইয়াই উঠিয়া হাত দুইটা প্রসারিত করিয়া ধরিলেন, বলিলেন, ইস, স্বর্গ যে উজোড় ক'রে এনেছে! এসব আপনার নিজের বাগানে ফুটেছে ? কাল সকালেই আবার বিরক্ত করতে আসছি —যাই না মনে করুন।

গদগদ হইয়া বলিলাম, নিশ্চয়ই আসবেন। আমি নয় ডেকে নিয়ে আসব 'খন খুব ভোরবেলা ; সে সময় যা হয়ে থাকে !

ছোট শিশুর মত আনন্দ সমস্ত মানুষটিকে এত স্বচ্ছ করিয়া দিয়াছে—যেন অন্তস্তল পর্যন্ত দেখা যায়। শিশুর মতই হাসিয়া বলিলেন, আপনি আমায় ডাকবেন ? তবেই হয়েছে। দেখবেন, রাত থাকতে এসে হানা দিয়েছি ; যা নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন। আমার যাইবার আগে তিনিই আসিয়া হাজির অতি প্রত্যূষে ; প্রথম কথা—সমস্ত রাত ঘুম হয় নি মশায় ; চলুন, কোন্ দিকটা ?

বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধ প্রশংসায় গৌরিকান্ত দুয়ারটির কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যে দিকটায় চান, দৃষ্টি যেন আর ফিরাইতে পারেন না। মুখে কথা নাই, শুধু একটা আবেগমাখা হাসি।

ফুলের গন্ধও তাহাদের এই উষার অতিথিদের অভিনন্দিত করিবার জন্য যেন ভিড় করিয়া পড়িয়াছে।

পরিচয় দিতে লাগিলাম, এটা ডালিয়া ; ঠিক এখন ফোটবার সময় নয়। তবুও একটা-না-একটা ফুল থাকেই, এই ফুটন্তদের দলে প'ড়ে বেচারা যেন চক্ষুলজ্জায় প'ড়ে গেছে আর কি। এ রকম বেলা আপনি এ তল্লাটে পাবেন না। যোগাড় করতে যা বেগটা পেতে হয়েছে, লিখলে একটা ইতিহাস হয়ে যায় ; ওর চেয়ে রাজপুত্তরা তাদের কনে উঠিয়ে আনত ঢের সহজে। খোশামোদ করতে হয়েছে, ঘুষ খাওয়াতে হয়েছে, তাতেও যখন হ'ল না, তখন চোর বনতে হ'ল ; একটা ডাল কেটে এনেছিলাম।

গৌরীকান্ত বলিলেন, এ চুরিতে পাপ নেই। আমি তো ভেবেছিলাম সাদা গোলাপ। বেলার এত পাপড়ি ! আর রসে যেন ভেঙে পড়ছে পাপড়িগুলো !

এমন উৎসাহভরে কখনও ফুলের ব্যাখ্যান করি নাই। কোথায় এমন সমঝদারই বা এ রুক্ষ পৃথিবীতে !

গোলাপ ফুটিয়াছে—মার্শাল নীল। চাঁপার মত রঙে কোথাও একটু গোলাপী রেখা —কাঁচা সোনার যাহার রঙ, তাহারই রাঙা ঠোঁটের হাসির মত। তুলিতে হাত উঠে না ; কিন্তু পূজার আগ্রহটা প্রবল। একটা তুলিয়া হাতে দিলাম। বলিলাম, 'সটন্'স প্রাইড' নাম দিয়েছে। এর সগোত্র প্যারিস এক্‌জিবিশনে প্রথম প্রাইজ পায় ; দেখুন না, ফোটার মধ্যে বেশ একটি দেমাকের ভাব নেই ? আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি, এই দিকে আসুন।

পথে মার কুমড়ালতা অবহেলায় লঙ্ঘন করিয়া যাইতেছিলাম। গৌরীকান্তবাবু পিছনে আসিতেছিলেন; থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়েবাবু! কি যে দিব্যি নামটি, ভুলে গেলাম—

বলিলাম, গোবর্ধন।

হ্যাঁ, ঠিক; মশায়, এ কি কুমড়োর ফুল?

বলিলাম, হ্যাঁ, কাঁচরাপাড়া থেকে বিচি আনানো; মার একেবারে প্রাণ বললেই চলে; বোধ হয় আমি ছেলে হয়েও অত যত্ন পাই নি।

এ জিনিস আমার গোটাকতক চাই-ই চাই—এ যে বাগান আলো ক'রে রয়েছে একেবারে!

কাল সন্ধ্যার সময় যখন অমন জ্যোৎস্না-রাত্রিটার লাঞ্ছনার কথা শুনিতেছিলাম, মনে মনে ভাবিতেছিলাম, কি করিয়া এই শুষ্ক কাষ্ঠের মত অতি নীরস মানবটিকে সৌন্দর্য-রসে দীক্ষিত করা যায়!

এখন দেখিলাম, ইহার মধ্যেই রসের গূঢ় রহস্যটি ধরা পড়িয়াছে। এই তো দরদ, যাহা প্রভেদ বোঝে না, যাহা উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে সমস্তর উপরেই উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। নূতন চক্ষে কুমড়ার ফুল দেখিতে লাগিলাম। মৃণালের চেয়েও শীর্ণ, সুকুমার বৃন্তের উপর গোলাপী মেশা হলুদরঙের ফুলগুলি, তাহাদের একটি দলেই কি সুষমাই না ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিজেকে এমন পরিপূর্ণভাবে মেলিয়া কোন ফুলই বোধ হয় ফুটিতে পারে না। গোটাকতক তুলিলাম; আমার আঙুলগুলা যেন আবীরে ভরিয়া গেল।

গৌরীকান্তবাবু তাড়াতাড়ি অথচ খুব আলগা হাতে আমার নিকট হইতে ফুলগুলা তুলিয়া লইলেন, বলিলেন, দেখবেন, ওগুলো হ'ল পরাগ, খুব বাঁচিয়ে, ওই তো আসল। ওই যে রজনীগন্ধা! তাই তো বলি, এত ফুল না হ'লে কাল অত গন্ধ আসছিল কোথা থেকে! ওর কেরামতি রাত্তিরে; থাক্, রাত্তিরেই এসে নিয়ে যাব 'খন; ততক্ষণ যতটা রস টানে। চলুন, এইবার আপনার কেয়া দেখিগে, সংস্কৃতে হলেন কেতকী—

কেতকীরেণু খদির রসে দিয়া—
শুকায়ে নিও কমল কিশলয়ে;
অধর তাতে সুরভি ক'রে প্রিয়া,
আমারে দিও মরণ বিলাইয়ে।

একটুখানির মধ্যে কেয়া-খয়েরের ফর্মুলাটি কেমন দিয়ে দিয়েছে। খয়েরের রস ক'রে তাতে কেয়ার ধুলো দিয়ে কচি পদ্মপাতায় শুকিয়ে নেবে। আগেকার তারা সব ফুলপাতার সঙ্গে ঘর করত। সেদিন ওর একখানি বইয়ে দেখছিলাম না! শকুন্তলার জ্বর এল, তক্ষুনি চন্দন ঘ'ষে পদ্মপাতায় লেপে বসিয়ে দিলে; এখন হ'লে—ছোটা মোটর, ডাক্ সিবিল সার্জেনকে—

আমরা পুষ্পলোক বাস করিতেছি বলিলেও চলে। সমস্ত দিন কেবল ফুল, ফুল আর ফুল।

গৌরীকান্তবাবু সকালে আসেন, সন্ধ্যায় আসেন। সময়টা প্রায়ই বাগানে কাটিয়া যায়। ফুলের পরিচর্যা, ফুলের আলোচনা, আর পাত্র ভরিয়া ফুল সঞ্চয়, এই কাজ। বলেন, নন্দনকানন সম্বন্ধে যা শোনা যায়, তা কতকটা এই রকম হবে; কি বলেন ইয়েবাবু?

তাঁহার জন্য একটি সাজি কিনিয়াছি; সেইটিই পূর্ণ করিয়া ফুল দিই। সাজি ভরিয়া ফুল দিয়া মনে হয়, এ পূজা, তাঁহার অন্তরের মন্দিরে যে সৌন্দর্যের দেবতা আছেন, তাঁহাকে অর্ঘ্য দিতেছি।



দেবতার সংস্পর্শে আমার বাগানের শ্রীবৃদ্ধিও হইয়াছে। কোথায় এঞ্জিনীয়ারের বাগান, কোথায় কমিশনার সাহেবের গ্রীন-হাউস, এই সব দুষ্প্রবেশ্য স্থান হইতে কতকগুলি নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য আর দামী ফুল আমার বাগানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; বেশীর ভাগই গৌরীকান্তবাবুর চেষ্টায়। সে-সবের মধ্যে একটি আছে নীলপদ্ম। কাশ্মীর স্টেট-গার্ডেন্স হইতে আমদানি করা, ভুস্বর্গের পারিজাত। বাগানের মাঝখানে উহারই জন্য একটি হৌস হইবে স্থির হইয়াছে, মাঝখানে থাকিবে একটি ঝরনা।

বলি, এত কষ্ট ক'রে যোগাড় ক'রে সব আমায়ই দিয়ে দিচ্ছেন; কিছু তো আপনিও রাখলে পারেন।

বিমর্ষভাবে কপাল স্পর্শ করিয়া বলেন, সে অদৃষ্ট করি নি ইয়েবাবু, তা হ'লে আর ভাবনা কি! হাজির হ'তে দেরি হবে না, গিন্নী সঙ্গে সঙ্গে টান মেরে ফেলে দেবেন। কি যে আক্রোশ, দেখেন নি তো। সে পক্ষের সঙ্গে কিছুই মেলে না, মেলে শুধু এইখানটায়।

রহস্য এইখানেই শেষ নয়, আরও আছে। আজকাল আমাদের দুইটি বাড়ির স্ত্রীমহলেও ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, আমার স্ত্রী প্রায়ই যান। ফিরিয়া আসিয়া রোজই বলেন, আচ্ছা, এই যে ঠাকুরপুজোর ভাগ থেকে কেটে কেটে নিত্যি সাজি-ভরা ফুল পাঠাও, কই, বাড়িতে তো কোথাও একটা পাপড়িও দেখতে পাই না!

বলি—তুমি বোধ হয় খোঁজ কর না।

উত্তর হয়, ওমা, অবাক করলে যে! বলে গোয়েন্দাগিরি করতেই আজকাল আমার

যাওয়া। আর ফুল কি শুধু দেখতে হবে! যা ফুল যায়, তাতে সারা বাড়িটা গমগম করবে না! কি যে বল।

বলি—দু বেলা টাটকা ফুল যাচ্ছে, তাই বাসি হওয়া মাত্রই নিশ্চয় ফেলে দেন। তুমি যাও তো সেই তিনটে-চারটের সময়, তখন বোধ হয় তাই আর দেখতে পাও না।

তাহাও নয়; কেন না, আমার গোয়েন্দাটি দুই দিন পরে আসিয়া খবর দিলেন, আজ ওত পেতে ছিলাম, কর্তা আপিসে বেরিয়ে যেতেই হাজির হয়েছি, ঠিক এগারোটা দশ। ফুলের বিন্দুবিসর্গ নেই। সাতটা-আটটার সময় তোলা ফুল দশটা-এগারোটার সময় বাসি মনে করে, এমন পুষ্পবিলাসীও আছে নাকি?

বলিলাম, ওঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখলে তো পার।

সেও হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলেই কথা উল্টে নেয়, মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে পড়ে, তার ওপর খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করা চলে না। এমনিই তো বেশ আমুদে মানুষটি!

একটু হতবুদ্ধি হইয়া রহিলাম। তাহার পর একটা কথা মনে উদয় হইল, বলিলাম, হয়েছে গো, নিশ্চয় পুজো-টুজো করেন; কথাটা আমাদের কাছ থেকে গোপন—

স্ত্রী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, স্বামী পুজো-আর্চা করলে, নিষ্ঠাবান হ'লে, মেয়ের লজ্জিত হবার তো কথাই! বরং নাস্তিক, অনাচারী হ'লে—

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কথাটা পাল্টাইয়া লইতে যাইতেছিলাম, স্ত্রী বলিলেন, আমি যা ভেবে ঠিক করেছি, শুনবে?

আমি আগ্রহভরে বলিয়া উঠিলাম, বল না। মনে ঠিক আছে, যতই সম্ভবপর আন্দাজ হউক না কেন, একটা খুঁত বাহির করিয়া আক্রোশ মিটাইবই —টাটকা-টাটকি।

স্ত্রী বলিলেন, আমার মনে হচ্ছে, সাহেব-টাহেবের বাড়ি ভেট পাঠায়।

অসম্ভব নয়। আমি কিন্তু তাচ্ছিল্যের সহিত হাসিয়া বলিলাম, আরে দূৎ, রোজ রোজ—

তিনি সহজ দৃঢ়তার সহিত বলিয়া চলিলেন, না হ'লে সাহেবের কাছে অত খাতির আছে শোনা যায়, সে কি-ক'রে হয়? মাইনেও বেড়েছে এর মধ্যে বলছিলে। ফুল খোশামোদ করবার ফল নিশ্চয়।

যুক্তিটা সহজেই খণ্ডন করিবার নয়, সেইজন্যই বেশি অবহেলা দেখাইয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া তর্কটা চাপা দিলাম।

সন্ধ্যার সময় গৌরীকান্তবাবু আসিলে বলিলাম, মশায়, আপনি ফুলের কি ভাবে সদ্ব্যবহার করেন, সেই নিয়ে আমাদের স্ত্রী-পুরুষে কাল সমস্ত রাত গভীর গবেষণায় কেটেছে। আপনার ভাদ্দর-বউয়ের যত আজগুবি আন্দাজ, বলে—বাড়িতে ফুল দেখতে পাই না, নিশ্চয়ই একটু বাসি হ'লেই ফেলে দেন। বললাম, আরে ধ্যাৎ—এ'কেই বলে মেয়েলী বুদ্ধি। বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে আলাপ, তাদের সব ভেট-টেট দেন নিশ্চয়। বলে—হ্যাঁ, তোমার যা বুদ্ধি, অমন চমৎকার ফুলগুলো ওই মেলেচ্ছ-গুলোর পায়ে ঢালতে যাবেন! সাত্ত্বিক মানুষ, নিশ্চয় পুজোটুজো ক'রে বাসি হ'লে আবার ফেলে দেন।

গৌরীকান্তবাবু খুব মনোযোগসহকারে শুনিতেছিলেন, এইবার প্রবল বেগে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, দেখছিলাম, কার কতটা বুদ্ধির দৌড় ! সে ধরবার জো নেই তো গবেষণা ক'রে কি হবে ? তবুও উনি পুজোর দিকে গেছেন, অনেকটা কাছাকাছি ; তবে কার পুজো, ধরতে পারেন নি, হাঃ—হাঃ— । তবে, আর দেরি নয়, এইবার জানাব । তখন বুঝতে পারবেন, ফুলগুলো এতদিন কি ভাবেই না নষ্ট ক'রে এসেছেন । একটু দেরি করছিলাম, ওদিকে মল্লিকার গোড়েটা ঠিক তোয়ের হয় নি এতদিন । এদিকে বোধ হয় পদ্ম দুটোও ঠিক পুরন্ত হয়ে ফুটেছে, আর সেই কেয়াট—চলুন, দেখা যাক ।

বাগানের মাঝে দাঁড়াইয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, নাঃ, সব ঠিক আছে । তবে আজই হোক, বুঝলেন ইয়েবাবু ? কি যে দিব্যি নামটি—

বলিলাম, গোবর্ধন ।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক । আজ ফুলের বাহার দেখবার নেমন্তন্ন ; ওইখানেই পায়ের ধুলো দেবেন । ভাগ্যগুণে আজ খাসা একটি মিরগেল মাছও পাওয়া গেছে । আর ডিম নিশ্চয় খান—ছোট ? তবে হ্যাঁ, ঠাকুরটিকে চাই আপনার । গিন্নী বলেন, আমি আজ রান্নাঘরের ত্রিসীমানার মধ্যে ঢুকতে পারব না । কাজ কি ও জাতকে ঘাঁটিয়ে মশায় ? বললাম, বেশ, ও'র ঠাকুরকে ডেকে আনছি, দেখিয়ে শুনিয়ে দোব 'খন ; তুমিও তো আজ আমার কাছে থেকেই গুণী ; আর ও'র স্ত্রী বোন সব আসছেন, তোমার এদিক থাকলে চলবেই বা কেন ?

আহারে বসিয়াছি । গলদ্‌ঘর্ম গৌরীকান্তবাবু সামনে একটি টুলে বসিয়া পাখার হাওয়া খাইতেছেন ; এতক্ষণ রান্নাঘরে ছিলেন । নানা ফুলের একটা ক্ষীণ মিশ্র গন্ধ যেন মাঝে মাঝে নিশ্বাসে ধরা দেয় ; কিন্তু ফুল কোথাও দেখিলাম না । শুধু সামনে একটা ছোট ঝুড়িতে আর-সব আবর্জনার সঙ্গে সেই পদ্মের কতকগুলা পাপড়ি, আর কেয়াফুলের কচি পাতা । বোঝাই যায়, ছোট মেয়েটির কীর্তি । 'ফুলের বাহার' নিশ্চয় উপরে শোবার ঘরে, খাওয়া-দাওয়ার পর লইয়া যাইবেন ।

বলিলেন, ঠাকুর, এইবার নিয়ে এস চপ-টপগুলো । কি রকম হয়েছে কে জানে, একেবারে আনাড়ী লোক !

ঠাকুর একটি রেকাবিতে এক প্রস্থ তরকারি, ভাজা আনিয়া হাজির করিল । গৌরীকান্ত-বাবু প্রবল উৎসাহে নির্দেশ করিতে লাগিলেন, আগে ওইটে দাও ; বাতলান দিকি জিনিসটা কি ?

রজনীগন্ধার বাসের সঙ্গে ছোলার বেসনের সোঁদাটে গন্ধ । একেবারে জলের মত পাতলা ক'রে নিতে হবে বেসনটা—আগার দিকটা কেমন, মুচমুচে তো ? এইবার গোড়ার দিকটা একটু জিবের চাপ দিন ; বেশ একটু মিষ্টি নয় ? ওইটি হ'ল মধু,

ভাজার কারচুপিটা বুঝুন। এইবার ওইটি দাও বাবাজী। না বললেও নিশ্চয় ধ'রে নেবেন, গন্ধই যে ওকে ধরিয়ে দিচ্ছে ; কেয়াফুলের চপ—মাছটিকে সেদ্ধ ক'রে নিয়ে কাঁটা বেছে ফেলবেন, তারপর আস্তে আস্তে কেয়াফুলের ওপরকার কাঁচ পাতাগুলো তুলে ফেলে ফুলটা কুচিকুচি ক'রে ফেলবেন, মাইণ্ড ইউ—কেয়ার ধুলোগুলো সব মাছেই পড়া চাই ; তারপর—না না, ও তিনটেই খেতে হবে। গিন্নী করলেও একটা কথা ছিল ; দেখছেন তো, যেন ফুলের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ ক'রে উঠেছি, কম মেহনত ! আচ্ছা, অন্তত আর একটা। এইবার এইটে দেখুন তো। দাও ঠাকুর। আপনার সেই নীলপদ্মের ডালনা, আপনি সাধ ক'রে যার নাম রেখেছেন নীলা। কখনও এ ব্যাপার মাথায় ঢুকেছিল ? সব পদ্মরই হয়, তবে এমনটি হয় না। এ জিনিসটির জন্যে আমি মাড়োয়ারীদের কাছে ঋণী। দেখবেন, পদ্মের সিজনে দোকানে ঝুড়ি-ঝুড়ি পদ্ম কিনে রেখেছে, ভাবছেন বুঝি খদ্দের মারবার জন্যে রামচন্দ্রের মত অকালবোধন করছে সব, হাঃ—হাঃ—হাঃ। আমারও ফুলের দিকে ঝোঁক, একদিন ধরলাম, বলি শেঠজী—। ও কি ইয়েবাবু ! ফুল খাবেন ফুলের মত তাজা হয়ে, এ যেন ফাঁসিতে উঠতে যাচ্ছেন ! নিন, পেয়াদা ব'সে আছি, হাত গুটোলে ছাড়ছি না। হ্যাঁ, কি যে বলছিলাম, সেই শেঠজীই আমায় বাতলে দিলে। একটু কামড় দিয়ে বললে, বাবু, ফুল তোমরা ব্যাভার করতে জান না। লজ্জায় ঘাড় হেঁট হয়ে গেল মশায়। অথচ এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। প্রথমটা পাপড়ি-টাপড়ি বাজে হিস্যেগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিলেন, পাখিটির রোঁয়া তুলে ফেলবার মত আর কি—দেখবেন নরম প্যাডের মতন একটা জিনিস, ছিঁড়ে ফাটিয়ে ফেলুন—দেখবেন ভাতের মত দানা দানা, সবই ঘিয়ে ভেজে নিন—ওটা দিয়ে দাও ঠাকুর—খাবেন বই কি। তুমি ততক্ষণ ওদের কাছ থেকে বেলফুলের গোড়ের মোরব্বাটা নিয়ে এস। ওইটি বড় শক্ত জিনিস মশায়, একটু ভাজবার তারতম্য হ'ল, কি রসের বে-আন্দাজ হ'ল তো বাস্—বড্ড মোলায়েম জিনিস কিনা—এ তো আর আমলকিও নয়, কুমড়োও নয়—আপনার ঠাকুর তো এদিককার সব শিখেই ফেললে ; যাক, যদি চ'লেও যাই এখান থেকে তো মাঝে মাঝে নাম করতে হবে। এর পরে কলকেফুলের শুক্তানি, শিউলির ঘণ্ট, চন্দ্রমল্লিকার গুড়-অম্বল—শিখিয়ে দোব 'খন।

ঠাকুর খালি-হাতে আসিয়া বলিল, মাইজী বললেন, আমি ছুঁতে পারব না, নিজে এসে বের ক'রে নিয়ে যেতে বল।

ওইঃ, তবু আপনারা কাব্যি ক'রে বলবেন, নারী হ'ল পুষ্পের জাত, মেয়েমানুষেরই ফুলের দিকে টান বেশি। কি যে বিষদৃষ্টি ! সে গুমর করব আমি। সেই যে বলছিলাম না ? কাব্যচঞ্চু মশায় বলতেন, গৌরীকান্ত, তুমি মধুলিড়। বসুন, আমি নিজের হাতেই নিয়ে আসছি।



রংলাল

অনেক কাঠ-খড় পোড়াইয়া সুন্দর মিথিলায় একটি চাকরি জুটিল। মনিব একজন কুঠিয়াল সাহেব।

ভাবিলাম, না, এ ধুতি-চাদরের কর্ম নয়, হ্যাট-কোট সিগারেট-চুরুটে জায়গাটাতে প্রথম হইতে জাঁকিয়া বসিতে হইবে, ওদিকে এখনও এসবের কদর আছে শোনা যায়। স্ত্রী সুটকেসে একজোড়া ধুতি দিতেছিলেন, প্রবলভাবে নিবারণ করিয়া বলিলাম, না না, ওসব বাতিল ; আমার জীবন থেকে ও যুগই চ'লে গেছে ব'লে জেনো।

স্ত্রী বলিলেন, বুঝি না বাপু, কি মন্দ যুগটাই ছিল এমন ?

বলিলাম, আমি তাকে সত্য ত্রেতা যুগ ব'লে মেনে নিতেও রাজি আছি, পবিত্র খদ্দর, দায়িত্বহীন জীবন, অর্থমনর্থমের বালাই নেই ; কিন্তু আপাতত পায়জামা, স্লীপিং সুট আর হাফ-শার্ট দিতে যেন ভুলো না ; পাইপ দুটো দেওয়া হয়েছে তো ? গোল্ডসটা ?

টাইয়ে গেরো কষিয়া হ্যাটটা মাথায় চাপাইয়া লইলাম। চাকর আসিয়া খবর দিল, ট্যাক্সি হাজির।

গন্তব্য স্টেশনে ট্রেন পৌঁছিল পরের দিন প্রায় তিনটার সময়। গেটের কাছে বৃদ্ধ স্টেশন-মাস্টার, আগে একটি সেলাম করিয়া টিকিটের জন্য হাত পাতিলেন, তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়া বাহিরে আসিলাম।

এইখানে আমার সম্ভ্রমে প্রথম আঘাত লাগিল। চিঠিটা বোধ হয় সময়ে পেঁছায় নাই, কুঠির দিক হইতে কোন রকম যানবাহনের বন্দোবস্ত নাই। একটি মাত্র ভাড়াটে একা একটি বাদামগাছতলায় দাঁড়াইয়া আছে। চালক বোধ হয় আমায় দেখিয়াই, তাহার কঙ্কালসার ঘোড়াটাকে সাধ্যমত আমার হ্যাট-কোটের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য প্রবলবেগে ডলাই-মলাই শুরু করিয়া দিয়াছে। কঞ্চি আর ধনুকাকৃতি বাঁশের গাড়ি, স্প্রিঙের নামগন্ধ নাই, ফুট তিনেক উঁচু গজ দুয়েক লম্বা। মনটা দমিয়া গেলেও উপায়ান্তর না দেখিয়া সেইটাই ভাড়া করা গেল। 'একমান' শুকনা ঘাসের উপর

একটা ছিন্ন মলিন চট বিছাইয়া গদ্‌গদ হইয়া বলিল, বইঠল যাও, অর্থাৎ বসিতে আজ্ঞা হোক।

সন্দিগ্ধভাবে একবার প্রশ্ন করিলাম, কুঠি যেতে হবে ; পারবে তো ?

আধ ঘণ্টার বেশি লাগবে না। বুঝতেই পারবেন না, মোটরে ব'সে আছি, কি এক্কায়। —বলিয়া গদির নিচে আরও দুইটি ঘাস দিয়া উপর হইতে ঠুকিয়া-ঠাকিয়া দিল। ঘোড়ার পিঠে একটা চাপড় মারিয়া বলিল, চল্‌, নয়া বড়াবাবুর কাছে বকশিশ মিলবে।

একটু রুক্ষস্বরে কহিলাম, বড়াবাবু নেহি, ছোটা সাহেব কহো।

পাঁচটা নাগাদ এক্কা আসিয়া বাসার সামনে দাঁড়াইল ; দেখিলাম, এটি আমার সাহেবত্বের দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক। ছেঁচা বেড়ার ঘর, খড়ের ছাউনির উপর কুমড়াগাছে ভরিয়া গিয়াছে ; বেড়ায় ঝিঙে। সামনে একটা চাতালের উপর তুলসীগাছ, তাহার গোড়ায় একটা ভাঙা টবে মনসা। আমার পূর্বতন 'বড়াবাবু' মহিম রায় বাড়িটাকে এমন মারাত্মক রকম বাঙালী-মার্কা করিয়া গিয়াছেন যে, এখানে টুপি-প্যাণ্টালুনের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা একটা রীতিমত সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় বুঝি।

এক্কার চারিদিকে শীঘ্রই একটু ভীড় জমিয়া গেল—কুঠির দুই-একজন আমলা, দুই-তিনটা পিওন, গ্রামের ইতর-ভদ্র কয়েকজন লোক। আমি বেশ একটু অস্বস্তিতে পড়িয়া গেলাম। মনে হইল, যেন এই জীর্ণ এক্কাগাড়ি আর সামনের ঐ বাড়ি—এই দুইটাতে চক্রান্ত করিয়া আমার পোশাকসুদ্ধ আমাকে সকলের সামনে পরম দ্রষ্টব্যরূপে তুলিয়া ধরিয়াছে। সকলের লম্বা সেলাম আর নির্বাক সশ্রদ্ধ ভাবটাতে মনের সঙ্কোচটা একটু কাটাইয়া নামিতে যাইব, এমন সময় একটা বেশ বলিষ্ঠ গোছের দেশী কুকুর সবার পায়ের মধ্য হইতে সামান্য একটু আগাইয়া আসিয়া ঠিক আমার সামনেটিতে মুখ উঁচু করিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত শরীরটা রাঙা, ডান চোখের চারিদিকে একটা গোল সাদা দাগ, এক দিকের কানটা খাড়া, অন্য দিকেরটা ঝোলা ; দেখিতে হইয়াছে, যেন একটি মাত্র চশমা-পরা একটা অতি বখাটে ছোকরা তাহার টুপিটা লক্ষ্ণৌয়ী কায়দায় বাঁকা করিয়া পরিয়াছে। দাঁড়াইয়া, যে দিকের কানটা খাড়া, সেই দিকের ঘাড়টা অল্প একটু উঁচু করিয়া পরম অভিনিবেশের সহিত আমায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অন্য কুকুর হইলে বোধ হয় ডাকিয়া পাড়া মাথায় করিত, এ একেবারে সে দিক দিয়াও গেল না, শুধু একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল মাত্র।

হোক কুকুর, কিন্তু ভাবটা এতই মানুষের অনুরূপ যে, আমি সেলামে সমীহে যে সঙ্কোচটা কাটাইয়া উঠিতেছিলাম, তাহা হঠাৎ দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়া আমায় একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। মনে হইল, যেন হ্যাটকোটধারী কালা সাহেব আমি সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া শেষ পর্যন্ত এক মহা বিচক্ষণ সমালোচকের হাতে পড়িয়া গিয়াছি। আর সকলে সম্মান করুক, কিন্তু এই একটি জীব ততক্ষণ আমার অপরূপত্বটুকু সমস্ত অন্তর দিয়া উপভোগ করিয়া লইতেছে।

নামিতে গিয়া পায়ে প্যান্টালুন আটকাইয়া একটু পড়-পড় হইলাম। কয়েকজন ব্যস্ত-ভাবে আগাইয়া আসিল, কুকুরটা এক পা পিছাইয়া গিয়া মুখটা অন্য দিকে ফিরাইয়া লইয়া হুফ করিয়া একটা হ্রস্ব আওয়াজ করিল। স্পষ্ট যেন বলিল, হুঁ, এই তো সাহেব, তার আবার—! যদি কথা কহিয়া বলিত, এর চেয়ে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না।

একমানটাকে আনা পাঁচেক ভাড়া দিলেই যথেষ্ট হইত, একটা টাকা বাহির করিয়া দিলাম। কেন দিলাম যে স্পষ্ট বলিতে পারি না, তবে ওই বেয়াড়া কুকুরটার কাছে সাহেবী চালটা বজায় রাখা নিতান্ত দরকার, বোধ হয় আবছা আবছা এই রকম একটা কথা মনে হইয়াছিল।

একমান একেবারে তিন-চারটা সেলাম করিয়া অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইল। চারিদিকের মৃদু গুঞ্জনে বুঝিলাম, আর-সবার কাছেও সাহেবিয়ানাটা দ্রুত অনুমোদিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু কুকুরটা কোথায়—যাহার জন্য এত? দেখি, ভিড় হইতে সরিয়া কয়েক গজ দূরে একমানটা যেখানে একটা ইটের উপর টাকাটা বারংবার বাজাইয়া যাচাই করিতেছে, কুকুরটা পাশে জুটিয়া উঁচু কানের দিকে মাথাটা ঈষৎ তুলিয়া সেই রকম স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছে। মুখে হাসি। অন্য কুকুর হইলে বলা চলিত, জিভ বাহির করিয়া মাথা দুলাইয়া একটু একটু হাঁপাইতেছে, কিন্তু এর সম্বন্ধে আর আমার সন্দেহ রহিল না যে, ওটা কুটিল হাসি—অর্থ হইতেছে, কেমন হে, ঠিক আছে তো? বোকারামকে খুব ঠকানো গেল, হিঃ—হিঃ—

স্বীকার করি, আমার মনের ভুল ; কিন্তু তখন এর চেয়ে সরল সত্য সেখানে আর কিছু ছিল না।



বাসায় আসিয়া উঠিলাম। উঠানের মাঝখানে একটা চট-মোড়া তেলচিটে ডেক-চেয়ার, দেখিয়াই মনে হইল, মহিমবাবু ইহাতে আটহাতী কাপড় পরিয়া থেলো হুঁকায় তামাক টানিতেন। পাশে একটি চৌকি—রোদে বৃষ্টিতে মাঝখানটি বাঁকিয়া গিয়াছে, একটা পায়া নাই, সেখানে তিনখানা ইটের ঠেকনা দেওয়া। আমি বসিতে আগন্তুকদের কয়েকজন চৌকির উপর বসিল। ইহারা আমলা।

একটু পরিচয়াদি হইল। খুব বৃদ্ধ গোছের একজন অগ্রণী হইলেন, উনি পেশকার

সাহেব, ইনি হাজরিনবিস, ইনি তহশীলদার ; ইনি হচ্ছেন একাউণ্টবাবু (অ্যাকাউণ্টেণ্ট)।

হুজুরের কোন রকম কষ্ট হয় নি তো পথে ?

অপর একজন বৃদ্ধের পরিচয় দিলেন, আর ইনি দেওয়ানজী লালা রামকিষুণলাল ; সবচেয়ে প্রাচীন লোক এখানে।

দেওয়ানজী দন্তলেশহীন মুখে হাসিয়া সেলাম করিয়া বলিলেন, সব হুজুরকা মেহেরবানি।

তাঁহার প্রাচীনত্বে আমার কি মেহেরবানী থাকিতে পারে বুঝিতে না পারিলেও বলিলাম, বড় আনন্দের বিষয়।

একটু চুপচাপ রহিল। দেওয়ানজী গলা পরিষ্কার করিয়া কি একটা বলিবেন, এমন সময় একজন পিওন একটা মাঝবয়সী কালো তেলচুকচুকে লোককে সামনে হাজির করিল। দেওয়ানজী বলিলেন, হুজুরের 'টহলু' (চাকর), নাম লোটনা। নে, সাহেবের সব গোছগাছ ক'রে ফেল্ ; খবরদার, যেন কোন রকম কষ্ট না হয়, তা হ'লে—

চাকর পাইয়া মনটা একটু প্রফুল্ল হইল, কিন্তু দেখি, লোটনার পাশে সেই কুকুরটা দাঁড়াইয়া। বুঝিলাম, পিওনের সঙ্গে সঙ্গে সেও লোটনাকে ডাকিয়া আনিতে গিয়াছিল। দেওয়ানজীর কথা শেষ হইলে একটু সামনে আসিয়া লোটনার মুখের দিকে ঘাড়টা বাঁকাইয়া চাহিল, জিভ বাহির করা, ডান চোখটা একটু টেপা ; ভাবটা যেন, এর কথাই তোকে জানাতে গিয়েছিলাম—কেমন ঠেকছে ?

একটু পরে সবাই উঠিয়া গেলে লোটনা খুব লম্বা একটা সেলাম করিয়া বলিল, হাম নৈহাট্টি থাকছিল—তিন বরষ।—বলিয়া একটা সেলাম করিয়া দন্ত বিকশিত করিয়া দাঁড়াইল।

প্রথমে এ রকম অদ্ভুত আত্মপরিচয়ে একটু রাগ হইল। তা ছাড়া, সাহেবের সামনে ও-রকম হাসির মানে কি ? একটা ধমক দিয়া চৈতন্যসঞ্চার করিতে যাইতেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল—না, এই এখন আশা-ভরসা, খুশি রাখাই ভাল। তাহা ছাড়া আমার হিন্দীর পুঁজি যে রকম, ওর বাংলা জ্ঞানে অনেকটা সামলাইয়া লইবে। আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, তিন বছর নৈহাটি ছিলি ? তাই বলি, যেন চেনা চেনা মুখ। আমার বাড়ি সেরামপুর কিনা—

লোটনা হা তজোড় করিয়া কৃতার্থ হইয়া বলিল, হাম সিরামপুর খুব জানে, হুঁয়ামে আদালত থেকে আমার মাসীর ছেইলার জেহল হয়েছিল।

এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জায়গা সম্বন্ধে আরও একটা নূতন তথ্য পাইয়া অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলাম, সত্যি নাকি ? সেরামপুর আদালত থেকেই জেলের হুকুম হয়েছিল ? তবে দেখছি—

লোটনা আনন্দে হাত কচলাইতে লাগিল।

চাবির রিঙটা প্যাণ্টালুনের পকেট হইতে বাহির করিয়া দিয়া বলিলাম, যা সুটকেসটা নিয়ে আয় তো—চামড়ার বাক্স।

লোটনা সুটকেসটা আনিয়া চৌকির উপর রাখিল।

ডালাটা খুলিতেই কুকুরটা সরিয়া আসিয়া চৌকির উপর দুইটি পা তুলিয়া দিয়া দাঁড়াইল; আড়চোখে দেখিলাম, দুইটা কানই খাড়া করিয়া গভীর কৌতূহলের সহিত বাক্সের ভিতর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছে। ভ্যালা বিপদ তো!

লোটনা পরিচয় দিল, বলিল, ওর নাম রংলাল আছে; সাধু ভালা আদমিদের কুছভি বোলে না, চোরদের খুব পহছানতে আছে।

ব্যাটা উজবুক কোথাকার! মনের রাগ মনে চাপিয়া বলিলাম, আচ্ছা, তুই যা, দু বালতি জল তুলে নিয়ে আয় দিকিন। চা করতে জানিস?

লোটনা হাসিয়া বলিল, লৈহট্টিমে আমার চায়েরভি দোকান ছিল। এক টাকায় ষোড়হো আনা নফা থাকত।

ক্ষুদ্র ডাকাত! বিস্মিতভাবে একবার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, আচ্ছা, আয় জল নিয়ে, বাতলে দিচ্ছি; সে দরের চা করলে চলবে না।

সুটকেস হইতে পায়জামা, তোয়ালে, খাটো শার্ট, হালকা চটি, সাবান প্রভৃতি বাহির করিলাম। লোটনা যতক্ষণে জল লইয়া আসিল, আমি ততক্ষণে ধড়াচুড়া ছাড়িয়া ঢিলা পায়জামা, শার্ট, ঘাসের চটি পরিয়া তৈয়ার হইয়া গিয়াছি। এইবার হাতমুখ ধুইয়া লওয়া, চাটুকু হইলে চা পান করিয়া সাহেবের সহিত একটু দেখা করিয়া আসা। তাহা হইলে এক প্রস্থ কাজ শেষ হইয়া যায়।

রংলাল চাকরটার সঙ্গে ইঁদারায় গিয়াছিল। ঘুরিয়া আসিয়া একটু যেন অবাক হইয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। ভঙ্গীটা ভাষায় প্রকাশ করিলে দাঁড়ায়, এ আবার কি রূপ! একটু পরে আমার পায়ের কাছে আসিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আঘ্রাণ লইতে লাগিল।

চাকরটা ধমক দিয়া বলিল, খবরদার, মালিক হ্যায়।

আমি একেবারে এতটুকু হইয়া গেলাম। কথাটি ঠিক এই রকম দাঁড়াইল, যেন, হ্যাঁ, আমার বহিরাবরণে, বিশেষ করিয়া মিনিটে মিনিটে তাহা পরিবর্তিত করায়, এমন কিছু আছে বটে, যাহাতে অন্য কিছু বলিয়া সন্দেহ হইবারই কথা, তবে আসলে আমি এদের মনিব। আমি মাঝখানে অসহায়ভাবে পড়িয়া আছি, ইহারা দুইজনে এখন যেটুকু দাঁড় করায়।

কুকুরটা কথাটা ভাল করিয়া যাচাই করিবার জন্য চৌকির ওই কোণটার উপর গিয়া দাঁড়াইল। একবার ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিল, তাহার পর হঠাৎ যেন চিনিতে পারিয়া, কৌতুকরসে পরিপ্লুত হইয়া, দুই সারি দন্ত বিকশিত করিয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়া গেল।

যাক, আপদ গেল। উঠিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বেশ ভাল করিয়া হাত মুখ ধুইয়া লইলাম,

একটি টাটকা চুরুট ধরাইলাম, তাহার পর চৌকির উপর সাহেবী কায়দায় পা ছড়াইয়া ডেক-চেয়ারটায় গা ঢালিয়া দিলাম। লোট্‌না চায়ের যোগাড় করিতে লাগিল।

চায়ের সুমিষ্ট প্রত্যাশার সঙ্গে এই নবীনতম পদমর্যাদার উপলব্ধিতে মনটি বেশ একটি আত্মতৃপ্তিতে মজিয়া আসিতেছে, এমন সময় দোরগোড়ায় নজর করিতেই দেখি, একেবারে সারবন্দী একেবারে পাঁচ-পাঁচটি কুকুর, মাঝেরটি রংলাল।

বোধ হয় য়ে, এইমাত্র আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদের তন্গতভাবে দাঁড়াইবার ভঙ্গীতে আমার যেন মনে হইল, তাহারা অনেকক্ষণ আসিয়া আমায় নিঃশব্দে পর্যবেক্ষণ করিতেছে। একটি কুকুর মাদী, রংলাল যেন তাহার বান্ধবীকে এক আজগবি চিজ দেখাইয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আমার ঘাড়ের উপর দিয়া খাতির জমাইয়া লওয়া গোছের।

আমি মুখ তুলিয়া চাহিতেই সবগুলার মধ্যে একটা চঞ্চলতা পড়িয়া গেল। রংলাল মাদীটার ঘাড়ের কাছটা দাঁত দিয়া চুলকাইবার ভান করিয়া বোধ হয় কানে কানে কি বলিল, পাশের কুকুরটা হঠাৎ ঘুরিয়া আসিয়া সেইখানটাতে জিজ্ঞাসুভাবে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর এ ওর ল্যাজে একটা কামড় দিল; ও তাহার পাটা ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিল এবং এইভাবে জড়াজড়ি করিতে করিতে সামনের জমিটাতে গিয়া লুটাপুটি গড়াগড়ি শুরু করিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে হিঃ—হাঃ—ওফ্‌ প্রভৃতি নানা রকম অস্পষ্ট চাপা আওয়াজ।

ব্যাপারটা হাসিয়া খুন হইয়া যাইবার মত, এত কাছাকাছি যে, আমি কোন মতেই নিজের সহজ ভাবটি রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমায় উঠিতেই হইল, ট্রাঙ্ক হইতে আয়নাটা বাহির করিয়া, যতটা সম্ভব পোশাকের ছায়া ফেলিয়া মনের দ্বিধাটা মিটাইতে চেষ্টা করিলাম। এতই কি হাস্যকর একটা কিছু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহাতে, শুধু কথার কথায় নয়, নিতান্ত বাস্তবরূপে কুকুর-বিড়ালের পর্যন্ত হাসিয়া পেটে খিল ধরিয়া যায়?

চায়ের স্বাদ পাওয়া গেল না। স্ত্রীর উপরও একটু রাগ হইল, না হয় করিয়াছিলামই একটু বারণ, দিয়া দিলেই হইত কাপড়-জোড়াটা, সময় আছে, অসময় আছে; আর কিই যে আমার এমন বাধ্য তিনি! ঢের দেখা গেল!



চাকরি বেশ চলিতেছে। সাহেব সদয়, আমলারা বেশ অনুগত, ছোটা সাহেব নামটাও চালাইয়া লইয়াছি; কিন্তু জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে।

কুকুরটার উপর দিয়া অনেক পরীক্ষা করা গেল। প্রথমটা এক কোণে চেন দিয়া বাঁধিয়া রাখা গেল, যাহাতে আমায় যখন-তখন দেখিতে না পারে। তাহাতে সদাসর্বদা পাড়ার নানাজাতীয় কুকুরে তাহার কুশল-সমাচারের জন্য এত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল যে, ক্রমাগত কাজকর্ম ছাড়িয়া তাহাদের পিছনে লাগিয়া থাকার চেয়ে রংলালকে মুক্ত করিয়া তাহাদের নিশ্চিন্ত করাই সমীচীন বলিয়া মনে হইল।

এক এক করিয়া দুই-তিনজনকে দান করিয়া দিলাম। যাহাকেই দান কর, তিন-চার দিনের মধ্যেই তাহার বাড়ি হইতে চেন হারাইয়া যায়, তাহার পর রংলাল ফিরিয়া আসে। এই করিয়া প্রায় দুইটি টাকা ওই দিক দিয়া দণ্ড দিলাম।

মুশকিল এই যে, খোলাখুলি মারধোর করিতে পারি না। বাহ্যত তাহার অপরাধটা কি? দিব্য কাছে কাছে থাকে, কামড়াটে নয়, কিছু নয়, এমন নিমকহালাল কুকুরকে তাড়না করিবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণই নাই; তবুও যখন বাড়িতে কেহ নাই, অথচ কুকুরটা একটা কান নামাইয়া, আর একটা কান খাড়া করিয়া পরম দার্শনিকের মত আমায় অবলোকন করিতেছে, তাহাকে তাড়া যে না করিয়াছি এমন নয়। প্রথমটা উপেক্ষা করিয়াছি, আছে তো আছে, সামান্য একটা কুকুর তো! চাহিয়াও দেখি নাই। ক্রমে এমন একটা অস্বস্তি মনে খচখচ করিতে থাকে যে, একবার চাহিতেই হয়; তাহার পর থাকিয়া থাকিয়া ক্রমাগতই চাহিতে হয় এবং যদিও অপলক দৃষ্টিতে আমায় নিরীক্ষণ করা ভিন্ন তাহার কোনও দোষই থাকে না, তথাপি আমার মাথায় ক্রমশ যেন আগুন ধরিয়া উঠিতে থাকে, হাতের কাছে যাহা পাই, তাহা লইয়াই উঠি। খুন চাপিয়া যায়, ক্ষতিবৃদ্ধি-জ্ঞান থাকে না।

নিজেকেও বদলাইয়া দেখা গিয়াছে। হাফপ্যান্ট পরিয়া দেখিয়াছি, অর্থাৎ বিলাতী পোশাক অর্ধেক বলি দিয়া ফল হয় নাই। লুঙ্গি পরিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে রংলাল পাড়ার তাবৎ কুকুরকে ডাকিয়া আনিয়া এমন সমারোহের সহিত আপ্যায়িত করিয়াছে যে, লুঙ্গিটা সেই দিনই সাহেবের খানসামা করিম শেখকে দান করিয়া দিয়াছি।

বাকি ছিল ধুতি-চাদরের পরীক্ষা। প্রাণের জ্বালায় ধরিতামও; কিন্তু হায় রে! এদিকে যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিয়া বসিয়া আছি। 'ছোটা সাহেব' নামটা এমন সাংঘাতিকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, এখানে ধুতি পাঞ্জাবি পাম্পশু আর আমায় এ জন্মে পরিতে হইবে না।

চারিদিকে নিরাশ হইয়া অবশেষে খোশামোদ ধরিয়াছি—ডাহা হীন খোশামোদ। কাছে ডাকিয়া আদর করি, আয় রংলাল, ব্যাটা আয়, চ্যু-চ্যু। শুনছিস লোটনা? কুকুরটাকে মাঝে মাঝে একটু ক'রে নাইয়ে দিস। জানিস তো কি ক'রে নাওয়াতে হয় কুকুরকে?

লোটনা বিজ্ঞভাবে হাসিয়া বলে, লৈহট্টিমে আমার একটা কুকুর থাকছিল, গঙ্গাজলে চান করতে গিয়ে ডুবে গেল।

মনে মনে আশান্বিত হইয়া বলিলাম, হ্যাঁ, তোর জানা আছে তা হ'লে। রোজ চান

করাবি, বাড়িতে নয়, পুকুরে নিয়ে গিয়ে। বড্ড উঁচুদরের কুকুর, টের পাওয়া যাচ্ছে কিনা।

কিছুই ফল হয় না। সেই সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি; সেই ব্যঙ্গভাবে এক কান নামানো, বেড়াইতে বাহির হইলে পাড়ার যত কুকুর জড় করিয়া সেই পিছু পিছু অনুসরণ, কিছুরই এতটুকু ব্যতিক্রম হয় নাই।

এসব অত্যাচারের উপর আবার খরচের জন্য মনস্তাপ আছে। রোজ মাংসের বন্দোবস্ত করিয়াছি, রাত্রে ভাতের সঙ্গে আধ সের দুধ। সাক্ষাৎ আমারই বশীভূত হইবে বলিয়া, অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইলেও, নিজের হাতে খাওয়াই। এদিকে কয়েকদিন হইতে মাদীটাকে রোজ ডাকিয়া আনে; মাংস দুধ আর একটু বাড়াইয়া দিয়াছি, তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিলে, রংলাল শীঘ্র বশ মানিবে এই আশায়।

আশা কতটা সফলতার পথে জানি না, তবে ঘাড় নিচু করিয়া খাইতে খাইতে রংলাল যে-ভাবে সঙ্গিনীর দিকে এক-একবার তাহার সেই মারাত্মক হাসির ভঙ্গীতে আড়চোখে চায়, তাহাতে যেন মনে হয়, স্পষ্ট বলিতেছে, বোকারামকে ঠকাইয়া চলিতেছে মন্দ নয়, কি বল গো?



পুজোর ছুটিতে পনরো দিনের ছুটি পাইয়া বাড়ি আসিয়াছি। স্ত্রী দেখিয়াই বিস্মিত হইয়া বলিলেন, এ কি, একেবারে যে আধখানা হয়ে গেছ! অথচ শুনি, এমন ভাল জায়গা, পশ্চিম—

তাহা হইলে শরীরটাও ভাঙিয়াছে! আশ্চর্য কি। যা অশান্তি!

উত্তর করিলাম, বিরহটা সবার ধাতে সয় না।

স্ত্রী রাগিয়া বলিলেন, রঙ্গ রাখ; এ যেন কুনজরে পড়ার লক্ষণ, শরীর যেন কালি মেরে গেছে!

একটু চুপ করিলেন বটে, কিন্তু মনের কথাটা আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না; বলিলেন, লোকে বলে, জায়গাটা কামিখ্যের নাকি খুব কাছে? ওখানেও নাকি ভেড়া-টেড়া করে?

বলিলাম, এই তো আমারই ওপর ঝুঁকেছিল, যখন দেখলে, ভেড়া হয়েই গেছি এখান থেকে, তখন ভাবলে, আর মরা ভেড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা কেন?

তাঁহার মনের অবস্থার হিসাবে তামাশাটা বোধ হয় খুবই অসাময়িক হইল। মুখভার

করিয়া কহিলেন, আচ্ছা, হয়েছে, থাক্। তোমার কিন্তু আর ওখানে যাওয়া হবে না।—বলিয়া পোশাক-পরিচ্ছদ জিনিসপত্র গুছাইয়া এমন দৃঢ়তার সহিত বাক্সে ভরিয়া চাবি দিতে লাগিলেন, যেন এ বিষয়ে একেবারে চরম নিষ্পত্তি হইয়া গেল।

ছুটির প্রথম দিকটা ভালই কাটিল। রংলালও নাই, প্যান্ট-কোটও বাক্সের ভিতর, কটা দিন ধুতি-চাদরের মধ্যে শরীরটাকে মুক্তি দিয়া এবং লোটুনার বাংলার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

ক্রমেই ছুটি যেমন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, কর্মস্থানের রংলালময় ছবিগুলি চোখের সামনে স্পষ্টতর হইয়া মনটাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। কি ভাবিলাম জানি না; একদিন স্ত্রীর কাছে কথাটা হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম; হাসিচ্ছলেই বলিলাম, সেখানে একটা ভারি মজা হয়েছে, কুকুর যে এত মানুষের মত লক্ষ্য করতে পারে, জানতাম না; অন্তত তার রং-ঢং দেখলে তোমার মনে হতেই হবে, সে খুব বিবেচকের মত তোমার কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে।

কাহিনীটা আগাগোড়া বলিয়া গেলাম।

হাসিচ্ছলে আরম্ভ করিলাম বটে, কিন্তু ব্যাপারটা মূলত আমার কাছে লঘু ছিল না বলিয়াই হোক আর যে জন্যই হোক, বর্ণনাটা বেশ স্পষ্ট এবং একটানা হইল না। বাক্যে জড়াজড়ি করিয়া শুধু এইটুকুই স্পষ্ট করিয়া দিল যে, এর মধ্যে কোথায় যেন আমার একটু দুর্বলতা আছে, যা আমি গোপন করিতে চাহি।

স্ত্রী শোনার সময় কোথাও একটু হাসিলেন না, শোনার শেষে আরও গম্ভীর হইয়া গেলেন, এবং মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করিলেন, ওটা বুঝি তোমার কুকুর হ'ল ?

আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, এতক্ষণ ধ'রে তবে শুনলে কি ? দেশী কুকুর, গায়ের রঙ রাঙা ব'লে—

স্ত্রী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, থাম বাপু, কুকুর তো কখনও কেউ দেখে নি ! অমন এক-দৃষ্টে চাউনি কুকুরের ?

সেইটিই তো বুঝতে পারি না ; তবে আর তোমায়—

বুদ্ধি কি তোমার রেখেছে যে, বুঝবে ? না, তোমরা পার এসব ব্যাপার বুঝতে ? এ তো স্পষ্ট, কোন খারাপ মেয়েমানুষ কুকুরের বেশ ধ'রে—

আমি কুসংস্কারের দৌড় দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কহিলাম, সর্বনাশ ! একটা জলজ্যান্ত কুকুর, দিনরাত হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি ক'রে বেড়াচ্ছে, দিনের আলোর মত স্পষ্ট, আর তুমি কিনা—

যত স্পষ্ট, তত সর্বনাশের গোড়া ! তোমরা যখন এসব কিছু বোঝ না, তখন চুপ ক'রে থাক। বিশ্বাস না হয়, এক্ষুনি তাঁতী-বউকে ডেকে পাঠাচ্ছি, তার মুখেই শোন। চন্দোরের মাও বোঝে কিছু কিছু, লক্ষণ মিলিয়ে ঠিক ব'লে দেবে, কোন্ মেয়েমানুষ, কোথায় থাকে। আমার অদৃষ্টে শেষ পর্যন্ত যে কি আছে ! মা মঙ্গলচণ্ডী যে—

বাড়াবাড়ির সম্ভাবনা দেখিয়া আমি বলিলাম, থাক্, আর ওদের ডেকে কাজ নেই ;

কিন্তু খারাপ মেয়েমানুষই যদি হ'ত কুকুরটা, অন্তত—

স্ত্রী হাত উঁচাইয়া বলিলেন, থাক, যে বোঝে না, তার সঙ্গে আর বৃথা তক্ক করতে চাই না। মোট কথা, তোমার আর ওখানে যাওয়া হবে না। আমি জানি, জায়গাটি কামিখ্যের একেবারে কাছে, তুমি আমায় নুকিয়ে ভেতরে ভেতরে এই সব—

রাগ হইয়া পড়িল। বিশেষ করিয়া উঁহার এই কামাখ্যা-বাতিকে তো আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইয়াছে। সেবারে বম্বে বেড়াইতে গেলাম, অসুখের টেলিগ্রাম দিয়া পৌঁছিবার পরদিনই আনাইয়া লইলেন ; আসিয়া শুনিলাম, টের পাইয়াছেন, জায়গাটা কামাখ্যার কাছাকাছি। দিল্লী লাহোর কামাখ্যা হইতে বেশী দূর নয় বলিয়া এ পর্যন্ত পূজার ছুটিতে বেড়াইতে যাওয়া হইল না। রেঙ্গুন কামাখ্যা ও'র মতে দুইটা পাশাপাশি স্টেশন। দুই দিন উপবাস করিয়া পড়িয়া রহিলেন, তিনশো টাকার অমন চাকরিটি লওয়া হইল না। আমার যাওয়ার কথা হইলে কামাখ্যা আবার রাণাঘাট কৃষ্ণনগর পর্যন্ত ঠেলিয়া আসে, এর চেয়ে আর বিপদ কি আছে ? মা জানকীর দেশ বলিয়া এ ক্ষেত্রে কোন রকমে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, কিন্তু মনের সন্দেহ আর কতদিন চাপা থাকিবে ?

বিরক্তির সহিত বলিলাম, কামিখ্যে তো তোমার চারদিকেই—দেখ তো কাণ্ড ! একটা কুকুর চেয়ে থাকে ব'লে আমায় চাকরি ছাড়তে হবে ? এমন জানলে কোন্ মুখ্যু তোমায় বলতে যেও—

প্রথম একরাশ প্রশ্ন বর্ষিত হইল। প্রাণের চেয়ে কি চাকরি বড় ? শাক ভাত খাইয়া লোকের দিন চলে না ? দেশের যে সকল লোক বিদেশে চাকরি করে না, তাহাদের স্ত্রীপুত্র কি বাঁচিয়া নাই ?

প্রশ্নগুলি ক্রমেই ব্যক্তিগত রূপ ধারণ করিল—এই মাস চারেকেই জায়গাটার উপর এতটা টান হইল কেন ? কুকুরটাকে উপরে উপরে দেখিতে পারি না, অথচ তাহার দুধ মাংস বরাদ্দ করিবার কারণ কি ? যদি কথাটা সোজাই ছিল তো এতদিন লুকাইবার কি কারণ ছিল ? সেই বলিলাম, অথচ আসিয়াই বলি নাই কেন ?

দেখিলাম, হাতে আঁচল উঠিয়াছে, চোখের পাপড়িগুলি একটু ঘন ঘন উঠানামা করিতেছে। বুঝিতে বাকি রহিল না, এবারে অশ্রুস্রোতে যে-সব প্রশ্ন নামিবে, সেগুলি হইবে যেমন উত্তপ্ত তেমনই বেগবান। আপাতত চাকরি-সমস্যার চেয়ে সেটা গুরুতর হইবে বুঝিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম।

রাত্রে আহার করিবার সময় দেখিলাম, ভাবটা প্রসন্ন। চাকরির কথাটা তুলিব তুলিব করিয়া প্রয়োজনানুরূপ শক্তি সঞ্চয় করিতেছি, বলিলেন, একটা মস্ত বড় সুখবর আছে, কি খাওয়াবে বল ?

বলিলাম, ভেড়ার মাংস খাও তো লোক ডাকি, গা থেকে কেটে দিক।

রাগিতে গিয়া হাসিয়া বলিলেন, খালি তামাসা। আজ তাঁতীগিন্নী বুড়ীকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। সব শুনে কি বললে বল তো ?

শেকল গড়াতে।

শুনেই বললে, কুকুর, না হাতী। কোন মেম-পেত্নী ; দেশী কোন কু-মেয়েমানুষ হ'লে ও পোশাকের দিকে ঘেঁষত না। বললাম, তবু ভাল। মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে তক্ষুনি পাঁচ সিকে মানত ক'রে তুলে রাখলাম।

তাঁতী-বউয়ের কি বিদায় হ'ল ?

ওরা গরিব মানুষ, ডাকলে আপন জেনে আসে, ভাল পরামর্শ-আশটা দেয়। দোষ আর কি ? উল্টে বরং বললে, ও পাপ কেরেস্তানী পোশাক আর বাড়িতে রেখো না। বার ক'রে দিলাম। বুড়ো মানুষ, বয়সের ভারে নুয়ে গেছে, তবু সেই পেল্লাই গাঁঠরি ঘাড়ে ক'রে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে গেল। শুনে অবধি এমন হয়েছিল, আদাড়ে জিনিস-গুলো সরিয়ে হাড়ে যেন বাতাস লাগল। ও কি, হাত গুটোচ্ছ যে! তাঁতীবউয়ের কল্যাণে চাকরি র'য়ে গেল, কোথায় খুশি হয়ে দুটি খাবে, না—। মাছের ডালনাটা আর একটু দিই, ব'স।

রাগে বিরক্তিতে সে রাত্রে আর কথা কহিলাম না, কেন না, মুখ খুলিলেই একটু বাড়া-বাড়ি হইয়া যাইত। অন্তরাল হইতে একবার কানে গেল, স্ত্রী ঝিকে সঙ্গোপনে বলিতেছেন, দেখছিস তো! ঠিক মিলে যাচ্ছে! তাঁতী-বউ ব'লেই ছিল, ও পোশাকের ওপর কুদৃষ্টির জন্যে একটা টান প'ড়ে গেছে, একচোট ভয়ংকর চটবেই, দেখছিস তো রাগের বহর ?

দুঃখও হইল, ন্যায়সঙ্গত রাগের এমন কদর্থ, এতটা অমর্যাদা পূর্বে কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না জানি না। আমি যত চটিতেছি, উহারা দিব্য বসিয়া ততই লক্ষণ মিলাইতেছে।

পরের দিন কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে অন্য ভাবে দেখা দিল। ভাবিলাম, যাক, সমস্ত ব্যাপারটা গোটা ত্রিশ-চল্লিশ টাকার উপর দিয়া যদি শেষ হয় তো মন্দের ভাল। এখন আমায় বাধ্য হইয়া ধুতি-চাদর-পরিহিত হইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। নিজের ইচ্ছায় কোট-প্যাণ্ট ছাড়া হইত না, এতে একটা সান্ত্বনাও রহিল, আর ওদিকে রংলাল-সমস্যাও মিটিল। দুঃখ রহিল, 'ছোটা সাহেব' আবার 'বড়া বাবু' হইতে চলিলেন। তাহা হউক, মোহটা অনেক কাটিয়া আসিয়াছিল, বাকিটুকু কাটিতে দেরি হইবে না।

বাকি থাকে—হঠাৎ এ পরিবর্তনের জন্য সাহেবকে এবং অনুগত আমলাবৃন্দকে একটা অজুহাত দেখানো, অন্তত জিজ্ঞাসা করিলে একটা সমীচীন উত্তর দেওয়া। একটি বেশ সভ্য এবং সুসঙ্গত মিথ্যা রচনায় ব্যাপৃত রহিলাম।

কুঠির টমটম হইতে নামিয়া দেখিলাম, অভ্যর্থনার জন্য কয়েকজন আমলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত রহিয়াছেন। সেলাম, প্রতি-সেলাম, কুশল-প্রশ্নাদি হইল। লক্ষ্য করিলাম, লালা রামকিষুণ সেলাম না করিয়া করজোড়ে প্রণাম করিলেন। মুখে একটি তৃপ্ত হাসি।

সকলের নয়ন এবং অধর কোণে একটি প্রশ্ন নাচিয়া বেড়াইতেছিল, আগুসার হইয়া আমি নিজেই সবার কৌতূহল মিটাইয়া দিলাম। বলিলাম, হ্যাঁ, আর সবই তো কুশল, তবে গাড়ি থেকে আমার সুটকেসটা কাল রাত্রে চুরি হয়ে গেছে, পোশাক-পরিচ্ছদ যা কিছু সব তাইতেই ছিল। এই দেখুন না, ভাগ্যিস একসেট কাপড়-চোপড় এনেছিলাম। চারিদিক থেকে সহানুভূতির একটি মৃদু কলরব উঠিল। লালা রামকিষুণ একেবারে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, তাই নাকি? ভারি জুলুম তো!

বেশ বোঝা গেল, সকলেই ভিতরে ভিতরে খুশি, এবং আমার ক্ষতিতে লালা রামকিষুণের আনন্দটা সকলের চেয়ে অধিক বলিয়াই তাঁহার এত আড়ম্বরের সহিত সহানুভূতি দেখানো দরকার হইয়া পড়িল। ইহার পর যে কথাবার্তা হইল, তাহার মধ্যে মর্যাদার ব্যবধান রক্ষা করিয়াও এমন একটি নিগূঢ় আত্মীয়তার সুর ছিল যে, তাঁতী-বউয়ের উপর আমার আক্রোশটা ধুইয়া মুছিয়া গেল। বুঝিলাম, বিদেশে 'ছোট সাহেব' হইয়া একলা-একলা থাকার চেয়ে 'বড় বাবু' হইয়া সবার হৃদয়ের সান্নিধ্য-লাভ করা সমধিক ভাগ্যের কথা।

কোঁচানো চাদরের হাওয়া খাইতে খাইতে চেয়ারে বসিয়া গল্প করিতেছি, রংলাল হাজির। দূরে দাঁড়াইয়া প্রথমে দুইটা কান খাড়া করিয়া, পরে একটা কান নামাইয়া, মাথাটা কাত করিয়া শত প্রকারে লক্ষ্য করিতে লাগিল। আমিও অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে দেখিতে লাগিলাম, কি করে! ক্ষণেক পরে বলিলাম, কি রে রংলাল, চিনিতে পারিস না?

আওয়াজ শুনিতে যা দেরি, রংলাল ছুটিয়া আসিয়া একেবারে কোলে লাফাইয়া হাঁটুতে থাবা তুলিয়া, আদর খাইয়া, আমার জামা-কাপড় চাটিয়া-চুটিয়া এক কাণ্ড করিয়া তুলিল।

অনেকদিন পরে দেখার জন্যই এই স্নেহের উপদ্রব; কিন্তু আমার মনে হইল, কোট-প্যাণ্টালুন-মুক্ত বলিয়াই কুকুরটা আমাকে এতদিনে এই প্রথম তাহার নির্মল পশুহৃদয়ের সমস্ত প্রীতি দিয়া অভিষেক করিয়া লইল।

আমার ঘাড় হইতে মেম-পত্নী না হউক, সাহেব-ভূত যে নামিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ওঝাগিরির যশ খানিকটা তাঁতী-বউকে দিতে হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশই যে রংলালের প্রাপ্য, সে কথা আর কেহ না জানিলেও আমি মর্মে মর্মে জানি।



বিপন্ন

এম. এস-সি. পাস করিলাম ; সঙ্গে সঙ্গে একটি চাকরিও জুটিয়া গেল। বয়স তখন এত অল্প যে, প্রফেসার সেন তাঁহার নিজস্ব প্রথায় অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন, শৈলেন, তুমি, যাকে বলে এঁচড়ে পেকে গেলে।

চাকরি—বেহারে কোন একটি কলেজে প্রফেসারি। সত্বর যোগদান করিবার তাগিদও ছিল, তাহার উপর কাকা 'শুভস্য শীঘ্রম্, শুভস্য শীঘ্রম্' করিয়া বাড়িটাতে এমন একটা উৎকট তাড়ানো-ভাব দাঁড় করাইলেন এবং আমি বালকসুলভ অবুঝপনার বশে চাকরিটা হারাইবই জানিয়া শেষ পর্যন্ত এমন নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন যে, বাহালি-পত্র পাওয়ার পরদিনই তাড়াতাড়ি যাত্রা করিতে হইল। তাহাতে খুঁটিনাটি অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যই কেনা হইয়া উঠিল না।

কর্মস্থানে পেঁছিয়া বৈকালের দিকে বাজারে বাহির হইয়া গেলাম এবং একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি বড় দেখিয়া মনিহারী দোকানে প্রবেশ করিলাম। দোকানটিতে বেশ ভিড়, বেশির ভাগ লোকই দাঁড়াইয়া ; কাউণ্টারের সামনে সারি সারি কতকগুলি চেয়ার পাতা, সবগুলিই অধিকৃত। আমার একটু বসিতে পারিলেই ভাল হইত, কেন না, অনেকগুলি জিনিস লইতে হইবে, বিলম্ব হইবার কথা। এদিক-ওদিক চাহিতেছি, হঠাৎ নজর পড়িল, একটি কোণপানা জায়গায় একটি ছোকরা আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। চোখোচোখি হইতেই তাহার চেয়ারটি ছাড়িয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনি এইখানে আসুন না ; দাঁড়িয়ে কে ?

হিন্দীতে কথা বলিল, তাহা না হইলে বেহারী বলিয়া চিনিবার উপায় ছিল না। মাথায় আধা-বাবরি-গোছের ব্যাক-ব্রাশ চুল, কোঁচায় কাবুলী-ফেরতা দেওয়া কাপড় পরা, গায়ে বোতামের কালো ফিতা বাহির করা একখানি পাশবোতাম পাঞ্জাবি—টায়টোয়ে কোমরের নিচে পর্যন্ত নামিয়াছে, পায়ে নাগরা—এদেশী নয়, যাহা কলিকাতায় গিয়া বাংলার সুকুমারত্বের ছাপ লইয়া আবার এখানে ফিরিয়া আসিয়াছে। একটু হাসিয়া ইংরেজীতে বলিলাম, না, থাক্, ধন্যবাদ। আমি বেশ আছি।

এক ধরনের খাতির আছে যাহা অত্যাচারের নামান্তর মাত্র, দেখিলাম এও তাই।
তাই কি হয়?—বলিয়া ছোকরা হাসিতে হাসিতে দুই পা আগাইয়া আসিল এবং আমার হাতটা ধরিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিয়া সামনের বিক্রেতাকে বলিল, নাও, আমার এখন থাক্, আগে এঁকে দাও; সেই থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক।
সন্দেহ হইল, দালাল নাকি? তাই বা কেমন করিয়া হয়? দেখিলাম, কাউন্টারের উপর তাহার নিজেরই বাছাই করার জন্য এক-রাশ জিনিস রহিয়াছে। ফুলেল তেল, সাবান, আরশি, চিরুনি, কয়েক রকম সুগন্ধি, লেটারপ্যাড, আরও নানা রকম জিনিস —যাহা শৌখিনও, আবার প্রয়োজনীয়ও হয়। ইতিমধ্যে বিক্রেতা কাউন্টারের ওধার হইতে একখানা চেয়ার তুলিয়া তাহার জন্য এদিকে নামাইয়া দিল। বোঝা গেল, শাঁসালো খদ্দের বলিয়া বেশ খাতির আছে।
আমি বিক্রেতাকে বলিলাম, আগে আমায় একটা স্টোভ দেখাও দেখি; প্রাইমাস হানড্রেড আছে?
দোকানী বলিল, আছে বাবু, তবে একটু দেরি হবে, সামান্য একটু। আজই বাক্স এসে পৌঁছেছে, প্যাকিং খুলে এখুনি নিয়ে আসছি। বলিয়া সে ফিরিল; ছোকরা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, খুলে, দাম খতিয়ে নিয়ে এস, নইলে একটা যা-তা দাম ব'লে এঁকে ঠকাবে—। কিছু তাড়াতাড়ি নেই এঁর।
তাহার পর আমায় প্রশ্ন করিল, আপনি কি বেশি ব্যস্ত?
বলিলাম, না, তেমন, আর কি! তবে ততক্ষণ বরং অন্য একজনকে ব'লে যাক না, আমায় তেল, সাবান, ব্লেড এইগুলো দিক বের ক'রে।
আচ্ছা, সে হচ্ছে।—তুই যা শীগগিরি, দেখিস, যেন আবার মেলা তাড়াহুড়ো ক'রে যা-তা নিয়ে আসিস নি।—ও-ই আনুক মশাই, ভাল সেলস্‌ম্যান। সিগারেট খান?
পকেট হইতে একটি সিগারেট-কেস বাহির করিয়া সামনে ধরিল। একটা সিগারেট বাহির করিয়া মুখে দিলাম; ছোকরা নিজেও একটা ঠোঁটের মাঝে আলগা করিয়া ধরিয়া কেতাদুরস্তভাবে দেশলাই জ্বালিয়া আমার সামনে ধরিল। তাহার পর নিজেরটা ধরাইয়া, একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, স্মোক ইজ মাই প্যাশন।
একেবারে আপ-টু-ডেট!
লক্ষ্য করিলাম, সিগারেট খাইতে খাইতে খুব চকিত এবং সংযতভাবে দুই-একবার পাশের জিনিসগুলির উপর দৃষ্টিপাত করিল এবং নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবিতে লাগিল; তাহার ভাবটা দেখিলে সন্দেহ হয়, যেন কি একটা কথা বলিতে চাহিতেছে, অথচ যেন জো পাইতেছে না।
নিতান্ত চুপ করিয়া থাকার অস্বস্তি কাটাইবার জন্য বলিলাম, ও জিনিসগুলো বুঝি আপনি পছন্দ করবার জন্যে আনিয়েছেন?
মুখের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ। সঙ্গে সঙ্গে যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল এইভাবে বলিল, ঠিক কথা, এই তো আপনাকে পাওয়া গেছে, দিন

তো মেহেরবানি ক'রে আমার গোটাকতক জিনিস পছন্দ ক'রে। বলবেন বোধ হয়, কেন, আপনি নিজে কি পছন্দ করতে পারেন না? পারি, কিন্তু জানেনই তো টু হেডস্ আর বেটার দ্যান ওয়ান।

আমার মুখে এরূপ একটা অশোভন আপত্তি ধরিয়া লওয়ায় আমি একটু লজ্জিত হইয়াই বলিলাম, সে কি কথা! আমার দ্বারা যদি সামান্য সাহায্য হয় তো আমি বিশেষ আনন্দিতই হব।

সে আমি বাঙালীদের জানি, তাঁদের সম্বন্ধে আমার ধারণাও খুব উচ্চ। আচ্ছা, এই সাবানের কথাই ধরা যাক।

সাবানের বাক্সগুলি একে একে সরাইয়া দিয়া বলিল, এই তো ভিনোলিয়া, ইর্‍্যাস্মিক, হিমানী, ন্যাসকো, পামঅলিভ, ক্যালকাটা সোপ ওআর্কস, মাইসোর—আরও এই সব কি কি রয়েছে, আপনি কোন্‌টা রেকমেণ্ড করেন?

আমি বলিলাম, মাফ করবেন, বিলিতীগুলির সম্বন্ধে আমি কিছু বলব না। তবে—

ছোকরা ভিনোলিয়া, পামঅলিভ, ইর্‍্যাস্মিকের বাক্সগুলি সঙ্গে সঙ্গে পাশে সরাইয়া রাখিয়া বলিল, নিন, বলুন এবার। মানে, ভিনোলিয়া দাবি করে, অমন সফ্‌ট আর ডেলিকেট স্কিন অন্য সাবান দিতে পারে না। তা যাক গিয়ে; এদিকে আবার স্বরাজও তো চাই মশাই! এখন এগুলোর মধ্যে আপনার কোন্‌টা পছন্দ? এক কোম্পানিরই পাঁচ-সাত রকম আছে। আচ্ছা, আপনি সায়েন্স, না, আর্টস?

বলিলাম, সায়েন্স।

আই. এস-সি?

না, এইবারে এম এস-সি. পাশ করেছি।

ছোকরা গভীর শ্রদ্ধার সহিত আমার দিকে চাহিল, তাহার পর বলিল, তবে তো কথাই নেই, দি ম্যান ফর ইট। আচ্ছা, সাবানে গায়ের রঙ ইম্প্রুভ করতে পারে? ধরুন—

সেকেণ্ড কয়েক একটু চিন্তা করিয়া লইল, তাহার পর কহিল, ধরুন—এই ধরুন, কেউ যদি পাড়াগাঁয়ে, মনে করুন, এই তের-চোদ্দ বছর পর্যন্ত কাটিয়ে থাকে, জানেনই তো, পাড়াগাঁয়ের ধুলো কাদা মেঠো হাওয়া—এসবের মধ্যে রঙ তো আর ঠিক থাকে না; তা এখন যদি সে রেগুলারলি সাবান মেখে যায় তো রঙটার জলুস বাড়বে ব'লে আপনাদের সায়েন্স গ্যারাণ্টি দিতে পারে?

কোথায় ব্যথা এবং আমার এত খাতিরের কারণটাই বা কি এতক্ষণে বুঝিলাম। বলিলাম, কি জানেন? সায়েন্স যে গায়ের রঙ আর সাবানের কথা ধ'রেই কোন বিশেষ কথা বলেছে তা মনে পড়ে না; তবে সাবান জিনিসটা লোমকূপগুলো বেশি পরিষ্কার রাখে, বাইরের ময়লাও জমতে দেয় না, কাজেই গায়ের চামড়ার স্বাস্থ্যটা থাকে ভাল; সেই থেকেই—

ছোকরা গালে হাত দিয়া মাথাটি কাত করিয়া খুব মনোযোগ-সহকারে কথাগুলো শুনিতেছিল ; সোজা হইয়া বসিয়া, তর্জনীটা একটু নামাইয়া বলিল, দেয়ার ইউ আর, হয়েছে। আচ্ছা, তা যদি হয় তো এক বার ক'রে সাবান মাখলে যে পরিমাণে উন্নতি হবে, দু বার ক'রে মাখলে তার চেয়ে বেশি উন্নতিই হবে নিশ্চয়, তিন বার ক'রে মাখলে সেই অনুপাতে তার চেয়েও বেশি ? চার বার—ছ বার—আট বার—

হায় রে চোদ্দ-পনেরো বৎসরের গাত্রচর্ম, তোমার বিপদও অনেক ! আমি আর না থাকিতে পারিয়া বলিলাম, হেজে যেতে পারে।

ছেলেটি যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। ক্ষণমাত্রে সামলাইয়া লইয়া বলিল, না, ছ বার আট বার একটা কথার কথা বলছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সাবানপর্ব যেন চাপা দেওয়ার জন্যই একটা তুলিয়া লইয়া বলিল, তা হ'লে এ সাবানটার সম্বন্ধে কি বলেন ? কোম্পানিটাও ভাল, গন্ধটাও ডিসেন্ট—



খুব বড় সাবানবেত্তা বলিয়া আমার কোন কালেই নাম ছিল না ; তবু বেচারাকে সপ্রতিভ করিয়া তুলিবার জন্যই বলিলাম, দেখি, হ্যাঁ, এইটিই আজকাল কলকাতায় খুব চলেছে, হট ফেভারিট।

মুখটি পুলকে দীপ্ত হইয়া উঠিল, বাক্সটা একটু তুলিয়া ধরিয়া এক পাশে নামাইয়া রাখিল, মনে মনে বুঝিবা কাহার দুটি কঙ্কন-পরা হাতে তুলিয়া দিল। বলিল, এই দেখুন বেয়াদবি, আপনাকে পান অফার করা হয় নি !

পকেট হইতে একটা রুপার ডিবা বাহির করিয়া ডালাটা খুলিয়া ধরিল। জিজ্ঞাসা করিল, জরদা খান ?

না।

আচ্ছা, তেল আজকাল কলকাতায় সবচেয়ে কোন্‌টা বেশি চলছে ?

সাবান সম্বন্ধে সমস্ত কলিকাতাকে টানিয়া আনিয়া ভাল করি নাই দেখিতেছি ; কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, ছোকরা বলিয়া উঠিল, অত কথায় কাজ কি, আপনি নিজে কি ব্যবহার করেন তাই বলুন না ? আপনারও তো চমৎকার চুল দেখছি।

উত্তর করিলাম, আমার কথা ছেড়ে দিন; যখন যেটা হাতের কাছে পাই, খানিকটা দিই মাথায় চাপড়ে—বলিয়া একটু হাসিলাম।

ছোকরা নেহাত যেন খাতিরে পড়িয়া মুহূর্তের জন্য মুখটাতে একটু হাসি টানিয়া আনিল, সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর ব্যস্ততার সহিত জেরা শুরু করিয়া দিল।

আচ্ছা, হাতের কাছে কোন্‌টা বেশি পান ?

তার কি কোন ঠিক আছে ? কোন দিন হয়তো দিলামই না তেল মাথায়।

নাছোড়বান্দা। ক্ষণমাত্র ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা, না হয় অন্য দিক দিয়েই দেখা যাক, সবচেয়ে কম কোন্‌টা পান ?

আমি আর একবার হাসিয়া বলিলাম, সেটা আরও বলতে পারি না। যেটা সবচেয়ে বেশি পাই, সেটার কথাই যখন মনে থাকে না, তখন সবচেয়ে কমের কথা কি ক'রে মনে থাকবে বলুন ?

আবার একটু অপ্রস্তুত ভাব ; একটু মৌন থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, আপনাদের সায়েন্স কি বলে, চুলের সঙ্গে তেলের সম্বন্ধ বিষয়ে ?

বলিলাম, কেশতৈল সম্বন্ধে সায়েন্স বিশেষ ক'রে কোথাও ব'লে গেছে ব'লে তো মনে পড়ে না। তবে কথা হচ্ছে, তেল-টেল মাখলে একটু শ্যাম্‌পুইং করলে, চুলটা থাকে ভাল।

ছোকরা আমার কথার সঙ্গে সঙ্গে তর্জনীটা নামাইয়া বলিল, থাকে ভাল। বেশ, এই-বার এই দিক থেকে দেখা যাক, কেশতৈল হচ্ছে মোটামুটি তিন ক্লাসের—তিলের, নারকেলের আর এণ্ডির, এই তিনের কোন-না-কোন একটা দিয়ে ভাল কেশতৈল তৈরি ; এখন দি কোশ্চেন ইজ, এর মধ্যে কোন্‌টি চুলের পক্ষে সবচেয়ে ভাল ? আপনাদের সায়েন্স কি বলে ? ধরুন—। একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, এই ধরুন, আমার এক আত্মীয়া প্রায় তের-চোদ্দ বৎসর পর্যন্ত পাড়াগাঁয়েই ছিল। আমাদের দেশের বাপ-মায়েরা সৌন্দর্য সম্বন্ধে কতটা গাফিল, জানেনই তো। বিশেষ ক'রে বেহারে। এরা আবার স্বরাজ চায় মশাই ! আমার হাতে থাকলে আমি এখন দুশো বছর কিছু দিতাম না। চুল যে সৌন্দর্যের একটা কতবড় অঙ্গ, সেটুকুও যারা জানে না, তারা আবার স্বরাজ চায় কোন্ মুখে মশাই ? 'স্বাস্থ্য ভাল, স্বাস্থ্য ভাল' ব'লে যে তার বাপ-মা গুমর করে, তাতে তাদের কি বাহাদুরি ? সে তো নেচার দিয়েছে, শুধু চুলটার দিকে তোমরা একটু লক্ষ্য রাখতে পারলে না ? শেম !

বেজায় চটিয়াছে। একবার মনে হইল, বলি, আজকাল তো সভ্য এবং স্বাধীন জগতে চুলটা বাদই দিতেছি—বলিয়া স্বরাজকামীদের এবং তাহার "আত্মীয়া"র বাপ-মায়ে-দের উপস্থিতের জন্য বিপন্মুক্ত করি ; কিন্তু কেশের মোহ তাহাকে যেন পাইয়া বসিয়াছে, তাহাতে এ ধরনের কথায় ফল হইবে না জানিয়া কহিলাম, আপনি যদি তাঁর চুলের উন্নতি চান তো এখনও যে একান্ত না হয় এমন নয়।

ছোকরা ব্যস্তভাবে বলিল, কি ক'রে ? আমি এইজন্যেই তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, বাঙালী ব'লেই। আর আমি মশাই, বাঙালীদের একটু ভালবাসি। এদিকে আমরা বলি, বেহার ফর বেহারীজ, ওদিকে আপনারা পাল্টা জবাব দিন, বেঙ্গল ফর বেঙ্গলীজ—এই ক'রে দুটো প্রতিবেশী জাতের মধ্যে ভাবের কিংবা অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান বন্ধ হয়ে যাক—বাস্, তা হ'লেই স্বরাজ মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে আর।

কি! নিন, সিগারেট খান। চুলোয় যাক সব; তবে আমাকে আপনার বন্ধু ব'লেই জানবেন।

বলিলাম, বড় আনন্দ এবং সৌভাগ্যের বিষয়। বলেছেন ঠিকই, পাশাপাশি দুটি জাতের মধ্যে এ ধরনের মনোমালিন্য থাকা উচিতও নয়, আশা করা যায়, থাকবেও না বেশিদিন। ঠিক কথা, কেশ সম্বন্ধে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যা করেন—

ছোকরা তর্জনীটা উৎসাহভরে টেবিলে ঠুকিয়া বলিল, দেয়ার ইউ আর; আমি সেই কথাই জিজ্ঞাসা করব করব করছিলাম, অথচ লেডিদের কথা তুললে আপনি কি মনে করবেন ভেবে জিজ্ঞাসা করতে পারছিলাম না। হ্যাঁ, তাঁরা কি করেন? বাঙালী মেয়ে-ছেলেদের কেশসৌন্দর্য নামী। আমাদের এখানে কথায় বলে, 'ছাজা, বাজা, কেশ—তিনে বাংলা দেশ।' 'ছাজা' হ'ল ঘরের ছাউনি, 'বাজা' বুঝতেই পারেন, বাজনা, আর 'কেশ'—এই তিন নিয়ে বাংলা দেশ। আচ্ছা, ধরুন, তাঁরা যে উপায় অবলম্বন করেন, তাতে কতটা পর্যন্ত উন্নতি হতে পারে? যার চুল কোমর পর্যন্ত কায়ক্লেশে যায়, কতটা নামতে পারে তার চুল? হাঁটু পর্যন্ত? নাঃ; হাঁটু পর্যন্ত আর হতে হয় না, ট্রু লেট, কি বলেন?

নূতন বিবাহ, নূতন সাধ; নিরাশ করিয়া আর পাপের ভাগী হই কেন? বলিলাম, চোদ্দ-পনরো আর এমন কি বিশেষ দেরি হ'ল? এই তো মোটে চুল হবার সময় আরম্ভ হয়েছে।

ছোকরা আমার কথাগুলি শুনিতে শুনিতে স্মিতবদনে পানের ডিবা বাহির করিতে-ছিল; বলিল, আসুন, পান খান। আচ্ছা, চুল কি হাঁটুর নিচেও নামতে পারে? সে রকম যত্ন নিলে? এই দেখুন না, এই হেয়ার-অয়েলটার বাক্সের এই ছবিটা।

বেজায় হাসি পাইল। তবুও ভাবিলাম, যাহার এমনই সঙিন অবস্থা যে, তুচ্ছ একটা বিজ্ঞাপনের ছবিকে ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তাহাকে দমানো নিতান্ত পাষণ্ডের কাজ। বলিলাম, তুলির টানে যতটা সহজে চুল নিচে নামানো যায়, বাস্তব-ক্ষেত্রে ততটা আশা করা যায় না, তবে চেষ্টার অসাধ্য তো কিছু নেই।

নিশ্চয়ই, নেপোলিয়ান আল্পস্ ক্রস করেছিলেন কি ক'রে মশাই? চেষ্টা ক'রেই তো? তা হ'লে ধরুন পায়ের গুলের নিচ পর্যন্ত? যদি খুব যত্ন নেওয়া যায়, প্রাণপণে? সম্ভব?

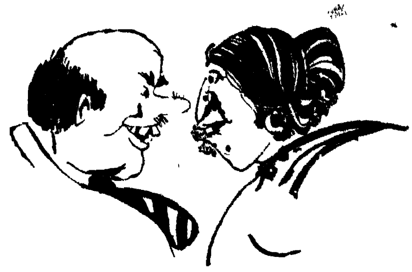
বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিতেছে। বিনীতভাবে, যেন এক অনির্দিষ্ট পক্ষের জন্য ওকালতি করিতেছি এই ভাবে বলিলাম, দেখুন, ও-রকম যত্ন নেওয়া কি এক উপদ্রবে দাঁড়াবে না? গোড়ালি পর্যন্ত চুল নিয়ে জীবন কাটানো—খোঁপা ক'রে রাখলে তার ভারে মাথা ঠিক রাখা দায়, খুলে রাখলে পায়ে জড়িয়ে আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা।

ছোকরা বোধ হয় ঝোঁকের মাথায় নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অধোগতির বহর দেখিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িল। একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল, না, ও একটা এমনই জিজ্ঞাসা করছিলাম, কথায় কথায়। কি জানেন, আপনার কোন আত্মীয়ার সৌন্দর্যটুকু

যথাসাধ্য বাড়িয়ে যদি একটু উপকার করতে পারেন তো করেন না কি ? বললে শুনব কেন ? আপনারা, বাঙালীরা, তো এটা একটা কর্তব্যের মধ্যেই ধরেন।
সেই নেহাত গদ্যময় স্থানে, বেচা-কেনার হট্টগোলের মধ্যে রচিত নিভৃতে এই নূতন প্রণয়ীর মূঢ়তা, বিহ্বলতা বেশ মিষ্ট লাগিতেছিল। একবার ইচ্ছা হইল, একটি সুমিষ্ট প্রশ্নের আঘাতে কৃত্রিম অথচ স্বচ্ছ রহস্যটুকু ভাঙিয়া দিয়া ব্যাপারটিকে চরমে আনিয়া ফেলি ; শুধাই, আত্মীয়াটি কি ধরনের, অর্থাৎ সৌন্দর্য বাড়াইয়া উপকার করিলে উপকারটি আসলে কোথায় পৌঁছিবে বন্ধু ?
কি ভাবিয়া প্রশ্নটা আর করিলাম না।



ভালই করিয়াছিলাম।
পরের দিন কর্মে যোগদান করিলাম। প্রিন্সিপ্যাল রায় আমায় সমস্ত কলেজটি একবার ঘুরাইয়া লইয়া দ্বিতীয় বাৎসরিক শ্রেণীর ঘরে লইয়া গিয়া পরিচিত করাইয়া দিলেন ; এই ক্লাসেই আমার অধ্যাপনা শুরু।
ক্লাসটির উপর একবার চোখ বুলাইতে গিয়া হঠাৎ চতুর্থ বেঞ্চের এক জায়গায় আমার চক্ষু সেকেণ্ড কয়েকের জন্য নিরুদ্ধ হইয়া গেল। দেখি, একটি ছোকরা একদৃষ্টে আমার পানে চাহিয়া আছে ; চোখে জ্বলন্ত বিস্ময়, তাহাতেই যেন মাথার চিতাইয়া আঁচড়ানো চুল খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, মুখে ছোট্ট একটি গোল হাঁ, বাঁ হাতে কালো ফ্রেমের চশমা—শখের জিনিস, দৃষ্টিকে নিঃসন্দেহ করিবার জন্য যেন পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে।
কালকের সেই ছেলেটি, দোকানে যাহার সহিত পরিচয় হইয়াছিল। আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলাম।
রোল কল করিতে করিতে মনে হইল, যে ছেলেটি ৮৮-তে উত্তর দিয়াছিল, সে-ই যেন আবার ৯২-তেও সাড়া দিল। প্রক্সি। আন্দাজে কাহার প্রক্সি তাহাও বুঝিলাম, তবুও দৃষ্টি একবার চতুর্থ বেঞ্চে গিয়া পড়িল। দেখিলাম. সেই কেশবিলাসী ছেলেটির জায়গা খালি, হাজরির বন্দোবস্ত করিয়া কখন নিঃসাড়ে চলিয়া গিয়াছে।
৮৮ এবং ৯২-কে আর একবার ডাকিলেই প্রবঞ্চনাটা হাতে হাতে ধরা পড়িত ; কিন্তু তাহা আর করিলাম না। ভাবিলাম, যাক, আপাতত সেও যেমন বাঁচিয়াছে, আমিও তেমনই একটা প্রবল অস্বস্তির হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছি।



নির্বাসিত

রাত্রি প্রায় এগারোটা।

শহরের এ প্রান্তে আজ একটা ব্ল্যাক-আউট অর্থাৎ দীপ-নির্বাণ-পর্ব ছিল। ঘণ্টা দুয়েক ঘুটঘুটে অন্ধকারের পর এইমাত্র আলো জ্বালা হইয়াছে। শুধু আলো নিবানো নয়, সব রকম আওয়াজ পর্যন্ত চাপিয়া লোকেরা এক রকম জবুথবু হইয়া বসিয়া ছিল। আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে অবরুদ্ধ কলোচ্ছ্বাসটা আবার চতুর্গুণ বেগে জাগিয়া উঠিল। কলিকাতার এ চাকলাটাকে যেন রাহুতে গ্রাস করিয়াছিল, মুক্তির পর আবার উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে।

অম্বিকা গাঙুলী পার্কের ধারে ধারে ফুটপাথ দিয়া ঠুকঠুক করিয়া আসিতেছিলেন। মনটা অত্যন্ত অপ্রসন্ন, নিতান্ত একটা বাজে হুজুকে দাবা-খেলাটা আজ বন্ধ গেল। বিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম—এক হিসাবে। আর একবার বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল, কিন্তু এ রকম বাজে কাজ নয় বলিয়া ওরই মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিল। সেবার নেহাত তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। এক-আধ দিনের নয়, সাঁইত্রিশ বৎসরের পুরনো স্ত্রী,—এগারো বৎসরে বিবাহ করিয়াছিলেন, আটচল্লিশ বৎসরে গেলেন মারা। তবুও বাদ দিতেন না; 'হাঁ' 'না' করিতে করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন আড্ডায়; কিন্তু যাহার সঙ্গে দাবা-খেলা, সেই ভৈরব হালদার তাঁহার মৃতা পত্নীর জন্য এমন শোকাচ্ছন্নভাবে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল যে, তাহার উপর দাবা-খেলার কথা তোলা নিতান্ত কি রকম দেখাইত যেন। চক্ষুলজ্জা বলিয়াও একটা জিনিস আছে তো! তাহা ছাড়া, একটা অনিষ্ট যে ঘটিবেই, এই বিশ্বাসে আরও মনটা তিক্ত হইয়া আছে। কবে কে আসিয়া দুইটা বোমা ফেলিবে না-ফেলিবে, সেই ভয়ে এখন হইতে অন্ধকার করিয়া বসিয়া থাকিয়া এই রকম ভাবে চোর-ডাকাতদের সুবিধা করিয়া দিলে তাহারা দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিবে। আজ এই দুই ঘণ্টার মধ্যে কত কি হইয়া গিয়াছে নিশ্চয়, কালকের কাগজেই খবর পাওয়া যাইবে। কেন যে এই 'সুখে থাকতে ভুতে কিলোনো'!

শুধু তাই? আজকে আবার হল্যাণ্ডে প্যারাশুট বাহিয়া সৈন্য নামিবার যা সব খবর পাওয়া গেল, যদি এই অন্ধকারের সুযোগ লইয়া আকাশ হইতে—

চিন্তাটাকে জোর করিয়া এইখানেই স্থগিত রাখিয়া গাঙ্গুলী মশাই পা চালাইয়া দিলেন। মোটা মানুষ, দুশ্চিন্তায় পরিশ্রমে ঘামিয়া একশা হইয়া যাইতেছেন। বাড়ির গলির সামনে আসিয়া বড় রাস্তাটা পার হইলেন। গলিটার মুখটায় আলো একটু কম, দুই দিক হইতে দুইটা মাঝারি সাইজের গাছের ডালপালা গলির মুখটাকে একটু চাপিয়া দিয়াছে। একটা গাছের গুঁড়ির চারিদিকে তারের জাল দিয়া ঘেরা। পাশে একটা পানওয়ালা বসে, সে তারের জালের উপর একটা ছেঁড়া চট শুকাইতে দিয়াছে। সেইখানটা অন্ধকার একটু জমাট। পানওয়ালা ব্ল্যাক্-আউটের হিড়িকে দোকান বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। চটটা তুলিতে ভুলিয়া গিয়া থাকিবে।

রাস্তা পার হইয়া গলিটায় প্রবেশ করিবেন, তারের বেড়ার ও-পাশটায়, অর্থাৎ অন্ধকার দিকটায়, একটা হাঁচির আওয়াজ শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। অমন বেয়াড়া জায়গায় হঠাৎ হাঁচে কে? মনে হয়, গা-ঢাকা দিয়া আছে; অথচ হাঁচিল, যেন একটা বাজ পড়ার শব্দ হইল। বেড়াটার পাশ দিয়া চটের আড়ালে দৃষ্টি পড়িতেই চক্ষুস্থির! একটি অদ্ভুত ধরনের পোশাকপরা ষণ্ডাগুণ্ডা-গোছের মানুষ বেড়ার ঠিক পাশটিতে দুই হাঁটু তুলিয়া তাহার মধ্যে মাথাটা গুঁজিয়া হাঁটু দুইটা দুই হাতে জড়াইয়া বসিয়া আছে। মাথায় বিলাতী হেলমেট টুপির উপর কতকটা শুঁড়ের মত পিতলের কি একটা আঁটা, দেখিতে অনেকটা ফায়ার-ব্রিগেডের টুপির মত। গায়ের জামাটা একটু নূতন ধরনের। মিলিটারি কোট বা ওইরকম ধরনের কিছু নয়। খুব হালকা কোন একটা কাপড়ের হাতকাটা জামা, খাকী রঙের বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু বেশ ভাল রকম বোঝা যাইতেছে না। গলার কাছটা অনেকটা খোলা। এদিকে নামিয়াছে ঊরুর প্রায় আধাআধি, মাঝখানে একটা পটি।

লোকটা রাস্তার পানে মুখ করিয়া, অর্থাৎ গাঙ্গুলী মশাইয়ের দিকে পিছন ফিরিয়া, বসিয়া আছে। কোমরে কি পরিহিত, পিছন হইতে ঠিক বোঝা যায় না। একবার মনে হয়, হাফ-প্যাণ্ট; একবার মনে হয়, না, হাইল্যাণ্ডার গোরারা যেমন কতকটা ঘাঘরা-গোছের একটা জিনিস পরে, এও সেই রকম একটা কিছু। এসবের উপর কাঁধ হইতে নিচে পর্যন্ত একটা চাদরের মত ঝলঝল করিতেছে। কোমরে একটা খাপ ঝুলিতেছে, তাহাতে ছোরা আছে, কি পিস্তল আছে, বোঝা যাইতেছে না। প্রথমটা দারুণ বিস্ময় হইল, এ পোশাকই বা কোথাকার? এমনভাবে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া আছেই বা কেন, এই বেয়াড়া জায়গায় আর এই অসময়ে? গাঙ্গুলী মহাশয় দাঁড়াইয়া মুঠার উপর চিবুকটা চাপিয়া, লোকটার দিকে চাহিয়া একটু চিন্তা করিবার চেষ্টা করিলেন। সাড়া-শব্দ নাই। একটু গলা-খাঁকারি দিলেন। সাড়া-শব্দ নাই। এসব অঞ্চলে, এই সময় এক-একবার এমন হয় যে, দুই-চার মিনিট বোধ হয় লোকই থাকে না ফুটপাথে; কাহারও সঙ্গে যে একটা পরামর্শ করিবেন, তাহারও সুবিধা হইতেছে না। আর একবার গলা-খাঁকারি দিয়া কোন রকম শব্দ না পাইয়া দুই পা আগাইয়া দেখিতে যাইবেন, একটা কথা মনে পড়িয়া সমস্ত শরীরটা যেন একেবারে হিম হইয়া গেল। ঠিক

যা ভাবিয়াছেন তাই—নিশ্চয়, অকাট্য। গাঙ্গুলী মহাশয় অস্ফুটস্বরে নিজের মনেই বলিলেন, কি সব্বনাশ, এখানেও! খুব সন্তর্পণে দুই পা পিছাইয়া সরিয়া আসিলেন এবং আর একবার ঘাড় বাঁকাইয়া মূর্তিটিকে দেখিয়া লইয়া হনহন করিয়া পা চালাইয়া দিলেন। শুধু পিছন ফিরিয়া এক-একবার দেখা, তারপর যত জোরে পা চলে—। মুখে এক-একবার শুধু অস্ফুট—'কি সব্বনাশ, এখানেও!' শেষে তাহাতেও হইল না, অর্থাৎ আরও খানিকটা হাঁটিয়া যে একেবারে বাড়ি গিয়া উঠিবেন, সে সাহসটুকুও অবশিষ্ট রহিল না। ছকড়ির ডিস্পেন্সারিটা খোলা দেখিয়া আর একবার পিছনে দেখিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ঢুকিয়া পড়িলেন।

ছকড়ি আর কম্পাউন্ডার দ্বারিকবাবু একই সঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, কি, গাঙ্গুলীকাকা যে, ব্যাপার কি? এ রকম হন্তদন্ত হয়ে? এত রাত্তিরে?

নেমেছে!—বলিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় একেবারে কাউন্টারের ও-পাশে গিয়া বলিলেন, নেমেছে, শীগগির দোর বন্ধ ক'রে দাও, সবগুলো।

নেমেছে কি কাকা?

গাঙ্গুলী মহাশয় একটা ডেক-চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া বিরক্তভাবে বলিলেন, কি? প্যারাশুট! নাববে না? তাদের সুবিধে ক'রে দিলে তারা নাববে না? নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে তারা তোমাদের মত? কর ব্ল্যাক-আউট—

দুইজনে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, প্যারাশুট! কোথায় কাকা?

ছকড়ি প্রশ্ন করিল, জার্মান প্যারাশুটিস্ট?

গাঙ্গুলী মহাশয় খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন, জার্মানরা এতদূর কি করতে আসবে? ইটালিয়ান। বম্বের কাছে 'পাঠান' জাহাজটাকে কি জার্মানরা ডোবাতে এসেছিল? কিন্তু তুমি আগে দোর-জানলাগুলো বন্ধ ক'রে দাও দ্বারিক। নাঃ, কি দরকার ছিল এ ব্ল্যাক-আউটের বল তো?

ব্যাপারটার আকস্মিকতায় এবং গাঙ্গুলী মহাশয়ের অবস্থা দেখিয়া ইহারা ঘাবড়াইয়া গিয়াছে অনেকটা। দ্বারিকবাবু দুয়ারটা বন্ধ করিতে উঠিয়া মুখ বাড়াইয়া একবার বাহিরে চাহিয়া লইয়া বলিলেন, রোঁদের পুলিস আসছে।

দুইজনের মুখে একটু ভরসার ভাব ফুটিল। ছকড়ি বলিল, ডাকুন।



গাঙ্গুলী মহাশয় আর গেলেন না, জায়গাটা বুঝাইয়া দিয়া দ্বারিকবাবুর সঙ্গে দোকানে বসিয়া রহিলেন। ছকড়িকে বলিয়া দিলেন, বেশি কাছে যেও না, বেশি ঘাঁটিও না।

আগে দেখ, দেখাই পাও কি না! সেদিনে দেখলে তো খবরের কাগজে, ওদের প্রত্যেকটি লোকের কাছে সাইকেল থেকে আরম্ভ ক'রে তাঁবু, রেডিও, মেশিনগান কিছুই বাদ থাকে না। আর যদি পাওই দেখা, তো যা বলে মেনে নিও বাপু, কাজ কি।

দূরে হইতেই দেখা গেল, গলির মোড়ে ছোটখাটো একটি ভিড় জমিয়াছে। তাহাদের মধ্য দিয়া পুলিস ছকড়ির সঙ্গে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

পুলিস আসিতেই নালিশে ব্যাখ্যানে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। টের পাওয়া গেল—লোকটা কি জাতি, কিই বা উদ্দেশ্য তাহার কিছুই টের পাওয়া যায় নাই, তবে এইটুকু পর্যন্ত জানা গিয়াছে যে, মাতাল। লোকেরা চারিদিক হইতে নানা রকম প্রশ্ন করিলে কোন উত্তর না দিয়া ওই রকম গোঁজ হইয়া বসিয়া থাকে। তখন পিছনে কোথা হইতে একটি ছোট্ট কাঁকর আসিয়া তাহার পিঠে পড়ে। ইহাতে লোকটা একেবারে ক্ষেপিয়া যায় এবং এলোপাতাড়ি সবাইকে পিটিবার চেষ্টায় কয়েকবার নিজেই গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িয়া আবার পূর্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া ওইভাবে বসিয়াছে। জাঁদরেল চেহারা আর অদ্ভুত সাজগোছ দেখিয়া কেহ আর কাছে যাইতে সাহস করিতেছে না।

পুলিস একটু দূরে হইতেই একবার ঝুঁকিয়া, একবার সিধা হইয়া, ডাইনে বাঁয়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর বীরের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, কৌন্ মুলুককা আদমি হ্যায়, কুছভি মালুম নহি কর্ সকা?

উত্তর হইল, কি ক'রে মালুম হবে? ওই একভাবে সেই থেকে ব'সে আছে, জিজ্ঞেস করলে না উত্তর দেয়, না কিছু, ক্রমেই মাথাটা যেন কোলে গুঁজড়ে যাচ্ছে।

ছকড়ি প্রশ্ন করিল, যখন উঠে মারতে এসেছিল, তখন কি ভাষায় গালাগালি করেছিল শোনেন নি একটু খেয়াল ক'রে?

লোকটা বিস্মিতভাবে মুখের পানে চাহিয়া বলিল, তাই কি পারে মশাই কেউ? সে মোদো মাতাল, ছোরা নিয়ে তাড়া করছে—সেদিকে লক্ষ্য না রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে তাই বিভোর হয়ে শুনব? আপনি যে অবাক করলেন!

ছকড়ি লোকটার পানে কটমট করিয়া একবার চাহিল। অন্য একজনকে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, যখন উঠেছিল, হাতে ভাঁজ-করা ছাতার মত কিছু ছিল?

বিস্মিত প্রশ্ন হইল, ভাঁজ-করা ছাতা?

হ্যাঁ, যা নিয়ে আকাশ থেকে নামা যায়?

আজ্ঞে না মশাই, এমন কিছু দেখি নি। কই, তোমরা কেউ দেখেছ নাকি হে?

হেল্‌মেট হ্যাটের দিকে দেখাইয়া বলিল, মাথায় ওই ছাতার মত একটা টুপি আছে, ওটা মাথায় দিয়ে আকাশ থেকে নামা যায় তো বুঝুন।

বোধ হয় অদ্ভুত-অদ্ভুত প্রশ্ন করিতেছে দেখিয়া একটু সন্দিগ্ধভাবে ছকড়ির পানে আড়চোখে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি করেন?

ছকড়ি তাহার দিকেও এবার কটমটভাবে চাহিয়া পুলিসটাকে কি বলিতে যাইতেছিল,

একটি ছোকরা আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, হ্যাঁ মশাই, আপনি কি বলতে চান,—এরোপ্লেন থেকে প্যারাশুট ধ'রে নেমে এসেছে ?

ছকড়ি বলিল, আপনাদের কি সন্দেহ আছে ?

ছোকরা পিছাইয়া একটু ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। প্রশ্ন করিল, কিন্তু প্যারাশুট কোথায় ? আর ওদের সঙ্গে তো ভাঁজ করা সাইকেল, রেডিও-সেট, তাঁবু, মেশিনগান—আরও কি কি সব থাকে ? সেদিন খবরের কাগজে ছবি দেখলাম।

ভিড় আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং ছকড়ির চারিদিকে চাপ বাঁধিয়া উঠিয়াছে। প্যারাশুটের ব্যাপারটা বোঝে কয়েকজন ; যাহারা বোঝে না, তাহারা বুঝিয়া লইয়া শঙ্কিতভাবে নানা রকম জল্পনাকল্পনা করিতে লাগিল। যেমন কিছু কিছু লোক খসিতে লাগিল, তেমনই মুখে মুখে কথাটা প্রচার হইয়া তাহার চেয়ে অধিক লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। লোকটা যে প্যারাশুট হইতে অবতরণ করিয়াছে—এ সম্বন্ধে অল্প লোকেরই সন্দেহ রহিল। একজন তারের বেড়ায় ছড়ানো চটটাই প্যারাশুট বলিয়া অভিমত দিল ; একজন বলিল, অন্তত প্যারাশুটের একটা অংশ হইতে পারে। সবাই যে বিশ্বাস করিল এমন নয়, তবে যাহারা বিশ্বাস না করিল, তাহারাও বেশ খানিকটা দূরে সরিয়া গিয়া ইহাদের প্যারাশুট সম্বন্ধে গভীর অজ্ঞতা লইয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। মোট কথা, নানা রকম আন্দাজী অভিমতে, শঙ্কিত বিদ্রূপে জায়গাটা গমগম করিয়া উঠিল।

রোঁদের পুলিস লাঠি দিয়া দূর হইতে চটটাকে পরীক্ষা করিতে যাইতেছিল, একজন বলিল, ওসব কিছু ছুঁয়ে-টুঁয়ে কাজ নেই সিপাহীজী, ওদের কোন্‌খানে কি নুকুনো আছে ! বোধ হয় ওর মধ্যে থেকেই নাড়া পেয়ে একটা বোমা খ'সে প'ড়ে রাস্তা, বাড়িঘরদোর, মানুষ—স—ব—

পুলিস লাঠিটা সরাইয়া লইল। লোকটা বলিল, হ্যাঁ, কাজ নেই, আমি বলছিলাম, থানায় একটা টেলিফোন—

একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল, থানার চেয়ে একেবারে লালবাজারে—

একজন গলা বাড়াইয়া বলিল, সবচেয়ে ভাল হয় একেবারে কেল্লায় ফোন ক'রে দেওয়া—Come at orce with—

ছকড়ি প্রশ্ন করিল, টেলিফোন এখানে আছে কারও বাড়ি ?

ফোন একটু দূরেই তেতলা বাড়িটাতে আছে, কিন্তু দেবে কি ব্যবহার করতে ?

পুলিস বীরদর্পে পা বাড়াইয়া বলিল, আলবত দেগা।

খানিকটা ভিড় সমেত কয়েক পা অগ্রসর হইয়াছে, একটা চ্যাংড়াগোছের ছোকরা বুড়া আঙুল চুষিতে চুষিতে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া সামনে আসিয়া বলিল, জমাদারসাহেব, লোকটা 'ওফ' করে একটা আওয়াজ করলে এই মাস্তোর।

ভিড়ের মুখ আবার ফিরিল, পুলিস প্রশ্ন করিল, কোন্‌ ভাখামে ?

'ওফ' শব্দটা বিশেষ কোন্‌ ভাষার খাস সম্পত্তি বুঝিতে না পারিয়া ছেলেটা থতমত

খাইয়া গেল। বুড়া আঙুল চোষা বন্ধ করিয়া একটু যেন চিন্তা করিয়া বলিল, হিন্দীতে। আবার কাঁদছেও যেন।

একজন লোক প্রশ্ন করিল, কাঁদছেও হিন্দীতে?

ছেলেটা বলিল, হুঁ, ফোঁপাচ্ছে।

ফোঁপাইতেছে এমন আসামীকে পুলিসে কখনও ভয় করে না; লাঠিটা ঘাড়ে ফেলিয়া বলিল, চলো, দেখি।

ছোঁড়াটা আগে, তাহার পিছনে পুলিস, তাহার পিছনে ছকড়ি, ভিড়ের আর সবাই আগে পিছে। ছোঁড়াটা একেবারে সামনে গিয়া নিজের হাঁটুতে দুই হাতে ভর দিয়া লোকটার সামনে নিচু হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ঘাড়টা বাঁকাইয়া আরও নিচু করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল, এখনও বোধ হয় কাঁদছে।

তাহার সাহস দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল এবং লোকটা কিছু করিল না দেখিয়া আরও বিস্মিত, খানিকটা আশ্বস্ত এবং বেশ খানিকটা লজ্জিত হইল। পুলিস ছোঁড়াটার পাশে আসিয়া প্রশ্ন করিল, এই, তুম কোন্ হ্যায়, কাঁহা রহতা হ্যায়?

কোন উত্তর হইল না; তবে লোকটা মাথা তুলিল একটু। তখনই অবশ্য নামাইয়া লইল; কিন্তু যাহারা কাছে ছিল, উহারই মধ্যে মোটামুটি এক রকম দেখিয়া লইল। রাঙা টকটকে মুখ, গোঁফদাড়ি কামানো, হেল্‌মেট টুপির নিচে কয়েকটা কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছ—যাহাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ন তাহাদের মনে হইল, চুলের রঙটা একটু যেন পিঙ্গল।

মোট কথা, প্যারাশুট লইয়া নামুক আর নাই নামুক, লোকটা যে ভিন্‌দেশী এবং ইউরোপীয়, সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। সাহস বাড়িয়া যাওয়ায় একটি লোক তারের বেড়ার চটটাও টানিয়া লইল। না, সেটাও প্যারাশুট নয়, কাপড়ের যাহাতে গাঁটরি বাঁধা হয় সেই রকম নিরীহ আটপৌরে চটই। পুলিসও দেখিল।

আরও কড়া সুরে হুকুম হইল, বোলো, কৌন হ্যায় তুম, কাঁহা ঘর হ্যায়?

লোকটা হঠাৎ আর একবার মুখটি তুলিয়া স-কারবহুল কি একটা কথা যেন বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শেষ করিবার পূর্বেই ঘাড়টা আবার লুটাইয়া পড়িল, এবং কথাটা ক্রমেই অস্ফুট হইতে হইতে মুখে মিলাইয়া গেল।

একটি মাঝবয়সী ভদ্রলোক আগাইয়া আসিয়া ইংরেজীতেও নানা ভাবে প্রশ্ন করিল। কোন উত্তর নাই।

ছকড়ি বলিল, ওতে হবে না, একে ভাষা বুঝতে পারছে না, তায় বেজায় মদ খেয়ে রয়েছে। ওকে থানায় নিয়ে চল। কাল ধাতস্থ হ'লে কোন জার্মান বা ইটালিয়ান কয়েদী ধ'রে নিয়ে এলেই বাছাধনের জাতকুল বেরিয়ে পড়বে। তবে আমি ব'লে দিচ্ছি, ও ইটালিয়ান, আগেকার গ্রীক-রোমানদের মত পোশাক ওর। আমার মনে হচ্ছে যে, মদ খাওয়া ওর একটা ভান মাত্র; অন্ধকারের সুযোগে ঘুরে ঘুরে সন্ধান

নিচ্ছিল, আলো জবালা মাত্রই একটু আড়াল দেখে ব'সে পড়েছে। যা হোক, নিয়ে চল' থানাতেই।
না যেতে চায়, বেঁধে নিয়ে চল, দড়ি সঙ্গে আছে ?
আশ্চর্য, পুলিস ধরিয়া তুলিবার সময়ও লোকটা কোন বেগ দিল না। শুধু গভীর শোকের একটা বুকভাঙা 'ওফ' শব্দ করিয়া বুকের উপর মাথাটা গুঁজিয়া দিল। পুলিস তাহার মাথার হেলমেট টুপিটা খুলিয়া লইতে যাইতেছিল, ছকড়ি তাড়াতাড়ি বারণ করিয়া উঠিল, বলিল, থাক্ জমাদার-সায়েব, ওদের হ্যাটের ভেতরই যে কি অস্ত্র লুকুনো আছে বলা যায় না, বোধ হয় তুললেই একটা দুম ক'রে শব্দ হয়ে সমস্ত ভিড় পরিষ্কার ক'রে দেবে ; যেমন আছে থাক্ আপাতত।
কয়েদী লইয়া ভিড়টা আবার সচল হইল। নিতান্ত কৌতূহলবশেই দুই-একজন সেই ডানপিটে চ্যাংড়াটার খোঁজ লইল ; কিন্তু তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না।



থানার ফটকের বাহিরে ভিড়টাকে আটকাইয়া দিয়া তিনজনে থানার মধ্যে প্রবেশ করিল —পুলিস, কয়েদী এবং ছকড়ি। অফিস-ঘরে দারোগাবাবু একটা সবুজ শেড দেওয়া টেবিল-ল্যাম্পের সামনে বসিয়া মাথা গুঁজিয়া একরাশ জরুরী কাগজপত্র লইয়া ব্যস্ত আছেন, পুলিস গিয়া এত্তালা দিল—একটা বিদেশী মাতাল রাস্তায় বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া ছিল, ধরিয়া আনা হইয়াছে।
মোটাসোটা, ঢিলাঢালা-গোছের খুব পুরানো দারোগা ; নূতন রায় সাহেব হইয়াছেন, সাহেব মাত্রকেই বেশ একটু সম্ভ্রমের চোখে দেখিতে হয়। কথা বলেন মেজাজের তারতম্য অনুযায়ী—বাংলা, হিন্দী কিংবা ইংরেজীতে ; মেজাজটা উষ্ণ-শৈত্য মিশ্রিত থাকিলে ভাষাও দেন মিশাইয়া। একটু শঙ্কিতভাবে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, বিদেশী মানে ? সায়েব ? অংরেজ ?
উত্তর হইল, না, ইংরেজ নয়, তবে কটা চামড়া বটে। কোথাকার লোক তাহা টের পাওয়া যাইতেছে না। একে মদ খাইয়া আছে ; তায় ভাষা যেন একেবারেই এক নূতন ধরনের। প্রশ্ন করিলে উত্তরও দিতেছে না, এক-আধটা কথা ফসকাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।
দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, পোশাক কি রকম ?
পুলিস পোশাক যথাযথ বর্ণনা করিল। দারোগা একবার কাগজের রাশির উপর দৃষ্টি বুলাইয়া খানিকটা ক্লান্তি আর বিরক্তির সহিত বলিলেন, লে আও সামনে।

পুলিস জানাইল, একজন বাঙালী ডাক্তারবাবুও সঙ্গে আছেন। সে বলে, লোকটা বোধ হয় আকাশ হইতে নামিয়াছে।

একে কতকগুলো দরকারী কাজের মধ্যে নূতন উপদ্রবে মনটা খিঁচড়াইয়া গিয়াছে, তাহার উপর এই আজগুবি কাহিনীর অবতারণা,—প্রায় এই সময়েই আবার খবরের কাগজেরা একটা গাঁজাখুরি চালাইয়াছে যে, উত্তর-বেহারে কোথায় নাকি মৎস্য-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। দারোগা রাগিয়া বলিলেন, যো এসা বোলতা হ্যায় ওভি দারু পিয়া, উসকোভি ঠাণ্ডি গারদমে দেও।

কয়েদী প্রবেশ করিতেই শেডটা ঘুরাইয়া দিয়া দারোগা তাহার উপর আলো ফেলিলেন; হেলমেটের সোনালী চক্রটা ঝকঝক করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ তো মুখে কথাই ফুটিল না। তাহার পর অনেকবার ভাল করিয়া আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া ইংরেজীতে প্রশ্ন করিলেন, কি জাত তুমি? রাস্তায় কি করছিলে?

নির্বাক, নিস্পন্দ। পা দুইটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া, উভয় বাহুতে বুকটা জড়াইয়া বীরের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে। শুধু মাথাটা বুকের উপর গোঁজা। মুখের গৌরবর্ণ সুরার উচ্ছ্বাসে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। আচ্ছা ফ্যাসাদ তো! প্রশ্ন হইল অবশ্য ইংরেজীতেই।—

কি নাম তোমার? বাড়ি কোথায়?

সেই চাপা গোঁজড়ানো কণ্ঠে মাতালের চাপা উচ্চারণে একটা শব্দ হইল, যেটা বাংলায় কতকটা গিরীশ-এর মত শুনিতে। যেন গ-এ, র-এ, শ-এ জড়াইয়া জিবে মিলাইয়া গেল। দারোগা মনোযোগের ভঙ্গীতে ঘাড়টা বাড়াইয়া আবার প্রশ্ন করিলেন; কিন্তু কোন উত্তর হইল না। কি ভাবিয়া একবার বাংলাতেও প্রশ্ন করিলেন, কোন উত্তর নাই; হিন্দীতে,—তথৈবচ। তখন ভাষা ছাড়িয়া সংকেত ধরিলেন, ইটালিয়ান? জার্মান? ফ্রেঞ্চ? রাশিয়ান? যুগোশ্লাভ?

হাল ছাড়িয়া দিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন, ভ্যালা ফ্যাসাদে পড়া গেল তো!

পুলিসটাকে বলিলেন, নিযে যা এঁকে লক-আপে; থাক্, লক-আপে কাজ নেই, কেরানিবাবুকো ঘরমে বৈঠা রাখো। একঠো আরাম-কুর্সি 'পর লেটা দেও। বাঙালী-বাবুকো বোলাও।

ছকড়িকে ডাকিয়া আনিল।

প্রশ্ন হইল, কি করেন আপনি?

ডাক্তারি।

বলেছেন—আকাশ থেকে নেমেছে লোকটা?

ঠিক আমি বলি নি, দু-একজন আন্দাজ করেছিল।

আপনি যান, তাদের মাথার চিকিৎসা করুন গিয়ে। আচ্ছা, আসুন তা হ'লে।

নমস্কার।

কলমটা তুলিয়া কাগজে মাথা গুঁজড়াইয়া দিলেন।

ছকড়ি একটু অপ্রতিভ হইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় অন্য একজন পুলিস আসিয়া এত্তালা দিল, মোটরে করিয়া জন পাঁচেক লোক আসিয়াছে, খুব জরুরী দরকার, দেখা করিতে চায়। দুইজন আওরৎও সঙ্গে আছে।

দারোগাবাবু বিরক্তভাবে বলিলেন, ভ্যালা ফ্যাসাদ! ক্রমাগতই—আচ্ছা, জরুরী কাম তো থোড়া বইঠ্‌নে কহো।

পুলিসটা বলিল, আওর সবকা পোশাক, হুজুর, ইস মাতোয়ালা সাহেবকা মাফিক হ্যায়।

দারোগা বিস্মিতভাবে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, মাতাল সায়েবটার মত পোশাক? যাও, বোলা লে আও।

প্রথম পুলিসটাকে বলিলেন, যাও, মাতোয়ালা সাহেবকো লে আও তুম।

লোকটাকে আনা হইলে সে আবার হৃতসম্মান বীরের ভঙ্গীতে ঈষৎ টলিতে টলিতে আসিয়া দাঁড়াইল—মাথা নিচু করিয়া।

পুলিসের সঙ্গে আগন্তুক তিনজন প্রবেশ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, দিব্যি বাওয়া! আর আমরা ও-দিকে—

টেবিলের উপর একটা রাশভারী ঘুঁষির শব্দে তাহাদের চৈতন্য হইল যে, তাহারা থানায়—খোদ দারোগার সামনে। একটু জড়সড় হইয়া দারোগাবাবুকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল তিনজনে। দেখা গেল, একটা চ্যাংড়াও ইহাদের পিছনে আসিয়া বারান্দার কপাটের পাশটিতে দাঁড়াইয়া চকচক করিয়া বুড়া আঙুল চুষিতেছে। পুলিসের তাড়া খাইয়া দেওয়ালের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দুইজনের পোশাক মাতাল সাহেবটার অনুরূপ, শুধু মাথায় হেল্‌মেট হ্যাট নাই। অপরজনের পোশাক একটু অন্য ধরনের, কোমরে নানা রকমে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরা একটা রঙিন সিল্কের শাড়ি, গায়ে একটা রঙিন ফতুয়া, কানে কুণ্ডল, হাতে বাজুবন্ধ—থিয়েটার-পরিচালকদের মতানুযায়ী আমাদের রাজ-রাজড়ারা আগে যেমন কিম্ভুত-কিমাকার একটা সাজ করিতেন, অনেকটা সেই রকম। আওরৎ যাহারা সঙ্গে আসিয়াছে বলিয়া টের পাওয়া গিয়াছিল, তাহারা নামে নাই, মোটরেই আছে। চল্লিশ বৎসরের ঘটনাবহুল চাকরির মধ্যে এমন অভিজ্ঞতা কখনও হয় নাই। নিতান্ত বিমূঢ়ভাবে দারোগা একবার এদিকে, একবার ওদিকে চাহিয়া আগন্তুকদের প্রশ্ন করিলেন, ব্যাপার কি? বাঙালী? তবে যে আমি তখন থেকে ইটালিয়ান, কি ফ্রেঞ্চ, কি রাশিয়ান—জিজ্ঞেস ক'রে হয়রান হচ্ছি?

এ প্রশ্নের সদুত্তর উহারা কেহই দিতে পারিল না।

একজন বলিল, স্যার, আমরা থিয়েটার করছিলাম—চন্দ্রগুপ্ত—ডি এল. রায়ের চন্দ্রগুপ্ত। ছকড়ি, পুলিস, দারোগা সকলেই একবার যেন নূতন দৃষ্টিতে কয়েদী আর আগন্তুকদের পানে চাহিল। দারোগা চক্ষু দুইটা বড় বড় করিয়া বলিলেন, থিয়েটার হচ্ছিল? হুঁ, তাই তো দেখছি। তা এতদূর পর্যন্ত গড়াল কি ক'রে?

—গেরো স্যার, তবে আর বলছি কি! মদনকে দেওয়া হয়েছিল গ্রীক সেনাপতি

অ্যান্টিগোনাসের পার্ট। প্রথম অঙ্কের প্রথম সীনেই আলেকজেন্দারের সামনে বেয়াদবি করার জন্যে আলেকজেন্দার নির্বাসিত ক'রে দিলে না স্যার? সেই যে স্টেজ থেকে ঘাড় হেঁট ক'রে বেরিয়ে এসে কোথায় সরল সবার চোখে ধুলো দিয়ে, আর পাত্তা নেই। খোঁজ খোঁজ রব উঠে গেল। একটু পরেই টের পাওয়া গেল, সেই বেশেই চরণ সা'য়ের দোকানে ঢুকে এক পাঁট মদ সাফ করেছে। তার পরে যে কোথায় গেছে, কেউ বলতে পারলে না। থিয়েটার তো মাথায় উঠল স্যার, পরের ছেলে, তায় আবার নেশাখোর, দেখছেনই সামনে। চারিদিকে লোক ছুটিয়ে দেওয়া হ'ল। প্লে ছাই হবে; বলুন স্যার, এ অবস্থায় ফিলিং আসে? সেকেণ্ড অ্যাক্টে আলেকজেন্দারকে অ্যান্টিগোনাসের পার্ট দিয়ে কোন রকমে চাপাচুপি দিয়ে চালাচ্ছি, এমন সময় ওই ছোঁড়াটা গিয়ে হাজির। দেখতে যে রকমই হোক, দেবদূত স্যার, বাঁচিয়েছে আমাদের —কোথায় গেলি রে ছোঁড়া, সামনে এসে দাঁড়া। একেবারে স্টেজে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা স্যার—। 'আপনাদের সব প্লেয়ার ঠিক আছে? সব গ্রীক প্লেয়ার?'—প্রথমটা মনে হ'ল নকুই। ঘরের গলদ কে প্রকাশ করতে চায় স্যার? আবার ভাবলাম, না; পরের ছেলে, ব্লাক-আউটের পর হুড়মুড়িয়ে ট্র্যাফিক আরম্ভ হয়ে গেছে; মোটর চাপাই পড়বে, কি ট্রাম চাপাই পড়বে। বললাম, অ্যান্টিগোনাসকে নির্বাসিত করবার পর আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বললে, ভাবতে হবে না, সে থানায় আছে। শুনতে দেরি স্যার, ট্যাক্সি ক'রে চ'লে আসছি, পোশাক ছাড়বারও তর সয় নি স্যার। ছায়া আর হেলেন সঙ্গে এসেছে, মোটরে আছে। ছায়া আবার ওর মেসো স্যার, মানে—মদনা হচ্ছে ছায়ার শালী-পো।—এই স্যার ব্যাপার সংক্ষেপে। এখন দয়া ক'রে ছেড়ে দিন গরিবের ছেলেকে। অনেক কষ্টে ওর বাপকে রাজি করেছিলাম, ছাড়তে চায় না; বলে, ছেলেকে আমার বকিয়ে দেবে তোমরা! বুঝুন স্যার! ওকে আমরা বকাব! এখনও দশ বছর ওর পায়ের তলায় ব'সে শিখতে পারি। এবারটা দেন খালাস, এই স্যারের সামনে নাক-কান মলছি, ও ছেলেকে আর কখনও—আর তুইও যে মদনা, মদ গিলে রাস্তায়—

মদনা একটু একটু টলিতেছিল, সামলাইয়া সিধা হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়া এতক্ষণে মুখ খুলিল। রক্তজবার মত চক্ষু দুইটি পিটপিট করিয়া টানিয়া টানিয়া বলিল, মদনার হিসাব ঠিক আশে শম্রাট। নির্বাসিত হয়ে বেরিয়ে এসে লজ্জায় অপমানে মুখ নিচু কর্‌রে বশুশে ছিল; রামচন্দ্রের মত বেহায়া নয় তো যে বুক ফুলিয়ে টহল দিয়ে বেরড়াবে। জিজ্ঞেস কর্‌র ডাক্তারবাবুকে, জিজ্ঞেস কর্‌রে জমাদার শায়েবকে, কোন খুঁত পেয়েশুল পার্ট করার মধ্যে? ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অ্যান্টি-গোনাস স্পিকটি নট। নির্বাসিত গ্রীকসেনাপতি বাওয়া, লজ্জায় অধোবদন হয়ে বশুশে আছি; দণ্ড তুলে নাও, শুড়শুড় ক'রে আবার উঠব গিয়ে। এই, এ'কে বলে পার্ট করা, বুজরুকি কর্‌রে বেছে বেছে রাজা-উজিরের পার্ট নিয়ে চেয়ার ঘামালেই হ'ল না। চল এবার। তা হ'লে আশুশি দারোগাবাবু, গুন্নাইট স্যার।



উপবাসী

রূপচাঁদ রাস্তার ধারে একটা শুকনো গুঁড়ির উপর পা দুইটা গুটাইয়া বসিয়া চিন্তিতভাবে একটা চোরকাঁটার শীষ দাঁতে খুঁটিতেছিল। আজ সকাল হইতেই তাহার মনটা বড় অপ্রসন্ন। তাহার কারণ বোসেদের মেয়ে নেড়ীর আজ বিবাহ। পাকাদেখার দিন হইতেই সে সমস্ত ভণ্ডুল করিবার মতলব আঁটিতেছে, কিন্তু কিছুই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। কাল গায়ে-হলুদটা হইয়াই গেল। আজ রাত্রে বিবাহ, একটু পরেই, এই সাড়ে দশটার গাড়িতে বর আসিবে ; এই পথ দিয়া বাজনা-বাদ্য করিয়া যাইবে। নিতান্ত অপ্রীতিকর বস্তুর যে একটা নিগূঢ় মোহ থাকে তাহারই টানে রূপচাঁদ পথের উপরটিতে আসিয়া বসিয়া আছে।

কাজিপাড়ার রহমৎ আসিয়া পাশটিতে বসিল। চুপ করিয়া খানিকটা পা দুলাইয়া, তাহার পর প্রশ্ন করিল, "কিছু উপায় ঠাওরাতে পারলি রে রূপো ?"

রূপচাঁদ ঠোঁট আর নাক একত্র করিয়া মাথা নাড়িল,—না, পারে নাই। রহমৎও—বোধ হয় সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ—একটা চোরকাঁটার শীষ তুলিয়া লইয়া দাঁতে খুঁটিতে লাগিল। খানিকক্ষণ নীরবেই গেল, তাহার পর ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, তোদের দু-জনের মধ্যে কি খুব বেশি ভালবাসা হয়েছিল ?"

রূপচাঁদ এবারেও কথা কহিল না, মাথা নাড়িয়া জানাইল—হ্যাঁ।

রহমৎ কথাটাতে একটু টান দিয়া গভীর দুশ্চিন্তার সহিত বলিল, "তবেই তো !" আবার শীষ চিবাইতে লাগিল।

একটু পরে গুঁড়িটার উপর গুটাইয়া-সুটাইয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা একটা কথা জিগ্যেস করব, বলতে আপত্তি আছে ? মানে, বিয়ের কথা হবার পর তোকে কিছু বলেছিল কি ?—যেমন ধরু, বিষ খেয়ে মরব, কি গলায় দড়ি দোব ? ··তা যদি বলে থাকে তো···"

রূপচাঁদ বলিল, "কিছুই বলে নি।"

রহমৎ কপালে চোখ তুলিয়া বলিল, "কিছুই বলেনি !—তবে তো আরও ভাবনার কথা। তোর ঘাড়ে শেষ পর্যন্ত একটা স্ত্রীহত্যার পাপ না চাপে !···"

রূপচাঁদ চোরকাঁটার শীষটা সরাইয়া লইয়া খানিকটা উদ্বেগের সহিতই প্রশ্ন করিল, "কেন?"

রহমৎ এখানে ছোকরা-মহলে প্রেম সম্বন্ধে এক বিশেষজ্ঞ। বয়সের অনুপাতে বাংলা নভেলে তাহার জ্ঞান খুব সুগভীর, তাহা ভিন্ন বাড়িতে ফারসী ভাষার একটু-আধটু চর্চা থাকায় বুলবুল, বাগিচা থেকে আরম্ভ করিয়া লয়লা-মজনু প্রভৃতি পশ্চিম-সীমান্তের ওদিককার ব্যাপারের সঙ্গে তাহার এক রকম সাক্ষাৎ-পরিচয় আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। বলিল, "যদি সত্যিকার ভালবাসা হয়—মানে, সে যদি সত্যিই লয়লা হয় আর তুই যদি সত্যিই মজনু হোস্ তো যে-মুহূর্তে তোদের প্রথম চোখোচোখি হয়েছিল সেই মুহূর্তেই চোখের রাস্তা দিয়ে তোর দিল্ ওর দিলের কাছে গিয়ে তার গার্জেন হয়েছিল—যাকে ফার্সীতে বলে ফিরস্তা। তা হ'লে হ'ল না? তোকে না পেয়ে ও যদি সত্যি একটা কিছু ক'রে বসে তো তোর গুনাহ্ অর্থাৎ পাপ লাগল না?"

রূপচাঁদ অত্যন্ত গুরুতর কিছু একটা আশঙ্কা করিয়াছিল, কতকটা নিশ্চিন্তভাবে বলিল, "বয়ে গেল।"

রহমৎ এত বড় একটা তত্ত্বকথার পর নায়কের মুখে এরূপ গ্রাম্যতাদুষ্ট মন্তব্য শুনিয়া নিশ্চয় খুবই ক্ষুণ্ণ হইল। বিরক্তির সাহিত বলিল, "তাহ'লে তোর ইশ্‌ক্ খাঁটি নয়, শুধু ভড়ং করছিস, যাঃ।"

রূপচাঁদ প্রশ্ন করিল, "ইশ্‌ক্ কি?"

রহমৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঘাড়টা তাহার দিকে ঝুঁকাইয়া অনেকটা ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "ইশ্‌ক্ হচ্ছে—প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা,—আশীকের জন্যে নিজেকে মিটিয়ে দেওয়া,—যা ছিল লয়লা আর মজনুর মধ্যে—যা ছিল জাহাঙ্গীর আর নূরজাহানের মধ্যে—যার মাঝখানে দাঁড়াতে গিয়ে শের আফগানের প্রাণ গেল,—যা ছিল আয়েষা আর জগৎ-সিংহের মধ্যে—যার হাহাকার দেখতে পাবি শরৎবাবুর দেবদাসে···তুই ঘাস চিবো ব'সে ব'সে।···"

হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। খানিকটা অগ্রসর হইতে রূপচাঁদ ডাক দিল, "রহমৎ, শোন্।"

অনেকটা অনিচ্ছার সহিত রহমৎ ফিরিয়া আসিল। তখনও রাগটা লাগিয়া আছে, বলিল, "তোর এসবে হাত দেওয়া ঠিক হয় নি। হুটোহুটি মারামারি ক'রে বেড়াস; ঐ নিয়েই থাকা উচিত ছিল।···কেন ডাকছিলি?"

"একটা গাধা জোগাড় করতে পারিস্?"

রহমৎ একদৃষ্টে রূপচাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বোধ হয় ভিতরে ভিতরে আশা করিয়াছিল হতাশ প্রেমের ধাক্কায় বেচারি পাগল হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার আর কোন নিদর্শন না পাইয়া সহজ বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করিল, "কেন, গাধা কি হবে? হঠাৎ গাধা?"

"বর শুনছি রমজানের গাড়ি ক'রে আসবে। কাল নতুন ক'রে রং করছিল, জিগ্যেস করলাম তো বললে…"

"গাড়িতে ঘোড়ার বদলে কি গাধা জুড়ে দিবি নাকি?"

"গাধা জুড়ে দেওয়া নয়।…রমজানের সাদা ঘোড়াটার একটা মস্ত দোষ আছে জানিস তো?—গাধার ডাকে ভয়ানক ভড়কে যায়…"

রহমৎ আরও বিস্ময়ের সহিত বলিল, "যাক্, তাতে কি?"

"বরটাকে যদি ঘায়েল করা যেত,—বরের বাপকেও, পুরুতকেও—সবগুলোই নিশ্চয় এক গাড়িতেই থাকবে।"

রহমৎ আরও দুই পা আগাইয়া আসিয়া অপলক দৃষ্টিতে রূপচাঁদের দিকে একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর আসিয়া আবার গুঁড়িটার উপর বসিল। মনে হইল যেন একটু খুশি হইয়াছে,—বোধ হয় এই জন্য যে, হতাশ প্রেমিক নিতান্তই চুপচাপ বসিয়া নাই, কিছু একটা করিতেছে। উন্মাদ হইয়া যাওয়া কিংবা আত্মহত্যা করা অবশ্য বেশি শাস্ত্রসংগত হইত, অভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীবিনাশও নিন্দার নয়। জিনিসটাতে উন্মাদ-লক্ষণও বর্তমান। বলিল, "কাজটা ভাল হয় না, যদিও জাহাঙ্গীরের নজির আছে… কিন্তু গাধা পাবি কোথায়?"

"তাই তো ভাবছি।…আমিও অবশ্য গাধা ডাকতে পারি…"

"দ্যুৎ, সে কি হয়? টের পেয়ে গেলে শেষকালে গাধা হোস্ আর নাই হোস্ ধোপার মত বাড়ি হাঁকড়াবে। তার চেয়ে এ বাবা ইংরেজের রাজত্ব,—গাধা নিজের খুশিতে, নিজের মনে ডেকেছে, আমরা কি করব?"

রূপচাঁদ হাঁটুতে চিবুকটা চাপিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "ঠিক তো;—বনে চরতে চরতে রংচঙে গাড়ি, সাজগোজ-করা লোক দেখে ওর মনে যদি ভাব এসে থাকে… আমরা কি ওকে উসকে দিতে গিয়েছিলাম?…তোমরা এত জুলুস ক'রে না এলেই পারতে।…কিন্তু পাওয়া যায় কোথায়? সমিস্যে তো সেই; আর গাড়ির সময়ও হয়ে আসছে…"



রহমৎ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, "আচ্ছা তুই ব'স্, আমি দেখছি একবার। আর দেখ্—যদি আমার দেরিই হয় আর বর এর মধ্যে এসেই পড়ে তো তুই এই গুঁড়ির আড়ালে ব'সে দিস না-হয় ডেকে খোদার নাম নিয়ে।…বাঃ, আমার মর্জি হয়েছে আমি ডেকেছি

গাধার ডাক মশায়, তাতে আপনাদের ঘোড়া যে ঘাব্ড়ে বসবে কে জানে !···বসে থাক্, দেখি একবার চেষ্টা করে।"

খানিকক্ষণ গেল। গুঁড়ির উপর থেকে স্টেশনের ওদিকে ডিস্ট্যান্ট সিগ্‌নালটা দেখা যায় ; রূপচাঁদ সেই দিকে চাহিয়া ছিল, দেখিল সিগ্‌নালটা মাথা হেঁট করিল। গাড়ি আসিতেছে। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, রহমৎ যেদিকটায় গিয়াছে—তীব্র উৎকণ্ঠায় সে দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। না, রহমতের কোন চিহ্ন নাই। তাহা হইলে বোধ হয় তাহার নিজের গলাই শেষ পর্যন্ত ভরসা।

ছোট স্টেশন, রাস্তায় বিশেষ লোক চলাচল নাই। বরযাত্রীদের যাহারা প্রত্যুদ্গমন করিবে তাহারা অনেকক্ষণ স্টেশনে চলিয়া গিয়াছে। রতন মণ্ডল তাহার ছোট মেয়েটিকে লইয়া স্টেশন অভিমুখে যাইতেছিল—মেয়ের মামার বাড়ি যাইবে ; জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোষজা এখানে ব'সে যে ?"

কিন্তু বেশি কৌতূহল দেখাইল না ; কেন না, রূপচাঁদকে ডোবার ধারে, কি জঙ্গলের মধ্যে, কি গাছের মগডালে, কি গুঁড়ির উপর দেখা এমন কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়। রতন চলিয়া গেলে রূপচাঁদ আর একবার রহমতের পথের দিকে চাহিল, তাহার পর গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া খুব নিম্নকণ্ঠে—'হাক্কা—' করিয়া একটা টানা আওয়াজ করিল। রাসভ-ধ্বনির রিহার্সাল। দ্বিতীয় বার আর একটু জোরে। না, বেশ চলিবে। গলাখাঁকারি দিয়া আরও একটু জোরে আরম্ভ করিতে যাইবে, দেখিল রায়েদের পোড়ো বাড়ির পাশ দিয়া যে সরু রাস্তাটা চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া গাধার উপর, পাকা ঘোড়সওয়ারের ভঙ্গিতে পা ছড়াইয়া রাসু ধোবার ছেলে সাতকড়ে গট্ গট্ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। সামনে আসিয়া তড়াক্ করিয়া নিচে লাফাইয়া পড়িল, তাহার পর গাধাটার পিঠে দুইটা সাবাসির চাপড় কষিয়া রূপচাঁদকে বলিল, "রহমৎ ডেকে নিয়ে এল। সে আসছে। তোমরা চড়বে নাকি দা'ঠাউর ? চড় না, ঘোড়া ছেড়ে চড়বে লোকে আমার মাতনের ওপর,—ওর নাম মাতুধন রেখেছি।·· পড়ার ভয় নেই, মাটিতে দুটো পা ঠেকিয়ে দাও, নিচে দিয়ে গ'লে বেরিয়ে যাবে ; মায়ের যেমনকার ছেলে ঠিক তেমনটি রইলে, আঁচড় পর্যন্ত লাগল না।"

রূপচাঁদ প্রশ্ন করিল, "ডাকে কেমন ?"

সাতকড়ে খুব সম্ভবত স্নেহের আধিক্যেই বলিল, "খুব মিষ্টি ডাক।"

রহমৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। একটু বিজয়ের ভঙ্গিতে রূপচাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি রে, হ'ল জোগাড়, না, হ'ল না ? বাবা, এ যার নাম রহমৎ শেখ !···কাজটা কিন্তু অন্যায় হচ্ছে, ব'লে দিলাম ; আমি এর মধ্যে নেই।···নাও, সাতকড়েকে বল এখন তোমার কি দরকার গাধায়।"—বলিয়া হাত পা গুটাইয়া নির্লিপ্ত ভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

রূপচাঁদ বলিল, "সেই কথাই তো বলছিলাম, ও বলছে খুব মিষ্টি ডাক ওর গাধার—মিষ্টি ডাকে কি হবে ?"

রহমৎ মুখ না ফিরাইয়াই বলিল, "রেখে দে, গাধার আবার মিষ্টি ডাক। আমাদের মোরগটা তাহলে মিঞা তানসেন।...এখন ঠিক তালের মাথায় ডাকবে কি না-ডাকবে সেই কথা দেখ।...কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না, ব'লে রাখছি; না-হক্ ক'জন বেকসুর লোককে..."

রূপচাঁদ সাতকড়ের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলিস্ রে, ডাকবে ফরমাস মতন?...ব্যাপারটা তোকে বুঝিয়ে দিই; মানে হচ্ছে..."

সাতকড়ে কোমরে একটা হাত দিয়া সিধা হইয়া বলিল, "মাতন আমার ডাকে নিজের খেয়ালের ওপর। কারুর তো রেয়ৎ নয়—দাসখৎ-ও লিখে দেয় নি,—বল না কেন রহমৎ ভাই?"

এমন সময় গাধাটা হঠাৎ তর তর করিয়া কয়েক পা আগাইয়া গেল এবং ঘাড়, পিঠ আর লেজ সোজা করিয়া বিকট রব করিয়া চীৎকার জুড়িয়া দিল এবং নিজস্ব ভঙ্গিতে আওয়াজটাকে ধাপে ধাপে নামাইয়া থামিয়া গেল। সাতকড়ে দৃপ্তভাবে তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "ঐ লেনু, একখানি লমুনা ঝেড়ে দিলে! ভাবছেন বুঝি আমাদের কথা কিছু বুঝছে না ও? আর কিন্তু ঘণ্টা-দুত্তিন এখন ঠাণ্ডা। সারা দিনে পাঁচ-ছটি বার আওয়াজ দেয়, ব্যস।"

রহমৎ ফিরিয়া বসিয়াছিল। স্টেশনের ওদিকে চাহিয়া বলিল, "তোর গাড়ি ওদিকে এসে গেল কিন্তু রূপো; ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।"

রূপচাঁদ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। দাঁড়াইয়া পড়িয়া চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "তাই তো! কোন উপায় নেই রে সাতকড়ে? তুই ওকে বলেছিস রহমৎ, কেন ডাকাতে হবে?...বলিস নি?...মানে হচ্ছে, একটা বরযাত্রী আমাদের গ্রামে আসছে, সাতকড়ে; তাদের একটু ঠাট্টা করা দরকার তো, নইলে ভাববে এদের দেশে ঠাট্টা করবার লোকই নেই; তাই ওরা যেই এখান দিয়ে যাবে আমরা শাঁক বাজিয়ে দোব...বিয়েবাড়ির হাজারটা শাঁকেও এমন বাজখেয়ে আওয়াজ হবে না বাবা, হুঃ।"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, সাতকড়েও হাসিয়া হাততালি দিয়া উঠিল, বলিল, "খাসা মতলব, দা'ঠাউর খাসা মতলব এঁটেছে বটে!"

রূপচাঁদ বলিল, "কিন্তু, তুই বলছিস যে আর ঘণ্টা দু-এক ডাকবে না ও?"

সাতকড়ে বলিল, "দু-রকম ডাক আছে দা'ঠাউর। এ যা লমুনোটা দিলে এটা হচ্ছে আহ্লাদের ডাক—মনটা খুব খুশি রইল, ডেকে দিলে একবার। আমরা যেমন হাসলাম না এইমাত্তোর, সেই রকম আর কি! আর একরকম ডাক আছে মাতনের, সে কিন্তু এ-রকম মিষ্টি লাগবে না, তা বলে দিচ্ছি। সে ওর কান্নার ডাক।"

রহমৎ ঘুরিয়া প্রশ্ন করিল, "ঠেঙিয়ে ডাকানো নাকি?"

সাতকড়ে আগাইয়া গিয়া গাধার খুঁটি ধরিয়া তাহার পিঠে হেলান দিয়া রহমতের সহিত মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল; বলিল, "তোমাদের মত ইস্কুলের পোড়ো নয় যে একটা বেতের ঘায়ে 'ভ্যা' করে উঠবে; আস্ত একখানি বাঁশ পিঠে ভাঙলেও মাতুধন

টঁ শব্দ করবে নি।…ওকে কাঁদাবার অন্য হদিস্ আছে। কিন্তু ঐ যে কইনু—শাঁক যা বাজবে তাতে কানে তালা লাগিয়ে থোবে।"
দু'জনেই আগ্রহের সহিত বলিল, "কি, কি হদিস্, বল্ না শীগ্গির, ওদিকে গাড়ি যে প্রায় ইস্টিশনে এসে পড়ল!"
সাতকড়ে বড় রাস্তার এ-মোড় ও-মোড় একবার দেখিয়া লইল, তাহার পর—"দাঁড়াও, দেখছি একবার" বলিয়া যে-পথে আসিয়াছিল সেই পথে বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। রূপচাঁদ হাঁকিয়া বলিল, "দেরি করিস নে সাতকড়ে, গাড়ি ওদিকে এসে গেল!"
একটুখানির মধ্যেই সাতকড়ে আবার ঘুরিয়া আসিল। একটু নিরাশভাবে বলিল, "নাঃ, পাওয়া গেল না।"
রহমৎ জিজ্ঞাসা করিল, "কি খুঁজছিলি তুই?"
সাতকড়ে বলিল, "কুকুরের গায়ের মাছি। গাধাকে ডাকাতে একেবারে ধন্বন্তরি, তবে আর বলছি কি? দুটি মাছি একটু ধুলোর মধ্যে ক'রে ছেড়ে দাও গায়ে, তার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পহর ধ'রে শোন না কত ডাক শুনবে। তা দিন বুঝে একটাও পাওয়া গেল না কুকুর—দরকার কিনা…সব বেটা ভাবলে উপ্‌গার হবে।"
স্টেশনটা গোটাকতক গাছের আড়ালে পড়ে, দেখা যায় না, তবু হাঁকডাক, ব্যস্ততার আওয়াজ কানে আসিল। রহমৎ আবার নির্লিপ্তভাবে ঘুরিয়া বসিয়াছিল, সেই ভাবেই বলিল, "মাছির কামড়ে যদি ডাকে তো বিছুটি ছোঁয়ালে ডাকবে না কেন?… আমি কিন্তু এর মধ্যে নেই বাবা; তোমাদের যা মনে হয় কর। একটা কথা বললি, তার উত্তর দিতে হ'ল; ব্যস।"
সাতকড়ে বিস্ময় এবং প্রশংসায় চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া এমন ভাবে চাহিল যেন সে রহমতের মধ্যে স্বয়ং মক্কার পীরকে প্রত্যক্ষ করিতেছে।
বরযাত্রীর দল স্টেশনের প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া রাস্তায় নামিয়াছে। প্রায় জন-ত্রিশেক লোক। গ্রামে তিনখানি গাড়ি। যতদূর সংকুলান হইয়াছে তাহাতে বরপক্ষীয়দের বসানো হইয়াছে। বাকি আর সকলেই পায়ে হাঁটিয়া আসিতেছে। রূপচাঁদের খবর ঠিকই ছিল, বর, নিতবর, বরের বাপ এবং পুরুত রমজানের গাড়িতে চড়িয়াছে। সেটা সর্বাগ্রে রাখা হইয়াছে।
সমস্ত দলটা ধীরে ধীরে চলিয়াছে। বুড়া রমজান কিন্তু তাহার পেট-মোটা ঘোড়া দুইটার রাশ এমন কায়দা করিয়া কষিয়া ধরিয়া আছে, মনে হইতেছে যেন অন্যমনস্ক হইয়া রাশ একটু ঢিলা করিলেই তাহারা একেবারে তীরবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া দিবে।
দলটা সামনে আসিতেই রূপচাঁদ গুঁড়ি হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সেলাম রমজান-চাচা।"
তীব্র উৎকণ্ঠায় মুখটা একটু শুকাইয়া গিয়াছে।

রহমতেরও মনে একটা শংকা এবং উদ্বেগ লাগিয়া ছিল। অনেকটা, পূর্বাহ্নেই ভাব জমাইয়া রাখিবার জন্য বলিল, "সেলাম-আলেকুম।"

রমজান কোন উত্তর দিল না, শুধু গাধাটার পানে একবার আড়চোখে চাহিয়া রাশটা আরও সতর্ক হইয়া ধরিল।

সাদা ঘোড়াটাও একবার ঘাড়টা ঘুরাইয়া দেখিয়া অস্বস্তির সহিত কান দুইটা সঞ্চালিত করিতে লাগিল। রূপচাঁদ আর রহমৎ দুজনেই সঙ্গ লইল। রূপচাঁদ একবার গাড়ির ভিতরটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। তাহার পর রমজানের সঙ্গে গল্প জমাইবার জন্য প্রশ্ন করিল, "রং ধরাতে কত খরচ পড়ল। রমজান-চাচা ?"

কোন উত্তর হইল না। রহমতের বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল, চকিতে ঘুরিয়া একবার গুঁড়িটা যেখানে আছে সেইখানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহার পর নির্লিপ্ত ভাবে বলিল, "আচ্ছা, রং ধরাতে যা-ই খরচ পড়ুক, তুমি একটু স'রে থেক তো, যদি জানের ডর থাকে ; রমজানী খালার ঘোড়া একটি যদি লাথি ঝাড়ে তো উঠে আর তোমায় জল খেতে হবে না।...এ তোমার বাংলা দেশের পিলেরোগা ঘোড়া নয় যে মনে করেছ..."



এমন সময় "হাঁক্কা"—করিয়া একটা অতি উগ্র আওয়াজ পিছনে শোনা গেল এবং পর মুহূর্তেই দেখা গেল আকাশপাতাল হাঁ করিয়া, লেজ সিধা করিয়া চীৎকার করিতে করিতে একটা গাধা বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। পিছনের লোকেরা ত্রস্তভাবে রাস্তা ছাড়িয়া দিতেছে। রানা রকম সন্ত্রস্ত রব উঠিয়াছে—'সাবধান'! 'গাধারা কামড়ায়ও আবার'...'দেখো, যেন ছুঁয়ে ফেলো না'...'কি বিপদ !...ও মাড়িয়ে চলেছে মশাই, আর আপনি ছোঁবার ভয় করছেন !"

রমজানের গাড়ির সাদা ঘোড়াটা দাঁড়াইয়া পড়িল। রাশটাতে একটা তীব্র ঝাঁকানি দিয়া পিছনে ঘুরিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর রমজান নামিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিবার পূর্বেই পাশের ঘোড়াটাকে এক রকম টানিতে টানিতেই সামনে গলা বাড়াইয়া মত্ত গতিতে ছুট দিল। একটা "সামাল সামাল" রব পড়িয়া গেল। গাড়িটা খানিকটা সিধাই ছুটিল, তাহার পর সাদা ঘোড়াটা রাশ ছিঁড়িয়া পলায়ন করায়, একটা-ঘোড়ার টানে খানিকটা একপেশে হইয়া ছুটিতে ছুটিতে রাস্তার ধারে একটা সেগুন-গাছের গুঁড়িতে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগিয়া হেলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

এর পরের দৃশ্য রূপচাঁদদের বাড়ির চিলেকোঠার অভ্যন্তর। সন্ধ্যার প্রাক্কাল। রূপচাঁদ ধূলিশয্যায় শয়ান; কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া বোধ হয় এইমাত্র নিদ্রা গিয়াছে। চোখের কোলে, গালে শুষ্ক অশ্রুর কলঙ্করেখা। নেড়ীর সঙ্গে আসন্ন বিরহের অশ্রু নয়; অবশ্য পরোক্ষ হেতু এইটাই বটে। আসলে রূপচাঁদের পিঠে আজ একটি আস্ত কঞ্চি ভাঙিয়াছে।

মাতুধন-ঘটিত ব্যাপারটা প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল না। ডাকের মূলে বিছুটি,—বিছুটি থেকে সাতকড়ে, সাতকড়ে থেকে রহমৎ, তাহার পর রহমৎ থেকে রূপচাঁদে বেশ সহজেই পৌঁছানো গেল। রূপচাঁদের পিতা দুর্ভাগ্যক্রমে দলের মধ্যেই ছিলেন। কান ধরিয়া বাড়ি লইয়া গেলেন, তাহার পর চোরের মার দিয়া চিলেকোঠায় পুরিয়া বাহির হইতে তালা আঁটিয়া দিয়া বলিলেন, "সমস্ত দিন সমস্ত রাত আজ শুকো, রাস্কেল কোথাকার ··নেমন্তন্ন-বাড়ি যাওয়া একেবারে বন্ধ ··"

বিয়ে-বাড়ি।

দুইটা বাড়ি বাদে রায়েদের বৈঠকখানায় বরযাত্রীদের তোলা হইয়াছে। কতকগুলা ছোকরা আসিয়া অবধিই গণ্ডগোল বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের গাড়ি করিয়া আনা হয় নাই, তাহাদের অপমান হইয়াছে। যাহারা গাড়িতে আসিয়াছিল তাহাদের অনেককেও তাহারা দলে টানিয়াছে—বলিয়াছে গাড়ি চড়াইয়া জখম করিবার মতলব ছিল এদের, তাদের গুরুবল ছিল তাই তাহারা চড়ে নাই। অবশ্য বরের গাড়িতে কাহারও বিশেষ আঘাত লাগে নাই, অন্যান্য গাড়িগুলা একেবারে নিরাপদ ছিল, কিন্তু কি সর্বনাশটাই-না হইতে পারিত, সেই দুশ্চিন্তায় সকলে স্তম্ভিত হইয়া আছে। সর্বনাশের চেয়ে তাহার কল্পনাটাই আরও ভয়ংকর, কারণ সে-কল্পনার তো কোন সীমা বাঁধা থাকে না। তাই, কিছু না হওয়ার চেয়ে বড় বিপদ আর কিছুই হইতে পারে না। স্নানে, আহারে, চায়ে, পানে—যত রকম ভাবে পারিল ইহরা কন্যা-পক্ষীয়দের সমস্ত দিন বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজের দিকের পুরুতকেও ইহারা দলে টানিল।

পুরুতঠাকুরের চা আসিলে একজন কাছে গিয়া দাঁড়াইল এবং চায়ে চুমুক দিয়া পুরুত-ঠাকুর মুখটা কুঞ্চিত করিয়া উঠিতেই, নিরীহের মত প্রশ্ন করিল, "খুব মিষ্টি দিয়েছে বুঝি? তা বেচারীরা তো জানে না যে আপনি কম মিষ্টি খান ·"

পুরুতঠাকুর ঠোঁটে জিবটা অস্বস্তির সহিত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "মিষ্টি কোথায় হে, এ যে নুন!"

"নুন!! না পুরুত-মশায়, আপনি নিশ্চয় ভুল করেছেন। অবিশ্যি, যা ছোটলোক এরা···কিন্তু আপনি বরপক্ষের পুরুত, আজকের কাজে আপনি দেবতার তুল্য, তায় সমস্ত দিন উপোস করে আছেন, আপনার সঙ্গেও কি এ-রকম ঠাট্টা-প্রবঞ্চনা করতে সাহস করবে? বোধ হয় ভুল করেছেন,—দেখুন তো আর একটা চুমুক···"

পুরুতঠাকুর একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন, চায়ের বাটিটা আছড়াইয়া দিয়া চীৎকার

করিয়া উঠিলেন, "আমি পুরোহিত, তিন কুড়ি বয়স হ'তে চলল, আমার সঙ্গে তঞ্চকতা! আমি যদি আজ এ-বিবাহে পৌরোহিত্য করি তো…"

সকলে আসিয়া পড়িল—কি ব্যাপার! …একটি ছোকরা বলিল, "থাক্ পুরুত মশাই, এই উপোসের মুখে যদি একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে বসেন সে তো আর স্বয়ং বিধাতা এলেও রদ হবে না; থাক্, স'য়ে যান…"

একজন সামনে ঠেলিয়া আসিয়া বরের পিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তার চেয়ে বরং বর আসনে বসবার আগে, কাকা, একবার গয়নাপত্র, দানসামগ্রীগুলো দেখে নিন্…"

কন্যাপক্ষের দিক থেকে একজন বেশ ষণ্ডাগোছের লোক উগ্রদৃষ্টিতে ছোকরার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "জিগ্যেস করি—কেন?"

ছোকরা রোগাগোছের, থতমত খাইয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, এম্নি বলছিলাম—সবাই তাহ'লে একবার দেখতাম।" তাহার পর পাশের একটি সঙ্গীকে প্রশ্ন করিল, "তুই বলছিলি না রে—এখানকার সেকরারা চমৎকার গড়ন করে গয়নার?"

সে ছোকরা এসব ফ্যাসাদের কথায় একেবারেই না-থাকিবার জন্য বলিল, "যাঃ, আমি কি জানি এখানকার সেকরাদের কথা, দেখ তো! মিছিমিছি আমায় টানা…"

প্রথম ছোকরা একটু ছুতা করিয়া সরিয়া পড়িল।

গোলমাল কিন্তু থামিল না। বরের পিতা একটু সন্দিগ্ধ-প্রকৃতির লোক, বলিল, "ছেলেমানুষ যদি তুলেই থাকে কথাটা, আপত্তির কারণও তো দেখি না আপনাদের। বিয়ের আগে গয়নাপত্র দেখে নেওয়া, এ রকম তো আখছারই হচ্ছে আজকাল।"

কন্যাপক্ষের লোকটির রাগে তখন শরীরটা কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছে, কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া বলিল, "এ বাড়িতে হয় নি।"

অপর একজন বলিল, "এ তল্লাটে নয়।"

বরকর্তার হাতে একজন সুবিবেচনার সহিত নিজের হুঁকাটা তুলিয়া দিল। সে দু-তিনটা টান দিয়া শান্তস্বরে বলিল, "নাই বা হ'ল, আজ হোক্। দোষ কি? পুরুতের চায়ে যখন নুন রয়েছে, তখন…কি যে বলে বেশ…

যে হুঁকা জোগাইয়া দিয়াছিল তাহার আবার সুযোগের মাথায় কথা জোগাইয়া দেওয়াও অভ্যাস আছে, বলিল, "তখন কনের গয়নায় খাদ থাকবে না, কে বলতে পারে?"

"মুখ সামলে"—বলিয়া কয়েক জন একসঙ্গে হুংকার করিয়া উঠিল!

বরকর্তা বলিল, "তা সামলাচ্ছে, কিন্তু গয়না যাচাই না-হ'লে বর পিঁড়িতে উঠবে না।"

—"আলবৎ উঠবে।"

কন্যাপক্ষীয়দের সকলেই সমস্ত দিন নানা রকম আবদার-অত্যাচার সহ্য করিয়া অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হইয়া ছিল। প্রতিশোধের আঁচ পাইয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল। এক জন ভিড়ের মধ্যে থেকে বলিয়া উঠিল, "তাকে কান ধ'রে টেনে এনে বসানো হবে।"

"কোথায় গেল বর ?"

"পাকড়ো উস্‌কো !"

অবরুদ্ধ আক্রোশের বাঁধ ভাঙিয়া একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। এ-পক্ষের দল যেমন দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া গেল, ও-পক্ষের দল সেই অনুপাতে কমিয়া আসিতে লাগিল ; যে যেখানে পারিল সন্ধ্যার অন্ধকারে গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বরের কিন্তু খোঁজ পাওয়া গেল না। আনাচে, কানাচে, অন্ধকারে, গলি-ঘুঁজিতে, বন-বাদাড়ে যে কয় জনকে ধরা গেল তাহাদের কেহই বর নয়।···

"গেল কোথায় বর ?"

প্রশ্ন উঠিল, "স্টেশনে যায় নি তো ?"

একজন উত্তর করিল, "তাদের বাড়ির দিকে এখন গাড়ি নেই তো ; কলকাতার গাড়ি আছে একটা।"

একটা দল স্টেশনের দিকে ছুটিল।

তখন কলিকাতার গাড়ি আসিয়া গিয়াছে। পাতলা অন্ধকারে দূরে হইতে দেখা গেল টিকিট ঘরের দিক থেকে খুব ঢিলাঢালা জামা-কাপড়-পরা একটি ছোকরা গাড়ির দিকে ছুটিয়াছে।···গার্ড হুইস্‌ল দিল।

দলের তিন-চার জন ছোকরা ছুটিল। প্লাটফর্মে যখন পেঁাছিল তখন গাড়ি বেশ একটু জোর দিয়াছে। তবুও বোধ হয় টানিয়া নামাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু সাহেব-গার্ডের ধমক খাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

একজন বলিল, "হাজ্‌ব্যান্ড স্যার, হাজ্‌ব্যান্ড রানিং এওয়ে !"

বিবাহ না করিয়াই পলাইতেছে সেইটে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য অপর একজন হাত তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আন্‌-ম্যারেড হাজ্‌ব্যান্ড অফ আন্‌-ম্যারেড ওয়াইফ, স্যার ! !"

গাড়ি কিন্তু চলিয়া গেল।



তখন দুর্ভাবনা জুটিল—জাত-কুল বাঁচে কি করিয়া ?

সদ্য বর কাঁড়িয়া বিয়ে দিতে হইবে। প্রথমে মিত্তিরদের শম্ভুর কথা মনে পড়িল সকলের। বিয়ে-বাড়ি তোলপাড় করিয়াও শম্ভুর সন্ধান পাওয়া গেল না। শম্ভু,

নিমন্ত্রণে আসে নাই—একটা অভাবনীয় ব্যাপার! কয়েকজন উৎসাহী ছোকরা তাহার বাড়ি ছুটিল।

বাড়িতে আর কেহই ছিল না, মেয়ে-পুরুষ সবাই বিয়ে-বাড়ি। বৈঠকখানার তক্তপোষে শম্ভু ঘুমাইয়া আছে। পাশে ত্রৈলোক্য কবিরাজের ছেলে মাখন। তক্তপোষের এক ধারে কতকগুলো শিশি আর একটা ওষুধ মাড়িবার খল।

আজ দিনের বেলায় মেয়ে খাওয়ানো ছিল। টের পাওয়া গেল শম্ভু কোন সুযোগে এক জায়গায় বসিয়া পড়িয়াছিল। আহারটা অত্যধিক হইয়া গিয়াছে। মাখন এখন বাপের যত রকম হজমি বড়ি, চূর্ণ, আরক আছে সবগুলা তাহার উপর পরীক্ষা করিতেছে।

বিয়ের কথা শুনিয়া মাখন কবিরাজোচিত গাম্ভীর্যের সহিত প্রশ্ন করিল, "লগ্ন কখন?"

"সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে।"

মাখন শম্ভুর পেটে দুইটা টোকা মারিয়া চক্ষু ঊর্ধ্বে তুলিয়া একটু হিসাব করিল; তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাহ'লে হ'ল না, এখনও চোঁয়াঢেকুর আসছে, এগারটার আগে উঠে বসতে পারবে না। এগারটা পর্যন্ত খেতে যাবে—সেই চেষ্টা করছি; সে-সময় হ'লে হয় তো দেখ।"

আর তাহা হইলে ছেলে কই?

একজন বলিল, "কেন, আমাদের ফেলু কেমন হয়? রমানাথের ভাগনে ফেলারাম…"

রমানাথ কাছেই ছিল। একটু লোভী লোক। ভাগ্নেকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করিয়াছে এবং তজ্জনিত খরচের একটা হিসাব রাখিয়া গিয়াছে, আশা ছিল বিয়েতে সেটা পুষাইয়া লইবে। সৌভাগ্যটা এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আসায় উল্লসিত হইয়া উঠিল। মোচড় দিয়া আরও কিছু আদায় করিবার জন্য বলিল, "ওর মা কি রাজি হবে? ওই একটি ছেলে, আর কেউ তো নেই…"

গরজের বালাই, দর আর একটু উঠিল। ফেলারামের ডাক পড়িয়া গেল। তাহাকে পাওয়া গেল না। রমানাথের ছেলে কানাই বরযাত্রীদের টিট্‌কারি দিতে দিতে স্টেশন পর্যন্ত ধাওয়া করিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া সব শুনিয়া বলিল, "সে তো আজ বিয়ে করতে পারবে না।"

রমানাথ একেবারে খিঁচাইয়া উঠিল, "আজ পারবে না মানে?—এ কি পরাণ মণ্ডলের কর্জ শোধ দেওয়া নাকি?—আজ পারব না, কাল—কাল নয়, পরশু। ডাক্ সে হারামজাদাকে। দেখি, কেমন না করে…"

কানাই বলিল, "ডাকলে আসবে কি ক'রে?—নেমন্তন্নর জন্যে জোলাপ নিয়ে বসে আছে—মাখনের কাছ থেকে। মাখ্‌না ভুল ক'রে কি একটা দিয়েছিল—এখনও জের কাটে নি।…সে আসতে চাইলেও বরং রোখা উচিত।"

কন্যাকর্তা আর সমাজের মাতব্বরেরা মাথায় হাত দিয়া বসিল। গ্রামে আর ছেলে নাই। এদিকে লগ্ন বুঝি বহিয়া যায়।

কানাই-ই প্রশ্ন করিল, "রূপচাঁদকে হ'লে কাজ চলবে না? হারু কাকা তো ওকে সমস্ত দিন উপোস করিয়ে রেখেছে—পেটফাঁপার হাঙ্গামাও নেই, জোলাপের হাঙ্গামাও নেই।"

এ-হেন পাজি বরযাত্রীর দলকে গাড়ি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করায় সকলেই রূপচাঁদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকেই একসঙ্গে চেঁচাইয়া উঠিল, "ঠিক তো! হ্যাঁ, ওর সঙ্গেই দিয়ে দাও বিয়ে।"

একজন সন্দেহ প্রকাশ করিল, "কিন্তু ঠিক মিল হবে কি? প্রায় এক বয়সই যে দুটোতে!"

—"আরে বেশ হবে, নাও, আগে জাত তো বাঁচুক, তারপর মিল আর ঢিল।"

একটি ছোকরা আবেগের মাথায় একেবারে গুরুলঘু ভুলিয়া সামনে আসিয়া বলিল, "আর ওদের দু'জনের মধ্যে যে লব্ রয়েছে! লবের চেয়ে মিল ··"

"বেরো!"—বলিয়া কে একজন তাহার গালে ঠাস করিয়া একটা চড় বসাইয়া পিছনে ঠেলিয়া দিল।

কনের মা মূর্ছা গিয়াছে, হারু সেইখানেই ছিল। কয়েক জন তাহাকে ডাকিতে ছুটিল। ওদিকে কানাই আর রূপচাঁদের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কয়েক জন তাহার বাড়ি ছুটিল।

বাড়িতে শুধু রূপচাঁদের ঠাকুরমা আর একটা বুড়ী ঝি। সকলে খোঁজ লইয়া চিলে-কোঠার সামনে গিয়ে দাঁড়াইল। বাহির হইতে তালা বন্ধ, ভিতরে কোন সাড়াশব্দ নাই। সকলে একবার সভয়ে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিল। তাহার পর ভুতো দোরে একটা ধাক্কা দিয়া ডাকিল, "রূপো!"

কোন উত্তর হইল না।

আরও জোরে ধাক্কা দিয়া ডাকিল, "রূপো, এই রূপচাঁদ!"

অতি ক্ষীণ একটা আওয়াজ ছিদ্রপথে বাহির হইল। একেবারে তিন-চারজন একসঙ্গে প্রশ্ন করিল, "বিয়ে করবি?"

রূপচাঁদ শরীরটাকে টানিয়া দুয়ারের কাছে সরিয়া আসিল। দুইটা কপাটের মাঝে ঠোঁট দিয়া প্রশ্ন করিল, "কিছু খাবার আছে রে?···ভুতো নাকি?"

—"হ্যাঁ,···ওদের বর পালিয়েছে। তোর সঙ্গে নেড়ীর বে ঠিক হয়েছে।"

রূপচাঁদ চিঁচিঁ করিয়া বলিল, "দোরটা খুলে দে; কিছু খাবার এনেছিস্ তোরা? কেনো কোথায়?"

—"কানাই চাবি আনতে গেছে, ভুলে গিয়েছিল···একেবারে বিয়ের পর খাবি রূপো, ঘণ্টা-দুয়েক একটু সবুর ক'রে থাক না।"

—"ওরে বাপ রে। দু-ঘণ্টা?···তবে থাক্।"

—"তুই অত ভালবাসতিস্ নেড়ীকে রূপো, একবার অন্য জায়গায় হয়ে গেলে বিয়ে…"

রূপচাঁদ ভিতর হইতে একেবারে খিঁচাইয়া উঠিল "মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস্ নে ভুতো …সমস্ত দিন পেটে অন্ন নেই, বলে এরও ওপর দু-ঘণ্টা চাপিয়ে বিয়ে কর্সে !…দোর খুলে কিছু খেতে দিবি তো দে, নইলে বেরো সব উপগার করতে এসেছেন !…" কণ্ঠস্বর ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

কানাই চাবি লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুয়ার খুলিয়া যতক্ষণ তাহারা নিচে নামিয়া আসিল ততক্ষণে রূপোর বাপ, নেড়ীর বাপ, আরও সব লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এ-রকম অর্ধমৃত অবস্থায় বিবাহ হয় না। এক জনকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, সে ছুটিয়া গিয়া একটু দুধ আর সন্দেশ লইয়া আসিল। রূপচাঁদ চাঙ্গা হইয়া উঠিতে উঠিতে বাড়িটা মেয়েপুরুষের কলরবে, হঠাৎ বিবাহের ত্রস্ত আয়োজনে গম্‌গম্ করিতে লাগিল।

কন্যাকর্তা স্নেহ-দ্রব কণ্ঠে রূপচাঁদের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "বাবা রূপচাঁদ, তোমার যদি কিছু সাধ থাকে তো বল…বল না, লজ্জা কি ?…রূপোর আমার লজ্জা হয়েছে গো, তোমরা দেখ !"

পিঠে কঞ্চির দাগে, আঙুল কটা আটকাইয়া যাইতেছে।

পুরুত, আরও কয়েক জন বয়স্থ ব্যক্তি বলিল, "হ্যাঁ, চাইবে বইকি, লজ্জা কি ? পা-গাড়ি, হারমোনিয়াম, যা ইচ্ছে হয় বল।"

কোন উত্তর নাই।

—"বল, বল, ওদিকে আবার লগ্নের সময় হয়ে এল…"

রূপচাঁদ একবার সমবয়সীদের পানে চকিতে চাহিয়া মাথাটা গুঁজিয়া লইয়া অর্ধস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "রহমৎ আর সাতকড়েকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে ?"



গোলাপী রেশম

তারাপদ বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল, "তোমার হয়েছে কি শৈলেন ? একটা মনি-অর্ডার নিতে যে হিমসিম খেয়ে গেলে ! দুবার দুজায়গা ভুল করে কোন রকমে দস্তখৎটা তো সারলে, এখন আবার তারিখ নিয়ে ও কি কাণ্ড করছ ?"

শৈলেন নিতান্ত অপ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি কলমটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "ও, হ্যাঁ, তাইতো ! উনিশ শ' ছত্রিশ লিখছি কি ব'লে !..."

তাহার পর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "কত সাল যাচ্ছে বল তো এটা ?"

পিওন বলিল, "আটত্রিশ পড়েছে বাবু।"

"ঠিক তো ! দেখ, মনেই ছিল না।" আরও বেশি রকম অপ্রতিভ হইয়া ব্যস্তভাবে তারিখটা শুধরাইয়া টাকা কয়টা না গুনিয়াই পকেটে ফেলিয়া পিওনকে সে বিদায় করিল।

তারাপদ ভ্রূ তুলিয়া গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিল, "এত অন্যমনস্ক, ব্যাপার কি বন্ধু ?"

"কৈ, অন্যমনস্ক হইনি তো !"

"হয়ে-যে-ছিলে তাতে তো কোন সন্দেহ নেই, অধিকন্তু এখনও রয়েছ। আর গোপনের বৃথা চেষ্টা না ক'রে কারণটা বলে ফেল দিকিন। কবিমানুষ, নতুন বসন্ত পড়েছে, আমি তেমন ভাল বুঝছি না।"

শৈলেন একটু লজ্জিতভাবে হাসিল, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর আর একবার তাগাদা খাইয়া বলিল, "নিতান্তই ছাড়বে না তা হ'লে ?"

তাহার পর জানালার বাহিরে খানিকটা স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "সাল ভুল করার জন্যে আমায় দোষ দিও না, আমি ১৯৩৮সালে ছিলাম না খানিকক্ষণ, বোধ হয় এখনও ঠিকমত নেই।"

তারাপদ একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়া ছিল, শুইয়া পড়িয়া বলিল, "এইচ-জি ওয়েলস্-কল্পিত 'টাইম-মেশিনে' তুমি যে কোন দূর-ভবিষ্যতে কিংবা দূর-অতীতে পাড়ি মেরেছ তা বুঝতে পেরেছি। একটু পরিচয় দাও তোমার প্রবাস-যাত্রার, শোনা যাক্।"

শৈলেন বলিল, "ভবিষ্যৎ তো মরুভূমি, সে দিকে গিয়ে কি করব ? গিয়েছিলাম অতীতে, আজ থেকে ত্রিশ বৎসরের ব্যবধান। সেখানে, কোন একটি শান্ত পল্লীগ্রামে রাধারমণের মন্দিরের পাশে উঁচু রকের ছায়ায় একটি ছোট মেয়ে খেলা করছে, তার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

তারাপদ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তার পাশটিতে একটি ছোট ছেলেও আছে।"

শৈলেন চোখ না ফিরাইয়াই বলিল, "আছে ; তার নাম রাখা যাক্ শ…"

তারাপদ বলিল, "শ-এর আড়ালে 'শৈলেন' তেমন ঢাকা পড়ছে না, তুমি স্পষ্টাস্পষ্টি আত্মপ্রকাশই কর। আর পবিত্র মন্দিরের পাশে একটি বালিকার সঙ্গে খেলা করছ ব'লে এই ত্রিশ বৎসরের ব্যবধান থেকে কানমলা দেবে এমন লম্বা হাত কারুর নেই।"

শৈলেন দৃষ্টি ফিরাইয়া হাসিল। একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "তোমায় পূর্বে কখন বলেছি—ছেলেবেলায় আমার অভিভাবকেরা আমার পড়াশুনোর সুবিধে হবে ব'লে তাঁদের কাছ থেকে অনেক দূরে বাংলায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—কেন না, তাঁরা থাকতেন দূর পশ্চিমাঞ্চলে। আমিও এই সুবিধে পেয়ে পাঠশালা আর গুরুমশাইকে আমার নিজের কাছ থেকে খুব দূরে দূরে রাখতাম। বিদেশে পুত্রবিরহকাতর বাপ-মা যখন ভাবতেন, আমি গুরুমশাইয়ের উদ্যত ছড়ির নিচে বিদ্যাকর্ষণ ক'রে যাচ্ছি, সে সময়টা আসলে আমি রাধারমণের মন্দিরের পাশে বেশ মাঝারি গোছের একটি দল জুটিয়ে অভিরুচিমত নানা রকম খেলায় মশগুল। দলের মধ্যে ছেলে-মেয়ে উভয়ই ছিল। তার মধ্যে একটি ছেলের পরিচয় দেওয়া আপাতত দরকার। ছেলেটার নাম ছিল…"

তারাপদ টুকিল, "লেডিজ্ ফার্স্ট !"

শৈলেন হাসিয়া বলিল, "আমারও ইচ্ছে ছিল, শুধু তুমি কি মনে করবে সেই ভয়েই আগে ছেলের পরিচয় দিতে যাচ্ছিলাম।…যাক্ ; মেয়েটির নাম ছিল চারু, আমরা চারী ব'লে ডাকতাম। যখনকার কথা বলছি তখন তার বয়স হবে—এই বছর আষ্টেক। চওড়া চওড়া গড়ন, ঘোরাল মুখ, মাথায় বেড়া বেণী ; একটা তিন-পেড়ে কাপড় থাট ক'রে পরা, আঁচলটা কোমরে মোটা ক'রে জড়ানো। পায়ে একজোড়া হাঙর-মুখো মল ছিল, সে যুগে প্রায় সব মেয়ের পায়েই থাকত।

"এর ওপর চারীর ছিল টক্‌টকে রং, যা বাংলার পল্লীগ্রামে দুর্লভ ব'ল টপ ক'রে একটা বিশিষ্টতা এনে দেয়।

"চারীর বাড়িতে শুধু ছিলেন তার বাপ আর ঠাকুরমা। মেয়েদের পক্ষে শুধু বাপ আর ঠাকুরমা থাকা মানে ষোল আনা আদর। চারুর মা ছিলেন না, অর্থাৎ এই আদরের মধ্যে কোথাও শাসনের বালাই ছিল না। এর ফলে চারুর ছিল পূর্ণ-স্বরাজ এবং সেই জন্যে সে আমার সমস্ত প্ল্যানগুলি পরিপক্ক ক'রে তুলতে আর-সবার চেয়ে সময় দিতে পারত। আমি ভুল বলছি, বরং অধিকাংশ প্ল্যান তারই মাথায় জন্ম নিত এবং তারই দক্ষতায় দানা বেঁধে উঠত। সময়ের অভাব না থাকায় আমি তার

হুকুম তামিল ক'রে মতলবগুলি কাজে রূপান্তরিত করতে অন্য ছেলের চেয়ে বেশি সাহায্য করতাম মাত্র!

"আমরা যেখানটায় খেলা করতাম, সে জায়গাটা ছিল বেশ নিরিবিলি। তার একদিকে রাধারমণের মন্দির আর দু'দিকে দেয়াল। সামনেটা খোলা ছিল বটে কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত ফাঁকা মাঠ, আর মাঠের শেষে আগাছার জঙ্গল। বাড়ি-ঘর নেই। বাড়ি-ঘর যা কিছু তা মন্দিরের পেছনে কিংবা দেয়াল দুটোর আড়ালে। অর্থাৎ, জায়গাটা গ্রামের শেষ প্রান্তে আর কি।

"খেলার রকমারি ছিল, বুঝতেই পার। কখন পাঠশালা-পাঠশালা খেলা হ'ত। আমি ছিলাম পাঠশালার কায়েমী পলাতক; সুযোগ-সুবিধে পেয়ে রোজ গড়পড়তা আরও চার-পাঁচটি ক'রে ফেরার জুটত—স্কুল-পাঠশালা মিলিয়ে। বেতটা বাদ দিয়ে আর সব বিষয়েই জিনিসটি স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করা হ'ত। এমন কি, অনিচ্ছুককে চ্যাং-দোলা ক'রে টাঙিয়ে নিয়ে আসাও বাদ যেত না, আর যাকে টাঙিয়ে আনা যেত, সেও হাত-পা ছোঁড়া এবং অশ্রাব্য গালাগালি প্রয়োগে নকলটিকে সাধ্যমত আসল জিনিসে দাঁড় করাবার চেষ্টা করত। কখন কখন এমন হ'ত যে, ব্যাপারটা অভিনয়ের কোটা থেকে সত্যই বাস্তবে এসে দাঁড়াত। হঠাৎ কোথা থেকে স্কুল বা পাঠশালের সত্যিকার পোড়োরা এসে পড়ত, এবং যাকে শখের চ্যাং-দোলা ক'রে আনা হচ্ছে আর যারা আনছে তাদের সবাইকে আসল চ্যাং-দোলা ক'রে লটকে নিয়ে তারা অদৃশ্য হয়ে যেত। আমি গুরুমশাই হয়ে পাঠশালাতে থাকতাম ব'লে, কিংবা চারু গুরুমশাই হ'লে শিরপোড়ো হয়ে তার তামাক সাজতাম ব'লে, পালে বাঘ পড়লেই দূর থেকে গা-ঢাকা দিতে পারতাম। চ্যাংদোলা হইনি কখন।

"মাঝে মাঝে এই রকম আকস্মিক রসভঙ্গের জন্যে, এ-খেলাটার প্রতি আন্তরিক টান থাকলেও বড় বেশি সাহস করা যেত না। এ-ভিন্ন কানামাছি ছিল কুমীর-কুমীর ছিল, পাড়ার নিত্য-দলাদলির নকল ছিল। কিন্তু সবচেয়ে যা বেশি হ'ত তা অভিনয়ের অভিনয়, অর্থাৎ যাত্রার অনুকরণ।

"সে সময় আমাদের গ্রামে ও-জিনিসটার খুব চল। নিম্নশ্রেণীদের দু'টো যাত্রার দল ছিল, ভদ্রলোকদের একটা অপেরা পার্টি। গ্রামের কয়েকটা ছেলে কলকাতায় পড়ত, তারা শহরের আনকোরা আধুনিকতা আমদানি ক'রে একটা থিয়েটার-ক্লাব পর্যন্ত দাঁড় করিয়েছিল। চারটি দলে যা করত, আমরা দুপুরে মন্দিরের পাশটিতে তার পুনরভিনয় করতাম। যাত্রাটাই আমাদের বেশি এ্যাপীল্ করত; তবে থিয়েটারের সীনের দিকে একটা ঝোঁক ছিল, সেই জন্যে প্রায়ই থিয়েটারের স্টেজে যাত্রার পালা ঢেলে অভিনয় করতাম। কেউ আনত গায়ের র‍্যাপার, কেউ মায়ের কস্তাপেড়ে শাড়ি, কেউ দিদিমার নামাবলী। নামাবলীটা হ'ত অরণ্যের সীন্, নামের জঙ্গলকে আমরা গাছের জঙ্গল করে নিয়েছিলাম আর কি। পুকুর দেখাতে হ'লে নামাবলীর মাঝখানটায় ছিঁড়ে দেওয়া হ'ত। ধ্রুবর মা সুনীতি অরণ্যে ঘুরে ঘুরে তৃষ্ণার্ত হয়ে জল খাচ্ছেন;

দেখাতে হ'লে সুনীতি হাতদুটো অঞ্জলিবন্ধ ক'রে নামাবলীর ছেঁড়া দিয়ে ভেতর দিকে গলিয়ে দিত এবং ওদিক থেকে ঘটি ক'রে একজন জল ঢেলে দিত,—বাস্তবিকতার নেশায় কখন কখন পানাসুদ্ধ। পুকুরে জল খবার এমন কৌশল আর কোন পার্টিই দেখাতে পারত না ব'লে এই সীনটি আমাদের সকলের বড় প্রিয় ছিল। ফলে, নামাবলী পাওয়া গেলেই ধ্রুবর পালা অনিবার্য ছিল, আর ধ্রুবর পালার ফাঁড়া কাটিয়ে কোন নামাবলীকেই কখন অক্ষত শরীরে ফিরে যেতে হয়নি।

"এই সব অভিনয়ে মেন-পার্ট থাকত চারুর। সে মল দুগাছা হাঁটুর কাছে তুলে বেটাছেলের মত কাপড় প'রে, 'দ্রৌপদীর স্বয়ংবর'-এ অর্জুন হয়ে লক্ষ্য বিঁধত, 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'-এ ভীম হয়ে কীচক বধ করত, শ্রীকৃষ্ণ হয়ে কংস ধ্বংস করত। মেয়ের পার্ট বড় একটা নিত না; শুধু 'সুভদ্রা-হরণ'-এ গোবরার মুখে লাগাম ক'ষে অর্জুনের রথ হাঁকিয়ে যাবার লোভে সে সুভদ্রা সাজত।

"এই পালাটির জন্যে আমি উন্মুখ হয়ে থাকতাম। কেন, সে কথা বলবার আগে গোবরার পরিচয়টা দেওয়া দরকার।

"পরিচয়টি আগেই পেতে, কিন্তু তুমি নিজেই বাধা দিয়েছিলে, মনে থাকতে পারে।

"গোবরা আমাদেরই পাঠশালার ছেলে, আমার পরে ভর্তি হয়। দুবেলা এক কোঁচড় ক'রে মুড়ি এনে পাঠশালায় ব'সে ব'সে খেত, আর মুড়ি বিলি ক'রে দল পাকাত। এ দিকে মাথা খেলত মন্দ নয়, তবে পড়াশুনোর দিকে বড় একটা ঘেঁষত না। তার সঙ্গে আমার এই দ্বিতীয় বিষয়ে মিল ছিল এবং এরই বলে তাকে ক্রমে পাঠশালা ছাড়িয়ে আমাদের দলে ভেড়ালাম। ভুল হয়ে গিয়েছিল; যাকে বলে খাল কেটে কুমীর ঢোকানো, তাই করেছিলাম আর কি। গল্পটা শেষ পর্যন্ত শুনলেই বুঝতে পারবে।..

"আচ্ছা, একটা কথা বিশ্বাস করতে পারবে?"

তারপদ বলিল, "কি?"

"এই যে, আমি চারুকে ভালবাসতাম।"

তারাপদ সবিস্ময়ে বলিল, "ভালবাসতে? তখন যে তোমরা দুগ্ধপোষ্য!"

শৈলেন অবিচলিতভাবে বলিল, "ভালই যদি না বাসতাম তো সর্বদা ওর কাছে কাছে থাকতাম কেন? আর কেনই বা হাজার কাছে থেকেও মনে হ'ত যথেষ্ট কাছে নেই? এরই বা কারণ কি যে, ক্রমাগতই ইচ্ছে হ'ত চারু একটা কিছু বিপদে পড়ুক, খুব মারাত্মক রকম বিপদে, যেমন ভুতে তাড়া করা, কিংবা হাতীতে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরা, কিংবা মাঝগঙ্গায় নৌকো থেকে প'ড়ে যাওয়া—আর আমি তাকে উদ্ধার করি। ভালবাসার লক্ষণ নয়? তা ভিন্ন পাঠশালা থেকেও যে কায়েমী ভাবে অনুপস্থিত থাকতাম, তারও মূলে ছিল চারুর প্রতি অনুরাগ, শুধুই গুরুমশাইয়ের প্রতি বিরাগ নয়।

"একদিন দুপুরে 'সুভদ্রা-হরণ' হবে ঠিক হয়েছে। আমার মনটা খুব হৃষ্ট, কেননা

এই পালায় আমি সাজতাম অর্জুন। সকালে পাঠশালায় গেলাম—রথের ঘোড়াকে খবর দেবার জন্যে। তখন ঘোড়া সাজত নিবারণ। খবর পেলাম, সে চার-পাঁচ দিন আসেনি। গোবরা ওদের পাড়ার ছেলে; জিগ্যেস করতে বললে, 'তার ক'দিন থেকে অসুখ।' দুশ্চিন্তায় পড়া গেল।

"একটু পরে গোবরা প্রশ্ন করলে, 'কেন রে নিবারণকে?'

"ছেলেটা নালিশ করতে এক নম্বর। এর কাছে সব কথা হুট্ ক'রে বলা নয়; বললাম, 'না, এমনি।'

"কিন্তু ঘোড়ার ভাবনায় মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে রইল। একটু পরে একটা টোপ ফেলে দেখলাম; বললাম, 'আজ আমাদের ওখানে যাত্রা হবে কিনা ·'

"গোবরা স্লেটে একটা বর্তুলাকার মুখ এঁকে তাতে দাঁত বসাচ্ছিল। মুখ না তুলেই জিগ্যেস করলে, 'কার দল রে? মথুর সা'র? তার দল হ'লে একবার দেখতাম!'

"আমি উত্তর করলাম, 'কেন, মথুর সা'র চেয়ে ভাল দল আর হ'তে নেই?'

"একটু উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করলে, 'কি পালা রে?'

"বললাম, 'সুভদ্রা-হরণ।'

"গোবরা আমার মুখের দিকে চাইলে। তারপর আবার নির্লিপ্ত ভাবে দাঁত আঁকতে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'যাবি না কি?'

"গোবরা একটু নিরাশভাবে বললে, 'না ভাই, পাঠশালা রয়েছে যে।'

"আমি বললাম, 'ঠাকুর-দেবতার পালা দেখলে আবার নাকি দোষ হয়।'

"পাশের অনাথকে সাক্ষী মানলাম। সে কম কথায় সারে, বললে, 'দোষ হ'লে আর পাঠশালায় ব'সে পেল্লাদ কেষ্ট-নাম করত না।'

"আমি উৎসাহের সঙ্গে বললাম, 'তুই যাবি না কি তা হ'লে?'

"অনাথ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নাক সিঁটকে বললে, 'ধ্যাৎ।'

"গোবরা সে দিন ধরা দিলে না। কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখা গেল নিজেই নিবারণের সঙ্গে হাজির হয়েছে। সে দিন আমাদের 'রিজিয়া', দুদিন আগে কলেজের ছেলেরা প্লে করেছিল। নিবারণের পার্ট ছিল না। সে আর গোবরা অডিয়েন্স হয়ে স্টেজের বাইরে দুখানা চেয়ার নিয়ে বসল। ঘাবড়ো না, 'চেয়ার' মানে অবশ্য থান ইঁট।

"নতুন দর্শক পেয়ে খুব চুটিয়ে প্লে করা গেল। ওঠবার সময় গোবরা বললে, 'তোরা করিস্? তবে যে বল্লি, মথুর সা'র চেয়েও ভাল দল?'

"আমি মনে মনে চটলাম। বললাম, 'মথুর সা'র পেশাদার···'

"তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল; বিজয়গর্বের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম, 'মথুর সা'র দলে সত্যিকার মেয়ে আছে?'

"গোবরা ঠোঁট উলটে বললে, 'আহা, সত্যিকার মেয়ে হ'লেই যেন হ'ল! তোদের রিজিয়া না হয় মেয়েই, কিন্তু অন্তার দাদার কাছে দাঁড়াতে পারে?'

"আমি হো হো করে হেসে উঠলাম, বললাম, 'খুব বুঝেছিস তো! রিজিয়া মেয়ে ছিল নাকি? ও তো পেনোর ভাই, ওর মাথায় ওটা বাবরি চুল।'

"তারকেশ্বরের মানত চুল নিয়ে পেনোর ভাই হারাধন খুব ঠকিয়েছে দেখে আমি আর হাসি সামলাতে পারছিলাম না। এমন সময় অন্য সবার সঙ্গে চারু এসে সামনে দাঁড়াল। ঝুঁকে পায়ের মল নামাতে নামাতে জিগ্যেস করলে, 'কি রে শৈল, হাসছিস্ কেন এত?'

"সে সেজেছিল বক্তিয়ার, তিনপেড়ে শর্মাড়র মালকোঁচামারা বক্তিয়ার! বললাম, 'এ তোকে ভেবেছে বেটাছেলে আর হারাধনকে ভেবেছে মেয়ে-মানুষ!'

"সকলে আবার হেসে উঠলাম।"

"চারু একটু গম্ভীর হয়ে, একটু হেসে, চোখ দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে, 'এবার থেকে তোরা আমায় চারু-দা বলে ডাকবি, খবরদার।'—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটা আলগা ক'রে হো-হো করে হেসে উঠল।

"গোবরার অবস্থাটা যা হ'ল তা আর বর্ণনা ক'রে কাজ নেই, শুধু কাঁদতে বাকি রইল বেচারির। মুখ রাঙা ক'রে বললে, 'রোসো, তোমাদের সবার ভিরকুটি ভাঙছি গুরু-মাশাইকে ব'লে—মেয়েদের সঙ্গে মিশে এই সব খেলা হয় বাবুদের! নিবারণ, তোমারও এই বিদ্যে! বেশ ··'

"নিবারণ বললে, 'দিস্ ব'লে; ভারি ভয়, ওঃ!' "

"চারু একটু এগিয়ে এল, গলা বাড়িয়ে বললে, 'তুই মেয়েমানুষ দেখলি কোথায় রে এর মধ্যে? আমি তো চারু চন্দোর ভট্টাচার্য!' ব'লে সোজা হয়ে গম্ভীর হয়ে দাঁড়াল। আর একটা হাসির রোল উঠল।



"তার পরদিন বিকেলে পাঠশালায় ফেরত গোবরা আবার এসে হাজির। বললে, 'চল সব, গুরুমশাই ডেকে পাঠিয়েছেন।'

"বিকেলে তখন অনেক ছেলে জুটেছে, তুমুল বেগে কি একটা হুটোপাটি খেলা হচ্ছে; কেউ ওর কথায় বড় একটা কান দিলে না। শুধু পাঁচী ব'লে একটা মেয়ে খেলার মাঝেই শরীরটা অষ্টাবক্র ক'রে হাতের আঙুলগুলো ছেতরে গোবরার কথাগুলোই

বিকৃত ক'রে ভেংচে উঠল। তারপর আর কেউ ওর কথা ভাবলেও না, এবং অনেকক্ষণ পরে খেলার মাঠে একটা ছেলের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে প'ড়ে গিয়ে যখন ঝেড়ে-ঝুড়ে উঠলাম—দেখি ছেলেটা আর কেউ নয়—আমাদের গোবরা।

"সেই থেকে গোবরা ভিড়ে গেল আমাদের দলে। অবশ্য রোজ আসত না, তবে খুব বেশি দেরিও করত না, আর যত দিন যেতে লাগল ততই তার হাজির ঘন ঘন হয়ে উঠতে লাগল। ক্রমে আমাদের থিয়েটারের অডিয়েন্স হওয়া থেকে একদিন স্টেজের উপর তার প্রমোশন হ'ল।

"সেদিন আমাদের 'রাধারমণ থিয়েটার পার্টি'র—আজকালকার ভাষায় বলতে গেলে—শ্রেষ্ঠ অবদান…'সুভদ্রা-হরণ'। অশ্বিনীকুমার নিবারণ অনুপস্থিত—ঘোষালদের কাচ-বাঁধানো দেওয়াল টপকে' বেল পাড়তে গিয়ে তার খুরে কাচ বিঁধে গেছে।

"গোবরা ছিল, তাকে বললাম, 'তুই ঘোড়া হ গোবরা, হবি ?'

"গোবরা বললে, 'যাঃ, ঘোড়ার পার্ট আবার মানুষ করে !'

"একটু থেমে বললে, 'যদি করি তো ও-রকম পেছনে ঝাঁটা বেঁধে ন্যাজ করতে পারব না।'

"অগত্যা লাঙুলহীন ঘোড়াই নামানো হ'ল সেদিন। স্টেজে নেমে কিন্তু চিঁ-হিঁ-হিঁ শব্দ ক'রে, ঠোঁট কাঁপিয়ে, লাগামে ঝাঁকানি দিয়ে এবং পেছনের নারকেল-ডেঁপোরের রথে অর্জুন আর সুভদ্রাকে দু' একটা লাথি ঝেড়ে ঘোড়া সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিলে ! এক মুহূর্তেই প্লে'টার চেহারা বদলে' গেল। খুশিতে বিস্ময়ে চারু তো স্টেজের মর্যাদা ভুলে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়েই উঠল।

"তখুনি সীন নামিয়ে দেওয়া হ'ল। একটু পরে যখন আবার সীন্ উঠল, বিস্মিত অডিয়েন্স দেখলে ঘোড়ার পেছনে অস্তাদের লক্ষ্মীনারায়ণের রুপোর চামর বাঁধা, আর সুভদ্রা আর তারকেশ্বরের চুলওয়ালা নকল-মেয়ে হারাধন নয়, স্বয়ং চারু।

"এই দারুণ সীনটির লোভে চারু কায়েমী ভাবে সুভদ্রার পার্ট নিলে, একাদিক্রমে চার দিন এই খেলাই চলল। সে যুগে এটা রেকর্ড।

"চারু গোবরার এত ভক্ত হয়ে পড়ল যে, কোথা থেকে খুঁজে-পেতে একটা সম্বন্ধও বের করে ফেললে—গোবরা তার ভাই হয়।—অর্থাৎ এত বড় একটা স্টার-অ্যাক্টারের সঙ্গে আত্মীয়তা না বের করে সে সন্তুষ্ট হ'তে পারল না।

"আমার কিন্তু মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। বুঝতে পারলাম আমার ভালবাসার ক্ষেত্র আর মসৃণ নয়—গোবরা হতভাগাও মজেছে, সেও…"

তারাপদ, "থামো !" বলিয়া, হাতটা বারণের ভঙ্গিতে উঁচু করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, বলিল, "নিঃসাড়ে, নির্বিবাদে শুনে যাচ্ছি ব'লে তুমি যে দস্তুরমত রোমান্স ফেঁদে বসলে দেখছি হে ? একটি মেয়ে, দুটি ছেলে—that damned eternal triangle again (সেই শাশ্বতী ত্রয়ী)! মতলবখানা কি বল দিকিন ?"

শৈলেন বলিল, "হিংসে আছে, দ্বেষ আছে, চক্রান্ত অভিসন্ধি, এমন কি হত্যা পর্যন্ত রোমান্স বলতে আপত্তি থাকে, ব'লো না।

"নানাভাবে লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে লাগল। প্রথম প্রথম গোবরা আমাদের বেশ চোখে চোখে রাখবার চেষ্টা করতে লাগল। খেলার মধ্যে আমরা দুজনে, অর্থাৎ আমি আর চারু, একটু কাছে কাছে থাকতাম, কেননা আর সবার তুলনায় আমাদের দুজনের মধ্যে একটু ঘনিষ্ঠতাই ছিল। প্রায় দেখতাম, আমরা খুব ঘেঁষাঘেঁষি হ'তেই গোবরার বক্রদৃষ্টি আমাদের ওপর এসে পড়েছে। চারু কিছু বুঝত না, কেননা তার মনটা ছিল নি-দাগ, আমি কিন্তু একটু থতমত খেয়ে যেতাম, কেননা আমি চারুর সান্নিধ্যটা বেশ একটু সূক্ষ্মভাবে উপভোগ করতাম।

"এমনও হয়েছে—দুপুরবেলা, রোদ ঝাঁঝা করছে, আমার মত নিতান্ত এলে-দেওয়া ছেলে এবং চারুর মত নেহাত আদরে-গলা মেয়ে ভিন্ন কেউ বাড়ির বা'র হতে পারে না—আমরা দুটিতে মন্দিরের রকের কোণে বেলগাছের ছায়ায় পাশাপাশি ব'সে গল্প করছি, হঠাৎ গোবরা নিতান্ত একটা অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে বেরুল। আমাদেরই আশ্চর্য হবার কথা, সে কিন্তু আগে-ভাগেই কপালে চোখ তুলে প্রশ্ন করলে, 'তুই এখানে, শৈলেন? আর আমি চারিদিক খুঁজে হয়রান হচ্ছি!'

"চারু হয়তো প্রশ্ন করলে, 'কেন রে গোবরা?'

" 'ওকে গুরুমশাই ডেকেছেন।'

" 'কেন?'

" 'কেন তা ও-ই জানে আর গুরুমশাই জানে। আর, ডাকবে না? রোজ রোজ পাঠশালা কামাই ক'রে এখানে এসে একলা ব'সে থাকা…'

"চারু বললে, 'একলা কেন? এই তো আমি রয়েছি।'

"এর উত্তর গোবরা দিলে না। আমিও চুপ ক'রে রইলাম। একটু পরে গোবরা বললে, 'চল্ শৈলেন, বসে রইলি যে?'

"আমি রেগে-মেগে বললাম, 'যাঃ, যাব না।'

"গোবরা বললে, 'তা হ'লে যাই আমি, বলে দি'গে যে…'

"আমি তাই চাই—বেশ জমাট গল্প চলছিল, আপদ বিদেয় হ'লেই বাঁচি, বললাম, 'যা, এক্ষুনি যা, যাচ্ছিস না যে?'

"গোবরা বললে, 'তোর হুকুম?'

"চারু বললে, 'তার চেয়ে তুইও আয় না গোবরা, একটু পরেই তো নন্তী, ফেলা, এরা সবাই আসবে।'

"গোবরা অবশ্য আসতেই চায়, কিন্তু আসে না। বলে, 'হ্যাঁ, শৈলর সঙ্গে আমায় কেউ দেখে ফেলুক!'

"ছবিটি আমার যেন চোখের সামনে ভাসছে। চারু আঁচলটা দাঁতে কামড়ে, রকের

নিচে পা নামিয়ে গোড়ালি ঠুকে ঠুকে মল বাজাচ্ছে, সমস্ত শরীরটাও দুলছে, আমার পা দোলানো বন্ধ হয়ে গেছে—খানিকটা দূরে সিঁড়ির ও-দিকটায় গোবরা দাঁড়িয়ে। গোবরার শেষের কথাটায় কি ছিল, চারু একেবারে 'হো' 'হো' করে হেসে উঠল। বললে, 'তা হ'লে শৈল না থাকলে আসবি তো ? তুই যা তো শৈল।'

"সঙ্গে সঙ্গে গলাটা বাড়িয়ে নিয়ে এসে আমার কানে কানে বললে, 'তুই অমনি ঘুরে পাঠশালা থেকে সবাইকে ডেকে নিয়ে আয়, উল্টে ওকেই চ্যাং-দোলা করে নিয়ে যাক্…'

"তারপর কি যে হ'ল মনে পড়ছে না ; ছেলেবেলার অনেক ছবিই তো খানিকটা খানিকটা ঝাপসা হয়ে যায় ?—তবে গোবরা-ঘটিত আর-এক দিনের কথা সমস্তটাই স্পষ্ট মনে আছে। চারুকে মন্দিরে না পেয়ে তার বাড়িতে গেলাম। দেখি, ঘরে বারান্দায় বাঘবন্দীর ছক্ কেটে চারু আর গোবরা একাগ্রচিত্তে খেলায় মগ্ন। গোবরার পাশে পাঠশালার বই-স্লেট রাখা। চারু একবার চোখ তুলে আমার দিকে চাইলে, কিন্তু বোধ হয় খুব অন্যমনস্ক ছিল ব'লে কিছু বললে না। গোবরা আমার দিকে পেছন ফিরে ছিল।

"আমার গায়ে যেন আগুন ছড়িয়ে দিলে। ছেলেবেলার কণ্ঠে যতটা কটুতা ভরা যায়, আর নেহাত কমও যায় না—ততটা ভ'রে বললাম, 'হ্যাঁ রে গোবরা, আর নিজের বেলায় বুঝি পাঠশালা কামাই হয় না ?'

"গোবরা চমকে ফিরে দেখে যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

" 'বাঃ, আমি তো যাচ্ছিলাম পাঠশালা, আমার তেষ্টা পেয়েছিল তাই··'

" 'আহা, পাঠশালায় তো জল পাওয়া যায় না !…'

"চারু আধশোওয়া হয়ে খেলছিল, যেন ফণা ধ'রে উঠে বসল, হঠাৎ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'ও খাবে না পাঠশালার জল, তোর কি রে ? আ-মর ! বাড়ি বয়ে কোঁদল করতে এল দেখ না ! যা বেরো, ও যখন তোর বাড়িতে যাবে বলিস'খন। আ-গেল যা ! নিজে সারাদিন টো-টো ক'রে বেড়াচ্ছে, তাতে কিছু নয়, আর ও বেচারি …তুই উঠিস নি তো গোবরা, ও কি করে আমি দেখব…'

"আমি হন্ হন্ ক'রে বেরিয়ে এলাম ; রাগ ছিল, অভিমান ছিল, আর কি ছিল ঠিক মনে পড়ে না, তবে খানিকটা গিয়ে প্রায় যখন মন্দিরের কাছাকাছি হয়েছি, হঠাৎ আমার গলা বন্ধ হয়ে এল, চোখে কি যেন ঠেলে উঠতে লাগল এবং বাপ-মা প্রভৃতিকে অনেক দিন দেখিনি ব'লে আমি কাপড়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

"হতাশ প্রেমের অশ্রু এই রকম একটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা অবলম্বন ক'রে উপছে ওঠে কি না, তোমরাই বলতে পার।

"তিন দিন যাইনি। চতুর্থ দিন চারু নিজে এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেল। রাস্তায় একবার আমার কাঁধে হাত দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'তোকে কথাগুলো ব'লে এত কষ্ট হয়েছিল, শৈল, মাইরি বলছি।'

"ছেলেবেলার ভাঙন দু'কথাতেই জোড়ে, গেলও জুড়ে ; তবে—গোবরা-ঘটিত ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠতে লাগল। গোবরা সেদিন খুব আস্কারা পেয়েছিল। তার পরেও যে তিনদিন যাইনি, সে তিনদিনও নিশ্চয়ই তার একাধিপত্য গেছে। সে যে ক্রমে ক্রমে আমায় পরাস্ত ক'রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র থেকে সরাচ্ছে, তাতে আর তার সন্দেহ ছিল না। এর পরেও দু'একটা ব্যাপার ঘটল, যাতে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাটা পরিপুষ্ট হবার বেশ অবসর পেলে। তারপর একদিন সে মনের কথাটা স্পষ্টই ব'লে ফেললে।

"সেদিন আমাদের সেই শ্রেষ্ঠ অবদান 'সুভদ্রা-হরণ'। প্রথা-মাফিক আমি সাজব অর্জুন, চারু সাজবে সুভদ্রা, গোবরা সাজবে ঘোড়া। ল্যাজের জন্যে পেছনে চামর বাঁধবার সময় কিন্তু হঠাৎ সে বেঁকে বসল, বললে, 'না, আমি ও সাজব না।'

"প্রথমে সকলে বেশ একটা কৌতুক অনুভব করলাম, গ্রামের যাত্রা-থিয়েটারে এইরকম প্রায় হয় ব'লে আমাদের যাত্রারও যেন কদর বেড়ে গেল। 'ঘোড়া বেঁকে বসেছে' ব'লে বেশ একটা আমোদ-মিশ্রিত রব উঠল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ঘোড়ার জিদে সব পণ্ড হয় দেখে সবাই চ'টে উঠল। কে একজন জিগ্যেস করলে, 'তবে, তুই কিসের পার্ট নিবি শুনি ?'

"গোবরা খানিকটা গোঁজ হয়ে রইল, তারপর আরও সবার পীড়াপীড়ির পর ঘাড়টা বাঁকিয়ে বললে, 'আমি অর্জুনের পার্ট নেব।'

"সকলে এত বিস্মিত হয়ে উঠল, যেন সত্যিই একটা ঘোড়া অর্জুনে রূপান্তরিত হ'তে চাচ্ছে ; কয়েকজন একসঙ্গে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'অর্জুনের !'

"গোবরা বললে, 'বাঃ, কেন হব না ? দুবার ঘোড়া সেজেছি ব'লে আমি যেন মানুষ নই ! আমি শৈলর চেয়ে ঢের বড়, ওর চেয়ে ঢের সুন্দর। আর, ও আসুক দিকিন আমার সঙ্গে কুস্তিতে !'

"চারু একেবারে কপালে চোখ তুলে ব'লে উঠল, 'সে কি রে ! তুই আমার সম্পর্কে দাদা হ'স না ? বলতে তোর আটকাল না জিভে ? তুই অর্জুন সাজলে আমার সুভদ্রা সাজা চলে ? তুই যে অবাক্ করলি রে।'

"নন্তী গালে তর্জনী ঠেকিয়ে বললে, 'পাঠশালে প'ড়ে তোর এই বিদ্যে হচ্ছে গোবরা !'

"মাসখানেক থেকে পাঠশালে যে তার কোন বিদ্যেই অর্জন হচ্ছে না সে কথাটা অবশ্য কেউ তুললে না।

"নিবারণ বললে, 'আর তুই কুস্তিতে যদি শৈলকে হারাতে পারিস, তা হ'লে তো তুই ওর দাদা ভীম হ'লি, চারী তা হ'লে তোর ভাদ্দর-বৌ হ'ল না ?'

"সে দিনে আর প্লে হ'ল না। ভালই হ'ল, কেন না গোবরা আমার দিকে এমন ভাবে চাইলে, যাতে স্পষ্ট বোঝা গেল, সে ঘোড়া সাজলে একটি খুর যা ঝাড়ত, তাতে বীর অর্জুনকে আর এ জন্মে গাণ্ডীব তুলতে হ'ত না।

"এর ফল এই হ'ল যে, আমার আর চারুর সম্বন্ধটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। অর্থাৎ,

চারু সুভদ্রা হ'লে আমার অর্জুন হতে কোন দোষ নেই। বরং সব দিক দিয়ে আমিই যোগ্য।···তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর, তারাপদ, এর পরে আমাদের দুজনের মনে মনে যেন একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল। করছ না বিশ্বাস?"

তারাপদ বলিল, "বিশ্বাস করি আর নাই করি, ওর কাব্যটুকু উপভোগ করতে বাধা হচ্ছে না। কৈশোরের প্রেম বড় মধুর; আমাদের ধর্ম তাই এ'কে দেব-মুখী ক'রে শাশ্বত ক'রে রেখেছে। সত্যিই নিজের শুদ্ধতার জোরে এ-প্রেম প্রেমাস্পদকে দেবতার সঙ্গে একাসনে···"

শৈলেন তারাপদর মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে হাসিতে লাগিল; বলিল, "ঠিক বলেছ, দেবতার সঙ্গে একাসনই বটে। সেই কথা বলব ব'লেই আজ এত কথার অবতারণা।



"সেদিন কি-একটা অজ্ঞাত কারণে সকাল থেকেই ভাল ছেলে হবার ঝোঁক চেপেছিল। খুব ভোরে উঠলাম। বইয়ের ছেঁড়া পাতাগুলি জেয়ল আঠা দিয়ে জুড়ে বইগুলোতে মলাট দিলাম, তারপর খাবার-টাবার খেয়ে বই-স্লেট নিয়ে পাঠশালায় বেরুলাম।

"রেল পেরিয়ে চারুর সঙ্গে দেখা; জিগ্যেস করলে, 'কোথায় চলেছিস রে শৈল? পাঠশালায়?'

"মাথা নেড়ে উত্তর দিলাম।

"জিগ্যেস করলে, 'আজ আসবি না—?'

"বললাম, 'না। বাঃ, পাঠশালায় যেতে হবে না? শুধু তোদের সঙ্গে খেলা করলে চলবে আমার?'

"চারু শুধু ঠোঁটটা একটু উল্টে চ'লে গেল। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ঘুরে জিগ্যেস করলাম, 'তুই কোথায় যাচ্ছিস রে?'

"বললে, 'সজনে ফুল কুড়ুতে ঘোষেদের পুকুরপাড়ে।'

"আমি আবার পাঠশালা পানে ঘুরলাম বটে, কিন্তু দু'পা এগুতে পাঠশালা আর সজনে ফুল, অর্থাৎ গুরুমশাই আর চারুর দোটানায় প'ড়ে গতিটা শ্লথ হয়ে উঠল, এবং হঠাৎ যখন মনে হ'ল, সজনে ফুল কুড়িয়ে বাড়িতে তরকারির সাহায্য করাও ভাল ছেলের একটা লক্ষণ, তখন বেশ একটা তৃপ্তি পেলাম।

"সেদিন সকাল বেলাটায় কিছু একটা ছিল। যেমন নিজেকেও খুব ভাল লাগছিল, ঘোষেদের পুকুর-পাড়ে চারুকেও তেমনি যেন বেশি ক'রে মিষ্টি বোধ হচ্ছিল। তাকে ঝ'রে-পড়া ফুল কুড়ুতে দিলাম না, আমি থাকতে সে বাসি ফুল কুড়ুবে? গাছে উঠে ডাল ভেঙে ভেঙে টাটকা ফুলে তার কোঁচড় ভর্তি করলাম। কিছু আমও চুরি ক'রে দিলাম। তারপর বাস্তবক্ষেত্রে আর তার কোন উপকার করবার উপায় না দেখে বললাম, 'আজ রিজিয়ার থিয়েটার করবি চারী?'

"মানে, তা হ'লে বক্তিয়ার সেজে বীরেন্দ্রসিংহকে হত্যা করা যায়। বইয়ে যাই থাক্ না কেন। চারুর জন্যে একটা প্রকাণ্ড কিছু না করতে পারা পর্যন্ত যেন স্থির হ'তে পারছিলাম না। যদি পারি তো বীরেন্দ্রের পার্টটা গোবরাকেই দোব।

"চারু একটা টোকো আম দাঁত দিয়ে কুরে কুরে খাচ্ছিল। চোখমুখ কুঁচকে বললে 'না।'

"জিগ্যেস করলাম, 'কেন রে?'

"চারু বিরক্তভাবে বললে, 'সাজ নেই, কিছু নেই, আমি অমন নামাবলী গায়ে দিয়ে রিজিয়া সাজতে পারব না, যাঃ!'

"একটু আশ্চর্য হ'লাম, কেননা চারুর কোন কালে পোশাকের ফ্যাসাদ ছিল না। কথাবার্তায় রহস্যটা বোঝা গেল। আগের দিন শীতলাতলায় কলকাতার গণেশ পরামাণিকের দল গেয়ে গেছে। তারা আনকোরা-নতুন সাজে একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছে; বিশেষ ক'রে রুক্মিণী—সে আবার ঢুকল, ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের মত একটা প্রকাণ্ড গোলাপী রেশমী শাড়ি পেছনে টানতে টানতে; ও-জিনিসটা তখন সদ্য কলকাতায় যাত্রা-থিয়েটারে ঢুকেছে, আর নির্বিচারে চলেছে, এখনকার স্টেজে গ্রীক্-প্যাটার্নের অভিবাদনের মত,—সেলুকাসের সেনাও ওই করছে, আবার শ্রীকৃষ্ণের দ্বাররক্ষীও ওই করছে; সেদিন এক জায়গায় দেখলাম বৈকুণ্ঠে দেবর্ষি নারদও মাথায় বীণা তুলে ঐ ইউনানী অভিবাদন করলো···তুমি হাসছ যে,—অমরলোকে না-হয় সেখানকার বাসিন্দাদেরই মৃত্যু নেই, তা ব'লে পুরনো স্টাইল ম'রে নতুন স্টাইলও ঢুকবে না, এমন কোন সর্ত আছে না কি?

"আমি একটু ব্যাকুল হয়ে উঠলাম; চারুর ভাল পোশাক পরবার সাধ হয়েছে, এই সময় যদি কিছু করা যেত! বিশেষ ক'রে চারুর মনোরঞ্জনের জন্যে আমার আর গোবরার মধ্যে যে রকম রেষারেষি চলছে।

"গল্প করতে করতে আমরা ঘাটে শানের বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। আমি বললাম, 'বৌদির ট্রাঙ্কে একটা শান্তিপুরে ডুরে শাড়ি আছে, যদি বলিস তো দুপুর বেলায় যখন ঘুমুবে···'

"চারু ঠোঁট কুঁচকে বললে, 'মিছে বকিসনে শৈল, ডুরে শাড়ির নাকি আবার উড়ুনি হয়, তাও আবার শান্তিপুরে! অরুচি!'

"বৌদির পরই জেঠাইমা আর ঠাকুরমা—থান আর নামাবলী। আমি অসহায়ভাবে চিন্তা করতে লাগলাম।

"একটু পরে মল-সুদ্ধ পা শানে ঠুকতে ঠুকতে চারু বললে, 'এক জায়গায় পাওয়া যায়।'

"আমি ব্যগ্রভাবে বললাম, 'কোথায় বল্ তো?'

"চারু উত্তর না দিয়ে অন্যদিকে চেয়ে গা দোলাতে লাগল। আমি আবার প্রশ্ন করতে, বললে, 'সে তোর দ্বারা হবে না।'

"বললাম, 'বল্‌ই না।'

"বললে, 'রাধারমণের মন্দিরে।'

"আমার সমস্ত অন্তরাত্মা মন্দির ওলট-পালট ক'রে এল। নিষ্ফল হয়ে আবার জিগ্যেস করলাম, 'মন্দিরে কোথায় রে?—সেখানে তো দোলনা, ঠাকুরের শোবার খাট, নৈবিদ্যির থালা…'

"চারু আঁচলটা দাঁতে চেপে পালিশ করতে করতে বললে, 'রাধার গায়ে।'

"ব'লে, ফল কি হ'ল দেখবার জন্যে একবার আড়চোখে আমার দিকে চাইলে। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'রাধার উড়ুনি তুই গায়ে দিবি!'

"চারু বোধ হয় ভয় পেয়ে গেল, তাড়াতাড়ি বললে, 'বাঃ, তাই বললাম না কি?'

"তারপর গম্ভীরভাবে উঠে প'ড়ে বললে, 'বাড়ি যাই, তুই পাঠশালে যাবি নি? খালি মেয়েদের সঙ্গে খেলা!'

"চারু রেগেছে। একসঙ্গে আসতে আসতে খানিক পরে আমি বললাম, 'আর, যদি কেউ টের পায়? তা ছাড়া পাপও তো বটে?'

"চারু কোঁচড় থেকে একমুঠো সজনে ফুল বের ক'রে শুঁকতে শুঁকতে বললে, 'কে তোকে বলেছে?—তার চেয়ে গোবরাকে বললে বরং…'

"চারু ঈর্ষার শক্তির কথা জেনেই কি ওকথা বলেছিল? মেয়েমানুষ,—ওদের মনের বৃত্তি কখন্ থেকে অঙ্কুরিত হ'তে থাকে কে জানে। কিন্তু ঐতেই—ঐ গোবরার নাম এনে ফেলতেই—ফল হ'ল।

"তার পরদিন দুপুরের পুজো করতে ঢুকে পুরুতঠাকুর দেখলেন রাধার গা খালি। একটুখানির মধ্যেই গ্রামে হৈ-চৈ প'ড়ে গেল।·· সিগারেটের টিনটা নাড়িয়ে দাও দিকিন, দেশলাইটাও,—থ্যাংক্স্।

"কখন্ চুরি গেল, কে করলে, কেমন ক'রে—সে সব কথা থাক্। আজ একটু আগে বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম—না? আসল কথা হচ্ছে—রাস্তা দিয়ে একটা লোক খানিকটা জরি-বসানো গোলাপী রেশম নিয়ে যাচ্ছিল, দুপুরের রোদে ঝলমল করছে। আলোয় ঝলমল গোলাপী রঙ এখনও আমায় চঞ্চল ক'রে তোলে। আমি আর বর্তমানে থাকি না। কালের পর্দা হালকা রেশমের মতই ফরফরিয়ে উড়তে থাকে—

দেখি তার ও-প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে দুটি কিশোর-কিশোরী, স্থান—একটি পোড়োবাড়ির একটি নিভৃত প্রান্ত।

"মেয়েটির গা একটি জরির পাড় দেওয়া গোলাপী রেশমে জড়ানো। তার ভাঁজে ভাঁজে ওপর থেকে এসে পড়েছে দুপুরের সূর্যের চোখ-ঝলসানো আলো; তাতে ভেতরের গায়ের রং আর বেড়াবেণীর ঝিক্‌মিকি যেন হয়ে উঠেছে রূপকথার মায়া। ছেলেটি বিজয়গর্বে দাঁড়িয়ে আছে; রাজকুমারীকে সোনার গাছের হীরের ফল এনে দিয়ে অরূপকুমার নিশ্চয় একদিন এই রকম ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল।"

তারাপদ একটু অপেক্ষা করিয়া ঈষৎ হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "তারপর?"

শৈলেন বলিল, "হ্যাঁ, একটা 'তারপর' আছে বৈকি;—তারপর সেই দৃশ্যমঞ্চে পুরোহিত-প্রমুখ গ্রামের একপাল লোকের প্রবেশ—দুপুরের চেয়েও উগ্রমূর্তি সবার; পথনির্দেশক গোবরা।...হ্যাঁ, বলেছিলাম, এ রোম্যান্সে হত্যা পর্যন্ত আছে, সেটা আর কিছু নয়, তোমার গার্ভিসলিকো-পড়া মনে ঔৎসুক্যটা জাগিয়ে রাখবার জন্যে; ক্ষমা কর।...ও কি! তোমায় হঠাৎ অমন উদাস দেখাচ্ছে কেন? রেশমী উড়ুনির মায়ার ছোঁয়াচ, না, গোবরার হাতে হত্যা হ'লাম না ব'লে নিরাশা?—তার হাতে যতটুকু ছিল তা তো সে ক'রেই ছিল।"



তীর্থ-ফেরত

অন্নদাপিসী তীর্থ করিয়া ফিরিলেন। উঠিয়াছিলেন শিয়ালদহে। কথা ছিল কামাখ্যা, প্রয়াগ, পুষ্কর, দ্বারকাধাম, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, জগন্নাথ—আর এর মধ্যে ছোট বড় যে যে তীর্থ পড়ে সব সারিয়া মাস চারেক পরে ফিরিবেন। আজ মাত্র তের দিনে কামাখ্যা, কাশী, গয়া আর বৈদ্যনাথধাম হইয়া বাড়ি ফিরিয়াছেন। এই রকম যে হইবেই জানা কথা, কেহ বিস্মিত হইল না; পিসী যে তেরটা দিন গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে থাকিতে পারিয়াছিলেন এইটেই বরং পরম বিস্ময়কর ঘটনা।

বাড়িতে পৌঁছিবার বোধ হয় আধ ঘণ্টাটাকের মধ্যেই গঙ্গা-স্নানের খাটো কাপড়টা পরিতে দেখিয়া বড়বধূ বলিল, "সমস্ত রাত জেগে গাড়ির ঝাঁকানিতে হা-ক্লান্ত হয়ে রয়েছ মা, আজ না-হয় বাড়িতেই তোলা জলে নেয়ে নাও না, এই পোটাক পথ আবার হাঁটা—"

পিসী অল্প হাসিয়া বলিলেন, "সঞ্চয় যত না হোক, আসতে না আসতেই খরচ মা?—কতটুকুই বা?—দিয়ে আসি দুটো ডুব।—পাড়ায় এদের সব খবর কি?"

শাশুড়ীর অলক্ষিতে বড়বউ আর সেজোবউ একটু ঠোঁট টিপিয়া মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিল। নূতন নাতবউ সরযূ, দিদিশাশুড়ীর তীর্থপ্রত্যাগমন উপলক্ষ করিয়া এই প্রথম আসিয়াছে। বলিল, "সবাই তো বেশ ভালই আছে, না কাকীমা?—দেখন-হাসিদের সঙ্গে ঘোষালদের যে ঝগড়াটা ছিল সেটাও মিটমাট হয়ে গেছে—দেখন-হাসির সাধে ওরা সবাই খেতে এসেছিল—না বাপু, ঝগড়া আমি একেবারে দেখতে পারি না, কেমন যেন—"

পিসী হঠাৎ যেন অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ওমা, ঝগড়া নাকি আবার কারুর ভাল লাগে!—নে, শীগগির আমার কমণ্ডলুটা কোথায় আছে দে দিকিন—রোদ চড়চড় ক'রে বেড়ে যাচ্ছে।...ওরা নিজেই মিটিয়ে নিলে ঝগড়াটা, না—"

সেজো বউ বলিল, "না, রতন ঠাকুরঝি ওপরপড়া হয়ে মিটিয়ে দিলে।"

অন্নদাপিসী বলিলেন, "ভাল করেছে। মুয়ে আগুন, এইটুকু পাড়া তাতে আবার ঘর ঘর ঝগড়া! ক'টা দিন বাইরে ছিলাম, কি তৃপ্তিতে যে কেটেছে! ফিরতে কি মন সরছিল? কেবলই মনে হচ্ছিল গাঁয়ে গিয়ে আবার সেই—এর সঙ্গে ওর মুখ-দেখাদেখি নেই, এ ওর বাপান্ত না ক'রে জলস্পর্শ করে না—ওদের দু'বাড়ির মাঝখানে দেয়াল উঠেছে···দে না রে কমণ্ডলুটা, আর মালাগাছটাও দিস,—তুমি দেখ তো একবার বড় বউমা—"

নাতবউ একটু আবদার করিল, "আমায়ও নিয়ে চল ঠাকু'মা, হ্যাঁ—"

"তুই কাল যাস তখন। কনে-বউ, পা টিপে টিপে চলবি—আমি খপ ক'রে দুটো ডুব দিয়ে আসি।"

পিসী চলিয়া গেলে আবার দুই বউ-এ মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিল। সেজোবউ ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "উনি আবার তীর্থ করবেন! গেছি আর কি।"

রেলের ওপারে গঙ্গা। চরকি ঘুরাইয়া রেল পার হইয়া প্রথমেই চাটুজ্যেদের বাড়ি। সদর দরজাটা পার হইলে বাইরের উঠানটা পড়ে। ঝি হারানের মা গোরুর জন্য বঁটিতে বিচালি কাটিতেছিল, দেখিয়া কাজ থামাইয়া প্রশ্ন করিল, "ওমা, পিসী যে গো! এই শুনলাম মাসচারেক এসবে নি। দাঁড়াও, একটু পাদকজল নি, তিথি ক'রে এলে। কি কি তিথি হ'ল পিসীর গা?"

"মুয়ে আগুন, আমার আবার তিথি! মন প'ড়ে থাকে তোদের কাছে, এক দণ্ড যে মোনোস্থির ক'রে·· তোর হারানে কেমন আছে? জ্বর দেখে গিয়েছিলুম—"

সদর উঠানের ওদিকে অন্দরবাড়ি। রান্নাঘরের জানালা দিয়া সরযুর দেখন-হাসি বলিল, "অনা-পিসী যে গো!"

নানাবিধ প্রশ্ন-মুখর তিন-চারিটি কৌতুকদীপ্ত মুখ আসিয়া জানালায় জড় হইল।

"আসছি, কেমন আছিস সব?" বলিয়া অন্নদাপিসী অন্দরবাড়ির দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

সরযুর দেখন-হাসির মা ভাঁড়ার ঘর থেকে বাহির হইয়া আসিল। সমবয়সী। পাড়ার বউ, সেই সম্পর্কে ভাজ। বেসনের হাতটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "ফলল তো আমার কথা? মরণ, তুমি আবার তিথি করবে!·· তোর পিসীকে একটা আসন দে না রেণু।"

অন্নদাপিসী বলিলেন, "না, আর বসব না বউ, তাড়াতাড়ি দুটো ডুব দিয়ে আসি।—সত্যিই একা একা মন টিকল না। থাকতিস তুই সঙ্গে, আরও গোটাকতক তিথ্ সারতাম।···কিন্তু কথা চাপা দিলে শুনব না তো। ঘটা ক'রে সাধ দিলি মেয়ের, শত্রুমিত্র পাত পেতে গেল, শুধু—"

পিসী হঠাৎ থামিয়া গেলেন, ছেলে-মেয়েরা জড় হইয়াছিল, বলিলেন, "সরু দিকিন তোরা, ছেলেমানুষেরা সব কথা শোনে না।"

উহারা সরিয়া গেলে গলাটা খাটো করিয়া বলিলেন—"হুঁ, উপযুক্ত হয়েছে। আমি যাবার সময়েই বউমাকে ব'লে গেছলাম—দেখো, রেণুর সাধে কালো-বউ যদি ঘোষাল-গিন্নিকে দিয়ে না পাত পাতায় তো আমার নামে কুকুর পুষো, ও তেমন সেয়ানা মেয়ে নয়।…বললে পেত্যয় না যাবি বউ, যখন তোর অমনটা হ'ল আমি ঘোষালগিন্নির শুধু পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিলাম—বলি—একটা শোকের সময় অতি বড় শত্রুতেও একবার এসে পাশে দাঁড়ায়, তা…থাক্, সে সব কথা শুনলে আবার…ঐ যে বললাম—উপযুক্ত হয়েছে, থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে দিয়েছিস বউ, আমার শুধু আপসোস রইল গোমড়ামুখীকে নিজের চোখে বড় বড় মাছের গেরাস তুলতে দেখলাম না…ভাল কথা! —গেরাসের কথায় মনে প'ড়ে গেল—খাওয়ানোর ব্যবস্থা নাকি দু'রকম হয়েছিল বউ?"

চাটুজ্যে গৃহিণী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কি ঠাকুরঝি!…"

"চ'মকো না, চমকাবার এখনও ঢের বাকি আছে। শুধু খাওয়াবার দু'রকম ব্যবস্থা নয়, পরিবেষণেও মুখ-দেখাদেখি হয়েছিল।"

চাটুজ্যে গৃহিণী ভীতভাবে প্রশ্ন করিলেন, "কে বললে এ কথা ঠাকুরঝি?"

"কে বললে, বউকে এখন সে কথা বল! কে দরদ দেখিয়ে ভাব করাতে…থাক বাপু। কথাটা শুনলাম এসেই, তাই ভাবলাম বউকে একবার ব'লে যাই—আপনভোলা সাদা-সিদে মনিষ্যি; দুনিয়াটাকে নিজের মতন ক'রে দেখে…কিন্তু ব্যাগ্‌গতা করি বউ, আমার নাম করিস নি কারুর কাছে—সাতেও থাকি না পাঁচেও থাকি না; নেহাত শুনলাম কথাগুনো—গায়ে লাগল, তাই—"

হঠাৎ কণ্ঠস্বর তুলিয়া সহজভাবে বলিলেন, "তাহ'লে তুই যাবি না তো এখন? ভাবলাম, যাই, বউকে ডেকে নি, তা যা ভাঁড়ার নিয়ে পড়েছিস!—ভাঁড়ার ভাঁড়ার ক'রেই মরবি তুই…যাই, সমস্ত রাত জাগা, শরীরটা যেন আর বইছে না।"

চাটুজ্যেবাড়ি থেকে যখন বাহির হইলেন, পিসীর মুখের ভাবটা বেশ প্রসন্ন। দুইটি শিশু বাহিরে কলহের উপক্রম করিতেছিল, মাঝখানে দাঁড়াইয়া মিষ্ট কথায় দুইজনকে ঠাণ্ডা করিলেন; বলিলেন, "ঝগড়া মারামারি কি করতে আছে বাপ? ছি,—লক্ষ্মী ছেড়ে যান। কাশী থেকে কাঠের পুতুল এনেছি নিয়ে এসো আমার কাছ থেকে—ঝগড়া করে না।"

চাটুজ্যেবাড়ি ছাড়াইয়া রাস্তাটা বাঁয়ে ঘুরিয়াছে, তাহার পরেই একটা ফে'কড়া চৌধুরী-পাড়ায় প্রবেশ করিয়াছে। সেটা গঙ্গায় যাওয়ার পথ নয়, অনেক ঘুরিয়া স্টেশনের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

গঙ্গায় যাইবার পথ না হইলেও অন্নদাপিসী পিছনে একবার চাহিয়া লইয়া এই গলি-টাতেই প্রবেশ করিলেন।

একটু গিয়াই ঘোষালদের বাড়ি।

ঘোষালগিন্নি একগোছা পূজার বাসন আর খানিকটা তেঁতুল লইয়া ঘাটে যাইতেছিলেন। পিসীকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন, "ঠাকুরঝি যে গো! আজ সকালে বুঝি?

মিটল তীথের সাধ ?" অল্পেই হাসা রোগ আছে, নথের ঘেরার মধ্যে মুখটি হাসিতে ভরিয়া উঠিল।

পিসী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "তুই ঘাটে যাচ্ছিস কি লো বউ, তোর তো বিছানায় প'ড়ে থাকবার কথা !"

ঘোষালগিন্নি সশব্দে হাস্য করিয়া বলিলেন, "মরণ ! বিছানায় প'ড়ে থাকতে গেলাম কেন ? তুমি তীর্থি ঘোরো লম্বা লম্বা পা ফেলে আর ঘোষালবউ বিছানায় পচুক !"

পিসী যেন ভ্যাবাচাকা লাগিয়া গিয়া উপর দিকে চাহিয়া কি চিন্তা করিলেন একটু, তাহার পর আত্মস্থভাবেই ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন, "তা হ'লে কি ঠাট্টা করলে ?—তাই হবে নিশ্চয়, আমারই বোঝবার ভুল হয়েছে !"

ঘোষালগিন্নি হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, "দেখ ঢং, এলেন আর আরম্ভ হ'ল ! হ্যাঁ গা, শয্যাধরা হয়েছি ব'লে কে ঢং করলে ? জলজ্যান্ত মানুষ, দু'বেলা দেখছে লোকে।···তা বসবে না একটু ?—দাঁড়িয়ে থাকবে—অ্যাদ্দিন পরে তীর্থি ক'রে ফিরলে ?"

"না, বসব না বউ, সমস্ত রাত জাগা, শরীর ভাজা ভাজা হয়ে রয়েছে, রোদ্দুরও বেড়ে উঠছে চড়চড় ক'রে। তাড়াতাড়ি দুটো ডুব দিয়ে আসি···কিন্তু বলিহারী ঠাট্টা মা, খুরে খুরে নমস্কার সবাইকে। ঠাট্টা শুনলে পেটের ভেতর হাত পা সেঁধিয়ে যায় ভয়ে ! আমি ভাবছি কখন গিয়ে বউ-এর হাসিহাসি মুখখানা দেখব···আর কি আঁতে ঘা দিয়ে ঠাট্টা বাপু !"

ঘোষালগিন্নির হাসিহাসি মুখটা নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল একটু, উৎকণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করিলেন, "আঁতে ঘা দিয়ে কি ঠাকুরঝি ?"

"থাক সে কথা বউ, ছেলেপুলেগুনো আছে কেমন বল দিকিন ? পান্তীটার অসুখ দেখে গেছলাম—"

"সেরে উঠেছে।"

হাতের বাসনগুলো পাশে শানের বেঞ্চির উপর রাখিয়া ঘোষালগিন্নি একটু জিদের সহিত বলিলেন, "না, তুমি নুকুচ্ছ ঠাকুরঝি, বলতেই হবে,—আমি জানি উঠেছে একটু কথা।"

অন্নদাপিসী গলাটা খাটো করিয়া বলিলেন, "কে বলেছে আমি নাম করতে পারব না বউ,—যিনি দরদ দেখিয়ে তোমাদের মধ্যে ভাব করাতে গেছলেন ? রাস্তায় দেখা হ'ল —অপরাধের মধ্যে জিগ্যেস করলাম—হ্যাঁগা রতন—"

পিসী যেন নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন, আত্মধিক্কারের সহিত বলিলেন, "দেখলে ভীমরতি ! বলব না—না, আপনি মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল নামটা। বলে ধম্মের কল বাতাসে নড়ে—জিগ্যেস করলাম—রতন, ঘোষালগিন্নি আছে কেমন বলতে পারিস ?···ঘোষালগিন্নি তোমার কুপোকাৎ হয়েছেন। চারটে ভোজ বাদ গেছল, আর লোভ সামলাতে পারেন কি ? রেণুর সাধে তাড়াতাড়ি ভাব ক'রে নিয়ে চারটে ভোজের খাওয়া একসঙ্গে খেয়ে···"

ঘোষালগিন্নির মুখটা একেবারে পাঁশুটে হইয়া গেল। যেন অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন, "রতন এই কথা বললে ঠাকুরঝি, রতন?"
পিসী বলিলেন, "তুই মানুষ চিনিস না বউ, সেই জন্যেই তো তোর কথা ভেবে মরি। তিথিই করতে থাকি আর যাই করতে থাকি, মনে হয়—আপনভোলা মানুষ—বউটা কার না কার কাছে বোধ হয় অপদস্থ হচ্ছে।"
ঘোষালগিন্নির পাঁশুটে মুখটায় আবার রং ফিরিয়া আসিতে লাগিল, কান দুইটা রাঙা হইয়া উঠিল; শুধু প্রশ্ন করিলেন, "রতন ওই কথা বললে?"
পিসী গলাটা একেবারে চাপিয়া আনিলেন, ছোবলমারা গোছের করিয়া হাতটা নাড়িয়া বলিলেন, "শুধু রতনই বলি কেন গো। ঐ চাটুজ্যেগিন্নি—সেধে তো যেতে চায় নি; আত্তিস্য দেখিয়ে ভাব ক'রে নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে গেলি একটা মানুষকে, তার পরে ওই কথা?"
ঘোষালগিন্নি বিস্ময়ের উপর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "চাটুজ্যেগিন্নি!"
"ঘোষালদা ঠিকই বলতেন বউ, তুই আর বাড়লি নি, যেমন কনে বউটি এসেছিলি, তেমনিই রয়ে গেলি।—মাগী কম নাকি? গেছলাম কিনা, বলি ক'দিন পরে এলাম, একবার দেখাটা ক'রে আসি—সে কী চিপটেন কেটে কেটে কথা মা! কী হাসি!—কী ছড়া কাটা!—'সেই তো মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি?'—ঠাকুরের শ্রাদ্ধয় মুখ ফিরিয়ে থেকে, এলি কিনা, সাধের খাওয়ার সময়! এটুকু লোভ সামলানো গেল না?"
ঘোষালগিন্নি উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। কনে বউ-এর সঙ্গে তাঁহার নিজের কোনও যুগে কোনও সাদৃশ্য ছিল কি না সন্দেহ; আর সে-কথা ভুক্তভোগী ঘোষালদার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। চাটুজ্যেদের লইয়া পাড়ার অন্তত কুড়ি বাইশখানা ঘর অনায়াসে শুনিতে পারে কণ্ঠস্বরকে এইরকম চড়া পর্দায় বাঁধিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সেধে গিয়েছিলুম? আমায় বলে কি না—সেধে গিয়েছিলুম?—মনে নেই—শুধু পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিল?—আন্না-বামনি যাবে সেধে নেমতন্ন খেতে?"
অন্নদাপিসী বলিলেন, "চুপ কর্ বউ, লোকে মনে করবে আমি বুঝি তোকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে গেলুম। মুয়ে আগুন, আমার নিজের বলে মরবার ফুরসত নেই—যাই বউ, চুপ কর,—এদিকে রোদটা দেখতে দেখতে চড়চড় ক'রে উঠেছে—চাঁদি ফেটে যাচ্ছে মাথার। নে, মাথা গরম করিস নি; একে তোর মাথার রোগ লেগেই আছে।"
রোদে অবশ্য চাঁদি ফাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু গলি হইতে ফিরিয়া অন্নদাপিসী যখন রাস্তায় পড়িলেন, তখন তাঁহার মুখটা পূর্বের চেয়েও প্রসন্ন। ঘোষালগিন্নির গলা ক্রমেই পর্দায় পর্দায় চড়িয়া উঠিতেছে। যখন মোড়টা ফিরিবেন একবার ঘাড়টা ফিরাইয়া পিসী দেখিলেন চাটুজ্যেগিন্নি চীৎকারের চোটে পাড়া মাথায় করিতে করিতে ধীরে ধীরে আসিয়া ষষ্ঠীতলায় গলিটার মাথায় দাঁড়াইলেন। পিসী তাড়াতাড়ি মোড়টা ফিরিয়া পা চালাইয়া দিলেন।

রাস্তাটা দীনু ঘোষের পুকুরের পাশ দিয়া ঘুরিয়া ডাইনে বুড়ো শিবের ভাঙা মন্দির রাখিয়া আবার মোড় ফিরিয়াছে, তারপর সোজা গঙ্গার ঘাটে চলিয়া গিয়াছে। মন্দিরের সামনেই, রাস্তার অপর দিকে একটা শান-বাঁধানো ঘাট। নিচের রানায় চরণ ঘোষের বিধবা বোন বাতাসী একটা কাপড়ে সাবান দিতেছে আর নিজের মনেই কি একটা কথা লইয়া গরগর করিতেছে। মেয়েটাকে পাড়ার সকলেই সাধ্যমত এড়াইয়া চলে বলিয়া সর্বদাই নিঃসঙ্গ থাকে, তবে কখনও নির্বাক থাকে না। বাতাসীর নিয়ম হইতেছে সে বসিয়া কাজই করুক বা উঠিয়া চলাফেরাই করুক পাশে প্রয়োজন মত একটি, দুইটি বা ততোধিক মানুষ রহিয়াছে এরূপ ধরিয়া লইয়া নিজের বক্তব্য বলিয়া চলে। কাল্পনিক মানুষের সহিত বাক্যালাপ যদি বাস্তবিক মনুষ্যে শুনিতে পায়, গ্রাহ্য করে না। কেহ যদি শোনেও তো টুকিতে সাহস করে না।—বাতাসী ডাকসাইটে কুঁদলি মেয়ে।



কেহ যদি অন্নদাপিসীর মুখের পানে চাহিত, মনে করিত পিসী যেন মেঘ না চাহিতেই জল পাইয়াছেন। বাতাসী মুখ নিচু করিয়া একমনে কাপড়ে সাবান দিতেছিল, পিসী মন্দিরের দিকে মুখ করিয়া একটা গলা-খাঁকারি দিলেন।

বাতাসী মুখ তুলিয়া বলিল—"অনা-পিসী নাকি গো? কখন এলে?" পিসী দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঘাটের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কে, বাতাসী? আমায় কিছু বললি নাকি?"

বাতাসী সাবান দেওয়া বন্ধ করিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "জিগ্যেস করছিলাম, কখন এলে?—এই শুনলাম তিত্থি করতে গেছ, এক বচ্ছর এখন আসবে না—জানি না বাপু, কত কথাই যে রটাতে পারে সব! খেয়ে-দেয়ে কাজ তো আর নেই।"

বাতাসী হঠাৎ কান খাড়া করিয়া একটু শুনিল, জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোষালগিন্নির গলা শুনছি না? ওই এক মানুষ, সকাল থেকেই আরম্ভ করেছে। কি ব্যাপার অনা-পিসী? তুমি তো ওই দিক দিয়েই আসছ।"

পিসী বলিলেন, "থ্যামা দে বাছা, খাই দাই গাজন গাই, কারুর কথায় থাকি না। সমস্ত রাত জেগে শরীরটা ভাজা ভাজা হয়ে রয়েছে, ভাবলাম গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি। কে গলা বের করছে, কে ষষ্ঠীতলায় দাঁড়িয়ে কার বেটা পুত কাটছে ওসব

খোঁজ রাখি না। তবে একটা কথা আসতে আসতে যেন কানে গেল—কান দিই না, তবে 'বাতাসী বাতাসী' করছে শুনে…না, থাক্ বাছা, আবার ভাববে সবাই—"

বাতাসী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কি কথা, বল পিসী, আমার মড়া মুখ দেখ। আমি জানি বাতাসী সবার বুকে বাঁশ দিয়ে ডলছে, বাতাসীর কেউ ভাল দেখতে পারে না।"

পিসী একবার চারিদিকে চাহিয়া যেন নিতান্ত নিরুপায়ভাবে বাতাসীর মুখের পানে চাহিলেন, তাহার পর আগাইয়া গিয়া গলা খাটো করিয়া বলিলেন, "কড়া দিব্যিটা খপ ক'রে দিয়ে বসলি বাতাসী, তোদের যেন কি হয়েছে!—হ্যাঁলা, রেণুর সাধে, ঘোষালগিন্নির পায়ে ধ'রে সাধাসাধি ক'রে নিয়ে গিয়ে ভাব করাবার তোর এমন কী মাথাব্যথা ধরেছিল?—যশের জায়গা বড়, যশ নিতে গেছলি, এখন সামলা।"

বাতাসী কাপড়টা গুটাইয়া লইয়া পাশের গাদার উপর রাখিয়া দিয়া হাত দুইটা হাঁটুর উপর রাখিয়া সোজা হইয়া বসিল, সুর টানিয়া বলিল, "কী—বাতাসী পায়ে ধ'রে ভাব করাতে গেছে?—বাতাসী?"

পিসী বলিলেন, "আমি বললাম, সে কথা; বললাম সে তো থাকে না বাপু কারুর কথায়। তা থাক বাছা, রোদ এদিকে চড়চড়িয়ে উঠছে। মাথা গরম করিস নি বাতাসী, ভালর যুগ নয় তো, তোরই দোষ যে নোকের উবগার করতে গেছলি।—আমার নামটা আর করিস নি বাছা, ব্যাগ্গতা করি, নেহাত দিব্যি দিয়ে বললি, তাই"—

যাইতে যাইতে বলিলেন, "আজ বিকেলে একবার আসবি বাতাসী, বদ্যিনাথের পেসাদ নিয়ে আসবি একটু।"

মোড়ের মাথায় একবার মুখটা ঘুরাইয়া দেখিলেন বাতাসী কাপড়-চোপড় সব বাঁ হাতে জড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। পিছন হইতে দেখিতে হইয়াছে যেন একটা ফণাধরা গোখরো সাপের মত।

মোড় ফিরিতেই দেখা হইল রতনের ভাইপো গোবরার সঙ্গে। পিসী প্রশ্ন করিলেন, "তোর পিসী কোথায় রে?"

গোবরা বলিল, "এই মাত্তোর নাইতে গেলেন, গঙ্গায়।"

"মুয়ে আগুন, আমারই সাতপহর বেলা হয়ে গেল, পাঁচ ভূতের পাল্লায় প'ড়ে। যত মনে করি থাকব না এদের কথায়, তা ছাড়বে?" পিসী পা চালাইয়া দিলেন।

রতন স্নান সারিয়া উঠিয়া আসিতেছিল, পিসী চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, ওমা! রতন, তুই এখানে?—আর তোর নামে ওদিকে—"

সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা উৎকট উদ্বেগের ভাব ফুটিয়া উঠিল যে রতন পিসীর ত্বরিত প্রত্যাগমনের কথাটাও তুলিতে ভুলিয়া গেল। স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, "কি কথা জেঠাইমা? আমায় নিয়ে কি কথা আবার?"

পিসী বলিলেন, থাক্ বাপ্, না জানিস ভালই। পিরথিমিতে যে যত কম জানতে পারে সেই তত ভাগ্যবতী। বাড়ি যা।—তোর মেয়েটা আছে কেমন?"
রতন ব্যাকুল আগ্রহে ধরিয়া বসিল, "না, বলতেই হবে তোমায় জেঠাইমা।"
"এই দেখ বেয়াড়া জিদ মেয়ের!—তোমার মতন নির্ঝঞ্জাট মানুষের কেন গায়ে প'ড়ে পরের অত উবগ্গার করতে যাওয়া বাছা? ওসব বাই ছাড়।"
"কি উবগ্গার করেছি জেঠাইমা, আমার তো—"
"কি উবগ্গার করেছ তা আমিই কি জানি বাছা? সমস্ত রাত জেগে শরীরটা ভাজা ভাজা হয়ে রয়েছে, মনে করলাম যাই একটা ডুব দিয়ে আসি গঙ্গায়। বড় বউমা বারণও করলে; ব'লে, মা, হা-ক্লান্ত হয়ে রয়েছ, এইখেনেই তোলা জলে নেয়ে নাও। না তার কথা কেটে আসতাম, না হ'ত-শুনতে।—ষষ্ঠীতলায় এসে দেখি হাট ব'সে গেছে যেন।···হ্যাঁগা, ব্যাপার কি? কিসের এত গণ্ডগোল এখানে?···কে কার কথা শোনে! সব অগ্নিমূর্তি হয়ে রয়েছেন। শেষে বাতাসী ছুঁড়ী বললে, রতনদিদি এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে, দুটো বাড়িতে মুখ-দেখাদেখি ছিল না, পাড়া ঠাণ্ডা ছিল; নিষ্কম্মা মানুষ, ও'র আর সেটা সহ্য হ'ল না—গেলেন ভাব করাতে—এখন স'রে দাঁড়িয়েছে কেন? দেখে যাক এসে—"
রতনের সমস্ত শরীরটা হঠাৎ কঠিন হইয়া উঠিল। বলিল, "বাতাসী হারামজাদী এই কথা বলেছে?—ছোটলোকের দুটো পয়সা হয়েছে কিনা। আছে সে ষষ্ঠীতলায়?"
অন্নদাপিসী বলিলেন, "থাক্ না থাক্ তুমি এখন যেতে পাবে না সেখানে বাছা।—আর, আমি বলেছি এ কথা যেন বলতে যেও না, ব্যাগ্গতা করছি; নেহাত তোকে বললে গায়ে লাগে, তাই। তাও বলতুম না, জানি অসইরন সইবার পাত্তোর নোস্ তুই, শিবুঠাকুরপোরই মেয়ে তো—নেহাত কোট ক'রে বসলি—শুনে তবে ছাড়বি—"
পিসী গলাটা আবার খাটো করিয়া লইলেন, বলিলেন, "তবে বলতেই যখন হ'ল—ওই ঘোষালগিন্নি মাগীই কি কম নাকি?—ভাব করাবার নাম ক'রে নিয়ে গিয়ে কি অপমান করিয়েছিস? গলা বের করে জাহির ক'রে বেড়াচ্ছে—আর চাটুজ্যেগিন্নিকেও নাকি কি সব বলেছিস?—খল, পেটে পেটে জিলিপির প্যাঁচ?—"
তিনজনের অভিযোগে রতন যেন একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল, দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বলিল, "ওরা এখন আছে সবাই ওখানে জেঠাইমা?"
"না, কেউ নেই; তুমি সোজা বাড়ি যাও। এই কড়কড়ে রোদ্দুর মাথায় ক'রে তোমায় সেখানে যেতে হবে না এখন। তুই বরং দাঁড়া, আমি একটা ডুব দিয়ে উঠে আসছি। খবরদার যাবি নি রতন—"
জলে নামিবার পূর্বে পিসী একবার ঘুরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন ঘাটের কাদা, কাঁকর অগ্রাহ্য করিয়া রতনপ্রায় পাগলের মত হন হন করিয়া উঠিয়া যাইতেছে।
স্নান করিয়া অন্নদাপিসী বাঁ হাতে কমণ্ডলু লইয়া এবং ডান হাতে মালা জপিতে

জপিতে যখন ফিরিলেন, ষষ্ঠীতলায় তখন কান পাতা দায়। গলির মুখের কাছে একটি বড় দলের মধ্যে দাঁড়াইয়া ঘোষালগিন্নি ; ষষ্ঠীতলায় একদিকে বাতাসীর সুপুষ্ট দল, একদিকে রতন, তাহার সঙ্গে তাহার নিজের পাড়ার কয়েকটি মেয়ে, ওদিকে বাড়ির মেয়ে বউ পরিবৃতা হইয়া চাটুজ্যেগিন্নি। কে কাহার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে, অথবা কে কাহার সঙ্গে করিতেছে না, বোঝা শক্ত। নথের ঝাঁকানি, বিশ ত্রিশ জোড়া হাতের বিচিত্র ভঙ্গী, কটু এবং কখনও অশ্রাব্য উক্তিতে ষষ্ঠীতলা গমগম করিতেছে। বাতাসীর কেরামতি একটা দেখিবার জিনিস। সে গাছকোমর বাঁধিয়া একবার ঘোষালগিন্নির দলের মোহড়া লইতেছে, সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিয়া হাত, পা, কোমর, মাথা নাড়িয়া চাটুজ্যেগিন্নিকে যথোচিত উত্তর দিতেছে এবং পরক্ষণেই পাশে রতনের দলকে বাক্যবাণে জর্জরিত করিয়া তুলিতেছে।

অন্নদাপিসী আসিতেই সকলেই তাঁহাকে চারিদিক থেকে সাক্ষী মানায় ব্যাপারটা আরও উগ্র হইয়া উঠিল।

পিসী কিন্তু কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। মালা জপিতে জপিতে স্থির দৃঢ় পদে ভিড়ের মধ্য দিয়া ষষ্ঠীঠাকুরের চাতালের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কমণ্ডলুর জলটি ঠাকুরের মাথায় ঢালিয়া দিয়া আবার নির্বিকারভাবে মালা জপিতে জপিতে বাহির হইয়া গেলেন।



সবজান্তা

নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া লিখিতে বসিয়াছি। শুনিলাম, রান্না-বান্না নাকি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

'শুনিলাম' কথাটাতে আপনারা বিস্মিত হইয়া উঠিলেন দেখিতেছি। ভাবিতেছেন বোধ হয়—রসনা কোথায় ছিল ? রসনা অবশ্য যথাস্থানেই ছিল ; তবে আহার্যের—প্রকৃত আহার্যের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পায় নাই বেচারা। এটা নিশ্চয় মানিবেন যে, আহার্য উপার্জন করিতে হইলে রসনার আর একটি শক্তিকে সক্রিয় করা প্রয়োজন—অর্থাৎ বাচনিক শক্তি। অবস্থাবিপর্যয়ে বেচারি সেইটি পারে নাই। আশা করি এবার একটা শিক্ষা হইল।

নিমন্ত্রণ যেখানটায় ছিল সে জায়গাটা আমাদের শহরের বাহিরে, প্রায় মাইল চারেক দূরে। জায়গাটি নিজেই একটি ছোটখাট শহর ; কাছাকাছি থাকায় আমাদের শহরের সঙ্গে নাড়ির একটা যোগ আছে, তবে দূরত্বটা নেহাত অবহেলার নয়, তাই দুইটি জায়গার বাসিন্দাদের মধ্যে পরিচয় যে খুব ঘনিষ্ঠ এমনও নয়। যাহাদের সঙ্গে বিষয়-কর্মের কোন যোগ আছে তাহারা অল্পবিস্তর চেনা, বাকি সকলের মধ্যে পরস্পরের দেখা হইলে, মাথা নুয়াইয়া একটি ছোট্ট নমস্কার—'কেমন আছেন ?' 'ভাল তো ?' —ঐ পর্যন্ত।

নিমন্ত্রণ-বাড়িতে পদার্পণ করিতেই গৃহকর্তা হলধরবাবুর সহিত দেখা হইল। বলিলেন, "আসুন, আসুন ; বহুদিন পরে দেখা। আমিও এদিকে কাজটার হিড়িকে আর বেরুতে পারিনি। তারপর, খবর সব ভাল তো ?"

বলিলাম—"হ্যাঁ, ভালই একরকম ; কাজটি বেশ সুসম্পন্ন হয়েছে তো ?"

এই সময় বাঁ-হাতে খুব বড় খোলের হুঁকা টানিতে টানিতে একটি কৃশ, খর্বাকৃতি ভদ্রলোক চঞ্চলপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং হুঁকাটা নিজের মুখ হইতে নিজেই যেন ছিনাইয়া লইয়া—চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া হলধরবাবুকে প্রশ্ন করিলেন, "এ্যাঁ! তুমি এখানে নিশ্চিন্দি হয়ে গল্প করছ হলধর ? ওদিকে সেই থেকে তোমায় খুঁজে

খুঁজে আমার পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেল। বলি তোমার ইয়ের জোগাড় হয়েছে ?...ঐ যে গো, কি যে বেশ বলে—দেখ, মনেই আসছে না, এত বে-বন্দোবস্তয় কি মাথার ঠিক থাকে ?" ডান হাতে মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

হলধরবাবু একটু 'কিন্তু' হইয়া বলিলেন, "এই এঁর সঙ্গে একটু আলাপ করছিলাম, মধুকাকা ; আমাদের শৈলেনবাবু, নাম শুনেছেন নিশ্চয় ?"

মধুকাকা কি মনে করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন ভুলিয়া, এক পা পিছাইয়া আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর হুঁকাটা আরও দূরে সরাইয়া চোখ দুইটা আরও কপালে তুলিয়া বলিলেন, "আরে! আমাদের সেই শৈলেনবাবু ? কৈ তুমি তো এতক্ষণ আমায় বলনি হলধর! আমি আজ গাড়ি থেকে নেমে ওবধি কত লোককে জিজ্ঞাসা করছি, আমাদের শৈলেনবাবুকে বলা হয়েছে কি না—শৈলেনবাবু আমাদের কখন আসছেন—"

হলধরবাবু নিশ্চয় এতটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং এতটা আগ্রহ প্রত্যাশা করেন নাই, আবার একটু 'কিন্তু' হইয়া বলিলেন, "এইমাত্র এলেন কি না শৈলেনবাবু। আপনার কথায় মনে হচ্ছে কাকা, যে, শৈলেনবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ রয়েছে পূর্ব থেকে।"

আমি বিমূঢ় দৃষ্টিতে লোকটির দিকে চাহিয়া ছিলাম, কেননা হাজার চেষ্টা করিয়াও মনে করিতে পারিতেছিলাম না যে ইহাকে কোথাও দেখিয়াছি। এখানে তো নয়ই। কথাবার্তার ভাবে বোধ হইতেছে এখানে থাকেও না। তবে ?

মধুকাকা কিন্তু খুব সপ্রতিভ।

হলধরবাবুর প্রশ্নে আবার চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "আলাপ! সে আজকের আলাপ না কি ? শৈলেনবাবুকে আজ দেখছি ? হলধর হাসালে শৈলেনবাবু—বলে শৈলেনবাবুর সঙ্গে আলাপ আছে দেখছি! আপনার সঙ্গে যেন আজকের পরিচয়! সেই ইয়ের কথা মনে আছে ? অবশ্য বহুদিন হয়ে গেল।"

আমি স্মৃতিশক্তিকে আলোড়িত করিবার চেষ্টা ছাড়িয়া, একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া স্খলিতকণ্ঠে বলিলাম, "আজ্ঞে খুব মনে আছে, সে কি ভোলা যায় ?'

কি খুব মনে আছে সে-সম্বন্ধে আমার নিজের কোন ধারণাই নাই। তবে ও-প্রশ্নের আমার মুখে আর ও-ভিন্ন উত্তর ছিল না।

আমার এ বিষয়ে একটু দুর্বলতা আছে।—

ইনসিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট নমস্কার করিবার জন্য কপালে হাত তুলিতে গিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। "বাই জোভ! আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি মশাই! দাঁড়ান,—"

মনে করিবার জন্য রগ দুইটা টিপিয়া একটু পরে তর্জনীটা উঁচাইয়া বলিল, "হয়েছে! লালগোলায়, স্টীমার ঘাটে।"

জন্মে কখনও লালগোলা ঘাট দেখি নাই। কিন্তু ঘায়েল হইলাম; কুণ্ঠিত স্বরে বলিলাম,—"হবে—"
"হবে কি মশায়! অবধারিত সত্য। আচ্ছা, লালগোলা ঘাটের দিকে কখনও গিয়েছিলেন কি না বলুন তো—খুব মনে ক'রে দেখুন।" স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।
আমি এত জোর মনে করিলাম যে, কপালে ঘাম জমিয়া গেল। বলিলাম, "একবার যেন গিয়েছিলাম ব'লে মনে হচ্ছে।"
"মনে হচ্ছে কি মশায়! নিশ্চয় গিয়েছিলেন। আমার তো ভুল হবার কথা নয়। অত ভুল হ'লে কি একলা মানুষ এতগুলো ইনসিওরেন্সের ব্যাপার সামলাতে পারতাম? দাঁড়ান—গাড়ি থামতেই বৃষ্টি নামল—গাড়ি লেট, ওদিকে স্টীমার ছাড়ে—ভিজে চুপসে গেছেন, সুটকেস্-সুদ্ধ—টেনে ছাতার মধ্যে নিয়ে নিলাম, আপনাকে সামলাতে নিজে পিছলে আছাড় খেলাম—মনে পড়েছে এবার?"
অল্প হাসির সহিত আমার অপলক দৃষ্টিতে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।
কপালের ঘাম মুছিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, এইবার পড়েছে মনে।"
লালগোলার ঘাটে কবে আছাড় খাইয়াছিল জানি না, তবে আমায় আপাতত প্যাঁচে বাগাইয়া দিব্য এক আছাড় দিল—নিরুপায় ভাবে ইনসিওর্ড হইলাম।

দোকানে গিয়া বলিলাম, "শাড়ি দেখাও দিকিন।" ছোকরা বেচনদার প্রশ্ন করিল, "কি রকম শাড়ি দেব?"
আমি উত্তর দেওয়ার আগেই গদির উপর হইতে দোকানী ছোকরাকে এক ধমক দিল, "খদ্দের চেন না?—আবার জিগ্যেস করছ? বের কর মাদ্রাজী, শান্তিপুরী আর গুজরাটী শাড়ির গাঁট ক'টা।···খদ্দের 'এই জিনিস চাই' ব'লেই খালাস, তারপর চোখের সামনে তাঁর পছন্দসই জিনিস বিছিয়ে দিয়েছি—আর আজকালকার এইসব ছোকরাদের দেখুন না—কি রকম শাড়ি যদি খুঁটিয়েই বলবেন তো তুই কি করতে আছিস? তা ভিন্ন, বাবু কি এই আজ প্রথম এসেছেন? বছরের মধ্যে বোধ হয় কম ক'রে ধরলেও আট দশ খেপ মাল নিয়ে যাচ্ছেন, তবুও ভুল করবি? আরে গেল!"
অবশ্য সে দোকানে এই প্রথম যাওয়া। কিন্তু সে কথা বলা গেল না। আটপৌরে একজোড়া শাড়ির দরকার ছিল; দুইজোড়া মাদ্রাজী আর একজোড়া দামী শান্তিপুরী লইয়া বাড়ি ফিরিলাম।
স্টেশনে নামিলে, তাহারই গাড়িতে নিত্য চড়ি,—চেনা লোক, বলিয়া ড্রাইভার লগেজ-সুদ্ধ একরকম জবরদস্তিই নিজের গাড়িতে টানিয়া তুলিয়াছে—এমন ঘটনা আমার জীবনে বিরল নয়।
এইসবে ক্রমেই একটা ধারণা কেমন বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে যে, কে আমায় চেনে, কাহাকে আমি চিনি, কি কি ঘটনা সব আমার জীবনে কবে কোন্‌খানে ঘটিয়াছে, এ-

-সব সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নাই, জোর করিয়া কিছু বলা নিতান্ত অশোভন। সব চেয়ে নিরাপদ—যাহারা একটু জোর করিয়া বলিবার শক্তি রাখে তাহাদের কাছে আত্মসমর্পণ।



তাহাই করি; হলধরের কাকাকে বলিলাম, "আজ্ঞে খুব মনে আছে, সে কি ভোলা যায়?"

হলধরবাবু বলিলেন, "তবে কাকা, আপনি ততক্ষণ শৈলেনবাবুর সঙ্গে ব'সে একটু আলাপ করুন, কোণের ঘরটা খালি আছে। আমি একবার ওদিকে—"

মধুকাকার শীর্ণ মুখে খুব হৃষ্টপুষ্ট একজোড়া কাঁচা-পাকা গোঁফ। তাচ্ছিল্যের হাসিতে সেটা আরও ফুলাইয়া বলিলেন, "আরে সে তুমি বলবে তবে? এতদিন পরে শৈলেনবাবুকে পেয়েছি আমি, ছেড়ে যেতে পারি কখনও, না উনিই আমায় ছাড়বেন? কি বলুন শৈলেনবাবু?"

ক্লান্তি—এবং এরই হাতে সমর্পিত হওয়ার জন্য নিরাশার মধ্যে আবার হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম—"বিলক্ষণ! তা কখনও পারি? কতদিন পরে দেখা…"

হলধরবাবু চলিয়া যাইতে যাইতে আবার ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন—"তাহ'লে আর একটা কথা ব'লে যাই কাকা, জায়গা হ'লে আপনি ও'কে একটু দেখবেন—যেন সাটের মধ্যে ব'সে ও'র খাওয়ার কোন বিঘ্ন কি অসুবিধে…"

একটা জরুরী কাজে ওদিক থেকে কে ডাকিল, "হলধরবাবু!"—"তাহ'লে আসি কাকা, নিশ্চিন্দি রইলাম" বলিয়া ত্রস্তপদে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে খবর আসিল—জায়গা হইয়াছে।

ক্ষুধায় নাড়ি চন্ চন্ করিতেছিল। প্রথমত, চার মাইল পথ ছ্যাকরা গাড়িতে অতিক্রম করার জন্য, দ্বিতীয়ত, অসহায়ভাবে মধুকাকার গল্প শুনিতে শুনিতে। হেন বস্তু নাই যা লোকটা জানে না, হেন জায়গা নাই দেখে নাই, হেন মানুষ নাই চেনে না! …বদরিকাশ্রম, রেঙ্গুন, জওহরলালের পারিবারিক জীবন, হাওড়ার নূতন পুলের কন্ট্রাক্ট,—এসব সম্বন্ধে এত পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর এর পূর্বে কোথাও পাই নাই। অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। আহারের ডাক পড়িতেই—"তাহ'লে ওঠা যাক্ এবার"—বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। একটি স্বস্তির নিশ্বাসও পড়িতে যাইতেছিল, মধুকাকা আস্তিনে টান দিয়া বলিলেন—"বসুন একটু।"

মুখের দিকে চাহিয়া চতুর দৃষ্টি হানিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত প্রশ্ন করিলেন, "বুঝেছেন তো ?"

বুঝিবার কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না, ক্ষুধার চোটে চিন্তার শক্তিও হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল, তবু হতাশ দৃষ্টিতে যতটা সম্ভব বুদ্ধির দীপ্তি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া হাসির অভিনয় সহকারে বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই ঠিক।"

বসিয়া দেখিতে লাগিলাম—একটু সুবিধামত জায়গা পাইবার জন্য নিমন্ত্রিতের দল ঠেলাঠেলি করিয়া চলিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র তৃণাসন, সামনে কাঠি দিয়া গাঁথা শুষ্ক জীর্ণ কয়েকখানি শালপত্র, পাশে আকারহীন একটি মৃৎজলাধার—মানব সভ্যতার একেবারে আদিযুগের সাক্ষ্য। হায়, তাও বুঝি আজ অদৃষ্টে জুটিল না।

শেষ লোকটি পর্যন্ত যখন চলিয়া গেল, মধুকাকা বলিলেন, "উঠুন এবার, কি বলেন ?"

বলিলাম, "হ্যাঁ, এইবার ওঠা চলে।"

ঘরে, বারান্দায়, ততক্ষণ সমস্ত আসন অধিকৃত। লোলুপ দৃষ্টিতে সুদূর কোণটি পর্যন্ত সন্ধান করিলাম, সব ভর্তি। পরিবেষকরা লুচি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। হিঙের সম্বরা-দেওয়া কুমড়ার ছক্কা আর টাটকা লুচির একটা অপরূপ মিশ্র সুবাস উঠিতেছে, তাহার সঙ্গে চারিদিকেই বুভুক্ষু স্বাস্থ্যের একটি মিষ্ট কলরব।···কি জোর কপাল এদের !

মধুকাকার ভ্রুক্ষেপ নাই, মোটা গোঁফজোড়ার পিছনে লিক্‌লিকে শরীরটি লইয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া পাশ কাটাইয়া ডিঙাইয়া চলিয়াছেন—তাঁহার উপরেই যেন আজকের সবচেয়ে গুরুভার, ভাবটা ঠিক এই রকম। শুধু বারান্দায় পহুঁছিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, "ওপরে চ'লে আসুন।"

অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ওরে পথ ছাড় দিকিন। আহা, ক'রো'খন পরিবেষণ—শৈলেনবাবু!—দেখতে পাচ্ছ না ?···ডিঙিয়েই আসুন না পাতাটা মশাই, ছেলেমানুষ ওরা, দোষ কি। এই দিকে···এই যে, নমস্কার···আমাদের শৈলেনবাবু—চেনেন বোধ হয়, ভিড়ের মধ্যে তো ও'র চলবে না। একটু ব্যবস্থা ক'রে দিগে··· আসুন শৈলেনবাবু, চ'লে আসুন—অত জড়সড় হয়ে চললে কি নেমন্তন্ন-বাড়িতে চলে ?···শৈলেনবাবু আমাদের চিরকালটা সেই একভাবেই রইলেন।"

ছাদেও অনেকগুলি লোক বসিয়াছে, তবে ভিড় অপেক্ষাকৃত কম। মধুকাকা একটি পংক্তির শেষদিকে আমায় লইয়া দাঁড়াইলেন। একটি যুবক লুচির ঝুড়ি লইয়া যাইতেছিল, হাঁক দিলেন এবং সে নিকটে আসিলে বলিলেন, "রাখ দিকিন।···একটি আসন নিয়ে এস—দু'খানা, নৈলে বসতে কষ্ট হবে শৈলেনবাবুর···আরও একটু তফাত ক'রে বেছাও হয়েছে···তিনখানা পাতায় কি দরকার ও'র। মিতাহারী সদাচারী লোক···তা দিয়েছ দাও, নেড়ে-চেড়ে খেতে সুবিধে হবে।

"নিন, এবার ব'সে পড়ুন শৈলেনবাবু। কোন ভাবনা নেই, এই আমি প্যাটি হয়ে বসলাম।"

"নাও, এইবার লুচি দাও।"

ছোকরা খান দশ-বারো লুচি গুছাইয়া লইয়া পরিবেষণ করিতে যাইতেছিল। মধুকাকা, "হাঁ—হাঁ, কর কি!" বলিয়া অর্ধেক দাঁড়াইয়া উঠিলেন, তাহার পর ডান হাতের দুইটি আঙুল বিস্তারিত করিয়া বলিলেন—"তিনখানি—হদ্দ চারখানি—খুব ফুলকো, গরম গরম বেছে, ব্যস—শৈলেনবাবুর খোরাক জান না?···আপনাকে ভেবেছে কি এরা মশাই? চারখানাই দিক্—না তিনখানা?"

লুচির গোছার পানে একবার সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস জোরে চাপিয়া বলিলাম, "না, চারখানা চলবে না।"

মধুকাকা বিজয়ানন্দে তর্জনী ঘুরাইয়া বলিলেন, "'চলবে না,' ঐ শোন। শৈলেনবাবুর খোরাক আজ দেখছি? হুঁঃ···তিনখানা, হদ্দ চারখানা। আজ কিন্তু রাত হয়ে গেছে কত! আর এতটা পথ যেতে হবে না? কিন্তু তাহ'লেও তুমি দাও চারখানাই, কোন রকমে রাজি করব শৈলেনবাবুকে।"

লুচির ওদিকে জোর তাগাদা চলিয়াছে, আড়চোখে দেখিলাম, বুদ্বুদের মতই শুভ্র-কান্তি চক্রগুলি পড়িতে না পড়িতেই অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। ওদিকে চার পাঁচ জন হিমসিম খাইয়া যাইতেছে, জোগান দিতে পারিয়া উঠিতেছে না। এ ছোকরারও টান পড়িল। মধুকাকা বলিয়া দিলেন, "বেগুন ভাজা পাঠিয়ে দাও।"

তাহার পর ডাকিলেন, "ওহে, জলের ভাঁড়!"

একটি ছোট ছেলে জল দিতেছিল, উপস্থিত হইলে বলিলেন, "ভাঁড়টি রাখ তো বাবা; একটি ভাঁড় এইখানেই লেগে যাবে, শৈলেনবাবুর জলের টান জান না তো! তুমি এই ছিলিমটি পালটে নিয়ে এস তো বাবা ··রামজীবন চাকরকে চেন তো? যাও, খাসা ছোকরা, বাঃ!"

বেগুন ভাজা আসিল।

মধুকাকা বলিলেন, "দাও।···না, দু'খানাতে হবে না, আরও দু'খানা দাও। ওটি ও'র চিরকালের পেয়ারের জিনিস—জানা আছে কি না। তোমার হাতে কি হে?"

বেগুনের পিছনে ছিল কুমড়ার ছক্কা। ছোকরা এক হাতা তুলিতেই মধুকাকা হাত উঁচাইয়া বারণ করিয়া উঠিলেন, "না, ও চলবে না। হিং দেওয়া তো? উনি ওটা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেন না।···না, দেবে একটু, শৈলেনবাবু? কি রকম রাঁধলে দেখতেন একটু,—বেশি জেদ করছি না। সামান্য একটু, আরে খাতিরে প'ড়েও তো ঢেঁকি গেলে লোকে।"

নিজের রসিকতায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

আমি কোন রকমে মাথা তুলিয়া আঙুল কয়টি জড় করিয়া বলিলাম, "খুব সামান্য দেবেন।"

ছোকরা আধ-হাতা তুলিয়াছিল, মধুকাকা ব্যস্ত হইয়া উঠায় তাহারও অর্ধেকটা ঝাড়িয়া রাখিয়া বাকিটুকু অতি সন্তর্পণে আমার পাতে দিয়া দিল। মধুকাকা বলিলেন, "যাও, ডাল পাঠিয়ে দাও।"

আহার করিতে লাগিলাম। ততক্ষণে আশে-পাশের নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আমার মিতাহার সম্বন্ধে বেশ একটি চাঞ্চল্যকর কৌতূহল পড়িয়া গেছে। ক্ষুধায় পিত্ত জ্বলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু পাছে একটুও ব্যস্ততা লক্ষিত হইলে মধুকাকার কথার সঙ্গে না খাপ খায়, সেই ভয়ে সেই চারখানি লুচি, বেগুন ভাজা আর বড়ি পরিমাণ ছক্কাকে যতটা সম্ভব টানিয়া বাড়াইতে লাগিলাম।

মধুকাকা আশ্বাস দিতে লাগিলেন, "আপনি খুব র'য়ে ব'সে চিবিয়ে চিবিয়ে খান, শৈলেনবাবু, আমি রয়েছি।"

যাহাকে কলিকা বদলাইতে পাঠানো হইয়াছিল সে ফিরিয়া আসিল। কলিকাটি হুঁকায় বসাইয়া আঙুলের টোকা দিয়া আগুনটা ঠিক করিতেছেন, এমন সময় যে ছোকরা ছক্কা দিয়া গিয়াছিল সে পিতলের বালতিতে ডাল লইয়া উপস্থিত হইল এবং হাতাটি ডুবাইয়া একটু নাড়িয়া চাড়িয়া আমার পাতে ঢালিয়া দিল। খানিকটা স্বর্ণাভ ডালের সঙ্গে আধখানা রুই মাছের মুড়া আমার পাতটিতে গড়াইয়া পড়িল।

সঙ্গে সঙ্গেই হুলস্থুল কাণ্ড! মধুকাকা হুঁকাসুদ্ধ এক রকম প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ! করলে কি হে! সব মাটি? এতক্ষণ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এসে শেষকালে দয়ে মজালে? শৈলেনবাবু রাত্তিরে মাছ খান না, বরাবর সবার একথা জানা—আর নাই জান, দেখছ তো কত সামলে কি ক'রে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে আসছি···হিং-এর গন্ধ ব'লে ডালনাটাতে পর্যন্ত এখনও হাত দেন নি, আর তুমি কি না স্বচ্ছন্দে একহাতা মুড়োসুদ্ধ ডাল হড় হড় ক'রে ঢেলে দিলে! কি রকম বেয়াক্কেলে ছোকরা! একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই···দেখছ, ঐ জন্যে আমিষ থেকে আলাদা ক'রে বসিয়ে কত হেপাজত ক'রে খাওয়ানো হচ্ছে এইটুকুও যদি বোঝবার ক্ষমতা নেই তো পরিবেষণ করতে নেমেছ কেন বাপু?"

লোক জড় হইয়া গেছে। নিমন্ত্রিতদের হাত বন্ধ, "কি হ'ল?···শৈলেনবাবুর খাওয়া গেল বুঝি?···না হয় অন্য একটা পাতা ক'রে দিক না, একটু জিগ্যেস ক'রে দিতে হয়, নিয়মই তাই পরিবেষণের।"

ছেলেটি তো লজ্জায় অপমানে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমার যেন চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছে—কতকটা অবস্থাগতিকেও, কতকটা চোখের নিচেই মসলা আর ঘৃতপক্ব নধরক্রান্তি মাছের মুড়াটার জন্য। কিন্তু মিতাহারের যশটা তখন ঘাড়ে জাঁকিয়া বসিয়াছে, অবশ্য অপযশের চেয়েও গুরুভার এবং দুর্বহ, কিন্তু ঝাড়িয়া ফেলি সে-ক্ষমতা আর আমার নাই তখন।

তবুও বলিলাম, "একটা ভুল ক'রে বসেছে ছোকরা, কি আর হবে, আমি ওগুলো ঠেলে সরিয়ে রাখছি পাতের ধারে।"

ছেলেটির জন্য কষ্ট হইতেছিল সত্য; কিন্তু পাতের একপাশে ঠেলিয়া রাখিবার আরও

একটি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা এখন আপনাদের বলিতে লজ্জা নাই। আশা ছিল, পাতের একপাশে থাকিলে কখন কখন একটু গড়াইয়া আসিবে ; মধুকাকা-বর্ণিত পেয়ারের বেগুন যেন বিষ হইয়া উঠিতেছিল।

হায় রে দুরাশা !

মধুকাকা মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "আরে না, না, না ; আপনি ভালমানুষ, বলবেনই, কিন্তু আমি ব'সে থেকে সেটা কি হ'তে দিতে পারি ? হলধর আমার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্দি আছে। না, পাতা সরিয়ে অন্য পাতা ক'রে দাও। এইবার নিয়ে এস তিনখানি লুচি—একেবারে কড়া থেকে—থাক্ দু'খানিই নিয়ে এস, একটা বিঘ্ন হয়ে গেল, চাপ খাওয়া খাইয়ে কাজ নেই, খান দু'এক বেগুন ভাজা···ছক্কা উনি ছোঁন নি, কাজ নেই জবরদস্তি ক'রে—আর যাও, নিরামিষ ডাল—কপি আছে ? হিং টিং দেওয়া নয় ? নিরিমিষ তো ?—নিয়ে এস তাহ'লে। গেরো আর কি।"



আমার পাশেই একটি বৃদ্ধ দন্তহীন মুখে পোয়াটাক ওজনের একটা ল্যাজা লইয়া কসরত করিতেছিলেন, এত গোলমালেও বিরাম ছিল না ; এবার তাহার শেষ কাঁটাটি পরিতোষ সহকারে চুষিয়া লইয়া বলিলেন, "মাছ-মাংস হ'ল আসুরিক আহার, চল্লিশের পর এসব ছেড়ে দেওয়াই ভাল ; উনি ঠিকই করেছেন।"

প্রথম ক্ষুধার দাপটটা কমিয়া গিয়াছে। সকলের, বিশেষ করিয়া বয়স্থদের মধ্যে সংযত আহারের প্রশংসা বেশ ছড়াইয়া পড়িল। সেই সঙ্গে আমারও যশটা হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিল এবং অচিরেই আমি শূন্যপাত্র সমেত সকলের পরম দর্শনীয় হইয়া পড়িলাম।

নিরামিষ ডাল আর কপি আসিল। কপিটা পুড়িয়া গিয়াছে ; কাজের বাড়িতে অল্প ও আলাদা করিয়া রাঁধা নিরামিষ তরকারিগুলা প্রায়ই যায়। তবুও তাহাই অমৃতস্বাদে দু'একবার মুখে দিয়াছি, এমন সময় শব্দ হইল, "ধোঁকার ডালনা ! ধোঁকার ডালনা চাই ? ধোঁকা ···"

আমি হাত বন্ধ করিয়া উৎকর্ণ হইয়া মুখ তুলিলাম, আশায়, আনন্দে বুকটা ঢিপ ঢিপ করিতেছে, আসল আমিষ তো পোড়া অদৃষ্টে জুটিল না, গিলটিকরা আমিষে তবু যদি একটু সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

"ধোঁকা ! ধোঁকার ডালনা !"

একটি কালো, নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন গোছের যুবা মালসা লইয়া পরিবেষণ করিতে করিতে

অগ্রসর হইতেছে ; মনে হইতেছে যেন সাক্ষাত দেবদূত। পিছন হইতে, অন্য পংক্তি হইতে তাগাদা আসিতেছে, "ধোঁকাটা একবার দেখিয়ে যাবেন মশাই!…একবার ঘুরে যেও ভাই…"
রসিক গোছের কে একজন বলিল, "একবার এস দাদা, সত্যিই যেন ধোঁকা দিও না!"
মধুকাকার হুঁকার ঘড়ঘড়ানি শুনিতেছি। সিধা হইয়া বসিয়া অপলক নেত্রে ধোঁকার দিকে চাহিয়া রহিলাম। মোগলাই গন্ধটা ক্রমেই বাতাসটাকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। গলিতদন্ত পলিতকেশ বৃদ্ধ স্খলিতস্বরে বলিলেন, "আর ফিরে ক'বার আসবে, হ্যাঁ—ও একেবারেই খানিকটা দিয়ে যাও।" পাতের মাঝখানটায় বেশ ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন। একরাশি ধূমায়মান ধোঁকার সুবাস ভুরভুর করিয়া উঠিল।
তাহার পরই একটু জায়গা ছাড়িয়া আমার পাতা। হাতায় তুলিয়া দিতে যাইতেই মধুকাকা উঠিয়া পড়িলেন এবং হাতে হুঁকা ধরিয়া কোমর আর ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাও ঢেলে, মালসাসুদ্দু, ছেড় না। আমি সেই থেকে লক্ষ্য ক'রে আছি কি না, দেখি কি করে…ডালের বেলা একবার ঘা খেয়ে শৈলেনবাবু পাত ছেড়ে সোজা হয়ে ব'সে আছেন, পাছে ভুলের চোটে আবার একটা বিভ্রাট ঘটে, তা তোমাদের কি বোঝবার কোন ক্ষমতা আছে? আপনি মুখ ফুটে বলবেন শৈলেনবাবু, যেটা খেতে চাইবেন, যেটা না চাইবেন, এত লজ্জাই কি, আর সংকোচই বা কি?—শেষে …।"
কেহ বোধ হয় অস্বীকার করবেন না যে, দারুণ ক্ষুধায় বয়সনির্বিচারে সকলকেই ছেলেমানুষ করিয়া তোলে। আমি প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া গিয়াছিলাম, কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া কুণ্ঠিত ভাবে কহিলাম, "এই বারণ করতে যাচ্ছিলাম আর কি …।"
বৃদ্ধ একটু বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলেন, "ধোঁকাও খান না?"
মধুকাকা বলিলেন, "না, শৈলেনবাবুর প্রাণ ওতে সায় দেয় না। ওটা আত্মাকে একটা প্রবঞ্চনা কিনা। মাংস খাব না তো আসল নকল কিছুই খাব না—এই হচ্ছে শৈলেনবাবুর কথা। ওঁকে তো আজ থেকে দেখছি না।"
বৃদ্ধ মুখের ধোঁকার রসে একটা সকারবহুল শব্দ করিতে করিতে বলিলেন, "কথাটা অতি উত্তম—মাংস যখন খাব না, তখন ধোঁকা খেয়ে আত্মাকে বঞ্চনা করি কেন—বাঃ, সাধু!…তবে দেবার জন্যে ছোকরা যখন তুলেছে তখন আবার রেখে না দিয়ে…"
নিরাশায় এবং তাহার উপর আবার সাধুবাদের অত্যাচারে পিত্ত যেন জ্বলিয়া উঠিল, যথাসম্ভব মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলাম—"না, না, রেখে দেবে কেন, আপনাকেই দিক্ না, কতটুকুই বা,—দাও ভাই ঐ পাতে দিয়ে দাও…"
বৃদ্ধ হাসিয়া পাতের চারিদিকের পাহাড়টা পিছনে ঠেলিয়া দিয়া ধোঁকার জন্য আর একটু জায়গা করিয়া দিলেন, বলিলেন, "ঐ এক হাতার বেশি দিও না কিন্তু। খাওয়া এদানি ছেড়েই দিয়েছি। নেহাত ধোঁকাটা একটু উৎরে গেছে, তাই…"

তরকারি-পর্ব শেষ হইল—খান পাঁচেক বেগুন ভাজা, একটু নিরামিষ ডাল আর সামান্য দুগ্ধ কপির ডালনা।

আর হ্যাঁ, শেষে একটু চাটনি জুটিয়াছিল। মধুকাকা বলিলেন, "না, শৈলেনবাবু, এতে আপত্তি করলে শুনব না ; গুরুতর আহারের পর চাটনি একটু খেতেই হবে। আচ্ছা বেশি দেবে না, আমি দেখছি…।"

মরীয়া হইয়া বোধ হয় এক্ষেত্রে মনের ভাবটা চাপিতে পারিতাম না ; কিন্তু অম্ললুব্ধ রসনা বড় বেশি সজল হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই বাক্য নিঃসৃত করা গেল না। মধুকাকার নিম্নমুখী সতর্কদৃষ্টির সামনে পিতলের চামচের একপ্রান্ত থেকে অল্প একটু রসের সঙ্গে দুইটি আলুবোখরা আর গুটি ছয়-সাতেক কিসমিস নিতান্ত অপরাধীর মত শূন্যপ্রায় পাতের উপর আসিয়া পড়িল।

হলধরবাবু উপরে আসিলেন। চারিদিকে দেখিতে শুনিতে আমার পাতের সামনে আসিয়া একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "এ কি, শৈলেনবাবুর পাতে যে কিছুই…!"

মধুকাকা হুঁকা হাতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "স—ব ঠিক আছে, তোমার কিছু ভাবতে হবে না। আমি পুরো চার্জ নিয়ে ব'সে আছি…উনি যা খান তা যথাস্থানেই পেঁছিবে, পাতে তুমি আর দেখবে কোথায় !"

বলিয়া হাঃ হাঃ করিয়া নিজের রসিকতায় আবার হাসিয়া উঠিলেন এবং তাহার পর হলধরবাবুর পিঠে গোটাকতক চাপড় দিয়া বলিলেন, "তুমি বরং নিচের দিকটা সামলাও—আমি যেতে পারছি না, ছেড়ে নড়বার জো নেই, সব মাটি ক'রে বসবে ·· বসেইছিল সব মাটি ক'রে…"

নিচে থেকে আওয়াজ আসিল, 'তাহ'লে আমি নিশ্চিন্দি, কাকা রইলেন শৈলেনবাবু, যেন কোন…"

বলিলাম, "বিলক্ষণ !"

মধুকাকা বলিলেন, "কিছু ভাবতে হবে না ; তুমি বরং একছিলিম তামাক সেজে পাঠিয়ে দাও ··এখানে সব নির্ভুল চলবে,—আজকের পরিচয় !—নাড়িনক্ষত্র জানা আছে যে…"

দই আসিল। মধুকাকা তখন হুঁকায় নূতন সাজা কলকে বসাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন, ডাইনে বাঁয়ে অল্প অল্প দুলিতেছেন,—তরকারির ফাঁড়া গেল, এখন মিষ্টান্নের আক্রমণ হইতে কোন প্রকারে আমায় যেন রক্ষা করিতেই হইবে।

"হাঁ—হাঁ—হাঁ—হাঁ—হাঁ ! না, দই নয়—ন রাত্রৌ দধি-ভক্ষণম্—দেখলে কত সাধ্যিসাধনা ক'রে, অনেক কষ্টে একটু চাটনি নিতে রাজি করালাম আর তুমি কি না সেই লোকের পাতে দই দিতে চলেচ !…তোমার হাতে ও কি ?—বোঁদে ? না, চলবে না।"

ছোকরা বলিল, "খুব খাস্তা বোঁদে হয়েছে, দিই না একটু ··"

মধুকাকা বিরক্ত হইলেন, "আমায় যদি ও'র খাওয়া সম্বন্ধে এতই অজ্ঞ মনে কর

তোমরাই ওঁকে বল—রাজি কর। তবে হলধরের কাছে আমার কোন জবাবদিহি রইল না।"

—বলিয়া মুখটা অন্যদিকে ঘুরাইয়া সঘন তামাক টানিতে লাগিলেন।

বলিলাম, "না,—খালি বোঁদে কি চলে? ওটা দইয়েরই একটা অঙ্গ কি না…"

কথাটার দুইটা মানেই হয়, আমার অদৃষ্টে সোজা মানেটাই খাটিল। মধুকাকা বিজয়ের উৎফুল্লতাই মুখটা ঘুরাইয়া বলিলেন, "হ'ল তো? তোমরাই না হয় শৈলেনবাবুকে আজ দেখছ…বলে দই-ই নিলেন না তো বোঁদে! আরে দই ছাড়া বোঁদে, সে তো হ'ল যেমন…"

তর্ক-বিতর্কেই অমূল্য সময়টা কাটিয়া যায় দেখিয়া বৃদ্ধ অসহিষ্ণুভাবে তাগাদা দিলেন, "এই ছেলেটির পাতে একটু বোঁদে।"

দেখিলাম ছেলেটির দরকার নাই, তাঁহার নিজেরই পাত শূন্য।

মধুকাকা বলিলেন, "যাও, সন্দেশটা পাঠিয়ে দাও।"

বোঁদের পরিবেষক ঘুরিয়া বলিল, "সন্দেশ হয় নি তো, রসগোল্লা আর লেডিগেনি হয়েছে, নিয়ে আসছে।"

মধুকাকা একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, "অ্যাঁ, শৈলেনবাবুকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে আর সন্দেশ করা হয়নি! হলধর এ করলে কি! আমি যার ভরসায় রয়েছি—জিনিসটা ওঁর বরাবরই প্রিয়—জবরদস্ত গোটাকতক নেয়াবই—আর তুমি বললে কি না—সন্দেশের পাটই নেই!"

সন্দেশ জিনিসটাকে আমি দু'চক্ষে দেখিতে পারি না। ও ছানার-ছাতু আমার গলা দিয়া কখনও নামে না, তাহার উপর কান্না ঠেলিয়া গলা আজ যেন একেবারে কাঠ হইয়া আছে।

মধুকাকা একেবারে মুশড়াইয়া গেলেন। রসগোল্লা আর লেডিগেনি আসিলে হতাশভাবে বলিলেন, "আরে ও কি খান কখনও শৈলেনবাবু যে বলব খেতে ওঁকে?"

খাইতে বলিলেনও না, তবে অবশ্য বারণও করিলেন না, কেমন যেন একটা হাল ছাড়িয়া দেওয়া ভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন।

আমি রসগোল্লাটা বাসি ভাল, পানতুয়া বা লেডিগেনিটা ততোধিক। কিন্তু প্রাণ ধরিয়া একটাও লইতে পারিলাম না।

তাহার কারণ, মধুকাকা দেখিলাম একেবারে দমিয়া গিয়াছেন, এঁর উপর যদি, যে রসগোল্লা-লেডিগেনি তাঁহার মতে আমার অভক্ষ্য, তাহারই দুই-চারিটা খাইয়া ফেলি তো ব্যাপারটা বড়ই মর্মন্তুদ হইয়া পড়িবে। আর মধুকাকার মতে যে-জিনিসটা ভালবাসি না, লোভের বশে সেইটাই আহার করিয়া ফেলিলে মুখ দেখাইব বা কেমন করিয়া লোকসমাজে?

যে ছেলেটি পরিবেষণ করিতেছিল তাহাকে বলিলাম, "না, আর দরকার নেই, খাওয়াটা চাপ হয়ে গেছে।"

শেষের কথাটুকু ব্যঙ্গ—শেষে ঐটুকুতেই যৎসামান্য সান্ত্বনার চেষ্টা করা গেল। হায়, কেই বা বুঝে ব্যঙ্গ!—তাঁহার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া যাওয়ায় মধুকাকা আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "দেখলে তো? আসল কথা, ও-দুটো জিনিস ওঁর রোচে না—কোন কালেই রোচে নি। তোমরা না হয় শৈলেনবাবুকে আজ দেখছ; কিন্তু আমার তো আজকের পরিচয় নয়, শৈলেনবাবু কি খান আমার কাছে লিখিয়ে টিপসই ক'রে নাও; অক্ষরে অক্ষরে না মেলে, যা চাও জরিমানা দিচ্ছি, হুঁ··· কি হে ছোকরা, পান দিচ্ছ?···না, শৈলেনবাবু পান খান না।···সুপুরি লবঙ্গ দিযে একটু মসলা ক'রে নিয়ে আসবে শৈলেনবাবু? না, তাও ছেড়ে দিয়েছেন এদানি? ··"



নিমন্ত্রিতেরা সব উঠিয়া পড়িয়াছে, বৃদ্ধ বাঁ-হাতটি মাটিতে চাপিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন। চারিদিকে রন্ধনের প্রশংসা এবং তৃপ্ত উদ্গারের মধ্যে আমার চোখ ফাটিয়া জল গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। উঠিতে উঠিতে বলিলাম, "না, আজকাল হর্তুকিই খাই একটু খেয়ে উঠে; তা সে পকেটেই আছে, আপনাকে আর কষ্ট দেব না।"

একটা মস্তবড় কাজ অনেক বাধা-বিঘ্নের মধ্যে শেষ পর্যন্ত সামলাইয়া লইবার আনন্দে মধুকাকা মৃদু-হাস্যের সহিত ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলেন।



ভারত-উদ্ধার ও পাঁঠা

নিরামিষ, অর্থাৎ নুন, ছোলা আর আদা খাইয়া ভারত-উদ্ধার করা কি একেবারেই অসম্ভব ?—পাঁঠা কি খাইতেই হইবে ?

বহুদিন পূর্বে—ছেলেবেলার একটা কথা আজ মনে পড়িয়া গেল বলিয়া প্রশ্নটা করিতেছি। কথাটা ভুলিবার নয়,—মাঝে মাঝে মনে পড়ে।

যখনকার কথা তখন 'ভারত' কাহাকে বলে জানি না, 'উদ্ধার' কাহাকে বলে তাহা আরও জানি না। দেশের হাওয়াটা গরম আর সেই গরম হাওয়া থেকে এইটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি যে সায়েবদের সঙ্গে আর 'হেসে কথা কওয়া' নয়, দেখিলেই চাঁটি বসাইতে হইবে। তাহার জন্য প্রচুর ক্ষমতার দরকার। কষিয়া ডন, কুস্তি, বৈঠকে মাতিয়া গেলাম সবাই।

সবাই মানে—আমি, গোবরা, যুগল, ফ্যালারাম আর মুকুন্দ। আরও এক-আধ জন ছিল বোধ হয়, এখন ঠিক মনে পড়িতেছে না। ছেলেবেলার কথা তো সব থাকে না মনে···তখন কতই বা বয়স আমাদের ?—কাহারও বারো, কাহারও দশ ; যুগলের বোধ হয় বছর তেরো হইবে।

লাহিড়িদের পোড়ো বাড়ির খিড়কির দিকে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া আমরা আখড়া বানাইয়া ফেলিলাম। জায়গাটা খুব নিভৃত, একটেরে ; পিছন দিকটা দেওয়াল দিয়া ঘেরা, সামনের দিকটায় দোতলা বাড়িটা। পিছনের দেওয়ালের পরেই ঘন জঙ্গল—নোড়, পেয়ারা, আম, জাম, আমড়া, কলার ঝাড় ; তার নিচে আসসেওড়া, কচু, বিচুটি,—কোন ইংরেজ যদি নিজেদের বিপদের কথা টেরও পায় তো সহজে যে আসিয়া পড়িবে এমন আশঙ্কা নাই।

জায়গাটাতে সকালবেলায় হাত মুখ ধুইয়াই আমরা আসিয়া উপস্থিত হইতাম ; ডন হইত, বৈঠক হইত, কুস্তি হইত, মুগুর ছিল। এই সমস্ত করিয়া যখন যথেষ্ট শক্তি হইবে সে-সময় কোন সায়েব দুর্ভাগ্যক্রমে হাতে আসিয়া পড়িলে কি করিয়া তাহাকে বাগাইতে হইবে সেজন্য একে অন্যের ঘাড়ে লাফালাফির ব্যবস্থাও ছিল। ব্যাপারটা নিতান্ত নির্দোষ নিরাপদ ছিল না,—ফুলিয়াও যাইত, কালসিটেও পড়িত, একটু-আধটু

রক্তপাতও হইত না যে মাঝে মাঝে এমন নয়। তবে চোখে জল আনিবার রেওয়াজ ছিল না। জল আসিয়া পড়িলে তাহাকে 'ভীরু' বলা হইত। 'ভীরু' কথাটা মাত্র কয়েকদিন ব্যবহার হইয়াছিল, তারপর যুগল বলিল, 'ভীরু' না বলে ওকে 'সায়েব' বল।···যুগল আমাদের সর্দার ছিল।

মোট কথা, দিব্যি ঘেরা-ঘোরা একটা জায়গার মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে থাকিয়া একটা জাতকে মনে মনে যতটা নিচু করা যায় তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না।

এই সব করিয়া গিয়া ভিজানো ছোলা আদা আর নুন চিবাইতাম।

পাঠশালের পরে বিকালে আবার ঐ ব্যবস্থা।

উদ্দেশ্যটাও যে নিতান্ত অনির্দিষ্ট ছিল এমন নয়। মসজিদপাড়ার গোড়াতেই একটা ফিরিঙ্গি-পরিবার ছিল, তাহাদের প্রায় বছর বারো-তেরোর ছেলেটার উপর বরাবর আমাদের তাক্ ছিল।

কালো চামড়া বলিয়া দু-একজন একটু গুঁইগাঁই করিয়াছিলাম, যুগল বলিল, "লোকে একেবারেই এম-এ পাস করে না ; এ, বি, সি, থেকে আরম্ভ করতে হয় হে চাঁদ! ওর ওপর দিয়েই হাত পাকাও আগে। একেবারে কেউটে ধরে না।"

মনটা একটু খুঁত খুঁত করিতে লাগিল বটে, কিন্তু যুক্তিটা অকাট্য। স্যামুয়েলের জন্যই আমরা তর্কে তর্কে রহিলাম।

একদিন বিকালে যুগলের আসিতে বড্ড দেরি হইল। বাড়ির ভিতর দিয়া আগাছার জঙ্গল চিরিয়া সরু রাস্তাটা চলিয়া গিয়াছে। বেশ গা-ঢাকা-গোছের সন্ধ্যা হইয়া সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। অনুশীলন শেষ করিয়া আমরা উদ্বিগ্নভাবে পথের দিকে চাহিয়া আছি, এমন সময় দূরে হইতে দেখি নূতন কে একজন অতিশয় মন্থর গতিতে আমাদের পানে চলিয়া আসিতেছে ; গতিটা শুধু মন্থর নয়, একটু যেন একপেশে অর্থাৎ ডান দিকটায় একটু যেন খোঁড়াইতেছে লোকটা। সন্ধ্যার আবছায়ায় কি রকম হঠাৎ একটা আতংক হইল, যুগল নাই, তাহার উপর এ আবার নূতন মানুষ কে আসে! বোধ হয় পলাইবারই পথ খুঁজিতেছিলাম এমন সময় আগন্তুক হাত তুলিয়া থামিতে ইশারা করিল। ততক্ষণে কাছেও আসিয়া গিয়াছে, দেখি আমাদের যুগল। ভয় গিয়া তীব্র বিস্ময়ে সকলে হাঁ করিয়া রহিলাম।

যুগলের নাকের বাঁ-দিকটা ফুলিয়া ঠেলিয়া আসিয়াছে, মুখের ডানদিকটা এমন ফুলিয়া গেছে যে ঠোঁট দুইটাকে যেন মনে হইতেছে একটা ছোট পাঁউরুটি। কপালে একটা এতখানি কালসিটে—চোখ দুইটায় নাকের দিকের দুইটা কোণ প্রায় বুজিয়া আসিয়াছে। এদিকে মালকোঁচার কাপড় ছিঁড়িয়া ফাতরাফাই হইয়া গিয়াছে, পাঞ্জাবিটা গলার সামনাসামনি শেষ পর্যন্ত ছিঁড়িয়া আসিয়া কোটের মত দুইধারে সরিয়া গিয়াছে।

আমরা প্রায় সকলেই একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিলাম, "ব্যাপার কি রে যুগলো ?"

যুগল মুখ নাড়িয়া কি একটা বলিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু মুখটাও ভাল করিয়া

নাড়িতে পারিল না, কিছু বোঝাও গেল না। মুকুন্দ বলিল, "ঠিক বুঝতে পারলাম না, ভাল ক'রে বল্।"

যুগল ঝাঁঝিয়া উঠিল। তাহাতে কথাটা যদিও আরও জড়াইয়া গেল কিন্তু আওয়াজটা জোর হওয়ায় বোঝা গেল। ঝাঁঝিয়া বলিল, "বলছি—শুধু নুন-ছোলার কাজ নয়, পাঁটা খেতে হবে। তা কালার মত খালি —ভাল ক'রে বল্, ভাল ক'রে ব…"

"উঃ" করিয়া হাত দিয়া মুখের ডান-দিকটা চাপিয়া যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করিয়া বসিয়া ডাইনে-বাঁয়ে দুলিতে লাগিল।

ব্যাপারটা চোখের সামনে যতটুকু দেখিতেছি তার সঙ্গে নুন-ছোলার উপর পাঁঠা চাপানোর কি সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া সকলে পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম। দারুণ কৌতূহল হইতেছিল, কিন্তু যুগলের অবস্থা দেখিয়া, বিশেষ করিয়া মেজাজ দেখিয়া কেহই আর ঘাঁটাইতে সাহস করিলাম না।

একটু পরে যুগল নিজেই কথা কহিল প্রশ্ন করিল, "মুখটা খুব ফুলে গেছে, না রে?"

গোবরা উত্তর করিল, "ভেবেছিলাম—তুই বুঝি মুখোশ প'রে ভয় দেখাতে আসছিস সন্ধ্যে হয়েছে দেখে।"

আমি প্রশ্ন করিলাম, "বোলতা না কি রে যুগল?"

যুগল কপাল, নাক এবং ঠোঁটের উপর আলগা ভাবে হাতটা বুলাইতে বুলাইতে বিরক্ত ভাবে বলিল, "হাঁদার মত কথা ক'সনে শৈল ; বোলতা কামড়ালে এমন খাপছাড়া হয়ে ফোলে কখনও!—মাদার-ফলের মত হয়ে গেছে মুখটা।"

একটু চুপ করিয়া কতকটা রাগিয়াই ফ্যালারামকে প্রশ্ন করিল, "একলাই স্যামুয়েলকে শায়েস্তা করতে পারব বলতে গেলি কেন রে কাল?…উঃ ফোলাটা চড়চড় ক'রে বেড়ে…উঃ…"

ফ্যালারাম বলিল, "দেখলাম তুই একলা কাল গোবরা আর মুকুন্দর মোয়াড়া নিলি, তাই…"

যুগল মুখের উপর হাতটা চাপিয়া বলিল, "বকাস নি বলছি ফ্যালা। তোদের ফুর্তি বেড়েছে। মিছিমিছি উস্‌কে দিয়ে…"

মুকুন্দ বলিল, "তুই একলা যেতে গেলি কেন, আমাদের কাউকে …"

যুগল ঘাড়টা তাহার পানে একটু ঘুরাইবার চেষ্টা করিল, না পারিয়া সামনের দিকেই চাহিয়া বলিল, "বাহাদুরি রাখ্। ··যা না, তোরা তো পাঁচজন রয়েছিস।"

কথা বাড়াইয়া ফল নাই দেখিয়া সবাই আবার চুপ করিয়া রহিলাম। একটু পরে মুকুন্দ বলিল, "ওদের সুবিধে—ওরা বক্সিং জানে, তাই…"

চোখ দুইটা আরও বুজিয়া আসিতেছে, চাড়া দিয়া চাহিয়া যুগল বলিল, "থাম্, বক্সিং যেন দেখি নি কখনও। ··বেটা যেন দশভুজার মত ঘুষি চালাতে আরম্ভ ক'রে দিলে—বাগিয়ে ধরতে না ধরতে।…পাঁঠার ব্যবস্থা যদি না হয় তো ছেড়ে দে এ-সব ধাষ্টামি। চাল-কলা, কি নুন-আদা খেয়ে ও-ব্যাটাদের…"

অনেকখানি বকিয়া যুগল ক্লান্তভাবে হাতে মুখটা রাখিয়া ঘাড় কাত করিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে গোঙাইতে লাগিল।

গোবরা ভীত সম্ভ্রমের সঙ্গে বলিল, "তবুও আসল সায়েব নয়, ফিরিঙ্গি, তাও আবার কটা চামড়াও নয়।...কিন্তু পাঁঠা পাওয়া যাবে কোথায় ?"

ফ্যালারাম বলিল, "তাই তো।—হপ্তায় একবার ক'রেও তো খেতে হবে ? ওরা রোজ মাংস চালাচ্ছে, তাও আবার মুরগীর। সকালে যখন ডাকে, গলার জোরেই বোঝা যায় ওগুনোর গরমাই কত।"

অনেকক্ষণ আবার চুপচাপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যা বেশ ঘনাইয়া আসিতেছে। ওদের উপর,বিশেষ করিয়া স্যামুয়েলের উপর আক্রোশে মনটা জ্বলিয়া যেন খাখ্ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু পাঁঠার কোন উপায়ই না দেখিতে পাইয়া শুধু মাঝে মাঝে নিষ্ফল আক্রোশের দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে এক-একটা!

একটু পরে ফোলা নাকে খুব একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যুগল বলিল, "ওঠ্, রাত হয়ে গেল।...ও-ব্যাটাদের জয়-জয়কার এখনও কিছুদিন।...দেখ্ না, সবার বাড়িতেই পুজো হয়, তা এক মা-কালী ছাড়া সব দেবতাই বোষ্টোম।...ক্রমেই আরও টাটিয়ে উঠছে রে! বাড়িতে যে কি বলব..."

আমি দরদের সঙ্গে বলিলাম, "বোলতা কামড়ানোর কথাই বলিস যুগলো, মা-শেতলার দয়ায় তোর মুখটা সেই রকম নিটোল হয়ে ফুলে আসছে, না রে ফ্যালা ? আর আছে ততটা এবড়ো-খেবড়ো ?"



সবাই যেন বড্ড মন-মরা হইয়া গেলাম। অবশ্য যুগলের মুখের ফোলাটা দুই-তিন দিনের মধ্যেই কমিয়া গেল কিন্তু আর তেমন গা নাই যেন কাহারও, কতকটা হাল-ছাড়িয়া-দেওয়া গোছের ব্যাপার। আখড়ায় আসিতে হয় আসি, একটু-আধটু ডন্-বৈঠকও যে না হয় তা নয়, কিন্তু স্যামুয়েলঘটিত ব্যাপারটার আগে ভারত-উদ্ধারের উদ্দীপনায় তাহাতে যেমন একটা উগ্রতা ছিল, স্যামুয়েলকে মনে মনে চোখের সামনে দেখিতে দেখিতে ডন্-বৈঠক করিতে করিতে যেমন ঘামিয়া উঠিতাম—আর সে-জিনিসটি নাই। কেমন যেন ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। বেশির ভাগ সময়ই কাটে পাঁঠা জোগাড়ের গল্প করিয়া; কোন উপায়ই ঠাহর করিতে না পারিয়া বিষণ্ন মনে যে-যার বাড়ি

চলিয়া যাই। ছোলাতে আর ভক্তি নাই। কোনদিন ভিজাইতেই ভুলিয়া যাই; কোনদিন বা আদাই থাকে না; নেহাত শপথ লইয়া ধরা,—আঙুলের ডগায় গোট-দশ-বারো ছোলার দানা মুখে ফেলিয়া দিয়া অশ্রুধার সঙ্গে চিবাইতে চিবাইতে চলিয়া যাই।···ভীমের আদর্শে ভাতের সঙ্গে ফেন চলিতেছিল, এখন পানসে বোধ হয়।·· স্যামুয়েল যে কি মোক্ষম ঘা দিল!

হ্যাঁ, আর একটা কথা।—স্যামুয়েলের খোঁজও করা হইয়াছিল, সকলে একজোট হইয়া। দেখা গেল, সে আর একটা ছেলেকে সাথী করিয়া লইয়াছে। দুই "দশভুজার" সম্মিলিত ঘুষির হিসাব করিয়া আর কেহ ঘেঁষিলাম না।

তারপর একদিন যুগলই সমস্যার সমাধান করিল। একদিন দেখি হঠাৎ চরণদাসের মা'র নাতিকে আনিয়া হাজির। এরা জাতিতে বাগ্দী। চরণদাস মারা গিয়াছে, তাহার বুড়ী-মা এই বছর-দশেকের নাতিটিকে লইয়া দিনাতিপাত করিতেছে। বুড়ীর বাড়ি-সংলগ্ন খানিকটা জমি আছে, একটা ডোবা আছে; তরিতরকারিটা, মাছটা বেচিয়া চলিয়া যায়। একটা গোরুও আছে; আর আছে একপাল ছাগল—মাদী-মদ্দ, ধাড়ি-বাচ্ছায় অনেকগুলি।

তখন রাখিবন্ধন প্রভৃতির হুড়াহুড়ি খুব। যুগল বলিল—"আর এক ভাইকে ডেকে নিয়ে এলাম, তোমরা সবাই কোল দাও এক এক ক'রে।"

সবাই একে একে সুদামকে আলিঙ্গন করিলাম। যুগল তাহার কপালে আখড়ার মাটির তিলক দিয়া বলিল, "ভারত-উদ্ধার করতে হবে সুদামভাই!"

সুদাম নিশ্চিন্তভাবে ঘাড় নাড়িল, যেন ব্যাপারটা নারিকেল গাছে ওঠার মত বা জলে ঝাঁপাই ঝোড়ার মতই নির্ভাবনার কথা। একটা অস্পষ্ট গোছের ধারণা করিয়া লইয়াছে। বাড়ি কিংবা চারিদিকের জঙ্গলের মধ্যে কিছু স্পষ্টতর অর্থ খুঁজিয়া পায় কি না দেখিবার জন্য একবার বিমূঢ়ভাবে চারিদিকে চাহিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল, "তার জন্যে এখন তাহ'লে কি করব?"

তাহার সুপুষ্ট শক্তিমান দেহ দেখিয়া আমি বলিলাম, "একবার স্যামুয়েলকে আচ্ছা ক'রে যদি··"

যুগল কড়া চোখে ইশারা করিয়া আমায় থামাইয়া দিল। সুদামকে বলিল, "আজ তোর প্রথম দিন, এখন গোটাকতক ডন্-বৈঠক ক'রে নিয়ে বাড়ি যা। ছোলা ভিজিয়ে রেখে এসেছিলি?"

সুদাম বলিল, "হুঁ; আর একটা ছাগলের ছানা ম'রে গিয়েছিল, সেটাও রান্না আছে, সকালে ঠাকুমা-বুড়ীতে আমাতে অর্দ্দেকটা খেয়েছিনু, বাকিটা রয়েছে।"

সুদাম চলিয়া গেলে যুগল আমার পানে চাহিয়া খিঁচাইয়া বলিল, "এ ক্যাবলাকান্তের যার সঙ্গেই দেখা, খালি—'স্যামুয়েলকে ঠেঙাও'···তুই নিজে যা না!"

তারপর একটু থামিয়া সহজ কণ্ঠে বলিল, "সুদেকে এক মতলব ক'রে টানলাম।

ও-ব্যাটা বাগ্দীর পো 'ভারত-উদ্ধার' করবে, না ছাই করবে, বলে আমরাই এত ক'রে থই পাচ্ছি বড় !···ওকে ভিড়োলাম এক মতলব ক'রে।"

আমাদের কৌতূহলী দৃষ্টির পানে চাহিয়া লইয়া বলিল, "ওর ঠাকুমার অনেকগুলো ছাগল ; বাচ্চা থেকে নিয়ে সব সাইজের পাঁঠা হরদম মজুদ রয়েছে···"

সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। গোবরা বলিল, "সুদে আনবে বলেছে ?"

ফ্যালারাম বলিল, "তাহ'লে মাঝারি সাইজের আনতে বলিস যুগল···"

মুকুন্দ বলিল, "হ্যাঁ, একেবারে কচিগুলো কিছু নয়—ঘাস যেন···"

যুগল সবার মুখের পানে একে একে চাহিয়া শাসনের ভঙ্গিতে বলিল, "ব্যাস, সবাইয়ের নোলায় জল এসে গেল !···শোন্, এই বারণ ক'রে দিচ্ছি, পাঁঠা আদায়ের মতলবে ডেকেছি যদি বলিস ওকে কেউ, তো আর কিছু বাকি রাখব না। ও ব্যাটা মাংনায় পাঁঠা জোগাবার পাত্তোর কিনা !···আর চাইলেও ওর ঠাকুমা-বুড়ী দিচ্ছে অমনি ! ডাকসাইটে কেপ্পন মাগী। ও একটু এসে জ'মে বসুক, তারপর মতলব ক'রে বের করতে হবে ; ততদিন তোরাও ভাবতে থাক্ আমিও মাথা ঘামাই, যার মতলবটা লাগসই হয়।"

সুদামের জমিয়া বসিতে দেরি হইল না। বাংলা দেশের মধ্যে ওদের নাড়িতেই যা একটু গরম রক্ত আছে, কোস্তা-কুস্তির ব্যাপারে একেবারে মাতিয়া উঠিল। আখড়া খোঁড়া, জঙ্গল পরিষ্কার, ডন্-বৈঠক, মুগুর ভাঁজা, কুস্তি—একধার থেকে সব সাঙ্গ করিয়াও একটুও যেন ক্লান্তি আসে না, আরও কিছু চায়,—এক-একদিন একটু অসহিষ্ণু ভাবে যুগলকে প্রশ্ন করে, "বামুনঠাকুর, তিনি আছে কোথাকে ?—সেই যে কাকে উদ্ধার করতে হবে বলেছিলে ?"

সুদামকে সরাইয়া দিয়া এক-একদিন আমাদের পরামর্শ হয়। যুগল বলে, "কিন্তু সুদের শরীর হয়েছে দেখেছিস ?—নুন-ছোলা খাওয়া নাড়ি নয় তো যে···কিন্তু কি ক'রে সরানো যায় পাঁঠা ? বুড়ী যক্ষীর মত আগলে ব'সে আছে।"

অবশেষে একদিন সুদামের কাছেই কৌশলে পাড়া হইল কথাটা। সুদাম ভারত-উদ্ধার সম্বন্ধে অধীরতা দেখাইলে যুগল বলিল, "সে তো তোর একার কাজ নয়, সুদাম ; আমরা ক-জনেই তোয়ের না হ'লে তো হবে না।"

সুদাম একটু যেন নিরাশ হইয়া বলিল, "কেন, বীর-হনুমান তো এক রকম বলতে গেলে একাই···"

যুগল বলিল, "ভারত তো আর মা-জানকী নয় যে অশোকবনে ব'সে কান্নাকাটি করছে —হনুমান একাই গিয়ে···"

সুদাম একটু বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করিল, "তবে ?"

চেলার চেয়ে গুরুর জ্ঞান যে এমন কিছু বেশি তা নয় ; যুগল কি করিয়া বুঝাইবে কোন হদিস না পাইয়া একবার আকাশ থেকে আরম্ভ করিয়া পোড়ো বাড়িটা মায় আখড়া পর্যন্ত দৃষ্টি বুলাইয়া লইল, চেলার এ-রকম অসুবিধাজনক অজ্ঞতায় বিরক্ত

হইয়াই বলিল, "সে তুই ঠিক বুঝবি কি এখন ?—'ভারত-উদ্ধার' মানে—মানে—সায়েব দেখলে ঘুষো বসিয়ে দেওয়া—ইস্কুলে পাঠশালে ইংরিজি পড়া মুখস্থ না করা, স্বদেশী কাপড় পরা···আর এই ধরু···"

আমরা সকলে গোড়াতেই মতলব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম—একথা সেকথা করিতে করিতে সুকৌশলে আসল কথাটা পাড়িতে হইবে সুদামের কাছে আজ। বাজে কথা আসিয়া পড়িয়া দেরি হইয়া যাইতেছে দেখিয়া গোবরা আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিল না, বলিল, 'কিন্তু আসল কথা হচ্ছে পাঁঠা খাওয়া।"

সুদাম একটু বিস্মিত হইয়া চাহিতে যুগল গোবরার পানে চাহিয়া একটু রাগিয়া বলিল, "ভেঙে বল্ কথাটা—তা নয়, মাঝখান থেকে 'পাঁঠা খাওয়া'! পাঁঠা তো ওর ঠাকুমা-বুড়ীও খায়—ক'টা 'ভারত-উদ্ধার' করেছে ?"

তাহার পর সুদামের পানে চাহিয়া বলিল, "সে কথা নয়; কথা হচ্ছে—চাল-কলা খেয়ে তো সায়েবদের সঙ্গে ভেড়া যায় না,—এক একখানা লাস দেখেছিস তো ?—ওরা দু'-বেলা মাংস চালাচ্ছে, তাও মুরগীর মাংস, সেই জন্যে ··"

সুদাম হাতে আখড়ার একটা ঢেলা ভাঙিতে ভাঙিতে বলিল, "পাঁঠা তো আম্মো খাই; সকালে বাসি-করা খেয়ে এনু।"

যুগল বলিল, "তুই একা খেলেই হবে? একা তাবৎ সায়েবগুলোকে ঠেকাতে পারবি ?···"

ফ্যালারাম নিচু মুখে একটা খড় চিরিতে চিরিতে কথার গতিবিধিটা লক্ষ্য করিতেছিল। হাত থামাইয়া সুদামের পানে চাহিয়া বলিল, "তাই যুগল বলছে—আমরা আখড়ার সকলেই যাতে পাঁঠার মুখ দেখতে পাই তার ব্যবস্থা করতে হবে।"

গোবরা বলিল, "আর,এক আখড়ার একজনে পাঁঠা খায়, আর বাকি সব ছোলা চিবোয় এটা ঠিকও নয়।"

মুকুন্দ টীকা করিল, "এক আখড়ার সবাই গুরুভাই হ'ল কিনা। বোষ্টোম তো সবাই বোষ্টোম, আর—কি যে বলে—পাঁঠা খায় তো সবাই পাঁঠা খায়।"

প্রসঙ্গটা এই পর্যন্ত আসিয়া একটু বন্ধ রহিল, তাহার কারণ এবার সুদামের কিছু বলার পালা, কথাটা তাহার দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সুদাম কিন্তু 'হ্যাঁ', 'না', কিছুই না বলিয়া একটা ঘাসের শিষ তুলিয়া দাঁতে কাটিতে লাগিল।

যথেষ্ট সময় দেওয়ার পরও যখন কিছু বলিল না, ফ্যালারাম কতকটা নির্লিপ্ত ভাবে বলিল, "তাই যুগল বলছিল, তুই সুদাম যদি মাঝে মাঝে জোগাড় করতিস পাঁঠা তো আমাদের মস্ত বড় একটা সমিস্যে মিটে যেত।"

তাহাতেও উত্তর নাই দেখিয়া একটু থামিয়া বলিল,"অবিশ্যি তোর ঠাকুমাকে ব'লে।"

সুদাম ভ্রূ নাচাইয়া বলিল, "তুমিই গিয়ে কয়ে দেখ না বুড়ীকে, দেখব কেমন বুকের পাটা।"

গোবরা বলিল, "বলতেই যে হবে তার মানে কি? একটা ভাল কাজের জন্যে নেহাত দায়ে প'ড়ে পাঁঠা খেতে হচ্ছে—এতে না ব'লে সরিয়ে নিলে পাপ হয় না।"
মুকুন্দ বলিল, "তাহ'লে তো দুর্গা পুজোর জন্যে মল্লিকদের বাগান থেকে অত কষ্ট ক'রে যে গোলাপ ফুল তুলে নিয়ে আসি সেও পাপ।"
সুদাম বলিল, "পাপের কথা হচ্ছে নি; কথা হচ্ছে ও খান্দাৎ মাগীর দিষ্টি থেকে সরাবে সে এখনও মায়ের পেটে আছে। নৈলে আমিই কি নিয়ে আসতে পারতুম নি···, কবে একটা মরবে সেই ভরসায় ব'সে থাকতে হয়।"
গোবরা বলিল, "তোর ঠাকুমা শুনতে পারে কত দূর পর্যন্ত বলু দিকিন,—তোদের তো ধাড়িতে বাচ্চাতে অনেক পাঁঠা-পাঁঠী। আমার পিসী তিন দশ পর্যন্ত গোনে কোন রকমে, তারপর গুলিয়ে ফেলে ··মাল সরাবার সুবিধে হয় তাতে।"
যুগল একদৃষ্টে চাহিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া ছিল, হঠাৎ সুদামের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, তোর ঠাকুমা মানত-টানত করে না ঠাকুরদের কাছে?"
সুদাম বলিল, "আগে করত, এখন ছেড়ে দিয়েছে।"
সকলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলাম। সুদাম বলিল, "একবার ক্ষীরী ছাগলটা পর্শো হবার সময় বুড়ী মা-শেতলার কাছে জোড়া-পাঁঠা মানত করলে। ক্ষীরীর সুচরংকুলে যেই বাচ্চা হ'ল, আর গা করে না মাগী। মা মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেয়, বুড়ী এলাকারি দেয়, একের নম্বর ঝানু কিনা, বলে—ঐ ক্ষীরীর বাচ্চাই দোব, একটু গোস্তো হোক গায়ে,—অন্য ছাগলীর ছাওয়াল মেরে উলটে পাপ করতে যাব কেন? ··মা শেতলা আবার ঠাকুমার বাবা তো?—এসা পেটে ব্যথা ধরল ক্ষীরীর,—যায় যায়! ঘাট মেনে বুড়ী দুটোর জায়গায় তিনটে পাঁঠা দিয়ে এলো। কিন্তু সেই থেকে বড্ড চ'টে গেছে, আর মানতের দিকে যায় না।"
যুগল বলিল, "সে কথা হচ্ছে না, মানে ভয় করে তো মা-শেতলাকে?"
সুদাম বলিল, "যমের মতন। আর কাকেই বা ভয় করে মাগী ধরাতলে? তোমরা বামুন—মাকে দিয়ে একটা ব্যবস্থা করাও না, দা-ঠাউর, খাইয়ে পাঁঠায় অরুচি ধরিয়ে দিই।"



কয়েকদিন আরও গেল।
আখড়ায় একটু মন্দা পড়িয়াছে। যুগলের ভাবটাও একটু বিমর্ষ, মন-মরা গোছের। মাঝে মাঝে আসেও না আড্ডায়—কোথায় যে থাকে টের পাওয়া যায় না। আর-সবাই আসি আমরা, কিন্তু যুগল হইল আড্ডার প্রাণস্বরূপ,—জমে না।

তাহার পর উপরি-উপরি তিন দিন অনুপস্থিত থাকিয়া একদিন আসিয়া বলিল, "মা মুখ তুলেছেন রে, এবার যা কত পাঁঠা খাবি।"

ব্যাপারটা ভাঙিয়া বলিল—আর কোনও উপায় না দেখিয়া যুগল মা-শীতলার শরণাপন্ন হইয়াছিল। রোজ সকালে গিয়া ডাবের জল ঢালিয়া আসিত, ছুটি পাইলেই চিলেকোটার ঘরে গিয়ে ধর্না দিত, শুইবার সময়ও মাকে স্মরণ করিয়া শুইত।

মা মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন···সুদামের ঠাকুমা জ্বরে পড়িয়াছে।

যুগল বলিল, "সুদেকে ডেকে এসেছি, সে একটু ছাড়া পেলেই আসবে চ'লে। ··কিন্তু আসল জিনিসই পাওয়া গেল না এখন পর্যন্ত।" হঠাৎ ফ্যালারামের পানে চাহিয়া বলিল, "হয়েছে!···ফ্যালা, তোর বাবার তো গড়গড়া আছে, তার সট্‌কাটা জোগাড় কর্ না।"

আমরা সকলে অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে যুগলের মুখের পানে চাহিলাম।

যুগল বলিল, "সুদে আসুক, বলছি।"

ফ্যালারাম বলিল, "সট্‌কার সঙ্গে তামাকও আনব নাকি যুগলো? বাবা কলকাতা থেকে বেশ খানিকটা ফৌজদারী বালাখানা এনে রেখে গেছে।"

যুগল আর ফ্যালারাম কিছুদিন আগে তামাক ধরিয়াছে একটু একটু—তামাকটা সিগরেট অর্থাৎ বিলিতী জিনিস নয় সেই খাতিরে বা ভক্তিতে। যুগল একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "তা আনিস। দেখিস তোর বাবা এসে না আবার টের পায়।"

কথাবার্তার মধ্যে সুদাম আসিয়া পড়িল। জ্বরটা যে যুগলেরই কীর্তি, শুনিয়া বলিল, "টেঁসে যাবে নি তো? বড্ড কাতরাচ্ছে।"

যুগল বলিল, "টাঁসিবার জন্যে তো জ্বর করান নি মা-শেতলা, আমাদের কাজ হাঁসিল হয়ে গেলেই আবার চাঙা ক'রে দেবেন। সব ওঁরই হাতে তো? আর এমনি কি শুনতেন?—নেহাত দেখলেন এরা ভারত-উদ্ধারের জন্যে করেছে—দুটো দিন কাত ক'রে দিলেন বুড়ীকে।···এখন আসল কাজ যাতে আজই রাত্রে হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে; বুড়ো মানুষ, মিছিমিছি কষ্ট বাড়ানোর দরকার কি?···আমি মতলব ঠাউরেছি···"

আমরা সকলে ঘিরিয়া বসিলাম যুগলকে। সে বিশদ ভাবে আমাদের কাছে তাহার মতলবটি বুঝাইয়া দিল।

সব শুনিয়া সুদাম বলিল, "কিন্তু স্বপ্নটাও যদি মাকে দিয়ে বলিয়ে দিতে পারতে·। বড্ড হাঙ্গামা, আর যদিই কোন রকমে টের পায় বুড়ী তো··"

যুগল ভারিক্কে হইয়া একটু বিরক্তির সহিতই বলিল, "যা বলছি তাই কর্, নৈলে যাবে অক্কা পেয়ে বুড়ী। তোরা জেতে বাগ্দী, ঠাকুরদেবতার কথা বুঝিস না। একটা আবদার করলাম, শুনলেন; সব কাজ ওঁদের ঘাড়ে চাপানো ঠিক নয়।"

সেই দিন প্রায় রাত ন'টার সময় আহার করিয়া আমি, যুগল আর ফ্যালারাম

শীতলাতলায় যাত্রা দেখিবার নাম করিয়া সুদামের বাড়িতে আস্তে আস্তে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গোবরার ভূতের ভয় বেশি, মুকুন্দর বাপ সন্ধ্যার সময় কলিকাতা হইতে আসিয়াছে, তাহারা আসিতে পারিল না।
ফ্যালারাম তাহার বাপের গড়গড়ার নলটা লইয়া আসিয়াছে। তামাক জোগাড় করিতে পারিয়া ওঠে নাই।
যুগল একটা সংকেত করিতেই সুদাম বাহির হইয়া আসিল। যুগল প্রশ্ন করিল,—"কি রকম ?"
সুদাম বলিল, "নিঝুম হয়ে প'ড়ে আছে, মাঝে মাঝে এক-আধবার কাতরাচ্ছে। তবে সন্ধের চেয়ে ভালই।"



সুদামের বাড়িটা একটু একটেরেয়। একেবারে কাছে কোন ঘর নাই। আগাছার মধ্য দিয়া আমরা ঘরের পিছনে চলিয়া গেলাম। পাঁঠা অভিযানের পথে যে সাপ-খোপেরও সাক্ষাৎকার হইতে পারে সেদিকে খেয়াল নাই।
যুগল ফিস্ ফিস্ করিয়া প্রশ্ন করিল, "কোন্‌খানটা শুস তোরা, দেখা।"
ছেঁড়া-বেড়ার ঘর, অনেক উঁচুতে মাঝখানে একটা জানালা। সুদাম আন্দাজে তাহাদের বিছানার জায়গাটা বাতলাইয়া দিল।
যুগল বলিল, "এবার তুই যা ভেতরে। আমি গলিয়ে দিচ্ছি নলটা, তারপর আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে তোর ঠাকুমার মাথার ঠিক নিচে, বালিসের তলায় মুখটা ঢুকিয়ে রেখে দিবি। তারপর সব ঠিক হ'লে দুটো টোকা মারবি।…যা যা ব'লে দিছলাম সব মনে আছে তো ? যা এবার।"
যুগল প্রয়োজনীয় অস্ত্র আনিয়াছিল। ছেঁচা-বেড়াটা খুব সন্তর্পণে একটু ফাঁক করিয়া নলটা গলাইয়া দিল।…
একটু পরেই দুইটা টোকা পড়িল।
নলে মুখ লাগাইয়া যুগল চাপা স্বরে ডাকিল, "বুড়ী—বুড়ী ! · "
থামিয়া আর একটু জোরে ডাকিল, "বুড়ী শুনছিস ?"
ছেঁচা-বেড়ার ফাঁক দিয়া একটা গ্যাঙানির শব্দ ভাসিয়া আসিল। ফ্যালারাম ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "শুনেছে এবার।"
যুগল বলিল, "আমি মা-শেতলা। ক্ষীরীর বিয়ো…"

ফ্যালারাম চাপা গলায় টিপিয়া দিল—"শব্দ ক'রে বল্—ঠাকুরে কথা কইছে যে।"
যুগল সটকার মুখে চালান দিল—"ক্ষীরীর প্রসবের কথা মনে আছে ? সেই যে ফাঁকি দিতে চেয়েছিলে··· ফাঁকি দেবার সুখটা আছে মনে ?···"
গ্যাঙানিটা বাড়িয়া গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুড়ীর গলার আওয়াজ শোনা গেল—জ্বরের ঘোরে কাঁপা আওয়াজ—"সুদু জেগে আছিস ?"
সুদাম গভীর ঘুমের আড়ামোড়া ভাঙিয়া বলিল, "কেন ঠা'মা, জল খাবি ?"
"না ঘুমো ; একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখনু তাই বলছি।"
"মরগা ; কিসের স্বপ্ন দেখলি ? স্বপ্ন, না জ্বরের তারোস ?"
"না রে, মা-শেতলার স্বপ্ন দেখনু।"
"কি বলে ?"
"ক্ষীরী-ছাগলীর কথা বলছিল মা।"
"বলবে নি ? তুই জোড়া-পাঁঠার মানত ক'রে অত ভোগা দিলি···"
একটু চুপচাপ গেল। তাহার পর বুড়ী দুই-তিন বার কি যেন একটা শোঁকার আওয়াজ করিয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা সুদু, তামাকের বাস আসছে কোথা থেকে বল্ দিকিনি ?"
আমরা ভয়ে কাঁটা হইয়া গেলাম। যুগল নলটা একবার নিজের নাকে দিয়া আমাদের দুইজনের নাকে ঠেকাইল। সত্যই কড়া তামাকের গন্ধ পুরানো নলটার ভিতর ফ্যাক্ ফ্যাক্ করিতেছে।
বুড়ী আরও দুই-তিনবার হ্রস্ব নিঃশ্বাস টানিয়া বলিল, "নাঃ, সত্যিই যেন রে ! পাচ্ছিস না তুই সুদু ?"
দারুণ উদ্বেগে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া বসিয়া আছি।
যা হোক, সুদামটার বুদ্ধি আছে। খানিকটা চুপ করিয়া বলিল, "না, আমার তো স্বপ্ন নয়, পাবো ক'ন-থে' ?"
একটু চুপ করিয়া বলিল, "মা-শেতলার সঙ্গে বোধ হয় হুঁকো-হাতে মহাদেবও এসেছে ঠা'মা, তিনি আবার মায়ের বর হয় কিনা ; সেই জন্যে তামাকের গন্ধ পাচ্ছিস। ব'লে দে, হপ্তায় হপ্তায় একটা ক'রে পাঁঠা বলি দিয়ে বামুনদের পেসাদ বিলি করব। তারপর ঘুমিয়ে পড়, দু'জনেই চ'লে যাবে'খনি।···শুনছিস ঠা'মা ?—মিছিমিছি ঠাকুর-দেবতাদের মেলা দাঁড় করিয়ে রাখিস নি, তানাদের মাস্তোর একটা কাজই নয় তো···"
প্রায় মিনিট পনর-কুড়ি আমরা বুড়ীর এই প্রতিজ্ঞাটুকুর আশায় উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর ওদিকে নাক-ডাকার শব্দ আরম্ভ হইল।
ফ্যালা বলিল, "আবার চালা যুগলো, তাগাদা দে কিপ্টে বুড়ীকে। কোনমতে বললে না, দেখলি !"
বেজায় মশা কামড়াইতেছে এবং আরও কিছু যে কামড়াইতে পারে, সে চৈতন্যটাও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। মানুষের মেজাজই ঠিক থাকে না, তো শীতলার ! বিরক্তি

ও রাগের মাথায় মা-শীতলা বেশ একটু চড়া গলায়ই হাঁক দিলেন—"বুড়ী! এই কিপ্‌টে বুড়ী—যে কথাটা বললাম…"

"গাঁ গাঁ" করিয়া একটা বিশ্রী আওয়াজের সঙ্গে বুড়ী ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। ডাকিল—"সদু! সুদু!—অ সুদাম !!…আলোটা বাড়িয়ে !!…"

শেষ করিবার পূর্বেই চিৎকারের উপর আর একটা বিকটতর আওয়াজের সঙ্গে সুদামকে টানিয়া একেবারে হুড়মুড়িয়া নিচে পড়িল।—"ওরে বেরো ঘর থেকে! কি ঠেকলো হাতে লতার মতন—বালিসের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে! ··কিলবিল ক'রে উঠল!—বেরো—বেরিয়ে পড় শীগগির!···মা রক্ষে করো ··রক্ষে করো মা!!···য-টা পাঁঠা খেতে চাইবে···"



এর পরের দৃশ্য আমাদের পাঠশালা। পরের দিন সকালবেলা। পাঠশালার সামনে বাদামতলাটায় বেশ ভিড় জমিয়াছে, এক পাশে সুদাম আর সুদামের ঠাকুরমা। সামনের দিকটায় আমাদের পণ্ডিতমশাই, এক হাতে বেত,—এক হাতে একটা গড়গড়ার ছেঁড়া নলের খানিকটা। একটু বেঁকিয়া, রাস্তার এক প্রান্তে উৎকণ্ঠিত ভাবে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মাঝখানে ভারত-উদ্ধারের আমরা কয়জন—ফ্যালারাম ছাড়া। পণ্ডিতমশাই এবং আরও সকলে যেদিকে উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আছেন সেদিকে চাহিলে দেখা যায় একটি বড় মিছিলের মধ্যে, চ্যাংদোলা হইয়া হাত-পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে এবং অশ্রাব্য গালাগাল দিতে দিতে ফ্যালারাম আগাইয়া আসিতেছে

কিন্তু, এই পর্যন্ত থাক্‌।

সেই থেকে পাঁঠা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছি বলিয়া প্রশ্নটা মাঝে মাঝে এখনও মাথা চাড়া দিয়া ওঠে,—ভারত-উদ্ধার করিতে হইলে পাঁঠা কি খাইতেই হইবে?



সম্পত্তি

স্বরূপ মণ্ডল বলিল, "আদালত-আদালত একালের একটা বাই হয়েছে দাদাঠাকুর। এগুনে, মানে আমাদের সময়ে এসব ছেল না। তার আগেও ছেল না। দুর্যোধন যখন বললেন—'ছুঁচের ডগায় যতটুকু মাটি ওঠে ততটুকু পর্যন্ত দোব না, কই, এঁরা পাঁচ ভাইয়ে তো কেঁাসুলী ডেকে আদালতে গিয়ে উঠলেন না? মোট কথা, মোকদ্দমা কবলেই যে সম্পত্তি-জ্ঞানটা খুব টনটনে হ'ল একথা মানব না দাদাঠাকুর। ওটা হ'ল ট্যাকার গরমাই। শুনছেন তো ঢোলের আওয়াজটা?—ট্যাকা আছে, কলকেতা থেকে কেঁাসুলী আনিয়ে মকদ্দমা জিতে দত্তবা লবীনের বাগানের ওপর দাঁড়িয়ে নিলেমের ঢ্যাঁড়রা পিটোচ্ছে। ট্যাকার গরমাই, এ'কে সম্পত্তি-জ্ঞান বলব না।"
স্বরূপ আবার খানিকক্ষণ একমনে বাঁশের বাতাটা চাঁচিল, তাহার পর হাত থামাইয়া বলিল, "কেমন ক'রে বলব কন না, আমরা যে অন্য রকম দেখেছি কি না। বেশি দূরের কথা নয়, এই তিনটে গেরাম পেরিয়েই বাতাসপুরে। বেশি দিনেরও কথা নয় এমন, কত্তই বা আমার বয়েস হবে ত্যাখন! ধরুন দশ—জোর, বারো। যদি মনে করেন স্বরূপ মিছে বলছে তো পাশের গেরামে গিয়ে খোঁজ নিলেই হবে,—বাঞ্ছারামের নাতি-নাতকুড়েরা এখনও বাতাসপুরের ছ-আনিদের দেওয়া নাখরাজ রাজার হালে ভোগ ক'রে যাচ্চে।

"বাতাসপুরের ছ-আনি তরফের কত্তা ত্যাখন উমেশ পাল। সবে কিছুদিন আগে সম্পত্তি ভাগ হয়েছে—দশ-আনি আর ছ-আনি এই দু-তরফের মধ্যে খুব রেষারেষি। ভৈরব পাল যদি উত্তুর দিকে যায় তো উমেশ পাল যাবে দক্ষিণ দিকে! উমেশ পাল মায়ের শ্রাদ্ধে সাতখানা গেরাম ব'লে খুব ধুমধাম করলে; ভৈরব পালের সেরাদ্দ করবার জন্যে না ছেল মা, না ছেল মাসী, না ছেল খুড়ী; মেয়ের এক দূর-সম্পর্কের জ্যেঠশাশুড়ী কোথায় প'ড়ে ভুগছিল, তাকে দেশে নিয়ে এসে ঘটা ক'রে গঙ্গাযাত্রা করালে,—তারপর সেরাদ্দ যা করলে তাতে উমেশ পালের মুখে চুণকালি মাখিয়ে

দিলে একেবারে।…উমেশ পালের হাতে তখনও এক খুড়ী রয়েছে, বিধবা। কে জানে —ভাসুর-পো যেমন ক্ষেপে আছে, রেষারেষির মাথায় কখন কি ঘটিয়ে বসবে—এই ভয়ে তিনি রাতারাতি একদিন স'রে পড়ল! ভাবটা —আমার ঘটা ক'রে সেরাদ্দর কাজ নেই বাপু, কোনওরকমে দুটো দিন বাঁচি আগে! দশ বছর পরে সেতুবন্ধ তীর্থ থেকে তাঁর মিত্যুর খবর যেদিনকে পাওয়া গেল, উমেশ পাল তিলকাঞ্চন ক'রে গোনাগুনতি বারোটি বামুন খাইয়ে দায় খালাস হ'ল। দোষ দেবেন কি ক'রে দাদাঠাকুর? খুড়ীর ব্যাভারটা তো ভাল হ'ল না!

"এইরকম কাণ্ড,—পুজো বল, পাব্বন বল, অতিথি বল, কুটুম বল—সব নিয়েই রেষারেষি—এমন রেষারেষি যে, সমস্ত গেরামটা অষ্টপ্রহর সরগরম হয়ে আছে। সমস্ত তল্লাটটায় পালেদের ঝগড়া নিয়ে একটা ডাক প'ড়ে গেল! এই সময় বাঞ্ছারাম হঠাৎ কেমন ক'রে একদিন ধরা প'ড়ে গেল।

"বাঞ্ছারাম যেমন সিঁদও কাটত তেমনি আবার সুবিধে পেলে দিনমানেই গেরস্তর থালাটা, বাটিটা, কাপড়টা, গামছাটা বেমালুম পাচার ক'রে দিত। খুব হাতসাফাই ছেল, কিন্তু বিধেতাপুরুষ যখন মুখ তুলে চান, তখন হাতসাফাইয়ে আর কি করবে বলুন দাদাঠাকুর? ধরা প'ড়ে গেল।

আমি কতকটা বিস্মিতভাবেই প্রশ্ন করলাম, "অথচ বলছ বিধাতা-পুরুষ মুখ তুলে চাইলেন?"

স্বরূপ হাত থামাইয়া একটু মৃদুহাস্যের সহিত আমার পানে চাহিল, বলিল, "ধৈর্য ধ'রে সবটা শুনতে হবে দাদাঠাকুর। যদি দেখেন স্বরূপ মণ্ডল ভুল বলেছে, যেমন অভিরুচি সাজা দেবেন। ত্যাতক্ষণ একটু ধৈর্য ধ'রে শুনতে হবে…হ্যাঁ, কি যে বলছিলুম—বাঞ্ছারাম আর সেবারটায় পারলে না চোখে ধুলো দিতে, ধরা প'ড়ে গেল।…বাতাসপুরের দশ-আনি আর ছ-আনি তরফের বাড়ি দুটো পাশাপাশি; মাঝখানে কুল্যে একটা পুষ্করিণী। ভাগাভাগিতে দশ-আনি তরফের ভৈরব পাল পেলে বসতবাড়িটা; তারপরেই পুষ্করিণীটা, তারপরে কাছারি-বাড়ি। উমেশ পালের ভাগে পড়ল কাছারি-বাড়িটা। সেইটেকেই লম্বা দেয়াল দিয়ে ঘেরেঘুরে, দোতলার ওপর আর একতলা উঠিয়ে উমেশ পাল যা বাড়ি হাঁকড়ালে তার সামনে দশ-আনিদের বাস্তু কানা হয়ে গেল। ছোট তো হ'তে পারে না জ্ঞাতির কাছে?—তখন ভৈরব পালও আবার দোতলার ওপর আর একতলা চাপাতে সুরু ক'রে দিলে। মানে, খুন চেপে গেল আর কি দু-তরফের মাথায়—এ যদি বলে আমার বাড়ি দোতলা তো ও বলে আমি তেতলা তুললুম, ওর যদি তেতলা শেষ হ'ল তো এ বলে আমি চারতলা তুলব, এর চারতলা তো ওর পাঁচতলা, ওর পাঁচ তো এর ছয়, এ যদি বলে আমার ছয়, তো…"

স্বরূপ কাটারিসুদ্ধ হাতটা এক-একতলার অনুপাতে ধাপে ধাপে তুলিতেছিল। সাতের কাছে যখন আসিল, আমি তাহার হাতের পানে বিমূঢ়ভাবে চাহিতে হাতটা

নামাইয়া বলিল, "না, সাততলা পর্যন্ত উঠতে পেলে আর কে—ভৈরব পালের তেতলা শেষ হয়ে চিলেকোঠা উঠছে এমন সময় কোথা দিয়ে কি হ'ল—সমস্ত চিলেকোঠা, তেতলার খানিকটা, মায় পুরনো একতলারও কোণের দিকটা নিয়ে হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ল। ভৈরব পাল একটা ছুতোনাতো ক'রে উমেশ পালের সঙ্গে ঠিক একটা দাঙ্গা বাধিয়ে দিত, কিন্তু..."

আমি আবার বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "এতে উমেশ পালের দোষটা হ'ল কোথায় বুঝছি না তো স্বরূপ?"

স্বরূপ মৃদু হাসিয়া বলিল, "দোষ, মোকদ্দমা, সালিসী—এসব হ'ল আপনাদের একালের কথা দাদাঠাকুর, সেকালে এসব তো ছিল না। তুমি কোট্ ক'রে একতলার ওপর দোতলা চাপাতে গেলে ব'লেই তো আমার এই ক্ষতি আর অপমানটা হ'ল—সে কালের লোকেরা কথাটা এইরকম সোজাসুজি ভাবেই ধরত কিনা।...নির্ঘাত একটা হাঙ্গামা বেধে যেত এক আধ দিনের মধ্যে, কিন্তু উমেশ পালের গুরুঠাকুর ব্যাপারটা সামলে দিলে। তিনি পুকুরে চান আহ্নিকটুকু সেরে গামছাটি মাথায় পাট ক'রে দশ-আনিদের শুনিয়ে শুনিয়ে মন্তর আওড়াতে আওড়াতে ঐ পথ দিয়ে বাড়ি সেঁদুচ্ছেল, আন্দেকগুলি ইঁট নেমে মন্তরসুদ্দু তেনাকে চাপা দিয়ে দিলে। তবু মন্দের ভাল ব'লে ভৈরব পাল গায়ের জ্বালাটা গায়েই মেরে নিলে। বাড়ি পড়া নিয়ে আর কোন গোলমাল করলে না। উমেশ পালের তেমন গুরু-ভক্তি টুরুভক্তি ছেল না দাদাঠাকুর—সবার তো সমান হয় না—তধু বাতাসপুরের লোকেরা কি হয় কি না হয় করছে,—এমন সময় আপনাকে যা বলছিলুম, বাঞ্ছারাম ধরা প'ড়ে গেল।

"বাঞ্ছারামকে এ তল্লাটে সবাই চেনে, সাবধান থাকে; কিন্তু বাতাসপুর তো দূরে; সেখানে তাকে বড় একটা কেউ চিনত না। না চেনার দরুন উমেশ পালের বাড়িতে দিনমজুরীতে সে একটা কাজ পেয়ে গেছল।...দুপুর গড়িয়ে গেছে, শীতকালের বেলা, মজুরী সেরে বাঞ্ছারাম গায়ে সুতী র‍্যাপারটুকু জড়িয়ে দাঁতন করতে করতে ঠুক ঠুক ক'রে চলেছে। এইবার চানটা সেরে খুদ্ মুড়ি যা জোটে একমুঠো গালে দিয়ে আবার খাটুনিতে নামবে, এমন সময় হেঁড়ে গলায় এক ডাক—'কে যাতা হ্যায়?'

"রাস্তাটা ভৈরব পালের দেউড়ির সামনে দিয়ে। বাঞ্ছারাম ফিরে দেখে সিং-দরজায় একটা তেপাইয়ের ওপর এক বেটা নতুন পশ্চিমে দারোয়ান। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পেরে বাঞ্ছারামের বুক একেবারে শুকিয়ে গেল। কি তেওয়ারী না কি নামটা, আমার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না, এগুনে পুলিশে কাজ করত, বাঞ্ছাকে এর আগে জেলে দেখেছে। বেশ ভাল ক'রে চেনে। মুখ ফিরুতেই জিগ্যেস করলে, 'বাঞ্ছারাম আছ না? এখানে কোথা থেকে?'

"যেমন বলা উচিত—খুব এক লম্বা সেলাম ঠুকে বাঞ্ছারাম বললে, 'হ্যাঁ, আমিই দারোগা সাহেব, গতর খাটিয়ে এক মুঠো উপার্জন ক'রে যা জোটে তাতেই কোনরকমে দিন গুজরান করছি। অনেকদিন পরে দর্শন পেয়ে বড় আনন্দ হ'ল!'

"মানে, মন ভিজোবার যতরকম কথা হ'তে পারে বাঞ্ছারাম আউড়ে দিলে ; কিন্তু কথায় বলে, চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী, আর কথাতেই যদি মন ভিজবে তো পশ্চিমে বলেচে কেন ?...তেওয়ারী সব শুনে চোখ পাকিয়ে বললে—'তোমারা র‍্যাপারকে ভেতরমে ফোলা কেন ?'

"বাঞ্ছারাম একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে, 'দুটো মুড়ি কিনেছিলুম, দারোগা সাহেব, চান ক'রে উঠে মুখে দোব।...আচ্ছা, এখন তাহ'লে আসি, বড্ড তাড়াহুড়ো রয়েছে, জমিদারের মজুর খাটছি কিনা। সন্দের সময় এসে ভাং ঘুটে দিতে হবে দারোগা সাহেবকে, অনেক দিন সেবা করতে পাই নি...'

"তেওয়ারী তেপাই ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, গোঁফে একটা চাড়া দিয়ে গলা চড়িয়ে বললে, 'তোম এদিকে আবেগা কি হামকো উঠনে পড়েগা ?'

"তেওয়ারীর শরীর আগে থেকে ভারী হয়ে গেছে, বাঞ্ছারাম ছুট দিলে যে দৌড়ে ধরতে পারত এমন নয়, তবে কথা হচ্ছে যখন যেটা ঘটবার সেটা ঘটবেই কিনা দাদাঠাকুর, বাঞ্ছারাম কেঁচোটির মত সুড় সুড় ক'রে এসে কাছে দাঁড়াল। দাঁড়াতে দেরি, তেওয়ারী র‍্যাপার ধ'রে দিলে একরাম-ঝটকা। র‍্যাপারটা তো হাতেই থাকুক, একদিকে বাঞ্ছারাম ঐ হুখানে ছিটকে পড়ল, আর একদিকে এই এত বড় এক রুপোর পানের ডিবে। তেওয়ারী বললে—'উঠায় করকে লে আও।'

বাঞ্ছারাম আস্তে আস্তে ডিবেটা কুড়িয়ে এনে দিতে হাত ধ'রে আর একটা ঝটকা দিয়ে দে মার। পুলিশের কাজ ছাড়া পর্যন্ত আসামী পায় নি, হাতটা নিসপিস করছিল, মার যা দিলে তার আর হিসেব রৈল না দাদাঠাকুর ; দশ-আনি দেউড়ির আমলা গোমস্তা যে যেখানে ছিল ছুটে এল, কেউ থামাবার চেষ্টা করলে, কেউ ওরই ওপর আরও দু-ঘা বসিয়ে হাতের সুখ ক'রে নিলে। কেরমেক সোরগোলটা যখন বেড়ে গেল, তখন ছ-আনিদের তরফ থেকেও কয়েকজন এসে জুটল।

"ছ-আনি তরফের দারোয়ানের নাম পাঁড়ে। অমন লাসও কেউ এ তল্লাটে কখনও দেখে নি, অমন রুক্ষু মেজাজও না। রুটির ময়দা ঠাসছিল, চোর ধরা পড়েছে শুনে তালটা থালায় ঢাকা দিয়ে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে এসে উপস্থিত হ'ল, ভিড় ঠেলে সামনে এসে জিগ্যেস করলে, 'ক্যা হুয়া হ্যায় ?'

"তেওয়ারী দেশওয়ালীর কাছে বাহাদুরি দেখিয়ে বললে, 'শালা, রুপোর ডবে চুরি ক'রে পালাচ্ছেল পাঁড়েজী, ধরেছি।'

"পাঁড়েজী একে লোকটাই গোঁয়াব, তায়—যেমন হয়ে থাকে দাদাঠাকুর—নিজে কখনও পুলিশে কাজ করত না ব'লে তেওয়ারীর ওপর ভেতরে ভেতরে খুশি ছিল না। তার ওপর আবার যখন বাঞ্ছারামের দিকে চেয়ে বুঝলে যে, তেওয়ারী তার জন্যে কিছু বাকি রাখেনি তখন ভয়ংকর খাপ্পা হয়ে উঠল। তা ছাড়া মনিবের মেজাজও বুঝত ; জিগ্যেস করলে—'ডিবে কোথায় ?'

তেওয়ারী ডিবেটা হাতে তুলে দিলে। ডিবেটা হাতে নিয়ে পাঁড়েজী বললে—'এ তো

দেখছি আমাদের বাড়ির ভিবে। চোরকে ছেড়ে দাও।' তেওয়ারী নতুন এসেছে, দুপক্ষের সব ব্যাপারটা শোনে নি তখনও, তায় পুলিশের লোক সোজা পন্থাটিটাই জানে। একটু হতভম্ব হয়ে থেকে বললে, 'বাঃ চোরকে ছেড়ে দেবো কেন? —ধরা পড়েছে, তাকে পুলিশে দিতে হবে।'
"পাঁড়েজী একটা সুবিধেই খুঁজছেল,—পুলিশের নাম হ'তেই তো ওদের নিজেদের ভাষায় চোখা চোখা একরাশ গাল ঝাড়লে, নিজে পুলিশ ছেল না ব'লে বরাবর একটা আক্রোশ ছেল কিনা। তারপর এগিয়ে বললে—'মাল আমার, চোরও আমার, হাম য্যাসা খুশি করেঙ্গে, চোর দে-দেও।'
"তেওয়ারীরও রোখ চেপে গেল, বাঞ্ছারামকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে বললে —'কোভি নেহি ছোড়েঙ্গা, চোর সরকার বাহাদুরকা হ্যায়।'
"বলতে দেরি, চিতুনো বুকে এক রাম রদ্দা কশিয়ে তেওয়ারীকে হটিয়ে পাঁড়েজী ধরলে বাঞ্ছারামের টুঁটি টিপে; তারপর সে যা আরম্ভ হ'ল দাদাঠাকুর, সে এক রামায়ণ মহাভারতেই গপ্প শোনা যায়; প্রথমে তো নিজেদের মধ্যেই দিব্যি খানিকক্ষণ চড় ঘুষি অদল-বদল করলে দু-জনে, তারপর চোর নিয়ে টানাটানি—একজন ধরলে দুটো নড়া বাগিয়ে, একজন ধরলে দুটো পা, তারপর টানাটানি,হেঁচড়া-হেঁচড়ি—এ একবার পাঁড়েজীসুদ্দু হিড়হিড় ক'রে দেউড়ির দিকে টেনে নিয়ে যায় তো ও একবার তেওয়ারী সুদ্ধু সিংদরজার পাঁচ হাত বাইরে হিঁচড়ে নিয়ে আসে—'হামকো চোর' তো 'হামকো সরকারী চোর'! আমরা সবাই হাঁ ক'রে তামাসা দেখচি। আমি ত্যাখন খুড়োর কাছে বেশির ভাগ থাকতাম কিনা—একবার মনে হচ্ছে বুঝি নড়া দুটো ছিঁড়ে গেল, আবার মনে হচ্ছে, পাদুটো বুঝি বাঞ্ছারামের কোমর থেকে খ'সে বেরিয়ে গেল। জম্মে আর একবার মাত্র সে-রকম কাণ্ড দেখেছি দাদাঠাকুর, কলকেতার গড়ের মাঠে দু-দল গোরা খেলছেল—তা সেটা ছেল একটা কাছি নিয়ে। গোটা একটা নিরীহ মানুষ নিয়ে —আর সে-মানুষও আমাদের জানাশোনা বাঞ্ছারাম—এ ধরনের কাণ্ড আর দেখি নি কখনও। তামাসা দেখতে বোধ হয় দু-তরফে এমন শতাধিক লোক জমা হয়ে গেছে, খিস্তি খেউড় যা চলছে তার আর লেকা-জোকা নেই; ··মাঝখানে ঐ রকম সমুদ্রমন্থনের পালা চলেছে।···"
বলিলাম, "মারা গেল না লোকটা স্বরূপ? গল্প শুনেই তো আমার আদ্দেক হয়ে এসেছে!"
স্বরূপ হাসিয়া উত্তর করিল, "কথায় বলে—চোরের পরাণ ভোমরার মধ্যে থাকে দাদাঠাকুর, তাছাড়া ওকে মরতে হবে যে অন্যভাবে, ত্যাতক্ষণ পর্যন্ত ওকে ধকলটা সামলাতেই হবে কিনা—তা না হ'লে নিয়তি আর বলেছে কেন?···তারপর যা বলছিলুম,—বাঞ্ছারামের এর পরে যখন জ্ঞান হ'ল, তখন দেখে সে ছ-আনিদের কাছারির সামনে ঘাসের ওপর প'ড়ে রয়েছে, চারিদিকে একপাল লোক। পাশেই পাঁড়েজী, দশ-আনিদের দেউড়ির দিকে চেয়ে এক একটা হুংকার ছাড়ছে আর তাল

ঠুকছে—'আব দ্যাখো, কিসকা চোর হ্যায়, শালা তেওয়ারী! হামকো সামনে পুলিশগিরি ফলানে আয়া হ্যায়!'

"উমেশ পাল আহারাদি ক'রে এই সময়টা ভেতরে থাকে। রাজামানুষ, একটু রঙেই থাকে, বুঝতেই পারেন, দাদাঠাকুর। পেরায়ই তো এই রকম ব্যাপার হচ্ছে দু-বাড়ি নিয়ে, গা করে না। তেমন তেমন কিছু হ'ল—খবর গেল ভেতরে। দরকার মনে হয় বেরিয়ে এল, নয়তো হুকুম পাঠিয়ে দিলে। এই রকম ক'রে চলে। এবার তো কাণ্ডটা একটু ঘোরালোই হয়েছে—দাওয়ানজি খানসামাকে দিয়ে এত্তালা দিয়ে দিলে। খানসামা ছেল আমারই খুড়ো ভবানী মণ্ডল, দাদাঠাকুর। এত্তালা হ'ল—এই রকম রুপোর ডিবে নিয়ে চোর পালাচ্ছেল, ও-দেউড়ির দারোয়ান আটকে রেখে মারপিট করছেল, পাঁড়েজী তাকে বামালসুদ্দু ছাড়িয়ে নিয়ে এসে আটকে রেখেছে, হুজুরের কি হুকুম হয়।

"উমেশ পাল চোখ বুজে আলবোলায় তামাক খাচ্ছেল, বললে—'শির লে আও!'

"কাঁচা মাথা একটা কেটে ফেলা সে সময় খুব বেশি কথা ছেল না দাদাঠাকুর! খুড়ো বাইরে এসে হুকুম শুনিয়ে দিলে। শুনতে দেরি, মার খেয়ে বাঞ্ছারামের যে একটা ঝিমু ধরেছেল কোথায় গেল উড়ে, ডাক ছেড়ে কান্না জুড়ে দিলে। চোরের কান্না, তায় আবার মশানে যেতে বসেছে, কান্নার চোটে সারাদেউড়ি তোলপাড় ক'রে তুলে বাঞ্ছারাম এমন কাণ্ড ক'রে তুললে যে, যে একটু রঙের আমেজ ধ'রে এসেছেল, সেটা গেল চ'টে। দাওয়ানজির ভেতরে ডাক পড়ল।

"সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কত্তা উমেশ পাল জিগ্যেস করলে, 'কাঁদে কে?'

"কত্তা রঙের মুখে থাকলে দাওয়ানজিও তটস্থ হয়ে থাকত, মানে মেজাজের ঠিক থাকত না কিনা;—ভয়ে ভয়ে বললে—'ঐ ব্যাটা চোর। সামান্য একটু মাথাটা কেটে নেওয়ার হকুম হয়েছে হুজুরের থেকে, পাড়া তোলপাড় করছে,—কেউ যেন কখনও দেয়নি মাথা এর আগে! তা এক্ষুনি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে! যাই পাঠিয়ে দিই।'

"দাওয়ানজি ফিরতেই কত্তা হাতটা একটু তুলে দাঁড়াতে হুকুম করলে, বললে, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, কাজ-কম্ম ছেড়ে বাড়ি গিয়ে বস এবার। আমি কাঁচা মাথা চেয়েছি সে ব্যাটা খোট্টা দারোয়ানের।...কি অধিকারে সে আমার চোরের গায়ে হাত দেয়? পাঁড়ে কি করছেল? জানে না সে আমার হুকুম? আজ আমার চোর আটকাবে, কাল আমার ভারী আটকাবে, পরশু আমার জুড়ি আটকাবে, পরদিন আমার জমিদারীতে হাত দেবে—আমার খাস সম্পত্তির ওপর যদি এই ভাবে দখল বসায় সবাই, তো পাঁড়ে বেটা কি করতে আছে শুনি? তোমরাই বা কি করতে আছ?...যাও, আভি নেকালো সব!'

"চ'টে গেলে উমেশ পালের আবার বেশি ক'রে মালের দিকে ঝোঁক পড়ত,—খুড়োকে বোতল আনতে হুকুম ক'রে দিলে।

"দাওয়ানজি হাতজোড় ক'রে বললে, 'হুজুর, পাঁড়েজি তো সে বেটার ধাষ্টামো আর

বে-আইনির জন্যে কিছু বাকি রাখে নি,—অচৈতন্য হয়ে ও-তরফের সিংদরজার সামনে প'ড়ে আছে, হুকুম হয় তো ধড় থেকে না হয় মাথাটা আলাদা ক'রে আনিয়ে হুজুরে নজর দিই।'

"কত্তা কিছুই উত্তর না দিয়ে একটু গোঁজ হয়ে রইল, তারপর বললে, 'চোর বেটা কোথায় ?'

"দাওয়ানজি বললে, 'বাইরেই প'ড়ে আছে আধমরা হয়ে, হুজুর · বেটা চীৎকার করছিল, ঠাণ্ডা করবার হুকুম দিয়ে এসেছি।'

"'দশ-আনির বড় কত্তা কোথায়—অন্দরে ?"

"'হৈচৈ শুনে তিনি বেইরে এসেছিলেন, এখন তেওয়ারীর এজাহার নিচ্ছেন বোধ হয়, বারান্দার সামনে বেস্তর লোক জড় হয়েছে।"

"কত্তা আবার খানিকটা গোঁজ হয়ে রইল ! দাওয়ানজি একবার জিগ্যেস করলে, 'তা হ'লে চোর বেটার সম্বন্ধে যা সাজার হুকুম হয় হুজুরের···'

"কত্তা বললে, 'সাজা উমেশ পাল নিজের হাতে দেবে। হাতীশালা থেকে নতুন হাতীটা বের করতে বল, হাওদাসুদ্দু। আমি স্বয়ং আসছি।"

স্বরূপ বাতা আর কাটারিটা রাখিয়া দিয়া দুইটা হাঁটু দুই হাতে জড়াইয়া আমার দিকে মুখ করিয়া বসিল, "হাতীর তলায় চাপা দিয়ে চোর মারা হবে—স্বয়ং কত্তা থাকবেন হাতীর ওপর—সঙ্গে সঙ্গে কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল দাদাঠাকুর।

"কম ক'রে বোধ হয় দশখানা গেরামের লোক ভেঙে পড়ল। ছেলেমানুষ ব'লে খুড়ো আমায় দেখতে মানা ক'রে দেছল, আমি চুপি চুপি গিয়ে একটা ছাতিম গাছে উঠে ব'সে রইলেম। দশ-আনি তরফেরও যত লোক বাইরে এসে জমা হ'ল, দেউড়ির ছাতে মেয়েরা গিয়ে জমা হ'ল। ওদিকে দশ-আনির বড় কত্তা ভৈরব পাল গোপনে গোপনে সদর থানার লোক ছুটিয়ে ওপর ঘরের একখানি ঘরে জানালার ধারে ব'সে ওপিক্ষে করতে লাগল। সেও তো ব'সে থাকবার পাত্তোর নয়—অত বড় অপমানটা হ'ল !



"বৈকাল হ'লে উমেশ পাল বেরিয়ে এল। দাওয়ানজিকে জিগ্যেস করলে, 'ঢোল, শানাইয়ের জন্যে বলা হয়েছিল ? হয়নি বলা ?'—দাওয়ানজি চুপ ক'রে রইল। কত্তা গলা চড়িয়ে বললে, 'বলেছি নিজে সাজা দোব, আমায় কি মেয়েমানুষের মত লুকিয়ে চুরিয়ে সাজা দিতে হবে ?···নেকালো সব !' তক্ষুনি ঢুলী শানায়ীদের ডাকতে পাইক ছুটল। কত্তা হুকুম দিলে—চোরকে হাজির করা হোক।

"বাঞ্ছারামকে দু'তিনজন মিলে একরকম টাঙিয়েই নিয়ে এল। হাতীর পিঠে রূপোর হাওদাই থাকুক আর সোনার হাওদাই থাকুক্, তার তো মিত্যুই দাদাঠাকুর? একেবারে নেতিয়ে পড়ছে, মুখ দিয়ে আর রা সরছে না।

"কত্তা হুকুম দিলেন—চারজন বরকন্দাজ সাজগোজ প'রে হাজির হবে। তোষাখানা থেকে একখানা জরির পোশাক, আর কত্তার খাস আলমারি থেকে এক বোতল বিলাতী মালেরও হুকুম হ'ল। সাজার আয়োজনটা দেখে দেউড়ির চারিদিকে ভিড় চাপ বেঁধে উঠল।...এইবার তামুকটা একবার দিন দাদাঠাকুর, একটু পেসাদ পাই।"

স্বরূপ বেশ পুরাদমে কয়েকটা টান দিল। কলিকাটা একবার দেখিয়া লইয়া বলিল, "আছে এখনও খানিকটে।"

তাহার পর কলিকাটা আবার আমার হুঁকার মাথায় চাপাইয়া দিয়া বলিল, "সে অনেক কথা দাদাঠাকুর, কত আর কইব। তাই বলছিলুম যে, সম্পত্তিজ্ঞান একটা জিনিসই আলাদা, কথায় কথায় মামলা মোকদ্দমা করলেই যে সেটা খুব টনটনে বলতে হবে তা নয়।...হ্যাঁ, সেদিনকার কথা যা বলছিলুম—সদর থেকে খুনের খবর পেয়ে য্যাখন দারোগা এসে হাজির হ'ল, ত্যাখন জলুসটা ঠিক দশআনি তরফের সিংদরজার সামনে। ঝালর হাওদা দেওয়া হাতীর ওপরে ঠিক মাঝখানটিতে জরির কাপড়চোপড় প'রে বাঞ্ছারাম, বাবুর বোতলের মাল খেয়ে জয়জয়কার করতে করতে রূপোর ডিবেটা যতদূর হাত যায়, মাথার ওপরে তুলে ধরেছে—চারপাশে চারটে সাজগোজ-পরা বরকন্দাজ আসাসোঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে। নিচে দু'খানা গেরামের যত ঢুলী আর শানায়ী পেল্লায় জোরে নহবত বাজিয়ে চলেছে।

"দশ-আনিদের দেউড়ি ঘুরে, সারা বাতাসপুরটায় বারদুই চক্কোর দিয়ে, জলুসটা পোড়ো শিবমন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে থেকে বাঞ্ছারাম সুদ্দু হাতীটা মাঠে নামিয়ে দশ-আনিদের জমির পাশেই ছ-আনিদের যে একটা চাকলা আছে, তার প্রায় বিঘে পাঁচ ছয় ঘেরে মাহুত আর একটা চক্কোর দিলে; হাতীর পেছনে পেছনে একটা লোক চুণের দাগ দিতে দিতে চলল। বাঞ্ছারামের নাতি-নাতকুড়েরা আজ পর্যন্ত সেটা ভোগদখল করছে। দশ-আনিদের জমির ঠিক লাগোয়াই, দাদাঠাকুর, যেন ওরা কখনও ভুলতে না পারে আর কি।

"তেওয়ারীর কাঁচা মাথাটা নিয়ে আসতে পারে নি ব'লে কত্তা পাঁড়েজীর ওপর একটু চ'টে গেছল; তবুও পঞ্চাশটা টাকা বকশিস করলে। নৈলে যে বড় অধম্ম হয় দাদা-ঠাকুর,— সে-বেচারী চেষ্টার তো কিছু কসুর করে নি..."



ফুটবল

আবার সেই ফুটবল আসিয়া পড়িল।

ক'দিনই বা বন্ধ ছিল? এই তো সেদিনকার কথা,—গজাননের নাক থেতো হইয়া সেরখানেক রক্ত পড়িল, ষষ্ঠীচরণের পায়ের দফা রফা হইল। ষষ্ঠীর ল্যাংচানো এখনও পর্যন্ত ভাল করিয়া সারে নাই, গাঁটে ব্যথা, অমাবস্যা-পূর্ণিমায় এখনও উপোস দিতেছে।

ফুটবল আসিল। এবার আবার কাহার হাত পা মাথা নাকের উপর কিরকম দৃষ্টি কে জানে। পাঁজিতে ফুটবলের বর্ষফল দেয় না কেন? যেমন—নিকলস্ রাজা, গুপ্ত মন্ত্রী, ফল—অনাসৃষ্টি, আন্তর্জাতিক বিবাদ, অরাজকতা···জ্যোতির্বিদরা কি বলিতেছেন?—জিনিসটা তাঁহাদের গণনার বাহিরে? কিন্তু তাঁহারা কি শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে ওটা নগণ্য?

গণনার যে বাহিরে একথা আমিও স্বীকার করি, কেননা কোথায় যে যাইবে গড়াইতে গড়াইতে কিছুই ঠিকানা নাই—মাঠের ফুটবল হোক, কিংবা গলির টেনিস বলই হোক, কিংবা বৈঠকখানার আলোচনাই হোক—অর্থাৎ শরীরী ফুটবলই হোক, বা অশরীরী ফুটবলই হোক।

গজাননদের কথাটাই ধরা যাক।

সমস্ত দিনই ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। তাহার উপর প্রায় সাড়ে চারটে হইতে যেরকম তোড়ে আরম্ভ হইল, কেহ আর বাহির হইতে পারিল না। অথচ আজ নিজেদের পাড়ার দলের খেলা,—হাসি-ঠাট্টার খেলা নয়, আই-এফ-এর সেকেণ্ড রাউণ্ড! অনুপমদের বৈঠকখানায় জুটিয়াছে কয়েকজন। সবাই এখনও আসিতে পারে নাই, বৃষ্টি যেরকম জোর চলিয়াছে এখনও, আজ যে পুরা আড্ডা জমিবে না এটা ঠিক। সবাই ম্যাচের ফলাফলের জন্য উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা করিয়া আছে। যাহারা আসে নাই তাহাদের মধ্যে আছে গজানন। নটু বলিল, "গজা এলেই খবর পাওয়া যাবে, বৃষ্টি হোক বাজ পড়ুক, সে তো যাবেই দেখতে।"

ষষ্ঠীচরণ বলিল, "কিন্তু, আমার যেন মন বলছে, খেলা বন্ধ ক'রে দেবে আজ—এ দুর্যোগে খেলা অসম্ভব ; মাঠে দাঁড়াতেই পারবে না, তা খেলা !"

আড্ডার নিয়মই হইতেছে প্রায় প্রত্যেকেরই অন্তত একজন করিয়া বিরুদ্ধবাদী থাকে, ষষ্ঠীচরণ কথা কহিলে হৃষীকেশের গায়ে বিষ ছড়ায়। বলিল, "তোর মন বলছে তো ?—তাহ'লে নির্ঘাত খেলা হয়েছে আজ। তোর মনকে জিগ্যেস কর্ দিকিন কারা হারলে,—তাহ'লে বুঝতে পারব তারা জিতেছে।"

ষষ্ঠীচরণ হেলান দিয়া ছিল, সোজা হইয়া বসিল। মুখটা একটু বিকৃত করিয়া হৃষীকেশের দিকে বাড়াইয়া বলিল, "খেলিস তো ঘরের কোণে শালীদের সঙ্গে টেবিল টেনিস, বৃষ্টি হ'লে যে খেলা বন্ধ হয় তুই কি ক'রে জানবি ? হয় বন্ধ, আমার কাছে শুনে শেখ—সেবারে মোহনবাগান-ডালহৌসির খেলা বন্ধ হ'ল, তার আগের বারে এর চেয়েও কম বর্ষার জন্যে এরিয়ান্সদের অমন ম্যাচটা পোস্টপোন্ড ক'রে দিলে। কত শুনতে চাস ?"

নটু বলিল, "দেবেই যে বন্ধ ক'রে তার কোন মানে নেই। সেবারে ক্যালকাটা-মোহনবাগানের ফাইনালটা করলে বন্ধ ? আজকাল সে আগের মত কুড়ি-বাইশটি টীম নিয়ে খেলা নয় তো হুট ক'রে বন্ধ ক'রে দিলেই হ'ল…"

সমর্থন পাইয়া হৃষীকেশ শালী-শালাজ তুলিয়া বিদ্রূপের শোধ লইল। মুখবিকৃতি করা চেঁচামেচি করা তাহার প্রথা নয়। একটু বিরক্তভাবে নটুর পানে চাহিয়া বলিল, "আপনি জানেন না নটুবাবু, কেন বকছেন মিছিমিছি। বলে, ষষ্ঠীর হুকুম না নিয়ে আই-এফ-এ এক পা নড়তে পারে না। সে যখন বলছে খেলা বন্ধ আজ, তখন বন্ধ…"

ষষ্ঠীচরণ আরও রাগিয়া উঠিল ; বলিল, "আলবৎ বন্ধ। যদি মরদ হোস তো ফ্যাল বাজি রিষে,—দশ টাকা। অমন মেয়েমানুষের মত চিপটেন কাটতে সবাই পারে।… নে, এই আমি বলছি, যদি আজ খেলা বন্ধ না থাকে তো…"

এমন সময় নিতাই আসিয়া ছাতা মুড়িতে মুড়িতে ঘরে প্রবেশ করিল। হৃষীকেশ বলিল, "এই তো হাতে পাঁজি মঙ্গলবার,—নিতাই এসে গেছে,—কি রে নিতু, তোর মামা খেলতে গেছল, ফিরেছে ?

খেলোয়াড় মামার গর্বে নিতাইয়ের কথাবার্তা খুব সংক্ষিপ্ত। বলিল, "খেলা শেষ না ক'রেই ?"

অনুপম বলিল, "ষষ্ঠী, কি যেন বাজির কথা বলছিলি, থেমে গেলি কেন ?—আজ বর্ষার দিনটা দিব্যি হ'ত দশটা টাকা হ'লে…"

"হ্যাঁ, বাজি চলুক, বাজি চলুক…কথা পালটালে চলবে না…"বলিয়া একটা তুমুল সমর্থনের কলরব উঠিল !

নটু বলিল, "হ্যাঁ, তোমরা দুজনে একটা রফা ক'রে ফেল ; আমি ততক্ষণ একটা লিস্ট তোয়ের ক'রে ফেলি—কি কি হবে। আর রফাই বা কি ?—ষষ্ঠীকেই তো দিতে হয় টাকাটা…"

ষষ্ঠীচরণ বলিয়া উঠিল, "যা যা-বাঃ, ঐ বুদ্ধি নিয়ে টাকা নিবি সব!—নিতের মামা বাড়ি ফেরেনি—কাজেই বুঝে নিতে হবে মাঠে খেলা হচ্ছে! বলিহারি লজিক্‌ মাইরি! · নিতের মামা যদি রাস্তায় মাতলামি করবার জন্যে সমস্ত রাত হাজতে কাটায় তো বুঝতে হবে সমস্ত রাত মাঠে খেলা হয়েছে,—বাঃ!"

নিতাই বলিল, "তুই মাতাল বললি কাকে রে?"

"তোর মামাকে। তুই তো নিজেই সেদিন বললি—'রিসেসে এক পেগ না টানলে মামার সেকেন্ড টাইমে পা-ই ওঠে না'···"

নিতাই ডান হাতের ঘুষি বাগাইয়া বলিল, "এক পেগ্‌ মানে মাতাল?"

ষষ্ঠীচরণ প্রতিপ্রশ্ন করিল, "বাড়ি আসেনি মানে মাঠে খেলা হচ্ছে?"

"আলবত হচ্ছে।"

"আলবত মাতাল।"

"তা হ'লে নে, এই মাতালের ভাগ্নের তাল সামলা ··"

ঠিক নাক লক্ষ্য করিয়া ঘুষিটা ছুটিত,—সকলে উভয় পক্ষকে থামাইয়া দিল।



ঘরের এই গুলতানের মাঝখানে গজানন আসিয়া প্রবেশ করিল। খাঁটি ফুটবল-বাজের পোশাক,—মাথায় ওয়াটারপ্রুফ টুপি, গায়ে ওয়াটারপ্রুফ কোট, পায়ে রবারের জুতো। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই পকেট হইতে একটা চিনেবাদাম বাহির করিয়া ভাঙিয়া মুখে ফেলিয়া কোটটা খুলিতে লাগিল। ঘরের কলরবটা উহাদের দুজন হইতে সরিয়া গজাননকে কেন্দ্র করিয়া জমিয়া উঠিল।—"এই যে গজা এসেছে··· বললাম না?—আকাশ ভেঙে পড়লেও গজু ম্যাচ দেখতে যাবেই যাবে··· ফুটবল গজার প্রাণ—বললাম না?···কি খবর রে গজা—কারা হারল···এই দুর্যোগ, তুই গেলি কি ব'লে?—হ্যাঁ বুঝতাম—গিয়ে পড়েছিস্‌, হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল, তা নয়···খেলা না দেখলে গজানবাবুর ভাত হজম হয় না···আচ্ছা ঝোঁক মাইরি!···"

ষষ্ঠীচরণ গজাননের অভ্যুদয়ে মোক্ষম হার খাইয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া আছে। নিতাইও মামার অপমানের প্রতিশোধ লইতে না পারায় মনে মনে আপশাইতেছে এবং মাঝে মাঝে ষষ্ঠীচরণের পানে আড়চোখে চাহিতেছে। গজানন কোট, টুপি ছাড়িয়া দুয়ারের কাছে একটা দেওয়াল-আলনায় টাঙাইয়া রাখিয়া বলিল, "চা হয়ে গেছে নাকি?—আগে এক কাপ চায়ের বন্দোবস্ত কর অনুপম। মনে করলাম যাব না, কিন্তু না গিয়েও

কেমন থাকতে পারি না। সেই এতটুকু থেকে ওব্যেস।…ষষ্ঠী আর নিতে অমন ক'রে ব'সে কেন রে?—যেন রাম-লক্ষ্মণ এইমাত্র বনবাসের খবর শ্নেছিস…"

হৃষীকেশ বলিল, "ষষ্ঠী দশ টাকার বাজি রেখেছিল আজ খেলা হবে না…"

গজানন চেয়ারে বসিতে যাইতেছিল, আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কতকটা উদ্বেগের সঙ্গেই প্রশ্ন করিল, "তারপর?—জিতেছে নাকি?"

হৃষীকেশ বলিল, "না, জিতবে আর কোথা থেকে?—কবেই বা জেতে?…সেই জন্যেই তো ওরকম ক'রে ব'সে আছে।…তারপর,—ওদিকে কারা জিতল? …আমাদের এরা খেললে কেমন বল।"

গজানন চেয়ারে হেলান দিয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ঠোঁটে আটকাইয়া দিল; দেশলাই জ্বালিতে জ্বালিতে বলিল, "কারা জিতল ব'লে দিতে হবে?… খেলার কথা আর ব'লে কাজ নেই, হাঁটু পর্যন্ত জল মাঠে, এক গজ বল যায় না—তবে হ্যাঁ, তার মাঝেও ডাক্তার যা খেললে—মার্ভেলাস!"

নিতাই চৌকির মাঝখান থেকে কোণের দিকে সরিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল "আর, মামা?"

গজানন মুখটা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "থার্ড ক্লাস। এবার যেদিন খেলা হবে তোর মামাকে ধামা চাপা দিয়ে রাখিস নিতে, যেন বেরুতে না পারে।"

ষষ্ঠীচরণের গলা হইতে 'খুক্' করিয়া একটা শব্দ হইল, নিতাই একবার রোষকষায়িত লোচনে তাহার পানে চাহিয়া গজাননকে বলিল, "তুই খেলার বুঝিস কি? ব'লে দিলি ধামাচাপা দে, আগে তোকে কে ধামাচাপা দেয় তাই দেখ্। দুটো বুকনি শিখে…"

নটু অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "আঃ, এই এক মামার ভাগ্নে জুটেছে!…ও বোঝে না তো ওকে জিগ্যেস করতে গিয়েছিলি কেন বাপু?…এদের আজকে সব এগারজোড়া বুট প'রে নামবার কথা ছিল মহোমিডেন স্পোর্টিং-এর মত, নেমেছিল রে গজা?"

গজানন বলিল, "হাঁটু পর্যন্ত তো জলে ডোবা—কে বুট প'রে কে খালি পায় বোঝবার জো আছে? ফুটবল হয়েছে না ওয়াটার পোলো?…তবে হ্যাঁ খেলেছে জান্ দিয়ে। ডাক্তারের খেলা দেখে আমার সেই খেলা মনে প'ড়ে যাচ্ছিল—কি ড্যাশ্!—কি ড্রিবলিং—কি বল ডিস্ট্রিবিউশ্যন্…ছুটল তো যেন কামান থেকে একটা গোলা ছুটেছে। ঠিক ওই জিনিস দেখেছিলাম ক্যালকাটার হোসীর মধ্যে, বল যদি একবার পেলে…"

ষষ্ঠীচরণ হঠাৎ ঘুরিয়া মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল, "তুই হোসীকে কবে দেখলি রে গজা? হোসী যখন খেলে তখন তোর দুধের দাঁত ভাঙেনি।"

চা আসিল। কাপে একটা চুমুক দিয়া গজানন মুখটা আরও বিকৃত করিয়া বলিল, "আর তুই বুঝি হোসীর গলা ধ'রে ইয়ার্কি মারতিস্? …ক'টা ফুটবলারকে দেখেছিস্ রে ষষ্ঠে?—কাগজ প'ড়ে তোর যত দৌড়…"

হৃষীকেশ বলিল, "ওর কথা বাদ দে না।…একে বাজে কথা ভিন্ন বলে না, তার বাজি

হেরে মাথার ঠিক নেই।···তুই টাকাটা নিয়ে আয় না ষষ্ঠে, এখানে ব'সে বাজে গজর গজর করছিস কেন? ··আজ পাড়ার টীম জিতেছে, তোর টাকা দিয়েই একটা ফীস্ট হয়ে যাক।"

"যা-যাঃ খাবি—গঙ্গার জলে মুখ ধুয়ে আয়; ফীস্ট খাওয়ার ঐ মুখ! তার চেয়ে হ্যাংলার মত যেমন হাঁ ক'রে ব'সে আছিস সব ব'সে থাক, গজা তার মিথ্যে বড়াই-গুলো ঠুসে ঠুসে দিক, পেট ভরিয়ে বাড়ি যা।"

গজানন সোজা হইয়া বলিল, "মিথ্যে বড়াই কে বলে রে?"

"আমি বলি।"

গজাননের রাগে খানিকটা বাক্‌স্ফূর্তিই হইল না। তাহার পর কাঁপিতে কাঁপিতে ষষ্ঠীচরণের চেয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, "কোন্‌টে মিথ্যে বলেছি, বল, যদি মরদ কা বাচ্চা হ'স তো ··হোসী খেলতো না ক্যালকাটায়?"

ষষ্ঠীচরণ একটু তেরছা হইয়া বেঁকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তুই মরদ কা বাচ্চা বললি কাকে রে?"

"যে আমায় মিথ্যেবাদী বলেছে তাকে।"

"আলবত মিথ্যেবাদী, ডাক্তার ক্যালকাটার হোসীর পায়ের নখের কাছে লাগে না। সে একটা ছিল ইণ্টার-ন্যাশনাল প্লেয়ার···"

"যে আমায় মিথ্যেবাদী বলে তার গুষ্ঠিসুদ্ধ মিথ্যেবাদী। আজ যে ডাক্তারের ড্যাশ আর ড্রিবলিং না দেখেছে···"

"খবরদার গজা! গুষ্ঠি তোলালে বত্রিশ পাটি দাঁত ঝেড়ে দেব। দুটো কথা শিখে রেখেছিস;—কি বুঝিস রে তুই ড্যাশ আর ড্রিবলিঙের?···"

ব্যাপার অচিরেই ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইল।

দুইজনেই ঘুষি বাগাইয়াছে,—দুইহাতেই। লড়াইয়ে মুর্গি'র মত ঘাড় দুইটা ধনুকাকার, ঠোঁটে তীব্র ব্যঙ্গ এবং চক্ষে ততোধিক তীব্র ঘৃণা। বাকি সবাই ঠাণ্ডা করিবার ভাষায় দুইজনকেই আগুন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে।

"ছেড়ে দে গজা, দরকার নেই, তা ভিন্ন তুই পারবিও না ও গোঁয়ারের সঙ্গে···থাম; ষষ্ঠী, রাগের মাথায় তুলিয়ে ফেলেচে গুষ্ঠি, আর কি হবে? তুই মিথ্যে কথা বললে যে তোর গুষ্ঠিসুদ্ধু মিথ্যে ব'লে এসেছে তার প্রমাণ কি?···যাক, যা হয়ে গেছে,··· নে, চা-টা খেয়ে ফেল গজু, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে···মুঠো নামা ষষ্ঠী, রাগের মাথায় শেষকালে সত্যিই বসিয়ে দিবি দাঁতের ওপর···আবার এও মুস্কিল—যদি মারব ব'লে ঘুষি বাগিয়ে না মারে, বলবে গুষ্ঠিসুদ্ধু মিথ্যেবাদী···"

গজানন সোজা ষষ্ঠীচরণকেই উত্তর দিল, "লে-লে; দাঁত ঝেড়ে দেয় সব সম্বন্ধী, এই চেয়ে দেখ শ্রীচরণখানির বহর, এসা একখানি কিক্ ঝাড়ব, উঠে আর···"

আর অগ্রসর হইতে হইল না—"তবে রে, সম্বন্ধী বললি যে বড়?"—বলিয়া ষষ্ঠীচরণ তীব্র হুংকারে গজাননের গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার পর লুটোপুটি, ঠেলাঠেলি,

ঘুষি, চাপড়, চুলের মুঠি—কখন উল্টান চেয়ারের পায়ার উপর, কখন টেবিলের নিচে …ভাষা যা বাহির হইতেছে তাহার সামনে "গুষ্ঠি" সম্বন্ধী" এ সব তো শিষ্টাচার।… নিতাই গোটা কতক ঘুষি দিল—ষষ্ঠীচরণ গজানন, দুজনকেই—কেন না দুজনের উপরই চটিয়া ছিল ; বাকি সবাই ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু অসম্ভব,—যেন দুজনে দুজনের জাঁতিকলে পড়িয়া গিয়াছে।

হঠাৎ অনুপম বলিয়া উঠিল, "ওরে, গজার নাক দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে মাইরি ! খুন !"

সবাই লাগিয়া পড়িয়া দুইখানা চেয়ার আর ষষ্ঠীচরণের নিচে হইতে গজাননকে টানিয়া বাহির করিল। সোজা হইয়া বসিতেই তাহার নাক দিয়া আরও জোরে গল্ গল্ করিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল।…"জল আন,…টিংচার আইডিন, খানিকটা ন্যাকড়া …গাঁদাপাতার রস ‥" —একটা গোলমেলে শঙ্কিত রব উঠিল।

হাজার করিয়াও রক্ত বন্ধ হয় না। নানারকম আন্দাজ আর অভিমতে ব্যাপার আরও জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। কেহ বলিল—মাথার শিরা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কেহ বলিল—নাকের এবং তাহার আশপাশের হাড় একখানিও আস্ত নাই। কেহ বলিল, "দেখ দিকিন দাঁতগুলো ঠিক আছে কিনা"…কেহ পরামর্শ দিল, "অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন ক'রে দাও—একেবারে মেডিকেল কলেজে তোল।" কয়েকজন বলিল, "অতক্ষণ বাঁচবে না।"

সামনে দিয়া একটা ট্যাক্সি যাইতেছিল। অনুপম দাঁড় করাইল। বলিল, "ওসব কাজের কথা নয়, আমাদের ডাক্তারের ডিস্পেন্সারিতে নিয়ে চল।"

নটু বলিল, "ডাক্তার তো ওদিকে খেলতে গেছে। খেলার পরে টেন্টে অনেকক্ষণ কাটিয়ে ফেরে।"

অনুপম বলিল, "তা হোক, কম্পাউণ্ডার ধনেশবাবু ফাস্ট-এড্‌টা দিয়ে দিতে পারবে। তারপর না হয় ‥তোল গজাননকে · গজা ওঠ ‥ভয় নেই, কিছু হয় নি তো তোর—শুধু একটুখানি ছ'ড়ে গেছে মাত্র।"

চোরা ঘুষি লাগাইবার জন্য নিতাইয়ের বোধ হয় মুমূর্ষুর প্রতি দয়ার উদ্রেক হইল। সহানুভূতির স্বরে বলিল, "কিছু ভয় নেই, তুই ইষ্টি দেবতার নাম কর গজু, ভাল হয়ে যাবি ‥কি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে বল তো ? · মাকে দেখবি ?…"

এতক্ষণ সকলে গজাননকে ঘেরিয়া ছিল। তাহাকে তোলা হইলে কয়েকজনের দৃষ্টি ষষ্ঠীচরণের দিকে গেল। সে মুখটা যন্ত্রণায় অতিমাত্রায় বিকৃত করিয়া পায়ের গোছটা দুইহাতে টিপিয়া বসিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিতে—পাছে কেহ ওটা গজাননের কীর্তি বলিয়া মনে করে সেইজন্য—ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "চেয়ার প'ড়ে একেবারে…উফ্ !‥ বাপরে ! · "

অনুপম, নটু, হৃষীকেশ গজাননকে ট্যাক্সিতে তুলিতেছিল, নিতাই তাড়াতাড়ি কপাটের কাছে গিয়া বলিল, "দাঁড়া, যেন চ'লে যাস নি তোরা, ষষ্ঠীকেও সঙ্গে নিতে হবে, তারও ঠ্যাঙের দফা নিকেশ।"

ডিস্‌পেন্‌সারিতে পেঁছিতেই ডাক্তার ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া আসিল।—"ব্যাপার কি? মোটর অ্যাক্‌সিডেন্ট নাকি?···নিয়ে এস শীগ্‌গির ওপরে···এঃ!···খুব সাবধানে···ষষ্ঠীচরণের কোথায় লেগেছে?"

কম্পাউণ্ডার আর ডাক্তার—দুইজনকে লইয়া পড়িল। ব্যাণ্ডেজ করিতে করিতে ডাক্তার প্রশ্ন করিল, "ফুটবলের তর্ক করতে করতে এই ব্যাপার! তোমরা সব কোন্‌ দিন মরবে এই ক'রে।"



অনুপম একটু মুরুব্বিয়ানী টোনে বলিল, "আজই মরেছিল; ভাগ্যিস আপনি খেলেই তাড়াতাড়ি চ'লে এসেছেন···নৈলে অন্তত গজানন তো···"

ডাক্তার বিস্মিতভাবে বলিল, "খেলা!···খেলা তো বৃষ্টির জন্যে আজ বন্ধ; ফোনে জানিয়ে দিলে; আমি বেরুই নি তো···"

সকলে বিমূঢ়ভাবে পরস্পরের মুখের পানে চাহিল। ষষ্ঠীচরণ একটা কি বলিতে গিয়া যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল। নটু বলিল, "তবে যে গজু তুই অত ফলাও ক'রে গল্প করলি—নিজের চোখে খেলা দেখে এসেছিস?—বললি··ওকি ডাক্তারবাবু দেখুন, দেখুন!—গজুর কি দাঁতকপাটি লাগল নাকি?···"

ডাক্তারের মুখে যেন একটু মৃদুহাস্য খেলিয়া গেল; বলিল, "লাগে নি, তবে লাগতে পারে, তোমরা ওকে একেবারেই বকিও না এখন···।"



হাতে-খড়ি

মিটুর হাতে-খড়ি হইল।

অনুষ্ঠানটি তেমন বড় কিছু না হোক, মিটুর কাছে কিন্তু মস্তবড় একটা মুক্তির আকারে আসিয়াছে। কারণটা বলি।

ছেলেটির লেখাপড়ার দিকে খুব ঝোঁক, আরও বেশি বাড়িয়াছে—এই বৎসর খানেক হইতে। লেখাপড়াটা হয়তো এমনই খুব লোভনীয় জিনিস নয় একটা—বেত আছে, কানমলা আছে; যেদিন মামার বাড়ি থেকে সঙ্গীরা আসে, খেলা বেশ জমিয়া ওঠে, সেদিনও স্কুলে যাওয়া আছে—দেখে তো ছোড়দার অবস্থা; তবুও একটা গুণ আছে, বেশ যেন বড় করিয়া দেয় বই-স্লেটে। দাদাকে দেখে তো, যখন-তখন যাহা ইচ্ছা বানান করিতেছে; যাহা খুশি লিখিতেছে; খাইয়া-দাইয়া হাফ-শার্ট'টা গায়ে দিল, ব্যাগে বই-স্লেট পুরিয়া কাঁধে ঝুলাইয়া লইল, গট গট করিয়া স্কুলে চলিয়া গেল। অতটা না হোক, তবু প্রায় বাবার কোট-প্যাণ্ট পরিয়া মুখে পান গুঁজিতে গুঁজিতে আপিসে যাওয়ার মত একটা কাণ্ড; যতক্ষণ না মোড় ঘুরিয়া স্কুলের পথে চলিয়া যায়, মিটু চারিটি আঙুল মুখে দিয়া দোরের কাছটিতে দাঁড়াইয়া দেখে।···কী ভয়ানক যে ছোট বোধ হয় নিজেকে!···

—আর তাড়াতাড়ি বড় হওয়া যে দরকারও হইয়া পড়িয়াছে এদিকে। খোকা ছিল না, এক রকম চলিয়া যাইতেছিল। এখন খোকা আসিয়াছে, হামাগুড়ি পর্যন্ত দিতে শিখিয়া গেল, মা বলিতেছে এইবার কথা কহিতে শিখিয়াই সব্বার আগে তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিবে।···তখন?

মিটু যে একেবারে বসিয়া আছে এমন নয়। আরম্ভ করিয়াই দিয়াছিল। দাদার কাছে শিখিয়া শিখিয়া অ—আ—ক—খ-র সমস্তটা জানে। ই পর্যন্ত লিখিতে পারে, 'একে চন্দ্র'র সমস্তটা পারে গুনিতে। এতদিন দাদার সমান হইয়া যাইতই, মা-ই তো বারণ করিয়া সব মাটি করিয়া দিল। সেদিনকার কথাটা বেশ মনে আছে মিটুর। দাদার লেখার উপর দাগ বুলাইয়া বুলাইয়া শুঁড়ওলা চিংড়ি মাছের মত ই-টাকে শিখিয়া ফেলিয়াছে। দাদা দেখিয়া বলিল, "উস্! তুই দেখছি আমার চেয়েও ভাল লিখবি, মিটু।"

এত ভাল লাগিল মিটুর। জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার চেয়ে ?"
"বাবা কি আমার চেয়ে ভাল লেখেন নাকি ?"
দাদা বড়দের মত একটা চোখ একটু ছোট করিয়া মাথাটা একটু দুলাইয়া দিল, তাহার পর কথাটা কাহাকেও বলিতে বারণ করিয়া স্কুলে চলিয়া গেল। মা খুব ব্যস্ত ; একবার মনে হইল, বলি, আবার ভাবিল, না, এখন না। নিচে নামিয়া আসিয়া পেন্সিল দিয়া পড়ার ঘরের দেয়ালে অনেকগুলা ই লিখিল ; তাহার পর বাবা যখন খাইয়া আপিসে চলিয়া গেছে, হাতের মুঠায় একটা ছোট কয়লা লইয়া আবার উপরে রান্নাঘরে উঠিয়া গেল। মা খাইতে বসিয়াছে বাবার পাতে, মিটু গিয়া বলিল, "একটা কি ভয়ানক জিনিস জানি দেখবে মা ?"
মা বলিল, "কি ?"
মিটু বলিল, "তা হ'লে চোখ বোজ কিন্তু। যতক্ষণ না ওয়ান-টু-থ্রি বলব ততক্ষণ খুলতে পারবে না। খুলবে না তো ?"
মা বলিল, "না"।
মিটু বলিল, "না, তুমি খুলবে।"
তাহার পর মিটুর মনে পড়িয়া গেল ঠাকুরমা একদিন যা বলিয়াছিলেন। বলিল, "হ্যাঁ, তুমি তো মিথ্যে কথা বলবে না, না মা ?—খেতে বসেছ যে।"
মা যে এত সোজা কথাটায় কেন একটু চোখ রাঙাইয়া হাসিল, মিটু বুঝিতে পারে না। তারপর মা চোখ বুজিলে মিটু খুব আস্তে আস্তে দেয়ালে ই-টা লিখিল। তাহার পর বলিল, "ওয়ান-টু-থ্রি, চোখ খোল !"
মা দেখিয়াই কিন্তু রাগিয়া উঠিয়া চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, "মোছ্ মোছ্, শীগ্‌গির মোছ্—কে শেখালে তোকে ? মা-সরস্বতীর সামনে এখনও হাতে-খড়ি হয়নি…"
মা ঠাকুরদের বড্ড ভয় করে। নিজে উঠিয়া মা-সরস্বতী টের পাইবার আগেই ই-টা মুছিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু শিখেছিস ? আরও কোথাও লিখেছিস ?"
বেশ মনে পড়ে—মিটুর কান্না পাইতে লাগিল। অনেক কষ্টে বলিল, "না।"
"আর কুলও এখনও খাস নি তো ?" মিটু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না, খায় নাই।
মা আবার পাতে বসিয়া বলিল, "খবরদার খবরদার, আর অ-আ ও মুখে এনো না। শিখতে যাও নি তো ? হাতে-খড়ি না দিয়ে – মা সরস্বতীকে প্রমাণ না ক'রে পড়লে, কি লিখলে, কি কুল খেলে, মা ভয়ানক চ'টে যান, একেবারে বিদ্যে দেন না। খবরদার।"
সেই থেকে কি করিয়া কাটিতেছিল মিটুর ! যাহাতে মা-সরস্বতী টের না পান সেই জন্য অ-আ-ক-খ-গুলোকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া পেটের একেবারে খুব ভিতরে করিয়া দিয়াছিল। একবারও লেখে নাই। মিটু টের পাইত সেগুলো ঠিক গলার নিচে

পর্যন্ত আসিয়া ঠেলাঠেলি করিত, সুড়সুড়ি দিত, কিন্তু মিটু একবারও তাহাদের বাহির হইয়া মুখে আসিতে দেয় নাই।

তাহার পর সেই আজ হাতে-খড়ি হইয়া গেল, সবগুলো যেন হুড় হুড় করিয়া বাহির হইয়া আসিল ; একদিন দাদাকে স্কুল থেকে আনিবার জন্য চাকরের সঙ্গে গিয়া মিটু যেমন দেখিয়াছিল, ঘন্টা বাজার সঙ্গে ছেলেরা হুড় হুড় করিয়া বাহির হইয়া আসিল, সেই রকম।

আজ সকাল থেকে বেশ ভাল লাগিতেছে মিটুর—যখন ইচ্ছা অ-আ বলিতেছে ; শুধু-শুধু, আবার প্রথম-ভাগ খুলিয়াও ; এই এতদিনের অ-আ-ক-খ বাহির হইয়া আসিয়া পেটটাকে হালকা করিয়া দিতেছে। লিখিতেছেও ; ই শেখার পর দুটো রাঁধা চিংড়ির মত ঈ-টার উপর বড় লোভ ছিল, খুব দাগিয়াছে। আর একটু, তাহার পরই শিখিয়া যাইবে। এইবার শিখুক না খোকা দাদা বলিতে—যত পারে।



আজ সকাল থেকে মিটুর মনে দুটি চিন্তার ধারা বহিয়া চলিয়াছে—এক এই, আর এক মা-সরস্বতীকে লইয়া। কাল যখন ঠাকুরকে আনিয়া ঘরে রাখা হইল তখন থেকেই মিটুর মনটা যেন কেমন হইয়া ছিল—কতকটা ভয়ও আছে, আবার খানিকটা আহ্লাদও—মিটু ঠিক বুঝিতে পারে না। আহ্লাদ এই জন্য যে, ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিলে একেবারেই ভয় হয় না,—বেশ কেমন মা মা ভাবটা, কোলে শুইয়া খোকা খেলা করিলে মায়ের মুখে যেমন হাসি থাকে, বেশ সেই রকম হাসি—চাহিয়া দেখিতে বেশ ভাল লাগে। কিন্তু সেই যে হাতে-খড়ির আগে অ-আ শিখিয়াছিল, মিটু 'ই' পর্যন্ত লিখিত, সে কথাটা জানেন নাকি ঠাকুর? মিটু চাহিয়া দেখে—হাসি একটুও বদলাইয়া রাগ আসিল কি না ; বেশিক্ষণ চাহিয়া থাকিতে সাহস হয় না।

আজ সকাল থেকে কিন্তু ভয় একেবারেই গিয়া ভালই লাগিতেছে মিটুর। কেহ নৈবিদ্য সাজাইতেছে, কেহ ফুল-চন্দনের ব্যবস্থা করিতেছে, কেহ দোয়াত, কলম, বই সাজাইতেছে—আসা-যাওয়া, কাজের ফরমাইস—সকাল থেকে যেন ঠাকুরের চারিদিকে ভিড় পড়িয়া গেছে। মিটু আড়ে চাহিয়া যতবারই মা-সরস্বতীর মুখের পানে চাহিতেছে, ততই যেন মনে হইতেছে তিনি হাতে-খড়ির আগেকার কথাটা ভুলিয়াই গেছেন। সেদিন আমার বাড়ি থেকে সবাই আসিয়া পড়িতে, তাঁদের চা, খাবার দিতে, তাঁদের সঙ্গে গল্প-

গুজব করিতে মা যেমন মিটুর রাস্তায় যাওয়ার কথাটা বাবাকে বলিতে ভুলিয়া গেল না ?—অনেকটা সেইরকম। তাহার পর পূজা হইল—আরও গোলমাল; তাহার পরই সেজকাকার কোলে বসিয়া হাতে খড়ি ··মিটু একবার চোখ তুলিয়া দেখিল—কৈ একটুও তো ঠাকুরের সেই আগের কথা মনে নাই ··খালিই তো হাসি—আরও বেশি করিয়া যেন···এমন চমৎকার লাগিতেছিল মিটুর ঠাকুরকে! যখন সেজকাকা বলিতে ঠাকুরকে মিটু বলিল, "খুব বিদ্যে দাও মা,"—তখন তো আরও হাসি ঠাকুরের মুখে—সে সব কবেকার পুরনো কথা ভুলিয়া গেছেন বলিয়াই তো ?

হাতে-খড়ির পর লেখাপড়ার প্রচুর মুক্তির মধ্যে মিটুর মনে সম্পূর্ণ একটা অন্যধরনের ভাব ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ভয় তো একেবারেই নাই, সকালের দিকের সেই যে নির্মল আনন্দটি, তাহারই পাশে পাশে একটা অদ্ভুত ধরনের কৌতূহল জাগিয়াছে মনে—ঠাকুরটি কে ?—কোথায় বাড়ি ? কি করেন ?···পৃথিবীতে যতো সবাইকে উনিই হাতে-খড়ির পর অ-আ-ক-খ দিয়া বেড়ান ? উঃ, কতো আছে!—আরও কতো বিদ্যে—দাদাদের বইয়ে, মামা কাকাদের বইয়ে যতো আছে।···পৃথিবীর যতো সব টাকা যেমন মিটুর দেশের মহারাজের, পৃথিবীর যতো সব বিদ্যে তেমনই শুধু মা-সরস্বতীর নাকি ? বাবা!·· কে তাহা হইলে ওঁর হাতে-খড়ি দিয়াছিল ?

প্রশ্নের বোঝা ক্রমেই দুর্বহ হইয়া পড়ে মিটুর, মায়ের কাছে উপস্থিত হয়। প্রথমভাগ আর স্লেট আজ একরকম নিত্যসঙ্গী, হাতেই থাকে।

মা ঝিনুকে করিয়া খোকাকে দুধ খাওয়াইতেছে, মিটু গিয়া পাশে বসে, প্রথমভাগ খুলিয়া অ-আ-র অর্ধেকটা পড়িয়া যায়, তাহার পর প্রশ্ন করে, "মা, খোকার কবে কথা ফুটবে মনে হচ্চে ?"

ওর কথাগুলো এইরকমই একটু পাকা গোছের, মা হাসিয়া প্রশ্ন করে, "কেন বলু তো ? তাড়াতাড়িটা কিসের ?"

"হাতে-খড়ি হয়ে গেল, এবার 'দাদা' বলুক না কত বলবে।"

ঐটুকু ভূমিকা করিয়া যে যে প্রশ্নের জন্য বিশেষ করিয়া আসা সেগুলো আনিয়া ফেলে, "মা-সরস্বতী কোন্ ঠাকুরের কে হন মা ?···আচ্ছা মা, মা-সরস্বতীর কাছে অনেক বিদ্যে আছে ?"

"হ্যাঁ, আছে বৈকি। তুমি খুব মন দিয়ে পড়ো, ভক্তি করো, তোমাকেও···"

"কত বিদ্যে আছে—আকাশের মতন ?"

"আকাশেও আঁটে না"

উরে স্বাপ!"—বলিয়া পরিমাণটার একটা স্পষ্ট ধারণা করিবার জন্য একটু চুপ করিয়া থাকে, তাহার পর প্রশ্ন করে, "কে হাতে-খড়ি দিয়েছিল মা-সরস্বতীকে ?"

"ওঁর আর কে হাতে-খড়ি দেবে বাবা ? ওঁর হাতে-খড়ি দেবার মত কি কেউ আছে সংসারে ?"

মিটুর মাথায় ঢোকে না কথাটা, একটু বুঝিবার চেষ্টা করিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করে, "কন ?...তাহ'লে কি ক'রে বিদ্যে হ'ল ?"

খোকা শেষের দুধটুকু খাইতে প্রবল আপত্তি করিতেছে, তাহার উপর এ ছেলের এমন প্যাঁচালো প্রশ্নে মা একটু বিব্রত হইয়াই বলে, "হবে না ? তুই একটু চুপ কর্ দিকিন। এটা আবার কোনমতে দুধ খেতে চায় না।"

মিটু একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া থাকিয়া প্রথমভাগে মনোনিবেশ করে। কিন্তু মন একেবারেই সরস্বতীর সমস্যা লইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। গোটাচারেক অক্ষর পড়িয়া দু'হাতে একটু একটু লুফিতে লুফিতে খোকার দিকে চাহিয়া লইয়া বলে, "কী দুষ্ট খোকাটা! দুধ না খেলে হব না ওর দাদা, অ্যাঁ মা ?..."

শেষ হইয়াছে দুধ খাওয়া খোকার, মায়ের সঙ্গে সন্ধি হইয়াছে। মা খোকার পানে চাহিয়া হাসিয়া বলে, "আহা, হোয়ো; এবার খোকা হয়েছে লক্ষ্মী।...বই লুফতে নেই।"

"বই তো ঠাকুর, না মা ?"—কপালে দুই হাতে চাপিয়া খুব ভক্তিভরে প্রণাম করে মিটু। তাহার পর বলে, "সরস্বতী-ঠাকুর বই-ঠাকুরকে পড়েন, মা ?"

ভাষার বাঁধুনি দেখিয়া মায়ের হাসি পায়, বলে "পড়েন না।"

"কেন মা ?"

খোকা থেকে ফুরসত পাইয়া এবার আর মার ধমক দেওয়ার দরকার হয় না, ছেলের বুদ্ধি লইয়া একটু খেলা করিবারও ইচ্ছা করে। প্রশ্ন করে, "তুই-ই বল্ না। হাতে-খড়ি হয়েছে, পড়তে শিখেছিস, বুদ্ধি তো হয়েছে ?"

মিটু একটু ভাবে, তাহার পর হঠাৎ মায়ের উত্তরের মধ্যে থেকেই তাহার উত্তরটা জোগাইয়া যায়। বলে, "বলব ?—বলব ?—হাতে-খড়ি হয়নি যে সরস্বতী ঠাকুরের।"

মা একটু হাসিয়া প্রশংসার দৃষ্টিতে চায়, বলে, "ঐ দেখ্, বুঝেছিস তো এবার ?"

মিটু মাথা দুলাইয়া স্বীকার করে—বুঝিয়াছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমস্যাটি আরও জটিল হইয়া ওঠে। মা মাঝে মাঝে চিন্তান্বিত মুখটির পানে আড়ে চাহিয়া দেখে। ধাঁধায় পড়িয়াছে ছেলে, আবার কি বলে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে থাকে। মিটুর হাতে-খড়ি হইয়াছে, বুদ্ধি হইয়াছে, প্রাণপণে চেষ্টা করে অন্তরের সমস্যাটা মিটাইতে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন হদিস্ না পাইয়া করিতেই হয় আবার প্রশ্ন, "কেন হয়নি হাতে-খড়ি, মা ?"

মা ছেলেকে আর দুর্ভাবনায় ফেলিয়া রাখিতে চায় না, ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া দেয়। বলে—সে-সব বড় দুঃখের কথা,—কে দিবে হাতে-খড়ি ? বাবা মহাদেব ভোলানাথ, অষ্টপ্রহর ভূত-প্রেত লইয়াই ব্যস্ত, তা থেকেও যে সময়টা বাঁচে ভিক্ষা করিতেই কাটিয়া যায়—ছেলেমেয়েদের কে খাইল না খাইল, সে খোঁজই রাখেন না—হাতে-খড়ি দেওয়া তো দূরের কথা। ছেলেমেয়েরা সব তেমনি, নিজের খেয়াল-খুশি

লইয়াই থাকেন—কষ্ট শুধু মায়ের, একলা মানুষ, হেঁসেল দেখেন কি ভাঁড়ার দেখেন…

মহাদেবকে মিটু চেনে কিছু কিছু, তবে তাঁহার সংসারটা যে এমন সে খবরটা রাখে না ; এমন গৃহস্থলীর কর্ত্রীর প্রতি মনটা বেদনায় ভরিয়া আসে, প্রশ্ন করে, "কে মা ওঁদের মা ?"

"অন্নপূর্ণা।"

মিটু একটু অন্যমনস্ক হইয়া যায়। বেশ নামটি—এত নরম যে শুনিলে কেমন একটা মায়া হয়। আহা, মহাদেব ঐ রকম, ছেলেমেয়েরা ঐ রকম—একলা মানুষ ··

মিটু চুপ করিয়া ভাবে। ছেলে দেব-তত্ত্ব লইয়া মুশকিলে পড়িয়াছে ; মা আড়ে চাহিয়া চাহিয়া দেখে, মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসি লাগিয়া থাকে। এর তুলনায় দুর্গাঠাকুর বেশ জমজ'মে, সেই জন্যই বোধ হয় মনে পড়িয়া যায় মিটুর। প্রশ্ন করে, "অন্নপূর্ণা মা-দুগ্‌গার কে হন, মা ?"

—বোধ হয় ভাবে, অমন একজন জমকালো ঠাকুরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকিলে অন্নপূর্ণার কপালটা কোন সময় ফিরিলেও ফিরিতে পারে।

মা বলে, "কে আর হবেন রে, বোকা ছেলে ?—অন্নপূর্ণাই তো মা দুর্গা। তিনদিনের জন্যে বাপের বাড়ি আসেন—রাঁধতে হয় না, বাড়তে হয় না—কিছুর জন্যে ভাবতে হয় না—তুই দেখিস নি একেবারে মা দুর্গার মূর্তি ? দু'পাশে লক্ষ্মী আর সরস্বতী দুই মেয়ে, তারপর কার্তিক আর গণেশ…"

চিন্তা অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে। বাধা দিয়া মিটু বলে, "কোন্ সরস্বতী ?"

"ক'জন আবার সরস্বতী আছে ?…আমার ক'টা মিটু আছে ?—একটাই তো ?…নে, এবার হাঁটু ছেড়ে ওঠ্…খোকাটা ঘুমিয়েছে, শুইয়ে দিইগে।"

মিটুর অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হইতেছে। শুধু আশ্চর্যই নয়, কেমন মনমরা করিয়া দিয়াছে আজকের ব্যাপারগুলো। সব চেয়ে মুশকিল হইয়াছে—মা দুর্গাই যে অন্নপূর্ণা, মনকে এটা ও কোনমতেই স্বীকার করাইতে পারিতেছে না। মা দুর্গাকে বেশ মনে পড়িতেছে মিটুর—এবারে পাশের বাড়িতেই দেখিয়াছিল—সিংহের ওপর দাঁড়াইয়া—সিংহ একটা সবুজ রাক্ষসকে কামড়াইয়া ধরিয়াছে—অনেক হাত মা দুর্গার—আর, বেশ মনে পড়ে, মুখটা এমন যে তাহাতে যে কখনও রাঁধিবার ভাবনা ভাবিতে হয়—বিশ্বাস করিতেই পারে না মিটু।…আর পাশে বুঝি—এই সরস্বতীই ?—মিটুর এখন মনে পড়িতেছে বটে, ঠিক এই রকম সাদা একজন ঠাকুর, ছবিদিদির মত হাতে এই রকম বাজনা—তবে, এই রকম বসিয়া নয় তো, দাঁড়াইয়া আছেন। দাঁড়ানো ঠাকুরকে বসা ঠাকুরের সঙ্গে এক করিয়া লইতে তত বাধে না মিটুর, আর সরস্বতী-ঠাকুর যে আসলে নিজেই একজন মেয়ে—এই যেমন ছবিদিদি—এটাও মিটুর মন অল্প আয়াসেই মানিয়া লয়—অতবড় যখন মা, তখন মেয়েই বৈকি ; কিন্তু মুশকিল হইয়াছে

অন্নপূর্ণাকে লইয়া—মা দুর্গার সঙ্গে এক করিয়া কোনমতেই দেখিতে পারিতেছে না। মনটা যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

মা দুর্গা অন্নপূর্ণা না হোন, সরস্বতীসুদ্ধ ছেলেমেয়েগুলি যে সব অন্নপূর্ণারই এটা খুব সহজেই মিটুর মন মানিয়া লইয়াছে এবং মানিয়া লইয়া একটি করুণ সংসারচিত্র রঙে রেখায় পূর্ণ করিয়া লইয়াছে।

বড়ই কষ্টে আছে মিটু। সকালে সরস্বতী লইয়া যে ভাবখানা জড়ো হইয়াছিল, এখন আর সেগুলো মোটেই নাই, এখন মিটুর মনটা অন্নপূর্ণাকে লইয়া পড়িয়াছে। আহা, একলা মানুষ—মহাদেব ঐ রকম, ছেলেমেয়েরা এইরকম—বিশেষ করিয়া এই মেয়েটি, একে অবাধ্য, তায় কানের কাছে ঐ বাজনা বাজানো—সে যে কি জ্বালাতন, দেখিয়াছে তো ছবিদিদি যখন তাহার সেতার লইয়া বসে।

মিটু প্রথমভাগে মন বসাইতে পারে না, লেখার তো কথাই নাই। ধীরে ধীরে গিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করে। কেমন একটা সংকোচ হয়, প্রথমে আড়চোখে চাহিয়া শেষ পর্যন্ত বেশ সোজা হইয়াই ঠাকুরের দিকে চায়। মা যা বলিয়াছে ঠিকই তো মিলিয়া যাইতেছে—মেয়েই তো সরস্বতী-ঠাকুর—ছোট একটি মেয়ে, মা অন্নপূর্ণা যতই ডাকুন কাজের জন্য, যতই বকুন, হাতে বাজনা লইয়া খালি মিটি-মিটি দুষ্টামির হাসি। মিটু যতই স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে ততই আর তাহার সন্দেহ থাকে না যে হাতে-খড়ির সময় সকালে যে হাসিটা অন্যরকম মনে হইয়াছিল, আসলে সে হাসিটা দুষ্টামিতে ভরা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চাহিয়া চাহিয়া যখন আর কোনই পরিবর্তন দেখে না মিটু, বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া যায়।

বাইরে দোর-গোড়ায় বসিয়া মিটু হাঁটু দুটি দুই হাতে বেড়িয়া মুখ নিচু করিয়া বসিয়া থাকে—কোলের মধ্যে বই-স্লেট। অনেকক্ষণই থাকে বসিয়া, বাবা আপিস হইতে ফেরে, বলে, "ব্যাপার কি মিটুবাবু?—বিদ্যের চাপে একদিনেই যে নুইয়ে দিলেন মা সরস্বতী!"

উপরে উঠিয়া যায়। মিটু বসিয়াই থাকে। তারপর মিটুর মাথায় হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলে। উঠিয়া সোজা চলিয়া যায় রান্নাঘরে। মা চায়ের জোগাড় করিতেছে, একটু বেশি ব্যস্ত আর গম্ভীর। মিটু ঘরের মাঝখানটায় একটু চুপ করিয়া দাঁড়ায়। কি করিয়া পাড়া যায় কথাটা?···এক সময় একটু দুলিয়া লইয়া বলে, "মা, হাতে-খড়ি হয়ে আমি খুব পড়েছি—দেখো, কালকে সেই···"

কেটলি নামাইতে নামাইতে মা বলে, "হ্যাঁ খুব পোড়ো, তাহ'লেই তো··

কথা একবার আরম্ভ হইয়া গেলে আর আটকায় না, মিটু বাধা দিয়া বলে, "বই তো ঠাকুর, না মা?"

"হ্যাঁ, খুব যত্ন ক'রে ··"

"অ্যাঁ মা, সরস্বতী ঠাকুরের হাতে-খড়ি হ'লে বই-ঠাকুরকে পড়বেন?—খুব ভালও হয়ে যাবেন?"

"উনি আর মন্দ কবে যে…"
তাহার পর মনে পড়িয়া গেল আজ সকাল বেলার গল্প-করা ছেলের কাছে। চা ছাঁকিতে ছাঁকিতে ছেলের মুখের পানে চাহিয়া বলে, "ও হরি! তুমি বুঝি সেই সব কথা ধ'রে…তা হবেন না ভাল? হাতে-খড়ি হ'লে মতিগতি হবেই। এই তুই-ই তো খেলা দুষ্টুমি ছেড়ে খালি বই নিয়ে রয়েছিস কেমন। কত বাধ্য হয়েছিস। কিন্তু সরু বাবা একটু এখন ··আগুন, গরম জল, ওদিকে তাড়াতাড়ি···তোকে বলব'খন আরও মা-সরস্বতীর গল্প ··"



মিটু ধীরে ধীরে নামিয়া যায়। ঠাকুরঘরেও যায় একবার – সেই এক ভাব,হাতে বাজনা, মুখে দুষ্টামি করিয়া না-শোনার হাসি।···মিটু যেন স্পষ্টই দেখে মা অন্নপূর্ণা ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হইয়া যাইতেছেন—একলা মানুষ—আহা···
মিটু নামিয়া আবার সদরের দিকে চলিয়া যায়। মায়ের কথায় একটা সমস্যার কিছু মিটিল, কিন্তু আর একটা আসিয়া জুটিয়াছে। আকাশের চেয়েও তো বেশি বিদ্যা সরস্বতী-ঠাকুরের, তবে আবার হাতে-খড়ির কি দরকার?···মিটু আবার সদর দরজায় হাঁটু মুড়িয়া বসে। বাবা ক্লাবে যাইবার জন্য জামা জুতা পরিয়া নামিয়া আসে। বলে, "তোমার হাতে-খড়ি ফিরিয়ে দাওগে মিটু, নিজের যত ভাবনার বোঝা তোমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন মা-সরস্বতী।"
বাহির হইয়া যায়।···ভাবিয়া ভাবিয়া এক সময় মিটু ভাবনার যেন কিনারা পায়।— ঠিক তো, হাতে-খড়ি না হইলে বিদ্যা থাকিয়াও যে নাই! এই তো, তাহার নিজের কথাই ধরা যাক না—পেটে সমস্ত অ-আ-ক-খ, একে চন্দ্র দুইএ পক্ষ কিছুই বাদ ছিল না, কিন্তু কোন কি সম্বন্ধ ছিল মিটুর সে সবের সঙ্গে?···তাহার পর যেই না হাতে-খড়ি হওয়া, ব্যস···
মিটুর মনটা কল্পনায় যেন নাচিয়া ওঠে।—সরস্বতী-ঠাকুর বিসর্জনের পর বাড়ি ফিরিয়া গেছেন—হাতে এই ঘ্যানঘেনে বাজনাও নাই, মুখে এ দুষ্টামির হাসিও নাই —তাহার জায়গায় এক হাতে স্লেট,এক হাতে খড়ি—আর কী বাধ্য আর লক্ষ্মীটি হইয়া গেছেন!—ঠিক মিটু যেমন আজ হইয়া গেছে, রাস্তায় যায় নাই, খোকাকে কাঁদায় নাই। আর কত কাজের হইয়া গেছেন সরস্বতী-ঠাকুর!—মিটু কল্পনায় দেখে, মা অন্নপূর্ণার আর সে-রকম ব্যাকুল ভাবটা একটুও নাই মুখে—ভাঁড়ার ঘর, হেঁসেল

যেখান থেকেই ডাক দিতেছেন, সরস্বতী গিয়া মুখটি বুজিয়া লক্ষ্মীটি হইয়া দাঁড়াইতেছেন, হাতে-খড়ির পর যে মতিগতি ফিরিয়া গেছে একেবারে···

তাহা হইলে কে দিয়া দেয় হাতে-খড়িটা সরস্বতী ঠাকুরের ? মেজকাকার কাছেই যাইবে ?

একটু অন্যধরনের লোক, বাবা আর মা'র মত সব কাজে চট্ করিয়া রাজি করানো যায় না। তবুও একবার দেখা যাক্ না।

মেজকাকার দুয়ারের কাছাকাছি পর্যন্ত গিয়া মিটু আবার ফিরিল। মা'র কাছে গিয়া বলিল, "একটা পান দাও, মেজকাকা চাইছেন।"

মেজকাকা একটা চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িতেছে, মিটু চেয়ারের গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "এই নাও, পান খাও মেজকাকা।"

"আজ হঠাৎ এত দয়া যে মিটুবাবু ?"

মেজকাকা একটু বোঝে কম,—আজ মিটুর যে হাতে-খড়ি হইয়াছে সেটা মনে নাই ? কত লক্ষ্মী হইয়া গেছে মিটু ! অবশ্য সেটা আর বলিল না, বলিল, "এমনি। মা বললে —মিটু একটা পান খাবি ? আমি বললাম—দুৎ, পান খেলে জিব মোটা হয়ে যায়, বিদ্যে হয় না। মেজকাকাকে দিগে।"

"মেজকাকার বুঝি বিদ্যের দরকার নেই ?"

"তোমার তো অনেক আছে, সবার হাতে-খড়ি দাও ··"

বই থেকে মুখ তুলিবার আগেই তাড়াতাড়ি আরও জুড়িয়া দেয়,"মেজকাকা, সরস্বতী-ঠাকুরের হাতে-খড়িটা দিয়ে দেবে ?"

মেজকাকা বই থেকে মুখ তুলিয়া হাসিয়া চায়, বলে, "তুমি সরো দিকিন একটু, আমার অত কাজের ফুরসত নেই। ডেঁপো কোথাকার !"

মেজকাকা ঐ রকম। এর পরেই মিটুর ইচ্ছা ছিল অন্নপূর্ণার সংসারের কথাটা তোলে। অবশ্য জানা কথা, কোন ফল হইত না। বাবা, মা, জেঠা, কাকা—সবার মুখেই তো এক কথা—সংসারের কিছু বোঝে না মেজকাকা।

রাগ আর বিরক্তির মাথায় এই কথাটুকু লইয়া আক্রোশ মিটাইতে মিটাইতে মিটু আবার সদর দোর-গোড়ায় হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। আগে শুধু মা অন্নপূর্ণার দুঃখে দয়া ছিল, এখন আবার মেজকাকার উপর রাগে জিদটা আরও বাড়িয়া গেছে, কেবলই মনে হইতেছে—সে নিজে যদি লিখিতে জানিত তো মেজকাকার ওরকম ঠাট্টা করিয়া উত্তর দেওয়ার মজাটা টের পাওয়াইত।···অনেকক্ষণ একমনে ভাবিল মিটু, মার মতন মনে মনে মা দুর্গাকেও খুব ডাকিল, তাহার'পর এই নিদারুণ সমস্যাটার একটা পাকারকম সমাধান হইল; মিটু উঠিয়া উপরে চলিয়া গেল।

·

সন্ধ্যা হইয়া গিয়া বেশ একটু অন্ধকার হইয়াছে। মিটুর মা ঠাকুরের শীতলের জন্য

উপরের ঘরে বসিয়া ফল কাটিতেছে, এমন সময় মিটুর ছোড়দা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, চক্ষু দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল, "কার জন্যে আর ফল কাটছ ? দেখবে চলো—শিগগির…"

"কেন রে !"—বলিয়া মা উদ্বিগ্নভাবে চাহিতে বলিল, "এসো না, দেখবে ; শেতলের জন্যে ধুপদানি ক'রে আগুন নিয়ে যাচ্ছি—দোরের ফাঁক দিয়ে দেখি ··চলো না, এতক্ষণ বোধ হয়…"

যখন বারান্দায় আসিয়াছে কানে গেল, "মাথায় পাগড়ি ঙ লে-খো—"

—মিটুর গলা, ভেজানো দুয়ার খুলিয়া দুইজনে ঘরের ভিতর গিয়া দাঁড়াইল। মায়ের চক্ষু স্থির !—

সরস্বতীর বীণাটি মেঝের মাঝখানে অবহেলা ভরে ফেলিয়া রাখা—। ডান হাতটি মিটুর হাতের মধ্যে, তাহাতে একটি পেন্সিল খড়ি, মিটু বাঁহাতে তাহার ছোট স্লেটটা সেই খড়িতে লাগাইয়া ঠিক কোলে করার মত করিয়া মূর্তির পিছনটিতে দাঁড়াইয়া আছে।

দাদা ছুটিয়া আর সবাইকে ডাকিয়া আনিতে গেল।

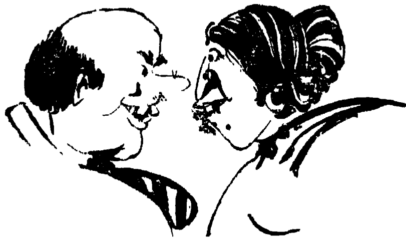
ভয়ে মার গলায় কান্না ঠেলিয়া আসিয়াছে, "পোড়াবাঁদর, মার হাতে-খড়ি দেওয়া হচ্ছে ? লেখাচ্ছি তোমায় মাথায় পাগড়ি 'ঙ' ··"

হাত তুলিয়া অগ্রসর হইয়াছে, মিটুর মেজকাকা আসিয়া উপস্থিত হইয়া নিরস্ত করিল। চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া ডাকিল, "এদিকে আয়। ··আমায় রাজি করাতে না পেরে আমার লেখা অক্ষর দিয়েই লেঠা চুকিয়ে নিচ্ছে ! ··এলি, না, যাব ?"

মিটু ঠাকুরের চৌকি হইতে নামিতেই বোধ হয় ঠাকুরের মুকুটের পিছন দিকে আটকানো একটা ক্যালেন্ডার নিচে পড়িয়া গেল। মিটুর দাদা গিয়া সেটা তুলিয়া আনিল। বলিল, "আমার ঘর থেকে খুলে এনেছে, হতভাগা !"

নিচে ইংরাজী মাসের তারিখ, উপরে বেশ বড় একটি যোগাসীন মহাদেবের ছবি, মাথার অনেক উপর পর্যন্ত গঙ্গা ঠেলিয়া উঠিয়াছে। বছরের হিসাব সমেত তাঁহার হঠাৎ এখানে আবির্ভাবের তাৎপর্যটা কেহ ধরিতে পারিল না।

মিটু বেশ আটঘাট বাঁধিয়াই শুরু করিয়াছিল ঃ সকালে সকলে উঠিয়া যখন দেখিবে ঠাকুরের হাতে বাজনার বদলে স্লেট আর চক-পেন্সিল, তখন নিশ্চয় ভাবিবে মহাদেব নিজেই আসিয়া মেয়ের প্রতি এই কর্তব্যটুকু সারিয়া লইয়াছেন। ব্যবস্থাটুকু কিন্তু টিকিল না,—সন্ধ্যার সময় 'শীতল' বলিয়া যে আবার পূজার একটু জের বাকি আছে বেচারির সেটুকু জানা ছিল না।…বকুনি, কানমলা—ওটুকু মিটু গ্রাহ্য করে না। শুধু দুঃখ রহিল—সুদূর কৈলাসে সেই কে মা অন্নপূর্ণার জন্য,—মাত্র মাথায় পাগড়ি 'ঙ' পর্যন্ত হাতে-খড়ি হইল—এতে অবুঝ কন্যার মতিগতি ভাল রকম ফিরিবে কি ?



জাগ্রত

আবার রাত দুপুরে গুরুচরণ আসিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। দরজা খুলিয়া দেখি সেই রকম আতঙ্কে চক্ষু দুইটা ঠেলিয়া আসিয়াছে, ঠোঁট দুইটা অল্প বিভক্ত, চুল উস্কখুস্ক ; বলিলাম—"ফীট-অব-প্রিসেপটার যে ! হঠাৎ কি মনে করে ?"

গুরুচরণ ভিতরে আসিয়া নিজে হইতে দোরটা অর্গলিত করিয়া হুড়কাটা একবার নাড়িয়া দেখিল, তাহার পর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আবার এক ফ্যাসাদ বাধিয়েছে মশাই, দিনকতক ডুব না দিলে চলছে না ; চলুন ভেতরে, সব বলছি।"

গুরুচরণ, হিন্দীতে যাহাকে বলে "হরফন্দ" সেই জাতীয় লোক, ঘটকালি, হোমিও-প্যাথি, অর্ডার-সাপ্লাই, কোষ্ঠী-রচনা প্রভৃতি হরেক-রকমের ফন্দি করিয়া দিন গুজরান করে। এদিকে কলিকাতায় মার্কিনী সৈন্যদের ছাউনি-পড়া পর্যন্ত তাহাদের নানা-ভাবে চরাইয়াও বেশ দু'পয়সা করিতেছে, মাঝে মাঝে কাহারও বিরাগভাজনও হইয়া পড়ে, একটু গা-ঢাকা দিয়া খোঁজ লইতে থাকে, তাহার পর সে অন্যত্র বদলি হইয়া গেলে আবার গিয়া নূতন মানুষ পাকড়াও করে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সম্বন্ধ ধরিয়া ওরা এখানকার গুরুবাদে একটু শ্রদ্ধান্বিত, সেইজন্য গুরুচরণ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া নিজের নাম রাখিয়াছে ফীট-অব-প্রিসেপটার।

ঘরের মধ্যে আসিয়া গুরুচরণ হাতের ক্যাম্বিস ব্যাগটা টেবিলের উপর রাখিয়া একটা চেয়ারে বসিল, বলিল—"বাধিয়েছে আবার এক ফ্যাসাদ মশাই।"

প্রশ্ন করিলাম—"কি রকম ?"

গুরুচরণ মুখটা একটু নিচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল, বেশ একটু বিরক্ত ভাব, তাহার পর হঠাৎ দৃষ্টি তুলিয়া বলিল—"অনেক দেশের অনেকরকম লোক দেখলাম মশাই এই লড়াইয়ের হিড়িকে, কারবারও করলাম অনেকের সঙ্গে, কিন্তু এই অ্যামেরিকানগুলোর মতন এমন ব্যাদড়া মানুষ চোখে পড়ল না, সবাইয়ের ওপর টেক্কা দিয়ে ওদের কিছু করা চাই। ফটো নিচ্ছিস—নে, কালীঘাট থেকে আরম্ভ ক'রে একরাশ মন্দিরের ফটো তুলিয়ে দিলুম, কিছু কিছু বিগ্রহেরও। তাতে আশ মিটল না, আমায়

তোমাদের কোন জাগ্রত দেবতার ফটো নিতে একটু সাহায্য করো মিস্টার ফীট-অব-প্রিসেপটার।"

একটু বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলাম—"জাগ্রত! পেলে কোথায় কথাটা?"

"আমারই দুর্মতি মশাই, কোন একটা মেয়ের সঙ্গে 'লভ্' করছে, একটা কবচ চাইলে। লোভ বড় পাপ মশাই, ভাবলাম একটা মোকা এসেছে, ভাল ক'রে কিছু ডে'ড়েমুসে নিই, এসব দিন তো আর ফিরে আসবে না। বললাম—'সায়েব, কবচ দু'রকম হয়—যদি কোন হে'জি-পে'জি দেবতার কবচ নাও, তাতে চান্স শতকরা পঞ্চাশ থেকে প'চাত্তর, না, যদি একেবারে পাকা ব্যবস্থা করতে চাও, শতকরার মধ্যে শতকরা, তো কোন জাগ্রত দেবতার কবচ গড়তে হবে আমায়, কিন্তু খরচেও ওটা যদি পঞ্চাশে সারতে পারি তো জাগ্রত দেবতার কবচ একশ টাকার কমে হবে না।' ছোঁড়ার নাম ওয়েকফিল্ড, ঢ্যাঙা, ডিগডিগে চেহারা, বললে—'না, মিস্টার ফীট-অব-প্রিসেপটার, মিস রেন্‌কে আমি আকণ্ঠ ভালবেসে ফেলেছি, তুমি কোন সেই রকম দেবতারই কবচ বানিয়ে দেও।' পাঁচখানি দশ টাকার নোট টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিয়ে বললে—'এই তোমার আগাম, কাজে লেগে যাও।' কয়েকদিন গেল, একদিন এসে বাকি পঞ্চাশটি টাকা রেখে শেকহ্যাণ্ডের চোটে হাত আমার ছি'ড়ে ফেলে আর কি—"মিস্টার ফীট-অব-প্রিসেপটার, আশ্চর্য তোমাদের এই জাগ্রাটা গডেস! মিস রেন্ রাজি, ছুটি পেলেই অ্যামেরিকায় গিয়ে আমরা বিয়ে করব।'··· তারপর থেকেই ঝোঁক গিয়ে পড়ল ঐ জাগ্রত দেবতার দিকে, একটু দরকার পড়লেই—'তোমাদের কোন জাগ্রাটা গডেসকে দিয়ে আমার এই কাজটুকু করিয়ে দাও মিস্টার ফীট-অব-প্রিসেপটার।'—আপনি সদ্ ব্রাহ্মণ, আপনার কাছে লুকোব না মশাই, দাঁও বুঝে আমিও দিলাম রেট ডবল ক'রে, আর মা-কালীর কৃপায় কেমন পড়তা প'ড়ে গেল, যাতেই হাত দিই ফ'লে যায়; বেশ দু'পয়সা হাতে আসতে লাগল।

এই ক'রে তো চলুক, বেটার হঠাৎ ঝোঁক উঠল জাগ্রত দেবতাদের ফটো নিতে হবে। একদিন হঠাৎ এসে হাজির—'মিস্টার ফীট-অব-প্রিসেপটার, তোমাদের ওয়াণ্ডারফুল জাগ্রাটা ডিইটির যা সব ব্যাপার দেখলাম তাই নিয়ে আমি অ্যামেরিকান ম্যাগাজিনে একটা প্রবন্ধ লিখতে চাই—কতকটা লিখেওছি, এখন গোটাকতক ফটো পেলে প্রবন্ধটা দামী হয়, তুমি আমায় এ বিষয়ে সাহায্য করো।'

চক্ষু একেবারে চড়কগাছ মশাই! ফটোর ব্যবস্থা আমি কি ক'রে করব? মন্দিরের ফটো চলে আড়েআবডাল থেকে, কিন্তু বিগ্রহের ফটো কি কেউ টপ ক'রে নিতে দেয় মশাই? টের পেলেই দরজা বন্ধ ক'রে দেয়, ম্লেচ্ছ কাণ্ড তো? সবাই পছন্দ করবে কেন? তবুও আশে-পাশের কতকগুলো শিবলিঙ্গের ফটো দিয়েছিলাম তুলিয়ে—অত গ্রাহ্য করে না লোকেরা; কিন্তু যারই একটু ঘটা ক'রে আরতি পুজো হয় এমন সব মূর্তিওলা ঠাকুরই তো হয় কারুর বাড়ির দরদালানে, না হয় কড়া পাহারার মধ্যে,—সেখানে নাক গলাতে দেবে কেন মশাই?···অনেক ক'রে বোঝালাম, ভাল কথায়,

আবার ভয় দেখিয়েও বললাম—'ওসব জাগ্রত দেবতা নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করা চলে না সায়েব, ও'রা যেমন ভাল করতেও তেমনি আবার মন্দ করতেও, কি হতে কি হয়ে পড়বে শেষকালে! আর ফটোটা তোমাদের কেরেস্তানী কাণ্ড কিনা, ও'দের ততটা পছন্দ নয়। দেখেছ তো অনাচারের ভয়ে তোমাদের দেশের দিকে পা দিতে চান না কেউ, শেষকালে ভাববেন দেখেছ বেটা স-শরীরে নিয়ে যেতে পারলে না তো শেষকালে ফটো নিয়ে যাবার ফন্দি বের করলে। শিবঠাকুর একটু অন্য ধরনের, আচার অনাচারের অত বালাই নেই, কিন্তু কোন জাগ্রত ঠাকুর সে ব্যাপারটা কিভাবে নেবেন কিছুই বলা যায় না, এখন যা চাইছ দিয়ে যাচ্ছেন, শেষে চ'টেম'টে একটা অনিষ্ট না ঘটিয়ে বসেন।'

অনেক ক'রে বললাম মশাই, যতটুকু বুদ্ধি এল মাথায়, কিন্তু ঐ যে আগেই বলেছি, এমন ব্যাদড়া জাত তো হয় না, বিপদের কথা শুনে যেন আরও ক্ষেপে উঠল—'ফটো আমায় নিতেই হবে মিস্টার ফীট-অব-প্রিসেপটার, অনিষ্টই যদি করেন সেটাও তো তোমাদের জাগ্রুরাটা ডিইটির ক্ষমতার আর একটা দিক, তাতে আমার প্রবন্ধ আরও জোরালো হয়ে উঠবে। না, তুমি করো ব্যবস্থা।'…বুঝুন তর্কের ধারাটা মশাই।… আরে তুই-ই যদি দাঁত ছিরকুটে পড়লি তো তোর জোরালো প্রবন্ধে কি কাজ দেবে তাই একবার ভেবে দেখ!

কোন মতেই যখন রাজি হচ্ছি না তখন মোটা টাকা কবলালে। আগে ফটো পিছু পাঁচ টাকা, সাত টাকা, দশ টাকা পর্যন্ত দিত, একেবারে প'চিশ টাকায় গিয়ে উঠল; মিথ্যে কথা বলব না, একটু লোভে প'ড়ে গেলাম মশাই।

তা তো গেলাম, কিন্তু পাই কোথায় তেমন মূর্তি বলুন? শেষে অনেক ভেবেচিন্তে, সাহাদের গোপীরমণজীউর কথা মনে পড়ল। বা'রবাড়িতে ঢুকেই চণ্ডীমণ্ডপে যেন জ্বল জ্বল করছেন রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি—যেমন রুপোর মশনদ, তেমনি কাপড়চোপড়, তেমনি গয়নাগাঁটি, হ্যাঁ, মনে হবে, জাগ্রত ঠাকুর বটে। সুবিধে আছে, সাহাদের বাড়ি-সুদ্দু কোথায় চেঞ্জে গেছে, ভেতর-বাড়িতে একেবারে তালাবন্ধ। এখন দারোয়ান আর পুজারী ঠাকুরকে একটু হাত করতে পারলেই কার্যসিদ্ধি হয়। হ'ল রাজি, তবে কিছু খসবে,—পুজারী পাঁচ টাকা, দারোয়ান বেটা দু'টাকা, এই সাতটাকা। ওয়েক-ফিল্ডের কাছে ওটা সোজাসুজি পনের টাকা করে দিলুম,—মনে করলাম এও গোপী-রমণজীউর দয়া, মুফতে আটটা টাকা ঘরে এসে তো গেল।

কৈ মশাই?—ব্যাটা স্টাণ্ড, ক্যামেরা, কালো কাপড় সব কাঁধে ক'রে নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে। তা দেখতে হবে বৈকি,—যেমন রাধার রূপ, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের—ঢুলঢুলে চোখ, মুখে হাসি, তেমনি সাজসজ্জে, গয়নাগাঁটি, চোখ ফেরায় কার সাধ্যি!… বেটার মন ব'সে গেছে দেখে আর এক প্যাঁচ দিয়ে কি ক'রে আরও গোটাকতক টাকা খসাব মনে মনে ভাবছি, এমন সময় ওয়েকফিল্ড হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল,—'মিস্টার ফীট-অব-প্রিসেপটার, এ তো তোমার জাগ্রুরাটা গডেস্ নয়!'

'বল কি সায়েব! এমন জবলজবলে ঠাকুর, এ তল্লাটে এমন দুটি নেই, আর তুমি বল কিনা এ জাগ্রত নয়!'

'না মিস্টার ফীট-অব-প্রিসেপটার, এ তো স্লীপিং ডিইটি, চোখ ঢুলে আসছে, যেন যে কোন মুহূর্তেই ঘুমিয়ে পড়তে পারে। এ তো জাগ্রাটা অর্থাৎ ওয়েকফুল ডিইটি হ'তেই পারে না—দুজনের মধ্যে কেউই নয়; আমার প্রবন্ধের সঙ্গে খাপ খাবে কেন?'

একেবারে দিলে সব ভেস্তে মশাই? কত ক'রে বোঝালাম, কার শুনতে বয়ে গেছে? ঢুলঢুলে চোখ দেখে কী যে মাথায় সেঁদিয়ে গেল—ঘুমন্ত ঠাকুর,এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়তে পারে, কোন মতেই তা আর বের করতে পারলাম না তার মাথা থেকে। যেমন গেছল তেমনি বেরিয়ে এল সাহাদের বাড়ি থেকে।

যাক, মনে করলাম ঝোঁকটা অন্তত কাটল বেটার, তাই লাভ; ও মশাই! দুদিন না যেতে যেতে আবার সেই উৎপাত! 'করলে না ব্যবস্থা কোনও জাগ্রাটা গডেসের ফটো তোলবার, মিস্টার ফিট-অব-প্রিসেপটার?' বললাম—'সায়েব, নিয়ে গেলাম তোমায় অমন জাগ্রত দেবতার কাছে, তুমি তুললে না ফটো, আমি কি করব? জাগ্রত ঠাকুর তো আর ফরমাশী জিনিস নয়, মাঠে ঘাটেও প'ড়ে থাকে না!' যখন নেহাত নাছোড়বান্দা, কোন ওষুধই ধরে না, মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল মশাই, ভাবলাম গোপীরমণজীউ যখন দিলেন একটু সুবিধে ক'রে, তখন সেটা খাটিয়েই দেখি না—কিছু ট্যাঁকেও আসতে পারে, বেটা পেছিয়েও যেতে পারে হ্যাঙ্গাম দেখে। যখন খুব বাড়াবাড়ি লাগিয়েছে, দিন তিনেক বিছানায় প'ড়ে থাকবার ভান ক'রে বললাম—'সায়েব, তুমি তো জাগ্রত নয় ব'লেই খালাস, এখন যত আক্রোশ আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে ঠাকুরের; তিনদিন বিছানা থেকে উঠতে পারিনি—যাই যাই অবস্থা—ডাক্তার ডাক্, বদ্যি ডাক্, তিনদিনে পঁচিশটা টাকা লম্বা হয়ে গেল। কেরেস্তানদের ছোঁন না ওঁরা, তোমাদের কিছু হয় না, মারা পড়ি আমরা। না সায়েব, আর ওসব ফ্যাসাদের মধ্যে টেনো না গরীবকে।'

বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই, দুখানি দশ আর একখানি পাঁচ টাকার আনকোরা নোট সামনে বিছিয়ে দিলে—'এই তোমার চিকিৎসার খরচ ফীট-অব-প্রিসেপটার, জাগ্রাটা ডিইটির ফটো কিন্তু আমার চাই। বোধ হয় যাঁদের দেখলাম তাঁরাও জাগ্রাটা, কেনই বা মিথ্যে কথা বলতে যাবে তুমি, তবে ওতে আমার প্রবন্ধ ঠিক জমবে না, আমাদের দেশের লোক বিশ্বাসই করতে চাইবে না।'

বিটকেল জাত মশাই, যা একবার ধরবে তা থেকে নড়চড় নেই, শেষে টাকাটা পর্যন্ত ডবল ক'রে দিলে, পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ—'জাগরাটা ডিইটির ফটো আমার চাই-ই মিস্টার ফীট-অব-প্রিসেপটার, করো কোন রকমে জোগাড়।'

মনের পাপ গোপন করতে নেই মশাই, একটু লোভে প'ড়ে গেলাম। শুধু লোভেই নয়, মা-কালীর দয়ায় দু'পয়সা করে খাচ্ছি দেখে আরও দু'একজন ভড়ং করে ঢু

মারতে লাগলে এদিকে, তার মধ্যে ঈশেন হাজরার ছেলে বৈকুণ্ঠকেও দেখলাম, অমন জালিয়াত জোচ্চোর কলকাতা শহরে দ্বিতীয়টি নেই।—পৈতের গোছা আর ফোঁটা-চন্দনের ঘটা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম মশাই, ওয়েকফিল্ডটাকে শেষে না গেঁথে ফেলে। কিন্তু পাই বা কোথায় তেমন জাগ্রত দেবতা? লোভে দুর্ভাবনায় মৃতপ্রায় হ'য়ে পড়লাম মশাই, শেষে গিয়ে আমার একদিন হরকালী মাসির কথা মনে প'ড়ে গেল, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

হরকালী মাসিকে আপনি দেখেন নি, ভগবান করুন যেন না দেখতেও হয় কখনও। আমি সম্পর্কে বোনপো, সওয়া আছে, তবুও স্বপ্নে দেখেটেকে ফেললে আঁতকে উঠি এখনও। মাসি বিধবা, কদমফুল ক'রে মাথার চুল ছাঁটা, এদিকে যেমনি আড়ে, তেমনি দৈর্ঘ্যে। হাঁটুর একটু নিচে পর্যন্ত একটা মটকার থান পরে থাকেন সর্বদা, মাথাটা ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে মাথায় একটা ভিজে গামছা পাট ক'রা।—তা সে কি দিন, কি রাত্রি।

সবচেয়ে তারিফ মাসির গলা, সেই যে রাত থাকতে উঠলেন, সেই থেকে রাত্তিরে একেবারে ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ভাঙা কাঁসির সমানে বেজে চলছে, পাড়ার লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত। সেই হরকালী মাসির এক ঠাকুর আছেন।"

আমি প্রশ্ন করিলাম—"কি ঠাকুর?"

"ঐটি জিগ্যেস করবেন না, ঠাকুর যে কি ঠাকুর তা পাড়ার লোকে এখন পর্যন্ত কোন হদিস পেলে না। মাসিও বলতে পারেন না, জিগ্যেস করলেই বলেন—পোড়া কপাল আমার, ঠাকুরকেই যদি চিনতুম তবে আর আমার এ দশা হবে কেন? কেউ বেশি খুঁটিয়ে জিগ্যেস করবার সাহসও পায় না। বছর দশেক আগে কোথায় তীর্থ করতে গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন—একটা পা, আর চারটে হাতের মধ্যে দুটো হাত ভাঙা। অঙ্গহীন ঠাকুর যে পুজো করতে নেই এটা মাসিকে কারুর বলবারও হিম্মত হয়ে উঠল না কখনও, শরীরের যেটুকু বাকি আছে তাইতে আগাগোড়া মেটে সিঁদুর মাখিয়ে একটা টিনের চালার মধ্যে বসিয়ে রেখেছে, ঠাকুরও দিব্যি পুজো খেয়ে যাচ্ছেন। সেই ঠাকুরের কথা আমার মনে প'ড়ে গেল।"

বোধ হয় ঠাকুরের বর্ণনাতেই একটু অন্যমনস্ক হইয়া গিয়া থাকিব, সেই ঝোঁকেই প্রশ্ন করিলাম—"খুব জাগ্রত?"

গুরুচরণ বলিল—"ঘুমুবার ফুরসত পেলেন কখন মশাই যে জাগ্রত হবেন না? ঐ তো হরকালী ঠাকরুণের কথা শুনলেন; তারপর সকাল থেকে মাসি ঐ ঠাকুরের তলায় পাড়ার যত লোক তাদের বেটা-পুত কাটছে, অবিশ্যি হাড়িকাঠে ফেলে না কাটুক, কথারও তো একটা ফল হয়ই; ঠাকুরের দিকে যেন চাইতে ভয় হয় মশাই। ভাবলাম, ঐ ঠাকুরের ওপর দিয়ে ওয়েকফিল্ডের টাকাটা খসাই। ওখানে আর বাছাধনকে ঢুলঢুলে চোখ ব'লে আপত্তি করতে হবে না। তারপর সেবায়েত হিসেবে মাসিকেও দেখিয়ে দেব, গলার আওয়াজও শুনবে। ব্যস, বাজি মাৎ।

বেহালা থেকে কোশ তিনেক দূরে মাসির বাড়ি, ফলতার লাইন থেকে নেমে কোশ-খানেক যেতে হয়। একদিন গেলাম মাসির কাছে। তা আদর যত্ন করে মশাই। একথা-সেকথার পর একটু সুযোগ বুঝে আসল কথাটা পাড়লাম, বললাম—'মাসি, ঠাকুরের তোমার একটু ভালরকম পুজোর বন্দবস্ত করো না, না হয়, টিন সরিয়ে ঘরের ওপরের ছাতটাই পিটিয়ে নাও, বলো তো করি ব্যবস্থা।'
মাসি ঠায় আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রৈল, ঝানু মেয়েছেলে তো ? তারপর জিগ্যেস করলে—'তুই কি ব্যবস্থা করবি শুনি ?'
ব্যাপারটা বললাম, অবিশ্যি আমায় যে টাকাটা দেবে তার কথা বাদ দিলাম, মনে মনে ঠিক ক'রেই ছিলাম ঐ থেকে পঁচিশ টাকা নিয়ে পিসির হাতে দেব, একটা দায়ে খালাস হওয়া তো, না হয় পুরো টাকাটা এলই না ভোগে।



মাসি একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে সবটা শুনে গেল, তারপর গালে চারটে আঙুল চেপে বললে—'তুই যে আমায় অবাক করলি গুরু, সেই ফিরিঙ্গিগুনো ?—বনে-বাদাড়ে, গেরস্তের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায় ?'…এরপরই মাসির গলা চড়ল। ওর পদ্ধতিই হচ্ছে—যে যাই বলুক, শেষ পর্যন্ত পাড়ার লোককে তার মধ্যে টেনে আনেই। পর্দা চড়াতে চড়াতে আরম্ভ করলে—'একদিন ছিলাম না, এসে শুনলাম পাড়ার অলপ্পেয়েরা একটাকে ডেকে এনে আমার ঠাকুরের ফটোক তুলিয়ে দিয়েছে। অমন জাগ্রত ঠাকুর আমার সেই থেকে যেন ম'রে আছেন, নৈলে এক একটা ক'রে পাড়ার সব্বাইকে শেষ হোতে হোত না ? ঠাকুর কি আমার তেমনি ঢোঁড়া ছিলেন ? আমি ছিলাম না, নৈলে কত বড় গোরা সেপাই দেখে নিতাম না একবার ? কোথায় ভাবছি মাসি কষ্টে পড়েছে শুনে বোনপো আমার দরদ দেখিয়ে একটু আহা বলতে এল, না, পাড়ার হাবাতাদের মতন সেও কিনা আমার ঠাকুরের…'
এই পর্যন্ত ব'লেই মাসি একেবারে স্টাইল বদলে ফেললে ; রাগের ভাব ছেড়ে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে আমার মুখের পানে একটু চেয়ে রইল, তারপর কত যেন অনুতাপ হয়েছে এইভাবে গলা সহজ ক'রে বললে—'হ্যাঁরে, আমার এ হোল কি ? আবাগে আবাগীদের সঙ্গে থেকে থেকে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি শেষকালে ? না গুরু, আমি এ গ্রামে বাস উঠিয়ে দিয়ে কালীঘাটে গিয়ে থাকব, তুই আমার ব্যবস্থা ক'রে দে।'

উল্টো উৎপত্তি দেখে ঘাবড়ে গেলাম মশাই, করতে এলাম এক, হয় আর—বুড়ি আমার স্কন্ধে চাপবার মতলব করলে নাকি? জিগ্যেস করলাম—'কি হয়েছে মাসি! বাস তুলে দেবার কথা কি হোল?'

মাসি বললে—'কি হয়নি বাবা? এতদিন পরে তুই মাসি ব'লে এলি—আমারই ভালর জন্যে—কি ক'রে আমারই ঠাকুরের চালাটুকু একটু পাকা ক'রে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে, আমি এদিকে পাড়ার শতেকখোয়ারদের সঙ্গে এক ক'রে তোকে কিনা মুখঝামটা দিতে বসলাম গুরু! কবে আমার মরণ হবে? আর থাকতে আছে এ পাপ জায়গায়?'

ধড়ে প্রাণ এল মশাই, মাসির যে এমন সুবুদ্ধি হবে, আর এত হঠাৎ, কল্পনাতেও আনতে পারি নি। বললাম—'তাতে কি হয়েছে মাসি? গুরুজন, দুটো কথা না বুঝে ব'লেই থাকো তাতে হয়েছে কি? তুমি মন খারাপ কোরো না, ও আমার আশীর্বাদ। তাহ'লে নিয়ে আসব ধ'রে ব্যাটা ফিরিঙ্গিকে? ছোঁবেও না কিছু না, সাত হাত তফাত থেকে একটা ফটো তুলে নেবে, তাতে ঠাকুরের ঘরটা যদি একটু ভাল হয়ে যায়, উচিত নয় কি আমাদের রাজি হওয়া? কি জানো মাসি, ভগবান গীতায় দুর্যোধনকে বলেছেন—তিনিই সব করেন কর্মান, আমরা নিমিত্ত মাত্র, টিনের ছাতের ওপর বৃষ্টি পড়লে আওয়াজে ঠাকুরের চোপোর রাত ঘুম হয় না, শিলে বৃষ্টি হোল তো কথাই নেই, তোমার একটি পয়সা খরচ করালেন না, আমার একটি পয়সা খরচ করালেন না, সাতসমুদ্র তের নদীর পার থেকে এক ব্যাটা ফিরিঙ্গিকে পাকড়ে' নিয়ে এসে তার ঘাড় ধ'রে কষিয়ে নিচ্ছেন ব্যবস্থাটা—বোঝ না, একটু তলিয়ে ভেবে দেখবার কথা নয়?'

মাসি একদৃষ্টে আমার মুখের পানে চেয়ে শুনে যাচ্ছিল, বললে—'আমি মেয়েছেলে, অত শাস্ত্রকথা তো বুঝি না বাবা, তাই ক'রে ফেলছিলাম ভুলটা, তা কবে নে'সবি তাকে? আর আসছে তো আমাদেরই ভালর জন্যে, তায় গীতায় নাকি বলেছে ঠাকুরই পাঠিয়ে দিচ্ছেন, খাবারটাবারের ব্যবস্থা একটু ক'রে রাখব? শোর গোরুর তো জোগাড় হবে না, একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে বিদায় করা আর কি…'

চোখ দেখে, বলবার ভঙ্গিমে লক্ষ্য ক'রে ধ'রে ফেলা উচিত ছিল মশাই, তবে এ স্টাইলটা মাসির নাকি একেবারে নতুন, ভাঁওতায় প'ড়ে গেলাম। বললাম—'নিয়ে আসা তোমার যবে সুবিধে। আজ বেরস্পতিবার, শুক্কুর, শনি দুটো দিন বাদ দিয়ে না হয় রোববার আসি নিয়ে। আর খাবারের কথা বলছ…বাজারের ওরা খায় না, নিজের হাতে গ'ড়ে দিতে পারো কিছু তো সে মন্দ নয়, একটু তোয়াজ হয় তো।'

মাসি বললে—'নিজের হাতে বৈকি বাবা, বেশ যত্ন ক'রে নিজের হাতের জিনিসই খাওয়াব আমি, একটা লোক সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এসে এতটা উপকার করছে, খেয়ে যদি কিছুদিন তারই না লেগে রৈল মুখে তো কি হোল? নিজের হাতেরই জিনিস হবে।"

গদ্গেরচরণ একটু চুপ করিল. তাহার পর বলিল—"একটা সিগারেট দিন তো, বেদম ক'রে দিয়েছে মশাই।"

সিগারেটের অর্ধেকটা শেষ করিয়া আবার বলিতে লাগিল—"আজ বিকেলে গিয়াছিলাম মশাই, সোজা সেখান থেকে আসছি। ওয়েকফিল্ড তো যাবার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে ড্যাম গ্ল্যাড। সিঁদুরের ওপর তেল মাখিয়ে মাসি আবার ঠাকুরকে একেবারে 'মার-মার কাটকাট' ক'রে রেখেছে, তার ওপর তার নিজের চেহারা আর গলা। না, সায়েবের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় অবিশ্যি করতে এলো না, তবে সায়েব এসেছে দেখে ছেলেমেয়ে ধাড়ি বুড়ো যারা সব এসে জটলা পাকাচ্ছিল,মেরেধ'রে, হাতপা নেড়ে বাজখেঁয়ে গলা ছেড়ে একলা তাদের মোহড়া নিয়ে যেভাবে জায়গাটা মিনিট কয়েকের মধ্যে সাফ ক'রে ফেললে, সায়েবের তো একেবারে তাক লেগে গেল মশাই ; ফিস ফিস ক'রে জিগ্যেস করলে—'কে এ ম্যান মিস্টার ফীট-অব্-প্রিসেপটার ?'

বললাম—'ম্যান নয় সাহেব, উওম্যান, এই ঠাকুরের সেবায়েত—নার্স।' একেবারে ড্যাম গ্ল্যাড, আমার হাতটা চেপে ধ'রে বললে—'এই এতদিন পরে তুমি আমায় জাগ্রাটা গডেসের কাছে নিয়ে এসেছ মিস্টার ফীট-অব-প্রিসেপটার, নার্স'ই যদি এ-রকম হয় তা'হলে আমার সন্দেহ নেই গডেস সম্বন্ধে ; চেহারা তার দেখছিই, মেজাজ সম্বন্ধেও আমার আর খুঁৎখুতুনি রইল না।'

ভ্যাজাল হটিয়ে মাসি গন্ গন্ ক'রে ভেতরের দিকে চ'লে গেল, বার দু-এক সায়েবের দিকে ফিরে দেখেও নিলে। যতক্ষণ দেখা গেল ওয়েকফিল্ড হাঁ ক'রে চেয়ে রইল, যেন কি অপূর্ব জিনিস দেখছে। মাসি ভেতরে চ'লে গেলে বললে—'এইবার ফটোটা তুলে নিই মিস্টার ফীট-অব-প্রিসেপটার ; দাঁড়াও দেখি কোন্ অ্যাঙ্গল থেকে সুবিধে হবে।' ওয়াণ্ডারফুল জাগ্রাটা গডেস, আমার প্রবন্ধের দাম চার গুণ বেড়ে যাবে।'

আখচার যেমন ছোট ক্যামেরা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এ তা নয়, বেশ তোড়জোড় ক'রে গেছল মশাই, জাগ্রত দেবতার কথা শুনে ; একটা বেশ মাঝারি সাইজের ক্যামেরা, স্টাণ্ড, মাথা ঢাকবার জন্যে একটা কালো বনাত,—অনুষ্ঠানের কিছু বাকি রাখেনি। কয়েক জায়গায় বসিয়ে বসিয়ে মাসির বাড়ির ঠিক দরজার মুখটিতে গিয়ে স্ট্যাণ্ড ক্যামেরাটি ফিট করতে লাগল। এই সময় মাসি আমায় ভেতরে ডাক দিলে।

সায়েবকে জিগ্যেস করলাম—'আমায় কোন সাহায্য করতে হবে তোমাকে ?' সায়েব বললে—'না মিস্টার ফীট্-অব-প্রিসেপটার, ধন্যবাদ ; সূর্যটা ঐ ডালটার আড়ালে গেলেই আমি তুলে নোব ফটোটা। মিনিট ছ- সাত লাগবে। ওয়াণ্ডারফুল জাগ্রাটা গডেস।'

ভেতরে গিয়ে দেখি মাসি আমার জন্যে থালা সাজিয়ে ব'সে আছে—মালপো, সন্দেশ নারকেলের নাড়ু, কয়েক রকম ফল, একটি বড় থালায় ঠেসে সাজানো।

বললাম—'এ করেছ কি মাসি, এত কে খাবে, পেট-রোগা মানুষ একে ; এই থেকেই সায়েবের জন্যে তুলে রাখো অর্ধেকটা।'

খাওয়াবার সময় যেমন বলে মাসি, একটু কড়া ক'রেই বললে—'সায়েবের ব্যবস্থা আছে, তোকে ভাবতে হবে না, তুই একটি একটি ক'রে খেয়ে ফেল। হ'ল তার ফটো নেওয়া ? বললাম—'রোদটা একটু স'রে গেলে নেবে, মিনিট প'াচ সাত দেরি আছে।'

মাসি ব'সে আমায় খাওয়াতে লাগল। একটা ব্যাপারে একটু যেন খটকা লাগল মশাই, অন্য অন্য বারে যে রকম গল্পগুজব ক'রে খাওয়ানো, এ সে রকম নয়, মাসি যেন ভেতরে ভেতরে ফুলছে। ঠিক বুঝতে পারছি না ফটো নেওয়াচ্ছি ব'লে মাসি কি আমার ওপর চটল শেষ পর্যন্ত ? টাকার লোভে রাজি হয়ে রাগটা কি শেষ পর্যন্ত আমার ওপর গিয়েই পড়ল ? মনে মনে সাত প'াচ ভাবছি, এমন সময় মাসি উঠে পড়ল, বললে—'ব'সে ব'সে খা গুরু, আমি সায়েবের ব্যবস্থাটা করিগে। খবরদার একটি ফেলে উঠতে পাবি নি, ভয়ানক রাগ করব, আমার জাগ্রত ঠাকুরের পেসাদ।' তখনো যদি একটু সন্দেহ করি মশাই – ।

মিনিট পাঁচেক হবে। আস্তে আস্তে খেয়ে যাচ্ছি, এমন সময় বাইরে উৎকট আওয়াজ ; ঠিক যেন সদর দোর-গোড়াতেই। একটা মালপোয় কামড় দিয়েছিলাম, সেইভাবেই হাঁ ক'রে চেয়ে রইলাম। প্রথমে একটা গ্যাঁঙানি—তারপর···একি ! সায়েবের গলা যে ! যেন একটা গর্তের মধ্যে থেকে চেঁচাচ্ছে—'মিস্টার ফীট্-অব্-পিসেপ্টার, দৌড়োও।··হেল্প ! হেল্প ! দি গাগুরাটা গডেস। নার্সকে ডাকো। দফা শেষ করলে আমার—হেল্প !···'

গিয়ে দেখি এক বিপর্যয় কাণ্ড মশাই ! মাসি সায়েবের মুণ্ডুসুদ্দু ক্যামেরাটা কালো কাপড়টার মধ্যে ভাল ক'রে জড়িয়ে বাঁহাতে কড়কড়িয়ে ধ'র আছে, আর ডান হাতে পিঠে শপাশপ ঝাঁটা—দর্জির কলের ছুঁচও অত তাড়াতাড়ি পড়ে না মশাই। আর সেই সঙ্গে আপসানি—'আমার ঠাকুরের ফটোক তুলতে এসেছ ! এই তোল্ তোল্ ফটোক। এই—এক ফটোক, দু ফটোক, তিন ফটোক—তোল্ না কত তুলবি ! ঠাকুরের আমার হাত নেই বলে হেঁজি-পেঁজি, না ? বেওয়ারিশ ! এইবার টের পা কত জাগ্রত আমার ঠাকুর।—আর তুই আয় এবার—তোকেও দেখিয়ে দিই ঠাকুর আমার কত জাগ্রত। ব্যবসা ফেঁদেছিস, তার মুনাফা নে এসে ! চামার ! বামুনের ঘরের গরু ! আয় বেরিয়ে·!···'

পেছন ফিরে ছিল, দেখতে পায়নি তাই রক্ষে ; সায়বকে বাঁচাবে কে মশাই, যেমন গেছলাম তেমনি ফিরে এসে খিড়কির দরজা খুলে সোজা একেবারে এখানে।

নাক কান মলছি, আর ও পাপের পথে নয়—না খেতে পেয়ে মরি সেও ভি আচ্ছা।··· তা তো হ'ল মশাই, কিন্তু সে ব্যাটা ফিরিঙ্গি যে সমস্ত কলকাতায় তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে বেড়াচ্ছে আমায় !"



কবি কুণ্ডনলালের মেঘদূত

উনিশ শ' তেতাল্লিশ সালের শেষের কয়েকটা মাস আমায় বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে কাটাইতে হয়। কোন সামরিক কারণে দ্বীপটার নাম বা প্রবাসের উদ্দেশ্য আপাতত অপ্রকাশ রাখিতে হইবে।

জায়গাটি অপূর্ব। একটি উঁচু কোন টিলার উপর গিয়া দাঁড়াইলেই তৃতীয়ার চাঁদের আকারে নীল সমুদ্রের রেখা দেখা যাইবে, তাহার তটদেশ হইতে চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সবুজ—সবুজ—আর সবুজ। ধানের ক্ষেত, তাহারই মাঝে মাঝে নারিকেল এবং সুপারি গাছ—একখানি নিরবচ্ছিন্ন সবুজের আস্তরণ, আর এই আস্তরণটি সমস্তক্ষণই একটি চঞ্চল হাওয়ায় দোল খাইতেছে। অপরূপ!

কিন্তু সেই সঙ্গে অসহ্যও। সমস্ত দ্বীপটাতে ছাড়া ছাড়া কয়েকটা কৃষক-পল্লী। তাহারা শুধু ধান রোয় আর ধান তোলে, এর অতিরিক্ত তাহাদের কোন কাজ নাই। অল্প দিনের মধ্যে এই সব সঙ্গীর একটানা চরিত্র-মাধুর্যে প্রাণটা আইঢাই করিতে লাগিল। মনে হইল যেন কাউপারের কবিতার আলেকজান্দার সেলকার্ক বনিয়া গিয়াছি।

এই সময় একদিন কুণ্ডনলাল আসিয়া উপস্থিত।

আমি ক্যাম্পে বসিয়া নিতান্ত সময় কাটাইবার জন্যই কতকগুলো পুরানো হিসাব লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলাম, হঠাৎ কানে আওয়াজ আসিল—"রাম রাম বাবুজী!" খাতা হইতে চক্ষু তুলিয়া দেখি একজন অপরিচিত ভদ্রলোক,...ঘুণ্টি দেওয়া জামা পরা, পায়ে স্প্রিংওলা জুতা, মাথায় হলদে রঙের মারোয়াড়ী পাগড়ি। বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে।

হাতে যেন স্বর্গ পাইলাম। দেশে বাঙালী-মারোয়াড়ী—আমরা আলাদা আলাদাই থাকি, কিন্তু এখানে মনে হইল যেন কত বড় আত্মীয়—

"আসুন আসুন, শেঠজি, হঠাৎ এখানে কি ক'রে আসা হ'ল!...

—ইত্যাকার প্রাথমিক আলাপে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে একখানি ক্যাম্প-চেয়ারে বসাইলাম।

পরিচয় হইল। কুন্ডনলালের বাড়ি আজমীঢ়ে, কিন্তু কয়েক পুরুষ লইয়া এখন কলিকাতাতেই বসবাস। নানা রকম জিনিসের ফলাও কারবার সমস্ত বাংলা জুড়িয়া। চার ভাই, অনেকগুলি ভাইপো, অনেক আত্মীয়-স্বজন—সবাই মিলিয়া এই বহুমুখী ব্যবসায় পরিচালনা করেন। এই দ্বীপটিতেও তাঁহার এই প্রথম আসা নয়, প্রতি বছরই বার দু-এক করিয়া আসেন, একবার এই সময়—ধানের অবস্থা দেখিয়া দাদন দিয়া যান, আবার একবার আসেন ফসল তোলার সময়, নিজের হিস্যের ধান চালান দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য।

বেশ চমৎকার লোকটি, খুব ঘনিষ্ঠতা জমিয়া গেল। অনেক দেশ ঘোরা আছে, গভীরতা না থাকিলেও অনেক তথ্য জানা আছে। হিন্দু সাহিত্যেও ভাসা ভাসা জ্ঞান আছে। বাংলা বলিতে পারেন, তবে হিন্দীর ছুট থাকে, আর এক-একটা কথা একটু বাঁকিয়া যায়।

বাসাটা একটু ভিতর দিকে, আমাদের ক্যাম্প হইতে প্রায় মাইল খানেকের পথ। কখনও আমি যাই, কখনও উনি আসেন। একঘেয়ে জীবনে বেশ একটু বৈচিত্র্য আসিল।

প্রথম পরিচয়ের দিন-পাঁচ পরের কথা। কুন্ডনলাল সকালের দিকে প্রায়ই আসিয়া থাকেন, সেদিন আসেন নাই। একটু সকাল সকালই দেখা করিতে গেলাম। গিয়া দেখি একটা চারপাইয়ে গা এলাইয়া পড়িয়া আছেন, বারান্দার এক কোণে মুনিম কিছু টাকাকড়ি লইয়া হিসাব-কিতাব করিতেছে, অনেকগুলি লোক তাহাকে ঘিরিয়া আছে।

আমি যাইতে কুন্ডনলাল উঠিয়া আমায় অভ্যর্থনা করিলেন। প্রশ্ন করিলাম, "শুয়ে ছিলেন যে শেঠজী?"

"না, এমনি।"

"আজ যানও নি সকালে।"

"না, আর কিছু না, এখানকার পানি একটু কমজোর, শরীরটা দুরুস্ত থাকে না।"

এটাই যে কারণ নয়, অন্তত আসল কারণ নয় সেটা বেশ বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু আর প্রশ্ন করা সমীচীন মনে করিলাম না। গল্প জমিয়া উঠিল, তবে তাহার মধ্যে যেন কিসের একটা অভাব রহিয়াছে। মনটাকে কুন্ডনলাল যেন টানিয়া গল্পের মধ্যে বসাইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং সব সময় সফলও হইতেছেন না। একবার একটু অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন, "বাড়ির চিটঠি আপনি ঠিক ভাবে পান বাঙ্গালীবাবু?"

মনে পড়িয়া গেল কুন্ডনলালের নূতন বিবাহ।

বলিলাম, "খুব ঠিকভাবে পাই না, তবে আমার তাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না।"

বিদেশে এক দেশের লোক, একটু হালকা রহস্যও হয় আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে। ওঁর জানা আছে আমি অপত্নীক, আমিও জানি উনি এতদিন বিপত্নীক থাকিয়া দ্বিতীয় দার

পরিগ্রহ করিয়াছেন।…লজ্জিতভাবে আমার পানে চাহিয়া কুন্ডনলাল অল্প একটু হাসিয়া বলিলেন, "বাঙ্গালীবাবু, তফ্‌রি করছেন—ওটি যে দিল্লীকা লাড্ডু তা মালুম নেই, যে-ভি খেলো সে-ভি পস্তালো, যে-ভি না খেলো সে-ভি—"

বলিলাম, "যে একবার খেলে সে আর পস্তালে কোথায় শেঠজী ?…

কুন্ডনলাল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "না বাঙ্গালীবাবু, আপনি বোড্ডো তফ্‌রিবাজ আছেন—বোড্ডো তফ্‌রিবাজ আছেন…"



আশ্বিনের শেষাশেষি হইলেও বর্ষাটা এখনও রহিয়াছে ; শরৎ এখানে খুব সংক্ষিপ্ত আর আসেও বড় দেরিতে। কয়েক দিন বেশ পরিষ্কার ছিল, শরতের পূর্বাভাস, আজ দুপুর থেকেই আবার বেশ মেঘলা ভাব দাঁড়াইয়াছে, বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবটা বাড়িয়া চলিল। সন্ধ্যা নাগাদ বৃষ্টি নামিবার সম্ভাবনা দেখিয়া আমি একটু বেলা থাকিতেই শেঠজীর নিকট বিদায় লইলাম, খানিকটা আগাইয়া দিয়া তিনি বাসায় ফিরিয়া গেলেন।

ক্যাম্পে আসিতে আসিতে আকাশ বেশ ভাল করিয়া ঘিরিয়া আসিল, মাঝে-মাঝে মেঘের ডাক। বোধ হয় চারিদিকে জলের জন্য এখানে ডাকটাও একটু নূতন ধরনের —মনে হয় নিচের জলের সঙ্গে উপরের জলের যেন পরিচিত ভাষায় গম্ভীর আলাপ-মন্দ্র। ঠিক ও-ধরনের জিনিস আমরা আমাদের প্রান্তে পাই না।

এখানকার একঘেয়ে জীবনে বর্ষার দিনগুলো যেন আরও অপ্রীতিকরই বলিয়া মনে হয়, সাধারণত, বন্দীকে যেন নির্মম নিঃসঙ্গ কারাগুহায় প্রবেশ করিতে হইল। সঙ্গে আমার বরাবরই কিছু বই থাকে, বেশির ভাগই কাব্যগ্রন্থ ; এখানে আসিয়া প্রথম প্রথম সেগুলা লইয়া খুবই নাড়াচাড়া করিতাম। খুব ভাল লাগিত, মনে হইত যেন বিশেষ করিয়া কাব্যপাঠের জন্যই বিধাতা এই আধ-সত্য আধ-অলীক জায়গাটিকে স্বপ্নের রাজ্য হইতে চয়ন করিয়া আকাশ-অবলম্বী করিয়া দুলাইয়া রাখিয়াছেন। ওদিকে নিজ বাংলার মন্ত্রণাগার থেকে মৃত্যুদূতের নিমন্ত্রণপত্র গেছে, বাংলার বৈশ্য-সমাজ তাহাকে জোগাইবে আহার, উল্লসিত মৃত্যুদূতের পদধ্বনি শোনা যাইতেছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র দ্বীপে সে সংবাদের একরূপ কিছুই আসিয়া পৌঁছিতে পারিত না, আমার কাব্য-আলোচনা অব্যাহতভাবে চলিল কিছুদিন। তাহার পর আসিল ক্লান্তি, একে একে সমস্ত গ্রন্থগুলি বাক্সজাত করিয়া ফেলিলাম।

আজ সন্ধ্যায় যখন প্রথম বর্ষা নামিল সেই আদিম আনন্দটি আবার ফিরিয়া আসিল।

এর যশটা কিন্তু বর্ষাকে দিলাম না, দিলাম একটি নবপরিণীত যুবার ব্যথাম্লান সলজ্জ হাসিকে। অনেক দিন পরে আমি আবার পেটিকা খুলিয়া কাব্যগ্রন্থ বাহির করিলাম—জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থই বাহির করিলাম—মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত। সমস্ত রাত বৃষ্টি হইল। কুন্ডনলালের ব্যথা আমায় সে রাত্রে বড়ই আতুর করিয়া তুলিল; মেঘদূতের প্রতিটি অক্ষর আমার কাছে নূতন অর্থে অর্থবান হইয়া উঠিয়াছে। এ যে আরও সুদূর নির্বাসন;—যে জগতে কুন্ডনলালের তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা···যুবতীবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ—সমুদ্রলগ্না এই স্বপ্নপুরী যে সে জগৎ থেকে আলাদা একেবারেই। এখানকার বুকের ব্যথা ওখানকার একজনের বুকে সংক্রামিত করিবে—মেঘের চেয়েও সূক্ষ্মদেহ কোথায় সেই দরদী বার্তাবহ? অনেক রাত্রি পর্যন্তই আমি পড়িলাম, কিন্তু দৃষ্টির গতি এতই বেদনা-মন্থর হইয়া পড়িল যে আমি 'পূর্বমেঘ'টুকুও শেষ করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

পরদিন সকালে বৃষ্টি ধরিয়া আসিল। রাত্রের সেই স্বপ্নালু ভাবটি যদিও পুরাপুরি নাই তবু তাহার আমেজ রহিয়াছে খানিকটা। বইটাও একবার শেষ করিবার আগ্রহ রহিয়াছে, সকালবেলাকার কাজগুলা সারিয়া আমি তাঁবুর মুখটিতে আবার মেঘদূত লইয়া বসিলাম। মেঘগুলি অল্প অল্প বিভক্ত হইয়া গেছে, হাওয়াটা হইয়াছে একটু জোরালো, তাহাতে সেগুলি বেশ লঘু গতিতে উত্তর দিকে ভাসিয়া চলিয়াছে।···রাত্রে মেঘের এই দূতালি ভাবটা এত প্রত্যক্ষ ছিল না। তাই তখনকার সেই স্বপ্নালুতা বোধ হয় একটু কাটিয়া গেল, কিন্তু তাহার জায়গায় বেশ একটি নূতন সজীবতা আসিয়া পড়িল। একটুর মধ্যেই আমি আবার বেশ ডুবিয়া গেলাম।

'পূর্বমেঘ' শেষ করিয়া ক্যাম্প-চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া একটি সিগারেট ধরাইলাম। মনটা আরও একটু প্রস্তুত করিয়া লইতেছি, এইবার—

চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥

—সেই অলকাপুরীতে প্রবেশ করিতে হইবে; এমন সময় দেখি কুন্ডনলাল মন্থরগতিতে এই দিক পানে চলিয়া আসিতেছেন।

বড় আনন্দ বোধ হইল। মনে হইল মেঘদূতের বিরহী যক্ষই যেন সারা রাত্রির সাধনার ফলে আমার গৃহদ্বারে উপস্থিত, একটু বেশি আগ্রহ করিয়াই সেদিন অভ্যর্থনা করিলাম। কুন্ডনলাল আমার পাশেই একটি ক্যাম্প-চেয়ারে উপবেশন করিলেন।

মনটা বেশ প্রফুল্ল কালকের তুলনায়। একটু রহস্যের আভাসেই প্রশ্ন করিলাম, "আজ শেঠজীকে একটু প্রসন্ন দেখছি, চিঠিপত্র কিছু এল নাকি সকালের বাটে?"

কুন্ডনলালের মুখটা হাসিতে দীপ্ত হইয়া উঠিল।

"আগো হাঁ বাঙ্গালীবাবু, এলো একঠো চিট্‌ঠি, আমার নিজের নামে সওয়া ছ'টাকা দরে যে ঢাই হাজার মোন চাল ধ'রে রেখেছিলাম, তার দাম সাড়ে নো টাকা হোয়ে গলো; আরও তেজ হোবে।"

এত বড় আঘাত আমার কাব্যানুভূতি কখনও পায় নাই। তবুও মনের ভাবটা যথাসম্ভব গোপন করিয়া আনন্দের সহিত অভিনন্দন জানাইলাম। অন্য কথাও আসিয়া পড়িল, কুন্ডনলালের অন্তরের আনন্দ যেন সবতাতেই উছলিয়া পড়িতেছে। ক্রমে মনকে প্রবোধ দিলাম—এত যখন, তখন কুন্ডনলাল মুনাফার চেয়েও মিষ্টতর কিছু আজকের ডাকে পাইয়াছে নিশ্চয়, লজ্জায় বলিতে পারিতেছে না।
বইটা একটা ছোট টেবিলে রাখা ছিল, একবার কুন্ডনলাল তুলিয়া লইল। বইটি বাংলা অক্ষরে বাংলা-সংস্কৃতের একটি সংস্করণ। একটু নাড়াচাড়া করিয়া প্রশ্ন করিল, "এ কি কেতাব পড়ছিলেন বাঙ্গালীবাবু ?"
বলিলাম, "মেঘদূত।"
"মেঘদূত ?—অচ্ছা !"
প্রশ্ন করিলাম, "পড়েছেন নিশ্চয় ?"
"না বাঙ্গালীবাবু, নাম-ধরু শোনা আছে। বাৎ কি আছে ওর ভেতর ?"
বলিলাম, "মেঘদূত হ'ল মহাকবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কাব্য এক হিসাবে ··'
কুন্ডনলাল প্রশংসা এবং বিস্ময়ে একটা চোখের ভ্রূ তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন—"অচ্ছা ! কবি কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য এক হিসাবে! ··আগে ?—কাব্যের বিষয় কি আছে ?"
বলিলাম, "বিষয় মোটামুটি এই যে. একজন যক্ষ কুবেরের শাপে বিন্ধ্যাচলের রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত হয় ; সে পাহাড়ের গায়ের মেঘকে প্রার্থনা জানাচ্ছে, হিমালয়ের অলকাপুরীতে আমার প্রেয়সীর কাছে আমার খবর পেঁছে দাও···"
কুন্ডনলাল অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া আমার পানে চাহিয়া ছিলেন, বলিলেন, "অচ্ছা ! তাহোলে বাঙ্গালীবাবু, হাওয়াই জাহাজের মতোন ওয়ারলিসেরও পত্তা ছিল হিন্দুদের ! মেঘের বিদ্যুৎকে···"
বলিলাম, "না, ওয়ারলেস নয়, কবির কল্পনা ; তিনি গোড়াতেই ব'লে দিয়েছেন—"কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু"—অর্থাৎ বিরহী-জন চেতন-অচেতনের ভেদাভেদ বোঝে না। তাই মেঘকে সজীব কল্পনা ক'রেই যক্ষ তাকে তার স্ত্রীর কাছে সংবাদ নিয়ে যেতে বলছে। কোন্ পথে যেতে হবে, কোথায় কি দেখবে, কোন্ শহরের কি বিশেষত্ব—এ সমস্তের একটি পরিষ্কার বর্ণনা দিয়ে গেছেন কবি···"
"অচ্ছা !—সমস্ত পথের বর্ণনা দিয়ে গেছেন ? আমায় কুছ্কুছ্ শোনান্ বাঙ্গালীবাবু, বড়ো দিলচস্পী মালুম হোচ্ছে।'
কৌতূহল খানিকটা জাগ্রত হইতে দেখিয়া আমারও লুপ্ত উৎসাহ খানিকটা ফিরিয়া আসিল। বলিলাম, "আপনার যদি ভাল লাগে শেঠজী তো না হয় সমস্তটাই পড়া যাবে দুজনে মিলে—অবসরের তো অভাব নেই, আর জায়গাটিও কাব্য পড়বার মতনই—আপনার মনে হয় না তাই ?"
যত দূরে দেখা যায় সবুজের ঢেউ, উপরে চঞ্চল খণ্ডিত মেঘের অভিযান, বহু দূরে

নীল সমুদ্রের একটি সরু ফালি—যেন অবগুণ্ঠিতা কাহার টানা দুটি চোখ কৌতুকভরে সমস্ত দৃশ্যটির পানে চাহিয়া আছে।

কুন্দনলাল একবার সমস্তটার উপর চোখ বুলাইয়া আনিয়া কতকটা আবেগভরেই বলিল, "সাত্যি বাঙ্গালীবাবু, এরকম চোমোৎকার দৃশ্য আমি কোথাও দেখি নি, আর ধান তো যেন লছমী-মাইয়ের খাজানা আছে। বোড্ডো মেহেরবানি যদি আপনি আমায় মেঘদূত পড়িয়ে শোনান্...অচ্ছা! বিন্ধ্যাচল থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিলকুল জায়গার চেয়ান আছে? খুব দিলচস্পী হোবে বাবুজী..."

কালকের রাত্রের সেই ব্যথাতুর ভাবটির পর থেকেই আমি বুঝিয়াছিলাম লোকটি ভাবুক,—উপরে প্রকাশ করিতে সংকোচ পান বলিয়া আরও ভাল লাগিল। এমন জায়গায় এমন একটি দরদী মনের স্পর্শ পাইয়া আমার মনের কপাটও যেন খুলিয়া গেল। বলিলাম, "তা হ'লে শেঠজী আপনি খেয়ে-দেয়ে বিকেলের দিকে আসুন আবার। এ জিনিস এক বৈঠকে শেষ না করলে রসটা পুরোপুরি পাওয়া যাবে না। আমিও যে কাজগুলো আছে সেরে রাখব, আজ তা হ'লে কাব্যচর্চাই চলুক।"

ভিতরের আগ্রহে কুন্দনলালের মুখটি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, বলিলেন, "বড্ডো মেহেরবানি হোবে বাঙ্গালীবাবু, কিন্তু এখন কুছভি তো 'জয়-গণেশ' ক'রে দিন, আমার জানতে বড্ডো ইরাদা হচ্ছে।"



একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে আমাকে। বলিলাম, "সে তো আনন্দের কথা শেঠজী—এত যখন আপনার আগ্রহ। ব্যাপারটা ঐ বললাম—বিরহী যক্ষ মেঘকে তার প্রেয়সীর কাছে দূত ক'রে পাঠাচ্ছে। সমস্ত কাব্যটি দুটি ভাগে বিভক্ত—পূর্বমেঘ আর উত্তরমেঘ। 'পূর্বমেঘ' হচ্ছে যাত্রাপথের কাহিনী। গোড়াতেই দেখি—আষাঢ়ের প্রথম দিনে রামগিরির সানুদেশ-সংলগ্ন মেঘ দেখে বিরহী যক্ষ বনমল্লিকা দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা ক'রে প্রেয়সীর কাছে পাঠাচ্ছে। তারপর পথের নির্দেশ—সে পথ নানা রকম আনন্দময় দৃশ্য দিয়ে তোমার মনস্তুষ্টি করবে। কোথাও পথিকবধূরা প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের আশায় মুখ থেকে হালকা কেশের গুচ্ছ সরিয়ে চোখ তুলে তোমার ওপর স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করবে, কোথাও সার বেঁধে বলাকা তোমার বুকে দুলবে, কৈলাসগামী রাজহংস ঠোঁটে মৃণাল-কিশলয় নিয়ে তোমার সাথী হবে। কোথাও বর্ষায়-ধোওয়া ক্ষেত থেকে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠবে—কৃষক-বধূরা স্নিগ্ধ

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তোমার পানে থাকবে চেয়ে। উত্তরে যেতে যেতে এলে তুমি আম্রকুটগিরি। হে মেঘ, সেই গিরিশিরে যে দাবানল প্রজ্বলিত হয়েছে, তোমার উচ্ছল জলধারায় তাকে নিভিয়ে দিও, গিরিরাজ তোমায় সাদরে মস্তকে ধারণ করবেন। সেখানে অল্প বিশ্রাম নিয়ে রেবা নদী পার হয়ে তুমি দশার্ণ ভূমিখণ্ডে এসে পড়বে। অপূর্ব সেই দেশ—বিশেষ ক'রে অপূর্ব তার রাজধানী বিদিশা নগরী। সেইখানে বেত্রবতী নদীর জল পান ক'রে পথের ক্লান্তি দূর ক'রে তুমি গিয়ে উঠবে নীচে পর্বতে। তোমায় দেখে আনন্দে কদম্ব ফুল সব উঠবে ফুটে, তারপর তোমার জলকণা দিয়ে জুঁই ফুলের কুঁড়িদের ফোটাতে ফোটাতে…"

কুণ্ডনলাল মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া শুনিয়া যাইতেছে, এত আবিষ্ট মন যেন মেঘের সঙ্গে কৈলাসগামী রাজহংসের মতই রামগিরি হইতে নীচে পর্যন্ত সমস্ত পথটা অতিক্রম করিয়া আসিল। বলিল, "অচ্ছা! এই রোকোম ক'রে সমস্ত রাস্তার চেয়ান দিয়ে দিলে? কালিদাস তো নিজেই দিয়েছিলেন বাবু? বড়া ধুরন্ধর কবি ছিলেন তো—সোমোস্ত রাস্তার হালচাল জানতেন, —অচ্ছা!"

বলিলাম, "এ তো আপনাকে শুধু কাঠামোটা বলছি শেঠজী, একটি একটি ক'রে বর্ণনা যখন শুনবেন…"

"অচ্ছা!"

"তার পর এল উজ্জয়িনীর বর্ণনা—যক্ষ বলছে, হে মেঘ একটু ঘুর হ'লেও তুমি উজ্জয়িনীর পুরী হয়ে…"

"উর্জেন!—কোন্ উর্জেন বাঙ্গালীবাবু?"

বলিলাম, "এই উজ্জয়িনীই, আবার কোন্ উজ্জয়িনী।"

"সে তো আজমীঢ়ের কাছে।"

"কাছেই তো, আপনাদের ওদিককারই ব্যাপার তো মেঘদূতে।"

"অচ্ছা!"—বলিয়া এমন স্থিরদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন, মনে হইল কাব্য আর এই কঠিন বাস্তব কুণ্ডনলালের কাছে যেন এক হইয়া গেছে। প্রশ্ন করিলেন, "কবি কালিদাস আর কি ব্যেবসা করতেন বাবুজী?—অনেক মুলুক ঘোরা ছিল…"

বলিলাম, "কবি আর কি করবে শেঠজী?—কাব্য লিখতেন আর রাজাকে শোনাতেন—উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম শোনা আছে নিশ্চয়?"

কুণ্ডনলালের চোখ দুইটি আনন্দে ছল্ ছল্ করিয়া উঠিয়াছে, একটু সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "অচ্ছা! আপনি বিক্রমাদিত্যের নওরতনের কথা বলছেন! এখন বুঝেছি, ইয়াদ পড়েছে।…বড় আনন্দ হোল বাবুজী—বড় আনন্দ হোল।… আগে?…"

বলিলাম, "এই ক'রে ক'রে দশপুর, তারপর আর্যাবর্তে এসে কুরুক্ষেত্র, ক্রমে কনখল, ক্রৌঞ্চরন্ধ্র, সর্বশেষে মানস-সরোবর—কবি লিখছেন—হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদান—যার জলে সোনার পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় সেই মানসসরোবরের…"

"অচ্ছা!" বলিয়া কুণ্ডনলাল নিরতিশয় বিস্ময়ে আমার পানে একটু চাহিয়া বলিলেন, "সোনেকা কমল বাঙ্গালীবাবু?"
একটু হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, "শেঠজীর যে লাল প'ড়ে গেল একেবারে! সত্যি কি আর সোনার কমল? ওটা কবির..."
কুণ্ডনলাল লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন, "না, আমি সে কথা বলছি না, সে কথা না,—বলছিলাম—মহাকবির কি আশ্চর্য কল্পনা! আগে, বাঙ্গালীবাবু?"
বলিলাম, "পূর্বমেঘ এইখানেই শেষ হ'ল। তার পর উত্তরমেঘ—প্রথমেই অলকাপুরীর বর্ণনা—কি তার সৌন্দর্য, কি-বা তার ঐশ্বর্য! সেখানকার অধিবাসীদের কি বিলাস-ব্যসন! সে এক অপরূপ জগৎ। নগরীর পর নিজের প্রাসাদের বর্ণনা দিয়ে, যক্ষ নিজের প্রেয়সীর কথা এনে ফেলল—বলছে, হে মেঘ, যদি সেই সময় প্রেয়সী আমার নিদ্রামগ্ন থাকে তো গর্জন ক'রে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিও না যেন, কেন না হয়তো সে স্বপ্নে আমায় বক্ষে ধারণ ক'রে রয়েছে, তোমার গর্জনে তার ভুজলতা শিথিল হয়ে যাবে..."
কুণ্ডনলাল উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "অ-হ-হ, কেয়া খুবী হ্যায় বাবুজী—কল্পনার কোতো দৌড়!"
একটু হাসিয়া আবার বলিতে লাগিলাম, "তার পর তাকে শীতল হাওয়ার স্পর্শে ধীরে ধীরে জাগিয়ে বলবে—'হে সধবে,তোমার প্রিয়তমের বার্তা বহন ক'রে এনেছি—তিনি কুশলে আছেন—দুঃখ শুধু তাঁর বিচ্ছেদভার; তিনি আমার মুখে তোমার কুশল চান।'...তার পর শ্লোকের পর শ্লোক চলেছে বিরহব্যথার বর্ণনা ক'রে। সে যে কি অপূর্ব শেঠজী!..."
একটু শীঘ্রই সেদিন উঠিলেন কুণ্ডনলাল—সকাল সকাল আসিয়া পড়িবার জন্য। গতি খুব মন্থর; মেঘের চেয়েও অশরীরী যেন কবিতার উপর ভর করিয়াই চলিয়াছেন।



কুণ্ডনলাল কিন্তু বিকালে আসিলেন না।
প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া বিরক্তি আর গ্লানিতে মনটা ভরিয়া গেল। অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্...হুঃ, সে দাদনের হিসাব রাখিবে, না, 'মেঘদূত'-এর রসাস্বাদন করিবে?
বিকাল কাটিয়া গিয়া সন্ধ্যা আসিল; মেঘটা আবার বেশ জমিয়া আসিয়া কাব্যের আসরটা জমকাইয়া আনিতেছে।...এক একবার মনে হইতে লাগিল—আসিবেই বোধ

হয় কুন্ডনলাল। মেঘদূত অমন করিয়া জাদু করিল ও'কে, আর না আসিয়া পারেন ?

সন্ধ্যাও উত্তরাইয়া গেল। তখন আমার হঠাৎ ভয় হইল—অসুস্থ হইয়া পড়েন নাই তো ?...বিশেষ করিয়া ও'র মধ্যেকার নীরব কবিটির সেই দিন সাক্ষাত পাইয়া আমার মনটা বড়ই উতলা হইয়া উঠিল। টর্চ আর জামাটা লইয়া আমি ও'র বাসার অভিমুখে চলিলাম।

দেখি বারান্দায় একটি সতরঞ্চির উপর একখানি ধবধবে চাদর বিছাইয়া একটি বাক্সের উপর একতাড়া কাগজ লইয়া কুন্ডনলাল বসিয়া আছেন, হাতে একটি শরের কলম, কাছেই এক মস্যাধার আর বালির পুঁটুলি। চক্ষু দুইটি দূরে মেঘলগ্ন।

সবচেয়ে যা সুন্দর, আর এই চিত্রটাকে পূর্ণতা দিয়াছে, তা সদ্যফোটা একরাশ মালতী ফুলে ভরা একটি পিতলের রেকাবি।

একটি বেড়া ঘুরিয়া হঠাৎ সামনে আসিতে হয়। কুন্ডনলাল আমাকে দেখিয়াই নিতান্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলেন এবং তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাগজগুলো গুটাইয়া ফেলিবার চেষ্টার সঙ্গে আমায় অভ্যর্থনা করিলেন। হাঁকিলেন, "আরে কুর্সি লে আও।"

একটা তীব্র আনন্দের সঙ্গে তীব্রতর অনুতাপ মিশিয়া আমার সমস্ত চেতনাটাকে যেন মথিত করিয়া দিল,—এই লোকটিকেই অরসিক ভাবিয়া মনে মনে হীন প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম ?.. স্নিগ্ধ প্রীতিভরে তাঁহার কাঁধে একটু চাপ দিয়া বসিতে বসিতে বলিলাম, "আজকের দিনটা এই ফরাশের জন্যেই শেঠজী, কুর্সি থাক্।...আপনি কি যেন লিখেছেন।"

কাগজগুলো বাণ্ডিলে পাকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়া কুন্ডনলাল লজ্জিতভাবে বলিলেন, "ও কিছু নয় বাঙ্গালীবাবু—এমনি ব'সে ব'সে একটু..."

আমি তৎক্ষণে দেখিয়া ফেলিয়াছি কুন্ডনলাল কবিতা রচনা করিতেছেন—যেমন আয়োজন আর যেমন অবস্থা, বুঝিলাম 'মেঘদূত'-জাতীয়ই কিছু।

ওদিকে বর্ষার আয়োজন আরও নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে, একটু আবেশ-স্তব্ধ থাকিয়া বলিলাম, "শেঠজী, আপনি এত রসিক, তার ওপর কবি—জানতাম না তো! আপত্তি যদি না থাকে তো যদি দেখবার সৌভাগ্য হ'ত...কেন না কাব্য কবির নিজের জীবন-কাহিনী হ'লেও সাধারণের তাতে অধিকার..."

কুন্ডনলাল অতি কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "বাবুজী, একেই তো কিছু নয়.. নেহাত এক সময় একটু অভ্যেস ছিল, তাই...তার ওপর আবার হিন্দী..."

বলিলাম, "আটকাবে না, আমার জানা আছে হিন্দী একটু একটু..."

আরও একটু কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়া কুন্ডনলাল কাগজের বাণ্ডিলটা আমার হাতে দিয়া দিলেন।—

অপূর্ব অদ্ভুত কাব্য—জীবনে এমনটি আর কখনও পড়ি নাই। কুন্ডনলাল তাঁহার মেঘদূত শেষের দিক থেকেই আরম্ভ করিয়াছেন :

"হে মেঘ, তুমি বড়বাজারে ২৭।৩ গোয়েঙ্কা লেনে আমার প্রেয়সী শ্রীমতী লছমীবতীর নিকট গিয়া বলিবে সে যেন আমার জন্য কিছুমাত্র না ভাবে। এবারে গতবারের চেয়ে অনেক বেশি চাষীকে দাদন দিয়াছি এখানে, লড়াইয়ের জন্যে রেটও খুব সুবিস্তা আছে—মোণ পিছু সাড়ে পাঁচ টাকা তো এখনই আসিয়া যাইতেছে। তিন হাজার মোণের দাদন দেওয়া, তিন-পাঁচে পনের হাজার টাকা! আমার প্রিয়াও যেন নিদারুণ বিচ্ছেদে হিসাবটা খতাইয়া দেখিয়া এর থেকে সান্ত্বনা লাভ করেন।

আর একটি বিশেষ দরকারী কথা। হে বারিদ, আমার এই প্রবাসের সময় আমা হইতে বিচ্ছেদের জন্য আমার প্রেয়সী নিশ্চয় সোনার গহনাগুলি বাক্সে তুলিয়া রাখিয়াছেন। আমি মর্মান্তিক দুঃখিত, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কাজের পরামর্শও দিই। সোনার দর এখন খুব চড়া; জাপানীদের যেমন মতলব দেখিতেছি, একটু অগ্রসর হইলেই দরটা হু-হু করিয়া আবার নামিয়া যাইবে। অতএব তাহাকে বলিবে—হে চারুহাসিনী, তুমি যদি গহনাগুলি ফেলিয়া না রাখিয়া এখন বিক্রয় করিয়া ফেল তো তের হাজার টাকার গহনায় কিছু নয় তো দশ হাজার টাকা মুনাফা পাইবে,—ঘরে বসিয়া। তাহার পর সোনার দর নামিলে যখন আমি দীর্ঘ বিরহের পর হা প্রিয়ে হা প্রিয়ে করিয়া গৃহে ফিরিব—তখন আবার মুনাফার টাকাটা বাদ দিয়া ঐ তের হাজার টাকার গহনা গড়াইয়া লইলেই চলিবে ধীরে-সুস্থে।

এইবার, হে মেঘ, আমার প্রিয়ার কাছে যাইবার রাস্তাটা তোমায় বলিয়া দিই, তুমি গভীর আনন্দ লাভ করিতে করিতে অগ্রসর হইও। সমুদ্রটুকু পার হইয়া প্রথমেই দেখিবে জমির ওপর যেন বড় চাঁদির পাত বিছানো আছে। দেখিলেই বুঝিবে এটা রোহিলগঞ্জের নুনের আড়ত। নুনের রেটটা জানিয়া লইয়া তুমি নোয়াখালী ও পরে চাঁদপুর হইয়া সিধা নারায়ণগঞ্জে উপস্থিত হইবে। প্রকান্ড পাটের আড্ডা। যদি পথশ্রান্ত হইয়া পড় তো আমার খুড়শ্বশুর নৌকিরাম গণপৎলালের পাহাড়-প্রমাণ পাটের মাথায় দাঁড়াইয়া খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লইতে পার।

হে মেঘ, নৌকিরাম গণপৎলালের গুদাম ছাড়িয়া আরও মাইলদুয়েক উত্তরে কুন্ডনলাল বিলামলের একটি বিরাট পাটের গাদা দেখিবে। আজ রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় সেই পাটে হঠাৎ আগুন লাগিবে। হে মেঘরাজ, তুমি স্বভাবতই কোমলপ্রাণ, তায় সমুদ্র হইতে প্রচুর জল আহরণ করিয়া লইয়া আরও কোমল হইয়া যাইবে, কিন্তু বিরহী কুন্ডনলাল করজোড়ে ভিক্ষা করিতেছে—সে আগুন তুমি কোনমতেই নিভাইতে যাইও না।—পাটের গাদাটি ফায়ার ইন্সিওরেন্স অর্থাৎ আগুনের বীমা করা, পুড়িয়া গেলে পনের হাজার টাকা লাভ, নিভাইলে আমি একেবারে বসিয়া পড়িব। তোমায় প্রিয়ার নিকট যখন গোপন সমাচার দিয়া পাঠাইতেছি, তখন আশা করি এ বিশ্বাস-টুকুরও মর্যাদা রাখিবে!

হে মেঘ, পর পর তোমার পথ পূর্ব দিকে, কিন্তু একটু ঘুর হইলেও, হে সখা, তুমি একবার হবিগঞ্জের দিকটা হইয়া যাইও। সেখানে পাটের জন্য এবার আমার বিস্তর দাদন দেওয়া আছে। অথচ কাল আমার ভাইপো হাজারীমলের পত্র পাইলাম—বৃষ্টির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ওখানকার পাট নষ্ট হইলে আমি এখানকার ধানে আর নারায়ণগঞ্জের পাটে যে টাকাটা 'নফো' করিব তাহার চেয়ে মোটা টাকা বাবদ মার খাইয়া যাইতে হইবে…"

এই রকম সব কাণ্ড, ছয় পাতা কাব্য লেখা হইয়া গেছে কুণ্ডনলালের। হবিগঞ্জের পর মেঘ আর উত্তরে না গিয়া সোজা গোয়ালন্দ চলিয়া আসিবে। সেখানে কুণ্ডনলাল-হীরাবক্সের নামে স্টীমার-ঘাটে কুলীর ঠিকা লইবার চেষ্টা করিতেছেন কুণ্ডনলাল। —একটু খোঁজ লইয়া এবং মুনিমকে একটু তৎপর হইতে বলিয়া মেঘ কলিকাতার আগে সবচেয়ে বড় পাট আর কাপড়ের আড্ডা কুষ্টিয়ায় গিয়া উঠিবে।…

এই রকম কোথায় সরষে, কোথায় তিসি গাদি করা আছে—আবার কোথায় আগুনের বীমা করা পাটের গুদাম—কত মুনাফা পিটিবার মতলব করিয়া রাখিয়াছেন কুণ্ডনলাল, কোথায় বা দেউলিয়া মারিয়া—কুণ্ডনলাল-মোতিভগৎকে উল্টাইয়া মোতিভগৎ-কুণ্ডনলাল করিবার শুভ উদ্যোগ চলিতেছে—সেই সব পরম বিস্ময়কর এবং কবিত্বময় কাহিনী বিরহিণী ষোড়শী বধূর নিকট পেঁছাইয়া দিবার অনুরোধের সঙ্গে গহনার সদ্‌গতির উক্তবিধ পরামর্শ।

শেষের দিকে আসিয়া পড়িয়াছি দেখিয়া কুণ্ডনলাল এক সময় রেকাবি হইতে একমুঠা ফুল লইয়া আলগাভাবে লুফিতে লুফিতে একটু সলজ্জ হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কেমন বাঙ্গালীবাবু! খুব দুরুস্ত হয়েছে কি-না?…"

বলিলাম, "দুরুস্ত হওয়ার কথা বলছেন কি কুণ্ডনলালজী,—আপনার মেঘ যখন বড়বাজারে ২৭।৩এ গোয়েঙ্কা লেনে পেঁছুবে ততক্ষণে সে তো একজন মহাশেঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে! একটা পুরো জীবনেও কেউ এমন তালিম পায় না। এখন শ্রীমতী লছমীবতীর কাছ থেকে আবার ওদিককার মুনাফার হিসেবটা কিরকম আসে জানবার আগ্রহ লেগে রইল।"

ক্যাম্পে ফিরিয়া খাবারটা মেসের চাকরদের বাঁটিয়া লইতে বলিয়া শুইয়া পড়িলাম।



রোমান্স...কলেজ স্ট্রীটে

কলেজ স্ট্রীটের একটি সংভ্রান্ত বইয়ের দোকান। একখানি বই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না, আমি ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালাম। লম্বা কাউন্টারের বাঁ দিকটায় বেশ ভিড়, বেচাকেনা চলছে। একটু দেখে নিয়ে ডান দিকটায় ঢুকে গেলাম। একজন টেবিলের ওপর একটা ক্যাশবাক্স রেখে বসেছিলেন, সামনে গিয়ে দাঁড়াতে মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন—"বলুন"।

একটা স্লিপে বইটার নাম লেখকের নাম, লেখা, মূল্য ইত্যাদি লেখা ছিল, বাড়িয়ে দিয়ে বললাম— "এই বইটা ·"

"নেই বাজারে।"—স্লিপটা দেখে, আমার কথা শেষ করবার আগেই, বললেন উনি।

"কাউকে একটু খুঁজে পেতে দেখতে বলে দেবেন? যদি একখানাও থাকে কোথাও পড়ে-টড়ে। বিশেষ দরকার ছিল। ভেবেছিলাম ওদিকেই পেয়ে যাব। শেষে···"

বোধ হয় মুখ চেনা আছে, তবে আর কোন প্রশ্ন না করে একজনের নাম ধরে ডেকে বললেন—"দেখুন তো একটু খুঁজে পেতে, যদি একটা কপি পাওয়া যায়।"

একজন একটা বড় নোট আর ভাউচার নিয়ে আসতে বাক্সর ডালা খুলে সেই দিকে মনোনিবেশ করলেন।

দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি, একটি মেয়ে উঠে এল ফুটপাথ থেকে। বয়স বাইশ-তেইশ, সুন্দরীই, আর বেশ যেন স্মার্ট। বাঁ দিকে না গিয়ে সোজা এদিকেই চলে এসেছে, নজর পড়তেই উনি বললেন—"এই যে, এসো মা। কি খবর?'

আমি ও'র সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম, পরিচিত দেখে বেশ খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে বাঁ দিকে সরে দাঁড়ালাম। মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে সামনাসামনি দাঁড়াল, বলল—

"দাদার সেই বইটা।···গেল কিছু?"

"না মা। অবিশ্যি একেবারে যে কিছু যায় নি এমন নয়। বিজ্ঞাপন দিচ্ছি, মাস চারেক হয়েও গেল, তবে তেমন সাড়া নেই ··"

"থাকবেও না। যা রুচি হয়েছে আজকাল!" ম্লান হেসে উত্তর করল মেয়েটি। বলল—"আজকাল বিকুবে···"

হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"দুখানা বই দিতে হবে। কাকে কাকে উপহার দিচ্ছেন দাদা। উপহারে উপহারেই যাবে।"

আবার একটু হাসল ও'র দিকে চোখ তুলে। উনি একজনকে ডেকে বলতে সে দুখানি বই এনে রাখল। আমি এতক্ষণ শুনেই যাচ্ছিলাম, বই এলে দেখবার জন্যে ঘুরেছি, মেয়েটির হাতে চামড়ার স্ট্র্যাপে বাঁধা খান তিনেক বই ছিল, নজর পড়ে যেতে দেখলাম, পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের ছাত্রী। এই সময় আর একটি ব্যাপার হোল।



একটি যুবক একটু যেন ব্যস্তসমস্ত হয়েই উঠে এসে নমস্কার করে দাঁড়াল। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, সুপুরুষই। সাজগোজের বেশ পারিপাট্য আছে। বাঁ কাঁধ থেকে সুদৃশ্য ব্যাগ ঝোলানো। ও'র সামনেই, তবে মেয়েটির থেকে একটু দূরত্ব রেখেই। মেয়েটি বই দুটো রাখবার জন্যে স্ট্র্যাপটা খুলছিল, উনি "আসুন আসুন"—বলে একটু যেন আগ্রহের সঙ্গে অভ্যর্থনা করতে মেয়েটি ঘুরে দেখে বাঁ দিকে চাইল। জায়গা যথেষ্টই ছিল, তবু আমি আরও একটু বাড়িয়ে দিতে সরে এল। যুবক—"থ্যাংকস্" বলে এগিয়ে গিয়ে ও'র সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। তারপর বাঁ দিকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে বই দুটো একটু দেখে নিয়ে মেয়েটিকে প্রশ্ন করল—"একটা দেখতে পারি কি?"
"দেখুন না।"—বলে মেয়েটি একটা ঠেলে দিতে তুলে নিয়ে ওপরের কভার থেকে উলটে-পালটে ভালো করে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করল "কিনলেন?...বেশ ভালো বই।"
ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বলল—"আপনাদেরই তো। বিজ্ঞাপন দেখেছি।"
উনি বললেন—"বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছি, লেখকের নিজের নামের একটা ভালো পরিচয়ও আছে, কিন্তু ডিম্যান্ড্ নেই।...ইনি হচ্ছেন ও'র বোন"...
"তাই নাকি?" ঘুরে একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে নমস্কার করল। পরক্ষণেই প্রশ্ন করল—"আমি একখানা বই নিয়ে যেতে পারি দিন কয়েকের জন্যে?"
একটু ছেড়ে দিয়ে বলল—"তারই বা দরকার কি? পড়ে ফেলতে একটু দেরি তো হবেই। বলছিলাম..."
আবার মুখ ঘুরিয়ে কাউন্টারের ওদিকে ও'কে বলল—"বলছিলাম—আমি একটু চেষ্টা করে দেখতে পারি? যদি..."
"আপনি!" যেন কথাটা লুফে নিলেন উনি। বললেন—"আপনি একটু ইন্টারেস্ট্ নিলে আর ভাবনা কি?"
মেয়েটির দিকে চেয়ে বললেন—"আমাদের—বলতে গেলে বেস্ট সেল্সম্যান। এদিকে নিজে একজন কবি—বিকাশ সান্যাল—নাম শুনেছ নিশ্চয়?"

"তাই নাকি ! ···নাম শুনব না ? ···নমস্কার।" —বেশ বিস্মিত পুলকিত ভাব ফুটে উঠল মুখে। মুহূর্তখানেকের জন্য আমার নজরটাও গিয়ে পড়েছে ঐদিকে, আপনিই, কি, চেষ্টা করে সৌজন্য রক্ষা করা, ঠিক বোঝা গেল না।

যে যুবকটি আমার জন্যে বই খুঁজতে গিয়েছিল, এসে বলল—"না, পাওয়া গেল না, ঢের খুঁজলাম।"

আমাকেই বলল।

একটু যেন রোমান্সের গন্ধ পেয়ে আমার পা উঠছিল না, একটা বুদ্ধিও জুগিয়ে গেল। বললাম—"তাহলে আর একটু কাজ করবে ভাই ? ঐ স্লিপ রয়েছে ওঁর কাছে, একটু কষ্ট করে ফোনে জেনে নেবে—কোন প্রেসে দিয়েছেন আর কবে নাগাদ বের হতে পারে।"

যুবক স্লিপটা তুলে নিয়ে চলে গেল। ডিরেক্টারি ঘাঁটা আর দুটো ফোনের ব্যবস্থা করে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে কিছু কথা বাদ পড়েছেই, তবে সূত্রটা ছেঁড়েনি। উনি প্রশ্ন করলেন—"তাহলে কতগুলোর দায়িত্ব নিতে পারবেন ?···মফঃস্বলে শিগ্গির যাচ্ছেন বলেই জিজ্ঞেস করছি।"

মেয়েটির দিকে চেয়ে বললেন—"মফঃস্বলে খুব পশার। একবার বেরুলে···"

মেয়েটি কৃতজ্ঞ—প্রশংসার দৃষ্টি তুলে চাইল।

যুবক বলল—"আপাতত শ চারেকের ঝুঁকি নিচ্ছি। পরে বাজার বুঝে। আপাতত আমায় খান পঞ্চাশেকের একটা প্যাকেট করে দিতে বলুন। বাইরে বেরুবার আগে লোক্যাল মার্কেটটুকু একবার দেখে নোব। পুশসেল তো। একটু তাড়াতাড়ি বলে দিন।"

মেয়েটির আয়ত ভাসাভাসা চোখদুটিতে প্রশংসা উপচে পড়ছে, তার দিকে চেয়ে বলল, "আপনি পরশু এই সময় একবার আসুন। পারবেন ?"

"পরশু ! এত শিগ্গির ! ··আমি আসব না কেন ? ইউনিভার্সিটি থেকেই তো ?"

"পোস্ট গ্রাজুয়েট ? কোন্···?"

"হ্যাঁ, সিক্সথ ইয়ার।"—মেয়েটি একটু লজ্জিতভাবে উত্তর করল।

"আজকাল আমাদের মেয়েরাও···কত অল্প বয়সে···!"

বলল অবশ্য কাউন্টারের ওদিকে চেয়ে। শেষ করতেও হোল না, মেয়েটিই বাধা দিয়ে ওকেই প্রশ্ন করল—"দেরি হবে ?"

আমার কাজে যে যুবকটি গিয়েছিল, এসে সময়টা জানাল—"প্রেসে আছে, আরও অন্তত দুমাস—লোডশেডিং, স্লো স্পিডে ··"

একজন বইয়ের পুলিন্দাটা এনে রাখল টেবিলের ওপর।

মেয়েটি বলল—"আমিই তুলে দিয়ে আসি ট্রামে।"

হাত বাড়িয়েছিল, যুবক আগেই তুলে নিয়ে বলে—"তা কি হয়! আচ্ছা আসি।… পরশু, এই সময়। নমস্কার।"

কি ভেবে আমাকেও একটা বাড়তি নমস্কার করে নেমে গেল। বোধ হয় মনের প্রফুল্লতা একটা যে বদান্যতা এনে দেয়, তার জন্যেই।

আমিও ঐ দিনটায় ঐ সময়ে উপস্থিত থাকবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। একটা উপায়ও বের করে নিলাম।

একটা মিড্ল স্কুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছি, সেক্রেটারি হিসাবে। সামনে পুরস্কার বিতরণের দিন। দেরি আছে মাস দুয়েক, তবে আমি বইগুলো কিনে রাখা ঠিক করে ফেললাম। বাছাইয়ের অঢেল সময় থাকবে হাতে। কিছুক্ষণ আগেই গিয়ে যথাস্থানে দাঁড়ালাম, ডান দিকে দু'জনের উপযোগী জায়গা ছেড়ে দিয়ে।

যথাসময়ে মেয়েটি বেশ একটু হন্তদন্ত হয়ে ফুটপাথ থেকে উঠে এল। স্টেজ পূর্বদিনেরই মতো। একটু ব্যগ্র হয়েই ওকে প্রশ্ন করল—"এসে ফিরে গেছেন?"

সঙ্গে সঙ্গে পায়ের শব্দে ঘুরে দেখে বলল—"এই তো।" যুবক প্রতি নমস্কার করে বলল—"এসে গেছেন! কতক্ষণ?"

"এইমাত্র, দু মিনিটও হয় নি।"—উৎসুক দৃষ্টিটা কাঁধের থলিটার ওপর গিয়ে পড়ল। যুবক বুঝে নিয়ে কতকটা অবহেলার সঙ্গেই বলল—"বই…প্রায় হয়েই গেছে। খান পাঁচ, ছয় পড়ে আছে, ফিরতি পথে হয়ে যাবে। আপনি এসে অপেক্ষা করবেন, তাই চলে এলাম তাড়াতাড়ি।"

"কি বলে ধন্যবাদ দিই আপনাকে? একদিনে পঞ্চাশ কপি! দাদা শুনে যে কী খুশী…"

"ফেললেন শেষ করে?"—উনি ওদিকে গোটাকতক ক্যাশমেমোয় সই করছিলেন টাকা নিয়ে বাক্সর ডালা বন্ধ করে প্রশ্ন করলেন। বললেন "তা আপনি পারবেন আমি জানতাম।"

মেয়েটির দিকে চেয়ে বললেন—"তোমায় বললাম না সেদিন?… সেদিন কি?—পরশুইতো। ও'র অসাধ্য কিছুই নেই।"

মেয়েটি আবার একটু হেসে নীরব প্রশংসার দৃষ্টিতে চাইল যুবকের দিকে।

সে কাউণ্টারের দিকেই চেয়ে বলল—"একবার বাজারটা দেখে নিলাম। দেখলাম বিশেষ বেগ পেতে হলো না।"

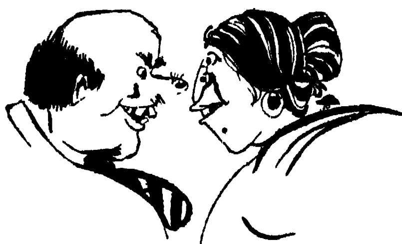
"তাহলে…এবার?"—প্রশ্ন করলেন উনি।

মেয়েটি উৎসুক দৃষ্টিতে চোখের কোণ তুলে চেয়ে আছে, যুবক মনে মনে একটু হিসাব করবার ভাব নিয়ে বলল—"দাঁড়ান একটু…"

তারপর ঘুরে মেয়েটির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—"আপনার কি বেশি তাড়া আছে?… যাতে বইগুলো তাড়াতাড়ি শেষ হয়…মানে…এর সঙ্গে টাকাকড়ির কথাও তো…মাফ করবেন আমায়"।

"সে তো থাকেই…"—মেয়েটি হেসেই ফেলল একটু, যদিও খুবই সংযমের সঙ্গে। বলল—"সে কথা আমি ঐ কাকাবাবুকে বলব।"
"বেশ বোঝা গেল!…ডেলিগেট কথা, তবু জিজ্ঞেস করতেই হোল। মাফ করবেন।"
"তাহলে এক কাজ করুন।"—কাউণ্টারের ওদিকে কথাটা বলে, কপালে তর্জনীটা টিপে একটু ভেবে নিয়ে আবার বলল—
"আমার বাইরে যাওয়ার প্রোগ্রাম রেখেছিলাম দিন দশেক পরে। এগিয়ে এনে পরশুই বেরিয়ে যাই। এদিকেই কয়েকটা জায়গা রেখেছিলাম হাতে এবার, মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত, বাড়িয়ে নর্থবেঙ্গল পর্যন্ত ঘুরে আসব তাহলে…"
ছেড়ে দিয়ে প্রশ্ন করল—"আপনি ছেপেছেন কত বলুন তো।" "বাইশশর বেশি সাহস করলাম না প্রথম এডিশনে। বুঝছেনই তো…যা রুচি চলছে আজকাল।"
"রুচি ঘাড় ধরে বদলে দিতে হবে।—যাব, তাহলে আমি এই ট্রিপে ওদিকের জন্যে হাজার খানিকের দায়িত্ব নিচ্ছি। একটু বেশি মেহনত করতে হবে, তবে ও কখানার ব্যবস্থা করে আসতে পারব আশা করছি।"
মেয়েটি বিস্ময়ে একসঙ্গে কথা খুঁজে না পেয়ে একবার এর মুখের দিকে একবার ওঁর মুখের দিকে চাইছিল, যুবক বলল—"ফিরে এসে আমার বাঁকুড়া—মেদিনীপুর, সাইডে প্রোগ্রাম আছে। একটা বুক ফেয়ারের চান্স পাব। তাহলে আপনার দাদাকে বলে দেবেন—এই দুটো ট্রিপে আমি বছর খানেকের মধ্যে একটা এডিশন শেষ করে ফেলতে পারব। আমি নিজে গিয়েই আলাপ পরিচয় করে অ্যাসিওরেন্স দিয়ে আসতে পারতাম…কোথায় বাড়ি আপনাদের?"
মেয়েটি বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বলল—"উঃ, দাদা তাহলে কী খুশিই যে হবেন! আমি সেদিন গিয়ে আপনার কথা বলতে…"
"এবার আর হোল না। বাইরে যেতে হলে আর সময় থাকবে না হাতে। ফিরে এসে চেষ্টা করব।…এই আমার কার্ড।" আইভরি পেপারে ছাপা একটি সুদৃশ কার্ড হাতে দিল। মেয়েটি ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে দিল।
আমি পুরস্কারের বই পড়ছি। উনি কিছু ক্যাশমেমোতে সই করছিলেন, বাক্সের ডালা বন্ধ করে প্রশ্ন করলেন—"তাহলে এবার?…"
"এবার তো আর সে ব্যবস্থা নয়। স্যাম্‌পেল—খান কুড়ির একটা প্যাকেট বেঁধে দিন আরও সব বইতো থাকবে—তারপর পঁচিশ পঞ্চাশ শ দুশো যেমন অর্ডার আসে সাপ্লাই করে যাবেন…ক্যাশ পেমেন্টই। সে ক্রেডিট্‌টুকু আছে বাইরে, দরকার পড়লে খাটব—।"
মেয়েটির দিকে চেয়ে একটু হাসল। মেয়েটি নির্বাক থেকেই একটু হাসিতে যতটা সম্ভব কৃতজ্ঞতা জানাল।
যুবক ওঁর দিকে চেয়ে বলল—"তাহলে এই ব্যবস্থা রইল।…দাঁড়ান।"
আবার কপালে তর্জনী টিপে একটু ভেবে নিয়ে বলল—"আমি আবার মাস দেড়েক

পরে এসে দেখা করব। ততদিনে আপনার পেমেন্টেরও অনেকটাই এসে যাবে। ও'র যদি দরকার থাকে দিয়ে দিতে পারবেন…"
"আপনি যখন এতটা দায়িত্ব নিচ্ছেন, সময়ে না এসে পড়লেও আমি যেমন দরকার হয় দিয়ে দিতে পারব না ? অচেনাও তো নয়।"—উত্তর করলেন উনি।
"তাহলে তো কথাই নেই আমার ওপর বিশ্বাসে ও'দের যদি এ উপকারটা হয়।… তাহলে সামনের মাসের পনেরো তারিখেই রাখি।"
সামনে টাঙানো ক্যালেণ্ডারটা দেখে বলল—"বুধবার পড়েছে।"
মেয়েটির দিকে চেয়ে বলল—"আপনিও যদি আসতে পারেন।"
"নিশ্চয় আসব। আমার তো কাছেই।"
"বেশ, গুড্‌বাই। নমস্কার।"
দুজনকেই অভিবাদন জানিয়ে নেমে গেল।
উনি মেয়েটিকে বললেন—"তোমার কি তেমনই দরকার মা ? তাহলে কিছু নিয়ে যেতে।"
"থাকনা এখন কাকা। দরকার…সেকথাও দাদাই ঠিক বলতে পারবেন। আমি আসি এখন।"
হাত তুলে নমস্কার করে নেমে গেল।
আমার বই বাছা শেষ হয়নি। পরে আবার একদিন আসতে হবে বলে একটা কাজের ছুতো করে নেমে গেলাম।



পরের মাসে পনেরো তারিখে গিয়ে নমস্কার করে দাঁড়াতেই উনি হেসে ফেললেন। রসিক মানুষ, আমার যে কেন আসা, টের পেয়ে গেছেন, বললেন—"নাটকের সব অংক না দেখে আপনি ছাড়বেন না দেখছি!"
"কি রকম ? ওকথা বললেন যে ?—অজ্ঞতারই ভান করলাম আমি যদিও একটু হাসি বেরিয়েই এল।
"প্রাইজের বই একসেট নিয়ে এসো"—একজনকে অর্ডারটা দিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন ‥"শেষ অংকটাও দেখে যান।…ওদিকের খবর ভালো, প্রকৃতই খুব খেটেছেন ভদ্রলোক। আমাদের একজন ভালো ক্যানভাসারও। যেমন যেমন বলেছিলেন প্রায়

সেই রকমই রেজাল্টও হয়েছে। মেয়েটি আজ বেশ একটু আগেই এসেছিল। বেশ একটা মোটা টাকার চেকই দিতে পারলাম ওর দাদার নামে। নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।"

"দাঁড়ালো না? ··একটা ধন্যবাদও সে···"

"উপায় ছিল না বেচারির। এইটে দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

একটা বড় খাম, মুখ সাঁটা, টেবিলের ওপর রাখা ছিল, এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। নাম ঠিকানা লেখা, এক কোণে ছাপা—"শুভ-বিবাহ।"

বললেন—"ওরই নাম।"

"বাড়িতে বিয়ে আছে?"

"ওর নিজেরই, এটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। আমাব নিমন্ত্রণ কার্ড।"

একটা খোলা কার্ড এগিয়ে দিতে পড়ে দেখলাম শ্রীমান সনৎকুমারের সঙ্গে কল্যাণীয়া দীপালীর শুভবিবাহ।

একটু আঘাতই পেলাম। বড় লাবণ্যমাখা কাঁচ মুখখানি কোথাও ছল-চাতুরির একটু বাঁকা রেখা কোথাও পাওয়া যায় নি। সেই জন্যেই যেন আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"তা, এমন ছল তামাসা করবার কি দরকার ছিল যে ··"

"না-না-না!"—উনি বাধা দিয়ে উঠলেন, বললেন—"বড় ভালো নিরীহ মেয়ে। ওর দাদাকেও জানি। সে ধরনেব পরিবারই। ও যা বলেছে, করেছে, নিতান্ত সাদা মনেই করেছে। —নিজের বিয়ের কথা কি করে বের করত বলুন! একটু হিন্ট্ ছিল টাকার কথায়। তা ভেতরে খাদ্ ধরবার বুদ্ধি আর থাকে?"

"কিরকম?···গলদ মানে?"

"বিবাহিত। তিনটি ছেলেমেয়ে। তবু ঐ রোগ—যদি রোমান্সের একটু গন্ধ পেলে ··" অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে মৃদুমৃদু হাসতে লাগলেন।

একটু পরে বললেন—"আমি অবিশ্যি জানতাম। ভাঙলাম না, ভাবলাম একটা শক্ত ধাক্কা খাওয়া দরকার। দেখে যান না শেষটুকু। এখুনি তো আসবে।"

"চিকিৎসাটার প্রশংসাই করতে হয় আপনার। তবে থাক্। আমি আজ যাই। শেষ-টুকুতো মনশ্চক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। আর প্রত্যক্ষ করবার উৎসাহ নেই।"

হেসে নমস্কার করে নেমে এলাম।



দ্বিতীয় পর্ব

ভালোবাসা একটি আর্ট



মেয়ে একই শহরের, যদিও একই পাড়ায় নয়। তেমনি আবার শহরটিও ছোট, পাড়ায় পাড়ায় বিশেষ দূরত্ব নেই। কাজেই দেখাশোনা, মেলামেশা হয়ে এসেছিল বেশ খানিকটা, শৈশবে, কৈশোরে। অবশ্য দুটি পরিবারের মধ্যে পূর্ব থেকেই খানিকটা ঘনিষ্ঠতা ছিল বলেই, পাড়া ডিঙিয়ে দু-বাড়ির মধ্যে যাতায়াত ছিল বলেই।

তারপর যেমন হয়, আবহমান কাল থেকে যেমন হয়ে আসছে—"তোমার সুবাকে আমায় দিতে হবে দিদি, আমার দ্বিজুর জন্যে বলছি। ও মেয়ে আর আমি অন্যত্র যেতে দিচ্ছি নে।"

"সে তো ওর ভাগ্যি ভাই। অত ভাগ্যির কথা ভাবতে পারা যায় না বলেই, নৈলে দুটিতে ঐ রকম যখন খেলা করে জামরুলতলাটিতে, দৃষ্টি গিয়ে পড়ে, আর ফেরাতে ইচ্ছে করে না তো চোখ। তবে বলব যে, বলবার ভরসা পাব তবে তো…"

এইভাবেই একদিন শুরু হয়ে, এই ভাবেই চলে কথা। এদিকে এঁদের গল্পের আসর, আরও পাঁচজনকে নিয়ে, ওদিকে ওদের খেলাঘর, পাড়ার আরও পাঁচটি জোটে—কর্তা-গিন্নী-ছেলেমেয়ে নিয়ে খেলাঘর, কিংবা পাঠশালা, কিংবা চণ্ডীমণ্ডপের দুর্গাপুজোর মিটিং; যেদিন যেমন মনের হাওয়া বয়। গল্পের আসরেও নানারকম শাখাপ্রশাখা বেরোয় গল্পের, তবে যতই না কেন বেরুক, শেষ সেই দু-তিনটি কথায়—"কী সুন্দর! …কী চমৎকার মানায় দুটিতে!"

সবারই যে অন্তরের কথা এমন বলা যায় না; তবে বসু-গিন্নীর মনটি বড় ভালো, পান-জর্দাও বড় মিষ্টি, সবাই এ-দুটির খাতির রাখবার চেষ্টা করে একটু। আর দুটো মুখের কথা বের করে দিতে লাগেই বা কার কি?

খুব যে আহা-মরি মানানসই এমন নয়ও তো। তাই কথাগুলো আরও লাগে ভালোই।

আগে সুবার কথাই ধরা যাক। ওর পুরো নাম সুবর্ণা। সুবর্ণা যে সুন্দরী, এ কথা আজ পর্যন্ত কেউ বলে নি।

প্রথমে রঙের কথাই ধরা যাক। ওর বাপ-মা পর্যন্ত না মেনে পারেন না যে ওখানে ও‌ঁদের নামের আন্দাজে ভুল হয়ে গেছে। তারপর নাক, মুখ, চোখ। কোন বিশেষত্ব নেই, নাকটি বরং মাঝখানে একটু চাপাই। হয়তো কিছু না থাকলেও এক একটা মুখে যেমন একটু মিষ্টতা লেগে থাকে, সেটুকু আছে ; হয়তো তেমন চোখে দেখলে সেটা আরও একটু স্পষ্টও হয়ে ওঠে, কিন্তু সে তো এমন কিছু নয়।

অপরপক্ষে দ্বিজেন রীতিমতো সুন্দর ; যৌবনে এসে সে এখন সুপুরুষ।

বঙ্কিম যে বলেছেন, 'ছেলেবেলার ভালোবাসায় একটা অভিশাপ আছে,' সেটা খুবই সত্য বরং আরও ব্যাপকভাবে সত্য, শুধু প্রতাপ-শৈবলিনীর অর্থেই নয়।

যে সময় চোখে নূতন রং লাগে, খাঁদা-কালোর প্রভেদ বুঝতে দেয় না, শৈশব-কৈশোরের সেই মাহেন্দ্র লগ্নে দ্বিজেনও ভালোবেসেছিল সুবর্ণাকে। দু-বাড়ির আলোচনায়, খানিকটা করে রসান দিয়েও তো যাচ্ছিল। বেশ ভালো লাগত ওকে দেখতে, ওর কথা ভাবতে। তারপর স্কুল যুগের খানিকটা পর্যন্ত এগিয়ে অভিশাপটা আস্তে আস্তে এসে পড়তে লাগল।

এরপর দ্বিজেন যখন ভালো করে বুঝল সে একজন তেইশ বৎসরের সুন্দর যুবক, কলকাতার কোন এক কলেজের ওপরতলার ছাত্র, তখন তার ভালোবাসার অভিশাপ সম্পূর্ণ।

ছেলেবেলার ভালোবাসার কথা বলছি। এমনি, বয়সের যে ভালোবাসা তা একের জায়গায় পাঁচে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য কলকাতা জায়গা বলেই, মফঃস্বলের এক ছোট শহরে এত ব্যাপক বিস্তৃত ভালোবাসার সুযোগ বা অবসরই বা কোথায় ? ও ভালোবাসে ওর কলেজের ছাত্রী সরমা হালদারকে। দুজনে একই ইয়ারে পড়ে, যদিও একই শ্রেণীতে নয়। দ্বিজেন হল গণিতের ছাত্র, সরমা ইতিহাসের। কিন্তু ইতিহাস-গণিতের দূরত্ব অন্যদিক দিয়ে যতই দুরতিক্রম্য হোক, ভালোবাসার পক্ষে তো কিছুই নয়, খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে ওর সঙ্গে।

সরমার বাবা ভারত সরকারের দপ্তরে কাজ করেন। বড় কাজ, তবে বদলি হয়ে বেড়াতে হয়। পুণাতে ছিলেন, বছর খানেক হল কলকাতায় বদলি হয়ে পার্ক-সার্কাসের দিকে সাহেব পাড়ায় বাড়ি নিয়ে রয়েছেন। নিজের গাড়ি আছে, সরমা তাতেই কলেজে যাওয়া-আসা করে।

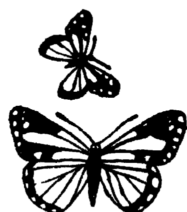
কোন কোন দিন সরমাদের গাড়ি করেই দ্বিজেনও যায় ওদের বাড়ি, নয় তো ট্রামে-বাসেই। পরিবারটি দিল্লী-বোম্বাই-লক্ষ্মৌ-পুণা ঘুরে একটু সাহেবী ভাবাপন্ন। এদিকে মাঝারি গোছের পরিবার, সরমার বাবা, মা, দুই ভাই, তিনটি বোন, বড় ভাজ, তার দুটি ছেলেমেয়ে। সরমার দাদা লক্ষ্মৌ হাসপাতালের ডাক্তার, কিছুদিন হল বিলাত থেকে বড় খেতাব নিয়ে আসতে গেছে।

স্মার্ট ছেলে, কলেজেও ভালো, চেহারাটাও রয়েছে, দ্বিজেন বেশ ভালো করেই মিশে গেছে পরিবারটির সঙ্গে।

এমন অবস্থায় এ সব পরিবারে যেমন হয়ে থাকে, সরমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধের সূত্রটুকু স্বীকৃত হয়ে গেছে। দ্বিজেনের বাড়ির অবস্থাও মন্দ নয়। মফঃস্বল শহরের পরিবার বলে যে ত্রুটিটুকু রয়েছে, ছেলেকে একবার বিদেশ ঘুরিয়ে আনলে সেটুকু যাবে চলে। এটাও ওঁদের ভবিষ্যৎ প্ল্যানের মধ্যে এসেও গেছে।

সবই ঠিক, বেশ এগিয়েও চলেছে দ্বিজেন, তবু মাঝে মাঝে পা যাচ্ছে রুখে।

এটা শুরু হয়েছে যে দিন সরমার দাদা বিলাত যাওয়ার আগে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে লক্ষ্নৌ থেকে কলকাতায় নিয়ে এল, তারপর থেকেই। ভাজ সরোজিনীর সঙ্গে এল তার ছোট বোন মৃণাল। দ্বিজেনের মনে হল সে এতদিন থেকে যা খুঁজছিল যেন এইবার পেল। প্রকৃত ভালোবাসার, প্রথম দৃষ্টিতেই ভালোবেসে ফেলার, না বেসে উপায় না থাকার যা লক্ষণ আর কি!



অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি। সরমার চেয়ে বয়সেও কম। তারপর সরমার রূপের যেমন একটা তীব্রতা আছে, মৃণালের তা একেবারেই নেই। নরম, একটু লাজুক, এক নজরেই ভালোবেসে ফেলার ঝোঁকে যে পদ্যটা লিখে ফেলল দ্বিজেন (সরমাকে নিয়েও লিখেছিল), তাতে মৃণালকে গলা পর্যন্ত সমস্ত পদ্মের ডাঁটা মৃণাল এবং তার ওপরের বাকিটুকু ফুটন্ত শতদল বলে কমপ্লিমেণ্ট দিল। অবশ্য কবিতাটা হাতে দিল না, নিজের মনের ভাবটা গুপ্তই রাখল, কিন্তু কয়েকদিন ধরে অবস্থা নিতান্ত সঙ্গীন হয়ে গেল।

তবে মৃণাল এসেছিল ওর জীবনে যেন ক্ষণ-বসন্ত রূপে। গোণা ঠিক সতেরোটি দিন ছিল বোনের বাড়িতে—যেদিন চলে গেল, বিকালের গাড়িতে যায়, সে হিসাবে পুরো সতেরোও নয়—তারই মধ্যে বর্ণে-গন্ধে-সঙ্গীতে ওর মনে একটা বিপ্লব বাধিয়ে পরে দিন কতকের জন্য মনটাকে একেবারে বর্ণ-গন্ধ-সঙ্গীতহীন মরুভূমি করে দিয়ে চলে গেল।

আবার মনটা এসে সরমায় আগেকার মতো বসাতে কিছু দেরি হল। তবে একবার যখন বসল, একটানা ভাবেই চলল। কৃষ্টিসম্পন্ন অভিজাত পরিবার, আত্মীয় স্বজনের যাওয়া-আসা আছে, নূতন নূতন রূপের ঢেউয়ের ধাক্কা লাগছে, সরমার ওপর ভালো-বাসাটা টলেও যাচ্ছে একটু-আধটু করে, তবে স্থায়ী কোনও ব্যাঘাত ঘটাতে পারছে না। এই করে বছর খানেক কেটে গেল।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, সরমা ইতিমধ্যে করছে কি? উত্তরটা এক কথাতেই দেওয়া যায়। ভালোবেসেই যাচ্ছে সরমা তার নিজের পদ্ধতিতে। কথাটা হচ্ছে, ভালোবাসার

আবার প্রকারভেদ আছে। এক ভালোবাসা নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই সন্তুষ্ট; সরমার তাই। দ্বিজেন এদিকে ক্রমাগত নিত্য-নূতনের মধ্যে দিয়ে ভালোবাসাটাকে রীতিমতো একটা আর্টের পর্যায়ে তুলে ধরেছে। যে-ভালোবাসা আর্টের স্তরে উঠে গেছে তার একটা শক্তি হচ্ছে, সে একই সময়ে আত্মপ্রকাশ আর আত্মগোপন – দুটোতেই সমর্থ। দ্বিজেন এ-শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠায়, এই যে এতগুলি মুখ এল-গেল ওর মনে, এর বার্তা গোপনই রইল সরমার কাছে। সে দেখল ভালোবাসার প্রদীপটি নির্বাত-নিষ্কম্পই রয়েছে দ্বিজেনের বুকে; নিশ্চিন্তই রইল। আর্ট হল জয়ী।

এই সময় ওর জীবনে একটা দিক্-পরিবর্তনের অবসর এল। ওরা দুজনেই পাশ করে কলেজ থেকে বেরিয়ে এল এবং সরমার পিতা ওদের বিবাহের প্রস্তাবটা তুললেন। তার সঙ্গে দ্বিজেনকে বিদেশে পাঠাবারও। দ্বিজেন প্রায় রাজিও ছিল; আর্টের পেছনে পড়ে থাকার একটা ক্লান্তিও তো আছে। একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত, কিন্তু এই সময় লিসা এসে উপস্থিত হল।

লিসার সঙ্গে পরিচয় হল সরমাদের বাড়িতেই। বাঙালীর মেয়েই, ওর নাম শীলা। সেইটেই উল্টে লিসা হয়ে গেছে। শোনা যায় নাকি একটা কারণও আছে, ওর ঠোঁটের হাসি নাকি মোনালিসার হাসি। সরমাদের সঙ্গে লিসাদের পরিচয় এখানেই এবং এই কদিনের মাত্র। ওর পিতা ডাক্তার বরাট কলকাতারই লোক, এই দিকেই ফিরিঙ্গী পাড়াতে একটা বাসাবাড়িতে থেকে প্র্যাকটিস্ করছিলেন, তারপর একটা বাড়ি কিনে সরমাদের প্রতিবেশী হয়েছেন।

মোনালিসার রহস্য শুধু তার ঠোঁটের হাসিটুকুতে। লিসা কিন্তু সর্বাংশেই রহস্যময়ী। বাহ্যত ও যাকে ইংরাজীতে বলা যায় ‘গ্ল্যামোরস্’ তাই। রূপে-ভঙ্গিতেও যেন চারিদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে চলে নিজেকে। কিন্তু তার পাশেই এমন আত্ম-সংহত, এমন নির্লিপ্ত যে, মনে হয়, ওর দেহ-মনের মাঝখানটিতে একটা খুব শক্তিশালী চুম্বক আছে এবং তা লিসার সমস্ত সত্তাটিকে নিজের চারিধারে আকৃষ্ট করে রেখেছে।

চুম্বকই যখন, আকৃষ্ট করেছে দ্বিজেনকেও, তবে মৃণাল ঘটিত ব্যাপারটুকু হয়ে যাওয়ার পর থেকে দ্বিজেনের ভালোবাসা অনেকটা সতর্ক রইল। এক্ষেত্রেও আবার যদি সরমাতেই ফিরে আসতে হয় তো সে বড় বিশ্রী হবে। একবার দিল ধুলো সরমার চোখে; বার বার না ও পারতে পারে।

তবু দুর্বার লিসার আকর্ষণ, বড় নিরুপায় বোধ করছে দ্বিজেন তার সামনে। শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে, দুদিকের ভালোবাসার সঙ্গে আপাতত একটা রফা করে মাঝামাঝি একটা পথ আবিষ্কার করে ফেলল দ্বিজেন। সরমার কাছে সময় চাইল। জানাল— রিসার্চের কাজটা নূতন পেয়েছে, এর মধ্যে বিয়ের ব্যাপারটা এনে ফেললে একটু ব্যাঘাত হয়ে যেতে পারে; একনিষ্ঠ মনোযোগ তো দরকার প্রথমটা।

কিন্তু এই উভয়নিষ্ঠ ভালোবাসা নিয়ে একনিষ্ঠ গবেষণার অজুহাতটা টিকল না। অবশ্য সরমার কাছে নয়। সে বেচারি আর্ট-দক্ষ ভালোবাসিয়ে নয়, সুতরাং চোখ-কান বুজে শুধু ভালোবেসেই যাচ্ছে। তবে তার বাবার তো আর দ্বিজেনকে

ভালোবেসে ফেলা নয়, দৃষ্টি বেশ স্বচ্ছই আছে, সন্দিগ্ধই হয়ে পড়েছেন। হয়তো এ কথাও ঠিক যে পুরুষ-মানুষই তো, এক সময় নিজেও ভালোবাসাটাকে আর্ট হিসাবেই চর্চা করেছিলেন, চেনেন তার স্বরূপ, ধরে ফেলেছেন।

রাজি হলেন না সময় দিতে। তাড়াতাড়ি ভালোবাসা-নেই এমন একটি পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে দিলেন।

সরমার বাড়ি বন্ধ হয়ে গেল দ্বিজেনের কাছে। সরমা গেল তো লিসাও গেল। হয়তো এক বাড়ির সংশয় অন্য বাড়িতেও সংক্রামিত হয়ে গিয়ে থাকবে।

সরমা যাক, লিসা যাক, মৃণাল যাক, কিন্তু আর্ট তো যেতে পারে না ; যার সাধনায় লোক সারা জীবন উৎসর্গ করে দিয়েও ক্ষান্ত হতে পারছে না, মনে করেছে পরজীবন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে তার সাধনা। দ্বিজেনও লেগে রইল। কিন্তু হিসাবে ভুল হয়ে গেল।

সব সাধনাই জীবন ভোর চলে, জীবনের ওদিকে যদি থাকেই কিছু তো সেখানেও টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু এ-সাধনায় যে তা চলে না, সে কথাটা বুঝল না দ্বিজেন। সরমা-মৃণাল-লিসারা বুঝতে দেয় নি। ও-পর্ব শেষ হলে দ্বিজেন একদিন হঠাৎ উপলব্ধি করল—প্রায় চারটে বছর টেনে নিয়েছে ওরা, সে এখন সাতাশ-আটাশ বছরের—যদি যুবকই বলতে হয়তো, যৌবনের প্রান্ত সীমায়।

এবার কাহিনীটাকে সংক্ষিপ্ত করা যায়, যদিও সময়ের দীর্ঘতায় প্রায় দশ বৎসরের কাহিনী।

তবে একরকম বৈচিত্র্যহীনই ঐ বছর চার ধরে যা হল তারই পুনরাবৃত্তি বলতে পারা যায়। এবার যা সাধনা সেটাকে যদি অভ্যাসযোগও বলা যায় তো নিতান্ত ভুল হয় না।

রিসার্চ শেষ করে ভালো আফিসে ঢুকেছে দ্বিজেন এবং ধাপে ধাপে উন্নতি করে সে এখন একটা ডিপার্টমেন্টের হর্তাকর্তা। তার অধীনে এখন একজন মেয়ে টাইপিস্টও রয়েছে—রীতা সেন।

এই দশটা বৎসরের প্রতিটি দিন ভালোবাসার একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, শুধু মনস্থির করে উঠতে পারে নি দ্বিজেন। সেই সরমাদের পরে মৃণালরা আসে, মৃণালদের পরে লিসারা। যখন মনে হয় এর ভালোবাসায় আকণ্ঠ ডুবে আছি, দেখা যায় একেবারে তলিয়ে যাওয়ার মতোও পাত্রী আছে।

কতদূর চলতো বলা যায় না, একদিন হঠাৎ দেখল উল্টা দিক থেকেও ঠিক এই ব্যাপারটা চলতে পারে। ওর শেষ পরীক্ষা চলছিল রীতা সেনকে নিয়ে ; একদিন সে এল না। এল তার চাকরি ছেড়ে দেওয়ার চিঠি। শুনল রীতা অন্য ডিপার্টমেন্টের যুবক টাইপিস্ট হিল্লোল গুপ্তর সঙ্গে বিবাহ করতে যাচ্ছে।

চেম্বারটা বন্ধ করে দিয়ে দ্বিজেন অপিসের গোল আয়নাটার সামনে দাঁড়াল, লক্ষ্য করল—সাধনায় আত্মবিস্মৃত হয়ে যা চোখে পড়ে নি এতদিন—রগের কাছে চুল-

গুলোয় অল্প অল্প পাক ধরেছে, কপালে গালেও অল্প অল্প বলিরেখা। সাধনার অবসাদ আছে তো, এদিকেও তো বয়স প্রায় চল্লিশ।

সুবর্ণার কাছে ফিরে গেল দ্বিজেন।

দুটো পাশ দিয়ে সুবর্ণা এখন ওদের ছোট মফঃস্বল শহরেই মাস্টারি করছে। গরীবের মেয়ে, বিবাহ হয় নি। কিংবা করেই নি বিবাহ।

দ্বিজেন যে ভালোবাসা নিয়েই এসেছে একথা শপথ করে বলা যায় না। কোথায় সরমা-মৃণাল-লিসা-রীতা, কোথায় সুবর্ণা! ভালোবাসা নয়, নিতান্ত প্রয়োজন একটা! তবু, দক্ষ আর্টিস্টই তো, বলল—"তোমার জন্য এই প্রতীক্ষা করে বসে আছি এতদিন সুবা।" সুবর্ণাও ঐ কথাটাই বলতে পারত, কিন্তু সে তো আর্টচর্চা করবার অবসর পায় নি জীবনে, অল্প একটু হেসে মুখটা ঘুরিয়ে শুধু একটু নীচু করে নিল।

চিত্ত ও চিত্র



(হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের "অভিমান" চিত্রটি দেখিয়া)

চিত্র-শিল্পের মডেল সে।

পঙ্কে তাহার জন্ম; কিন্তু বোধ করি, বিধাতা সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার অম্লান রূপ দেখিলে এই রকমই মনে হয়। মানুষও সে রূপের সমুচিত সংবর্ধনা করিয়াছে; সুতরাং জীবনে তাহার ক্ষোভের আঁচড়টুকু পড়িতে পায় নাই। 'বেলা' বলিতে লোকে যেটুকু বুঝিত, অর্থাৎ সেরা ভাস্করের হাতে কোঁদা প্রস্তর মূর্তির মতো নিখুঁত নিটোল একটি দেহযষ্টি, তাহার যাহা পাওনা, লোকে তাহা অকার্পণ্যে মিটাইয়া আসিয়াছে। তাহার অভাব নাই কোনোখানেই—না রূপে, না যৌবনে, না আদরে, না অর্থে। জীবন-শতদলের সব পলাশগুলিই একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; আর সে ইহাকেই তাহার নারীত্বের চরম পূর্ণতা মানিয়া লইয়া ইহারই মাদকতায় বিভোর ছিল।

শিল্পী তরুণ, নবীন তাহার প্রতিভা। বেলা সৌন্দর্যের রাণী, আর হাবভাবের অলংকার দিয়া সে সৌন্দর্য সাজাইতে দক্ষ; সুতরাং চলিল ভালোই। শিল্পীর প্রতিভার সহিত বেলা যেটুকু সংযোগ করিয়া দিত, তাহার ফলে চিত্রগুলি একেবারে অপরূপ হইয়া দাঁড়াইত। শিল্পী অন্তরের ভাবের ঐশ্বর্যে তন্ময় হইয়া মডেলকে কত ভঙ্গিমায় বসায়, শায়িত করে, কত ঠামে দাঁড় করায়, তাহার পর আঁকিবার আসনে বসিয়া দেখে তরুণী আবার তাহাতে পলকে শতগুণ সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে—কখনও সামান্য পাঁচটি অঙ্গুলির ললিত বিলাসে কখনও নয়ন-কোণের কোথাও একটু কুটিল চপলতাকে সংযত করিয়া, কখনও গ্রীবার একটি অলস হেলনে, আবার কখনও বা এমন অনির্বচনীয় একটা কিছুর দ্বারা, যাহা অঙ্গের কোনোখানেই ঠিক ধরা পড়ে না, অথচ যেন সৌরভের মতো সমস্ত অঙ্গটিকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে।

শিল্পী পাগল হইয়া যায়। কি আঁকিবে সে ? তুচ্ছ এ তুলির টানে কতটুকু বা ধরা দেয় ? বাস্তব যেখানে সীমাহীন, অনুকরণ তাহার কতটুকুকে সীমাবদ্ধ করিবে ?

বাহিরে তসবির প্রকাশিত হয়। রসজ্ঞেরা বাহবায় দেশের হাওয়া মাতাইয়া তোলে। কিন্তু সে প্রশংসার উচ্ছ্বাস শিল্পীর মনের যেখানটা খালি থাকিয়া যায়, সেখানটা কিছুতেই পূর্ণ করিতে পারে না। দ্রষ্টারা দেখে যতখানি হইয়াছে, তাহাতে উল্লসিত হইয়া উঠে, চিত্রী ভাবে কতখানি যে হয় নাই তাহাই, তাহার অন্তরের হাহাকার শান্ত হয় না, অনায়ত্তের জন্য চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া থাকে।

এতই সুন্দর সে বেলা, আর এমনই মুগ্ধ সে চিত্তকর। কিন্তু এ মোহের মধ্যে একটা বিশেষত্ব ছিল। শিল্পী রূপটিকে মানুষ হইতে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছে, এবং সেই জন্যই রূপের যে একটা বৈষয়িক দিক আছে, সেদিক দিয়াই তাহার সমাদর করিয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ অর্থের বিষয়ে সে একেবারে উদার হইয়া পড়িল। বাঁধা মাহিনা যাহা ছিল বেলার, তাহার উপর সে কত পাইত, তাহার আর হিসাব ছিল না। ইহার কারণ ছিল, শিল্পী যে-রূপ তুলির দ্বারা মাপিয়া উঠিতে পারিত না, তাহা অর্থের দ্বারা মাপিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইত। তাহার ছবির ক্রেতা যেমন সমুচিত মূল্য দিয়া তাহার ছবির সমাদর করিত, সেও বেলার মাধুর্য সম্বন্ধে সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছিল, কারণ দাম জিনিসটা পরিমাপের একটা সুস্পষ্ট উপায় ; মূল্য দিয়া বেশ সহজে অনেকটা বুঝানো যায়, জিনিসটার এই পরিমাণ কদর, এতটা যোগ্যতা।

এ বন্দোবস্ত বেশ চলিয়া যাইতেছিল। বেলা নিয়মমত আসিত, বসিত ; শিল্পী মনের মতো করিয়া তাহার ভঙ্গিমাটুকু ছানিয়া লইত। প্রয়োজনের বাহিরে দুই একটা কথা কোনোদিন হইত, কোনদিন বা হইত না। তাহার পর বেলার ছুটি হইয়া যাইত ; আর শিল্পী রঙের সমাবেশে মশগুল হইয়া পড়িত।

সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে তরুণ-তরুণীর মনস্তত্ত্ব লইয়া একটু গোলমাল হইয়া থাকে বটে ; কিন্তু এ স্থলে সে ভয় ছিল না, কারণ মনের দিকটা, আকাঙ্ক্ষার দিকটা, একেবারেই বাদ পড়িয়া গিয়াছিল উভয় তরফেই। তরুণ চাহিয়াছিল উৎকর্ষের দিকটায়। মডেলের কোন্ ভঙ্গিমাটিতে কতটুকু মধুরিমা ফুটিল, কতটুকু ইঙ্গিত হইয়াই রহিল ; তাহার মধ্যে আবার সেই বা কতটুকু ছানিয়া লইতে পারিল, কতটুকু তুলির সূক্ষ্মতাকেও এড়াইয়া গেল—এই লইয়াই সে ব্যস্ত থাকিত।

তাহার নয়নে লাগিয়া থাকিত রূপের বিস্ময় অথবা চিত্রের সৌকর্যের জন্য আত্ম-প্রসাদ। তাই হাজার মধুর হইলেও কোন ভঙ্গিমাই তাহার মনটাকে শিথিল করিয়া ফেলিতে পারিত না। বাহির হইতে দেখিলে বোধ হইত, কি এ তপস্বীর মতো সংযম ! কিন্তু এ সংযমের মধ্যে তাহার বিশেষ কোনো প্রয়াসই ছিল না। কারণ সে ছিল শিল্পের সাধনা লইয়া বিভোর—বাসনার স্থানই ছিল না সেথায়।

আর তরুণীর ছিল রূপ-ই বেসাতি। তাই নিজের শরীরের এক-একটা ভঙ্গিমায় নিজেরই মনে যে এক এক রকম ভাব জাগায়, সে কথা সাধারণে খাটিলেও বেলার পক্ষে

খাটিত না। তাহার উদ্দেশ্য দেখানো, এবং সে দেখানোর আর্টের যতটা ব্যঞ্জনা থাকে, ততই তার বেশি মূল্য তাহার পক্ষে। প্রথম প্রথম যেটুকু বা আন্তরিকতা ছিল, অভ্যাসে আবার তাহা একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রতীক্ষার তীব্র উৎকণ্ঠা, কি সোহাগের তারল্য দেখানো এখন চলা-ফেরা-শোওয়া-বসার মতোই স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া পড়িয়াছে, মনকে আর জাগাইতে হয় না।

কিন্তু এ-ভাবে আর বেশিদিন চলিল না। কারণ মনের সুপ্তি এক দিক দিয়া যেমন নিবিড়, অন্য দিকে আবার তেমনই লঘু;—কখন একটা কুসুমের মতো পেলব স্পর্শে সে যে জাগিয়া উঠে, বলা যায় না।

কারণটা ঠিক ধরা গেল না—একদিন যেন অহেতুকভাবেই বেলার সমস্ত মনের উপর একটা কিসের ব্যথা ছাইয়া গেল। এক অদ্ভুত বেদনা কোনো একটা আকার পরিগ্রহ করিল না। বেলার শুধু এইটুকুই মনে হইল, যেন একটা মস্তবড় ফাঁকির মধ্যে এতদিন সে কাটাইয়া দিয়াছে, পৃথিবী যেন একটা অলীক মোহের ফাঁদে ফেলিয়া তাহাকে নিষ্ঠুর-ভাবে বঞ্চনা করিয়া আসিয়াছে এতদিন। অথচ পৃথিবী বিশেষ কেহ নয়, কাহার কাছেই বা অনুযোগ করে সে! তা ছাড়া কি-ই বা প্রাপ্য ছিল তাহার, যাহা সে পায় নাই?

এসব কথার কোনও সঙ্গত উত্তর পাওয়া গেল না, তবে বেদনাটা ধীরে ধীরে এমনই বিপুল-বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে, তাহার সমস্ত জীবনটা যেন নিতান্তই অর্থহীন, লঘু এবং শূন্যময় হইয়া উঠিল।

এমনই করিয়া কয়েকদিন গেল; অবশেষে একদিন এই মূক ব্যথার সঙ্গীত একটা সামান্য আঘাতে তাহার হৃদয়ের তারে ক্রন্দনের মীড়ে জাগিয়া উঠিল।

একদিন শিল্পী বেলার সামনে একটা অনেকদিনের পুরানো ছবি আনিয়া ধরিল। হাসিয়া বলিল, "পৃথিবীতে সব জিনিসেরই দেখছি একটা দাম আছে। এই ছবিটাও শেষ পর্যন্ত বেশ দামে বিকোতে চলল। এর যে কখনও কদর হবে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি।"

কার চোখে কিসে নেশা ধরায়, বলা যায় কি? "দেখি, কোন ছবিটা?"—বলিয়া বেলাও হাসিয়া ছবিটা হাতে করিয়া লইল; কিন্তু ছবিটা এবং তলায় তাহার নামটাতে দৃষ্টিপাত করিতেই তাহার মনটা হঠাৎ যেন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং ক্রমে হাসিটা মিলাইয়া গিয়া চক্ষু দুইটা ঈষৎ সিক্ত হইয়া উঠিল।

একটা সামান্যই ছবি। নিতান্ত একটা সাধারণ বেষ্টনীর মধ্যে নিরালায় কিশোরী নিজের অন্তরের পানে চাহিবার অবসর পাইয়া যেন কাহার স্মৃতিতে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। কেহই কাছে নাই, কিন্তু কিসের শরম, কিসের শঙ্কা এবং শরম-শঙ্কাজড়িত কি এক মাধুর্যে মাথাটি নুইয়া পড়িয়াছে। মনে হয়, অন্তরে যে দেবতা জাগিয়াছে, তাহার মানসী মূর্তির কাছে কিশোরী নিরবশেষভাবে আপনাকে নিবেদন করিয়া দিতেছে। নীচে লেখা আছে, "সমর্পণ"।

বেলা যেন আত্মবিস্মৃত হইয়াই চাহিয়া রহিল। পূর্বেও এই ছবিটা এই ঘরের ছবির ভিড়ের মধ্যে নিশ্চয় দেখিয়াছে; কিন্তু আজ নূতন করিয়া তাহার মনে হইল, যেন তাহারই অন্তরের ব্যথা এই বর্ণ আর রেখার ভাষায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে, যেন সে তাহার

দয়িতের কাছে নিতান্তই আজ ধরা পড়িয়া গেল। তাই শিল্পী কথা কহিতেই সে হঠাৎ সচকিত হইয়া মুহূর্তেই লজ্জাবতী লতাটির মতো সংকুচিত হইয়া পড়িল।

শিল্পী বলিল, "তোমায়ই দেখে, অনেকদিন আগে, বোধহয় প্রথম আঁকা ছবি।"

আবার বলিল, "তখন রঙ ফলানোয় আর আঁকার ভঙ্গিমায় তেমন হাত খোলেনি, কিন্তু তা হলেও আত্মনিবেদনের ভাবটা জীবন্ত হয়েছিল খুব, না? আমার চোখেও যেন নতুন করে ভালো লাগছে।"

আশা-আশংকায় বেলার অন্তরটা যেন মণ্ডিত হইয়া উঠিল। ছবি হইতে আরম্ভ করিয়া শিল্পীর সমস্ত কথাগুলি পর্যন্ত আজ নূতন অর্থে অর্থবান হইয়া উঠিয়াছে।

শিল্পী আবার বলিয়া চলিল, "যিনি কিনবেন নতুন বিয়ে করেছেন শুনলাম, ছবিটি বড় চোখে লেগেছে ; যাক, আমাদের কাজটা তবুও সার্থক হ'ল।"

হায়, ভুল আশা! বেলার বুক ঠেলিয়া ক্রন্দন উঠিতেছিল—ওগো, আমার সার্থকতা এতে নয়—এতে নয়! সে কথা তোমায় আজ কি করে বোঝাই? আমার প্রাণের নিবেদনকে তুলি দিয়ে একটু একটু করে আহরণ করে যে ছবি সৃষ্টি করে তুললে, তা অপরের কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল, কিন্তু তোমার বুকেই কেবল এতটুকুও স্পন্দন জাগাতে পারলে না? কি করে তোমায় জানাই যে, এ চিত্রে সত্যই আমারই অন্তরের প্রতিচ্ছায়া ফুটে উঠেছে, সমস্তটাই তোমার কল্পনার লীলা নয় এ? হে উদাসীন, একবার আজ নিবিষ্ট হয়ে দেখ, চিরদিনই কি এই রকমভাবে ভুল বুঝে আমায় বিড়ম্বিত করবে?

অত কথা কিন্তু বলা গেল না ; নিতান্তই মিনতিক্লিষ্ট স্বরে বেলা শুধু বলিতে পারিল, "এ ছবিটা আর ঘর থেকে যেতে দিয়ে কাজ নেই সরোজবাবু, কাজ নেই বেচে।" এটুকুও যে কি রকম করিয়া মুখ দিয়া বাহির হইল, সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

প্রথমটা সরোজ যেন একটু বিস্মিত হইয়া গেল ; তাহার পর একেবারে হো হো করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, "ওঃ, বুঝেছি ; সত্যিই ছবিটা দেখতে তেমন কিছু নয়, কাঁচা হাতের আঁকা কিনা ; তুমি ভাবছ, বাজারে বদনাম হয়ে পড়বে। এক হিসেবে ঠিক ধরেছ বটে ; তবে রিটাচ্ করে-টরে অনেকটা সামলে আনব।"

বেলা শিল্পীর মুখের দিকে চাহিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আর একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

দুই দিন পরে আবার যখন আসিল, দেখিল ছবিটি নাই। সে কোনো প্রশ্ন করিল না, শুধু সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গায় ব্যাকুলভাবে চাহিতে লাগিল। মন জানিয়াও নিদারুণ সত্যটা বিশ্বাস করিতে চাহে না। সরোজ হাসিয়া বলিল, "নিয়ে গেছে সেটা, সে তাগাদা যদি দেখতে! তুমি একটু বস।"—বলিয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল।

বেলার বক্ষে একটা রূঢ় আঘাত লাগিল। তাহার মনে হইল, তাহার যৌবন আরম্ভের সেই সামান্য প্রতিমূর্তিটার একটা মূক ভাষা ছিল। সেটা যে সরোজের এই ঘরটিতে টাঙানো ছিল এবং সরোজকে যে মাঝে মাঝে দেখিতে হইত, এসবের ভিতর তাহার জীবনের অনেকটা সাফল্য ছিল।

এ কথাটা পূর্বে কখনও এমন করিয়া মনে উদয় হয় নাই এবং আজও ইহার সম্যক অর্থ ধরা গেল না ; কেবল মনে অকারণ একটা করুণ সুর ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল,—বেলা যেন আজ চলিয়া গিয়াছে, সরোজ তাহার অন্তরের নিবেদন, তাহার কৈশোরের প্রথম নিবেদন, তাহার নারী-হৃদয়ের চিরন্তন নিবেদন গ্রাহ্য করে নাই, তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে। অর্থই এই লুব্ধ শিল্পীকে অন্ধ ও বধির করিয়া তুলিয়াছে। কথাটা ফেনাইয়া ফেনাইয়া এই রকম ভাবেই মনে জমিয়া উঠিতে লাগিল।

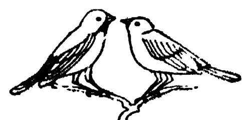
কিন্তু এ আবার কবেকার কোন বেলা ছিল,আর কিসের জোর তাহার এই শিল্পীর উপর, যাহা অর্থের উপরও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চায় ? মন এ কথারও উত্তর দিতে পারে না।

সরোজ হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিল, হাতে একমুঠা টাকা। ছবির দামের একটা মোটা অংশ, বেলাকে দিবে। অপ্রত্যাশিত সফলতায় মনটা উদার করিয়া দিয়াছিল, এ তাহারই একটা নিদর্শন।

"বেশ দামে বিকোল ছবিটা, রাখ এ টাকাগুলো।"—বলিয়া তাহার সঙ্কুচিত দক্ষিণ অঞ্জলি খুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিল।

বেলা অঞ্জলি খুলিল না। নির্বাকভাবে খানিকক্ষণ সরোজের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর কহিল, "না না, আমায় মাফ করুন সরোজবাবু, এ টাকা আমায় স্পর্শ করতে বলবেন না। তখন আমার এত হাবভাব ছলা-কৌশল শেখা হয়নি, আমার ও-ছবিতে কোনো কৃতিত্ব ছিল না, আপনার পায়ে ধরি, টাকা দিয়ে আর আমার জীবনের সমস্তটাই ভরিয়ে নিরেট করে দেবেন না—"

তাহার পর কথাগুলো একেবারেই অস্পষ্ট হইয়া গেল এবং চক্ষের কূল ছাপাইয়া অঝোর ধারায় অশ্রু নামিল।



জীবনে এ এই প্রথম।

চিত্রকর একদিন শুনিল, বেলা থিয়েটারে অভিনেত্রীর পদে ইস্তফা দিয়াছে। ব্যাপারটা খুবই সাধারণ, আকছারই হইয়া আসিতেছে। সে আর ইহাতে বিস্ময় মানিল না। সাধারণত ইহার যে গোটাকতক ধরা-বাঁধা কারণ আছে, তাহা দিয়াই সমস্যাটুকু পূরণ করিয়া লইল, অর্থাৎ ভাবিল, অন্যত্র টাকা পাইয়াছে বেশী, কাজেই পূর্বের দল ছাড়িয়া দিয়াছে, কিংবা নাম বাহির হইয়াছে, সুতরাং মূল্য বাড়াইবার এ একটা ফন্দি, অথবা এই রকম গোছের একটা কিছু হইবে। কিন্তু তাহার একটু ধাঁধা লাগিল,যখন প্রশ্ন করায় বেলা ছোট্ট করিয়া জবাব দিল, "এমনিই ছেড়ে দিলাম। না, অন্য জায়গায় কাজ পাইনি।"

সরোজ বিস্মিতভাবে মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কিন্তু বড় লোকসান হল যে?"

বেলা বলিল, "অত লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখি নি ; ওসব আর তেমন ভালো লাগে না, তাই ছেড়ে দিলাম।"—বলিয়া মুখের দিকে চাহিয়া অপ্রতিভভাবে একটু হাসিল।

সরোজ মাথাটা নীচু করিয়া একটু নিরুত্তর রহিল। কথাটা তেমন সে বুঝিতে পারিতেছিল না। সচরাচর যে কারণগুলো খাটে, তাহার কোনোটা এ ক্ষেত্রে লাগে না দেখিয়া সে একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল, "ভালো করলে কি? এ সময় অভিনয়গুলো তোমার বেশ স্বাভাবিক হয়ে আসছিল—বাজারে বেশ···"

অসহিষ্ণুভাবে বেলা বলিল, "অভিনয় স্বাভাবিক করবার জন্যে নিজেকে কতটা অস্বাভাবিক করে এনেছি জানেন সরোজবাবু? থাক সে কথা। নিন, বলুন আজ কি করবেন আমায় নিয়ে! এখনও তো এই দাঁড়ানো-বসা-শোয়ার অভিনয় চলবেই ; না হয় কথার অভিনয়েই জবাব দিয়ে এসেছি।"

মডেলের স্বরে আজকাল প্রায়ই এই রকম একটা মিশ্রণ থাকে, যাহা তাহার চিরন্তন হর্ষ কৌতুকের নয়। সরোজ লক্ষ্য করিল, একটু ভাবিলও, তাহার সেই দিনটার কথাও মনে পড়িয়া গেল, কিন্তু বেশী ভাবিয়া অবসর নষ্ট করিল না। উঠিয়া মডেলকে বলিল, "হ্যাঁ, নাও তো, আজ দাঁড়াতে হবে এই ভাবে। রোস, আইডিয়াটা আগে তোমায় বলে দিই ; ধর, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে. সে এসেছে নদীর ঘাটে জল নিতে। সমস্ত পথটা ঘোমটা ছিল ; এখানে এসে নিশ্চিন্দি হয়ে খুলতে যাবে, এমন সময় খানিকটা দূরে কোনো নৌকাতেই, কিংবা ডাঙাতেই কাউকে দেখে, হঠাৎ আধখানা ঘোমটা খুলে থেমে গেছে। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারছে না বলে ঘাড়টি বাঁকিয়ে ভ্রূ দুটি চোখের ওপর চেপে দাঁড়িয়ে আছে। দুটি পা সিঁড়ির দুটি ধাপে উঁচু নীচু হয়ে আছে, কলসীটি কাঁকাল থেকে নামিয়েছে, এখন কলসী রেখে ঘোমটাটি খুলবে কি তার আড়াল থেকে সন্দেহটা একেবারে মিটিয়েই নেবে, তা ঠিক করতে পারছে না।—আমার ছবিটা হবে ঠিক এই সময়কার, বুঝলে? কাঠের সিঁড়ি ওই তোয়ের করে রেখেছি ; এই কলসীটা ধর ; নাও, দাঁড়াও দিকিন।"

"বাবা বাবা, মাথায় এতও খেলে আপনার!"—বলিয়া একটু হাসিয়া বেলা কাঠের সিঁড়ির প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে পা দিয়া, সুগৌর বাম হস্তটিতে কলসী লইয়া এবং নিজের যৌবনশ্রীমণ্ডিত অপরূপ দেহখানির হিল্লোল সংযত বসনের রেখা-তরঙ্গে ফুটাইয়া বঙ্কিম ঠামে দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল, "তাড়াতাড়ি সেরে নেবেন ; আজ কি অপরাধে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করানো হল, জানি না।"

আঁচলের ঝুল, কি কাপড়ের ভাঁজ, কি কোথাও ঘোমটার পাড়ের একটা বাঁক ঠিক করিতে করিতে চিত্রকর হাসিয়া জবাব দিল, "থিয়েটারের চাকরি ছেড়ে নিজের প্রতি যে অন্যায় করেছ, তার জন্যে তুমি আজকাল বেজায় দুষ্ট হয়ে পড়েছ বেলা।"—বলিয়া একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়া আঁকিতে শুরু করিয়া দিল।

একটা রেখার টানে একটু সন্দেহ হওয়ায় দেখিয়া লইবার জন্য চিত্রকর মুখ তুলিল।

দেখিল, মডেলের মুখের ভাব বদলাইয়া গিয়াছে। শুধরাইয়া দিবার জন্য বলিল, "উঁহু বদলে ফেলেছ যে! ভ্রূ আরও নামিয়ে দাও, আর চাউনিটা আর একটু আড়ে হবে, সন্দেহের ভাবটি ঠিক ফোটে নি যে!"

বেলার ঠিক করিয়া লইতে দেরি হইল না। চিত্রকর আঁকিতে লাগিল। একটু পরে চোখ তুলিয়া দেখিল, সে আবার সব মাটি করিয়া বসিয়াছে। কি যে হইয়াছে তাহার, বলা যায় না। গ্রীবার ঈষৎ ঝোঁকটিতে যে একটা আচম্বিতের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেটা আর নাই এবং তীক্ষ্ণ কৌতূহলের ভাব তিরোহিত হইয়া একটা উদাস আনমনা ভাব আসিয়া পড়িয়াছে।

সরোজ একটু অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। মডেলের কাছ হইতে আজ সে মোটেই সহযোগ পাইতেছিল না অথচ এই-ই পূর্বে একই ভঙ্গিমা এবং একই ভাব ফুটাইয়া একটানা প্রয়োজনমতো দাঁড়াইয়া থাকিত। সে হাসিয়া বলিল, "তোমার কি হয়েছে বেলা? তোমায় দেখে বোধ হচ্ছে, বেচারা ঘাটে এসে এমন কাউকে দেখেছে, যাকে দেখে একেবারে মন হারিয়ে ফেলেছে, সতর্ক স্ত্রীলোকের যে ত্রস্ত অথচ সুসংযত ভাব থাকে, সেটা কই? এ যেন বেচারার সব এলোমেলো হয়ে গেছে। এ ভাবটা যদি তোমার মনে এতই আধিপত্য করে থাকে, অন্য একদিন না হয় তোলা যাবেখন; আজকে আমার ভাবটা একেবারে নষ্ট করছ যে!"—বলিয়া সরলভাবে হাসিতে লাগিল।

বেলা নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। শুধরাইবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু সরোজ ক্রমাগতই অপচ্ছন্দসূচক ঘাড় নাড়িতে লাগিল। তখন আর সে পারিল না, নামিয়া আসিয়া একটা সোফায় লজ্জিতভাবে বসিয়া পড়িল, কহিল, "না সরোজবাবু, আজ কেমন যেন হয়ে উঠ্‌ছে না কিছুতেই।"

সরোজ পেন্সিলটা রাখিয়া দিল। তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "থাক তবে এখন, কিন্তু এ আবার কি হ'ল?"

"হবার তো কিছু দেখি না, বোধ হয় কদিন থেকে শরীরটা তেমন—মরুকগে, আবার কবে হাজির দিতে হবে বলুন।"—বলিতে বলিতে দুয়ারের নিকট চলিয়া গেল।

সরোজ উত্তর করিল, "খবর দোবখন।"

"বেশ।"—বলিয়া বেলা বাহির হইয়া গেল।

চিত্রকর একটু অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিয়া নিজের মনেই বলিল "হুঁ।" তাহার সেদিনকার ঘটনাও মনে পড়িল, কিন্তু আর সময় নষ্ট না করিয়া অন্য একটা ছবিতে রঙ ফলাইতে বসিয়া গেল।

এই রকমই হইতে লাগিল। দুই মাস গেল, চার মাস গেল, একখানা আর ভালো ছবি শেষ করা হয় না। ছিন্নতন্ত্রী বীণার সুরের মতো সবগুলাই অসময়ে গতিহীন হইয়া পড়ে, আর কিছুই করা যায় না। শিল্পী নিজের খেয়াল ছাড়িয়া দিয়া মডেল যে ভাবে আবিষ্ট থাকে, তাহাই তাহার চিত্রফলকে মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু বৃথা, নির্বোধ ঔদাসীন্যের সময় তাহার কোথা হইতে যে সংকোচ আসিয়া পড়ে এবং গভীর সংকোচের মাঝে কখনু যে মনটা মুক্তপক্ষ হইয়া দূরদিগন্তে বিলীন হইয়া যায় কিছু বলা

যায় না। চিত্রকর তুলিকা ছাড়িয়া দেয় এবং অপ্রকাশের ব্যথা লইয়া হতাশভাবে বসিয়া থাকে।

সন্তপ্তচিত্তে বেলা প্রতিদিনই অনুরোধ করে, "আমায় ছেড়ে দিন,আমি কোনোমতেই পেরে উঠছি না, হাজার চেষ্টা করেও না। আমি নিজেই অন্য কাউকে না হয় ঠিক করে দিচ্ছি।"

শিল্পী বলে, "সে না হয় হল ; কিন্তু কি হয়েছে তোমার বল দিকি ?"

তবুও ছাড়ে না। ভাবে, ইহাকে লইয়াই তাহার এত প্রতিষ্ঠা ; মানসিক চাঞ্চল্যের সময়ই এটা ; দুই দিন কাটিয়া গেলে পরে আবার ঠিক হইয়া যাইবে। চাই কি ইহার মধ্যে দিয়াই এই তরুণীর একটা নূতন রূপ ফুটিতে পারে, সেটা তাহার চিত্ররচনায় একটা অভিনব সম্পদ হইয়া দাঁড়াইবে। এই রকম গোছের একটা আশাও ছিল, তা ছাড়া এই ঘরের প্রত্যেক জায়গাটির সহিত তাহার নিজের আঁকা প্রত্যেক ছবিটির সহিত বেলার স্মৃতি একান্তভাবে জড়িত। তাহার সৌন্দর্যসৃষ্টির ইতিহাসে যে এতটা স্থান জুড়িয়া আছে, তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিবার কথা কি ভাবিতে পারা যায় ?

তাহা না যাক ; কিন্তু বেলার তরফ হইতে ছুটির তাগাদা বড় জোর হইয়া পড়িল। তাহার মনে যে বেদনা, সেটা বেশী দিন কিন্তু তাহার কাছে রহস্যাবৃত রহিল না। তখন সে মনে মনে শিল্পীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমার দেহ অর্থাৎ দেহের ললিত ভঙ্গিমা লইয়াই তো তোমার কারবার ? সে দিকটা যখন আমার চিরদিনের মতো অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, তখন আর কেন ?

আমাকে বিদায় দাও। নিজের হাতে বাঁধন ছিঁড়িয়া যাইব, সে শক্তি আমার রাখে নাই ; তাই ভিক্ষা—তুমি নিজের মুখেই বিদায় দাও ; এইটিই তোমার মহাদান বলিয়া মনে রাখিব।

এই রকম আরও সব কথা, যার একটাও স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারে না।

মুখ ফুটিয়া বলে শুধু, "আর পারি না সরোজবাবু, আমায় ছেড়ে দিন, আমায় মুক্তি দিন।" তাহার পর দুইটি মর্মাহত প্রাণীর ক্লিষ্ট নীরবতায় ঘরের হাওয়াটা থমথম করিতে থাকে। একদিন নিতান্ত আড়ম্বরহীন বেশে অসময়ে স্টুডিওতে প্রবেশ করিয়া বেলা একটা সোফায় বসিয়া পড়িল, অশ্রুনিরুদ্ধ ভারি আওয়াজে বলিল, "আজ বিদায় নিতে এলাম।"

সরোজ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া তুলি লইয়া নিতান্ত নিবিষ্ট মনে কি একটা আঁকিতেছিল একেবারে তন্ময় হইয়া। মুখ না ফিরাইয়া তুলির একটা দীর্ঘ টান দিতে দিতে অন্যমনস্ক ভাবেই বলিল, "নিতা—ন্তই বিদা—য়। তা বেশ।"

—বলিয়া আঁকিয়া চলিল। কাজটুকু শেষ হইবার পূর্বেই কিন্তু তাহার চমক ভাঙিল, সন্ত্রস্তভাবে কি একটা বলিবার জন্য ফিরিয়া দেখিল, বেলা নাই।

একটা বিষম আঘাত লাগিল, এবং সেই সংযত শিল্পীর মনের দুর্গে এতদিনে এই আঘাতটি একটা বিদারণ-চিহ্ন অঙ্কিত করিল। হঠাৎ মনে হইল, বোধ হয় এইমাত্র উঠিয়া গিয়াছে, ফিরাইয়া আনি ; এভাবে বিদায় দেওয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরতা। কিন্তু

নিম্নতল পর্যন্ত নামিয়া রাস্তায় গিয়াও দেখিল, সে নাই। সে ফিরিয়া আসিয়া সোফাটায় হেলিয়া পড়িল এবং অনুভব করিল, তাহার অস্তিত্বের কোনখানটা হঠাৎ খানিকটা যেন বেজায় শূন্যময় হালকা ঠেকিতেছে।

তাহার আর সেদিন আঁকা হইল না। এতদিন কাজের সময়টাকে সে নিতান্ত সমাদরের চোখে দেখিত। আজ কিন্তু তাহার মনে হইল, যেন সময়ের এবং সেই সময়টাকে পূর্ণ করিবার জন্য যে কর্ম, জীবনে তাহার কোনো সার্থকতা নাই।

কেন এমন হইল, ভাবিতে গিয়া চিত্রীর ভ্রূতে সংশয়ের কুঞ্চন ফুটিয়া উঠিল, এমন কি চক্ষু দুইটাও দুই বিন্দু অশ্রুর আলোকে ঝলমল করিয়া উঠিল; এবং অনেকক্ষণ পরে যখন সে উঠিল, তখন একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে জানাইয়া দিল যে, ভিতরে তাহার একটা জায়গা উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে!



বেলা বিদায় লইল। ভাবিল, অভিমানের একটা প্রচণ্ড আঘাত দিয়া সে ইহকালের জন্য সুদূর হইয়া পড়িবে। এই শহর, এই দেশ, এমন কি শেষে এই পৃথিবী হইতে এত আলাদা হইবে যে,কখনও যদি অন্তত শিল্পী প্রয়োজন বোধ করে,তাহা হইলে তাহাকে আর খুঁজিয়া পাইবে না। তখন যে একটা বেশ প্রতিশোধ লওয়া হইবে, সে চিন্তা তাহাকে বড় তৃপ্তি দিল, যদিও সে ভাবিয়া দেখিল না, কিসের সে প্রতিশোধ, অপরাধ কোন্‌খানটায় এবং তাহার এ অভিমানের দাবিই বা উদয় হইল কোথা হইতে।

বেলা সুদূর এবং অলভ্য হইতে চাহিল বটে, কিন্তু তাহাও আবার সহজ হইল না। বহুদিনের বাড়িটা ত্যাগ করিল; কিন্তু শহর না ছাড়িয়া সরোজের বাড়ির আরও নিকটে একটা বাসায় আসিয়া উঠিল এবং তাহাতে নিজের প্রতি বিরক্ত হইল। একটা বড় রকম সক্ষমতায় এই ক্ষুদ্র দুর্বলতাকে চাপা দিবার জন্য সে একেবারে দেশ ছাড়িবার জন্যই আয়োজন জুড়িয়া দিল।

কিন্তু তাহাও আর শেষ হইয়া উঠে না। কিছুই গুছাইবার নাই। বিলাস-সম্পর্কিত আলয় ব্রহ্মচর্যের কঠোর দৈন্যে শূন্য হইয়া গিয়াছে; শৌখিন পরিচ্ছদ, অলংকার, আসবাব বিশেষ কিছুই আর নাই; কিন্তু তবু তাহার আর গোছানো হইয়া উঠে না। তাহার প্রবল উৎসাহ সমস্ত ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ নিবিয়া যায়; সজল নয়নে বেলা নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকে। জোয়ারের জল যেমন ভিতর হইতে ফুলিয়া সাগরের প্রান্তে চাপিয়া ধরে, একটা নিদারুণ অভিমান তেমনই করিয়া তাহার মনের শেষ সীমা পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠে; এবং সেই আত্মনিরুদ্ধ অভিমান কাহারও উপর উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতে পায় না বলিয়া অসহ্য বেদনায় বক্ষের শিরা-উপশিরাগুলি চাপিয়া ধরে।

শহর, দেশ কিছুই ছাড়া হইল না, সুদীর্ঘ একটা বৎসর এই দুরত্বহীন কঠোর অজ্ঞাতবাসে কাটিয়া গেল ; সকলের অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার এই হইল যে, তরুণী একদিন হঠাৎ শিল্পীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মনে কি যে তর্ক উঠিল যাহার এই অদ্ভুত মীমাংসা তাহা বলা যায় না ; তবে এই পর্যন্ত দেখা গেল, বেলা এক গ্রীষ্মাবসানের মধ্যাহ্নে দর্পণের সামনে বসিয়া সুচারুরূপে কেশ বাঁধিল, মণিবন্ধে সোনার চুড়ি এবং বহুদিনের অনাদৃত অনন্ত পরিল, একটা খয়ের রঙের বেনারসী শাড়িতে তাহার তরুণ যৌবনখানি মুড়িয়া কটিতে চন্দ্রহার দুলাইয়া দিল এবং রক্তাধরে তাহার সকলের চেয়ে মদির হাস্যটি ফুটাইয়া গাড়িতে উঠিল। যাইবার সময় হুকুম রাখিয়া গেল, আজ সব যেন প্রস্তুত থাকে, আজ শেষ দিন।

দাসী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যেতে হবে ?"

দর্পণের সামনে তোলা হাসিটিকে বেলা নষ্ট হইতে দিল না ; তেমনই ভাবে বলিল, "জাহান্নমে, কারণ আমার দুনিয়ায় মাত্র দুটি বিভাগ আছে ঃ এক-- এই স্বর্গ, দ্বিতীয় —জাহান্নম।"

দাসদাসীরা পরস্পরের সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিল, অর্থাৎ শুভ লক্ষণ, কর্ত্রীর মুখে অভিনয়ের বুলি দেখা দিয়াছে, বোধ হয় এবার দিন ফিরিবে।

এক বৎসর পরে বেলা আবার সেই ঘরটিতে প্রবেশ করিল। শিল্পী তখন ছিল না। বেলা পুরাতন অভ্যাসমতো সোফাটায় গিয়া বসিল, কিন্তু বসিবার আগে সেটাকে একবার ভালো করিয়া ঝাড়িয়া লইতে হইল, কেন না চিরন্তন প্রথানুযায়ী যেরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত, সেটা সেরূপ ছিল না। শুধু তাহাই নয়, বেলা লক্ষ্য করিল, ঘরটার আর সর্বত্রও একটা করুণ শ্রীহীনতা ছড়াইয়া রহিয়াছে। সামনে বন্ধ জানালার খড়খড়িতে ধুলা জমিয়াছে এবং তাহার উপর কয়েকটা মাকড়সা সূক্ষ্ম জালের পর্দা বুনিয়া নিরুপদ্রবে বসবাস করিতেছে। বুঝিতে পারিল, অনেকদিন ওই জানালা খোলা হয় নাই। দেওয়ালে ঠেস দেওয়া ছবিগুলায়ও ধুলা, এমন কি ঘরের মেঝেয়ও অনেকদিন ঝাঁট পড়ে নাই, এবং বেশী যে কেহ ঘরটাতে প্রবেশ করে না, তাহাও স্পষ্ট বোঝা গেল।

সৌন্দর্যের অধিষ্ঠান গৃহটির এই আতুর ভাবটি বেলার মনের এক জায়গায় বেদনা জাগাইল বটে, কারণ সে ইহাতে অভ্যস্ত ছিল না, কিন্তু সেই বেদনার পাশে একটা সুখের আভাস যে না ফুটিল, এমন নয়, কারণ অন্তরের অন্তরে সে বুঝিতে পারিল, এ তাহারই অভাবে।

বেলা অন্যমনস্কভাবে উঠিল এবং জানালাটি খুলিয়া দিয়া একে একে ছবিগুলা ঝাড়িতে লাগিল।

সবগুলিই প্রায় তাহারই দেহপ্রাণের সহিত জড়িত,তাহারই সৌন্দর্যের মূক সাক্ষী। আজ কি একটা ভাবিয়া বেলা অনেকদিন পরে নিজের হতাদর যৌবনশ্রীর পানে চাহিয়াছে, সুতরাং একান্ত নূতনভাবে সে তাহারই এই আলেখ্যগুলাকে আজ ভালো বাসিল। এক-একটাকে সে দুরন্ত আবেগ ভরে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। এই স্ফুট-চেতনা, ব্যথিতা,

নিঃসঙ্গ নারীর মনে হইল, তাহার রক্ত-মাংসের প্রতিরূপ এই চিত্রগুলায় তাহার মর্মের হাহাকারও বোধ হয় সঞ্চারিত হইয়া থাকিবে, বক্ষের কাছে চাপিয়া ধরিলে সমবেদনাময়ী সখীর মতো ইহাদেরও বুঝানো যাইবে, তাহার বেদনা কিসে এবং কতই না গভীর!

হঠাৎ একটি ছবির উপর তাহার চোখ পড়িয়া নিস্পন্দ হইয়া রহিল। পুরাতন ছবি, যে মালিক, সে বোধ হয় সংস্কারের জন্য রাখিয়া গিয়াছে। এক লতাকুঞ্জের দ্বারে হেলান দিয়া একটি নারী দাঁড়াইয়া আছে, দৃষ্টি তাহার বহুদূরে নিবদ্ধ, যেখানে বিতানের সংকীর্ণ পথ অস্পষ্ট হইয়া চক্রবাল রেখায় মিলাইয়া গিয়াছে। বসন্ত বহিয়া গিয়াছে। রিক্ত কুঞ্জ, সুখের ক্ষীয়মাণ স্মৃতির মতো দুই-একটা ফুল এখানে-ওখানে ধরিয়া রাখিয়াছে, নিদাঘের উষ্ণ নিশ্বাসে সেগুলাও তেমন ভালো করিয়া ফুটিতে পায় নাই, কেমন যেন মুছিয়া গিয়াছে। এই ম্রিয়মাণ সৌন্দর্যের সহিত একই ছন্দে মিলানো সেই রমণীমূর্তি; তাহার পূর্ণাত চক্ষে বেদনার গাঢ় ছায়া, আবেগের উগ্র শিখা আর আশার সৌম্য জ্যোতি কেমন করিয়া মিলিয়া গিয়া এক অতল রহস্যের সৃষ্টি করিয়াছে। নীচে লেখা আছে "প্রতীক্ষা"।

প্রতি রেখা, বর্ণের প্রতি অণু-পরমাণু হইতে একটা ব্যাকুল ভাষা যেন মৌনতা ভাঙিয়া আসিতে চায়ঃ ওগো নিষ্ঠুর, কেন 'আসি বলিয়া এখনও আসিলে না? আর কতদিন এ বিফল পথ-চাওয়া? হে অবিচারি, তোমারই জন্য সঞ্জিত এ কুঞ্জশোভা লুব্ধ কাল তিল তিল করিয়া হরণ করিয়া লয় যে! হে নিঠুর, কি তোমার কঠোর বৈরাগ্য, যাহা এই মর্মন্তুদ কাহিনীর কাছেও এত অটল? কুঞ্জের বসন্ত কাঁদিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, আর হে দেবতা, এই যৌবন-পুষ্পপাত্রের সব ফুল যে শুষ্কপ্রায়! তবুও এস, এ জীবনে এই বিপুল ব্যর্থতার অর্ঘ্য দিয়াই তোমার পূজা সাঙ্গ হইবে। তোমার হৃদয়হীন পাষাণ মূর্তিতে এই চির প্রতীক্ষমানা ভক্তই অন্তরের নিবিড় বেদনা দিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে। তুমি শুধু সকল নিরাশার মধ্যে একটি মাত্র আশা সফল করিও; তোমার বাণী চাহি না, তোমার স্পর্শ চাহি না, শুধু একটি মুহূর্ত-যুগব্যাপী প্রসন্ন দৃষ্টিতে এই ব্যর্থ জীবনে একটি স্মৃতিমাত্রের সম্বল দিয়া, এই ক্ষুদ্র অপ্রয়োজনের নিকট হইতে সংসারের নির্মম প্রয়োজনে ফিরিয়া যাইও।'

কিন্তু কে শোনে অন্তস্থলের এই গভীর ক্রন্দন?

তীব্র অভিমানে বেলার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সেই কঠিন গৃহপ্রাচীরের গায়ে বাম হস্তের আবেষ্টনীর মধ্যে বন্ধকবরী মস্তকটি রাখিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সোনার কাজকরা ভারি আঁচলখানি সোনার দেহ হইতে বস্ত্রাবরণ খসাইয়া দিয়া ভূমে লুটাইতে লাগিল, এবং স্থানভ্রষ্ট কটিহারটা গতাশ্রয়া ক্ষুদ্র লতিকার মতো ক্ষীণ কটির একটা লঘু বাঁকের অবলম্বন ধরিয়া অধোদেশ ঘেরিয়া দুলিতে লাগিল। দেহটি দুই-তিন স্থানে নুইয়া গিয়াছে—যেন অন্তরের অভিমান-ভরেই।

এই অনাদৃতা যুবতী আজ নিজেই উন্মুখ হইয়া আসিয়াছিল বটে; কিন্তু স্থির করিল, না, আর কথা কহিবে না, হাজার সাধিলেও না। শিল্পীর একটা অনুতপ্ত কাল্পনিক মূর্তিকে নিজের পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া সে অভিমানে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

এমন সময় সরোজ তাহার সত্য মূর্তিতেই ঘরে প্রবেশ করিল এবং অসংযতভাবে চিৎকার করিয়া উঠিল, "বেলা" !

কোনো উত্তর হইল না। শুধু সেই দেহবল্লরী ঈষৎ স্পন্দিত হইয়া আবার নিস্পন্দ হইয়া গেল।

সরোজ একটু দাঁড়াইল ; তাহার পর ধীরে ধীরে কাছে গিয়া বেদনার স্বরে বলিল. "বিদায় কি ওই ভাবেই নেয় বেলা ?"—ইচ্ছা হইল, অন্তত কাঁধের উপর একটা হাত দিয়া কথাটা বলে ; কিন্তু কি ভাবিয়া তাহা করিল না।

মনে হইল, যে রুদ্ধ অভিমানের ঢেউ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া তন্বীর দেহটিকে ভাঙিয়া খান খান করিয়া দিবে। বেলা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে ; কোনো কথা বলিল না, কিংবা ফিরিয়াও চাহিল না।

সরোজ নির্বাকভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। এই বিক্ষুব্ধা সুন্দরীর পাশে দাঁড়াইয়া সৌন্দর্য-উপাসক পুরুষের মনে কি হইতেছিল, কে বুঝিবে ? সে একটাও সান্ত্বনার কথা বলিতে পারিল না। তাহার স্থির ঈষৎ-সিক্ত চক্ষে হৃদয়ের মধ্যকার একটা তুমুল দ্বন্দ্বের আভাস ফুটিয়া উঠিতেছিল। ক্রমে এই সংযমী যুবার বাহুদ্বয় অবশভাবে আলিঙ্গনের আকারে সেই ক্রন্দমানা রমণীর দেহ ঘিরিয়া ফেলিল ; কিন্তু স্পর্শ হইবার পূর্বেই তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল।

তখন এই মনুষ্যটির মধ্যে ব্যথিতের পরিবর্তে চিত্রীই প্রধান হইয়া পড়িল। সে ভাবিল, অনুশোচনার কথা, সান্ত্বনার কথা বলিবার ঢের সময় পাওয়া যাইবে, কিন্তু সাক্ষাৎ অভিমানের মূর্তি ধরিয়া এই যে একটি নবীনা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া—এ সুবিধাটুকু ছাড়িয়া দিলে আর তাহার আপশোষ রাখিবার কি ঠাঁই থাকিবে ? বেলা তো ফিরিয়াই আসিয়াছে, তাহার সাময়িক চাঞ্চল্য কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সুদীর্ঘ বর্ষকাল পরে নিতান্ত অজ্ঞাতসারে সে যে একটি মাত্র নিখুঁত ভাবের ভঙ্গিমাটি তাহার সামনে ধরিয়াছে, যাহার মধ্যে এতটুকুও কৃত্রিমতার খাদ নাই সেটিকে যদি বিচলিত করিয়া নষ্ট করে তো সে ভুল কি আর সারা জন্মে মিটাইতে পারিবে ? তাহার চিত্তে যে দরদ উঠে নাই এমন নয়. তবে সে দরদ তাহার গভীর সৌন্দর্যানুভূতিকে লুপ্ত করিতে পারিল না। সে-এই অভিমানিনীর শোকবিদীর্ণ অভ্যন্তর হইতে চক্ষু সরাইয়া বাহিরে ন্যস্ত করিল, মুগ্ধ নেত্রে দেখিতে লাগিল, অবশ অঙ্গের প্রান্ত রেখায় রেখায় এবং স্রস্ত বসনের পরতে পরতে কি পূর্ণভাবেই না সেই শোক ফুটিয়া উঠিয়াছে !

তাই, এই সময় সমব্যথার পিয়াসী নারীর হৃদয়ে যখন রুদ্ধ বিক্ষোভের ঝড় তাহার প্রতি শিরা-উপশিরা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছিল, সেই সময় চোরের মতো অতি সন্তর্পণে, সৌন্দর্যের ভাণ্ডার হইতে কিছু সঞ্চয়ের জন্য সেই যশস্বী শিল্পী তুলিকা লইয়া বসিয়া গেল। সে ভাবিল, বেলা তো ফিরিয়াই আসিয়াছে, তাহার দুই দিনের চাঞ্চল্য কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু সৌন্দর্যের সাগরে মুহূর্তের জন্য এই যে হিল্লোলটি উঠিয়াছে, ইহাকে তো আর চিরদিন ধরিয়া রাখা যাইবে না।

কলতলার কাব্য



বেশ জুতসই আহারের পর ওদের বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম যে, আমাদের রাজনৈতিক অবস্থাটা নিতান্তই শোচনীয়! নখ-সঞ্চালনে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ওরা বলিল, 'হ্যাঁ, তোমাদের আবদার দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে; গাঁটের পয়সা খরচ করে সরকার বাহাদুর রাস্তায় রাস্তায় জলের কল পর্যন্ত করে দিলে, তবু তোমাদের মন পায় না! অনেক বুঝাইলাম যে, এক মাইল, আধ মাইলের মধ্যে এক-একটা কল বসাইয়া সরকার বাহাদুর জলপ্রার্থীদের মধ্যে কলহ-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র, আর এই কলহ সৃষ্টিই সকল বিষয়ে সরকারের মূল নীতি';—কিন্তু যেখানে যুক্তির নমুনা উক্তরূপ, সেখানে আর বৃথা বাক্য ব্যয় করিয়া কি হইবে? বিশেষতঃ যেখানে হারিয়াই খানিকটা তৃপ্তি পাওয়া যায়, সেখানে জিতিবার জেদটাই বা করে কোন্ মূঢ়?

একটু নিশ্চিন্ত থাকিলে বাঙালী হয় রাজনীতি, না হয় কাব্যের আলোচনা করিয়া থাকে। প্রথমটিতে নিরুৎসাহ হইয়া আজ এই জলের কল সম্পর্কে যে একটা ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহাই লিপিবন্ধ করিতেছি।

টিটাগড়ের স্টেশনে এবং কোম্পানির চটকলের মাঝের সুদীর্ঘ রাস্তাটার মধ্যখানে সিংহমুখো একটা জলের কল বোধ হয় অদ্যাবধি দাঁড় করানো আছে। রাস্তাটার দুই পাশে ছোট বড় অনেকগুলা বাড়ি উঠিয়াছে। কিন্তু পূর্বে, দীর্ঘান্তরালে দুই একটা দোকান ছাড়া, আর কিছুই ছিল না। তখন যেকোনো সময়েই লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত, কলটি দশ-বারোটি ঘড়া, বালতি ও অন্যান্য জলপাত্রে পরিবৃত—একটিতে ক্ষীণ

ধারায় জল গড়াইয়া পড়িতেছে এবং কয়েকজন পশ্চিমা স্ত্রী ও পুরুষ বাংলার দুঃখ-কষ্ট ও নিজ নিজ মুল্লুকের সুখৈশ্বর্যের গল্প করিতেছে। একটা পাত্র ভরিয়া গেলে 'ভাজা' অর্থাৎ পালা লইয়া একচোট বচসা হইত। যে জিতিত সেই ন্যায়কে স্বপক্ষে করিয়া নিজ পাত্রটা কলের মুখে বসাইয়া দিত, এবং প্রায়শঃ দেখা যাইত, যাহার রুপা-গালার বিচিত্র চুড়িপরা হাতখানা বেশী খেলে বিজয়-লক্ষ্মী সেই অঙ্গনারই সঙ্গিনী হইতেন।

দুপুরবেলায় এ দৃশ্যপট বদলাইয়া যাইত। তখন আর লোকের ভিড় থাকিত না। নিকটের নারিকেল বৃক্ষটা হইতে দুই একটা রৌদ্রতপ্ত কাক নামিয়া আসিয়া, কলের শান ভাঙিয়া যেখানে যেখানে জমা হইয়াছে; সেখানে দুই এক চুমুক জল পান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিত। এই সময় প্রায়ই দেখা যাইত, কলসিটি মাথায় লইয়া একটি চৌদ্দ-পনেরো বৎসরের পশ্চিমা মেয়ে দক্ষিণ দিকের একটা রাস্তা দিয়া মন্থর গতিতে আসিয়া কলতলায় উপস্থিত হইত। মুখের উপর তাহার এমন একটি কৌতুক-চঞ্চলতার ভাব ফুটিয়া থাকিত, যাহা দেখিলে স্বতঃই মনে হইত, কি গ্রীষ্ম, কি শীত, কি বর্ষা সকল ঋতুরই দিনগুলা, বিশেষ দ্বিপ্রহরের এই সময়টা, তাহার নিকট বসন্তের আকারেই বর্তমান। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এই যে, এত অসময়ে নিরিবিলিতে আসিলেও বেচারা নিরুপদ্রবে কখনও তাহার গাগরীখানি ভরিয়া লইতে পারিত না। কারণ, লোক না থাকিলেও তাহার আগমনের পূর্ব হইতেই কলের পাশে দুইটি ঘড়া বসানো থাকিত এবং সে আসিয়া কল টিপিলেই "আরে হামারা ভাজা, হামারা ভাজা" বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে একটা ছেলে ছুটিয়া উপস্থিত হইত।

প্রথম প্রথম মেয়েটা কিছুই বলিত না। কলসিটি সরাইয়া লইবার ভঙ্গিমায় বিরক্তির লক্ষণ পরিস্ফুট করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। ছেলেটা কলসিতে খানিকটা জল জমা হইলে, জল দিয়া কলসিটা উলটাইয়া-পালটাইয়া ধুইয়া লইয়া আবার ভর্তি করার জন্য বসাইয়া দিত। ইহাতে অসহিষ্ণুভাবে মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া অর্ধস্ফুট স্বরে বালিকা বলিত, "ই সব হারামজাদ্গি।" ছেলেটা কোনদিন মৃদু হাসিয়া সে বিরক্তিতে ইন্ধন যোগাইত। আর কোনদিন বা সাফাই দিত, "আরে ভাই, গাগ্রী ধিপল্ বা, ধোই না?"

বচসাটা কোন কোনদিন বাড়িয়াই যাইত। মেয়েটা প্রশ্ন করিত, এতক্ষণ পর্যন্ত কলসিটা রোদে বসাইয়া রাখিতেই বা কে মাথার দিব্য দিয়াছিল? এ সবই হারামজাদ্গি।

ছেলেটা উত্তর দিত, গুরমিন্টীকে রাজ্যে নিজের ইচ্ছা ও সুবিধা-মতো কাজ করিবার সকলেরই অধিকার আছে। যাহার না বনে, ঘরের ভিতর ঘোমটা টানিয়া বসিয়া থাকিলেই পারে ইত্যাদি। কিন্তু ছেলেটার অবাধ প্রতিপত্তি অধিক দিন চলিল না। একদিন ভাজা লইয়া গোলমাল করিতে গেলে বালিকা কলসিটা কলের মুখে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "হাম না হটায়ব, দেখি কৌনাকে অখতিবার বা।"

ছেলেটা হতভম্ভ হইয়া গেল, মুখে বলিল, "আরে ই ঔরৎ, না জমাদার বা।" কিন্তু কার্যতঃ কিছুই করিতে সাহস করিল না। মেয়েটা সেইরূপ জিদের সহিতই কলসিটা ভরিয়া লইয়া সেটা মাথায় বিঁড়া দিয়া বসাইয়া লইয়া গট্ গট্ করিয়া চলিয়া গেল।

যাইবার সময় কথা রাখিয়া গেল, "হাম হারামজাদ্‌গি তোড়ব হী।"

পরদিবস আসিয়া দেখিল, কলটাতে কলসির বালাই নাই। ঠোঁটে একটু বিজয়ের হাসি ফুটাইয়া বলিল, "হুঁঃ, বউয়া ডেরায়ল্‌ বাড়ন্‌"; অর্থাৎ বাছাধন ভয় পেয়েছেন; তাহার পর ধীরে-সুস্থে বেশ করিয়া মুখটা ধুইয়া রাঙা করিয়া মুছিল, আলগা টিকুলিটা আন্দাজে ভ্রু দুইটির মাঝখানে চাপিয়া বসাইয়া দিল এবং কলসিটা কলের মুখে বসাইয়া নারিকেল গাছের পাতলা ছায়ায় গিয়া বসিয়া রহিল। ছেলেটা তখনও আসিল না। তাহার আগমনের রাস্তায় এক একবার নজর ফেলিয়া মেয়েটা বলিল, "আবে কাঁহাসে? হাম কি সে জানাসি হাঁত?" অর্থাৎ আসিবেন কোথা হইতে, আমি কি সেই মেয়েমানুষ?

কলসি ভরিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, সে উঠিবার কোনো প্রয়াস করিল না। একটা খোলামকুচি লইয়া মাটিতে তাহার দেশী খেলার আঁকর কাটিতে লাগিল ও মাঝে মাঝে চোখ তুলিয়া এক একবার এদিক ও ওদিক দেখিয়া লইতে লাগিল। যখন প্রায় আধ কলসি জল পড়িয়া গিয়াছে, সে উঠিয়া গেল এবং "পানি সব খিপ গইল বা" বলিয়া সমস্ত জলটা ফেলিয়া দিয়া আবার টাটকা ও ঠাণ্ডা জলের জন্য কলসিটা লাগাইয়া পূর্ববৎ গিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় দেখা গেল, দুই হাতে দুইটা কলসি ঝুলাইয়া সেই হারামজাদা ছেলেটা আসিতেছে। দেখিতেও যা দেরি, লড়াইয়ে মোরগের মতো উগ্রভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং ত্রস্তপদে কলে পৌঁছিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের কলসিটা চাপিয়া ধরিয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া ছেলেটার পানে স্পর্ধিত নেত্রে চাহিয়া রহিল; ভাবটা—আজ এক চোট দেখিয়া লইবে সে।

ছেলেটা আস্তে আস্তে কলসি দুইটি শানের এক পাশে রাখিল এবং শান্তভাবে একটু হাসিয়া বলিল, 'আজ তো আর ভাঙার কথাই ওঠে না, তবে এত ভয় কেন? নাও, তুমিই ভরে নাও, আমি দাঁড়িয়ে দেখি।"

বালিকা তাহার মুখের দিকে একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর একটু অপ্রতিভের মতো কলসি ছাড়িয়া বলিল, "না না, সে কথা নয়, তবে অনেকটা যেতে হয়, আর এই রোদ—" হাসিয়া ছেলেটা বলিল, "হ্যাঁ, তোমার বাসা আর দূরে নয়। যে জানেনা, তাকে বোঝাওগে, আমি এই শহরেরই লোক, মুন্না-কাকার বাড়ি আর চিনি না? না, তোমায় এই নতুন দেখা আমার?"

বিস্মিতভাবে মুখটা একটু তুলিয়া মেয়েটা আবার ধীরে ধীরে নোয়াইয়া লইল। রৌদ্রে যতটা ঘামা উচিত ছিল তাহারও বেশী বেচারা ঘামিয়া উঠিতেছিল। কাল তাহার ছিল পূর্ণ জয়, আজ আসিয়া অবধি অন্তরে-বাহিরে সে যেন পরাজিত হইয়া চলিয়াছে। সকলের অপেক্ষা তাহাকে সংকুচিত করিতেছিল এই পরিচয়টা, কারণ সেটা তাহার তেমন গৌরবের নয়; তাহার চাঞ্চল্য, কৌতুক-প্রিয়তা ও নিঃসংকোচ ভাব পাড়ায় তাহাকে 'বাতাহিয়া' অর্থাৎ পাগলী নামে খ্যাত করিয়া রাখিয়াছিল। সে কথাটা লক্ষ্মীছাড়া সবজান্তা ছেলেটাও যে জানে, এটা তাহার কেমন রুচিকর বলিয়া বোধ হইল না।

নেহাত অপরাধীটির মতো বেচারা পলায়মান কলসিটির পানে চাহিয়া রহিল। ক্ষণেক পরে বোধ হয় একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া এই বোঝার মতো জড়তাটা দূর করিবার জন্য বলিল, 'যদি ততই জান মুন্নাকাকাকে, তো ওদিকে বড় একটা যাও না যে?"

ছেলেটা মেয়েটার পানে চাহিয়া ছিল; ঠোঁট টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "কি করতে যাব আর? মুন্নাকাকাকে দেখলে তো আর পেট ভরবে না। যাকে দেখলে কিছু ক্ষিদে মেটে, তাকে তো সামনে দেখতেই পাচ্ছি।"

মেয়েটা একেবারে সপ্তমে চড়িয়া উঠিল। ক্ষিপ্ত ক্রোধের একটা দীর্ঘ "কি!" টানিয়া কলসি ছাড়িয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল এবং তাহার কৈশোর অবসানের কটাক্ষে যতটা দাহ ছিল, সমস্ত দিয়া ছেলেটার পানে অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

ছেলেটা অবিচলিতই রহিল। সকৌতুক দৃষ্টিতে সঙ্গিনীর অনলবর্ষী নয়নের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার যে সবই উছলে পড়ছে—তোমার রাগ—কলসিতে জল—আর—আর—থাক্, সর, আমার ভরে নিতে দাও এখন।"



মেয়েটার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল। প্রথম খানিকটা একটা কথাও উচ্চারণ করিতে পারিল না, তাহার পর হঠাৎ বাঁধ ভাঙিল এবং 'ঝাড়ু মারা' হইতে আরম্ভ করিয়া যতগুলি গালাগাল একদমে মনে পড়িল, সবগুলি অনর্গল আওড়াইয়া কলসিটাকে বাঁকা কাঁকে সজোরে বসাইয়া দিল এবং ঝাঁকানির চোটে জল ছিটাইতে ছিটাইতে গৃহের অভিমুখিনী হইল।

ফণা ধরিলেই সাপকে মানায়। এই প্রচণ্ড বালিকার সহজ সৌন্দর্য ছেলেটা বোধ হয় উপভোগ করিতেছিল। সে খানিকটা চলিয়া গেলে গলা উঁচাইয়া কহিল, "তোমার নামটা কি বলে যাও, এ সব গালাগালির জন্যে মুন্নাকাকার কাছে নালিশ করতে হবে। 'বাভাহিয়া' বললে তো আবার এক চোট ক্ষেপে উঠবে।"

মেয়েটা দৃপ্তভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। রক্তিম মুখটা দুলাইয়া দুলাইয়া বলিল, "করিস নালিশ মুন্নাকাকার কাছে, আমি ভয় করি না। বলিস্ লছিয়া আমায় ঝাড়ু মেরেছে, লাথি মেরেছে, আর খড়ের নুড়ো দিয়ে আমার বাঁদুরে মুখটা পুড়িয়ে দিয়েছে; বলিস—একশো বার বলিস।"

আবার সবেগে ঘুরিয়া পূর্ববৎ চলিতে লাগিল।

মুন্নাকাকার কাছে কোনো পক্ষেরই নালিশ রুজু হইল না, এবং এই অপ্রিয় ঘটনার পর হইতে দুইজনের যে মুখ দেখাদেখি কি কথাবার্তা বন্ধ হইল, এমনও নয়। বর্ষা

আসিয়া পড়ায় দেখাশুনাটা অবশ্য প্রতিদিনই ঘটিয়া উঠিত না। যেদিন জল নামিত সজোরে, লছিয়ার সেদিন প্রায়ই আসা হইত না। মুন্নাই ভিজিয়া ভিজিয়া কলসি ভরিয়া জল লইয়া যাইত। ছেলেটা নিজের নিরিবিলি দো-চালা হইতে ব্যাপারটা দেখিত; আস্তে আস্তে ভিতরে যাইয়া কলসি দুইটা নাড়িয়া দেখিত—যদি সামান্যও জলের শব্দ হইত, বলিত, "আজ বাসিয়ে পানিসে চলি; আরে কৌন ভিঙে একচুক পানি লাগি।" যদি কলসিটা একেবারেই ঢন ঢন করিত, বাধা হইয়া ভিজিতে ভিজিতে সিকি কি আধা ভাগ ভরিয়া চলিয়া আসিত; এবং মুখখানি বর্ষার মেঘের মতো মলিন করিয়া হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিত।

বাহির হইতে যতদূর বোঝা যায়, এরূপ অবস্থা লছিয়ার মনে কোনো ভাবের ঢেউ তুলিত না। তাহার কারণ, তাহার মনটা ছিল স্বভাবতঃ আত্মস্থ—বাহিরের সহিত তাহার আদান-প্রদান ছিল অল্পই। নিজের কয়েকটা খেয়ালের নিগূঢ় সাহচর্যের মধ্যে সে বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে তাহার দিনগুলা কাটাইতেছিল। তাহার বয়সের সহিত সেগুলির কোনো সামঞ্জস্য আছে কি না, এ সব কথা ভাবিয়া দেখিবার তাহার অবসর বা চৈতন্য ছিল না; এবং লোকে যদি কোনো গরমিল আবিষ্কার করিয়া তাহাকে 'বাতাহিয়া' আখ্যা দেওয়া উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া থাকে তো করুক—সে গ্রাহ্য করিত না।

একটু—খুব সামান্য ব্যতিক্রম ঘটাইত কলতলাটা। সেইখানে ব্যয়িত তাহার জীবনাংশে আশা-বিষাদের একটা অজ্ঞাতপূর্ব মিশ্র অনুভূতি জাগিয়া উঠিতেছিল। সেটাকে সে যে পূর্ণভাবে নিজের হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতেছিল, এমন নয়; সেটা শুধু ধরা-ছোঁওয়ার বহির্ভূত একটা অস্পষ্ট আকারে তাহার উদ্দাম মনটাতে ছায়াপাত করিয়া মিলাইয়া যাইত। তাহার এমন ভাষা ছিল না যে, সে আভাসটুকুকে আকার দিয়া বুঝিতে সুঝিতে পারে—কারণ, যৌবন স্বীয় আগমনের সঙ্গে আর সকলকে যে শব্দ-সম্ভার দিয়া চৈতন্য ও স্পন্দন দান করে, লছিয়াকে তাহা দিবার অবসর পায় নাই। কলতলার একটা টান ছিল, সেটা বেদনার টান কি সুখের এবং তার উদ্ভবই বা কোনখানে সেটা সে বুঝিতে পারিত না; তাই কলতলা ছাড়িয়া সে বাঁচিত কি মরিত বলা কঠিন; তবে বাড়ি আসিলে তাহার সহজ প্রাত্যহিক জীবনের পাশে কলের স্মৃতি আসিয়া তাহাকে বিব্রত করিতে পারিত না, এটা ঠিক; মনটা ছিল তাহার বীণার মতো, —একটা ঘা পড়িলে একটু রনরনিয়া উঠিত বটে, কিন্তু তাহার স্মৃতি সে বহন করিয়া রাখিতে পারিত না।

এক একদিন লছিয়া বুড়ার সহিত ঝগড়া করিয়া নিজেই জল ভরিতে আসিত। বুড়াকে বলিত, "জলে ভিজে ভিজে তুই যদি মরিস, তা হলে আমি দাঁড়াব কোথা? সবাইকে তো পেটে পুরে বসে আছিস; কাউকেও রেখেছিস কি?"

বুড়া বিষণ্ণভাবে মাথাটা নাড়িয়া বলিত, "ঠিক বাত, ঠিক বাত, তবে কথা এই লচ্ছি, তুই যদি জ্বরে পড়িস, তাহলে তোর যে একটা বন্দোবস্তর কথা কদিন থেকে আমি ভাবছি সেটাতেও যে বাগড়া পড়ে যাবে।"

এ কথাটা লছিয়া মোটেই বরদাস্ত করিতে পারিত না। একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিত, মুখ ভেঙাইয়া বলিত, "বন্দোবস্ত! বন্দোবস্ত। আমার বন্দোবস্ত করলে ওই হাড় ক'খানা আগলাবে কে? শেয়াল কুকুরে? বুড়ো বয়সে তোর মতিচ্ছন্ন ধরেছে, তা আমার বুঝতে বাকি নেই। তা দেখি, আমি আগে যমের সঙ্গে তোর বন্দোবস্ত করি, কি তুই আমার বন্দোবস্ত করিস!"

বর্ষা গেল, শীত গেল, বসন্ত ফিরিয়া আসিল। জলের ভিড় আবার জমিয়া উঠিতে লাগিল এবং এই জমায়েতের সুখ-দুঃখ, বাংলার নিন্দা এবং মুলুকের তারিফ প্রভৃতি সেই পুরাতন গল্পের মধ্যে একটা নতুন বিষয় মাঝে মাঝে আলোচিত হইতে লাগিল—সেটা সুনরা ও লছিয়ার পরিবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা। সকলেই নাসিকা কুঞ্চিত করিতে লাগিল, ভ্রূ কপালে উঠাইতে লাগিল, একাল-সেকালের তুলনা করিতে লাগিল, এবং সবশেষে নির্লিপ্তভাবে এই অভিমতই প্রকাশ করিতে লাগিল যে, যাহার নাতনী তাহারই যখন চাড় নাই তো অপরের মাথা ঘামাইবার ফল কি?

প্রকৃতই, সুনরা ও লছিয়া একটু বাড়াইয়া তুলিয়াছে। তাহাদের কলতলার কলহ দুই-একটা লোক জড় না হওয়া পর্যন্ত আজকাল আর থামেনা, আর তাহাদের গল্প-হাসি শুরু হইলেও একটু বিবেচক লোকের চক্ষে তাহা কেমন কেমন ঠেকে। এমন কি সুনরা জ্বরে পড়িলে লছিয়া দুই একবার তাহার জল যোগাইয়া, তাহার পটলের ঝোলের পথ্য রাঁধিয়া দিয়া আসিয়াছে। মুন্নাও যে কতটা নেহাত না জানিত এমন নয়, কারণ জল তুলিতে যাইয়া সুনরার গৃহে এসব উপলক্ষে যেটুকু বিলম্ব হইত, লছিয়া তাহার একটা মনগড়া জবাবদিহি দিবার চেষ্টা করিত।



সুনরা কিন্তু কখনও পাল্টা ভিজিট দেয় নাই—লছিয়া জ্বরে মরণাপন্ন হইলেও নয়। মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বোধ হয় বলিবেন, তাহার মনে গলদ ছিল বলিয়া সে এতটা খোলা প্রাণ হইতে পারিত না! কথাটা অসম্ভব নয়, হইতেও পারে তবে লছিয়া ভাল হইয়া যদি মুখভার করিয়া অনুযোগ করিত, সুনরা বলিত, সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত তাহাকে খাটিতে হয়, তাহাকে কি নড়িবার জো আছে! যদি মনটা লছিয়ার ভাল দেখিত, কখনও কখনও একটু যোগও করিয়া দিত, "আর তোমার অসুখ হলে আমিই কি এমন ভাল থাকি লচ্ছি, যে, দুপা হেঁটে দেখে আসব?"

লছিয়া বলিত, "আচ্ছা, জ্বর-বোখার শুধু আমার জন্যে কালীমাই তোয়ের করেন নি, তখন দেখা যাবে।"

অনেকদিন এই ভাবেই গেল, তার পর একদিন এই ঘটনাটি ঘটিয়া বসিল।—

সেদিন ছিল দোল পূর্ণিমা। কলের ছুটি, ঘরও খালি—লোকগুলা রাস্তায় পিচকারির

উৎসবে মাতিয়া বেড়াইতেছে। শ্লীল-অশ্লীল নানাবিধ-গীতে হাসির উন্মাদ হররায় আর বেয়াড়া খঞ্জনি-বাঁধা ঢোল ও করতালির সৃষ্টিছাড়া আওয়াজে এই অল্প-পরিসর জায়গাটা গমগম করিয়া উঠিয়াছে। এত লোক যে এখানে ছিল, তাহা ভাবিয়া উঠা যায় না।

সুনরাও ময়লা কাপড়ের ওপর একটা নূতন পিরান চড়াইয়া, মাথায় একটা ধোপদস্ত ফুলদার হালকা টুপি পরিয়া, রঙ, আবীর ও কাদা মাখিয়া, মুখে কালি লেপিয়া, সঙ্গীদের পালাক্রমে গাধায় চড়াইয়া ও বার কতক নিজেও চড়িয়া সমস্ত সকালটা কাটাইল। একটা রসিক ছেলে সুনরা ও লছিয়াকে উদ্দেশ্য করিয়া বিচিত্র ছন্দে গান বাঁধিয়া আনিয়াছিল। সুনরা প্রথমটা বেজায় চটিল, দল ছাড়িবে বলিয়া ভয় দেখাইল, তাহার পর সরস গানটার মাদকতা যখন তাহার মনটা ভিজাইয়া দিল, সকলে পরামর্শ করিয়া লছিয়ার নামটা বাদ দিয়া ঘণ্টা দুয়েক পংক্তির গানটা লইয়া গলার গিরা ফুলাইয়া শহরময় খুব একচোট চিৎকার করিয়া ফিরিল।

আন্দাজ একটার সময় তাহারা বাড়ি ফিরিল।

এক আনা দামের ছোট গোল আর্শিটা ঝুড়ির 'পেটরা' হইতে বাহির করিয়া নিজের মুখটা দেখিতেই সুনরা হাসিয়া ফেলিল এবং তাহাতে দাঁতন-দিয়া-মাজা সাদা দাঁতগুলো বাহির হইয়া পড়ায় আরও যে একটা নূতনতর রূপ খুলিল, তাহাতে তাহার হাসির মাত্রাটা আরও বাড়িয়া গেল। মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া নিজের প্রতিচ্ছায়াটাকে বলিল, "লছিয়া দেখলে আজ আর তোমায় আস্ত রাখবে না।"

তাহার পর জামা-টুপি খুলিয়া বগলদাবা করিল এবং এক হাতে বলসিটা ঝুলাইয়া কলের দিকে চলিল।

দূর হইতে দেখিতে পাইল রঙ্-কাদা-মাখা গোটা চার-পাঁচ চ্যাংড়া ছেলের সহিত লছিয়া তুমুল বিবাদ জুড়িয়া দিয়াছে। তাহারাও গা না ধুইয়া ছাড়িবে না, লছিয়ারও জিদ কোনমতেই তাহাদের কলতলা নোংরা করিতে দিবে না। পাটের কোম্পানী যখন এই সই 'নিশাবাজ' গুণ্ডাদের পুষিতেছে, তখন তাহারা কলের ভিতরকার ভাল পুকুরটাতে গিয়া স্নান করুক না, কে মানা করে? 'ভালা আদমি'র মেয়েছেলেরা যেখানে খাবার জল লইতে আসে, সেখানে 'হারামজাদ্‌গি' করিতে আসার কি অধিকার তাহাদের?

সুনরা পা চালাইয়া আসিয়া পৌঁছিল. আওয়াজ ভারী করিয়া প্রশ্ন করিল, "কা ভইল্ রে?"

ছেলেগুলো সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "দেখ না সুন্দর ভাইয়া, বাতাহিয়ার বদমাশি।"

"বাতাহিয়ার বদমাশি! আর তোরা সব ভাল মানুষ, না? কলতলাটা সব উচ্ছন্ন দিতে এসেছিস! পালা, না হলে বসালুম কিল।" বলিয়া সুনরা কৃত্রিম রোষ দেখাইয়া দুই-একটা ছেলেকে ধরিতে গেল; দল ভাঙিয়া ছেলেগুলো দিগ্বিদিকে ছুট দিল। একটা ছেলে নিরাপদ ব্যবধানে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আর তুমি গা ধুলে বুঝি দোষ নেই? নিজের চেহারার দিকে একবার দেখ দেখি।"

"আরে, আবার তর্ক করে!" বলিয়া সুনরা আর একটা তাড়া দিল। আর কেহ

দাঁড়াইতে সাহস করিল না, অনেক দূরে গিয়া হাততালি দিয়া ছন্দোবন্ধে গাহিতে লাগিল -

"বাতাহাইয়াকে পিছে সুন্দর বাতাহা ভেলনু বা।—"

হাঙ্গামাটা থামিয়া গেলে কৃতজ্ঞতার বদলে লছিয়া সুনুরার মুখের পানে চাহিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "অনুমনু বন্দরকে মাফিক দেখাব তাড়।" অর্থাৎ ঠিক বাঁদরের মতো মানাইয়াছে।

সুনরা বিকট হাসি হাসিয়া ফেলিল। তাহার পর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "দেখ্‌ লছিয়া আজ আমার মনটা অন্য ধরণের, বেশী ঘাঁটাস নি। হোলির দিন, তোর গালগুলোও এত মিষ্টি লাগছে যে, না জানি কি হতে কি হয়ে যায় শেষে!"

লছিয়ার মেজাজ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া গেল। চোখ পাকাইয়া সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "খবরদার, কার সঙ্গে কথা কইছিস মনে থাকে যেন। তোদের সব কাণ্ডকারখানা দেখে আর ছেলেগুলোর ব্যবহারে আমার নিজের মনেরই ঠিক নেই, এর ওপর যদি মাতলামি করিস আমার সামনে—"

সুনরা দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, "মাতলামি! শিউলি যদি তালের রস খাইয়ে বলে – মাতলামি করিসনে, তবেই তো গেছি। আজ সকাল থেকে আমি তোর নেশায় ভরপুর হয়ে আছি লছিয়া—ধর্ম জানেন, আর কোনো নেশা করিনি—তোর ভাবনার রস খেয়েছি, তোর গানের রস খেয়েছি তাই বলছি, তোর কথার রস খাইয়ে আমায় আর বেসামাল করিস নে।'

লছিয়া রাগে চিৎকার করিয়া উঠিল, বলিল, "বড় বাড় বেড়েছিস সুনরা, চুপ কর্‌ বলছি, যদি এখনও মুখ না সামলাস তো তোর উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াব, আমি এক্ষুনি লোক জড় করে তোর যে দশা আজ পর্যন্ত হয়নি, তাই করাব।"



সুনরা শান্তভাবে বলিল, "দেখ্‌ লছিয়া, আমাদের দুজনের মধ্যে যে ঝগড়া, তাতে কি লোক ডাকা উচিত? আপোস করে নেওয়াই—"

লছিয়া রাগে অন্ধপ্রায় হইয়া গিয়াছিল; কিছু না পাইয়া উন্মাদের মতো গালাগালি করিতে করিতে কলের মাথার উপর হইতে সুনরার পিরাণটা টানিয়া ফ্যাস-ফ্যাস করিয়া ছিঁড়িয়া দিল এবং তাহাতেও তৃপ্তি না হওয়ায় নিজের কলসিটা কলের শানের উপর আছাড় দিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়িমুখো হইল।

সুনরা ছেলেটাকে আজ ভুতে পাইয়াছিল। নিজের ছেঁড়া জামাটা একবার চোখের সামনে মেলিয়া দেখিল, ভাঙা কলসিটার দিকে চাহিল, তাহার পর ছুটিয়া গিয়া রোরুদ্যমানা লছিয়ার হাতটা ধরিয়া নিতান্ত বেদন-মিনতি স্বরে বলিল, "লছিয়া, ঢের তো হয়েছে, মাফ কর ; ফিরে চল্, তোর কলসিটা কিনে দিই।"

কথাটা অবশ্য সমস্ত শোনানো গেল না, কারণ হাত ধরিতেই লছিয়া গলা চিরিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল এবং ঝাঁকি দিয়া ছাড়াইয়া লইয়া সজোরে সুনরার গালে বিরাশি-সিক্কার একটা চড় বসাইয়া দিল, লাথি ছুঁড়িল এবং রাগের আধিক্যে আর 'পাদমপি' চলিবার সামর্থ না থাকায় রাস্তার মাঝে বসিয়া চুল ছিঁড়িয়া, জামা ফাঁড়িয়া এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধাইয়া দিল।

সুনরা হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এমন সময় কানের কাছে গুরুগম্ভীর আওয়াজ হইল, "ই সব কৌ—ন্ বাত বা ?" এবং সুনরা নিজে ফিরিয়া দেখিবার পূর্বেই বক্তা দৃঢ় মুষ্টিতে তাহাকে ফিরাইয়া পুনরপি প্রশ্ন করিল, "সুন্দর, ই সব কৌন বাত বা ? ভালা আদমি কহলাবতাড় না ?" অর্থাৎ ভদ্রলোক বলে তোমাকে সবাই জানে তো ? তবে এ কি কাণ্ডকারখানা ?

সুনরা দেখিল, কলতলায় খানিকটা ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে এবং সেটা তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে ; তাহার প্রশ্নকারী স্বয়ং হনুমান মাহতো—তাহাদের 'মানজন', অর্থাৎ মোড়ল।

লছিয়া তেমনই জোর গলায় চিৎকার করিতেছিল "সাজা দাও ওকে, ও ভদ্দরলোকের মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছে ; কলসি ভেঙে দিয়েছে ; দেশ থেকে তাড়াও হারামজাদাকে। আমি আর এদেশে থাকতে চাই না। এখানকার 'মানজনে'র মুখে ছাই দিয়ে, সমাজের মুখে ছাই দিয়ে ; আর ও হারামজাদার মুখে নুড়ো জেবলে, আজই এদেশে ঝাড়ু মেরে চলে যাব আমি। আর সেই হতভাগা বুড়ো মড়াটারও একটা ব্যবস্থা করব, যে নিজের নাতনীর ইজ্জত রাখতে পারে না।"

কথাগুলায় বৃদ্ধ হনুমান মাহতো স্থির গাম্ভীর্য হইতে হঠাৎ সপ্তমে চড়িয়া উঠিল ; সুনরাকে একটা জবরদস্ত ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "ঠিক কথাই তো ; দাঁড়া এখানে তুই, উপযুক্ত সাজা তোকে দেওয়া হবে।" ছেলেমেয়েগুলা বেজায় ঠাট্টা গালাগালি লাগাইয়া দিয়াছিল, তাহাদের বলিল, "একে ঘিরে দাঁড়া যেন পালায় না।"

সুনরা পলাইবার কোনো লক্ষণ না দেখাইয়া গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। হনুমান রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে লছিয়াকে লইয়া স্নেহভরে তাহাকে একবার বুকে চাপিল, গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া দিল এবং তাহার কাপড়-জামাগুলা গুছাইয়া দিয়া মুন্নার বাসার দিকে চলিল ; পিছন ফিরিয়া সুনরাকে বলিল, "চল, এগো, আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে, আর অসহ্য হয়ে পড়েছে।"

দোল-পূর্ণিমার রাত্রি।

মানজন হনুমান মাহতোর বাসার সামনে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছটার তলায় পঞ্চায়েৎ

বসিয়াছে। মাঝখানে একটা তাড়ির কলসি, গোটাকতক কাঁচের গেলাস, চারিদিকে সমাজের বিজ্ঞেরা বসিয়া। সুনরার বিচার হইবে, সে বিধিমত এক পাশে করজোড়ে দাঁড়াইয়া।

বেজায় গোলমাল হইতেছিল। নেশা চড়াইয়া হাত দুইটা তুলিয়া হনুমান মাহতো সকলকে চুপ করাইল, তাহার পর একটু একটু জড়িত কণ্ঠে বলিল, "সুন্দর, অব ভাই সবকে সামনে বোল; কাহে তু লাচ্ছি মাইকে দেহমে হাত চড়হয়লে রহ।" - অর্থাৎ সমাজ ভাইদের সামনে বল তুমি লচ্ছি মায়ের গায়ে কেন হাত দিয়েছিলে।

সুনরা তেমনই চুপ করিয়া রহিল, না রাম, না গঙ্গা—কিছুই বলিল না।

হনুমান তাগাদা দিল, "কহ, কহ, হোঅ হোঅ!"

তখন স্থির পরিষ্কার কণ্ঠে সুনরা বলিল, "উঁহমণিকে মেহরারু বা।"—অর্থাৎ আমার স্ত্রী ও।

কথাটাতে সভায় হৈ-হৈ পড়িয়া গেল এবং 'মার হারামজাদাকো,' 'পিটো বদমাইশ কো', গোছের কয়েকটা অশুভসূচক ভাঙা ভাঙা কথা বেশী বেশী শোনা যাইতে লাগিল।

কয়েকটা ছেলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া শক্ত জমিটার উপর নিজের নিজের লাঠি ঠুকিয়া তাহাদের উৎকট অভিমত জ্ঞাপন করিল। বিজ্ঞেরা বোধ হয় কথাটা তেমন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, তাই এক এক চুমুকে বুদ্ধিটা চাঙ্গা করিয়া লইল। মুন্নার নেশাটা একটু বেতরহ হইয়া পড়িয়াছিল। টলিতে টলিতে দাঁড়াইয়া বলিল, 'হারামজাদা, তোর জিবটা উপড়ে নোব এখনই।'

একজন তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া দিল। হনুমান সুনরাকে বলিল, "নেশা করে তোর আজ মতিগতি ঠিক নেই, আমি টের পাচ্ছি। বুঝে-সুঝে কথা বলবার চেষ্টা করিস ভাইদের সামনে।"



সুনরা মাথাটা সিধা করিয়া বলিল, "সুনরা তাড়ি খেয়েছে একথা কেউ বলতে পারে না। গলায় আমার বৈষ্ণবের কণ্ঠি সেটা দেখেও ওকথাটা বলায় ধর্মকে গাল দেওয়া হয়েছে। আমি ঠিকই আছি আর লাছিয়া যে আমার স্ত্রী –এ কথাও খাঁটি।"

মুন্না আবার ঠেলিয়া উঠিতেছিল পাশের একজন লোক হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বসাইয়া দিল এবং এক গেলাস ভর্তি করিয়া বলিল, "ধর, মাথা ঠাণ্ডা কর, এটা ঘাবড়াবার সময় নয়।"

সুনরা বলিল, "আমি সমস্ত কথা বলে যাচ্ছি, মুন্নাকাকা মিলিয়ে দেখুন ঠিক কি না,

আর লছিয়াও তো সামনে আছে, কিছু কিছু তারও মনে থাকতে পারে।"

লছিয়ার নামে মুন্নার সিক্ত মনে স্নেহটা বোধ করি উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "লচ্ছি, আমার কাছে এসে বস্ তুই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ননীর পা দুটো তোর ভেঙে যাচ্ছে, সে আর আমি প্রাণ ধরে দেখতে পারছি না।"

নাক সিঁটকাইয়া লছিয়া বলিল, "বেশ আছি—আর আদর দেখাতে হবে না; তাড়ির গন্ধের মধ্যে গিয়ে বসতে পারি না। যত সব মাতাল বসেছে, বিচার হবে উনুনের পাশ!"

মুন্না প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া ফেলিল এবং অন্য মাতব্বরেরা যোগ দিল। একজন হাসির মধ্যে হঠাৎ থামিয়া বলিল, "লচ্ছি মাই আজ বড় চটে আছে, ছেলেটাকে জবরদস্ত সাজা দিতে হবে।"

সুনরার প্রতি হুকুম হইল, "বল্ তোর কি বলবার আছে?"

সুনরা বলিতে লাগিল, "আমার প্রকৃত নাম মোতীলাল, সুন্দর নয়, বাড়ি আমার বালিয়া জেলার গজরাজপুর গ্রামে। বাপের নাম ছিল সন্তোখী—"

মুহূর্তের মধ্যে মুন্নার ভাবটা বদলাইয়া গেল, নামটা শুনিয়াই সে উঠিয়াছিল, আস্তে আস্তে সুনরার সামনে গিয়া একেবারে মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দুই মিনিট ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "লছি, আয় দেখি, দেখ্ দেখি, তুই কি কিছু চিনতে পারিস? আমার যেন মনে হচ্ছে—"

লছিয়াও মাথার কাপড়টা তুলিয়া দিয়াছিল, গালের উপর ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া মাথাটা পিছনে ঘুরাইয়া, গলাটা নামাইয়া বলিল, "হাম কি জানি?"

মুন্না ফিরিয়া আসিয়া আর আধ গেলাস শেষ করিল, তাহার পর সুনরাকে বলিল, "আচ্ছা, বলে যা, দেখি আর সব মেলে কিনা!"

সুনরা কৌতূহল-স্তব্ধ সভার ঔৎসুক্য বাড়াইয়া বলিতে লাগিল, "আমাদের গ্রাম থেকে দশ ক্রোশ দূরে মঝৌলিতে আমার বিবাহ হয়। সে প্রায় দশ বৎসরের কথা। নেহাত ছেলেমানুষ ছিলাম বলে সব কথা মনে পড়ে না। মনে পড়ে শুধু, শ্বশুরবাড়ির সামনে প্রকাণ্ড বটতলাটার নীচে আমার পাল্কিটা নেমেছিল। রাস্তায় ভয়ানক বৃষ্টি হয়েছিল বলে কি একটা ছুতো করে বাবা শ্বশুরের সঙ্গে খুব একচোট ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছিলেন এবং শ্বশুরের পক্ষ থেকে মারামারির ভয় দেখিয়ে আমার জবরদস্তি বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। সেই তুমুল বর্ষা আর ভীষণ ঝগড়া ও গোলমালে রাতের সব কথা মনে থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু মুন্নাকাকা বোধ হয় এই সব পরিচয় থেকেই টের পাবেন যে, আমি মিথ্যা কথা বলছি না। সে সময়ে মুন্নাকাকার চেহারাট বেশ মনে পড়ে, কেননা উনিই আমায় পাল্কি থেকে চ্যাংদোলা করে গাজুরি বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। ও'র চেহারা তখন ছিল পালোয়ানের মতো—গালে গালপাট্টা দাড়ি ছিল, হাতে লোহার একটা বালা ছিল; আমার বেশ মনে পড়ে, প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে আমি চিৎকার করতে করতে ও'রই বুকে মুখ গুঁজেছিলাম। আজ আমায় ভগবান ভুলেছেন, সুতরাং সবাই ভুলবে; তবে আমি যে বুকে একদিন আশ্রয়

পেয়েছিলাম, তার আশা কখনও ছাড়ব না।"
সুনরা আসিল। একটু চুপ করিয়া আবার আরম্ভ করিতে যাইতেছিল। মুন্না আর থাকিতে পারিল না, হাত দুইটি বাড়াইয়া সুনরার পানে ছুটিল, বলিল, "আবার তোকে বুকে নিই, আর মোতিয়া, সেসব পুরনো কথা তুলে আমায় পাগল করিস না।"
হনুমান মাহতো তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, কহিল, "মাথা ঠাণ্ডা কর দোস্ত। আরে কে ও তা কে জানে? সে সব কথা অন্য লোকে জেনে নিতে পারে না?" সভার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হো ভাই সব, "ঠিক বোলতানি কি না।"
সকলেই সমস্বরে বলিল, "ঠিক বাত, বহুত ঠিক, বহুত ঠিক।"
একজন প্রাচীন এ পর্যন্ত রায় দিল, "আজকালকার জমানা, কত লোক কত মতলবে ঘুরছে, কে জানে? লচ্ছি-মাইয়ের লছমীর মতো চেহারা দেখলে অনেক ছেলেই এসব কথা প্রাণ দিয়ে খুঁজে বার করতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করি, যদি বিয়েই করেছিল তো এতদিন কোন্ জাহান্নামে নিজের সমর্থ পরিবার ছেড়ে ছিলিরে হতভাগা?"



সুনরা বলিল, "সে কথাও বলছি। বিয়ের প্রায় চার বছর পরে, আমার বয়স তখন তেরো কি চোদ্দ হবে, চা-বাগানের এক সেপাই আমাদের গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। এসে গ্রামের যে জোয়ান ছেলেগুলো ছিল, সেগুলোকে খুব ভজাতে আরম্ভ করলে। গ্রামের এক প্রান্তে সে বাসা নিয়েছিল। দলে দলে আমরা সেখানে জুটতাম, তার পয়সায় খাওয়া দাওয়া, নেশাভাঙ করতাম, আর চা বাগানের গল্প শুনতাম। শিকারের দল যখন বেশ জমে এসেছে, সেপাইটা একদিন সকলের সামনে একটা প্রকাণ্ড খাতা খুলে ধরলে আর বললে, নাও একে একে সই কর; দু বছরের শর্ত, তবে আমি যখন মাঝখানে আছি, যার যখন খুশি ছেড়ে চলে আসতে পার, সাহেবকে আমি মুঠোর মধ্যে রেখেছি, উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে। আর বেশী দেরি করা চলে না, কাল ভোরের গাড়িতেই রওনা হতে হবে। কাল সাহেবের তার এসেছে, আমার জন্যে কাজকর্ম সব বন্ধ। অনেক কথাই বললে, অনেক লোভই দেখালে, সব এখন মনে পড়ে না। সেদিন আমাদের নেশার মাত্রাটা বেশী হয়েছিল, প্রায় সবাই সই করলে; যারা করলে না, তারা যাতে গ্রামটাকে সতর্ক করে না দিতে পারে, সেজন্যে বেশী আগ্রহ করে তাদের নেশাটা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হল। সকালের গাড়িতে আমরা কজন রওনা হলাম।

চা-বাগানে এসে দেখলাম, চার বৎসরের জন্যে সকলের পায়ে শিকল আঁটা।"

"আমি খালি সাবুত দিতে বসেছি ; সেখানে চারটে বছর কি দুঃখে কি যন্ত্রণায় কেটেছিল, তা আর বলে কি হবে ? মোট কথা, মহাবীরজীর কৃপায় ছটা বছর জেল-খাটার মতো কাটিয়ে দিলাম। অনেক ফন্দি করে আবার শর্ত লেখা থেকে বাঁচলাম এবং ভাঙা-শরীর, ভাঙা মন নিয়ে গ্রামে ফিরে এলাম।"

"খবর নিলাম, বাবা মারা গিয়েছে, মা মারা গিয়েছে, ভাই সংসার চালাচ্ছে; ঘরে যেতে আর মন সরল না। সন্ধ্যার সময় বাড়ির সামনে দিয়ে শ্বশুর বাড়ির রাস্তা ধরলাম ; কেউ চিনতে পারলেন না। পিপরতলায় বড়মঠাকুরকে প্রণাম করে বললাম, যতদিন না রোজগার করে ফিরে আসছি, অভাগা সংসারটাকে দেখো ঠাকুর।"

সুনরার গলা ধরিয়া আসিতেছিল, একটু থামিল। মুন্না ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতেছিল! ভাঙা গলায় বলিল, "মোতি, আউর সাবুত দেবেক না পড়িবে, আ তু হামারা ছাতিমে। লছ্‌মি—"

লছিয়া অশ্বত্থগাছের আড়ালে কখন আশ্রয় লইয়াছে, কোনো উত্তর দিল না। সুনরা বলিতে লাগিল—

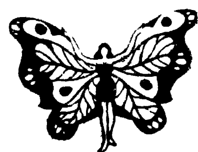
"শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দেখলুম সেখানেও সব ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। অনেক খোঁজ করে পাওয়া গেল, লছিয়াকে নিয়ে মুন্নাকাকা বাংলা মুল্লুকে এসেছে, কোন কলে কাজ করে। বাড়িতে আর টান নেই, আসে না কখনও।"

"তারপর এই দু-বছর কত করে ঘুরেছি, কত সন্ধান করেছি, কাকে বলি ? শেষকালে আজ বছর খানেকে বেশী হতে চলল, এখানে এসেছি। খোঁজ করি, কোনো ফলই হয় না। শেষে একদিন কলতলায় লছিয়াকে দেখলাম। কোন্ সেই ছেলেবেলায় একবার দেখেছি, ঠিক যে চিনতে পারলাম তা বলতে পারি না, তবে মনে একটা খটকা লেগে রইল। সন্ধান লাগাতে থাকলাম। অনেক খবর ইয়ার দোস্তদের কাছে পাওয়া গেল। অনেক খবর জল নিতে গিয়ে কলতলায় লছিয়ার কাছে পাওয়া গেল, ওটা ভারী বেহায়া হয়ে পড়েছে, হাউহাউ করে সব কথাই বলত। মোটের ওপর, আমার আর কোনও সন্দেহ রইল না যে, মহাবীরজী মুখ তুলে চেয়েছেন।"

হনুমান মাহতো বলিল, "সেসব নয় মানলাম, কিন্তু এতদিন জেনে শুনে তোর জরুকে নিস নি কেন ? সে জন্যে তোর পঞ্চভাইয়েরা তো কোন মতেই মাফ্ করতে পারে না।"

সুনরা বলিল, "সে পঞ্চভাইদের মর্জি ; তবে তারও যে একটা কারণ না আছে, এমন নয়। দেখলাম, আমি তো একেবারে বিলল্লা, ঘরবাড়ি নেই, হাতে একটা কানা কড়ি নেই, সবদিন বোধ হয় ঠিক ভাতও জোটে না, এর মধ্যেও বেচারীকে এনে আর কষ্ট দিই কেন ? রোজ দেখা শোনা তো হচ্ছেই। ও দাদার কাছে সুখে আছে, থাক্ ; বরং ওর জন্যে যে খরচটা হত সেটা জমিয়ে জমিয়ে একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাক। এক একদিন অবশ্য মনে হত, সব কথা খুলে বলি, কিন্তু ভয় হত যদি কেউ বিশ্বাস না করে, তা হলে যেটুকু আশা মনের মধ্যে আছে, তাও ভেঙে যাবে ; নিজের মেহরারুকে বোধ হয় জন্মের মতো হারাতে হবে। আর একটা কথা যা মনে হত, তা পঞ্চভাইদের সামনে না

বললে মনে পাপ থেকে যাবে, সেটা এই—ভাবতাম, লছিয়াকে সরিয়ে নিলে মুন্নাকাকা অন্য কোনো আত্মীয়কে জোটাবে, কি পোপুত নেবে। তা হলে—মুন্নাকাকার সব টাকা, যার ওপর লছিয়ার সুখ এতটা নির্ভর করছে—"
মুন্না আর কথাটা শেষ করিতে দিল না। তাড়াতাড়ি টলিতে টলিতে সুনরার হাতটা ধরিয়া টানিয়া আনিয়া নিজের কাছে বসাইল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "আরে তুই চিরকেলে দুষ্টু, আমি খুব জানি।" তাহার পর হনুমানকে বলিল, "দোস্ত, খানিকটা সিঁদুর আনতে বল, মোতিয়া নতুন করে লছিয়ার কপালে লাগিয়ে দিক। ছেলেটা সব কথাই বলেছে ঠিক, আর মিছে বললেও, আমার লছ্ছির একটা বিলি করতে হবে তো? আমি আর ক'দিন? কি হো ভাই সব?"



সকলে বলিল, "হুঁ হুঁ, ঠিক বাত।"
হনুমান মাহতো কিন্তু একটু বাঁকিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "কিন্তু তা হলেও যে নিজের স্ত্রীকে জেনেশুনেও এতদিন নেয়নি, আর দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রী হলেও রাস্তায় যে তার গায়ে হাত দিয়েছে; তার জন্যে ভায়েরা ওকে ক্ষমা করতে পারে না। ওর সাজা—ওকে একদিন শহরের সব ভায়েদের ভাত-তাড়ি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

ভালোবাসা



"কশ্চিৎ প্রৌঢ়" বরেষু,

গত শ্রাবণ (১৩৪৬) 'শনিবারের চিঠি'তে আপনার 'ভালোবাসা' শীর্ষক সরস রচনাটি পড়িলাম। আপনার শেষ কথাগুলি এই—"পুরুষ এবং স্ত্রী—জাতির ভালবাসা প্রকাশের ধারার বিভিন্নতা কি ?—এই ধরণের অনেক কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন আছে। আপনাদেরও নিশ্চয় বলবার অনেক কথা মনে হচ্ছে এবং বলবার ইচ্ছা করছেন, সুতরাং এইবার আপনারা বলুন. আমি চুপ করি।"

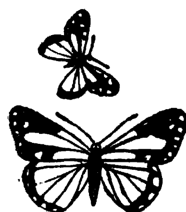
বলিবার অনেক কিছুই আছে সবারই, কেন না, ও জিনিসটির হাত হইতে কেহ তো আর রেহাই পাইল না। আর 'বাঘে ছুঁলেই আঠারো ঘা'—সারা জন্মে দাগ মেলায় না। তাহা হইলে যাহা জানি বলি, আপনি চুপ করিয়া শুনুন।

পুরুষের ভালোবাসা সম্বন্ধে আপনার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাই রহিয়াছে, শ্রীমতীর বেতো পায়ে ওরিয়েন্টাল বাম মালিশ করিতে করিতেই সেটা বেশ অনুভব করেন। বরং আরও একটু আগাইয়া ধরিলে বলা যাইতে পারে, বাড়িতে নববধূরূপে সালঙ্কচরণে তাঁহার প্রথম প্রবেশ করার সময় হইতে আপনার শুভ তত্ত্বাবধানে সেই পা-ই বাতগ্রস্ত হওয়া পর্যন্ত এই দীর্ঘ অবসরে ভালবাসার সব অবস্থারই আপনার অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। তাহার পূর্বেরও যদি কোন অভিজ্ঞতা থাকে আপনার, অর্থাৎ পূর্বরাগের, তো সে সম্বন্ধে আপনি নীরব, সুতরাং আমার কৌতূহলও অনধিকারী। ধরিয়া লওয়া যাক—আছে, তাহা হইলে পুরুষের ভালবাসার অভিব্যক্তির প্রায় সব রূপগুলিই আপনার প্রশ্নের অর্ধেক হিস্যে বাদ দিলাম। বাকি থাকে মেয়েদের ভালবাসার অভিব্যক্তি। পুরুষ বর্বর, তাহার সমস্তটাই স্পষ্ট, তাহাকে অনায়াসেই চেনা যায়; নারী ঠিক

বিপরীত ইহার, তাহাকে চেনা কঠিন, ঠিক যেমন কঠিন পাহাড়ে উঠার চেয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করা। তবুও তাঁদের ভালবাসা সম্বন্ধে যতটা জানি অথবা জানি বলিয়া বিশ্বাস, তাহার কিছু বলি।
মোহাড়াতেই বলিয়া রাখি, আমার সঞ্চয় সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা থেকে। তবে বিশ্বাস, করুন, আমার নিজের অভিজ্ঞতা নয়, তাহা না হইলেও আমি নিজের নামেই চালাইব। প্রথমতঃ ফাকতালে নিজেকে নায়ক করিয়া চালাইবার মধ্যে একটা নিখরচার আনন্দ আছে, আর দ্বিতীয়তঃ, যাহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমায় বড় বিশ্বাস করিয়া তাহাদের গূঢ়তম গোপন কথাটি বলিয়াছিল, তাহাদের নাম জাহির করা অধর্ম হইবে। এখন, মূল নামই গুপ্ত রাখিলাম তো, নিজেকে বাদ দিয়া রামা-শ্যামাকে নায়ক করিয়া বসাই কেন? এত বলা সত্ত্বেও যদি মনে করেন এসব আমার আত্মগোপনের চেষ্টা মাত্র তো কি আর করা যায়?
কিন্তু মুশকিল, কোথা হইতে আরম্ভ করা যায়? বেশ, একেবারে গোড়া থেকেই আরম্ভ করি কুন্তলার কথা থেকে।
কুন্তলার বয়স তখন বছর সাতেক……
বয়সের কথা শুনিয়া আপনি বিস্ময়ে হাত পা গুটাইয়া বসিলেন যে! সাত বছরের মেয়ে ভালবাসার কিছু জানে না? খুব জানে। অত কথা কেন, স্থির হইয়া একটু অংক কষিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন—জানে। আমরা পুরুষেরা সংসারে প্রবেশ করি বাইশ তেইশ বৎসরে, ভালবাসার হাতে খড়ি হয় চৌদ্দ-পনেরোয়; ওরা সংসারে প্রবেশ করে চৌদ্দ-পনেরোয়, মানেন তো? তাহা হইলে ভালবাসিতে শুরু করে করিবে আঙুল গুনিয়া দেখুন না!
কুন্তলা যখন সাত বছরের, তখন থেকেই আমার সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করে। অবশ্য শত্রু ভাবে আচরণ করিলে ভালবাসার পাত্রকে আরও শীঘ্র পাওয়া যায় রামায়ণের এ তত্ত্বটা কুন্তলার জানা ছিল কিনা জানি না; মেয়ে জাত, অবচেতনার স্তরে জানাও সম্ভব। মোট কথা, কুন্তলা আমার জীবন অসহ্য করিয়া তুলিয়াছিল, এবং আমি মেয়েটাকে বাঘের মত ভয় করিতাম। উদয়াস্ত তাহার কাজ ছিল আমার খুঁত ধরা এবং সেইগুলি যথাস্থানে পেশ করিয়া আমায় যথসাধ্য বিপন্ন করা। ও বয়সে ত্রুটি-বিচ্যুতির অভাব হয় না; কেননা, যাহাদের হাতে ঐ সময় আমাদের জীবন, জীবনের মাপকাঠি সম্বন্ধে তাহাদের সঙ্গে অনেক মতভেদ থাকে। তবুও যদি কুন্তীর ভয়ে কোনদিন অতিরিক্ত সাবধানে থাকিয়া নিখুঁত থাকিয়া যাইতাম তো, কুন্তী নিজেই খুঁত গঠন করিয়া লইত। —আমার বইয়ের পাতা ছিঁড়িত, জুতার ফিতা হারাইত, গোটা পেনসিলটা না ভাঙিলে অন্ততঃ তাহার সীস ভাঙিত, বৈঠকখানায় তাস, কাকার এস্রাজের তার পাওয়া যাইত আমার জামার পকেটে। নির্দোষ বেচারী আমি জানিতাম, কিন্তু কিছু বলিবার উপায় ছিল না। মেয়েটার আর একটা বিশেষত্ব ছিল, আমায় যে পরিমাণ জ্বালাইতে পারিত, বাবা কাকা ওঁদের সবাইকে ঠিক সেই পরিমাণেই ভুলাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল—মাথার পাকা চুল তুলিয়া, কানে শুড় শুড়ি দিয়া, ফাইফরমাস খাটিয়া; আরও তাহার

নিজস্ব নানা পদ্ধতিতে। পলিটিক্স মেয়েদের মজ্জাগত, শুধু মজ্জাগতই নয়, জন্ম-সিদ্ধ। একবার আমার বালিশের তলায় সেজ মামার হারানো ছুরি পাওয়া গেলে আসল অপরাধিণীর নাম করিয়া যে লাঞ্ছনাটা ভোগ হইয়াছিল কোন জন্মে ভুলিব না। এখনও যেন সব স্পষ্ট,—বাবার কোলের কাছে অভিমানে অশ্রুমতী কুন্তী, তাহাকে যেন কোনমতেই ঠাণ্ডা করা যায় না, বাবার হাতে আমার ছুরিটা, চারদিক ঘিরিয়া ছেলে-বড়র এক পাল, সদ্যলব্ধ চপেটাঘাতে আমার বাঁ রগটা তখনও ঝিন-ঝিন করিতেছে। বাবা বলিতেছেন, "লজ্জা করে না তোমার রাস্কেল, নিজে দোষ ক'রে পরের একটা নিরীহ মেয়ের ঘাড়ে দোষটা চাপাচ্ছ! কাওয়ার্ড! বেচারী তোমাদের বাড়ি আসে বলে ?···না মা, চুপ কর তুমি, ওর আজ খাওয়া বন্ধ।"

সেই একবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ঐটুকু মেয়ে, এমনভাবে তদ্বির করিল মামলাটা যে, সেই থেকে আর ওদিক দিয়া যাই নাই।



যাক্, ভালবাসার কথা তুলিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িলাম; কিন্তু আসলে অনেক দূরে আসিয়া পড়ি নাই; ভালবাসা সমান্তরালেই চলিতেছে। সেটা একদিন টের পাওয়া গেল।—

তখন কুন্তলার বয়স বছর আন্টেক হইয়াছে। অর্থাৎ আমার ঘাড়ের উপর দিয়া আরও এক বছরের পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে। বাঘও যেন এখন গা সওয়া হইয়া গিয়াছে, কুন্তীকে যে এখন কিসের মত ভয় করি নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।—তাড়কা রাক্ষসী? চীনের ড্রাগন? ঐ রকম একটা কিছু হইবে, কেন না, দৃষ্ট জগতে কোন তুলনা পাওয়া যাইতেছে না।

তাড়কার সঙ্গে অন্য দিক দিয়াও একটা সাদৃশ্য ছিল কুন্তলার। সে মায়া জানিত; ওদিককার কথা বলিয়াছি; সে আমার মধ্যেও মোহ আনিত।

বেশ মনে আছে সেদিনের কথা, আমি বাইরের ঘরে বসিয়া অঙ্ক কষিতেছি, কুন্তলা আসিয়া একবার এটা নাড়িয়া, একবার ওটা নাড়িয়া পাশে আসিয়া বসিল। আমি ভয়কণ্টকিত হইয়া একবার আড়চোখে দেখিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিলাম।

কুন্তলা ডাকিল, "শৈল!"

ফিরিয়া চাহিতে কাপড়ের মধ্যে থেকে একটা পান বাহির করিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "খাবি?"

মারাত্মক ছিল তাহার হাসিটা। অমন নিরীহ হাসি দেখা যায় না ; যেন সে মেয়েই নয়। অংক কষিতে কষিতেই বলিলাম, "হ্যাঁ, খাই, আর তুই গিয়ে বাবাকে বলে দে—পান খেয়ে মুখ রাঙা করেছি।"
ফিরিয়া চাহিলাম। কুন্তলা হাসি হাসি মুখটা অভিমানে তোলো-পানা করিয়া লইয়াছে। বলিল, "বেশ, না খাবি খাস নি, বদনাম দিস কেন ? চুরি ক'রে এনেছিলাম তোর জন্যে, তাই বললাম।"
"দে, কিন্তু—" বলিয়া পানটা লইয়া মুখে পুরিয়া দিলাম।
বেশ যখন মজিয়া আসিয়াছে, অপটুতার দরুণ মুখের দুই কোণ আর ঠোঁট দিয়া রস গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে, কুন্তী হঠাৎ উঠিবার ভান করিয়া বলিল, "চললাম বলতে।"
বিবর্ণ মুখে উঠিতে যাইব, ঘাড় বাঁকাইয়া হাসিয়া বসিয়া পড়িল, বলিল, "না রে না, খা তুই। আমি কি এতই বেইমান ?"
অনেক রকম আগড়ম-বাগড়ম কথা আরম্ভ করিয়া দিল। বেশ যখন ভয় ভাঙ্গা হইয়া কতকটা অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িয়াছি, কুন্তলা যেন নিছক কৌতূহলচ্ছলেই প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা শৈল, পৃথিবীর মধ্যে তুই সকলের চেয়ে কাকে ভয় করিস—স-ক-লের চেয়ে ?"
দুরবগাহ নারীর মন কে অত বোঝে ?
বলিলাম, "সেকেণ্ড মাস্টারকে কুন্তী, শুধু আমি কেন, সব ছেলে ভয় করে – যমের মতন। না হ'লে দেখ্ না, দশটা বেজে গেছে, এখনও ব'সে ব'সে তাঁর অংক কষছি। পনেরোটা অংক হোমটাস্ক দিয়েছেন ঠেলে, একটিও বাদ পড়ুক দিকিন !"
"তোর হয়েছে সব ?"
"না হয়ে উপায় আছে ? এইটে শেষ, এই পাঁচখানি পাতা বোঝাই অংক" অংকটা শেষ করিয়া ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিলাম, "বা-বাঃ, আর মাত্র পনরো মিনিট ! আজ আবার পয়লা ঘণ্টাতেই সেকেণ্ড মাস্টার !"
কুন্তলা বলিল, "তুই খেয়ে নিগে তাড়াতাড়ি শৈল ; আমি ততক্ষণ গুছিয়ে-গাছিয়ে সব রেখে দিচ্ছি। কোন্‌গুলো সব বল দিকিন ?"
চটিতে পা ঢুকাইতে ঢুকাইতে আঙুল দিয়া ছড়ানো বই, খাতা, পেন্সিল সব দেখাইয়া দিয়া বাড়িতে চলিয়া গেলাম।

এর পরে একেবারে স্কুলের দৃশ্যটা উদ্ঘাটন করা যাক। মনের স্ফূর্তিতে ফার্স্ট বেঞ্চে বসিয়া আছি। সেকেণ্ড মাস্টার আজ পিছনের বেঞ্চ হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। যেন একটি সাইক্লোন-ঝড় বহিয়া আসিতেছে, কোন ছেলে বেঞ্চের নীচে লুটাপুটি খাইতেছে, কেহ হাই-বেঞ্চে মাথা গুঁজিয়া পিঠ রগড়াইতেছে, কেহ আর নয় স্যার, ম'রে গেলাম বলিয়া আর্তনাদ করিতেছে ; কেহ বেঞ্চ থেকে খানিকটা দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে, সীটে ফিরিয়া আসিতে সাহস নাই। এক রকমারি কাণ্ড।
সেকেণ্ড মাস্টার আমার সামনে আসিয়া বলিলেন, "আপনি—?"

"হয়েছে স্যার সবগুলোই!"—বলিয়া তাড়াতাড়ি খাতা খুলিতেই চক্ষু স্থির! আজকের অংক যাহাতে কষা ছিল, সেই পাঁচখানি পাতা একেবারে বেমালুম সাবাড়!

সেকেণ্ড মাস্টারের ভীষণতার উপরে একটা সরসতার আবরণ থাকিত, সে আবার আরও ভীষণ; সেকেণ্ড মাস্টার একটু রহস্যপ্রিয় ছিলেন, সবাই এটাকে শিবু-মাস্টারের 'খেলিয়ে মারা' বলিতাম।

ঠিক যেন অংকগুলার উপর দিয়া ধীরে ধীরে চোখ বুলাইয়া যাইতেছেন, এইভাবে তিনখানি সাদা পাতা এক এক করিয়া উল্টাইয়া দেখিয়া গিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ, সবগুলোই ঠিক হয়েছে, বাঃ, বেশ ছোকরা শৈলেন, তুই নিজেই সবগুলো করেছিস?"

আমার তখন ধড়ে প্রাণ নাই। শুষ্ককণ্ঠে বলিলাম, "সব করেছিলাম স্যার, কিন্তু—"

"নেই বুঝি খাতায়? আমি ভেবেছিলাম, নিশ্চয় সূক্ষ্মরূপে আছে কোথাও; অংকও কষবে না, আবার মিছে কথাও বলবে এ কখনও হতে পারে? শৈলেন কি আমাদের সেই রকম ছেলে যে—"

তাহার পরেই মার। সে যে কি মার, বলিয়া বোঝান যায় না, ডেস্কের নীচে থেকে বেঞ্চের নীচে গেলাম, তাহার পর ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম, বেত্রবর্ষণ অপ্রতিহত ধারায় চলিয়াছে, বুক, পিঠ, হাঁটু, কব্জি, আঙ্গুল কোন জায়গা বাদ নাই—বেতটা গেছে ফাটিয়া তাহার ঝুরিগুলা যেখানে পড়িতেছে, যেন গাঁথিয়া বসিয়া যাইতেছে।

অনেক ছেলেবেলায় কি করিয়া মাথার ডানদিকে এক জায়গায় কাটিয়া গিয়া একটা দাগ ছিল, শেষে বেতটা তাহার উপর পড়িয়া পাতলা চামড়াটা ফাটাইয়া দিতেই ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিয়া বাহির হইলে সেকেণ্ড মাস্টারের রাগ পড়িল। অবশ্য না পড়িলেও তখন আমার পক্ষে বিশেষ ইতরবিশেষ ছিল না, তখন আমার অনুভব করিবার চৈতন্য একেবারে নিম্ন-পর্দায়।

আমায় বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

ভালবাসার প্রসঙ্গটা ভুলি নাই, সেই কথাতেই আসিতেছি।

তাহার পরদিন বিছানায় শুইয়া আছি। জ্বর, সমস্ত গায়ে বেদনা, মাথায় একটা পটি বাঁধা। পাশে বসিয়া আছে কুন্তী, গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে, কিছু দরকার হইলে যোগাইয়া দিতেছে। দারুণ অভিমানে সেবা গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু আবার অভিমানের বশেই গ্রহণ করিতেছি,—ও দেখুক, নিতান্ত অকারণেই ও কি দশা করিয়াছে আমার।

হঠাৎ একবার কি ভাবিয়া কুন্তী মাথাটা আমার মুখের কাছে লইয়া আসিল, একটু স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "পাতাগুলো কেন ছিঁড়ে রেখেছিলাম, বলব শৈল?"

প্রশ্ন করিলাম, "কেন আবার?—বদমাইসি। তোর কি করেছিলাম আমি যে—!" গলার স্বর আমার ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কুন্তী আমার কাঁধে হাত দিয়া মুখ আরও নামাইয়া বলিল, "বদমাইসি না শৈল, তোকে বড্ড ভালবাসি। মাইরি বলছি, যত তোকে লোকে বকে, মারে ; তোর যত কষ্ট হয়, তত তোকে এত ভাল লাগে শৈল, কি বলব! তোর মুখটা যদি সর্বদা বেশ শুকনো শুকনো থাকে, তোকে চমৎকার লাগে। এই তোর কাছে ব'সে আছি, বেশ লাগছে। মাইরি বলছি, মাইরি, না পেত্যয় যাস, দেখিস, সমস্ত দিন উঠবই না তোর কাছ থেকে। তোকে খুব ভালবাসি যে এখন, বে—শ, চমৎকার লাগছে! যত তোকে বেশি মারে লোকে, তত তোকে ভাল লাগে, মাইরি বলছি শৈল! মনে হয়, —আহা, শৈল বেচারীকে মারলে অমন করে! তোকে ভালবাসি ব'লেই তো মনে হয় শৈল, বিশ্বাস করলি নি ?…"

আপনি বিশ্বাস করিলেন ?

কিন্তু বিশ্বাস করিলেন, কি না - করিলেন, তাহাতে কিছু যায় আসে না। ভালবাসার মূল কথা অধিকার-স্পৃহা। আমাদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে ওটা আরও প্রবল, তা নিশ্চয় স্বীকার করিবেন, কেন না, একেবারে মেষে পরিণত করিয়া ফেলিবার চক্রান্তটা ওদেরই ; কিন্তু ইহার সঙ্গে আবার একটা করুণার ভাবও মিশ্রিত থাকে—একটা "আহা বেচারী"- এই রকম ভাব। তাহার কারণ আমরা শুধু ভাবি (ভুল করিয়া ভাবি), মেয়েরা অবলা, সরলা ; ওরা জানে (পাকা রকম জানে) আমরা দুর্বল, বোকা, অসহায়। সেই জন্য বোধ হয় নারী যতটা ভালবাসিতে পারে, পুরুষ ততটা পারে না। আমরা শুধু খাঁটি ভালবাসা বাসিয়াই সন্তুষ্ট থাকি, ওরা ভালবাসার সোনায় করুণার রং চড়াইয়া কণ্ঠে পরে। সখ হইলে রংটা ইচ্ছামত গাঢ় করিয়া লয়, যেমন করিয়া লইয়াছিল কুন্তলা। কুন্তলার ওটা ভালবাসাই ছিল, নারীর ভালবাসারই একটা অভিব্যক্তি। ও ছোট বলিয়া ওর কথাটা অবিশ্বাস করুন, কিন্তু বড়র ভালবাসায় এই জিনিসটিই বড় আকারে পাইতে পারেন, সতর্ক করিয়া দিতেছি। এ পর্যন্ত বলিতে পারি, করুণা উদ্রেকের অন্য উপায় না থাকিলে, অর্থাৎ শিবু-মাস্টারের অভাব ঘটিলে ওঁরা সে-ব্যবস্থাটা নিজের হাতেই তুলিয়া লন, মানবের ইতিহাসে এরূপ উদাহরণেরও অভাব নাই।

নারী প্রেমের সহস্রবিধ অভিব্যক্তির মধ্যে একটার দৃষ্টান্ত দিয়া আজ ক্ষান্ত হইলাম। বিশ্বাস করেন, আরও দেওয়া যাইবে।

পরিশেষে অমর কবি Shakespeare এর 'Twelfth Night' থেকে দুইটা লাইন উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করা গেল না :

viola : I pity hyou.

Olivia : That's a degree to love.

শব্দরূপ



"লতা—লতে—লতাঃ, লতা—লতে—লতাঃ—"

রাস্তার ওধারে ঐ ওদের বাড়ির ছেলেটি জোর গলায় শব্দরূপ মুখস্থ করিতেছে। সেকেণ্ড কিংবা ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ে এই শুনিয়াছি।

রাত এগারটা ; আহারাদি সারিয়া পান চিবানোর সঙ্গে ধূম্র-সেবন চলিতেছে, পাশে শুভ্র পরিচ্ছন্ন বিছানাটি, ইচ্ছা হইলেই গিয়া শুইব, সে ইচ্ছার মধ্যে বাইরের অন্য কাহারও অধিকার-উপদ্রব নাই, সেটা মাত্র আমার স্বরাট মনের খেয়াল-খুশি।

—এ—ই তো জীবন! মুক্ত, আত্মসম্পূর্ণ—

ছেলেটির উপর মনটা করুণায় ভরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেই যুগের চিত্র সব যেন চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল।—

সকাল বেলায় ওঠা।—অবশ্য এখনও উঠি, কিন্তু তাহা চাই বলিয়াই উঠি, সকালটা মিষ্ট লাগে বলিয়াই উঠি।

তখন মিষ্ট লাগিত বিছানা, আর তাহার বিচ্ছেদটি সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত সময়টাকে তিক্ত করিয়া রাখিত। কিন্তু সে কথা কে বোঝে? জীবনের ও-অংশটার বর্তমান নাই, শুধু ভবিষ্যৎ আছে ; আর সেই ভবিষ্যৎ সৃষ্টির জন্য মায়ের চোখ পর্যন্ত সতর্ক, নিষ্করুণ ; অন্যে পরে কা কথা?

মায়ের প্রথম সম্ভাষণ, "না, এ ছেলের যদি কিছু হয়। মাস্টার এসে গেল, এখনও তোর ঘুমের ঘোর কাটল না?—চোখ কচ্‌লাচ্ছিস? নাঃ—"

নেপথ্যে কাকার তাগাদা, "উঠল বৌদি, তোমার আদুরে গোপাল? খুব আস্কারা

দাও, ভবিষ্যৎটি চিবিয়ে খাও ছেলের—"

একটু পরে দাদা তাগাদায় আসিয়া উঠানে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। কোনো রকমে বাকস্ফূর্তি হইলে আঙুল গুনিয়া বলিলেন "প্রথম নম্বর তো শয্যাত্যাগই বাবুর একটা পর্ব, তারপর তোড়জোড় ক'রে মুখ ধোওয়ার ঘটা—যতটা সময় যায়; তারপর হ্যান, ত্যান, সাত সতেরো—"

গণনাটা অনির্দিষ্ট 'হ্যান ত্যান'র জোরে আগের কোঠা পর্যন্ত ঠেলিয়া তুলিয়া বলিলেন, "এখন আবার ঐ এক কাঁড়ি কোলের কাছে নিয়ে বসেছে তো? খাও, কিন্তু ও ঘুঘনি খাওয়া হচ্ছে না শৈলেন, নিজের ভবিষ্যৎ খাওয়া হচ্ছে, শর্মা এই বলে রাখলে।"

ঘুঘনি গলা দিয়া আর গেল না, তাড়াতাড়ি হাতমুখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া গিয়াছি। জীবন-মাস্টার মহাশয় এই দিকেই চাহিয়া বসিয়া আছেন, দেখিয়াই এক প্রকার ভেংচানো আপ্যায়নের সঙ্গে হাত দুইটা একটু বাড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, 'আ-সুন, আসুন, আস্ত্যাজ্ঞে হোক। দেড়টি ঘণ্টা বসে আছি বাপু পড়াশুনা তোমার কর্ম নয়, কেন এলে? যাও বাবা, মা, ভাই, কাকা জ্যেঠার আদর খাওগে। কালকের অংকটা হয়েছিল?"

সৌভাগ্যক্রমে কঠিন অধ্যবসায়ের জোরে অংকটা হইয়াছিল! জীবন-মাস্টার মহাশয়কে খুশি করিতে পারিব বলিয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিলাম "হ্যাঁ, ক'রে তবে ছেড়েছিলাম মাস্টারমশাই, রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত —"

"রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত! অসাধ্য সাধন করেছ যে! নেপোলিয়ান না হয়ে ছাড়ছ না দেখছি!" (অতঃপর বিকৃত মুখে)—"বলি, সারা বছরটা সাতটা না হতেই বিছানায় ঢুকে একটা দিন যদি একটু রাত ক'রেই শুয়ে থাক তো বড় গলা ক'রে আবার সেটা জানাচ্ছ কি?" লজ্জা করে না?"

অধ্যবসায়েরও পুরস্কার এই, একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল। জীবন-মাস্টারের পড়ানোর এই নমুনা,— তামাক খাইতেন, সে যুগের ঢাউস্ 'বসুমতী' পড়িতেন, বাকি সময়টা ভাল মন্দ নির্বিশেষে বাক্য যন্ত্রণা দিতেন। শ্লেষবাক্যে অমন সাধা রসনা এপর্যন্ত আর কাহারও দেখি নাই।

বাড়ির গণ্ডি পার হইলে স্কুলে ছিলেন সেকেণ্ড মাস্টার। যে বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁহার খ্যাতি তাহা এই যে তিনি ফাস্ট ক্লাস পর্যন্ত অকুণ্ঠভাবে ঠেঙাইতেন। প্রোপাইটার, হেডমাস্টার উভয়েই তাঁহার ছাত্র, এই পদ্ধতিতে গড়া; তাঁহারা মৃদু আপত্তি করিলে বলিতেন, "কেন, এরাই বা কি দোষ করেছে?"

না, জীবনটা যে নিতান্ত এই রকম একঘেঁয়েই ছিল এটা বলাও ভুল হইবে। বৈদ্যবাটি স্কুলের টীম ম্যাচ খেলিতে আসিল। ভলাণ্টিয়ারের ব্যাজ বুকে লটকাইয়া সে কী স্ফূর্তি সমস্তটা দিন! স্টেশন থেকে তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া আনা; আতিথ্যের তদারক, ঘোরাফেরা, মোড়লি করা; বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নাই, স্কুলের সম্পর্কও একেবারে অন্যবিধ। হেডমাস্টার বলিতেছেন, "দেখো শৈলেন, সারাটা স্কুলের মান-মর্যাদা আজ তোমার ওপর নির্ভর করবে—সেবায়, সম্বর্ধনায়, ডিসিপ্লিন্ রক্ষায় কোন

রকমে যেন অপযশ না হয়, দেখো !"

হউক একদিনের জন্য, কিন্তু সেই একদিন ধরিয়াই জীবনের কি প্রসার ! কি বেপরোয়া ভাব !—সেই দিনই সিগারেটে হাতে খড়ি !

পরের দিন ফার্স্ট পিরিয়ডেই সেকেণ্ড মাস্টার ক্লাসে ঢুকিয়া বোর্ডে দাগড়া দাগড়া অক্ষরে লিখিলেন, "রাইট অ্যান এসে অন্ ফুটবল ম্যাচ। দশখানি পাতা ভরে লিখবে। সব কাল নিশ্চয় মন দিয়ে খুঁটিনাটি লক্ষ্য করেছ সবাই—টীমের গাড়ি থেকে নামা ইস্তক শেষ পর্যন্ত। শুনছো তো শৈলেন ? হুঁ, তুমি আবার বেশি মুড়ুলি করছিলে দেখলাম, একটি পাতা কম হলে মুড়ুলি ঘুচুব তোমার।"

যাহারা শখ করিয়া মধুর বাল্যে, মধুর কৈশোরে ফিরিয়া যাইতে চান, তাঁহাদের মানা করি না, তবে আমি তাঁহাদের দলে নাই।

শব্দরূপের গগণভেদী শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে, "তৃতীয়া—লতয়া, লতাভ্যাম, লতাভিঃ।"

আমাকে মুখস্থ করিতে হইতেছে না, তবু, কি জানি কেন শুধু শোনার জন্যই যেন পরিশ্রান্ত হইয়া আসিতেছি। কানে য-ফলা আর অনুস্বার যেন হাতুড়ি পিটিতেছে। যে মুখস্থ করিতেছে সে বেশ উৎসাহের সহিতই মুখস্থ করিতেছে—কাল পণ্ডিত মহাশয়ের প্রসন্ন মুখ দেখিবে নিশ্চয় এই উচ্চাশায়। আমার কিন্তু এদিকে অমন মধুর অম্বুরির ধোঁয়া তিক্ত হইয়া আসিতেছে। সামনের জ্যোৎস্নাদীপ্ত আকাশের নীলাভা মলিন হইয়া আসিতেছে। কেমন করিয়া মনে পড়িয়া যাইতেছে, সেই ছেলেবেলার একদিনের কথা রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত অংক কষার ইতিহাস—তার পরিণাম—তার পুরস্কার।



অথচ বুঝি, এটা আমার উচিত নয়, এমন কি অধর্ম, কেননা আমি একজন প্রফেসার। পাড়ার ঘরে ঘরেই যদি কিশোর কণ্ঠে শব্দ সাধনার রোল উঠে তো প্রফেসারি কর্ণে সেটা সংগীত ঝংকার হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু—

আমার ছোট ভগ্নী আসিয়া উপস্থিত হইল। না, এগারটা উহার শয্যা আশ্রয়ের সময় নয়। অনেক কাজ ওর, সবচেয়ে বড় কাজ বাড়ির গেজেট গিরি। ভোর ছয়টা হইতে রাত বারোটা পর্যন্ত তাহার গতিবিধির গণ্ডীর মধ্যে যাহা ঘটে, অক্লান্ত উৎসাহে সে সমস্তর সংবাদ চারিদিকে চারাইয়া দেওয়া সুধীর নিত্যকর্ম। আমি উহাকে নিরুৎসাহ করি না, কেননা কোন ঘটনা কিংবা কোন আলোচনা ও নিখুঁতভাবে বর্ণনা করিবার ক্ষমতা অর্জন করিতেছে যে সংকল্প করিয়া আছি উহাকে একটি সাহিত্যিক করিয়া গড়িয়া তুলিব। শুধু অনুরূপ বর্ণনা বা আবৃত্তিই নয়, ওর স্বকীয় মন্তব্য বলিয়াও

একটা জিনিস আছে, আর সেটা যেমন মর্মস্পর্শী তেমনই নির্ভীক।

বসিয়া আমার আরাম কেদারার হাতলে চিবুক রাখিয়া সুধী বলিল, "মেজদা, তোমার লজ্জায় আর মুখ দেখানো উচিত নয়।"

হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন রে?"

সুধী বিরক্তির ভান করিয়া বলিল, "কেন রে, কি? পড়াশোনার ক্ষতি হবে ব'লে বিয়ে করলে না, কিন্তু কি জজ ম্যাজিস্ট্রেটটাই বা হলে? হ'লে তো শেষ পর্যন্ত সেই মাস্টার—গোবর্ধন মাস্টারও যা তুমিও তাই, তুমি না হয় টাই এঁটে টুপি পরে গরু তাড়াতে যাও।"

বুঝিলাম সুধীর নিজের কথা নয়, আবৃত্তি; নিচে মা প্রভৃতির মধ্যে আমার সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, সুধী সেইটেই রাত দুপুরে আমার শ্রুতিগোচর করিতে আসিয়াছে। বলিলাম, "বিয়ে করলে যে এটুকুও হত না, হদ্দ তোর না হয় আর একটা বৌদি -"

সুধী মাথা ঝাঁকাইয়া রাগতভাবে বলিল, "না, হত না। কারুর হয় না। বিয়ে করে সবাই বই-খাতার সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিয়ে পৈতে পুড়িয়ে ভগবানচন্দ্র হয়ে বসে থাকে। তুমি এই রাত দুপুরে আর বকিও না মেজদা। তোমার বরং ওদের বাড়ির ঐ ছেলেটির দেখে শেখা উচিত—ওর চন্নামৃত খাওয়া উচিত।"

অবশ্য 'চন্নামৃত' কথাটার অর্থ সুধী জানে না বলিয়াই বলিল, তবে কথাটা কাহারও মুখে উঠিয়াছে নিশ্চয়। যাহার চরণোদকের এতটা প্রভাব সেই দেব-বালকটি কে জানিবার জন্য সুধীকে প্রশ্ন করিলাম, "কোন ছেলের কথা বলছিস তুই?"

"কেন, ঐ যে পড়ছে, শুনতে পাচ্ছ না? মাসখানেক আগে পর্যন্ত ও-ছেলে যা ছিল, বাবাঃ ছোটলোকদের ছেলেদের সঙ্গে মিশে কেবল এপাড়া, ওপাড়া, সেপাড়া করে ডানপিটেগিরি ক'রে বেড়াত—বই-সেলেটের সঙ্গে দেখা নেই। বাপ-মায়ে স্কুলে টাকা গুণে যাচ্ছে, ছেলে সেই এক ভাব—সেই যে সেকেন কেলাসে এসে আটকেছেন, আর নড়নচড়ন নেই - তা বয়েস মানবে কেন গা? দিন দিন মাথায় লম্বা হচ্ছেন আর কাটগোঁয়ারের মত চেহারা হচ্ছে। একবার তো পালিয়ে গিয়ে পগুপাতিনাথই হয়ে এল - আবার এদিক ভক্তিটুকুন আছে কি না। এমন সময় একদিন গিন্নীর বোন এলেন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ছেলেটির মাসী"

"ছেলের মাসী।" অবাক্ হয়ে বললেন, "দেখছিস কি সরী, শীগ্গির ছেলের বিয়ে দে, ছেলে যে দামড়া মেরে যাচ্ছে, এর পরে আর কি সামলাবে? দে দিকিন বিয়ে, যদি ছেলের মতিগতি না ফেরে তো আমার নাম লক্ষ্মী-বামুনী নয়।" গিন্নী বললেন, "দাও একটু কিছু ক'রে দিদি, আমি তো পাড়ার নালিশে নালিশে উদ্ব্যস্ত হয়ে গেছি।" বললেই বলে "আমি রোখো ডাকাত হব; বড়দের লুটব, ছোটদের পুষব।" গিন্নীর বোন উঠে পড়ে লাগলেন, বিয়ে হয়ে গেল। দেশেই বৌভাত সেরে আজ এসেছে সব: আর সে ছেলেই নেই।······কর বিয়ে মেজদা, এখনও কাল ব'য়ে যায়নি।

ওদিকে ঐ কঠোর সাধনা চলিতেছে, ষষ্ঠীতে—লতায়াঃ-লতয়োঃ-লতাণাম, ষষ্ঠীতে

লতায়াঃ —

একেবারে অভাবনীয় পরিবর্তন! এত পরিশ্রম দেখিয়া গায়ে কাঁটা আসিলেও বিবাহের উপর একটা শ্রদ্ধা আসে বই কি।

সুধী বলিয়া চলিয়াছে,"আমরা আজ গিয়েছিলাম কিনা, এই তো আসছি সেখান থেকে। ······কি ফুটফুটে বৌটি, মেজদা! বেশ ডাগোর-ডোগোর, আর কথাবার্তায় কি সেয়ানা! আমার সঙ্গে তো খুব ভাব হয়ে গেল! ··আহা, যদি ঐ রকম একটি "

আমি ধমক দিতে চুপ করিয়া গেল। তখনই পূর্ব উৎসাহে আরম্ভ করিয়া দিল "খু—ব ভাব হয়ে গেল আমার সঙ্গে। নামটিও বড় চমৎকার—"

একটু অন্যমনস্ক হইয়া কি একটা যেন ভাবিতেছিলাম, বোধহয় দেশের ভাবী রঘু ডাকাতের কথা,—তারা সব ঐ রকম বিবাহ করিয়া ভাল ছেলে হইয়া যদি এই ভাবে ব্যাকরণ সাধনায় মাতিয়া উঠতো—

সুধীর কথায় অলস প্রশ্নচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি নামটি?"

"বনলতা"।

আমি অন্যমনস্ক ছিলাম বলিয়া কথাটা আবছাগোছের আমার কানে গেল। সতর্ক হইয়া চিন্তিত ভাবে প্রশ্ন করিলাম, "কি নাম বললি?"

"বনলতা গো।' ছেলেটা যাই হোক বড় ম্যাদামারা কিন্তু বাপু; সেই থেকে এক কথা নিয়ে বকেই চলেছে।···তা হবেই বা না কেন বল? এদিকে তো পড়াশোনার পাটই তুলে দিয়েছিল কিনা! গিন্নী বলেন, "কি ঝোঁকই পড়ার হয়েছে, দিদি।"

—"বৌমা যাবেন, তখন গিয়ে বাধ্য হয়ে বই বন্ধ করবে; বৌমার আবার কড়া আলো চোখে সয় না!"

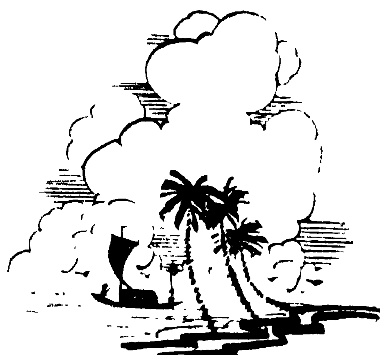
এই কঠোর সাধনার গোড়ার রহস্য জানিতে পারিয়া আমার এতক্ষণের দুঃখ দুশ্চিন্তা আলোড়ন করিয়া বোধ হয় একটা সকৌতুক হাসি ঠেলিয়া উঠিয়া থাকিবে। সেটা বিবাহের গুণগানের এবং সদ্য দৃষ্টান্তের প্রত্যক্ষ সুফল জানিয়া সুধী আগ্রহভরে প্রশ্ন করিল, "বলব তাহলে মাকে মেজদা, যে তুমি রাজী হয়েছ?"

আমি আকাশের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৌটির এত দেরি হচ্ছে কেন বল্‌তো আগে?"

সুধী বলিল, "আমরা যখন এলাম তখন তো মোটে খেতে বসল সব। সবে এসেছে আজ···সবাই অগোছ ছিল কিনা!···বলব গিয়ে মাকে?—হ্যাঁ মেজদা?"

ওদিকে তখন ক্লান্ত স্বরের মূর্ছিত ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে, সম্বোধনে···হে লতে; সম্বোধনে - হে লতে - হে লতে ' হে লতে।

অব্যবহিতা



১লা আষাঢ় ১৩৩৭

আমার জীবনের আকাশে যে দুর্যোগ উঠিয়াছিল, তাহা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। শুধু এইটুকুই নহে, খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত মেঘের আড়ালে আজকাল একটা চন্দ্রকলা মাঝে মাঝে দেখা যায়। অপেক্ষায় আছি, কবে সেটুকু মেঘও বিলুপ্ত হইবে এবং সমস্ত আকাশটা উহারই জ্যোৎস্নায় আলোকিত হইয়া উঠিবে।

বাস্তবক্ষেত্রে এই চাঁদের কণাটুকু সরু রাস্তাটার ওপারে ওই পঞ্চম বাড়িটার জানালার ফাঁকে, কিংবা ছাদের আলিসার আড়ালে, কখনও আধখানা, কখনও বা আরও কম, আবার কখনও আলোর আভাসটুকু মাত্রেই দেখা যায়। ঠিক যে তৃপ্তি পাই তাহা বলিতে পারি না, অথচ এই ক্ষণিক দর্শনগুলি যে কেবল অতৃপ্তিরই সৃষ্টি করিয়া আমায় বিভ্রান্ত করিতেছে, তাহা বলিলেও মিথ্যাই বলা হইবে। ওই বাড়ির ওই কিশোরী সমস্ত দিন নিজের খেয়ালে বা সংসারের প্রয়োজনে সমস্ত বাড়িটাতে সাধারণ ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় আর, পাঁচটা বাড়ির ব্যবধানে আমি সেই একটি চকিত দর্শনের জন্য থাকি প্রতীক্ষায়। নূতন চাকরি, তবুও ইহারই জন্য কয়েকদিন দেরি হইয়া গিয়াছে। এত কষ্টের পর পাওয়া চাকরি, সাবধান হইতেই হইবে; কিন্তু আপাতত সবচেয়ে বড় কথা -- আমার এই পাঁচ-পাঁচটা বাড়ির ব্যবধান যে আর সহ্য হয় না।

কখনও, যখন ও থাকে ছাদের এক প্রান্তে, আর নিম্ন হইতে ডাক পড়ে, "সদু!" তখন উত্তরে একটা বাঁশীর মত মিঠে আওয়াজ "আসি, যাই, কেন?"—এই রকম স্বল্পাক্ষরা

সঙ্গীত এ বাড়ির হাওয়াতেও একটা ঝংকার তোলে বটে, কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষার অনুপাতে সে আর কতটুকু ?

দুইটি অক্ষরের কাব্য ; কিন্তু শুনিয়া শুনিয়া তো আর মন উঠে না। সদু ! সদু ! নিশ্চয় সৌদামিনী—নিশ্চয়ই। হায় তাই বলিয়া কি সৌদামিনীর মতই এত বিরল বিকাশ হইতে হয় ?

সে যাই হউক, কিন্তু এ নিষ্ঠুর ব্যবধান যে আর সহ্য হয় না।

১০ই আষাঢ়

স্বর্গের দুয়ারে বাসা বাঁধিয়াছি। দেবতার অনুগ্রহে মধ্যেকার চারিটা বাড়ির চারি যোজনার ব্যবধান এক কথায় মিটিয়া গিয়াছে। এখন সদুদের বাড়িটায়,—মাঝখানে মাত্র সংকীর্ণ গলিটি।

যে দেবতার এই অযাচিত অসীম অনুগ্রহ, তিনি সকালে সামান্য এক মানুষের বেশে আসিয়া বলিলেন, "মশাই, বলতে বড় কিন্তু হচ্ছি, কথা হচ্ছে, ছোট বাড়িটাতে অনেক গুলি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি দয়া ক'রে যদি অদল-বদল করেন, ছোট বাড়ি ব'লে আপনার একলার কোন অসুবিধেই হবে না। দুটোই একই লোকের বাড়ি। বাড়িওয়ালার সাথে দেখা করেছিলাম, তিনি বলেন, আপনি রাজি হ'লে তাঁর আপত্তি নেই।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, কত দূরে আপনার বাড়িটা ? কি জানেন—এ গলি ছেড়ে যাওয়া আমার সুবিধে হবে না।"

ছলনাকারী দেবতা বলিলেন, "দূরে কিছুই নয়; মাঝখানে এই চারটে বাড়ি পেরিয়েই পরের বাড়িটা। আপনার জিনিসপত্র সমস্তই আমি লোক দিয়ে পেঁৗছে দোব। খাসা ছোট্ট-খাট্ট ফিটফাট বাড়িটি !"

তা দেখিতেছি, সত্যই চমৎকার বাড়িটি, যেন, একটি ফোটা ফুলের মত। সে আর হইবে না ? আমার স্বর্গের জ্যোতিষ্কের কল্যাণ-রশ্মি যে সারাক্ষণ তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে।

মেয়েটির রুটিন আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। এক নম্বরের কুড়ে—ভয়ানক দেরি করিয়া ওঠে। তাহাতে আমি প্রতিবেশী মাত্র, আমারই বিরক্ত ধরে, বাড়ির লোকের তো ধরিবেই। ছোট একটি ভাই আছে, সে তো নামই দিয়াছে 'কুম্ভকর্ণ দিদি'। সকালে গলির পাশের ঘরটিতেই বসিয়া থাকি, বসিয়া বাসয়া বিভিন্ন কণ্ঠের অনুরাগ শুনি, "না বাবু, এ মেয়েকে পারা গেল না ; কি অলক্ষুণে ঘুম !···হ্যাঁলা, ওঠ না, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তোর কি দুর্গতি হবে ?···ঠাকুরঝি, ওঠ, শ্বশুরবাড়ির জন্যে তোয়ের হাওয়া চাই তো ?" যেদিন খুব দেরি হইয়া যায়, সেদিন একটি বড় স্নেহসিক্ত স্বরও শুনিতে পাই, "সদু, ওঠ তো দিদি। তোমরা মেয়েটাকে রাত-দুপুর পর্যন্ত খাটিয়ে

খাটিয়ে মেরে ফেললে, ক'দিনই বা আর আছে তোমাদের এখানে বাপ, ?"

এটি ঠাকুরদাদার কণ্ঠস্বর, সর্বদাই পৌত্রীর আসন্ন বিদায়ের বেদনায় গাঢ়। এরকম নাতনী গত-প্রাণ মানুষ দেখা যায় না।

এত কাণ্ডকারখানার পর তো বাবু উঠিলেন। তাহার পর সংসারের কাজকর্মে একটু দেখা যায়। কিন্তু এই সময়ে মিনিটে মিনিটে যেমন 'সদু! ও সদি!' বলিয়া হাঁকাহাঁকি হইতে থাকে, তাহাতে আমার মনে হয়, মেয়েটি ফাঁকি দেওয়ার নব নব পন্থা আবিষ্কার করিতেই বেশী মনোযোগী। এক-একদিন আবার ঝাঁজিয়া উত্তর দিতেও ছাড়ে না, "খালি 'সদি, সদি, সদি,' মলেও সদি নিস্তার পাবে না দেখছি!"

গলাটা খুব-বই মিষ্টি বলিতে হইবে; কেন না, এমন রূঢ় কথাগুলাও এর চমৎকার শোনায়।

ইহার পর কোলের ভাইপোটিকে বাঁকা কাঁকলে লইয়া ছাতের উপর উঠিয়া পাশের বাড়িতে কে সই আছে, আলিসার আড়াল হইতে তাহার সহিত গল্প জুড়িয়া দেওয়া হয়। এই সময় আমি চেয়ারটা জানালার একেবারে কাছে টানিয়া আনি, কারণ কথা-বার্তা যা চলে তা একটা শুনিবার জিনিস। অনভিজ্ঞ লোকের ঠিক এই রকম ধারণা দাঁড়াইয়া যাইতে পারে যে, বক্তী একটি সংসারভারনিজিতা প্রকাণ্ড গিন্নী।—"মার দুদিন থেকে শরীরটা কেমন খারাপ যাচ্ছে···দাদা আর বউদির নিত্য ঝগড়ার জ্বালায় আর তো পারা যায় না ভাই···ছোট ভাইটি কোন মতেই বাগ মানছে না, সমস্ত দিন তার টিকিই দেখা যায় না,···বাবার সদু ভিন্ন এক দণ্ড চলে না।·· ঠাকুর দা? উনি নাতনীর হাতের তামাক যে কি চিনেছেন, আর ব'লো না! আমার ভাই, যদি একটু মরবার ফুরসত থাকে···"

এদিকে কয়দিন হইতে মুশকিলে পড়িয়াছি। খুব তো সংগোপনে ছিলাম, কিন্তু একটু অসাবধানের জন্য সেদিনে চোখোচোখি হইয়া গেল। আর কিছু দুঃখ নাই, কারণ সেই একটি মুহূর্তে যাহা পাইয়াছি, তাহা জীবনের অতুল সম্পদ হইয়াই থাকিবে; তবে দুষ্টু সেই অবধি অত্যন্ত সাবধান হইয়া গিয়াছে। গলার সে বাঁশী থামিয়া গিয়াছে, সখীর সঙ্গে সে বিশ্রম্ভালাপ নাই। আর দেখা? কোথায় প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছিলাম, তাহার বদলে ত্রস্ত সন্দিগ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এক-আধটা অতি চপল বিক্ষেপ, তাহাতে কি আর আশ মিটে?

আবার এই নিষ্ঠুর সংকোচ ঘর-দুয়ারেও যেন সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে। স্পর্শকাতর লজ্জাবতীর পাতার মত জানালার দুইটী সবুজ পাল্লা খড়খড়ি সমেত প্রায় বুজিয়াই থাকে। ওই একজনের লজ্জা অমন মুখর বাড়িটাকে যেন মৌন নতমুখী করিয়া দিয়াছে। পাশের, আমার এ বাড়ি হইতে সর্বদা যেন একটা তপ্তশ্বাস ওঠে।

একদিন দুপুরবেলা আফিস হইতে পলাইয়া আসিয়া একটু সুফল পাইয়াছিলাম। বাহিরের ঘরে ঠাকুরদাদার তামাকের সরঞ্জাম করিতে করিতে মাঝে মাঝে সুমিষ্ট রসালাপ চলিতেছিল; চুরি করিয়া খুব শোনা গেল। এই মেয়ে-জাতটা যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

অতটুকু বেলায় আমাদের জিবের আড় ভাঙে না, আর ওই একফোঁটা মেয়ে, হন্দ তেরো হইতে চোদ্দ বছরের মধ্যে হইবে, সমানে ষাট বছরের বুড়োর সঙ্গে পাল্লা দিয়া গেল। যাহার হাতে পড়িবে, তাহাকে নাজেহাল করিয়া ছাড়িবে দেখিতেছি।

সে কথা যাক, এরকমভাবে আফিস-পালানো তো রোজ চলে না। অথচ মন যেক্ষেত্রে পলাতক, সে ক্ষেত্রে জড়পিণ্ড শরীরটাকে শুধু শুধু বসাইয়া রাখিয়াই বা ফল কি? এরকমভাবে সমস্তদিন একটু দেখার তৃষ্ণা, একটু কথার তৃষ্ণা লইয়া কতদিন চলিবে?

হে সুন্দরী, একেই তো এই গলির আর ওই দেওয়ালগুলার নির্মম ব্যবধানের বাহিরে ঘুরিয়া মরিতেছি, তাহার উপর আবার এই কঠোর মৌনতার পাষাণভার কেন?

৩০শে আষাঢ়

দারুণ নিরাশায় অবশেষে সাহস আনিয়া দিল। ওর ঠাকুরদার সহিত আলাপ জমাইয়া লইয়াছি।

গিয়া বলিলাম, "আমার একটি বন্ধু আসবে আজ দুপুরবেলা। সে সময় আমায় আফিসে থাকতে হবে। দয়া ক'রে যদি এই চাবিটা তাকে দিয়ে দেন—তাকে বলা আছে, আপনার কাছে আসবে। মানে হচ্ছে, নতুন চাকরি, অসময়ে আফিস ছেড়ে আসাটা – বুঝলেন কিনা –"

কথাটা আগাগোড়া বানানো। তা যে রকম অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অত সত্য-মিথ্যা বাছিতে গেলে তো মারা যাইতে হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সত্যপ্রিয় বলিয়া ইহলোকে যাঁহারা নাম কিনিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কাহাকেও এইরূপ একটি চতুরাকে ভালবাসিয়া নাকাল হইতে হয় নাই! সুবোধ এবং সত্যবাদী বলিয়া আমারও একসময় যশ ছিল; এখন দেখিতেছি, তাহা রাখিতে পারিলে হয়।

ঠাকুরদাদা নাকের ডগায় চশমা দিয়া কি পড়িতেছিলেন। নাকটা আরও নীচু এবং চোখটা উঁচু করিয়া আমায় নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই সামনের বাড়িটাতে থাক? তা, কই, দেখি না তো কখনও?"

বলিলাম, "থাকি বড় কম; প্রায় সমস্ত দিনটা আফিসে চাকরি সামলাতেই কেটে যায়, আজকালকার বাজার, জানেনই তো।"

"কি নাম তোমার বাপু? নতুন এসেছ নিশ্চয়? একলা থাক নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এই দিন পাঁচ-ছয় হ'ল এসেছি।" নামও বলিলাম।

"বেশ বেশ, ব'স। তাইতো বলি, আজ সদুকে যখন বললাম, ঘোষেরা সামনের বাড়ি থেকে উঠে গেছে, নতুন কারা এল বলতে পারিস। সে বললে, কই, কাউকেও তো দেখতে পাই না।"

মনে মনে হাসিলাম, ভাবিলাম, একটা শুভ লক্ষণ বটে, মিথ্যা কথাটা তাহা হইলে ও তরফেও দরকার হইয়া পড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "সদু কে? সেই যে ফরসাপানা

ছোট ছেলেটি স্কুলে যায় দেখি ?" মুখে একটুও বাধিল না ; সদুর প্রসঙ্গটা উঠিয়াছে, একটু চালাইতেই হইবে।

ঠাকুরদাদা হাসিয়া উঠিলেন। এত হাসিলেন যে আমার ভয় হইল, বুঝি চতুরালি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। বলিলেন, "না, সে সদু হতে যাবে কেন ? সে আমাদের ঝড়ু ; সদু হচ্ছে ওর বোন। অমন মেয়ে দেখেছ কিনা বলতে পারি না, আর বয়স বেশী কিছু নয়তো, গড়ন ওরকম—ওরই বে'র জন্যে দিন দেখতে তো এই পাঁজি নিয়ে বসেছি। এই দেখ না, শ্রাবণ মাসে দুটো দিন আছে। (পাঁজিটা আমার দিকে ঠেলিয়া দিলেন) না, তোমার বুঝি আবার আফিসের তাড়া ? নিজের বাঞ্ছিতার জন্য পাঁজি দেখা ইহার পূর্বে কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না জানি না। লজ্জাকে এতদূর পরাভব করা অসম্ভব হইয়া পড়িল, বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মোটেই বসবার উপায় নেই ; এখন তা হ'লে আসি ; দয়া করে চাবিটা—"

"সে তুমি নিশ্চিন্দ থেকো।"—বলিয়া বৃদ্ধ আমায় কবাট পর্যন্ত আগাইয়া দিলেন ; আবার বলিলেন, "মাঝে মাঝে এসো, এই তো একই বাড়ি।"

বলিলাম, "নিশ্চয় আসব ; আমার তো সঙ্গীর বড়ই অভাব।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তা যদি বললে, সঙ্গীর অভাব আবার সব অভাবের ওপরে, জানি কিনা ! আমার বুড়ো বয়সের সঙ্গী হয়েছে নাতনীটি। তা বলতে কি, এক দণ্ড যদি তাকে না দেখেছি, কি তার কথা না শুনেছি, তো সে আর কি বলব ! তোমরাও তো ঠিক সেই রকমই হয় ?"

বলিলাম, "হ্যাঁ, হয় বই কি।" উত্তর দিয়া কিন্তু বুঝিতে পারিলাম, বৃদ্ধের প্রশ্নটাও বেখাপ্পা হইয়াছে, আমার উত্তরটাও।

কথাটা কিন্তু সত্য, যেন প্রাণের কথা অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া আসিয়াছে। কয়টা দিন যে কি গিয়াছে, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নাই, আফিস যাইতে পা উঠে না, জানালাটির পাশে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছি, কখন ছাতে ভিজা নীলাম্বরী শাড়িটি মেলিয়া দিতে আসিবে ; ওই কৃপণ বন্ধ জানালার সংকীর্ণ ফাঁক দিয়া কখন একটু তরল আওয়াজ ভাসিয়া আসিবে, ঠাকুরদাদার ঘরে কখন কলহাস্যের ঢেউ উঠিবে, সেই আশায়। বৈষ্ণব ভিখারী নিত্যই আসে, তবে আফিসের সময় উতরাইয়া গেলে। তবুও কখনও কখনও বসিয়া থাকিতাম। দ্রুততালে মন্দিরা বাজাইয়া গান গাহিবে—

(প্যারীর) দরদ ভেল জীবন-নিধি
সঙ্গোপনে মরমে ধরে,
সখীরেও নাহি কহয়ে কিছু বাণী

(প্রেমের কথা প্রকাশ করে না, বুকের ব্যথা পুষে রাখে, প্রকাশ করে না)

প্রথমে দরজার কাছে আসিয়াই শুনিত, কিন্তু সেই চোখাচোখি হওয়া অবধি জানালাটি ঠেলিয়া দিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিত আমি দেখিতে পাইতাম না বটে, তবু অন্ধের মত প্রাণ দিয়া অনুভব করিতাম। গান শেষ হইয়া গেলে ভিখারী বাদ্যযন্ত্রে দুইটা

বড় ঘা দিয়া বলিত, "কই গো দিদিমণি, এক মুঠো দিয়ে দাও লক্ষ্মীমণি, আবার অন্য বাড়ি আছে।"
লক্ষ্মীমণি ক্ষণিকের জন্য বাহির হইত, দুইটি ভিখারীকে একসঙ্গে তৃপ্ত করিয়া আবার ত্বরিত চলিয়া যাইত।
ওর ঠাকুরদাদা ঘরে থাকলে, বৈষ্ণব বাবাজী জ্যোতিষ জ্ঞানভাণ্ডের মুখটা খুলিয়া কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাইতে হইত। সে-সব প্রশ্নও বাঁধা, তাহাদের উত্তরও প্রায় একই। ঠাকুরদাদা জিজ্ঞাসা করিতেন, "গোঁসাইজী, তারপর মেয়েটার বরের ভাগ্য কেমন দেখছেন ?"

গোঁসাইজী বলিত, "ওই যে বললাম দা'ঠাকুর, মা আমার শাপভ্রষ্ট দেবকন্যে ; ও আমার দেবকন্যে ; ও আর দেখতে আছে ?"
ঠাকুরদাদার মুখটা আনন্দের হাসিতে ভরিয়া উঠিত। বলিতেন, "না, না, সে ভাগ্যি কি আমরা করেছি ?" তারপর আবার গম্ভীর হইয়া পড়িতেন ; প্রশ্ন হইত, "আচ্ছা, বর জুটতে এত দেরি হচ্ছে কেন বলতে পারেন ? আমি ওখানটা বুঝতে পারি না।"
বাবাজী বলিত, "ঠিক ওইজন্যেই ; এক যে-সে এসে বিয়ে ক'রে নিয়ে গেলেই তো হ'ল না দাদাঠাকুর। তবে আমি দেখলাম খড়ি কেটে—বর রথে চড়েছে, আর দেরি নেই।"
ঠাকুরদাদার তখনকার মত সন্দেহটা মিটিয়া যাইত। বৈষ্ণব খানিকটা ফৌজদারী বালা-খানার তামাক কিংবা দুইটা পয়সা লইয়া 'জয় রাধেশ্যাম' বলিয়া বিদায় হইত।



এই রকম ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপারগুলি সমস্তই আমার অন্তরের বিরহ-ব্যথায় করুণ হইয়া উঠিত। এক-একদিন ভিখারী চলিয়া গেলেও চেয়ারের হাতলে মাথা রাখিয়া বসিয়া থাকিতাম। সকালে নাওয়া-খাওয়া যেমন নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইত, এ সময় আফিস যাওয়াটাও ঠিক তেমনই একটা বাজে কাজ বলিয়া মনে হইয়া মনটাকে সারা জীবনটা সম্বন্ধেই নিশ্চেষ্ট নিশ্চল করিয়া দিত। ঝকঝকে তকতকে মনোরম ঘরে বসিয়া থাকিতাম, সামনে কোমল শয্যা, আলনায় ভদ্রোচিত কাপড়-চোপড়, প্রয়োজনাতিরিক্ত দুই-একটা শৌখিন দ্রব্যও সাজানো থাকিত; আফিসে সাহেবের অপরিমিত প্রীতিদৃষ্টিও ছিল ; কিন্তু কিছুতেই স্বাদ ছিল না, এবং এ সবের তুলনায় দুইদিন আগে যে রাস্তায় রাস্তায় সেই নিরুদ্দেশ ভাবে ঘুরিয়া বেড়ানো, সেটাকে তেমন বিশেষ দুঃখকর বলিয়া বোধ হইত না। মনে হইত, আর যাহাই হউক, তাহার মধ্যে একটা বিশাল-স্বাধীনতা ছিল। তখন অমৃতের সন্ধানও পাই নাই, আর সে কারণে; এই দারুণ অভাবের

কঠোর যন্ত্রণাও ছিল না। এক কথায় ; আমার কাছে দুঃখের স্মৃতিতে আর দুঃখ ছিল না এবং প্রত্যক্ষ সুখের মধ্যেও সুখ ছিল না ; সদুর বিরহ-ব্যথা আমার অতীত কালের যন্ত্রণা, বর্তমানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভবিষ্যতের আশা-নিরাশা সমস্তকেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। যেন বন্যার জলে সব একাকার করিয়া দিয়াছে, ফুলের বাগানও ডুবিয়াছে, কাঁটার বনও ডুবিয়াছে, আছে খালি দিগন্তপ্রসারিত গাঢ় জলরাশি। তাই বলিতেছি, সে যে কি যন্ত্রণায় কয়টা দিন গিয়াছে, তা অন্তর্যামীই জানেন।

৭ই শ্রাবণ

ঠাকুরদাদাকে সেই তো ভাব করিয়া চাবি দিয়া আসিলাম ; বিকাল বেলা দেখা করিতেই বলিলেন, "কই ভায়া, তোমার বন্ধু তো এলেন না ? আমি সমস্তদিন এইখানে ঠায় ব'সে, জলখাবারটাবারও আনিয়া রাখলাম, কিন্তু কই ?"

অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলাম, একটা মিথ্যা কথা বলিয়া সমস্ত দিন বৃদ্ধকে এতটা কষ্ট দিলাম ! আসল কথা, এত অন্যমনস্ক ছিলাম যে, এ সম্ভাবনাটাই মনে উদয় হয় নাই। ইহার উপর উনি যে আবার আতিথ্যের আয়োজন করিয়া বসিবেন, তাহা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারি নাই ; তা হইলে না হয় মিথ্যা কথাটার উপর আর একটু জুড়িয়া দেওয়া যাইত যে, আগন্তুক বন্ধুর জন্য ঘরে সমস্ত আয়োজন সারিয়া রাখিয়াছি।

সমস্ত দোষ সদুর ; ও আমার মন লইয়া যে কি জাদু করিয়াছে, ওই জানে। ঠাকুরদাদা বলিলেন, "তা হ'লে তোমারই এনে দিক, একটু জল খেয়ে নাও।··· না, সে হয় না, তবু তোমার বন্ধু না খেয়ে তুমি খেলেও আমাদের একটা সান্ত্বনা থাকিবে। সদু, ও সদু ! বলি ও বড়গিন্নী।···এটি আমার পাতানো সম্বন্ধ।" শেষের কথাগুলি বৃদ্ধ বড়গিন্নীর টীকা স্বরূপ আমায় বলিয়া স্মিত হাস্য করিলেন।

ঝড়ু দুয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "কি ?"

বলি, "সে কোথায় ?"

ঝড়ু দুয়ারের পিছনে তাকাইল।

ঠাকুরদাদা বলিলেন, "হয়েছে ; নিজে আড়ালে বুঝি তোমায় চর পাঠিয়েছেন ? বল, সেই খাবার, জল, পান সব নিয়ে আসতে।

ঝড়ু আর একবার অন্তরালে তাকাইয়া বলিল, বলছে—"তুই আনগে।"

"কেন ? ও, হয়েছে।"—বলিয়া ঠাকুরদাদা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "তোমায় লজ্জা, বুঝেছ ভায়া ? আমার এতক্ষণ ঠাওরই হয় নি।"

বৃদ্ধ উঠিয়া গিয়া, সংকোচে জড়সড়, লজ্জায় রাঙা মুখ নাতনীকে ধরিয়া আনিয়া আমার হাত তিনেক দূরে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "পাশের বাড়ির লোক, ছেলেমানুষ ; ওকে আবার এত লজ্জা ? এইবার লজ্জা ভাল ভাঙল তো ? খাবার নিয়ে এস।···কই হে ভায়া, তুমিও যে দেখছি আবার মুখ নীচু করে রইলে ! সব সমান।"

এটা গেল প্রথম পরিচয়ের কাহিনী। এখন আর সদু আমার সামনে আসিতে জড়সড় হয় না, আমিও উহাকে কাছে পাইলে নিজের হাতের চিরপরিচিত দশটি আঙুল লইয়া গবেষণায় ব্যস্ত থাকি না। ছাতে নীলাম্বরীটার খাতির বাড়িয়া গিয়াছে। সদু একবার তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিংড়াইয়া খুব পরিপাটি করিয়া ভাঁজ খুলিয়া শুকাইতে দেয়; তাহার পর শুকাইল কিনা, সে তদারকও মাঝে মাঝে করিয়া যায়। আমার সহিত এ সময় প্রায়ই দেখা হয়; কখনও হাসিয়া চলিয়া যায়, কখনও ছোট ভাইয়ের কথা পাড়ে—"আজ ঝড়ু ঠিক সময়ে পড়তে গিয়েছিল শৈলেনদা ?" কিংবা "ওকে খুব শাসনে রাখবেন।"—অথবা ঐ রকম গোছের একটা কিছু—বলিবার মত কথার অভাবে যা আপনিই ঠোঁটের গোড়ায় আসিয়া পড়ে।

এদিকে সেই অকরুণ জানালা দুইটিও দরদী হইয়া উঠিয়াছে, দুই হাত ভরিয়া আমায় শব্দ-রূপের সম্ভার বিলায়। সকালে ঝড়ু যখন আমার কাছে পড়ে, সদু আসিয়া মাঝে মাঝে জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়ায়। কয়েকটি নিয়মিত প্রয়োজন থাকে;—প্রথমত ঝড়ুকে খাবার খাইবার জন্য ডাকা, তাহার কিছু পরে আবার চা লইয়া আসিবার জন্য ফরমাস করা, এবং সবশেষে কয়টা বাজিয়া গিয়াছে, স্নানের সময় হইয়াছে, এই সব খবর দেওয়া; যদিও তাহার বিশেষ কোন প্রয়োজন থাকে না, কারণ আমার কাছেও ঘড়ি থাকে, ও-বাড়ির ঘড়িটা ঢংঢং করিয়া যখন বাজে, তখন ঝড়ুর সতর্ক কানে সবচেয়ে আগে তাহার খবর পেঁছায়।

মাঝে মাঝে গিয়া ঠাকুরদাদার কাছে বসি। দেখি, হুঁকা হাতে করিয়া, নয় পাঁজিটা খুলিয়া, না হয় সদুর ঠিকুজিটা মেলিয়া গভীর মানানিবেশের সহিত ঝুঁকিয়া চাহিয়া আছেন। বলেন, ভাবনার কথা নয়, শৈলেন ভায়া? ঠিকুজিতে লিখছে 'ত্রয়োদশ বর্ষ প্রাপ্তৌ' বিয়ে হয়ে যাবে; তা কোন লক্ষণ কি দেখতে পাচ্ছ? তুমিই বল না। তেরো ছেড়ে চোদ্দয় পা দিতে যাচ্ছে। বাপকে বললে বলে, সময় হলেই হবে। দিব্যি নিশ্চিন্দি আছে।

আমি বিজ্ঞের মত বলি, "না, নিশ্চিন্দে থাকাটা আর তো কোনমতেই উচিত হয় না। এ সমর্থনটুকু পাইয়া ঠাকুরদাদার উৎসাহ ও আমার প্রতি শ্রদ্ধা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে—বলেন, "এই তো সমঝদারের মতন কথা। ওরা সব বলবে, ছেলেমানুষ। হ্যাঁ হে শৈলেন, তেরো বছরের মেয়ে, সে ছেলেমানুষ হ'ল? তুমিই বল না। তেরো পেরিয়ে গেছে কোন দিন, এবার চোদ্দয় পড়বে। ব্রহ্মজ্ঞানী নয়; খৃষ্টান নয়—"

বলিতে গিয়া কথাটা একটু জড়াইয়া গেলেও আমি বলি, "না, ছেলে মানুষ তো আর মোটেই বলা চলে না।"

ঠাকুরদাদা মাথা কাৎ করিয়া চোখ বড় করিয়া বলেন, "মোটেই আর বলা চলে না। আমারও এই কথা। না ভায়া, ওই যে বললাম, তুমি ভেতরে ভেতরে চেষ্টা কর। একটু ঘোরাঘুরি করতে হবে, তা কিছু মনে ক'রো না। আমায় তো দেখছই, বাতে পঙ্গু, জান্তে ম'রে আছি। বেশ ভাল ক'রে দেখেছ তো মেয়েটাকে? একেবারে নিখুঁত করে বর্ণনা করবে। না হয় নিজেই এসে দেখে যাক; কাজ কি? দেখি,

একবার চোখে দেখলে কোন্ শালা না বিয়ে ক'রে থাকতে পারে ?"

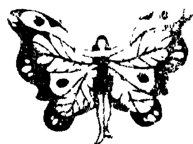
বৃদ্ধের মুখটা বিজয়ের গৌরবে দীপ্ত হইয়া উঠে এবং এইরূপ সময় সদুর ডাক পড়ে তামাক দিয়া যাইবার জন্য। আমায় চাপা গলায় বলেন, "খুব লক্ষ্য ক'রে দেখ তো ভায়া, গড়ন থেকে নিয়ে ইস্তক চলনটি পর্যন্ত কোনও জায়গায় কোনও দোষ চোখে পড়ে কি না।"

সদু আসিয়া কলিকা তামাক টিকা লইয়া যায়। একটু পরে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে এবং জলন্ত টিকায় মাঝে মাঝে টোকা মারিতে মারিতে ফিরিয়া আসে।

কোনদিন নিঃসংশয় চিত্তে এ কথা সে কথা তুলিয়া একটু দেরি করে; কোনদিন বা অহেতুক ভাবেই লজ্জিত হইয়া পড়ে, তাড়াতাড়ি হুঁকাটা ঠাকুরদাদার হাতে দিয়া; কোন দিকে না চাহিয়া, কাহারও সহিত কথা না কহিয়া বাহির হইয়া যায়।

আমি কিছু দেখি, বাকিটুকু জীবন্ত কল্পনার সাহায্যে পূরণ করিয়া লই। সেটুকু সময়ের মধ্যে ঘরের হাওয়ায় যে কি একটা বিপর্যয় হইয়া যায়, তাহা বলিতে পারি না। চলিয়া গেলে ঠাকুরদাদা হুঁকায় ঘন ঘন টান দিতে দিতে আমার পানে আড়-চোখে চাহেন। বলেন, "কি রকম দেখলে বল দিকিন ?"

প্রথম প্রথম বেজায়-লজ্জা করিত, হয়তো বলিতাম, মন্দ কি, কিংবা খুব জোর ভালই তো। আজকাল কখনও কখনও একটা বিশিষ্ট অভিমতও দিই, বলি, "রঙটা এদানিং যেন একটু আরও মাজা-মাজা বোধ হচ্ছে না ?" অথবা "চলনটা যেন একটু ভারিক্কে হয়ে এসেছে না ? আপনি কি বলেন ?" ওর ঠাকুরদাদার সামনে কখনও কখনও একটু লুকোচুরি, বেহায়াপনা আজকাল বড় মিষ্টি বলিয়া বোধ হয়।



ঠাকুরদাদা উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠেন, "তোমার চোখ আছে; আমি তো ঠিক ওই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম।"

এক-একদিন ঘরে ঢুকিতেই ঠাকুরদাদা প্রশ্ন করেন, "কি ভায়া ? কাজ কিছু এগুল ? তোমার গিয়ে, সেই ছেলেটির কি হ'ল ?"

ঠাকুরদাদার তাগিদের ঝোঁক সামলাইবার জন্য একটি কাল্পনিক পাত্রকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছি। এক হিসাবে নেহাত কাল্পনিকও নহে। এক বছর হয় এম এ. পাশ করিয়া এখন চাকুরিতে ঢুকিয়াছে; বাড়ির অবস্থা নিতান্ত খারাপ নয়—মোটা ভাত, মোটা কাপড়টা চলিয়া যায়। ছেলে দেখিতে শুনিতে চলনসই, যেমন গৃহস্থ-ঘরের ছেলে হইয়া থাকে।

ঠাকুরদাদার প্রশ্নের উত্তরে বলি, "সে পাত্র তো প্রায় হাতের পাঁচ ঠাকুরদা। আমার ছেলেবেলার বন্ধু, ধ'রে পড়লেই হবে। ওর চেয়ে ভাল যদি পাওয়া যায় তো দেখতে দোষ কি ?"

ঠাকুরদাদা বলেন, "সে কথা হাজার বার বলতে পার, নাতনী আমার রাজ-রাজড়ার ঘরের বেমানান হবে না। তবে, এ পাত্রও বা মন্দ কি শেলেন ? বলছ, তিন-তিনটে পাশ, দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। আচ্ছা, গায়ের রঙটা কেমন হবে বল দিকিন— ওর সঙ্গে মানাবে তো ? দাঁড়াও, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার ; সামনেই এনে দিচ্ছি, আর একবার ভাল ক'রে দেখেই বল না।···সদু, অ দিদিমণি।"

সদু আসে, ঠাকুরদাদার মিথ্যা অছিলা শুনিয়া চলিয়া যায়। শুধু কুণ্ঠিত করিয়া পাত্রের রঙটা মনে করিবার চেষ্টা করি। ঠাকুরদাদা অসহিষ্ণুভাবে নানান রকম আভাস দিতে থাকেন, আচ্ছা, সদুর চেয়ে কত ময়লা ? যদি পাশে দাঁড় করানো যায় তো উনিশ-বিশ, আঠার-বিশ ? ধর, তোমার গায়ের রঙ হবে ?"

আমি পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি নিজের হাতের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলি, "হ্যাঁ, তা হ'লেও হ'তে পারে।"

"তা হ'লে তুমি ঠিক করে ফেল। সত্যি বলতে কি শেলেন ভায়া, আমার কেমন যেন ছেলেটিকে মনে লেগেছে। থাকতে পারে ওর চেয়ে ঢের ভাল পাত্র। কিন্তু আমার মন যেন বলছে, ওই আমার সদুর বর।"

আমি আজকাল খুবই বেহায়া হইয়া পড়িয়াছি ; কিন্তু ইহার পর, আর লজ্জা দমন করিয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে ; আমি উঠিয়া পড়ি ; বলি, "তা হ'লে তাই দেখব। এখন তবে আসি।"

বৃদ্ধ এক একদিন আমায় বুকে চাপিয়া ধরেন। শিশুর মত সারল্যে ভরা চক্ষু দুইটি কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ছলছল করিয়া উঠে। বলেন, "ভাই, আর জন্মে তুমি কে ছিলে আমাদের যে, এ জন্মে এই দুদিনেই এত আপনার হয়ে পড়েছ ? পরের মেয়ের জন্য কে এত দেকদারি ঘাড়ে করে বল দিকিন ?"

আর গলির ব্যবধানটিও। আমি গলি পারাইয়া আজকাল সদুদের পাশের বাড়িতেই আছি।

এটুকু ঠাকুরদাদার স্নেহের প্রসাদ। একটা বিপদ আসিয়া পড়িয়াছিল, যা হয় আমায় আমার স্বর্গ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিত। ঠাকুরদাদার স্নেহে সেটা একটা সম্পদে পরিণত হইয়া আমায় একেবারে স্বর্গের সীমানার মধ্যেই তুলিয়া লইয়াছে।

আমার বাড়িওয়ালা উপরে একটা ঘর তুলিয়া দ্বিগুণ ভাড়ায় নোটিস দিয়া গেল। সেদিন ঠাকুরদাদার কাছে যখন গেলাম, মুখটা বোধ হয় বিমর্ষ ছিল। তিনি সমস্ত কথা না শুনিয়া ছাড়িলেন না। শুনিয়া সদুকে ডাকিয়া তামাক সাজিতে বলিয়া আমায় কহিলেন, "বস, বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিই।"

বুদ্ধির গোড়ায় ভাল করিয়া ধোঁয়া পড়িলে বলিলেন, "হয়েছে, এ আর শক্ত কথা কি ?"

সদ্ দ্বয়ারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল, ঠাকুরদাদা একটা ঠাট্টা করিতে সে বেচারা দুড়দুড় করিয়া পলাইয়া গেল। ঠাকুরদাদা একটু হাসিয়া চুপিচুপি আমায় বলিলেন, "কথাটা একটু গোপনীয়। বলি কি—তুমি আমাদের এই পাশের বাড়িটাতে চলে এস ; দু মাস থেকে মিছিমিছি ভাড়া গুনছি।"

আমি কথাটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া, মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ঠাকুরদাদা বলিলেন, "দেখ ভায়া, মেয়েটার বিয়ে যে খুবই কাছে, এ কথায় তুমি সন্দেহ ক'রো না। তা যদি হ'ল—আমাদের এই একটা বাড়িতে কি কুলুবে সে সময় ? কুলুবে না। আচ্ছা, তা হ'লে আমি তখন বাড়ি পাচ্ছি কোথায় ? এই সব ভেবে-টেবে, মিত্তিররা ছাড়বার পর থেকে পাশের বাড়িটা ধ'রে রেখেছি। মন্দ কাজ করেছি ? তুমিই বল না। ছেলেকে বলিনি। বললেই, বাজে খরচ—বাজে খরচ ক'রে রদ ক'রে দেবে। ভু-ভারতের মধ্যে আর কেউ জানে না। জানে এক বাড়িওয়ালা আর আমি, এই তুমি জানলে।"

আমি তো স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কোথায় কি তাহার ঠিক নাই, অথচ এই বৃদ্ধ একি কাণ্ডাকারখানা করিয়া বসিয়াছেন। মনে হইল, বলি, ঠাকুরদাদা, যখন এতই নিশ্চয় তুমি, তা হ'লে বোধ হয় নিজেই বিয়ে করবে ঠিক করেছ—বলিয়া লঘু বিদ্রূপের ঘায়ে সাংঘাতিক ভুলটা ভাঙিয়া দিই। কথাটা ঠোঁটেও আসিয়াছিল, এবং কর্তব্য হিসাবে বলিয়া ফেলাও উচিত ছিল, কিন্তু পারিলাম না। দেখিলাম, অপরিসীম বিশ্বাসভরে এই শিশু-বৃদ্ধ নিজের সত্য মিথ্যা ধারণাগুলি লইয়া জীবনের অবসান দিনে একবার পুতুল খেলা খেলিতে বসিয়াছেন ; যুক্তির রসায়ন সে অন্ধ-বিশ্বাসের উপর ঢালিয়া তাহাকে গলাইয়া দেওয়া নিতান্ত হৃদয়হীনের কাজ বলিয়া বোধ হইল।

তা ছাড়া অন্তরের মধ্যে প্রিয়সান্নিধ্যের যে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা এখানে আর অস্বীকার করি কেন ? এ কথাও ভাবিয়াছিলাম যে, আমি ভাড়াটি দিয়া দিলে এই পরিবারটির এই নিরর্থক খরচাটাও বাঁচিয়া যাইবে কিন্তু ঠাকুরদাদাকে এড়াইয়া তাহা যে পারিব, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একদিন উঠিয়া আসিলাম।

আলাদা আছি বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই স্নিগ্ধ পরিবারটির সহিত এক হইয়া গিয়াছি বলিলেও চলে। সবাই এই নিঃসঙ্গ প্রবাসীকে অন্তরের প্রীতি ও স্নেহ দিয়া আমন্ত্রণ করিয়া লইয়াছে এই গ্রহণের মধ্যে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কেহ একবার একটু থমকিয়া ভাবিয়া দেখিল না ; সবাই যেন সব সময়ের জন্য হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া রাখিয়াছে। আমিও দ্বিধাহীন পদে সেই দুয়ার-পথে এমন সহজে প্রবেশ করিয়া এমনই সহজে মিলিয়া গেলাম।

চরম সৌভাগ্যের কথা এই যে ; সদু আমার এই অকিঞ্চন গৃহখানিতে পা দিয়াছে। আরশির গায়ে যে ওই ফুলকাটা পরদা, সেটা সদুরই হাতের নিদর্শন বাক্সগুলার উপর যে রঙিন কাপড়ের ঢাকনা সেগুলিও সেই পদ্মহস্তখানির সৃষ্টি। আমার ব্যবহারের জিনিসগুলোর মধ্যে যে এমন শ্রী লুকানো ছিল, তাহা সদু স্পর্শ করিবার পূর্বে

জানিতে পারি নাই। দুপরবেলা আমি যখন আফিসে যাই, চাবিটা সদুর জন্য ঠাকুরদাদার কাছে দিয়া যাইতে হয়। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, ঘরটিতে যেন সৌন্দর্যের আরও কয়েকটি নূতন পাপড়ি খুলিয়াছে।

সকাল বেলা ঝড়ু যখন পড়ে এবং আমি হেলানো-চেয়ারে বসিয়া নানান কথা ভাবিতে থাকি, সে সময় সদু প্রায়ই আসে কখনও হাতে একটা ঘর-সাজানোর জিনিস লইয়া, আবার কখনও মুখে মিষ্টি অনুযোগ লইয়া—কোন্ জিনিসটা একটু অগোছ করিয়া ফেলিয়াছিলাম, কোন জিনিসটা কিনিয়া আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি, কোন্ জিনিসটা ব্যবহার করিবার প্রণালী ঠিক বুঝি নাই—এই সব।

আমি কখনও কখনও বলি, ব্যাটাছেলে চিরকাল লক্ষ্মীছাড়া আগোছালো—

মেয়েদের এই পরোক্ষ প্রশংসাটিতে সুন্দর মুখখানী লজ্জায় একটু রাঙা হয় এবং একটু নুইয়ে পড়ে। সদু বলে, "অমন কথা বলবেন না শৈলদা, তা হ'লে এই যে ছেলেটি দেখছেন, ও বাড়িতে একটি জিনিসও গোছানো থাকতে দেবে না ; একেই তো গোছাতে গোছাতে আমার প্রাণান্ত।"



এই রকমের কথাবার্তায় ভাই-বোনে কখনও কখনও একটু কলহ হইয়া পড়ে। দুইজনেই যখন আমার মধ্যস্থ মানিয়া বসে, আমি পড়িয়া যাই সে এক মহা সমস্যায় ; দুই জনেরই পিঠ ঠুকিয়া আর কবে সুবিচার হইয়াছে ? সদুর সপক্ষে রায় দিলে ঝড়ু গরগর করিতে থাকে। কেন কে জানে, তাহাতে একটু লজ্জিত হইয়া পড়িতে হয়। ঝড়ুর সপক্ষে বলিলে সদু খানিকক্ষণ একেবারেই কিছু বলে না, তখন মনে হয়, এর চেয়ে একটু লজ্জা পাওয়া বরং ছিল ভাল।

কাল আফিস হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম, শরীরটা তেমন ভাল ছিল না। সদু উপরের ছাদে কি করিতেছিল, এমন সময় পাশের ছাদে সেই সখীটি আসিয়া দাঁড়াইল। একটু অভিমান এবং বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "আর যে বড় দেখি না ভাই, আমাদের ভুলে গেলে নাকি ?"

সদু হাসিয়া বলিল, "তোমার ওই এক কথা ভাই, যদি জানতে, কি খাটুনিটা—।" বলিয়া সেই পুরানো ফর্দ আওড়াইতে যাইতেছিল। সখীটি বাধা দিয়া বলিল, "তার ওপর আবার একটি নতুন লোকের ঘরকন্নার ঝক্কি নিয়েছ।"—বলিয়া মুখের দিকে চাহিয়া একটু

হাসিয়া আবার বলিল, "না ভাই, রাগ ক'রো না, তোমার বউদি বলছিলেন, তাই জানলাম।"

আলসের উপর একটি বুনো ফুলের লতা ছিল ; একটি ফুল তুলিয়া সদু সঙ্গিনীর গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল, লজ্জিতভাবে একটু হাসিয়া বলিল, "তোমরা সব সমান, কেউ কম যাও না।"

সখীটি ইহার পর আরও সরিয়া আসিল এবং তাহার পর যে কথাবার্তা হইল, সে আর শোনা গেল না।

বোধ হয় এই জন্য আজ সকালে আসে নাই। অনেকক্ষণ পথ চাহিয়া ঠাকুরদাদার ঘরে গিয়া আড্ডা জমাইতে হইয়াছিল। তাও কি সেখানেও একটু দেখা দিল ? লজ্জা-রোগটা চাগাইলে আর নিস্তার নেই।

বিকালে আসিয়াছিল ; একটু লজ্জিত-লজ্জিত ভাবটা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আজ সকালে একবারটিও আস নি কেন সদু ? 'একবারটি' কথাটার উপর একটা বেয়াড়া রকম ঝোঁক পড়িয়া গেল।

সদু কি একটা বলিতে যাইতেছিল, একটা ঢোক গিলিয়া মাথাটা নত করিয়া ফেলিল। কানের সোনা দুইটি গালের উপর পড়িয়া ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া উঠিল।

একটু দেখিলাম, তাহার পর বলিলাম—কি করিয়া যে বলিলাম তাই ভাবি—বলিলাম, "তুমি একটু না আসাতে সদু আমার সমস্ত ওলট পালট হয়ে গেছে।"

মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল। একবার ঘাড়টা উঁচু করিয়া চোখ দুইটি তুলিয়া তখনই আবার নত করিয়া লইল। আর একটি এই চকিত দৃষ্টির আশায় অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম ; পুরস্কৃত হইতাম কিনা কে জানে, তবে ঝড়ুটা বাদ সাধিল। ঘরের ভিতর ষাণ্মাসিক পরীক্ষার পড়া করিতেছিল, মহম্মদ তোগলকের পাগলামি সম্বন্ধে একটা ছাই-পাঁশ প্রশ্ন করিয়া সব মাটি করিয়া দিল।

২২-এ অগ্রহায়ণ

অনেকদিন কিছু লিখি নাই। একেবারে সদু-ময় হইয়া আছি ; একটুকুও কি ফুরসৎ আছে আর ? মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবেরাও গঞ্জনা দেয়। যাহাদের বিবাহ হয় নাই, তাহারা বলে, "হ্যাঁরে, তুই হেন যে আড্ডাবাজ, তাকেও পর্দানশীন ক'রে ফেলেছে একেবারে। কেউ সাত পুরুষে আর বিয়ে না করে যেন।"

সদুকে এই সব অভিমতের কথা যখন শুনাই, সে কৃত্রিম অভিমানে বলে, "থাক না তুমি বন্ধুদের নিয়ে। পায়ে কি শেকল আঁটা আছে ?

বলি, "আছে যেন একটা।"

হাসিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলে, "আছে যেন একটা ! তা সে কি আমি পরাতে গিয়েছিলাম ?" না, শিকলটা আমি নিজেই পরিয়াছি। সে খুব সংক্ষিপ্ত কথা।

শিকলটা গড়িতেই যা দেরি হইয়াছিল ; পরিবার সময় এক কথাতেই পরা হইয়া গেল।

ইদানীং সব ছাড়িয়া ঠাকুরদাদা সেই হাতের-পাঁচ ছেলেটির জন্য বড় তাগাদা দিয়াছিলেন। তাহার রাশি, গণ, মেল ইত্যাদি যোগাড় করিতে করিতে কয়েক দিন কাটাইয়া দিলাম ; কিন্তু শেষ আর কোন-মতেই রুখিয়া রাখা গেল না। বাড়ি গিয়াছে, কাজের ভিড় প্রভৃতি কয়েকটা অছিলা পর্যন্ত নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন একদিন নিরুপায় হইয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতেই হইল।

সেদিন যে কি মুশকিলেই পড়িয়াছিলাম, বিধাতাই জানেন। দশটা, এগারোটা, বারোটা বাজিয়া গেল, কাহারও দেখা নাই . কেই বা দেখা দিবে ? ঠাকুরদাদা এক-একবার গলিতে উঁকি মারিয়া আসিয়া উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিতেছেন, আমি ক্রমেই মূঢ়ের মত নির্বাক হইয়া আসিতেছি, কি করিয়া সামলাইব ? শেষ কালে বৃদ্ধ আর থাকিতে পারিলেন না ; আমার হাত দুইটা ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ শৈলেন, তুমি কি বুড়ো ঠাকুরদাদাকে মিছে আশা দিয়ে পরিহাস করছ ভাই ? অনেকে এমনও করে।" অশ্রুতে দুইটি শীর্ণ গাল প্লাবিত হইয়া গেল।

ইহার পরেও সংকোচ করিয়া থাকা মহাপাতক। আমি-মাটির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম, "আমিই মস্ত বড় একটা মিছে আশা ক'রে ব'সে আছি ঠাকুরদা—আমায় ক্ষমা করুন। আমি নিজের সম্বন্ধেই এতদিন ব'লে এসেছি।"

সব লিখিয়া রাখা অসম্ভব এবং বিশেষ প্রয়োজনও নাই ; মোট কথা, ঠাকুরদাদা তুমুল কাণ্ড করিয়া তুলিলেন। তিনি যে আমার কথা এতদিন ভাবেন নাই, এইটিই তাঁহার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইল,এবং এই সমস্যা পূরণের ভার উল্টাইয়া আমার উপর পড়িল।—"হ্যাঁ হে শৈলেন, এমনটা কেন হ'ল বল দিকিন ?"

আমি বলিলাম, "কি জানেন ঠাকুরদা, আলোর নীচেই অন্ধকার ; বড় কাছে থাকায় আমি সেই অন্ধকারে প'ড়েছিলাম বোধ হয়।"

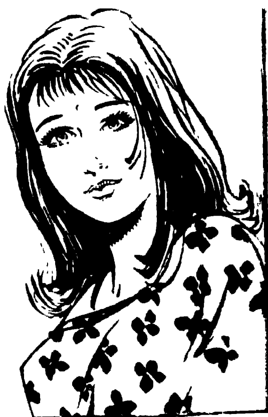
"সম্ভব। তা আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে সব, প্রেম, কত কি হচ্ছে,কই ঘুণাক্ষরেও তো জানতে পারি নি !"

"সে সব আমরা কেউ অত বুঝি-টুঝি না ঠাকুরদা ; আমিও না, আপনার নাতনীও না। সেকেলের চাল ধ'রেই বসে আছি।"

"সম্ভব। না, হ'লে এত সেকেলে মানুষ-ঘেঁষা হতে না দুজনেই। কিংবা এও তো হতে পারে যে, ওই যে বললে আলোর নীচেই অন্ধকার, সেইজন্যেই হাতের কাছে কি হচ্ছে, না হচ্ছে কিছু দেখতে শুনতে পাই নি।"—বলিয়া চশমার উপর দিয়া আমার দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া মন্দ মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

ঠাকুরদাদার অত্যাচারে তাড়াতাড়ি মাস-খানেকে ছুটি লইতে হইল, এবং ইহারই একটি সার্থক দিনে সদু আমার মধ্যকার ক্রমসংকীর্ণায়মান ব্যবধান একেবারেই বিলীন হইয়া গিয়াছে।

কন্যা সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী এবং·



একটি আই-এ পরীক্ষার ছাত্রীর জন্য একজন গৃহশিক্ষক আবশ্যক। আবেদনকারীর ন্যূনপক্ষে গ্র্যাজুয়েট হওয়া প্রয়োজন ; আহূত হলে তাঁকে নিজের খরচায় এসে সাক্ষাৎ করতে হবে। থাকা, খাওয়া এবং কন্যা শাণ্ডিল্য গোত্রিয়া, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী ও গান-বাজনা, হাতের কাজ প্রভৃতিতে নিপুণা ! অন্যান্য বিষয় পত্রের দ্বারা জ্ঞাতব্য।

লক্ষ্মীনারায়ণ রায়
৬-এ, মদন মিত্রের গলি।
বারাকপুর। জিলা—২৪ পরগণা

কাগজটা হাতে করে বার তিন-চার বিজ্ঞাপনটা পড়ে গেলেন লক্ষ্মীনারায়ণ, মানেটা ধরতে পারছেন না। স্ত্রী বিরজা দেবীকে হাঁক দিলেন—"ওগো, একবার এদিকে এসো তো শিগ্গির।"

এলে কাগজটা হাতে দিয়ে বললেন—"এই বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে। কী ব্যাপার বলো তো ?"

বিরজাও কয়েকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিরক্তিতে মুখটা বিকৃত করে নিয়ে বললেন—"আপিনটা ছেড়ে দাও তুমি !"

"ব্যস, যত দোষ আপিনের !" উত্তর করলেন লক্ষ্মীনারায়ণ।

"তা নয় তো কি ? আর সন্ধ্যের পরই তো তোমার যত লেখাপড়ার কাজ। আপিন-

চড়িয়ে ছাই ভস্ম কি লিখেছ, পাঠিয়ে দিয়েছ, তারা ছেপে দিয়েছে। কন্যা সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী—এখন ঠ্যাকাও গৃহশিক্ষকের পাল, কত ঠ্যাকাবে।"

"কি হয়েছে তোমাদের ?

ছেলে পঞ্চানন কলম হাতে পাশের ঘর থেকে উঠে এল। মনস্তত্বের প্রফেসার। মনের ব্যাপার নিয়েই একটা প্রবন্ধ লিখছিল। সব শুনে বিজ্ঞাপনটার দিকে খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মুখ তুলে একটু হাসল, বলল—"এতো দেখছি ফিক্স্‌ড্‌ আইডিয়ার (fixed idea) ব্যাপার। বাবার মনে উঠতে-বসতে নাতনীর বিয়ের চিন্তা যখন পাচ্ছেন না, নিজেই পাত্র হয়ে বসেছেন—মাথায় বদ্ধমূল হয়ে গেছে ধারণাটা—বিজ্ঞাপন লিখতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলবেন এ আর এমন বেশি কথা কি ?'

"ফিক্সড আইডিয়া যদি হয়ে থাকে তো সে তোর মেয়ের !"

—চটে উঠলেন লক্ষ্মীনারায়ণ। বললেন—"অষ্টপ্রহর আজেবাজে লেখা নিয়ে পড়ে থাকবি, হু-হু করে বেড়ে উঠছে সেদিকে হুঁস নেই—আনতে বল বিজ্ঞাপনটা পরশু তাকে যা লিখিয়েছিলাম, কপি করে পাঠিয়ে দিয়েছে কাল। দেখাচ্ছি—বাবার ফিক্স্‌ড্‌ আইডিয়া—কি মেয়ের !"

প্রায় সমস্তটুকুই নিজের মনে বকে যেতে হোল। পঞ্চু আবার ঘরে চলে গেছে ! ঘটনাটুকু সবিস্তারে নোট করে রাখতে হবে সদ্য সদ্য। বৈজ্ঞানিক ব্যাপার, একচুলও এদিক-ওদিক না হওয়াই ভালো।

"কৈ, ডাকুক, সরে পড়ল কেন ?"—ছেলের প্রতিভূ হিসাবে তার মাকেই একটু ব্যঙ্গের টোনে কথাটা বললেন লক্ষ্মীনারায়ণ। বিরজা দেবীও নিরর্থকজ্ঞানে নিজের কাজে চলে যাচ্ছিলেন, বললেন—"দাঁড়াও, দেখতে হবে। যাক, আমিই ডাকছি, দরকার নেই ওর। ফ্রয়েডের কাছে মাথা মুড়িয়েছে, কিছু কি পদার্থ আছে ? মেয়ের সামনেই একটা বে-আব্রু কথা বলে বসবে—একটুও বাধবে না।"

ডাক দিলেন—"দিদিমণি ! একবার এদিকে এসো তো ভাই। কোথায় গেলে ?"

দোরের পাশ থেকেই সব শুনছিল অনিন্দ্যা। উত্তর করল ছাতের রেলিঙের ধার থেকে — "এই যে, এখানে দাদু, ময়নাটাকে ছাতু দিচ্ছি।"

"আগে সেই বিজ্ঞাপনটা নিয়ে এসো তো, পরশু যেটা লেখালাম তোমায় দিয়ে। আছে তো ?"

হাতেই ছিল। "যাবে কোথায় ? এই তো রয়েছে দেরাজের মধ্যে।"—বলতে বলতে এনে হাজির করল, দেরাজ খোলবার অল্প একটু সময় নিয়ে। নিরীহভাবে প্রশ্ন করল—"কেন বলতো ?'

"তোমার দাদুর ফিক্স্‌ড্‌ আইডিয়া হয়েছে।" একবার ছেলের ঘরের দিকে রুক্ষ দৃষ্টিতে চাইলেন।

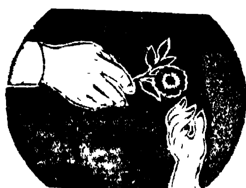
কাগজটা অনিন্দ্যার হাত থেকে নিয়ে পড়ে গেলেন। স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন—"এই দ্যাখো। ছেলেকেও দেখাওগে। নিজে লিখিয়েছি দিদিমণি লিখেছে, নিজের হাতে কপি করে ডাকে দিয়েছে।···কি দিদিমণি, তাই তো ?···ঐ নাও। তা এর

মধ্যে ওরকম আষাঢ়ে কথা সব ঢুকে পড়তে পারে কখনও ? তোর ফিক্সড্ আইডিয়ার নিকুচি করেছে !...গোটা চারেক টাকা বের করে দাও শিগ্গির।...কামিজটা নিয়ে এসো তো দিদি-ভাই।"

"ছুটতে হবে কলকাতায় এখুনি !"—স্ত্রী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন। "না ছুটেও তো উপায় হতে পারে। একবার পোস্টাফিসে গিয়ে ট্রাঙ্ক-ফোন করে দেখ কি ব্যাপারটা। সুদরে নিতে হবে তো, না, এই চলবে ?...ফিক্সড্ আইডিয়া !"—আর একবার ছেলের ঘরের দিকে দৃষ্টি হেনে কামিজটা গায়ে দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও কনেক্শ্যান্ পাওয়া গেল না কাগজের আফিসের সঙ্গে। লক্ষ্মীনারায়ণ বিকেলেও একবার চেষ্টা করলেন। ঐ অবস্থা। একটা গুরুতর রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে কলকাতায় হরতাল, পিকেটিং, লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস প্রভৃতির ব্যাপার চলছে।

সন্ধ্যার পর একটা চিঠি লিখতে বসলেন, সকালের প্রথম ক্লিয়ারেন্সেই চলে যাবে। তারপর আরম্ভ করে ছেড়েই দিলেন, আপিনটা যেন একটু একটু লেগে আসছে মনে হচ্ছে। সকালেই দেবেন লিখে। দ্বিতীয় দফা বিজ্ঞাপন বেরুতে চারদিন বাকি এখনও। সকালে পূজো-অর্চনা সেরে জলটল খেয়ে ধীরসুস্থে লিখতে বসেছেন—কাগজের অফিস থেকে এক্সপ্রেস-ডেলিভারিতে একখানি খাম এসে উপস্থিত হল। ওপরে ঐ দৈনিক কাগজেরই ছাপ। কলম রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি খুলে পড়লেন। লেখা আছে :



মহাশয়,

আপনার বিজ্ঞাপনটি নিয়ে আমরা বিব্রত বোধ করিতেছি খানিকটা। ভাষা খুবই অসংগত এবং বিজ্ঞাপনটি পাত্রের জন্য—কি গৃহ শিক্ষকের জন্য কিছু বোঝা যায় না। সাধারণ ভাবে আমাদের নিয়ম, মূলের হুবহু নকল করিয়া প্রেসে দিয়া দেওয়া। তথাপি অসংগতিটা বেশি মনে হওয়ায় ছাপা মুলতুবি রাখিয়া আপনাকে জানান স্থির করি আমরা ; কিন্তু কলিকাতার সাম্প্রতিক হাঙ্গামাদির জন্য প্রেসেও খানিকটা বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়ায় ভুলক্রমে বিজ্ঞাপনটি ছাপা হইয়া যায়। আমরা ইহার জন্য দুঃখিত। নিয়ম-বিরুদ্ধ হইলেও আপনার অবগতির জন্য আমরা মূল বিজ্ঞাপনটি পাঠাইয়া দিতেছি এই সঙ্গে। এর পরের দফা আরও চারদিন পরে আগামী শুক্রবারে ছাপা হইবে। সুতরাং পত্রপাঠ আপনার নির্দেশ জানাইয়া বাধিত করিবেন।

কাগজের বিজ্ঞাপন বিভাগের চিঠি। যথারীতি নাম ইত্যাদি দেওয়া রয়েছে। সঙ্গে

আর একখানি ভাঁজ করা কাগজ। লক্ষ্মীনারায়ণ তাড়াতাড়ি খুলে দেখলেন নাতনী অনিন্দ্যার হাতেরই লেখা। টেবিল থেকে কাগজটাও তুলে নিয়ে দুটোকে মিলিয়ে দেখলেন, একেবারে এক জিনিস।

দুপুরের পর, বেশ যখন নিরিবিলি হয়ে এসেছে, লক্ষ্মীনারায়ণ ওপর থেকে নীচে নেমে এলেন - অনিন্দ্যা যে ঘরটায় পড়ে! পড়ছিলই, তবে বইটা তাড়াতাড়ি মুড়ে সরিয়ে রাখল। হয়ত শরৎচন্দ্রই ; ওটা আর বিশেষ ধরেন না। আর, ঐ জনাই তো ভালো একটি শিক্ষক রাখা। উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল—"কী দাদু? নেমে এলে যে! আমায় তো ডাকলেই পারতে।"

"হ্যাঁ দিদি',—একটা যে হাসি ঠেলে আসছিল সেটা পিষে দিয়ে গম্ভীর হয়েই প্রশ্ন করলেন লক্ষ্মীনারায়ণ—"কি ব্যাপার বলো তো? কাগজওয়ালারা অরিজিনালটাই পাঠিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞাপনের ; আমরা যেটা…"

"আমরা যেটা পাঠিয়েছিলাম দাদু?" —বেশ উৎফুল্লই হয়ে উঠল অনিন্দ্যা। বিবেক পরিষ্কার না থাকলে তা সম্ভব নয়।

"ঠিক আছে নিশ্চয়। দেখি' - বলে ও'র হাত থেকে টেনে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে ; কিন্তু ওর মুখটা একবার রাঙা হয়ে উঠেই আবার যেন ছাইপানা হয়ে গেল।

চোখ তুলে ব্যাকুল হয়ে উঠে বলে চলল - "না—আমি এ চিঠি পাঠাইনি দাদু—কখনও এ আমার পাঠানো বিজ্ঞাপন নয় - বাঃ, একি!…না দাদু, সত্যি বলছি—তোমার এই পা ছুঁয়ে বলছি …"

ধরে নিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ। মুখে হাসি ফুটে উঠেছে, আদর প্রশ্রয়ের। বললেন— "কিন্তু তোমারই যে হাতের লেখা দিদি, দ্যাখ না ভালো করে।…হ্যাঁরে, তাড়াহুড়োর মধ্যে নকল করে পাঠিয়ে দিয়েছিলি?"

দেখাছলই আবার, যেন সম্মোহিত হয়েই, মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল অনিন্দ্যা—"তাড়াতাড়িতে এই রকম যাতা লিখে পাঠাব? কী যে বল দাদু! যেন বুঝে সুঝে কথা বলতে ভুলে যাচ্ছ দিন দিন।

"কোনও বই-টই পড়ছিলি না তো?"

চোখ আপনিই একবার শরৎচন্দ্রের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল। এদিকে হাসিটা লেগেই আছে মুখে, একটু বেড়েই যাচ্ছে যেন। অনিন্দ্যা আরও জ্বালাতন হয়ে উঠে ঝগড়াই আরম্ভ করে দিল এবার…

"বইয়ে ঐ সব লেখা থাকে? কোন্ বইয়ে বলো তো আমায়? আর, আর বই পড়ব; আবার লিখিতেও থাকব? না দাদু, তুমি…তোমার রীতিমতো ভীমরতি…" 'না, বলিয়াছিলাম, বই পড়ে মুড়ে রেখে…" খুক খুক করে স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে এল হাসিটা এবার। পিঠে হাতটা চেপে বললেন—"তা চটবার কি আছে এতে? ভুলই তো। কার না হয়?…ফিরে পাওয়া যায় না যে সে ভুলের বয়সটা—নৈলে…" বলতে বলতেই হাসি মুখ করে বেরিয়ে গেলেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, রোগের পূর্বলক্ষণ। ছেলে অবশ্য ও'র ঘাড়েই চাপাচ্ছে, কিন্তু.

সে তো কিছু কথা নয়। সার কথা রোগটা হচ্ছে, ঐ কায়েমী হয়ে বসে থেকেছে একটা ধারণা। কী বলতে গিয়ে, কী লিখতে গিয়ে কী এসে যাচ্ছে।

তাহলে তো চিকিৎসা দরকার। কোনও মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তারের হাতে, আজকাল শোনেন অনেক গজাচ্ছে তারা।

কিন্তু দরকারই বা কি তার? আদি অকৃত্রিম চিকিৎসা তো রয়েছে, আর তাতে কোনো মনস্তাত্ত্বিক ও'কে ছাড়িয়ে যেতে পারবে?

বিকালের ডাকে সতেরখানা দরখাস্ত এসে পড়ল। সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করে এসে সেইগুলো নিয়ে বসলেন লক্ষ্মীনারায়ণ। পাত্রের দিকেও আছে। আবার গৃহশিক্ষকের দিকেও আছে।

দেখে দেখে একজনকে বেছে নিলেন, যে দুদিকেই চলে। দু'বৎসর পূর্বে মনস্তত্ত্বে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে এম-এ পাশ করেছে, এখন কলকাতার একটি কলেজে প্রফেসার। কিছু অর্থ সংগ্রহ করে আমেরিকায় গিয়ে এই বিষয়ে চিকিৎসার ট্রেনিং নিয়ে ডাক্তার হয়ে আসতে চায়।

ছেলেটি যাকে বলে কপাল ঠুকেই ঝেড়ে দিয়েছে দরখাস্তটা। থাকা-খাওয়ার দিকে নেই। শুকনো মাসিক একশত টাকা করে চায়। বাড়ি নৈহাটি, প্রত্যহ কলকাতা থেকে ফেরবার পথে ঘণ্টা দুয়েক করে পড়িয়ে বাড়ি চলে যাবে।

ছেলেটিকে সাক্ষাৎকারে ডেকে, দেখেশুনে নিয়োগ করেছেন লক্ষ্মীনারায়ণ। পরিচয়াদি জেনে নিয়ে অভিভাবক পিতাকে চিঠি দিয়েছেন—ছেলে যদি সদ্য-সদ্যই আমেরিকা হয়ে আসতে চায় তো উনি সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

অবশ্য, চিকিৎসক হতে যাওয়ার আগে ও'র নাতনীর চিকিৎসাটা যে হয়ে যাওয়া দরকার, এ সর্তটা আছেই।

ঝড়ের পাখি



ছন্দা বাসা থেকে ফুটপাথে নেমে যেমন সামনের আকাশটা দেখে নিল, তেমনি পেছনেরটাতেও একবার চোখ বুলিয়ে নিলে ভালো করত। তিনদিন থেকে বর্ষা নেমেছে বেশ ভালোভাবেই, আজ সকাল থেকে একটু বিরাম যাচ্ছে বলে এতটা নিশ্চিন্ত হওয়া ঠিক হয়নি।

হয়তো নিরুপায় বলেই অতটা সতর্ক হতে পারেনি। ইণ্টারভিউয়ের জন্য বোধ হয় বর্ষাকাল বলেই দুটো দিন দিয়েছেন; আজ শেষ দিন।

প্রায় মিনিট পনেরো হাঁটতে হবে, তারপর রাসবিহারী এ্যাভিনিউর ট্রাম। মেঘমুক্ত করা রোদ, ছাতাটা খুলে কাঁধে বসিয়ে হন হন করে এগিয়ে চলল। এও একটা ভুলই হল, অবশ্য জেনে শুনে নয়; পেছনের আকাশটা ছাতার আড়ালে পড়ে গেল।

যখন নোটিশ পেল তখন আধা-আধিও যায়নি। নোটিশে একটু ভদ্রতার লেশমাত্র নেই। গুড় গুড় করে একটা গুরুগম্ভীর ডাক; ঘুরে দেখে, ওপরে ঝড়ের মুখে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত কালমেঘ দুর্দান্ত বেগে ছুটে আসছে। নিচেটা ঝাপসা। তারপর হঠাৎ-আশঙ্কায় একটা আশ্রয় দেখে বের করবার আগেই এসে পড়ল বৃষ্টি—তুমুল বেগেই।

আশ্রয়ের কথা ভাবলে চলবেও না। ছাতা চেপে ধরে, শাড়ি খানিকটা গুটিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলল ছন্দা।

অসম্ভব, কিন্তু কেমন একটা জিদ ধরে গেছে, যে কোনভাবেই দেবে ইণ্টারভিউ, তাতেও যদি একটু…

টানা মোটর হর্নের শব্দ। ঘুরে দেখল ট্যাক্সিই একটা। ঘুরে দাঁড়াবার উপায় নেই কিন্তু। ছন্দা শাড়িটা ছেড়ে দিয়ে, বাঁ হাতে ছাতা ধরে ডান হাতটা ধরল তুলে। শিখ ড্রাইভার। পাশে এসে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে একবার আরোহিনীর মুখটা দেখে নিল, তারপর বাঁ হাতে হ্যাণ্ডেল টিপে দরজাটা খুলে বলল—"জলদি উঠ যাও, গদ্দি ভিগু যায়গি।"

একটা পা দিয়েছে পাদানে, সামনে থেকে হর্ণ দিয়ে একটা বাড়ির-গাড়ি এসে ঘ্যাচ করে ব্রেক চেপে দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে যে ড্রাইভ করছে, বৃষ্টির ছাটের মুখে গলা বাড়িয়ে হাওয়ার গর্জনের ওপর গলা তুলে বলল—"আরে তুমি এখানে! উঠে এসো শীগগির!…পাইজী, তুমি চলা যাও!"

স্টার্ট দেওয়াই ছিল মোটরে, ড্রাইভার আর একবার দেখে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"উঠে এসো, উঠে এসো!"—বলে এ গাড়ির চালক এবার পেছনের দরজাটা খুলে ধরল। ছন্দা ভেতরে গিয়ে সামনের সীটের পিঠটা ধরে একটু সংকুচিতভাবে দাঁড়িয়েই রইল! চালক স্টার্ট দিতে যাচ্ছিল, একবার ঘুরে দেখে বলল—"বোস, বাঃ! সীট ভিজে যাওয়ার ভাবতে ভাবতে হবে না।"

চালিয়ে দিল মোটর।

ওর নিজেরই গাড়ি, নিজে চালাচ্ছে। বয়স বছর সাতাশ-আটাশ, সুট পরা, সীটের পাশে একটা ফোলিও ব্যাগের ওপর একটা নীলরঙের ফেল্ট হ্যাট পড়ে রয়েছে।

নিজের বিশৃঙ্খলতার দিকেই স্বভাবত আগে নজরটা গিয়েছিল ছন্দার।

হঠাৎ গাড়ির গতি লক্ষ্য করে বলে উঠল—"একি, সামনে ড্রাইভ করছেন যে?"

"বাড়ি ফিরবে তো?" ঘুরেই প্রশ্ন করল চালক!

"না, আমায় ট্রামে তুলে দিয়ে আসুন একটু।…দয়া করে লিফট্ দিলেন তো। ওকি এগুচ্ছেন কেন?" সামনেই একটা চৌমাথা, প্রশ্নের মধ্যেই সেখানে এসে পড়েছে মোটরটা। যুবা গতিবেগ কমিয়ে নিচ্ছিল, ছন্দা বলল—"কিন্তু কৈ, আপনাকে তো চিনতে - "

হাতটা তুলে মানা করল। সামনে নজর রেখেই বলল—"হচ্ছে কথা কয়োনা—ঝপসা—এ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়ে যেতে পারে।"

মোটরটা ঘুরিয়ে নিয়ে এগুল।

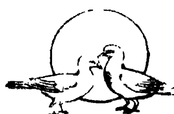
প্রশ্ন করল—"যাবে কোথায়?"

"ডালহৌসি স্কোয়ার। ক্লাইভ স্ট্রীটে।"

এসে পড়ল রাসবিহারী-এ্যাভিনিউ। সামনেই ট্রাম স্টপ।

একটা ট্রাম এসেও পড়েছে বালিগঞ্জ স্টেশনের দিক থেকে। গাড়ি কিন্তু এ্যাভিনিউতে ঢুকে পড়ে, মুখ ঘুরিয়ে সোজা এগিয়েই চলল দক্ষিণে।

"কে, আমায় নামিয়ে দিলেন না স্টপে ?"—একটু উদ্বেগের সঙ্গেই প্রশ্নটা করল ছন্দা।"
"তোমাকে পেঁছেই দিই চলো না। ট্রামে ওঠাও কি এখন সহজ ?"
"কিন্তু, ঐ যে বললাম—আপনাকে আমি চিনি নে তো!"
আবার উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে চালক সামনে চেয়েই প্রশ্ন করল—"ক্লাইভ স্ট্রীটে কোথায় ?"
একটা বড় সওদাগরি অফিসের নাম করল ছন্দা।
আবার বলল—"কিন্তু কখনও দেখি নি তো আপনাকে আমি।"
শুধু সেই রকম করে বাঁ হাতটা উঁচু হলো ; অর্থাৎ ঝাপসা পথ, কথা কয়ে অন্যমনস্ক হতে চায় না ? কয়েকটা ট্রাম স্টপ বেরিয়ে গেল। বেশ উদ্বিগ্নই হয়ে উঠেছে ছন্দা! যেন কি রকম ব্যাপার এদিকে রাস্তা একেবারে নির্জন। ও সামনে একটু ঝুঁকে পড়ে চালকের সীটের পিঠটা খামচে ধরে বলল—"না, শুনুন! উত্তর দিন কথাটার দয়া করে। ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিক, এক্সিডেন্টের ভয় নেই। মানে, আপনি নিশ্চয় ভুল করেছেন—আমায় দেখেছেন কি এর আগে ? কোথায় দেখেছেন ? বোধ হয় ঝাপসা বলেই আপনার দেখতে ভুল হয়েছে আজ…"
মোটর এগিয়ে চলছে! লেকমার্কেট ছাড়িয়ে গেল।
"শুনুন! শুনছেন ?"
"অফিসে কাজ কর ?"
"না, কাজের চেষ্টায় যাচ্ছি। ইন্টারভিউ আছে।"
"কিসের কাজ ?"
"লেডি টাইপিস্টের!"
"কত মাইনে ?"
"বাঃ! কি সব প্রশ্ন আসল কথা বাদ দিয়ে! আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি নে তো!" মুখ না ঘুরিয়ে কথা কয়ে যাচ্ছিল চালক আবার বাঁ হাতটা তুলল এবং সঙ্গে সঙ্গেই নামিয়ে নিয়ে রসা রোডের সামনে এসে বাঁ দিকের রাস্তায় ঢুকে পড়ল।



ছন্দা এবার চালকের কোটের কাছটাই খামচে ধরল, বলল—"বাঃ, একি! আপনি যে উল্টো দিকে যাচ্ছেন একেবারে! ডালহৌসি স্কোয়ার এদিকে ? এ কি! না, থামান গাড়ি—নামতে দিন আমায়—নয়তো চেঁচাব এক্ষুণি।"
মোড় ঘুরে সাদার্ণ এ্যাভিনিউতে ঢুকল গাড়ি। নির্জন চওড়া রাস্তা, গতিবেগ আর একটু বাড়িয়ে দিল চালক! এবার মাথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"চেঁচিয়ে ফল নেই, দেখতে পাচ্ছ তো রাস্তার অবস্থা। আর চেষ্টা করলে মুখ চেপেও তো ধরতে পারি। তার চেয়ে আমি যা প্রশ্ন করছি একটি একটি করে উত্তর দিয়ে যাও। বসো স্থির হয়ে।…

আগে বাড়ির ঠিকানাটা দাও !"

বড় বড় চোখ দুটো আতঙ্কে আরও বড় হয়ে উঠল ছন্দার। সঙ্গে সঙ্গেই যেন মরিয়া হয়ে কঠিন স্বরে বলে উঠল—"আপনি আমায় গুম্ করে দিয়ে টাকা আদায় করবেন ! মরে গেলেও আমি বলব না !"

কি হলো, চালক এবারে একটু হেসে ফেলল। একবার সামনে রাস্তাটা দেখে নিয়ে ছন্দার দিকে চেয়েই বলল—"তুমি বস স্থির হয়ে। একেবারে অত বেশি ড্রাস্টিক্ কিছু নয়। এভাবে ঘুরে চালানোর বিপদ আছে। আমি সোজা বসে যা প্রশ্ন করে যাচ্ছি তার উত্তর দিয়ে যাও।" ঘুরে বসে আর একবার মাথাটা ঘুরিয়ে বলল—"ঠিকানা না দিলেই গুম্ হবার সম্ভাবনা বেশি নয় ?"

আবার ঘুরে বসে গতিবেগটা আরও একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলল—"বলো তাড়াতাড়ি !"

ঠিকানাটা দিল ছন্দা। খানিকটা আর কোন কথা হলো না। ছন্দাই একবার বলল—"তাহলে আমায় ঐখানেই পেঁছে দিন।"

কোন উত্তর নেই। সোজা রাস্তা ধরে বৃষ্টির সংঘর্ষে করাত-টানার মতো একটা রুক্ষ আওয়াজ তুলে এগিয়ে চলেছে মোটর।

এক সময় প্রশ্ন হোল—

"বাড়িতে গার্জেন কে ?"

"আমার দাদা !"

"কি করেন ?"

"প্রফেসারি।'

আর একটু বিরতির পর—

"কি নাম ?"

"সাতকড়িপতি মজুমদার।"

বেশ বোঝা গেল একটু হাসি ফুটছে মুখে। ছন্দা বলল—'হাসলেন যে ?"

"কিছু মনে কোর না। ভাবছি—কেন ভয় করছ, যদি গুম্ করে টাকাই চাই তো কীই বা দিতে পারেন তিনি ?"

"নাম নিয়ে ঠাট্টা নয়।"—গলা ভারি করেই উত্তর দিল ছন্দা—"উনি আমার গুরুজন !"

"মানো গুরুজন বলে ?"

"তার মানে ?"

"কোনও গুরুজনের বাধ্য মেয়ে এ দুর্যোগে বেরোয় ?"

গোলপার্ক ঘুরে গাড়ি খানিকটা এগিয়ে ছন্দাদের বাড়ির রাস্তায় প্রবেশ করল। বেশী দূর নয়। খানিকটা এগুতেই ছন্দা ডানদিকের একটা ছোট দোতলা দেখিয়ে বলল—"এই বাড়ি, দাঁড়ান।" বাড়ি ঘেঁষে গাড়ী দাঁড় করিয়ে কয়েকটা হর্ন দিল যুবক। ছন্দা উঠে পড়ে, নামবার জন্য ছাতাটা খুলতে খুলতে বলল—"কাজ নষ্ট করে অদ্ভুত ধরণের উপকার ! তবু ধন্যবাদই দিচ্ছি। কিন্তু চেনেন না, শোনেন না, হঠাৎ…"

"চিনি বৈকি ?"

"চেনেন! তা কে…"
"একটি কাণ্ডজ্ঞানহীন দুঃসাহসী মেয়ে…"
"তার মানে!…"
কপাট খুলে একজন প্রৌঢ় এসে সামনে দাঁড়ালেন ছাতা মাথায় দিয়ে। খুব বিস্মিত হয়ে গেছেন। "ছন্দ; তুই যে!"
যুবকের মুখের দিকেও চাইলেন। ছন্দা ছাতা খুলে নেমে পড়ে একটু মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে এসে বলল - "ঐ ওঁকে জিজ্ঞেস করো দাদা। উপকার করে…"
হঠাৎ গলাটা ধরে এল কেন ওই জানে। হনহন করে পাশ কাটিয়ে ভেতরে চলে গেল। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে যুবকের দিকে চাইলেন। উনি বললেন—"যদি আপত্তি না থাকে তো ভেতরে এসে বলি।…কিম্বা আপনিই যদি একটু মোটরে এসে বসেন।"
দরজাটা আবার খুলে দিতে যাচ্ছিলেন, প্রৌঢ়ই আগ্রহ করে ছাতাটা বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন, বললেন—"সে কি! যদি আসতে পারেন আপনি, তার চেয়ে আর আনন্দের কথা কি হতে পারে?" সঙ্গে করে একেবারে ওপরে নিয়ে গেলেন।
ঐ কথা দিয়েই আরম্ভ হলো কথাবার্তা। কী যে দুঃসাহস আর অবিবেচনার কাজ করে বসেছিল ছন্দা। নিতান্তই আকস্মিক ভাবে এসে পড়েছিল মোটর নিয়ে, পরিচয়ের ভান করে তুলে নিল। নয়তো কি সর্বনাশের মধ্যে গিয়ে পড়ত ঠিক আছে তার! এই রকম ঝড়বৃষ্টিতে এক ক্লাসের ড্রাইভার শিকার খুঁজেই বেড়ায়। শহরের এ-ধরণের ব্যাপার তো নিত্যই হচ্ছে!
সাতকড়িপতি ছন্দাকেই ডেকে চা দিয়ে যেতে বললেন। পরিচয়ও নিলেন যুবকের। নাম ষষ্ঠীচরণ বিশ্বাস। বাপের বড় কনট্রাকটারী কারবার আছে ঢাকুরিয়ায়। সম্প্রতি বাইরে থেকে এঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিং নিয়ে ঢুকেছে।
ছন্দা চা নিয়ে এল ট্রে করে। সাতকড়িপতি বললেন—"সত্যি কী একটা ভুল করে বসেছিলে! আমিও জানি না কখন আকাশের অবস্থা না বুঝেই বেরিয়ে গেছ—আর এরকম হঠাৎ ট্যাক্সি দেখে উঠতে আছে? আজ উনি যদি এসে না পড়তেন…"
"তাহলে চাকরিটা নষ্ট হোত না আমার।" এখনও মুখটা ভারই আছে। তবে মনে হয় যেন ভেতরের কথা নয়। উপকারের গুরুত্বটা বুঝেছে। একটা জবাব হিসাবেই বলল কথাটা।
ষষ্ঠীচরণ একটু হেসে বলল—"সে ক্ষতিটা আমি পূরণ করে দিতে পারি। অবশ্য আপনি চান তো।"
বিস্মিত হয়ে চোখ তুলে চাইল ছন্দা। চাকরির কথা তো আছেই, তা ভিন্ন এতক্ষণ পরে 'তুমি' ছেড়ে 'আপনি' বলা।
দাদাই বললেন—"ওঁদের খুব বড় কারবার রয়েছে যে ঢাকুরিয়ায়।"
"ও!" চা ঢালতে ঢালতেই কথা হচ্ছিল, চোখ তুলে চাইল ছন্দা। আবার নামিয়ে নিয়ে হাল্কা ভাবেই—যেন নিতান্ত একটা জবাব দেওয়ার জন্যই বলল—"তা দিন না।

এত উপকারের ঝোঁক হয়েছে তো।"

ষষ্ঠীচরণ দাদার দিকেই চেয়ে হেসে বলল—"কিন্তু চাকরি করবার মতো মেয়ে কি? রাস্তা-ঘাট, বিপদ-আপদের হুঁস নেই।"

সামান্য একটু মুখটা কোঁচকাল ছন্দা। চায়ের কাপ দুটো দুজনকে এগিয়ে দিয়ে বলল।—"চাকরির আশা গেল। আবার কতক্ষণ বসে বসে নিন্দে শুনব দাদা! আমি যাই।"

বেরিয়ে গেল ছন্দা।

চা খাওয়াটা নিঃশব্দে চলল একরকম। প্রসঙ্গ ধরে বলার যা একরকম তা শেষ হয়েই গেছে তো। তবু চিন্তার ব্যাপার তো, তাই নিয়েই যেন কাটছে দুজনের। চা শেষ করে ষষ্ঠীচরণ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বলল, "যাই তা হলে আমিও।"

"দুর্যোগটা কমতে দেবে না।"

সাতকড়িপতিও উঠে দাঁড়ালেন। ষষ্ঠীচরণ বলল—"না, অনেকটা তো কমে এসেছে, তা ভিন্ন মোটর রয়েছে তো। দেরিও হয়ে গেল খানিকটা।"

দরজার দিকে একটু এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। মাথা হেঁট করে একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল—"ঐ কথা আর কি। চাকরি একটা দেওয়া যেত বাবাকে বলে। কিন্তু বিপদ বৈ কি?"

কেমন যেন একটু খাপছাড়া মনে হলো সাতকড়িপতির। যেন ঠিক এই কথা বলার জন্যই দাঁড়িয়ে পড়া নয়। বললেন—"তা একটু চিন্তার কথা বটে।"

"হ্যাঁ, একটু ভেবে দেখবেন।"

তারপর এনেই ফেলল কথাটা। হেঁট-করা ঘাড়টা তুলে বলল—"আর একটা কথা। আস্তে আস্তে নামিয়ে দিয়ে চলেই যাব ভেবেছিলাম তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে হলো …মানে…থাক সে কথা না হয় বাবার কাছেই শুনবেন।"

নমস্কার করে সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গেল।

হাসির অশ্রু



গাড়িতে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল বিকেলটা যেন সন্ধ্যা হয়ে উঠেছে। একটা ঝাপসা নীল মেঘের স্তর দক্ষিণ দিকে উঠে সমস্ত আকাশটা ছেয়ে ফেললে, তারপর ক্রমাগতই হাল্‌কা মেঘের স্তূপে সেটা পুরু হয়ে উঠেছে। রেন্‌-কোটটা বাসায় ফেলে এসে ভুল করেছে গিরীন। মেঘ দেখে আজ বড় অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে, তবুও কথাটা এক একবার মনে পড়ছিল ; এ যা বৃষ্টি নামবে, শুধু ছাতায় তার কিছুই আটকানো যাবে না।

গাড়ি থেকে নেমে যখন রিক্‌সতে উঠেছে, একেবারে মুষল ধারায় বৃষ্টি নামল। তখন মনে পড়ল ছাতাটাও গাড়িতে ফেলে এসেছে ভুলে। তখন কিন্তু আর উপায় নেই, গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, প্ল্যাটফর্মের শেষে গার্ডের গাড়ির লালটুকু যাচ্ছে দেখা।

পাড়াগাঁয়ের সাইকেল-রিক্‌সা, ছইয়ের কাপড়টা শতছিন্ন। চেনা রিক্‌সওলা দুলাল সেই লজ্জাতেই বললে, "না হয় ফিরে যাবেন দাদাবাবু ইস্টিশেনে ?...কাপড়টা আজকাল করে পাল্‌টানো হয় নি..."

"তোর কষ্ট হবে ?...ফিরে গেলে কিন্তু আজ আর বেরুতে পারা যাবে না স্টেশন থেকে।"

"কি যে ক'ন দাদাবাবু ! আমার কথাই যেন ভাবছি।"

জোরে পা চালিয়ে দিলে দুলাল।

গিরীনই কি নিজের কথা ভাবছে ? নিজের কথা যে ভাবে, সে কি ভরা শ্রাবণে নিজের রেন-কোট বাসায় ফেলে আসে ? তারপরেও কি চৈতন্যোদয় না হয়ে, অমন ঘনঘটা

দেখেও ছাতাটা দাতব্য করে আসে রেলগাড়িকে ?···অথচ এই বর্ষার চিত্রই অনুক্ষণ তার চোখের সামনে ভাসছিল।

অবশ্য তার কোলে আছে আরও একটি চিত্র, মেঘের কোলে বিদ্যুতের মতই। প্রভেদ এই যে বিদ্যুৎটি স্থির, নিরবচ্ছিন্নতার দীপ্তি মনের আকাশে।

বাড়িতে সুরবালা এসেছে আজ দিন সাত হলো। মাঝের এই কটা দিন যে কি করে কেটেছে, তা যার কেটেছে সে-ই জানে। কিন্তু বৃষ্টির জলের সঙ্গে সে আপসোসটা ধুয়ে যাচ্ছে গিরীনের, ও-যেন আদর করে গা পেতে নিচ্ছে বর্ষার ধারাকে। আজকের এই মেঘ-মেদুর অম্বর, সব লুপ্ত করা অবিরাম ধারাপাত—এ যে একান্তই ওদের দু'জনের জন্যে। এই যে সন্ধ্যাকে এগিয়ে আনা, এ তো ওদের মিলন-রজনীকে দীর্ঘতর করবার জন্যেই—দিনের খানিকটা অংশ ছিন্ন করে নিয়ে তার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে। ···কার উপর অসীম কৃতজ্ঞতায় মনটা আসছে ভরে।

দুলাল বলছে, "জ্বর-জ্বালা যে হচ্ছে বড় গাঁয়ে, সেই ভয়—নইলে বর্ষায় কি আর ভিজে না লোকে ? ভিজে—তবে, ঐ জ্বর-জ্বালা যে হচ্ছে বড়·· "

—তা হোক জ্বর, সে ত আশীর্বাদ, ছুটি নেবার পথ খুলবে, সেবার-হাতে সুরবালা থাকবে বসে পাশটিতে। কিছু একটা বলতে হয়, গিরীন সেইজন্যেই বললে, "তা হোক, তুই একটু জোরে পা চালা দিকিন···"

—আজ সব চিন্তার মাঝেই যে সুরবালা এসে পড়ছে। রাস্তার সামনেই যে দোতলার ঘরটা, ফুলশয্যা দিয়ে যেটা ওদের দুজনের ঘর করে দেওয়া হয়েছে, তার জানালার গরাদ ধরে সুরবালা আছে পথের পানে চেয়ে·· ভাগ্যিস বৃষ্টিটা সামনা-সামনি নয়···কিন্তু তবুও তো পাশ ঘেঁষে আসছেই খানিকটা ছাট···সুরবালার কি সাড় আছে—কতটা ভিজল, কতটা শুক্‌নো রইল ?······চারিদিকে এই জ্বর-জ্বালা !···"আর একটু পা চালাতে পারিস না দুলাল ? তোর জন্যেই বলছি, যতটা কম ভিজিস······"

"ছাটটা যে উল্‌টো আসছে, নইলে···এই তো সিদিন লতুন বৌদিদিরা এল—তেনার কাকা, ছোট বোন—বৌদিদি দু'বোনেরা আমারই রিকসায় ছেলো তো—বলোদ গাড়িতে মালপত্তর···সিদিনও ত বিষ্টি ছেলো গো, তবে এই রকম উল্‌টো ছাট কি ? শুদিও না লতুন বৌদিকে—ড্যাংডেঙিয়ে নে গিয়ে দরজায় দাখিল করলুম···"

গিরীন হাতটা সীটের গদির ওপর আস্তে আস্তে বুলোতে লাগল—সুরবালার বসে থাকাটুকুকে যে শত বৃষ্টিতেও ধুয়ে ফেলতে পারে না ; বললে, "না হয় আস্তেই চালা, তাড়া কিসের এমন ? ট্রেন ধরতে তো যাচ্ছে না লোকেরা···হ্যাঁরে ওরাও তোর এই ছেঁড়া রিক্‌সয় বিষ্টি মাথায় করে···।"

"কি যে বলেন দাদাবাবু !—তিনখানা রিক্‌সা, য'তে ভাবছে আমার রিকসায় চাপুক লতুন বৌদি, ব'দে ভাবছে আমার রিক্‌সায় চাপুক, আমিও কোন্‌ না সেই কথাই ভাবছি মনে মনে। কর্তা বললেন, দুলালের খানাতেই উঠুন বৌমা ও'র বোনকে নিয়ে, ওর হুডের কাপড়টা ভালো। ভালোই ছেলো কিনা, এই পরশুকার ঝড়ে রিক্‌সাসুদ্ধ উল্‌টে দিয়ে দিলে যে ফাৎরাফাই করে···"

গিরীন সীটটাতে সেই রকম আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে, ঝড়ে উলটে ছিল বলে আরও যেন মায়া পড়ে গেছে রিক্সাটার উপর ; বললে, "তো মেরামত করিয়ে নে কাপড়টা।"
"আমার নাম দুলাল হাজরা দাদাবাবু ; ওদের মত সেলাই তালি দেওয়া রিক্সা ঠেলতে আমার পা উঠে না। তা পয় আছে নতুন বৌদির, সমস্ত হপ্তাটা কামালুম কি রকম ! এবার যা হবে, হুড়ের কাপড় কিনব ভেবে রেখেছি…"
গিরীন একটু হেসে বললে, "কিন্তু পয় যে বলছিস্, রিক্সা তো তোর গেল উলটে…"
"তবে ব'দে যে চাকাই দিলে ভেউড়ে, য'তে পায়ে চুন-হলুদ লাগাচ্ছে—হিসেব করে দেখুন লোকসানটা। দাদাবাবু বলে পয় নেই !"
একটু চুপ করে রইল গিরীন, তারপর প্রশ্ন করলে, "তা কত জমল তোর নতুন কাপড় যে কিনবি ?"
"ন'টা টাকা লাগবে, সাতটা জম্যে ফেলেছি - কাল হাটের মোয়াড়াটা একাই সামলালুম তো…"
বাইরেটা যে পরিমাণ ভিজল, ভেতরটা ভিজেছে তার চেয়ে ঢের বেশী ; সেখানে তো সাতটা দিনের মেঘ জমে গুমরাচ্ছিল। রিকসা থেকে নেমে, ভাড়ার উপর দুটো টাকা বেশী দিলে দুলালকে। ছেলেটা ভাল, একটু লজ্জিত ভাবে বললে, "তা আপনি কেন গুনোগাৎ দেবে দাদাবাবু ; ঝড়ে লোকসান করেছে—সবারই করেছে…"
গিরীন হেসে বললে, "এ তো গুনোগাৎ নয়…আর বললি, আমি নিজের পকেট থেকে দিচ্ছি নাকি ? আদায় করব না তোর বৌদির কাছ থেকে !"



বেশ লাগছিল—গরীব, কিন্তু প্রভেদ সম্পর্কে বৌদিদি পাতিয়ে বসেছে, হয়তো নিজের অন্তরের প্রেরণাতেই ; এনে যে পেঁ'ছে দিয়েছে তার গুমর রাখবার জায়গা নেই। আজকের যে সুর তার সঙ্গে চমৎকার মিলে যাচ্ছে।
দুলালও কি ভেবে হাসলে, বললে, "তা বলছ তো দাও। তা হলে ভিতরকার কথাটাও বলি দাদাবাবু, আনলুম নতুন বৌদিকে…রিকসায় এক হিসাবে জন্ম পালটে যাওয়াই তো, তা কর্তাবাবু বক্‌শিশ করলেন মোটে চারটি গণ্ডা পয়সা। ভাগ্যিস একটু আড়ালে ছিলুম বলে কারুর নজরে পড়েনি—সেটাকে আট গণ্ডা বলে চালিয়ে দিলুম। …তা দ্যাও - সোয়ামী হোল গিয়ে ইস্তিরীর অর্ধাঙ্গিনী, মনে করব নতুন বৌদিদির পয়মন্ত হাত থেকেই নিলুম।"
এ পর্যন্ত গৌরচন্দ্রিকা তো বেশ হলো কিন্তু মূল গান এসে পড়া পর্যন্ত যে ক্রমাগতই বেসুরা চলেছে, তার কি করা যায় ?

রিকসাটাকে রাস্তা থেকেই বিদায় করে দিয়েছিল। তারপর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করে পুকুরের পাশ দিয়ে খানিকটা গিয়ে বাড়িটা। জল কাদার মধ্যে দিয়ে মাইল দেড়েকের পথ, সন্ধ্যা প্রায় হয়েই এসেছে; গাছের আড়ালে এগিয়ে গেলে সুরবালা যে জানালা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, অনেকখানি দেখা যাবে; না হলে রিকসা আসছে দেখে সে আগে আগেই সরে দাঁড়াবে না?

গোটা তিনেক গাছের আড়াল কাটিয়েই একটা বাঁকের থেকে উপরের জানালাটা দেখা যায়। জানলাটা নিতান্ত নির্বিকার ভাবেই রয়েছে বন্ধ।

একটা আঘাত লাগল, তবে খুব বেশী নয়। দাঁড়িয়ে যে থাকবেই একথা তো লেখা ছিল না চিঠিতে; একটা আন্দাজ করে নেওয়া। নানা কারণেই সে আন্দাজ না ফলতে পারে; কিংবা হয়ত ছিল দাঁড়িয়ে, বিলম্ব দেখে সরে গেছে। আর এও তো ভাববার কথা - এক বাড়ি লোক, নূতন বউ সে স্বামীর পথ চেয়ে কতক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে?···আন্দাজটাই কি ভুল হয় নি?

তবুও হলো নিরাশ। নব-বিবাহিতের মত,—কোথা দিয়ে কি হয়, সে যেন কোন যুক্তিই মানতে চায় না। একটু যেন অভিমান নিয়েই বাড়িতে প্রবেশ করলে গিরীন।

তারপর এই অভিমানই যাচ্ছে যেন ক্রমশ বেড়ে, চেষ্টা করছে ঠেকিয়ে রাখতে যুক্তি দিয়ে, কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে যেন।

প্রথমতঃ, তার এই ধারাস্নান—এই ভিজে চুপসে যাওয়া নিয়ে বাড়িতে যে একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল—"তোয়ালে আন্—শুক্নো কাপড় দে চা কর শিগ্গির—একি কাণ্ড! —না হয় না-ই আসতে আজ!··"

—আশঙ্কা, অনুযোগ ভর্ৎসনা; এর মধ্যে সুরবালা কোথায়? মনকে বোঝায়—মা, বোন, ভাজ, ওঘর থেকে বাবাও যোগ দিচ্ছেন, এর মধ্যে সুরবালার স্থান হয় কি করে? কিন্তু বোঝালে শোনে কে?—

মনে হয়—তবুও···

তবুও কি?···তবুও একজনের ডুরে শাড়ির আঁচল কি এই বাদুলে হাওয়ায় কাছের কোন দোরের আড়াল থেকে একটু উড়ে আসতে পারত না? গুরুজনদের সামনে একজনের সংযম কি দুটো চুড়ির শিঞ্জনেও একটু শিথিল হয়ে যেতে পারত না?

নীচেই অনেকক্ষণ দেরী করলে গিরীন। জামা কাপড় নীচেই ছাড়লে, তারপর গল্প-গুজব। কিন্তু সুরবালা বলে যে জীব বাড়িতে আছে তার তো কোন লক্ষণই নেই। তারপর মনে হলো উপরেও থাকতে পারে তারই প্রতীক্ষায়। যেমন বলা উচিত, উপরেই সবাইকে আসতে বলে সিঁড়ির দিকে এগুলো। কেউ আসছে না দেখে একটু আশাও হলো, তারপর গিয়ে দেখে উপরের ঘরও শূন্য।

নূতন করে এই অভিমানটুকু বেশ ভাল হয়ে জমে উঠবার আগেই কিন্তু সুরবালা এসে উপস্থিত হলো। হাতে খাবারের রেকাবি আর চায়ের পেয়ালা।

গিরীন প্রথম সম্ভাষণ করল—"তুমি এখানেই আছ নাকি?"

সুরবালা একটু চোখ তুলে চেয়ে হাসলে, রেকাবি আর ডিসসুদ্ধ চায়ের পেয়ালা একটা

ছোট টেবিলের উপর রেখে টেবিলটা সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে, "না থাকলে কি একজন এই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে···"

"আসত ? ঠিক কথা। কিন্তু এল যে, সে কথা কি একজনের মনে ছিল ?"

"এই দেখ, এসেই কবিত্ব, আমার ঘর বিছানা পত্তর ভিজে যাবে যে।"

তাড়াতাড়ি গিয়ে সুরবালা সামনের জানালাটা বন্ধ করে দিলে, তারপর বিছানার একটা কোণে, গিরীনের চেয়ারের সামনা সামনি হয়ে বসে বললে, "চাটুকু আগে খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। মনে থাকবার কথা বলছ, নিজের পায়ের তদারক করেই ফুরসত নেই তো পরের কথা মনে থাকবে কি ?"

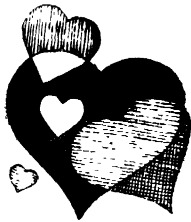
চায়ের কাপটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে গিরীন থমকে গেল, জিজ্ঞাসা করলে, "কি হলো পায়ে ?"

"মচকে গিয়ে যা ব্যথা! রান্নাঘরে বসে ফোমেণ্ট দিচ্ছিলাম···খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেড়াচ্ছি বিকেল থেকে···কে জিজ্ঞেস করে বল সেকথা ?"

"কই, এখন তো খোঁড়াচ্ছিলে না · মানে, তাইতে জিজ্ঞেস করি নি আমি·· কই, দেখি কোনখানটা।"

উঠে এগিয়ে যাবার আগেই সুরবালা চাপা গলায় খিল খিল করে হেসে উঠল, বললে, "বসো, কি জ্বালা! ফোমেণ্টের ব্যবস্থা না হলে তোমার চায়ের জল তৈয়ের থাকত কি করে? কাপড় ছেড়েই যে এক কাপ পেলে! · হ্যাঁ, এইবার গিয়ে বলে দাও যে, ওঁদের বউ ওপরে এসে আর খোঁড়াচ্ছে না!"

মুখে কাপড় চেপে হাসতে লাগল।



মুখে অল্প হাসি নিয়ে ছোট ছোট চুমুকে চা খেতে লাগল গিরীন, দুষ্টুমির কথাটুকু ভেবে মাঝে মাঝে চাইছে সুরবালার দিকে। বৃষ্টিটা একটু যেন নরম হয়েছিল, জানলার উপর ঝাপটায় মনে হচ্ছে আবার জোর হলো।

বললে, 'খুলে দেবে না জানলাটা ?"

"কি গেরো! জানলা না খুললে···আমার কিন্তু মচকানো পা, বারবার ওঠা-নামা করতে পারব না, জানলা খুলে ঐদিক দিয়ে নেমে যাব। আমার কাজ রয়েছে বিস্তর।"

"মচকানো পা নিয়ে শুয়ে থাকাই ভাল···"

"মচকানো পা নিয়ে খেটে বেড়ানো আরও ভাল। সবাই ভাববে—দেখেছ, কাজের

বউ ! এ বউ কি কে এল বাড়িতে, কে গেল, তার খোঁজ রাখতে পারে ?”

গিরীন নিজেই গিয়ে জানালাটা খুলে দিলে। ফিরে দেখলে সুরবালা একেবারে সিঁড়ির কাছে। দুপা এগিয়ে এসে বললে, “খেয়ে নাও ওগুলো, দিব্যি রইল, আমার ফুরসত নেই এখন বসবার।···বিকেলে মাছ পায় নি, পুকুরে জাল ফেলতে বলেছেন বাবা···”

“তুমি ফেলবে ?”

সিঁড়ির একটা ধাপে পা দিয়েছে সুরবালা, আঙুলটা উঁচিয়ে ঠোঁট নেড়ে জানালে · “পাবে উত্তর।”

এই রকম করে ক্রমাগতই যতিভঙ্গি করে চলেছে সুরবালা ক্রমাগতই। বাইরের দুর্যোগ অন্তরের ব্যাকুলতাকে যত মনে হচ্ছে সার্থক করে তুলি আজকের এই দুর্লভ রাত্রিটিকে, ততই সে ওর এই ছোট ছোট আঘাত দিয়ে, ওর এই অকরুণ হাসি দিয়ে যেন সেটাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। বিশেষ করে এই হাসি—এতটুকু ভাবালুতাকে এক মুহূর্তের জন্যেও দাঁড়াতে দিচ্ছে না ; এ কি রোগ দাঁড়িয়েছে নূতন !

ভাল হয়তো লাগছে, তার কারণ সুরবালার সবকিছুই ভালো। কিন্তু তবুও আজকের রাত্রিটি যদি এই করে হয় বিকল—ওর মনের সুরের সঙ্গে সুরবালার মনের মিল না থাকে—তা হলে সে আপশোষ রাখবার জায়গা কোথায় ওর ? বিয়ের পর এই প্রথম এই রকম একটি বর্ষারজনী···

কোন রকমে ওর মনের ঠিক তন্ত্রীটিতে দেওয়া যায় না একটু আঘাত ?

সেই উদ্দেশ্যে যে কি আত্মত্যাগ—তোমার মহিমায় মুগ্ধ হয়ে এক দিন আমার মনও যে কি মহিমময় হয়ে উঠেছিল, একথা কি যায় মুখ ফুটে বলা ? তবু হচ্ছে বলতে—আজ ওর জন্যে যতই দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, ততই আলেয়ার মত ও যাচ্ছে পেছিয়ে ; অথচ এক দিন কত আশা নিয়েই না এই সুরবালার দ্বারে উপস্থিত হয়েছিল যে, ওর মত নিঃশেষ করে কেউই বোধ হয় নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবে না—

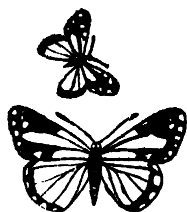
সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে এতক্ষণ পরে পেয়েছে সুরবালাকে। সমস্ত সংসারের চঞ্চলতা সব শব্দ থেমে গিয়ে বর্তমান সঙ্গীতটুকু আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—শুধু ঝর ঝর শব্দের সঙ্গে ভেকের অবিরাম কলরব। রাত্রিটুকু দুটি প্রাণীর হাতে তুলে দিয়ে সমস্ত পল্লী গভীর সুপ্তিতে মগ্ন।

জানালাটা খোলা, সামনে একটা কৌচের একটি ধারে গিরীন বসে অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। সুরবালা আসেনি, পাশেই বিছানা, তাইতেই আছে শুয়ে। অবশ্য জেগেই আছে, গল্পও করছে।

আহ্বানের উত্তরে হেসে বললে “কি করব, আমি কবি নই, খেটেখুটে এসে বিছানাটাই লাগছে ভাল।”

গল্পই হচ্ছিল—একথা-সে কথা নিয়ে। গিরীন বললে, “যখন এসে পড়ে কবিত্বের লগ্ন তখন কবি হওয়াতেই লাভ—এই রকম একটি লগ্নে সাড়া দিয়ে আমি একদিন আমার জীবনের যা সবচেয়ে পরম সম্পদ তাই পেয়েছি···”

সুরবালা মাথাটা ঘুরিয়ে দুষ্টুমি করে ভ্রু কুঁচকে বললে, "তোমার পরম সম্পদ তো শ্রীমতী সুরবালা দেবী—এই তো এতদিন জানতাম···
উপরে শুধু ওরা দুজনেই, ছাতের দরজাও বন্ধ ; তার উপর বর্ষণের শব্দ—বেশ মুক্তভাবেই হেসে উঠল একটু।
গিরীন বললে, "শ্রীল শ্রীযুক্তেশ্বরী সুরবালা দেবীরই কথা হচ্ছে।"
"মহারাণী'টা জুড়ে দাও···পরম সম্পদই তো।"
"শ্রীল শ্রীযুক্তশ্বরী-মহারাণী সুরবালা দেবীর কথা।"
"শুনতে হয় তো তা হলে।"
"তা হলে আসতে হয় এখানে।"
সুরবালা খিল-খিল করে হেসে ঘুরে শুল।
"কি হলো আবার ?"—বিস্মিত ভাবেই প্রশ্ন করল গিরীন।
"মহারাণীর হুকুম – এইখানে এসে কবিকে তার কাব্যকাহিনী শোনাতে হবে।
এই পথেই চালিয়ে নিয়ে আসছিল, বিজয়িনীর মত আরও মুক্তকণ্ঠে হেসে উঠল।
গিরীন উঠে গেল, একটা হাত চেপে ধরে বললে, "দোহাই তোমার সুরো, এই রকম হাসি দিয়ে আজকের এমন রাতটা আর দিও না ছিন্নভিন্ন করে।
"ওঠ, লক্ষ্মীটি।"
খানিকটা জোর করেই টেনে নিয়ে এসে কৌচটাতে দিলে বসিয়ে। সামনের অন্ধকারের গায়ে স্মৃতির বাতিটা যেন উজ্জ্বল করে দিয়ে বলতে লাগল—



"তোমায় আমি যেচে বিয়ে করতে গেলাম কেন—এ নিয়ে সবাই আশ্চর্য হয়েছে···"
আবার পাশে চোখ তুলে হাসলে সুরবালা।
গিরীন বললে "কেন, তুমি জানতে ব্যাপারটা ? কৈ, বল নি তো।···তা হলে আর নতুন কি শোনাচ্ছি।"
"কি ব্যাপার তা জানি না, তবে আমি যে সুন্দরী এটা তো জানতাম।"
"ও, আবার সেই দুষ্টুমি!"
আবার বলতে আরম্ভ করলে—
"প্রথম হয়ে পাশ করেছি। শ্বশুর হবার জন্যে চারিদিকে রেষারেষি পড়ে গেছে—বিলেত পাঠিয়ে কেষ্ট-বিষ্টু করে আনবে, মেয়েদের ফটো যা আসতে লাগল মাথা ঘুরিয়ে দেয়, এমনও নয় যে বিলেত যাবার অসাধ বা সুন্দরী চেনবার চোখ নেই— এমন অবস্থায়

হঠাৎ একি মতিগতি হলো। হ্যাঁ, মেয়েও যে খুব সুন্দরী তাও তো নয়…"
"ইস্!…নয়!"
"সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। আসল কথাটা কাউকে বললাম না; শুধু জিদ ধরে রইলাম -ঐ মেয়ে না হলে করবই না বিয়ে। একটু মোলায়েম করে বললাম অবশ্য—এখন থাক, নিজের পায়ে দাঁড়াই—মিথ্যে কথা সব…"
"এখন তার ফল ভুগছি…" একটু খুক্ খুক্ হাসি উঠল কথাগুলোর সঙ্গে।
"বিয়ের চিন্তাতেই কিন্তু মনটা আমার পূর্ণ হয়ে রয়েছে, তবে আমার রোমান্স একটু অন্য ধরণের। তাই নিয়ে তোমাদের বাড়িটা আমায় বড় টানত। আমি তখন ঐ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ নিয়ে কাজ করছি। অজ পাড়াগাঁ, তার মধ্যে এক প্রান্তে ঐ রকম একটা প্রকাণ্ড বাড়ি জীর্ণ হয়ে আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছে, লোক নেই; বড় নাড়া দিত মনটাকে। বড় রাস্তা থেকে একটু ঘুরে বাড়িটা. কাজে থাকতাম ব্যস্ত, মনও শ্রান্ত থাকত, কাছ দিয়ে কখনও যাইনি। পুরনো ঝাউ আর বট্‌লু-পাসের ফাঁকে ফাঁকে ওপরের যতটুকু দেখা যেত সেটুকু নিয়েই রোমান্স সৃষ্টি করতে করতে বেরিয়ে যেতাম আমাদের ক্যাম্পের দিকে। বলা বাহুল্য, সেই রোমান্সের কল্পলোকে একটি মেয়েও ছিল, বিয়ে না করায় সম্ভব-অসম্ভব জায়গায় বিয়েরই স্বপ্ন দেখছি তখন। তারপর একদিন সন্ধ্যায় কি মনে হলো—বড় রাস্তা ছেড়ে ঐদিক ঘুরেই আসব, টের পেলাম বাড়িটার নীচের একটা অংশে রয়েছে লোক, যেতে যেতেই দরজার মধ্যে দিয়ে চোখ পড়ল রকে একটা লণ্ঠন জ্বলছে আর তারই আলোয় রকের উপর দেয়ালে ঠেস দেওয়া এক গোছা বাসন ঝক ঝক করছে। রোমান্স খানিকটা খোরাক পেল। দুদিন বেশ অন্যমনস্ক রইলাম, তৃতীয় দিনে আবার ঐ পথে আসতে হওয়ায় ঐদিক হয়েই ঘুরে আসতে আসতে দেখি মেয়েটিও কল্পলোক থেকে নেমে এসেছে, তার কণ্ঠস্বর শুনলাম—ছোট্ট একটি কথায়।…তুমি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছ যে সুরো?"
"কল্পলোক থেকে নামতে পারছি না।" এবারের হাসিটা যেন জোর করেই হাসলে সুরবালা।
"কিছুদিন আমার অন্য গ্রামে গিয়ে কাজ করতে হলো। তাতে রোমান্স শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হবারই কথা, কিন্তু দিনদিনই যেন আরও শাখা-পল্লবে সজীব হয়ে উঠতে লাগল, আনন্দটা ক্রমে যেন যন্ত্রণায় দাঁড়িয়েছে। এই সময়ে মনের অবস্থা অন্যদিক দিয়েও ভাল নয়, দুর্ভিক্ষের অনেক দিন হয়ে গেছে, লোকের দেবার ক্ষমতা বা স্পৃহা এসেছে কমে। প্রথমটা যেমন পাবার বা দেবার উন্মাদনায় মানুষের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠেছিল, তেমনটি আর নেই। কেউ দিতে জানে না নিজেকে…একেবারে নিজেকে ভুলে যদি বিলিয়ে দিতেই না পারলে তো কেমন করে মেটাবে ক্ষুধা? ঐটেই তখন মূল চিন্তা মনের, তারপর এক সময় চিন্তাটা কি করে স্থান আর পাত্র পরিবর্তন করলে, দেখলাম বুভুক্ষুদের জায়গায় এসে পড়েছি আমি—আর দাতার জায়গায়…"
"সেই মেয়েটি। কী উদ্ভুটে রোমান্স বাবা!" এবারেও হেসে উঠল সুরবালা। কিন্তু সে অকৃত্রিম সুর ফোটাতে পারলে না।

বর্ষার বিরাম নেই। ঘোরটা একেবারে কাটল না গিরীনের ; আবিষ্টভাবেই বললে — "এই সময় সেই ঘটনাটুকু চোখে পড়ল।"

একটু চুপ করলে, মনটা যেন সিক্ত অন্ধকারের মধ্যে কোথায় গেছে তলিয়ে। সুরবালাকে তাগাদা দিতে হলো—"ঘুমে এদিকে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে···"

সেদিন কিন্তু মেয়েটি নিজের কথা একেবারেই ভাবেনি।···কাজ খুব কম, যোগানের অভাবেই প্রায় গুটিয়ে এসেছে। তাইতে নিজের কথাই বড় হয়ে পড়েছে বলে ঐ বাড়িটার ওদিক দিয়েই ক্যাম্পে ফিরে আসছি - বর্ষার সন্ধ্যায়, তবে বৃষ্টি নেই, আকাশে মেঘ থমথমে হয়ে রয়েছে। দেখি একজন—ভিখিরী নয়, দুর্ভিক্ষ যাদের ভিখিরী করে তুলছে তাদেরই এক জন। আর তো আমাদের কাছেও বড় একটা পাচ্ছে না কিছু। যারা এই সব কাজ নিয়ে থাকে তাদের মনটা যে সর্বদাই করুণায় ছলছল করতে থাকে এমন নয়, বরং দেখে শুনে ঘেঁটেঘুঁটে খানিকটা নির্বিকারই হয়ে যায়। এগিয়েই যেতাম, কতবার গেছি এই রকম, সেদিন কিন্তু কি হলো, হঠাৎ মনটা বড় টনটনিয়ে উঠল, মনে হলো ঐ মানুষটা শুধু ঐ মানুষই নয়, জগৎ জুড়ে যারা দীন-নয়নে রয়েছে হাত পেতে তাদের যেন প্রতীক। একটু এগিয়েছিলাম, ঘুরে দাঁড়ালাম।

"দোরের দিকে একটু তেরছা হয়ে বসে ছিল. ঘুরে দাঁড়াতে ভাল করে নজর পড়ল। পুরুষ নয়, মেয়েছেলে। শীর্ণ, কালো, মাথার চুলগুলি এলোমেলো হয়ে ঘাড়ের উপর লুটিয়ে পড়েছে ; পরনে একটা শতছিন্ন ময়লা কাপড়, গুটিয়ে-সুটিয়ে উবু হয়ে বসে রয়েছে বলেই যেন কোনরকমে লজ্জা নিবারণ হয়েছে , ঐ কাপড়েরই খানিকটা পিঠের উপর টানা।

"মুখে কথা নেই। যেন ডেকেছে, সাড়া পায় নি, আর ডাকবার শক্তি নেই, ওঠবারও শক্তি নেই, তাই হাত পেতে আছে বসে। চারদিকের ঘন গাছ-পালার ছায়ার ওপর মেঘলা সন্ধ্যার ছায়া এসে পড়ায় সমস্ত দৃশ্যটি অস্পষ্ট, সেই জন্যই যেন আরও করুণ।

"বলতে বাধা নেই, আমায় একেবারে অবিভূত করে ফেলেছিল। কিরকম গৃহস্থ জানি না, তবে ইচ্ছা থাকলেও তো এই ভর-সন্ধ্যের সময় কিছু দেবে না ; হাত দুটো আপনিই কখন পকেটে গিয়ে সেঁধিয়েছে, এক পকেটে একটা দু-আনি আর এক পকেটে আধখানা পাঁউরুটি ঠেকল।···দিয়ে আসি, তারপর এক পাশে বসিয়ে ক্যাম্প থেকে আরও কিছু না হয় নিয়ে আসা যাবে।

"পা বাড়িয়েছি, বাধা পড়ল। দরজার ভেতর দিয়ে উঠোনটার খানিকটা নজরে পড়ে, দেখছি একটি মেয়ে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে যেন বাড়ির সবাইকে লুকিয়ে এগিয়ে আসছে।·· বুকটা ধড়াস ধড়াস করে উঠল—দুটি ভিখিরীকে একসঙ্গে দয়া—এযে কল্পনাতীত, একজনকে না হয় শুধু দেখা দিয়েই···"একটু আড়াল হয়ে দাঁড়ালাম। আড়াল থেকে আরও একটু অস্পষ্ট, তবু যা দেখবার তা পাচ্ছি দেখতে। · দরজায় এসে একবার ঘাড় ফিরিয়ে ভেতরে দেখে নিলে মেয়েটি, তারপর গলা বাড়িয়ে বাইরেটাও চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রথমে একটা শাড়ি দিলে কোলের উপর ফেলে, তারপর চাপা-গলায় তার-ই একটু আঁচল মেলে ধরতে বলে কোঁচড় থেকে কতকগুলো মুড়ি বের করে

দিলে, খান দুই রুটি, আর একটু লম্বাগোছের গোটা দুতিন কি তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভিখারিণী বোধ হয় হাত তুলে আশীর্বাদ করতে যাচ্ছিল। হাত তুলে চাপা গলায় বললে—"চুপ।" দাঁড়িয়ে পড়ে একটু যেন কি ভাবলে, তারপর আর একবার ভেতর-বার দেখে নিয়ে পিঠের আঁচলটা আস্তে আস্তে নামিয়ে দিলে। আবার সতর্ক চাউনি, তারপর নিজের গায়ের ব্লাউজটা তাড়াতাড়ি খুলে নিয়ে ওর কোলে ছুঁড়ে ফেলে আঁচলটা আবার জড়িয়ে উঠানে অদৃশ্য হয়ে গেল।"

গিরীন চুপ করে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল—অনেকক্ষণ। তারপর বললে, "আমার মনে হলো পেয়েছি। এই রকম ভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারলে তার কাছে হাত না পেতে অন্য কার কাছে দিতে যাব ধরণা? তার পর দিনই বাড়িতে চিঠিটা লিখি—খোঁজ নিয়ে জানা গেল অভিভাবক দাদা—লিখলাম দাদাকে বোনের বিয়ের প্রস্তাব করে চিঠি দিন।"

মনে আছে সুরবালার। যদিও ঐ সূত্রেই যে বিবাহ এটা জানলে এই প্রথম। ওরা দুশো টাকা পেয়েছিল সে দিন। কোনও সিনেমার একটা অংশ, পুরাণো জীর্ণ জমিদারের বাড়ি দরকার, একটি হৃত গৌরব অভিজাত বংশের মেয়ের চরিত্র নাকি দেখান হচ্ছে। তারই শুটিং হচ্ছিল সে দিন—আরও একদিন হয়েছিল।··মেয়েটির সঙ্গে ওর একটু আলাপও হয়েছিল—তবে মা দিদি কিন্তু পরিচয়টা বাড়তে দেন নি।

এত বড় হাসির কথা—নির্জলা কবিত্বের এতবড় হাস্যকর পরাজয় আর হয় না। মুখে আঁচল চেপে উঠলই যেন একটু খিল খিল করে সুরবালা; তার পরেই একটু চুপ, তার পরেই স্পষ্ট মনে হলো যে আঁচলের মধ্যে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ।

অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে এগিয়ে বসল গিরীন—সত্যিই ফোঁপাচ্ছে সুরবালা! বুকে চেপে ধরে বললে—"কি! কি হলো সুরো?—হঠাৎ···"

সুরবালা মুখটা বুকে চেপে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গেই পারলে না কিছু উত্তর দিতে। তারপর ভাঙা ভাঙা কথায় কান্নার মধ্যে দিয়ে বলে চলল—"একদিন শুনবে—যেদিন হাসির মধ্য দিয়েই বলবার ক্ষমতা পাব ফিরে···তার আগে একটা কথার উত্তর দাও—পোড়া হাসির রোগ রয়েছে বলে তোমার কি একটুও এমন সন্দেহ আছে যে, আমি সেদিনকার চেয়ে আরও নিঃশেষ করে তোমার পায়ে লুটিয়ে দিই নি নিজেকে?···বল না- এই রকম একটা রাতেই যে বলবার কথা-সেটা···"

নয়



কি একটা খেলনা নিয়েই ব্যাপারটার সূত্রপাত হয়েছে, কি ভাবে জানিনা. তবে দেখছি প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ঐটুকু একটা শিশু শুধু বাড়ি কেন, সমস্ত পাড়াটাকে যেন তোলপাড় ক'রে তুলেছে। আরও সঙ্গীন হয়ে উঠেছে এই জন্যে যে কর্তা স্বয়ং রয়েছেন নাতির দিকে।…এদিকে শিশুর চীৎকার, ওদিকে ওঁর গলা মাঝে মাঝে সপ্তমে উঠছে ঠেলে—উনি জানতে চান কেন সে খেলনা হয় নি আনা? কার গাফিলতি? হ্যাঁ, ছেলেমানুষের আবদার আগে সামলাতে হবে—সব কাজ ছেড়ে · ওর ঢের ধৈর্য, কালও আনতে গেছে শুনে চুপ করে ছিল…কেন এল না আজ পর্যন্ত?

জমিদারী গলা, বাড়ির সমস্ত মহলগুলো গম গম করে উঠছে। আরও একটা আওয়াজ উঠছে মাঝে মাঝে, স্ত্রীকণ্ঠে। অতটা না হলেও বেশ জানান্-দেওয়া—আদর দিয়ে দিয়ে এ রকম জিদ হতে দেওয়া আর ভালো নয় নাতির…যুগ পালটেছে, এ সব জিদ আর চলবে? ঠিক যেটি চাইবে সেই জিনিসটি এসে পড়া চাই হাতের মুঠোর মধ্যে! …তার চেয়ে ভালো ভালো খেলনা সব দেওয়া হচ্ছে—না, আমার ঠিক সেই খেলনা চাই—বাজার তো উটকে এল—সে খেলনা যদি না পাওয়া যায় বাজারে…

"কলকাতার বাজারে বাঘের দুধ পাওয়া যায় পয়সা ফেললে।"

"তার কারণ বাঘ পাওয়া যায়; শহরে আছে, দেশেও আছে। খেলনাটার জন্যে কলুটোলা রাধা বাজার থেকে নিয়ে, চৌরঙ্গীর বড় বড় দোকান, মায় হগ্‌সাহেবের বাজার পর্যন্ত সব চ'ষে ফেলেছে—কোন্ জার্মেণী কোম্পানীর তৈরী জিনিস—লড়াইয়ে কোম্পানী নষ্ট হয়ে গেছে, আর আসে না চালান, কোথা থেকে পাবে লোকে এ বাঘের দুধ তা বলো…"

কর্তা কুট চালও দিচ্ছেন মাঝে মাঝে—

আমলা-মুহুরী চাকর-পেয়াদাদের হাঁক দিচ্ছেন নাম ধ'রে, ক'ষে ধমক দিচ্ছেন, নাতি বুঝুক কী হুলুস্থুল কাণ্ডটা লাগিয়েছেন উনি তার জন্যে।…এতেও যদি বাগ মানে।

কিছুই খাটছে না। ভেতরে কি কাণ্ড হচ্ছিল এতক্ষণ চোখে দেখিনি, রঙবেরঙের আওয়াজ থেকেই যা আন্দাজ হয়, হঠাৎ ছেলেটা যেন কার পাঁজা থেকে ছিটকে তীরের মতো ছুটে বেরিয়ে এসে বৈঠকখানায় ঢুকে বন্ধ দরজাটার ওপর আছড়ে পড়ল। সেই খেলনা চাই—থাকবে না এ বাড়িতে—কখনও থাকবে না। ··

এসে ধ'রে ফেলল সবাই। কিন্তু রাখবে কে ধ'রে? স্প্রিঙের-দম-দেওয়া খেলনার মতোই ছিটকে ছিটকে পড়ছে, কোল থেকে, পাঁজা থেকে, মোটা-গালচে পাতা তাই রক্ষা, তবু দেখছি মুখে-হাতে পায়ে এক একটা যেন রক্তের টানা টানা দাগ, ওলটাতে পালটাতে চিকচিক ক'রে উঠছে—কি ক'রে ছ'ড়ে গেছে, দেয়ালে লেগে, কি শানে আছাড় খেয়ে, কি কোনও আসবাবেই ঠোক্কর খেয়ে। নমুনা যা দেখছি তাতে এতক্ষণ যে আস্ত আছে কি ক'রে সেইটেই আশ্চর্য।

এক প্রস্থ খেলনা এসে পড়ল। সম্ভবতঃ একেবারে নূতন আমদানি; কেউ বেরিয়ে গিয়েছিল, এইমাত্র খরিদ ক'রে এসে পেঁছাল, কটাতে কাগজ জড়ানো রয়েছে এখনও। "এই তোমার ঘোড়া, নিজে চ'ড়ে গিয়ে কিনে আনলে তোমার খেলনা, লাখুবাবু" চীৎকারের সঙ্গে গড়াগড়ি দিচ্ছিল, বিদ্যুৎবেগে ঘুরে উঠে কাঠের দোলনা ঘোড়াটা পাঁজিয়ে ধ'রে একটা কুশন চেয়ারের গায়ে আছাড়। কয়েকটা টুকরোয় ছিটকে পড়ল দুটোই। তারপর আর হাতের কাছে এগিয়ে দিতেও হোল না, উল, এয়ার গান, বিউগ্‌ল্, রেলের সেট, পাম্পকরা ফুটবল—এক একটা ধ'রে আর আছড়ে আছড়ে ফেলে, দেওয়ালের গায়ে, আসবাবের গায়ে, দোরের গায়ে, জানালার গরাদের গায়ে। দুম দাম শব্দ, তার সঙ্গে গলা ফাটান চীৎকার। নূতন খেলনার লাট যেন ঘৃতাহুতি হয়ে দাঁড়াল। বাড়িটা সদর রাস্তা থেকে একটু দূরে। গেটের ভিতর পাশের গলির মধ্যে লোক জমে গেছে। বিশেষ ক'রে ছেলে ছোকরার দল। এক উদ্ভট কাণ্ড।

ভেতর-বাড়ি ওদিকে নিস্তব্ধ; শুধু মাঝে মাঝে কর্তা-গিন্নীর মধ্যে সেই উত্তর প্রত্যুত্তর আদান-প্রদান। এ ছাড়া আর বিশেষ শব্দ নেই। মনে হয় বাড়ির সবাই এতে অভ্যস্ত, কিম্বা এলে দিয়েছে, কিম্বা নিরুপায়।

বাইরের বাড়িতেও এক গোমস্তা-চাকর ছাড়া কেউ নেই। শুধু বৈঠকখানার ভেতরের দিকে জানলায় মুখ চেপে চার পাঁচটি ছেলে-মেয়ে নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। মনে হয় বাড়ির মধ্যে যেন একটা অলিখিত কানুনই আছে যে লাখু চটলে যেন কেউ তার সামনে না যায়।

এদিকে তাণ্ডব সমান ভাবেই চলেছে। ভাবছি এই ভাবে যদি চলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

এই ভাবে কি, বরং আর একটা তোড় নামল এর ওপর।

বৈঠকখানার সামনে গাড়ি বারান্দায় একটা মোটর এসে দাঁড়াল; বাড়ির বড় শেভ্রোম গাড়িটাই। এদিকে ভেতরে থেকে কর্তাও জামা জুতো প'রে বৈঠকখানায় এসে প্রবেশ করলেন। বললেন—"হয়েছে। চল আমার সঙ্গে, নিজেরা গিয়ে কিনে আনব যেখান থেকে পারি। খেলনা নাকি এতবড় কলকাতার শহরটায় পাওয়া যাবে না।

না পাওয়া যায় ওদিক থেকে বশে, সেখানে না পাওয়া-যায় একেবারে দিলেও।
চল্, আয়।"

আরও চীৎকার, আরও আছড়ানি, কোনমতেই যাবে না—কোন খেলনাই নেবে না। রাগের সঙ্গে জুটেছে আবার অভিমান, দাদুর ডাকে। যে যাচ্ছে ধরতে তাকে আঁচড়ে কামড়ে একশা করে—নিজের অঙ্গেও কয়েকটা রঙের দাগ নূতন ক'রে উঠল ফুটে। কর্তা নিজেও এগিয়ে গেলেন, ঠিক আঁচড়ানি-কামড়ানি না হোক, হাত-পা ছোঁড়ার কয়েকটা ধকোল পড়লই এসে গায়ে আর আদ্দির পাঞ্জাবীটাতে যে টানা বিদারণ রেখা পড়ল সেটাকে আঁচড়ানো কামড়ানোর বাইরে ফেলা যায়ই বা কি ক'রে ?

তবে সম্পর্কটা তো দাদু নাতিরই ; এসব নিশ্চয় অঙ্গের ভূষণ। হেসে, একটা মধুর সম্পর্ক পাতিয়ে বললেন—"দেখলে কি করলে · ?"

চাকরকে আর একটা পাঞ্জাবী আনতে বললেন, এলে বদলে নিয়ে বললেন "আচ্ছা তোকে যেতে হবে না, আমি একাই যাচ্ছি। তুই চুপ কর আমি খেলনা নিয়ে এলুম ব'লে।"

তাতে আরও আপত্তি। ভেবেছিলুম গলা আর হাত-পা ছোঁড়া চরম হয়ে গেছে, কিন্তু দেখলুম আরও শক্তি ধরে ছোকরা। লাফিয়ে উঠে ছুটে যায়,—না, যেতে দেবেনা, কিছু খেলনা নেবে না—মোটর ভেঙে চুরমার ক'রে দেবে···

সবাই ধ'রে রইল। কর্তা মোটরে গিয়ে ঢুকলেন, গলা বাড়িয়ে বললেন—"সামলে-সুমলে রাখো সবাই একটু।"

তা কি যায় রাখা ? কর্তা যেতে আরও যেন উৎকট হয়ে উঠল। তারপর যখন শঙ্কিত হয়ে উঠেছি—একটা কিছু হয়ে না পড়ে, ভির্মি না যায়, সেই সময় একেবারেই সব ঠাণ্ডা।

আর একখানি মোটর এসে গাড়ি বারান্দায় দাঁড়াল এবং একটি বছর ত্রিশের যুবা হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে নেমে এল। লাখুর বাবা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে বৈঠকখানায় ঢুকে প্রশ্ন করল, "ব্যাপার কি ?" তারপরই লাখুর দিকে চেয়ে বলল—"ওঠ্।"

বাপ ঢুকতেই লাখু চুপ ক'রে গিয়েছিল, উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বাপ ঘরটার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল—"এ সব কি কাণ্ড ?"

উত্তর নেই, শুধু চাপা কান্নাটা কয়েকটা দ্রুত ফোঁপানির মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে গিয়ে আবার থেমে গেল ; সোডাওয়াটারের বোতলটা খুলতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যেন ছিপি এঁটে দেওয়া হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত বিচার পর্বও শেষ হয়েছে ওদিকে ; সঙ্গে সঙ্গে রায়ও বেরিয়ে গেল। বিচারক শুধু একবার জিজ্ঞেস ক'রে নিল, বাবা বাড়িতে কিনা ; নেই শুনে চরম দণ্ড দিতে আর বাধল না, একেবারে নির্বাসন।

বলল—"বাড়িতে ডাকাত পোষা যায় না। বের ক'রে দোর দিয়ে দাও।" একটু ইতস্তত করবেই সবাই। নিজেই ঘুরে দোরের দিকে আঙুল বাড়াল। চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা শক্ত হচ্ছে,—সেই ছেলে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। বাপ নিজের হাতেই দরজাটা বন্ধ ক'রে গট্ গট্ করে ভিতরে চলে গেল। একটা চাকর

ঘরটা গ্ুছিয়ে নিতে রয়ে গেল। বাকি সবাই নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।
মন্দ লাগল না। জমিদারের তিন পুরুষ—বাপ, ছেলে, নাতি। কতদিনের সঞ্চিত একটা তেজ—একটা প্রতাপ—নিঃশব্দ, আবার শব্দিল—চেয়ে চেয়ে দেখবার যোগ্য বই কি! তারপর—বলতে যাচ্ছিলাম—তারপর ঐ নাতিতেই এসে সমস্ত যুগটা গেছে পালটে।—বলতেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু তাই বা বলি কি ক'রে? এ আবার যা প্রতাপ তা তো যুগে যুগেই নিমেষে যুগ দিয়েছে পালটে। সেই কথাই বলি এবার—
ঘর থেকে বেরিয়েই গাড়ি বারান্দার ওপর যে রকটুকু সেটা ঘুরে এদিকে গলির দিক পর্যন্ত চলে এসেছে। বেশ টানা, এদিকে হাত আড়াইয়েক চওড়া। নির্বাসন দণ্ডাদেশের পর লাথু প্রথমটা গাড়ি বারান্দার সামনেই এসে দাঁড়ল।



দেখলাম রাগ যায়নি মোটেই, অভিমানও ছিলই, তার ওপর এখন আবার এই অপমান এসে যেন উগ্র ব্রাহ্মস্পর্শ দোষের মতো কি একটা দাঁড়িয়েছে; মুখটা রাঙা টক্ টক্ করছে, বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে, চাপা ফোঁপানিতে শরীরটা উঠছে কেঁপে কেঁপে। একটা ভয় তো এসেছেই ছেলেমানুষের, কিন্তু সে ভয়টাকে ঠেলে চোখ দুটো যেন এক একবার জ্বলে জ্বলে উঠছে—একটা যেন প্রতিশোধের কঠোর সংকল্প, সেটাকে ভাষায় রূপান্তরিত করলে কতকটা যেন এই রকম দাঁড়ায়—রোস্ না, দাদুকে একবার আসতে দাও, তারপর তোমারও হচ্ছে!
এ ভাবটা তো আরও খারাপ; ওরকম একটা উগ্র বিক্ষোভ যদি নিজের মধ্যেই এমন করে ঘুরপাক খেতে থাকে তো শিশুর পক্ষে সে যে আরও সাংঘাতিক। একটু শঙ্কিতই হয়ে উঠেছি। তারপর মনে করছি কাউকে ডেকে না হয় বলি, এভাবে একলা দাঁড় করিয়ে না রেখে বাবুকে ব'লে ভেতরে নিয়ে ঠাণ্ডা করুক, এমন সময় মেয়েটির ওপর নজর পড়ল!
'নজর পড়ল'—বলা ঠিক হবে না, দেখেছি আগেই, তবে যা খণ্ড প্রলয়টা গেল তাতে অতটা খেয়াল হয় নি।
এই গলিটা অল্প একটু গিয়েই লাথুদের বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বাঁয়ে ঘুরে গেছে। ঠিক মোড়ের ওপর যে ছোট্ট একতলা বাড়িটি সেই বাড়ির মেয়ে। ওদেরও দরজার বাইরে ছোট্ট একটুখানি রক, একটু কোণাকুণি পড়ে আমার ঘরের জানালা থেকে, অল্প যে ক'দিন এসেছি এখানে তার মধ্যে বিকালের দিকে কয়েকবারই নজরে পড়ল মেয়েটি

ইঁট দিয়ে ঘর পেতে নিজের খেলনা নিয়ে বসেছে। ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটি, বিকেলের পড়ন্ত রোদটা গলি বেয়ে গিয়ে পড়েছে ঘরণী থেকে ঘর-করণা—সমস্ত টুকুর ওপর, নড়তে চড়তে ঝিকমিক করে উঠেছে, আপিস ফেরৎ আলস্যের ঘোরে ব'সে ব'সে দেখি। একাই থাকে মেয়েটি, গলিটা বিরল বসতিও, তবে বার দুই তিন চোখে পড়ল জমিদার বাড়ির পেছন দিয়ে একটি প্রায় সমবয়সী ছেলে কতকটা যেন প্রচ্ছন্নভাবেই গিয়ে উপস্থিত হোল, এবং এদিকে পিঠ ক'রেই খেলায় জ'মে গেল। মেয়েটিকে যেন চোখ তুলে এ বাড়ির দিকে চাইতেও দেখে থাকব মাঝে মাঝে। নিশ্চয় ওরই প্রত্যাশায়।

এ গেল ওদিকটার ইতিহাস।

আজও বার দুই পড়েছিল নজর ; একটি মেয়ে একতলা বাড়ির দরজার চৌকাঠ বেঁসে একটু ঘাড়টি বেঁকিয়ে নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ-হাতটা ঝোলানো, তাতে একটা মাঝারি সাইজের টিনের বাক্স ; বিস্কুটের বাক্স ব'লে মনে হোল। রাস্তায় যে ভীড়টা জমেছিল তার মধ্যে এসে দাঁড়ায়নি কিন্তু মেয়েটি। এই বার, যখন সব ঠাণ্ডা, নাটকের পট-পরিবর্তনের সঙ্গে রাস্তা একেবারে নির্জন, দেখি মেয়েটি চৌকাঠ ছেড়ে নেমে পড়ল ; তারপর দু-একবার এদিক-ওদিক চেয়ে আস্তে আস্তে পা বাড়াল এদিকে।

আমার জানালাটা আস্তে আস্তে টেনে দিয়ে একটু আত্মগোপন ক'রে বসলাম। মেয়েটি রকের ও-প্রান্তে এসে আর একবার চারিদিকে একটু দেখে নিল, তারপর বাক্সটা রকের কিনারায় রেখে, বুকটা রকের পাশে চেপে হাতের চেটোয় চিবুকটা রেখে গলিটার ওপরই নির্বিকারে দাঁড়িয়ে রইল। লাখু-এর আগেই কখন ব'সে পড়েছে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে হাঁটু মুড়ে সামনের দিকে চেয়েই বসেছিল, মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে, মেয়েটি আসতে একবার ঘুরে চেয়ে নিয়ে আবার দৃষ্টি সামনে ফেলল, খানিকটা সময় এই ভাবেই গেল।

কিন্তু লক্ষ্য করলাম সময়টা বৃথায় যায় নি একেবারে। লাখুর মুখের সেই থমথমে ভাবটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গিয়ে ঠিক সহজ না হোক, একটা যেন ফুটে উঠছে, কতকটা যেন—এই-যে নূতন পরিবেশটুকু সৃষ্টি হোল এর সঙ্গেও তার অসহযোগ।

মেয়েটি বাক্সের ডালাটা খুলল ; যে-শব্দটুকু হোল ; তাতে লাখু একবার ঘুরে চাইল এবং চেয়ে রইল একটু। মেয়েটি কতকটা যেন অবহেলার সঙ্গে বাক্সের অল্প সঞ্চয় নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে লাগল—

কয়েকটা কাঁচের পুতুল, গোটা দুই ন্যাকড়ার, বাড়িতেই তৈরী, কাপড়-চোপড় পরানো দুটো সেলুলয়েডের একটা ভাঙা তার মধ্যে ; আর গাদাখানেক নানা রঙের ছোট বড় কাপড়ের টুকরো—মনে হয় দরজির দোকান থেকে সংগ্রহ ক'রে আনবার কেউ আছে যেন ; ছিট আছে, সিল্ক আছে, সাদা মখমল আছে, মলমল আছে। এইগুলো হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে, আবার হাত আলগা ক'রে ঝুর-ঝুর ক'রে বাক্সয় ফেলতে লাগল নিজের মনেই ; লাখুর দিকে দেখলাম মাত্র একবারটি। চোখের একটুখানি কোণ তুলে সে চাইল। তারপর হঠাৎই সবগুলোর ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বাক্সর ডালাটা চেপে দিয়ে লাখুর উল্টো দিকে ঘাড়টা ফিরিয়ে নিয়ে আবার আগেকার মত দাঁড়িয়ে

রইল।

লাখু বলল, "উঠে আয় না নিরু। আসবি ?"

মিনিটকয়েক আগের সেই যে বজ্র-নির্ঘোষ তার সঙ্গে এ কণ্ঠস্বরের কোন সম্বন্ধই নেই। সেটা অবশ্য কিছু আশ্চর্য নয়, যে জ্বালামুখ দিয়ে অগ্নি বর্ষায় তাই থেকে আবার ঝরণাও তো নামে!

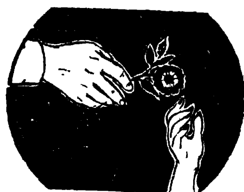
উঠে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তো আসা চলে না। একটু দাঁড়িয়েই রইল নিরু, তারপর বাক্সটা কাঁখালে তুলে নিয়ে ফ্রক পরা ছোট্ট শরীরে সামান্য একটু দোল দিয়ে রকের শেষের সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে উঠে এল। তবে একেবারে এদিকে নয়; মাঝামাঝি। লাখুও উঠে গিয়ে বসল। আমার একটু সুবিধাই হোল, একেবারে সামনাসামনি হওয়ায় পাল্লা দুটো আরও একটু চেপে দিয়েও সবটুকু দেখতে পারছি গলির এদিক থেকে।

নিরুও বসেছে। আড়ষ্ট ভাবটা আর একেবারে নেই, ডালাটা খুলতে খুলতে হঠাৎ ভ্রূ-দুটো তুলে, মুখটা একটু দুলিয়ে জিগ্যেস করল, "তোর বুঝি খেলনা হারিয়েছে ?"

লাখু বলল, "হুঁ। দাদু আনতে গেছে। আমি কিন্তু নোব নাকি ভেবেছিস ?"

নিরু ডালাটা পাশে রেখে নীচের ঠোঁট দিয়ে ওপরেরটা ঠেলে তারই সঙ্গে একটু সূক্ষ্ম হাসি মিশিয়ে মাথাটা দুলিয়ে দিলে। বোধ হয় তাৎপর্যটা—এমন খাতিরও দেখেনি, এমন জিদও দেখেনি! তারপর ওর মুখের দিকে চেয়ে বেশ স্পষ্ট করে হেসে উঠল।

লাখু দেখলই না, কিম্বা ব্যঙ্গটুকু গায়েই মাখল না। গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে বাক্সের মধ্যে চেয়ে ছিল, বলল, "তুই একটা চমৎকার জিনিস পেয়েছিস তো নিরু, মখমল বলে ওটাকে।"



"জানি!...দাদা এনে দিয়েছে।—তুই নিবি ?"

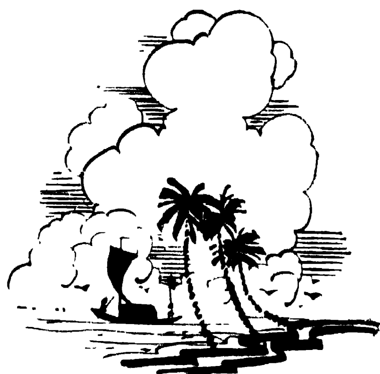
সামনে মেলে ধরল। আট আঙুল × আট আঙুল—এই রকম একটা টুকরো। লাখুর চোখ দুটো হঠাৎ লুব্ধ হ'য়ে উঠে চকচক করছে। তবুও একবার বলল,—"তোর থাকবে না যে। অমন ভালো রাঙা মখমলটা"

নিরু বাড়িয়েই ধরল, বলল—"তুই নে তো। আমার কথা ভাবতে হবে না।...আয় খেলি একটু, অ্যাঁ ?"

নিয়ে বাঁ হাতের ওপর বিছিয়ে চেয়ে রইল লাখু! কী অপূর্ব জিনিসই যে পেয়েছে! চোখ ফেরাতে পারছে না।...ওদের তো মুখ নয়, শরতের আকাশ, এই ছিল বজ্রগর্ভ

কৃষ্ণ মেঘে ঢাকা, এখন একেবারেই আলোয় ঝলমল।
বিস্মিত হতে হয়েছে বৈকি! কোথায় আট আঙ্গুলের এক টুকরো পরিত্যক্ত মখমল, আর কোথায় একটা এমনই দুর্লভ খেলনা যার জন্য বাবুকে হয়তো বিলাত পর্যন্ত ছুটতে হবে। তাও, যেমন শোনা গেল, পেলেও পণ্ডশ্রম।
বিস্মিত হয়েছি বৈকি, তবে খুব বেশিও নয়; ওদের জগতের ধারাটাই তো মোটামুটি এই।
তারপর যেটুকুও বা বিস্ময় ছিল তাও গেল কেটে, দেখলাম রহস্যটুকু আরও গভীর—চেয়েই ছিল লাখু। দৃষ্টিতে অসীম কৃতজ্ঞতা। একটু পরে ডান হাতটা টুকরোটুকুর ওপর ধীরে ধীরে বুলুতে বুলুতে বলল—"তুই সত্যি বেশ নিরু।"
নিরু খেলাঘর পাতছিল, প্রশংসায় কান দিল না, ঠোঁট দুটি অল্প একটু যা কুঁচকে গেল।
এর পরেই—"তুইও আমায় লব্ করিস, নারে ?...বিয়ে করবি তো ?" বেশ স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে সংলাপ। নিরু সেলুলয়েডের একটা পুতুল তুলে নিয়ে কাপড় পরাতে পরাতে বলল—"না ভাই, তোমরা হচ্চ জমিদার, রাজা, আমরা গরীব..."
নিরাশার ছায়া মুখে পড়তে না পড়তে লাখুর মনে পড়ে গেছে, নিরুর পিঠে হাত দিয়ে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে বলল—"নারে জমিদারি আমাদের নেই আর।"
নিরু কাপড় পরাতে পরাতেই বলল - "যাঃ, তাই না আরও কিছু!"
"মাইরি বলছি, মাইরি, মাইরি! কাল ঠাকরুণ মা বললেন - কেড়ে নিয়েছে আমাদের জমিদারি!"—মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ক্ষতিটা কত বড় যে লাভ, কী যে এক ঘোর সমস্যা গেছে মিটে!
এরপর আর একটু মুখটা ঝুঁকিয়ে—
"করবি তো বিয়ে এবার ?"
কাপড় পরাতে পরাতেই একটা হাসিকে চেপে চেপে রাখবার চেষ্টা করছে নিরু; ওরা তো স্পষ্ট ক'রে কিছু বলতে জানেও না। মুখটা বরং একটু ঘুরিয়েই নিল উল্টোদিকে, তারপর পুতুলটা বাক্সয় রেখে দিয়ে বাক্স উট্কে উট্কে আর একটা টুকরো বের করল। রাঙা টকটকে খানিকটা সিল্ক। এবার আর নিতান্ত আঙুলের মাপে নয়, প্রায় আধ হাত চওড়া একটা লম্বাটে ফালি। যত্ন ক'রে ভাঁজ করা ছিল; মেলে ধরতে পড়ন্ত রোদে ঝলমল ক'রে উঠে খানিকটা যেন আলো ছড়িয়ে দিলে জায়গাটায়। লাখুর মুখটা আরও যেন শতগুণ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে; নিরু হাতটা বাড়িয়ে বলল "তুই বরং এইটে নে তাহ'লে, ওটা দে আমায়।...কী চমৎকার এটা, নারে! তুই-ই নে।"

কবি



চলতে চলতে গতি আপনিই মন্থর হয়ে এসেছিল, এক সময়ে রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তখন পুলের প্রায় মাঝামাঝি এসে পড়েছি, তাইতে গঙ্গাকে আরও প্রশস্ত দেখাচ্ছে। সামনে বহুদূর পর্যন্ত গিয়ে ডান দিকে ঘুরে গেছে; পেছনে, কলকাতার দিকেও প্রায় অতদূর পর্যন্ত গিয়েই আর একটা বাঁক, এবার বাঁয়ে। দুদিকে, যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় তীর-লগ্ন তরুরাজির নীল রেখা, তারই মাঝে মাঝে যেন মিনা করে বসানো বাড়ি-ঘর-মন্দির-ঘাট-জুটমিল—তার জেটি, চিমনি···

মাঝখান দিয়ে এই বিরাটকায় বিবেকানন্দ ব্রিজ এপার-ওপার চলে গেছে।

আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মি পড়ে তাতে হলদে, গোলাপী, সিঁদুরে, বেগুনে - কত রকম যে রং তার হিসাব নেই। রঙের খেলা তীরের গায়ে, জলের ওপর, নৌকার ভরা পালে; দক্ষিণেশ্বরের মন্দির চূড়াগুলি ঝলমল করছে।

দক্ষিণে-হাওয়াটা এই সবে উঠল, সমস্ত দিনের গুমটের পর। ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

এ সময় এখান দিয়ে গেলে দাঁড়িয়ে না পড়ে যেন উপায় নেই; একবার দাঁড়িয়ে পড়লে পা তুলে এগুনোও কঠিন।

রেলিঙে বুক চেপে দাঁড়িয়ে আছি, আমার পিছন দিয়ে পুলের দুমুখো ট্রাফিকের স্রোত বয়ে চলেছে, মোটর, লরী, রিক্‌শা; পায়ে হেঁটেও চলেছে লোকে। অবশ্য খুব হালকা ট্রাফিক; চারিদিকের নিস্তব্ধতার গায়ে শব্দ তরঙ্গ উঠছে মাঝে মাঝে; কখনও স্তিমিত, কখনও মুখর।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি অত খেয়াল নেই ; হঠাৎ দেখি দুটি যুবক বেশ হন্তদন্ত হয়েই আসতে আসতে আমার থেকে দশ-বারো হাত দূরে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।
একটু যে কেমন কেমন ঠেকলই, তাহ'তেই মুখটা ঘুরিয়ে একটু ভাল করে দেখে নিলাম। দুজনেরই বয়স প্রায় সমান বলে মনে হ'ল, প'চিশ-ছাব্বিশের কাছাকাছি। চেহারা নাপেটি গোছের ; গায়ে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত পাঞ্জাবি। এদিকেরটি বাঙালী বলেই মনে হয়, অপরটি কিন্তু অন্য রকম, কাঠামোটা বাঙালীর মত হলেও, চুলটা শিখেদের মত করে মাথার মাঝখানে জড়ো করা, দাড়ি গোঁফ অল্পই, কিন্তু অক্ষত। শিখধর্মাবলম্বী দু-একজন বাঙালী বা বিহারী দেখেছি ; সেই রকম মনে হল। নির্লিপ্তভাবে সামনের দিকে চেয়ে থাকলেও ওরা যে, যে-কারণেই হোক, আমায় দেখেই দাঁড়িয়ে পড়েছে এটা বেশ টের পাওয়া যায়। কৌতূহল চেপে চুপ করেই রইলাম আমি।
খানিকক্ষণ গেল, এদিককার যুবকটি সামনের দিকে চেয়েই রেলিঙের মাথায় একটু তবলা বাজিয়ে অপরটিকে ফিস ফিস করে কি বলল, তারপর দুজনেই এগিয়ে এসে প্রায় হাত তিনেকের ব্যবধান রেখে দাঁড়াল। চুপ করেই রইলাম, কথাটাও ওরাই আরম্ভ করুক না।
একটু পরে এদিককারটিই একটু নড়েচড়ে যেন প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল, আর সময়ক্ষেপ না করে আমার দিকে মুখটা ঘুরিয়ে একটা নমস্কার করল, তারপর একটু হেসে প্রশ্ন করল, "গঙ্গার সিন্দুরি দেখছেন স্যার ?"
বললাম, "অবশ্য চোখ বুজে নেই, তবে, বেশ হাওয়াটি দিচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছি একটু।"
"এখানে এসে চোখ বুজে দাঁড়াবে, সাদ্যি কি কারুর, ঘর-ছাড়া করে টেনে আনে।"
আলাপটা দু-কথাতেই বেশ জমিয়ে ফেলেছে—এইভাবে একটু হেসেই সঙ্গীর দিকে ঘুরে চাইল। হয়তো কিছু ইশারাও করল সেও হাত দুটো তুলে নমস্কার করল আমায়।
প্রথমটা মনে হল চুপ করেই থাকি, উৎসাহ পেলে কথাবার্তায় বোধ হয় মাত্রা রক্ষা করতে পারবে না। তারপর ভাবলাম, দেখাই যাক না, একটা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসে দাঁড়াল তারও তো হদিস পাওয়া দরকার। প্রশ্ন করলাম, "তোমরা আস না কি রোজ ?"
বলল, "আমরা !...আমরা নাকি মানুষ ? চক্ষু থাকতেও অন্ধ। কি বলিস রে।"
সঙ্গীটি একটু লজ্জিত ভাবে হাসে।
এতটা আত্মগ্লানির জন্যই আমি বললাম, "অন্ধ কেন হতে যাবে ? এই তো বললে, ঘরছাড়া করে টেনে আনে, কিছু একটা দেখছ বলেই তো বললে।"
"আজ্ঞে, দেখছি বৈকি, দেখব না কেন ?—জল দেখছি, আকাশ দেখছি, মেঘ দেখছি, কিন্তু সব মিলিয়ে যে সিন্দুরিটা হচ্ছে সেটা দেখবার যে চোখ নেই। তারপর যদি-বা এল একটু ভাব মনে—কদাচ-কখনও তো সেটা যে একটু টুকে রাখব সে ক্ষ্যামতা তো নেই।"
বললাম, "টুকে যে রাখতেই হবে তার মানে কি ?"
"কি বলছেন স্যার, সেই তো সমিস্যে ! আর সেই সমিস্যে নিয়েই তো হুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি চারিদিকে।"

উৎসাহ-দীপ্ত মুখে আমার দিকে চাইল যেন এতক্ষণ আসল কথাটা এসে পড়েছে। আমিও প্রশ্ন করলাম, "কি রকম ?"

"এই যে দেখছেন, এর নাম গুরুজিৎ সিং…"

"শিখ ?"

"শিখ, সে মাথার চুলে আর হাতে ঐ একটা লোহার বালা আছে নইলে চার পুরুষ ধরে বাংলায় রয়েছে, এঁদো ডোবার জল শিখের আর কি রেখেছে ওর ? দেখছেনই চেহারা। এখন গুরুজিৎ বিয়ে করতে চায়…"

মুখের দিকে চেয়ে রইল ; বললাম, "করুক না, এ আর এমন সমস্যা কি ?"

"সমিস্যে এইখানে যে শিখের মেয়ে তো পাচ্ছে না, তখন আমার এক শালীকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছে…"

আমি একটু বিস্মিত হয়ে চাইলাম। একটু হেসে বলল, "আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন, কিন্তু এ তো আখছারই হচ্ছে স্যার। ওদের জেতের মধ্যে মেয়ে বড় কম তো, ওরা অত বাছে না, শিখ হল বহুৎ আচ্ছা, নয়ত বাঙালী কি পশ্চিমা—হলেই হয় একটা—সংসার ধর্ম করতে হবে তো। তবে গুরুজিৎ আবার একেবারে বাঙালী হয়ে গেছে। দু-একটা বাংলার নমুনা ছাড় না রে বাবুর কাছে, বুঝুন।"



গুরুজিৎ একটু লজ্জিতভাবে চাইল। আমি বললাম, "থাক, নমুনার দরকার কি ? শিখ বাঙালী হয়ে যায়, বাঙালী শিখ হয়ে যায় এ তো ভালই, আর বিয়ের মধ্যে দিয়েই এটা ঠিকভাবে হবে। তোমার শালীর সঙ্গে হচ্ছে এ তো উত্তম কাজ। তোমাদের আগে থাকতে জানাশোনা আছে বলে মনে হচ্ছে।"

"একসঙ্গে কাজ করি আমরা সালকের একটা মোটর মেরামতের কারখানায়। আমিই তো ওকে কথা দিলাম—কত আর খুঁজে হয়রান হবি ? আমার শালীটা ডাগর-ডোগর আছে দেখতেও অপ্সরা না হোক্, নিতান্ত নিন্দের নয়, বলিস তো দু-হাত এক করে দিই। শ্বশুর আর শালীকেও রাজী করিয়েছি। আপনি যেমন বললেন—সব উত্তম, সে সব দিক দিয়েই। দিন ঠিক, মেয়ে পছন্দ, গুরুজিৎ তিন শ টাকাই দিতে রাজী হয়েছে ; সব পাকা, তার এখন তরী বুঝি কিনারায় এসে বানচাল হয়।

"মেয়ে বেঁকে বসেছে ?"—ঐখানটায় একটা খট্‌কা লেগেছিল বলে খুব বিস্মিত না হয়েই প্রশ্নটা করলাম।

উত্তর হল—"মেয়ে তো ওকে ভিন্ন বিয়ে করতেই চায় না কাউকে। ওর মাসতুতো

বোন আরেক শিখের হাতেই পড়েছে কিনা। তবে এক অন্য ফ্যাচাং তুলেছে। মিডল-পাশ-করা মেয়ে কিনা, শহরে তো আজকাল কাউকে মুখ্যু থাকতে দিচ্ছে না, সেই হয়েছে বিপদ।…দেখা না রে চিঠিটা—সঙ্গেই তো আছে।" "চিঠি!"—এবার সন্দেহ-আসলে বিস্মিত হয়েই বলে উঠতে হল আমায়।

"অনেক দিন থেকে কথা চলছে তো। লেখাপড়া-জানা মেয়ে, চিঠিটা সুরু করে দিয়েছে। গুরুজিৎ বাংলা বলে যাবে আপনার মত, কিন্তু ওদিক তো অন্টরম্ভা…"

গুরুজিৎ মুখটা একটু অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "আরম্ভ করেছি তো শিখতে।" বেশ পরিষ্কার বাংলাতেই বলল। বললও বোধ হয় আমার ভাবটা শোনবার জন্য। সঙ্গী বলল, "শিখছে, দ্বিতীয় ভাগ প্রায় শেষ করেও আনল রাত জেগে। কিন্তু ওর যা আবদার তা পূরণ করে কি করে বলুন?"

"কি বলে ও?"

"পদ্য চাই বিয়েতে!" - আবদারের বহরটা জানিয়ে দিয়ে আমার মুখের দিকে চাইল, বলল, "না বিশ্বাস হয় চিঠিটা দেখুন না। আপনি দেখবেন তাতে আর হয়েছেটা কি?"

বললাম, "থাক, চিঠি দেখাতে হবে না। বাঙালীর মেয়ে একটু কবিতার আবদার করবে, এতে আর অবিশ্বাসের কি আছে?"

—"চিঠির উত্তর—মানে যেটা লাভের দিকে—আমি একরকম করে লেখাটা একটু বেঁকিয়ে দিয়ে যাচ্ছি—আবার চেনা হাত তো—গুরুজিৎ উদিকে ক-খ মকশ করে যাচ্ছে—এদিকটা একরকম চালিয়ে যাচ্ছি আপনাদের পাঁচ জনের আশীর্বাদে, কিন্তু কবিতা কোথায় পাই? তাই সকালে উদিকে নটা-দশটা পর্যন্ত, তারপর কারখানা বন্ধ হওয়ার পর দুজনে ঘুরে বেড়াচ্ছি…"

বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলাম, "উদ্দেশ্য?"

"একজন কবি খুঁজে বের করতে হবে তো? এ দায় থেকে উদ্ধার করবে কে?"

"কোথায় কোথায় খোঁজ?"

"খোলা জায়গা—একটু যদি বাগানের মত হল, মাঠের দিকেও চলে যাই দুজনে, দুদিন কলকাতার দুটো পার্কেও ঘুরে এলাম। তারপর পুকুর ঘাট, গঙ্গার ঘাটে…"

"ঘাটে কেন?"

একটু সঙ্কোচের সঙ্গে হাসল, বলল, "ওনরা সব চান করতে আসে তো—"

"ওনারা মানে…"

কথাটা তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, "ও বুঝেছি · তা ধর না হয় পেলে খুঁজে, তার পর? লিখিয়ে নেবে কবিতা?"

"মাংনাতে কি স্যার? গুরুজিৎ বিয়ের খাতে একটা বাজেট ঠিক করে রেখেছে তার জন্য…"

একটু কি যেন ভেবে নিয়ে বলল—"অবিশ্যি সবাই যে নিতেই চাইবে তা নয়, তবে যদিই চায় নিতে তো গুরুজিৎ কত ঠিক করে রেখেছিস রে?"

গুরুজিৎ আবার মুখটা ওদিকে ঘুরিয়ে নিল, বলল, "পনেরো; বাড়াতেও পারি।"

"সাইজ দেখে বাড়বে স্যার, ছোঁড়া আর যাই হোক, কেপ্পন নয় !"
চুপ করে রইল। উদ্দেশ্যটা বুঝে আমিও একটু চুপ করেই রইলাম। বেশ লাগছে, দেখাই যাক না একটু। তারপর কেমন একটু মমতা এসে গেল, বললাম, "এক কাজ কর। একটা উপায় বাতলে দিচ্ছি, পয়সাও লাগবে না এত খোঁজাখুঁজির হুজ্জৎ থেকেও বাঁচবে। একটা বিয়ের কবিতা কোনখান থেকে যোগাড় করে, নাম ধামগুলো বদলে ছাপিয়ে দাও, না হয় আগে ওর কাছে পাঠিয়েই দাও মঞ্জুর হয়ে আসবার জন্যে, যদি তা-ই চাই। বিয়ের কবিতা তো পথে ঘাটে ছড়ানো রয়েছে আজকাল।"
"চলবে না স্যার। ঐ পথে ঘাটে ছড়ানো থেকেই তো কাল হয়েছে। ঐ দিকে ত্রিশখানা যোগাড় করে রেখেছে কোথা থেকে। যেতেই হবে ধরা পড়ে।"
হেসে ফেলতে হল। হাসতে হাসতে বললাম, "আচ্ছা সেয়ানের পাল্লায় পড়েছ তো তোমরা ?"...কি সিংজী বাঙালী মেয়ের মোহ এখনও কাটে নি তোমার ?"
লজ্জিত হয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিচ্ছিল, সঙ্গী-বাঁ হাতে একটা ঠেলা দিল, মুখটা কানের কাছে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলল, "বের কর, এই বোকা।"



আগাম ধরিয়ে দিতে চায় নাকি !
ছোক্‌রা কতটা কুণ্ঠার সঙ্গে বাঁ দিকের পকেট থেকে একটা গোল পাকানো একসার সাইজের খাতা বের করল, একটা পেন্সিলও ; ওর হাতে দিয়ে মুখটা অল্প ঘুরিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইল। সঙ্গী এ দুটোকে আমার দিকে একটু বাড়িয়ে ধরে বলল, "খুঁজে খুঁজে নাজেহাল হয়ে আমি শেষকালে গুরোকে বললাম—এ কাজের কথা নয়। চল দুজনে মা-র মন্দিরে ধন্না দিয়ে পড়ি, এতোকে—এতো দিচ্ছেন, আর আমাদের একটা কবি জুটিয়ে দিতে পারবেন না ? তা একবার মাহাত্ম্যটা দেখুন স্যার, যেতেও হল না অত দূর, মাঝখানেই জ্বলজ্যান্ত কবি শোভা করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন !—তোর পয় আছে গুরো।·· নিন স্যার ধরুন।···জয় মা ! হুজুরের কলমের ডগায় অধিষ্ঠান হও এসে।

আপনি



মেয়ে সব দিক দিয়েই ভালো, কিন্তু তবুও মেজাজটা হঠাৎ ওরকম উল্টে গেল কেন বলা শক্ত। মাত্র বছর নয়েরটি হোলেও কত দিনের সেই পুরনো কথাটা তো খাটবেই—'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্—'

আজ স্কুলে পুরস্কার বিতরণ ছিল। রীতা তার অনেকগুলি নিয়ে ফিরছে। ক্লাসের প্রথম পুরস্কার, গুড এটেনডেন্স, গুড কনডাক্ট কোনটাই বাদ যায় নি স্কুলে যদি Beauty queen বা সৌন্দর্যরাণীর পুরস্কার থাকত তো ওর হাত থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারত না।

ব্যাপারটা শুনে আপনারা বলবেন—যে-মেয়ে ভব্য-আচরণের জন্য পুরস্কার পেল, তার কিনা আচরণের এই নমুনা। তার উত্তরে এও তো বলা যায়, ভব্য-আচরণ সম্বন্ধে ওর আদর্শের সুরটা খুব উঁচু পর্দায় বাঁধা বলেই অন্যের মধ্যে যেটা অভব্যতা মনে হল ওর, সেটা বরদাস্ত করতে পারল না। আদর্শ গুড্ কনডাক্টের মেয়ের মতো প্রথমটা ভালো কথায় শুধরে দেওয়ারই চেষ্টা করল, যখন দেখল বড্ড বেয়াড়া মানুষ, ভালো কথায় বাগ মানবার নয়, তখন—

যাক্ এটা আমার আন্দাজ মাত্র। যেমন আগেই বলেছি মেয়েছেলের চরিত্র দেবতারাই তার হদিস পান না, কুতঃ মাদৃশঃ এক সামান্য মানুষ!

পুরস্কার নিয়ে স্কুল থেকে ফিরছিল। গায়ে সাদা ও নীল রঙের স্কুল ফ্রক; পায়ে সাদা মোজা, স্ট্রাপ-শু; নীল ফিতের বো-বাঁধা দুটি বেণীর একটি সামনের দিকে, একটি পেছনে; হাতে চামড়ার বেল্টে বাঁধা পুরস্কারের বইগুলি। ও-দিকটা সঙ্গে আরও মেয়ে ছিল, একে-দুয়ে যে-যার বাড়ি চলে গেছে, এখন নিজেদের বাড়ির

কাছাকাছি এসে রীতা একলা !

নিজের মনেই গট গট করে চলে যাচ্ছে নিজের মনের সুর ধরে ; পেছন থেকে কে ডাকল—'খুকি. শোন !"

সুরটা যেন খচ্ করে কেটে গেল। রীতা একবার একটু ঘুরে চেয়েই আবার যেমন চলছিল, এগিয়েই চলল ; জুতার খট্ খটানিটা যেন আর একটু শব্দিল।

"খুকুমনি, তোমায়ই বলছি।"—ডেকেছিল একটি বছর ষোল-সতেরোর ছেলে। এবার স্বরটা আর একটু তুলল, হয়তো একটু কানে-খাটোই ভেবে থাকবে।

রীতা কতকটা স্কুলে ড্রিল করার মতোই ঘুরে দাঁড়াল। রোদে মুখটা রাঙা হয়েই ছিল, আরও খানিকটা রাঙা হয়ে উঠল।

বলল—"বলুন না, শুনছি তো।"

মুখটা বেশ গম্ভীর।

আপনারা বোধ হয় কারণটা আন্দাজ করতে পারেন নি। ন'বছরের একটা মেয়েকে 'খুকি' বলা আভিধানিক-ভাষাগত একটা ভুল নয় ? ক্লাসের প্রথম-পুরস্কার পাওয়া মেয়ের কানে খট্ করে বাজবে না ? বিশেষ করে যখন তাকে টেনেই বলা।

ছেলেটি প্রশ্ন করিল - "গিরীনবাবুর বাড়ি কোনটে বলতে পার তুমি ?"

"পারব না কেন ? পাশেই তো থাকি আমরা।"

"তাহলে তোমার সঙ্গে গেলেই হবে ?"

"হয় কিনা দেখুনই না এসে।"—আবার যেন ড্রিলের কায়দাতেই ঘুরে খট খট করে এগিয়ে চলল।

ছেলেটি পাশাপাশি এসে পড়ল। ফুটফুটে মেয়েটি। কথা কইতে ইচ্ছে করছে, এদিকে কথার ঢঙে একটা বেশ কৌতুকও বোধ করছে।

প্রশ্ন করল—"স্কুল থেকে আসছ ?"

"হ্যাঁ।"

"কোন ক্লাসে পড় ?"

"সিক্সথ্ ক্লাসে।"

"বাঃ, বেশ তো, এইটুকু মেয়ে সিক্স্থ্ ক্লাসে পড়ো !"

এর কোন উত্তর দরকার হয় না ! এগিয়ে চলল দুজনে।

"ওগুলো তোমার পড়বার বই ?"

"না, প্রাইজের।"

"বাঃ, প্রাইজও পেয়েছে এইটুকু মেয়ে ! কোন প্রাইজ ?"

"ফার্স্ট প্রাইজ।"

"তাই নাকি ? একেবারে ফার্স্ট প্রাইজ ! বাঃ বাঃ !"

এরও অবশ্য কোনও উত্তর দরকার হয় না। তবে প্রশংসার একটা লজ্জা বা মিষ্টি হাসি—এটুকু তো আনতেই হয়। একেবারেই কিছু নয় ; সেই গোমড়া মুখ ! বর্ধিত-কৌতুকেই ছেলেটি প্রশ্ন করল—একটু হেসেই করল প্রশ্নটা—"কিন্তু প্রাইজ নিয়ে আসছ

খুকি, বেশ হাসিখুসি ভাব নয় তো?"

এর উত্তর দরকার; কিন্তু দিল না কিছু রীতা; দুজনে এগিয়েই চলল। উত্তর দেবে কি, মুখটা যেন আরও ভার।

"আচ্ছা, আমার উপর রাগ কর নি তো? এত কথা—"

"হ্যাঁ করেছি।"—খট করে ঘুরে দাঁড়াল রীতা—"খুকি, খুকুমণি—তুমি—কেন, 'আপনি' বলতে পারেন না?"

"তোমায় 'আপনি' বলতে হবে!"—ছেলেটিও একেবারে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখে স্পষ্ট একটা কৌতুকের হাসি, একটু ব্যঙ্গও নিশ্চয় লেগে রয়েছে তার সঙ্গে। তবে নির্দোষ ব্যঙ্গই।

"হ্যাঁ, বলবেন 'আপনি'—"

"তোমায়!—আপনি!"

"হ্যাঁ, বলতে হবে—"

বাড়ির সামনে এসে পড়েছে; ঘুরে পা বাড়াল। চালিয়েও দিল পা দুটি।

"ও খুকি, শোন!—আচ্ছা বলব 'আপনি' তোমায়। একবারটি শুধু বলে দাও বাড়িটা কোথায়—তুমি—"

"বলব না।"—চৌকাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল, সামনে একটু ঝুঁকে বলল, "আর আমিও তাহলে এই—তুমি—তুমি—তুমি—তুমি—অসভ্য কোথাকার!"

বাড়িতে তো প্রাইজের ভাবনাও নেই, একবার জিভটা একটু বের করে ঘুরে ভেতরে চলে গেল।

উঠানে পা দিতেই মা জিজ্ঞেস করলেন—"কাকে তুই অসভ্য বললি রে?"

মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে! সতর্কই থাকতে হয় সবাইকে।

কোন উত্তর দিল না রীতা। গতিটা দ্রুত করে দিয়ে একেবারে ছুটতে ছুটতে ঘরে গিয়ে হাতের বই-বাঁধা বেল্টটা ছুঁড়ে ফেলে বিছানায় আছড়ে পড়ল। তারপরেই কান্না। কি করে বলি, কেন? রাগ তবু কিছু কিছু বোঝা যায়, কান্না তো একেবারেই জটিল বস্তু, বিশেষ করে মেয়েদের।

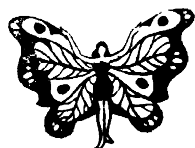
হয়তো প্রাইজ পাওয়ার সম্মানের পাশে-পাশেই এই হেয়-জ্ঞানটুকু বড় বেশী করে বুকে বেজেছে। কিম্বা একেবারেই উল্টো কিছু হতে পারে আবার, অর্থাৎ অনুশোচনা, গুড্ কন্ডাক্টের মর্যাদাটা তো রক্ষা করতে পারল না শেষ পর্যন্ত।

সমস্ত রহস্যটুকু পরিষ্কার হোল সন্ধ্যার পর যখন মা আর বৌদিদি গিরীনবাবুর বাড়ি বেড়াতে গেলেন। বাড়িটা খান-চার বাড়ির পরেই। নাতির অন্ন-প্রাশনে গিরীনবাবুর বোনের আসবার কথা ছিল কলকাতা থেকে; তিনি আসতে পারেন নি। শুধু ছেলে উৎপল এসেছে।

উৎপল একটি মজার গল্পও করেছে। আগে কখনও আসে নি তো। একটি বছর আট-নয়েকের মেয়ে রাস্তা দিয়ে আসছিল স্কুল থেকে প্রাইজ নিয়ে, তাকে জিজ্ঞেস করে বাড়িটার কথা, ইত্যাদি ইত্যাদি। মেয়েটি যে কে তা তো আর ওঁদের বুঝে নিতে

দেরি হয় নি।
খুব একটা হাসি পড়ে গেল উৎসবের ভরা বাড়িতে।

কথাটা রেখেছিল উৎপল। সাত বছর পরে।
সাত বছরে অনেক কিছু ঘটে গেছে। তার সংক্ষিপ্তসার—
ওদিকে বর হিসাবে উৎপলকে এবং এদিকে বধূ হিসাবে রীতাকে জীইয়ে রাখা হয়েছে, এবং 'আপনি—তুমি'র অম্ল মধুর কাহিনীটি বর্ণিত হয়ে মাঝে মাঝে দুই বাড়ির বাতাসটি হাস্য-চপল করে তুলেছে।
বিবাহটাও যথাবিধি হয়ে গেল।
ফুলশয্যাও এসে গেল, সারা জীবনের জন্যে মাধুর্য সঞ্চয় করে রাখবার একটি রাত, সবাই চায় এটিকে বিশিষ্ট করে আর সব রাতের থেকেই আলাদা করে রাখতে। উৎপলও চায়। বৌভাতের কাজের মধ্যে হাত পা খুবই ব্যস্ত রয়েছে; কিন্তু মনটা একটি কেন্দ্রেই হয়ে আছে স্থির, অচঞ্চল—কি করলে আজকের রাতটি আর সব রাতের সাধারণত্বের মধ্যে মিশে না যায়। বার দুই অতিশয় কর্মব্যস্ততার অতিমাত্র ভুলে ঢুকে পড়ল ঘরটায়, রীতাকে যেখানে পুষ্প-সজ্জায় সাজানো হচ্ছে। ঘর কাঁপিয়ে মেয়েদের তরল হাসি উঠল, আরও সব কথাও—থাক্, এইটুকু সঞ্চিতই হয়ে রইল।



তারপর ভাবতে ভাবতে পরম মুহূর্ত ক'টির জন্যও একটা ঠিক করে ফেলল। হয়েছে; সাত বছর আগের সেই প্রথম পরিচয়ের দিনটি এনে ফেলতে হবে আগে। আর সবাই আরম্ভ করে অন্য রকমে, ও আরম্ভ করবে কৌতুক-রস দিয়ে। প্রথমেই সেই দুর্বিনীতা নবমী রীতাকে আজকের ষোড়শী রীতার সঙ্গে দেবে মিলিয়ে। একটি সলজ্জ হাসি উঠবে ছলছলিয়ে, চেপেও থাকতে পারবে না রীতা।
ওদের জীবনের আজকের নাটকের প্রথম অংকটি হবে প্রহসন।
আজকের যে রাজা সে নতজানু হয়ে সেদিনকার আদেশ পালন করে বলবে—"মহারাণী আপনি আপনার দীনতম প্রজাকে—"

বৌভাতের উৎসবটা অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। সজ্জিত গন্ধমদির কক্ষে একটি কৌচে বসে ভাষাটা মনে মনে রপ্ত করে নিচ্ছিল উৎপল। রীতা ধীরে ধীরে এসে প্রবেশ করল।

এক মুহূর্তেই অত আয়াস করে রচিত তরলতা যেন বাষ্প হয়ে কোথায় গেল মিলিয়ে।
—এ যে অপূর্ব! পা থেকে নিয়ে মাথা পর্যন্ত বিচিত্র পুষ্পাভরণে এ যে সত্যই মহারাণী! এর সামনে অত লঘুতা সম্ভব কি করে?
কিন্তু এটা তো ক্ষণিকের আত্ম-বিস্মরণ, আবার তখনি সামলে নিয়ে প্রস্তুত হলো। দরজাটা দিয়ে এগিয়ে এসেছে রীতা।
এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল উৎপল। মুখে একটা কৌতুকের হাসিও টেনে আনবার চেষ্টা করল। শুরু করল—"মহারাণী, আপনি আপনার দীনতম প্রজাকে একদিন যে আদেশ করে ছিলেন—"
কিন্তু হোল না; হলে বরাবর ফার্স্ট-প্রাইজ-পাওয়া মেয়ে রীতা ধরেই ফেলত। নিজেও বোধ হয় সাথী হয়ে যেত এই প্রহসনে, অরসিকা তো নয়, অপরিচিতাও নয়।
কিন্তু হোল না, সমস্ত পরিবেশের অনমনীয় গাম্ভীর্যটা কি করে মিশেই গেছে কৌতুকের সঙ্গে, রসে খাদ মিশে গেছে। এগিয়ে আসছিল রীতা, থমকে দাঁড়িয়ে বলল—"একি! আপনি আমাকে 'আপনি' বলে—"
"তাই তো ঠিক রাণী! আপনিই আমাকে বরং সে দিনকার মতন 'তুমি' বলে—"
বাইরে শাঁখ বেজে উঠল; তার সঙ্গে কত কণ্ঠে যে কল-হাসি!
প্রাণপণে আবার কৌতুক রসটাকে ফিরিয়ে প্রহসনটাকে আবার দাঁড় করাবারই চেষ্টা করেছিল উৎপল; বিজলী-বাতির সুইচ টিপে আপাততঃ ক্ষিপ্রহস্তে যবনিকা নামিয়ে দিতে হোল।

মোতির ফল



রাত্রি প্রায় এগারোটা। হারাণ চক্রবর্তী ক্রুদ্ধভাবে চটির আওয়াজ করিতে করিতে হন্ হন্ করিয়া বাইরের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বাইরের বারান্দায় বাল্যবন্ধু রমেশ গাঙ্গুলী আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া রাগটা সপ্তমে চড়িয়া উঠিল। হাত নাড়িয়া বলিলেন, "নাও, এখন সামলাও! এই তোমায় বলে রাখছি রমেশ – কোনদিন একটা অপঘাত হয়ে এরা আমার ফাঁসি কাঠে যদি না লটকায় তো।"

রমেশ গাঙ্গুলী বন্ধুর ধাত চেনেন, ধীরভাবে বললেন, "কি ব্যাপারটাই শুনি না আগে···"

"ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু!···ও নয় এক ফোঁটা একটা মেয়ে—না বুঝে বলেছে একটা কথা। কিন্তু তুই তো একটা জোয়ান মদ্দ—মেডিকেল কলেজে ফিফ্থ ইয়ারে পড়ছিস, বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েছে, আজ বাদে কাল রোজগার করতে বেরুবি—তুই কি বলে ওর কথায় গেলি নাচতে? যদি হাড়গোড় ভাঙা "দ" হয়ে পড়তিস্···চুলোয় যাক্, ধরু যদি গিয়ে তার লাঠিটা হাঁকড়েই বসতো?···"

গাঙ্গুলী মশাই বলিলেন, "হয়েছে কি? ব্যাপারটা একটু ভেঙেই বল না—"

ভাঙিয়া বলিলে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়।—

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া এতগুলি কথা বলা হইল সে হারাণ চক্রবর্তীর ভাইপো পরেশ নাথ। ছেলেটির বুদ্ধিশুদ্ধি কতটা হইয়াছে বলা যায় না, তবে মেডিকেল কলেজের পঞ্চমবার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে একথা ঠিক। মাস পাঁচেক হইল বিবাহ হইয়াছে, সাতদিন হইল বধূ শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছে।

বধূটি সত্যই একটু ছেলেমানুষ ; তাহার উপর বাড়ি অজ পাড়াগাঁয়ে। যাহার নিজের ফিফ্‌থ্‌ ইয়ারে পড়ার উপযোগী বয়স হইয়াছে এবং ফিফ্‌থ্‌ ইয়ার পর্যন্ত পড়ার জন্য নানারকম ভালোমন্দ অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহার মাত্র প্রায় পুতুল-খেলার উপযোগী বয়স আর অভিজ্ঞতার স্ত্রী হওয়া একটা সংকট অবস্থা। পরেশনাথ কি করিয়া নববধূর মন পাইবে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এসেন্স, পাউডার, রুজ, ফিতা, সাবান প্রভৃতিতে কয়েকটি বাক্স বোঝাই হইয়া গিয়াছে—মন যে ভেজে নাই এমন নয়—ছেলেমানুষ হইলেও মেয়েমানুষই তো ? কিন্তু স্বামীরা যে গূঢ় শক্তিতে বুঝিতে পারে সেই শক্তি দ্বারা পরেশনাথ বুঝিতেছে—কোথায় যেন কি একটা ফাঁক রহিয়া গেছে এখনও যে জিনিসটির জন্য আরাধনা, বধূর কাছ থেকে ঠিক সেই জিনিসটি পাওয়া যাইতেছে না। বিপদ্‌ এই যে, জিনিসটা যে কি, সেটা নিজেও বুঝতে পারিতেছে না, তবে একটা অভাব। বধূকে যে বলিবে, একটা নির্দিষ্ট কিছু বলিতে হইবে তো ? তাহাকে সব রকম ভাবেই পাইতেছে, অথচ কোথায় একটু গলদ থাকিয়া যাইতেছে খুলিয়া বলা চাই তো ?

একবার মনে হইল তাহার ভাষার অভাবে এই রকম অবস্থা দাঁড়াইয়াছে ; বোধ হয় জানে কি অভাব, কিন্তু একটা সংজ্ঞা দিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছে না বলিয়াই এই আকুলি বিকুলি।·· মেডিকেল কলেজ, শুধু চেরা-ফাড়া করিয়াই কাটাইল কিনা !

কিছু খুব আধুনিক নভেল আর কবিতার বই কিনিয়া পড়িয়া ফেলিল। যখন কিছু ভাব এবং ভাষা সংগ্রহ হইল, বধূকে ভাব-ভাষা দিয়াই তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিল একটা রাত।

বলিল, পলা (মেয়েটির নাম উৎপলা), তোমার মনের বেদনা হয়তো বুঝিতে পারি, হয়তো পারি না, কিন্তু যদি নাই পারি বুঝতে তো তার জন্যে কি যে উদাসী ব্যাথার বেদনে নিতুই তোমার ধ্যানে তোমার ধারণায় আনমনা হয়ে নিত্যকার সব কাজ থেকেই আপনাকে আড়াল করে রেখে এই হাসি-কান্নার ধূপ-ছায়ার সুর দিয়ে গড়া সংসারের মধ্যে শুধু মনের বেদনাকেই ব্যাথার সাথী করে হতাশ হওয়ায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে বেড়াতে বেড়াতে নিজের হারিয়ে যাওয়া মনকে পথ ভুলে যাওয়া পথিকের মত···"

কতকটা খেই হারাইয়া ফেলায় এবং কতকটা বধূকে টুস্‌কি দিয়া হাই তুলিতে দেখিয়া নিরাশ হইয়া থামিয়া গেল। বই যেগুলি কিনিয়া আনিয়াছিল তাহার প্রায় অর্ধেকগুলি পড়িতে এখনও বাকি, কিছু তবু লোকসান সহিয়া ফিরাইয়া দিয়া আসিল।

এটা পঞ্চম দিনের ইতিহাস।

কিন্তু রোখ চাপিয়া গেল এবং আধুনিক ছাড়িয়া একেবারে পুরাতন পথ অবলম্বন করিল—বেশ একটু গ্রাম্যতা মিশাইয়া। রাত্রে বধূকে বলিল, "তোমার আমাকে পছন্দ হয়নি ; যাকে ভালো লাগে না তার চলন পর্যন্ত বাঁকা ঠেকে, তো তার দেওয়া এসেন্স সাবানে কি করবে ?—বেশ, আমায় যদি মন্দই লাগে তো···"

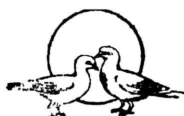
বধূ একটু বিমূঢ়ভাবে ধীরে ধীরে বলিল, "মন্দ লাগেনা তো···"

পরেশনাথের ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। ছয়টা দিনের এত সাধনা, এত

তপস্যার পর স্ত্রীর কাছে এই পুরস্কার?—"মন্দ লাগে না তোমাকে!" যখন আশা করিয়া আছে যে মিলনের উন্মাদনায় ভাষা উচ্ছাসে মুখর হইয়া উঠিয়া নিজের প্রকাশের দীনতায় মৌন হইয়া যাইবে—তখন শুধু ঐটুকু?—"মন্দ লাগে না তো!"...লোকে একটা ভাল তরকারি খাইয়াও যে এর চেয়ে বড় করিয়া প্রশংসা করে। ভালো লাগা আর মন্দ না লাগার মধ্যেও যে কতটা তফাৎ সেটুকু বুঝিল না এই মূঢ়া বালিকা? কি নিদারুণ অবস্থা!

পরেশনাথ মরিয়া হইয়া উঠিল, বলিল, "বেশ, আমার জন্মজন্মের পুণ্যফল যে আমার তোমার মন্দ লাগে না—সত্যিই তো আমার মধ্যে ভালো লাগবার কি আছে? আমি সুন্দরও নয়, কবিত্বও নেই আমার মধ্যে—মরা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করি—আমায় লোকের ভালো লাগবে কি নিয়ে?"

বধূ কতকটা কৌতূহলের সহিত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া শুনিতেছিল, স্বামীর বুকে একটু লুকাইয়া বলিল, "বললাম তো ভালো লাগে...তুমি বড্ড অভিমানী!"



স্বামী যেন হাতে স্বর্গ পাইল, অন্তত স্বর্গের কাছাকাছি একটা কিছু। একেবারে মর্মের ক্ষুধা না মিটাইলেও, এতদিন পরে বধূ দুইটা কথা বলিল যাহাতে দাম্পত্যরসের একটু আভাস আছে, দরদের একটু লেশ আছে, যাহার জন্য জন্ম জন্ম সাধনা করা চলে।

বধূকে আদরে আরও টানিয়া লইয়া বলিল, "না, আমার তো অভিমান হ'তে নেই!—কি কষ্টে যে আমার দিন কাটছে তা আমি জানি আর অন্তর্যামীই জানেন..." বোধ হয় মুখটা লুকানো আছে বলিয়াই বধূ বলিল, "আহা!—আমি যেন খুব ভালো আছি!"

পরেশনাথের নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস হইতেছিল না—এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত! স্বপ্ন না সত্য?

ব্যাকুলভাবে বধূকে আরও কাছে টানিয়া পরেশনাথ বলিল, "কেন পলা? আমি ভালো না থাকলে তুমিও ভালো থাকবে না কেন? আমি তোমায় চিরদিন বুকে করে আগলে থাকব পলা; সংসারের সব ঝঞ্ঝা, সব আঘাত আমার ওপর দিয়ে যাবে, তোমার গায়ে তো আমি একটু আঁচড় লাগতে দেব না। তোমার মুখের হাসিটা বজায় রাখাই তো, আমার জীবনের সব চেয়ে বড় ব্রত। আমি তার জন্যে সব সইব পলা, আমার মুখে কষ্টের ছায়া দেখলে যদি তোমার মুখের হাসিটি মিলিয়ে যায় তো সব কষ্ট তুমি হাসি মুখেই সইব পলা। শুধু একটি জিনিস আমি সইতে পারবনা।—তুমি মুখ ভার করে থেকনা; এ মুখখানি অন্ধকার দেখলে আমি পৃথিবী অন্ধকার দেখি যে!—আমি

বেশ বুঝছি তোমার একটা কিছু অভাব হয়েছে—এখানে আর কাউকে বলা বোধহয় চলবে না ; কিন্তু আমাকেও বলছ না—কী যে হচ্ছে আমার মনে, কি করে যে দিন কাটছে আমার !…"

"বড্ড গরম হচ্ছে"…বলিয়া বধূ মুখটা বাহির করিয়া লইল। একটু চুপ করিয়া রহিল দুজনে। তাহার পর পরেশনাথ বধূর পিঠে হাত দিয়া বলিল, "বলো আমার পলা, কী চাও তুমি ; কি করতে বলো আমায় তোমার জন্যে ? বলো পলা,—তোমার সেবা করবার জন্যে আমি ঘুরে মরছি, অথচ…

বধূ নিরুত্তর। চরমে আসিয়া পরেশনাথ আর হাল ছাড়িল না। বধূর হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আছে কোন একটা কথা ; আমায় বলতেই হবে পলা, আমার দিব্যি রইলো, বলো, আমার মাথা খাও…"

বধূ মুখটা গুঁজিয়া একটু রাগিয়াই বলিল, "অমনি দিব্যি দেওয়া হ'ল…সে তুমি পারবে না।"

পরেশনাথ হাতটা আরও চাপিয়া ধরিল, বলিল, "নিশ্চয় পারব পলা, বলে দেখ বরং ; তোমার জন্যে কি না করতে পারি ?"

বধূ আরও গুটিসুটি মারিয়া চুপ করিয়া রহিল এবং আবার তাগাদা হইলে পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া উল্টা দিকে মুখ করিয়া শুইল। স্বামী আগাইয়া গিয়া কনুইয়ের উপর ভর করিয়া প্রশ্ন করিল, "বলবে না ? দিব্যি দিলাম, তবুও ? বেশ !"

বধূ দুই হাতে মুখটা ঢাকিয়া বলিল, "খিড়কির দোরের কাছে যা আছে।"

পরেশনাথ প্রথমটা বিস্ময়ে একেবারে সোজা হইয়া বসিল—এ ধরণের কথা সে একেবারেই প্রত্যাশা করে নাই। মনে মনে খিড়কির দোরের কাছাকাছি সমস্তটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিল। খিড়কির পুকুর, তাহার পাশে একটা ছাইগাদা আর পাঁচমেশালি কতকগুলা গাছের জঙ্গল ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাইল না। ছোট একটা টিনের চালার মধ্যে একটা ভেঁড়া বাঁধা থাকে, কাকার শখ ; বধূ কি ইঙ্গিতে একটা বিদ্রূপ করিল ? তা যদি করিয়া থাকে সেটাও তো একটা মস্ত লাভ !

বলিল, "একটা ভেড়া বাঁধা আছে পলা ; তা তোমার যদি ইচ্ছা হয় তুমিও একটা পুষতে পার। ধরা তো দিয়েই আছে।"—একটু হাসিল ?

বধূ অবশ্য ঠাট্টা বুঝিল না। সেই ভাবেই একটু যেন অধৈর্য হইয়া বলিল, "আহা একটা যেন বিলিতি আমড়ার গাছ নেই।…তুমি একটু সরো বাপু, খালি ঘেঁসে আসছ।"

আছে একটা ঝাঁকড়া-ঝোঁকড়া গোছের আমড়া গাছ। পরেশনাথ একটু বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করিল, "কিছু দেখেছ সেখানে ? ভয় করে ?"

বধূ মুখ গুঁজিয়াই বলিল, "তাতে আমড়া পাকেনি যেন !…সরো তুমি, গরম হচ্ছে।" পরেশনাথের যেন ধড়ে প্রাণ আসিল এতদিন পরে। হাসিয়া বলিল, "ও ! তাই খেতে সাধ হয়েছে ! বলতে হয়,—বেশ, পাড়িয়ে দেবো কাল।"

বধূ ভীতভাবে বলিয়া উঠিল, "না, না, দিব্যি রইল আমার। আমার যেন লজ্জা

করে না!"

এতদরে অগ্রসর হইয়া আর এক সমস্যা। পাড়িবার ব্যবস্থা করিলে লজ্জা, যদি না করা যায় তো সামান্য দুইটি আমড়ার জন্যে একটা অতৃপ্তির বেদনা।

পরেশনাথ মনে মনে সমস্যার একটা কুল পাইবার চেষ্টা করিতেছিল বধূ বলিল, "কেউ যদি এরকম অন্ধকার রাত্তিরে চুপি চুপি গিয়ে…"

পরেশনাথ যেন অন্ধকারে একটু আলো দেখিতে পাইল। বধূকে বেষ্টন করিয়া বলিল, "আমি যাই পলা?"

বধূ বলিয়া উঠিল, "না, না, আমি তাই বললাম নাকি?"

সামান্য একটু চুপ দিয়া বলিল, "আর যদি পিছলে, কি গাছের ডালটাল ভেঙে পড়ে যাও—তখন?"

পরেশনাথের মনের তখন এমন অবস্থা যে সামান্য হাত-পায়ের উপর আর মমতা নাই। বলিল, "তোমার জন্যে না হয় লাগলোই একটু আঘাত, পলা। শোনোনি ছেলেবেলায় —কেশবতী কন্যার জন্যে রাজকুমার সোনার গাছ থেকে মোতীর ফল নিয়ে আসতে কি নাকালটাই না সহ্য করত? সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে, কত বিপদ কাটিয়ে… আমার কেশবতীর যদি হয়েছেই একটা সাধ…"

বধূ বলিল, "না, কাজ নেই; আমার ভয় করে বাপু!"

পরেশনাথ তাহাকে আর একবার আদর করিয়া বলিল, "কিছু ভয় নেই তোমার, পলা। তা' ভিন্ন গাছে ওঠবার দরকারও হবে না; পাঁচিলে উঠলেই চলবে, অনেক ডাল এসে পড়েছে।"

মুখটা নামাইয়া বলিল, "আমড়া পেলে আমার সঙ্গে খুব ভাব হবে তো?"

বধূর ভয়টা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল, বলিল, "না বাপু, আমার সত্যি বড্ড ভয় করছে, পড়ে যেয়ো না যেন।…দাঁড়াও, আমার বাক্সয় মা ঠাকুরের ফুল দিয়ে দিয়েছিলেন— খুঁটে বেঁধে দিই।"

অক্ষয় কবচ ধারণ করিতে করিতে পরেশনাথ বলিল, "এ কিন্তু সেই পয়সায় দশটা আমড়া নয়; এর একটার দাম অনেক, তা বলে দিচ্ছি।"

বধূ একটু হাসিয়া বলিল, "তা দোবখ'ন আমার মুখ-দেখানি টাকা আছে।"

পরেশনাথ বলিল, "ঐ দাম নাকি?"

তাহার পর যে দামের কথা বলিয়াছিল তাহার কিছু আগাম লইয়া ধীরে ধীরে কবাট খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

পাঁচিলে উঠিয়া কাজ হইল না; ডাল আছে, কিন্তু আমড়া নাই,—বধূর খালি একলার রসনা নয় তো! গাছে উঠিতে হইল। জানা গাছ, অবশ্য অজানা হইলেও কিছু ইতর বিশেষ হইত না—তবে কতকটা সুবিধা হইল।

আমড়ার থোলো ধরা গেল একটা— কিন্তু তাহার মধ্যে কোনটে পাকা, কোনটে ডাঁসা, কোনটে কাঁচা ঠিক বোঝা যাইতেছে না। কোমর বাঁধিয়া একটা কোঁচড়ের মতো করিয়া রাখিয়াছিল, সমস্ত থোলোটা তুলিয়া তুলিয়া তাহার মধ্যে সংগ্রহ করিল। আর একটু

উঠিয়া আরও কতকগুলো তুলিল, এমন সময় ভিতরকার ভারে ও চাপে কোঁচরের খুঁট দুইটা আল্‌গা হইয়া গিয়া সমস্ত আমড়া একেবারে নিচে…

ঠিক নিচে বলিলেও ভুল বলা হবে, ভেড়ার কুঠুরির টিনের ছাদের উপর। চড়চড় চড়চড় করিয়া সহসা একটা উৎকট আওয়াজ হইয়া বাড়ির সবাইকে জাগাইয়া দিল। ভেড়ার আর্তনাদ এই কার্যে সহায়তা করিল।

হারাণ চক্রবর্তী হাঁক দিলেন, "কিসের শব্দ! রিষে দেখ্‌তো কিসের শব্দ হ'ল।"

হৃষীকেশ বাড়ির চাকর, বলিল, "আমড়া পড়ল, কর্তা মশাই!"

"অত আমড়া—হঠাৎ কোথাও কিছু নেই!…তুই একবার ঘুরে দেখে আয়।"

সমস্ত দিনের পর খাটিয়া-খুটিয়া হৃষীকেশ এই সময়টা একটু মৌতাকে থাকে; না উঠিয়া একটু পরে ঢুলিতে ঢুলিতে বলিল, "দেখে এলাম চারিদিক ঘুরে, আমড়াই কর্তাঠাকুর। হনুমানে তুলেছে নিশ্চয়, আম মনে করে, তারপর টক্‌ আমড়া দেখে—রেগে ঐ করে…"

একটি বয়স্কা নারীকণ্ঠের আওয়াজ হইল, "তুমি উঠে একটু তাড়া দাও রিষু। এবারে তেঁতুল পাওয়া গেল না, ঐ আমড়া ক'টি ভরসা, শুনছ?"

বধূ দারুণ উৎকণ্ঠায় নিজের ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পরেশনাথ তাড়াতাড়ি নামিতে গিয়া একটা মাঝারি গোছের ডাল কড় কড় করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কাপড়টাও ছিঁড়িয়া গিয়া খানিকটা ঝল্‌ঝল্‌ করিয়া ঝুলিতে লাগিল। তাগাদা হইল—"রিষে উঠ্‌লি?"

হৃষীকেশকে উঠিতে হইল, কিন্তু আমড়াতলায় আসিয়া তাহার মৌতাত ছুটিয়া যাইবার উপক্রম হইল।…ল্যাজ ঝুলছে; হনুমানই বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন কাপড়-পরা!…কাপড়-পরা হনুমান!—মাথায় যতটুকু শক্তি ছিল তাই দিয়া ভাবিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর নেশাটা হঠাৎ ছুটিয়া গেল, ডাকিল, "কে?"

সঙ্গে সঙ্গেই ডাকিল, "কর্তাবাবু; শীগ্‌গির আসুন, কোন্‌ সুমুন্দি দেওয়াল টপকে পড়বে বলে গাছে উঠেছে! দাদাঠাকুর, অ দাদাঠাকুর!…নশীরাম, জেগে আছ হে? একবার স্বরূপ বাগ্দীকে হাঁক দাও। শীগ্‌গির এস…ততক্ষণ স্যাঙাৎকে আমড়া খাওয়াচ্ছি।"

এক মুহূর্তের মধ্যেই বাড়িটাতে একটা হৈ হৈ পড়িয়া গেল।

হারাণ চক্রবর্তী ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ও খড়ম খট খট করিতে করতে ছুটিয়া আসিলেন।

পরেশনাথের দাদা অপরেশ একটা গুপ্তী লইয়া উপস্থিত হইল।…মেয়েদের শঙ্কিত কলরবে, ছেলেদের ভীত কান্নায় বাড়িটা একেবারে জাগিয়া উঠিল। কলাবাগানের ওদিক থেকে নশীরাম ডাকিল, "কি খবর গো রিষি!" হৃষীকেশ বলিল, "খবর খুব খারাপ নয়, আগলে রেখেছি আমরা, তুমি এস একবার শড়কিটা নিয়ে…একটা হাঁক দিলে স্বরূপ বাগদীকে?"

পরেশের দাদা বলিল, "কে উঠেছিস নেমে আয়! নেমে আয়, না হ'লে ছুঁড়লাম এই হাতের গুপ্তী…"

হারাণ চক্রবর্তী একটু ভীতু প্রকৃতির লোক, একটু দূরেই ছিলেন, বলিলেন, "পরেশ ওপরতলা থেকে নামে না কেন? তার কাছে তো রিভলভারটা রয়েছে…অ, পরেশ!"

পরেশ তখন গাছ থেকে নামিতেছে; ওপরতলা থেকে নামিবে কি করিয়া? ছেঁড়া কাপড়ের লাঙ্গুলটি দুলাইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া মাটি স্পর্শ করিল, এবং ঘাড় নিচু করিয়া গাছের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

"তুই!"

"পরেশ নাকি? গাছে!"

হৃষীকেশ বলিল, "তাও রাত দুপুরে! কি কাণ্ডটা হ'ত এখুনি!"

কলাবাগানের ওধার থেকে নশীরাম প্রশ্ন করিল, "সব যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল রে রিষি? আমি যাচ্ছি যে গেঁথে নামাবার জন্যে…"

হারাণ চক্রবর্তী উত্তর দিলেন, বলিলেন, "আসতে হবে না নশু, আমাদের পরেশ বাবুর শখ…"

এমন সময় গিন্নী উপর থেকে হন্তদন্ত হইয়া নামিয়া আসিলেন। হারাণ চক্রবর্তীর কাছে গিয়া একটা চাপা ভর্ৎসনার সহিত হাত নাড়িয়া বলিলেন, "আর ঘরের কেচ্ছা বাইরের লোকের কাছে শোনাতে হবে না রাত দুপুরে! ঐ শুনবে চলো পাগলের মতো— 'না, আর আমড়া খাবো না—না, আমড়া খাবো না'—বলতে বলতে বউটা বোধ হয় অজ্ঞান হইয়া পড়ল এতক্ষণ…রিষে, নশু ওদের বলে দে একটা হনুমান ছিল —এমন কিছু মিথ্যেও বলা হবে না।… মরি!—দেখতে আর কিছু বাকি রইল না!"

কোকিল ডেকেছিল



রোজকার মতো সকালে পড়তে এসে নিখিল দেখল একটি চৌদ্দ-পনরো বছরের মেয়ে সেকেণ্ড মাস্টার অভয়পদ বাবুর গা ঘেঁসে একটু হেলান দিয়ে বসে গল্প করছে। নিখিলকে দরজার কাছে দেখেই উঠে পড়তে যাচ্ছিল তাড়াতাড়ি, অভয়পদ ডান হাতটা চেপে ধরে বললেন—"উঠতে হবে না, বোস।" নিখিলের দিকে চেয়ে বললেন—"এই মেয়েটির সম্বন্ধেই তোমায় একবার বলেছিলুম নিখিল—মনে আছে নিশ্চয় ?"
কে কবে কোন্ মেয়ের কথা বলেছে—বিশেষ ক'রে সেকেণ্ড-মাস্টারের মত কড়া লোক—সে কথা না মনে রাখাই নিশ্চয় ভালো ছেলের লক্ষণ। নিখিল চোখ দুটি উপরে তুলল।
"মনে পড়ছে না ? এ হচ্ছে নিভা, আমার ভাগনী, কাল ওর বাপ নিয়ে এল।"
"ও।—বাপ ?" অস্বস্তির সঙ্গে প্রশ্নটা করে চেয়ে রইল নিখিল।
"হ্যাঁ, আমার ভগ্নীপতি হেমন্ত। বোস'না তুমি। না, না, চেয়ারে কেন ? এইখানেই বোস মাদুরে। পড়বে তো—এই দ্যাখো, তুমিও এত লজ্জা করলে কি করতে আনানো ওকে এখানে ? বলেছি তোমায় ওর কথা, ভুলে গেছ। নিভা হচ্ছে এক নম্বরের স্কলার। ওদের সেখানে মেয়েদের আলাদা স্কুল নেই তো—মিডল স্কুলও নয়—ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গেই পড়ে। মাসের মধ্যে যদি পাঁচ দিন গেল তো প'চিশ দিন গেলই না। ঐ যে ছেলেদের সঙ্গে এক রুমে বসতে হবে—মেয়েদের আলাদাই বেঞ্চ, কিন্তু তাতে কি হয় ?—"
মুঠোর মধ্যে হাতটা গরম হয়ে উঠেছে নিভার, ফিরে দেখলেন মুখটাও একেবারে সিঁদুর

বর্ণ', হেসে মুঠো আলগা করে দিয়ে বললেন—"আচ্ছা যা, কিন্তু এ চলবে না বলে দিলুম।"

নিভা চলে গেলে নিখিলের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন—"বাঁচল।"

বাঁচল নিখিলও। এতক্ষণ পরে সহজভাবে একটু হেসে বলতে পারল—"ভীষণ লাজুক দেখছি।"

"ভীষণ—সে তুমি আন্দাজ করতে পারবে না। ঐ যে বললুম, মাসের মধ্যে পাঁচটা দিন স্কুলে গেলতো বলতে হবে খুব গেল। কিন্তু খুব শার্প মেয়ে তো—হ্যাঁ, আশ্চর্য রকম বুদ্ধিমতী, একরকম বলতে গেলে বাড়িতে পড়ে পড়েই পরীক্ষা দিয়ে একটা স্কলারশিপ নিলে!"

"তাই না কি?" বেশ সহজভাবেই প্রশ্ন করল নিখিল, অভিমতও দিতে পারল—"কিন্তু দেখে তেমন বোঝা যায় না তো?"

"একসেপ্‌শেনালি শার্প। তুমি ভালো ক'রে দ্যাখোনি বলে বুঝতে পারনি। ভাসা-ভাসা চোখে আবার একটু বোকা-বোকাই দেখায় তো, কিন্তু একটু লক্ষ্য করে দেখলেই দেখবে মাঝে মাঝে একটা ফ্লাশ (Flash), বুদ্ধি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। কিন্তু কাল হোল ঐ লজ্জা—যার জন্যে স্কলারশিপটা আর নেওয়াই হোল না—"

"ব্যাটাছেলেদের দেওয়া ব'লে?"

হেসে উঠলেন অভয়পদ, বললেন—"আরে না, অতটা কি হয় একেবারে যে ব্যাটাছেলের দেওয়া স্কলারশিপেও লজ্জা? শুনলে তো, সেখানে মেয়েদের পড়ার কোন ব্যবস্থা নেই। স্কলারশিপ অ্যাভেল (Avail) করতে হলে তো হাই স্কুল ভিন্ন গতি নেই, কিন্তু যে মেয়ে মিডল্ স্কুলেই মাসে পাঁচটা দিন হাজিরা দিয়েছে কি না দিয়েছে, সে হাই স্কুলের চৌকাঠ মাড়াবে? আর সেখানে অত ঢিলেপনা চলবেও না তো, স্কলারশিপটা মাঠে মারা গেল। বাপ ঠিক করেছিল—বাড়িতে পড়িয়েই ম্যাট্রিক পর্যন্ত নিয়ে যাবে, কিন্তু তার সময় কোথায়? ডেলীপ্যাসেঞ্জারী ক'রে চাকরি, সকালে বেরোয় সন্ধ্যায় ফেরে, রাত্তিরে ঐটুকু যা সময়—নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল মেয়েটা—আমি খেঁচকে খেঁচকে হয়রান হচ্ছি, বছর ঘুরে গেল কোন ফলই হচ্ছে না, শেষকালে এই সেদিন ওর ছোট ভাইয়ের অন্নপ্রাশনে গিয়ে চেপে ধরলাম হেমন্ত আর মালতীকে—না, আমার ওখানে পাঠিয়ে দাও, আমার স্কুলে ভর্তি করে দিই।"

"কিন্তু এও তো হাইস্কুল স্যার।"

কেন যে অমন হঠাৎ ভয় পেয়ে গিয়ে বলল কথাটা, নিখিল নিজেই ঠিক বুঝতে পারল না। একটু বিস্মিত হয়েই থেমে গিয়ে অভয়পদ প্রশ্ন করিলেন—"কিন্তু সে জন্যে তোমার অত অস্বস্তি যে?"

সঙ্গে সঙ্গে একটু হেসে উঠে বললেন—"ও! বুঝেছি। স্কলার, সে না জানি কত বড় একটা বাঘা-ভাল্লুক। আমাদের ক্লাশের নৃপেনকে তাই মনে হোত। কিন্তু এতো তোমাদের ক্লাশে ভর্তি হচ্ছে না। অবশ্য, নিয়ে নেওয়া যেত। সার্টিফিকেট ধরে পারা যায়। কিন্তু ঐ যে একটা বছর বসে রইল, আমি ওটা বাদ দিয়ে দিতেই চাই,

কাঁচাই হয়ে থাকবে তো। তার চেয়ে বরং বাদই থাক না একটা ক্লাস, মেয়েছেলেই তো। তাড়াহুড়ো কিসের এমন ? এরপর তোমার প্রশ্ন রইল—তা ছেলেদের হাইস্কুলে কেন ? তাই না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। ঐ রকম—কি যে বলে—"

"লাজুক। আমি ঠিক করেছি কবিরাজী ধরব এবার।"

"লজ্জার কোন কবিরাজী ওষুধ স্যার—"

"না, না, বড়ি-অনুপান নয়। কবিরাজী প্রিন্সিপ্লে (Principle)-এ চিকিৎসা ধরতে হবে এবার—বিষস্য বিষমৌষধি। ছেলেরা হোল তোমার বিষ, তাদের দেখলেই যত তোমায় ভয় আর লজ্জা, সেই ছেলেদের সঙ্গেই তোমায় এক করে দিচ্ছি দাঁড়াও। বাড়িতে ছেলে, স্কুলে ছেলে, সেখানে যেতে ছেলে, সেখান থেকে আসতে ছেলে, উঠতে ছেলে, বসতে ছেলে—একদণ্ড ছেলে ছাড়া থাকবে তবে তো ছেলেদের লজ্জা আর ভয়। বুঝেছ চিকিৎসাটা এবার ?"

হাঁ করে বিমূঢ়ের মতো শুনছিল নিখিল, প্রশ্নটায় সম্বিত ফিরে পেয়ে আমতা-আমতা করে উত্তর দিল—"আজ্ঞে না—মানে হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি।"

"কি বুঝলে ?"

"মানে—মানে স্যার—একটা মেয়েকে যদি—একটা মেয়েকে যদি—"

"ঠিক বোঝনি, অন্যমনস্ক ছিলে। একটু মন দিয়ে শোন, তুমিই হচ্ছ এর মধ্যে আসল। দু'বেলা পড়তে আস তো ? ও-ও তোমার সঙ্গে একসঙ্গে ব'সে পড়বে, সাইড-বাই-সাইড (Side by Side), তুমি চেয়ারে ও মাদুরে নয়। আমি রইলুম সামনে, যেমন তোমায় পড়াই। এর পর তুমি বাড়ি চলে গেলে, ও-ও খেয়েদেয়ে তৈরি হয়ে রইল, যাওয়ার সময়ে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে, ফেরবার সময় আবার পেঁাছে দিয়ে গেলে। কেমন, ঠিক ওষুধ নয় ? তোমার একটু ঘুর পড়বে, কিন্তু এ না করলে স্রেফ্ লজ্জার জন্যে একটা এমন ব্রিলিয়েন্ট (Brillient) মেয়ের ভবিষ্যৎ একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। আজকালকার একটা ভালো মেয়ের কত স্কোপ (Scope) জীবনে, লজ্জার অত প্রশ্রয় দিলে চলে ?"

নিখিল কপালের ঘাম মুছে ফেলে বলল—"না স্যার।"

ব্যবস্থাটা সেইদিন থেকে চালু করে দিলেন অভয়পদ।

কিন্তু শিবের অসাধ্য রোগ, অভয়পদ কি করবেন ? সবই প্ল্যান অনুযায়ী হয়ে যেতে লাগল, বাড়ি থেকে স্কুল পর্যন্ত, কিন্তু তার মধ্যে লজ্জাটাকে নির্বাসিত করে একটা সহজ সপ্রতিভ ভাব কোনমতেই আনা যাচ্ছে না যেন। পাড়াগাঁয়ের স্কুল, ক্লাসে মাত্র দুটি মেয়ে, ও আর নিখিলেরই এক জ্ঞাতি-ভাগিনী শীলা। দুজনে ক্লাসের একদিকে পাশাপাশি ডেস্কের সামনে বসে থাকে। শীলা মেয়েটি একটু চপল, তায়-গাঁয়েরই মেয়ে, চপলতাকে সংযত করলেও একেবারে মৌন হয়ে বসে থাকতে পারে না। নিভা তার পাশে নীরব হয়েই থাকে এক রকম ; প্রশ্ন নেই মুখে কোন, প্রশ্ন হলে অবশ্য উত্তর আছে, তবে প্রায় অর্ধোচ্চারিত। শিক্ষকেরা বেশী লজ্জায় ফেলতেও চান না ওকে।

কয়্গো উদ্রেকই করে ; তা ভিন্ন উত্তর তো একেবারে নিক্তি ধ'রে নিভুর্ল আর নিক্তি ধরে যথাযথ হবেই। নিতান্ত প্রয়োজন হোল তো যে প্রশ্নের উত্তর ক্লাসের আর কার্র দ্বারা হোল না, সেটা এগ্তে এগ্তে নিভার কাছে গিয়ে পেঁছোল। উত্তরটা দিয়ে দিতে কিন্তু আর সবার মাথাটা যতটা হেঁট হোল, তার চেয়ে নিভার মাথা আরও বেশী করে গেল ঝুঁকে।

শ্ধ্ শীলার দ্ষ্টি পরাভূত ছেলেদের বেশ ঘ্রে এসে ওর ঠোঁটের এক কোণে বাঁকা ছ্রির মতো একটি হাসি উঠে মিলিয়ে গেল। ওই জাতি আর বন্ধ্র কৃতিত্বটা মাঠে মারা যেতে দিল না।

শ্ধ্ চপলতা নয়, মেয়েটির আর এই রকম ছোটখাটো কতকগ্লো দোষ আছে।

স্কুলে এই করে চলল।

পথের ইতিহাস গোড়ার প্ল্যান থেকে একটু অন্য রকম হোল। দ্টো দিন প্ল্যান অন্যায়ীই যাওয়ার পর তৃতীয় দিনে হঠাৎ শীলা এসে উপস্থিত হোল বাড়িতে। অভয়পদ সেকেন্ড মাস্টার হিসেবে স্কুলের দৈনিক পরিচালনায় অনেকগ্লি বিষয়ের চার্জে, তাঁকে আগেই চলে যেতে হয়, শীলা এল উনি চলে যাওয়ার একটু পরেই। এল কোন একটা প্ল্যান অন্যায়ীই আর তার উদ্দেশ্যটা হয়তো শীলাই জানে। নিভা যেন একটু আগে থাকতেই তোয়ের ছিল, ও আসতে বই খাতাগ্লো টেবিল থেকে তুলে নিয়ে বের্তে যাবে, শীলা বলল, "বোস, এত আগে স্কুল ঝাট দিতে যাবে নাকি ? তা ভিন্ন আমি একটু হাঁপিয়েও গেছি— একেবারে উজিয়ে একটু আসতে হয় তো।"

হাঁপাচ্ছিল সে, একটু বিশ্রাম করে নিল।

বেশী দেরি হয়নি নিখিলের আসতে। শীলা চেয়ারে বসে মিনিট কয়েকও বিশ্রাম করতে না করতেই সে উপস্থিত হোল ব্যবস্থা মতো। শীলাকে দেখে একটু চিন্তিত হয়েই দাঁড়িয়ে পড়েছে, শীলা ওকে কিছ্ না বলে নিভাকে বলল—"চল এবার যাই, ওকে না হয় আমিই নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে করে আজ নিখিলদা ?"

আর কিছ্ না বলে অল্প একটু হাসির সঙ্গে ওর সেই বাঁকা ছ্রিটুক্ খাপ থেকে একটু যেন বের করেই আবার ল্কিয়ে ফেলল। তারপর নিভার হাতটা ধরে বেরিয়ে গেল। দিয়েও গেল সঙ্গে করে ওই।

একেবারে সপ্তাহ খানেকের পরে গিয়ে ব্যাপারটা হঠাৎ টের পেয়ে গেলেন অভয়পদ। প্ল্যানের ব্যতিক্রম, তায় শীলার বাড়িটাও একেবারে উল্টা দিকে, স্কুলের সামনে দিয়েই এসে নিয়ে যেতে হয়, আবার ফিরে যেতে হয়, প্র্ব ব্যবস্থাই চাল্ করতে যাচ্ছিলেন, নিখিলই কাতর প্রার্থনা জানাল—"থাকতে দিন স্যার এই। শীলাই এসে নিয়ে যাক না।"

"কেন বলো তো ?" চিন্তিত ভাবেই প্রশ্ন করলেন অভয়পদ।"

"মানে—কথা আর কিছ্ নয়—বড্ড লাজ্ক, পা টেনে টেনে চলে—দ্দিন দেরিই হয়ে গিয়েছিল স্কুলে পেঁছ্তে।"

একটু ভাবলেন অভয়পদ, বললেন—"তা বেশ ! কিন্তু ঠিক একটি মাস ; আজ হোল

কোন্ তারিখ ?"

সে এক মাসের পর আরও কটা মাস কেটে গেছে, পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী নিখিলের সঙ্গেই যাওয়া-আসা করছে নিভা, তবে আসল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ লজ্জা অপসারণের দিকটা কতদূর সফল হয়েছে বলা যায় না। সেই প্রথম দিনের মতো নিখিল সামনে, নিভা হাত চার পাঁচ দূরে মাথাটা হেঁট করে।

সফল যে হচ্ছেই কিম্বা একদিন হবেই, এটা ধরে অভয়পদ নিশ্চিন্তই আছেন, তারই মধ্যে হঠাৎ একদিন কি খেয়াল হতে নিখিলকে প্রশ্ন করে বসলেন।

"কি রকম বুঝছ ? একটু ফ্রি (Free) হয়েছে বলে মনে হয় ?"

"কিছু বুঝতে পারা যাচ্ছে না স্যার।" উত্তর করল নিখিল।

"এই যে এতটা পথ যাওয়া-আসা কর একসঙ্গে, কোন কথা হয় না ?"

"না স্যার।"

"মুখ বুজে থাকে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তার কারণ—তুমিও নিশ্চয় মুখ বুজে থাক। ও মেয়েছেলে গায়ে পড়ে কথা কইবে সেটাও তো ঠিক নয়, বেহায়াপনাই হবে সেটা। চেষ্টা করবে ওকে কথায় টানবার। করনি কখনও চেষ্টা ? যেমন ধরো স্কুলটা কেমন লাগছে, পড়াশোনা হচ্ছে কেমন ; কিম্বা কোন সাবজেক্ট্ নিয়েই আলোচনা করতে করতে এলে দুজনে।"



করেছিল একবার নিখিল একটা সাবজেক্ট বেছে নিয়ে। ছুটির পর অনেকখানি পর্যন্ত কিছু কিছু ছেলে থেকেই যায় সঙ্গে। শেষ দিকে এসে প্রায় ওরা দুটিতেই থাকে বাকি। যেখানটার দুদিকে শুধু টানা মাঠ জিজ্ঞেস করেছিল—"তোমার এই রকম সবুজ ধানের ক্ষেত আর ওপরে নীল আকাশ কেমন লাগে নিভা ?"

নিভা সেই রকম হাত কয়েক পিছনে।

মাথা না ঘুরিয়েই প্রশ্নটা করেছিল, উত্তরটা সেইভাবেই শুনল—"ভালো।"

কয়েক পা গিয়ে আবার প্রশ্ন করল—"আর কোকিলের ডাক ?"

একটা ছাৎ করে শব্দ হতে ঘুরে দ্যাখে, হাতের বই খাতা সব পড়ে গেছে, দাঁড়িয়ে পড়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে নিভা সেইদিকে। এরপর আর সাহস করেনি নিখিল। অভয়পদের প্রশ্নের উত্তরে বলল—"না, করিনি চেষ্টা স্যার !"

"করবে। যেমন ধরো স্কুলটা কেমন লাগছে, পড়াশোনা হচ্ছে কেমন, কিম্বা একটা সাবজেক্ট নিয়েই আলোচনা করতে করতে এলে দুজনে। কিম্বা কোন শিক্ষক বা—আচ্ছা, আমার সম্বন্ধে কিছু বলে তোমায়?—যেমন মামা বড্ড কড়া, কি জেদি, কিম্বা—"

"না স্যার।"

উত্তরটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নটা হঠাৎ যেন আপনি বের হয়ে গেল নিখিলের মুখ থেকে—"আমার সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলে স্যার?"

একটু শংকিত ভাবেই যেন বলল এই রকম মনে হওয়ায় অভয়পদ থেমে গিয়ে একটু কৌতুক-দৃষ্টিতে চেয়ে হেসে বললেন—"তোমার সম্বন্ধে কি বলবে আমায়? গার্জেনী করছ তার নালিশ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার! চায় না তো আপনার ব্যবস্থাটা অথচ এমন সুন্দর ব্যবস্থা—" একটু হাসবার চেষ্টা করেই বলল।

ভেতরকার কথাটা কিন্তু অন্য রকম। কিছুদিন আগেকার কথা। স্কুলের কাজের চাপ পড়লে, বিশেষ করে ছেলেদের অনুশীলন বা পরীক্ষার খাতা বেশী জমে গেলে অভয়পদ এদিকে একটু ঢিলে দিতেন। এখন নিভা এসে পড়ায় পড়ানোর কাজ আরও বেড়ে গেছে, উনি এরকম অবস্থায় পড়লে তাড়াতাড়ি নিখিলকে খানিকটা দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে ওকেই আবার নিভাকে দেখতে বলে ওপরে চলে যান।

নিখিলের সাহায্য দরকার হয় না নিভার বড় একটা, ক্কচিৎ যদি এক-আধটা প্রশ্ন করল কখনও।

একদিন ভুগোল পড়তে পড়তে ম্যাপে একটা জায়গা দেখিয়ে নেওয়ার জন্যে উঠে এল। অভয়পদ না থাকলে তাঁর বিধান অনুযায়ী সাইড-বাই-সাইড বসবার দরকার হয় না, একটু সরে ও'র জায়গাতেই বসে।

নিখিল একটা অংক কষছিল, সামলাতে পাচ্ছিল না বলল, "থামো দিচ্ছি দেখিয়ে।" দেরি হতে লাগল। নিভা হাতে ভর দিয়ে ওর অংক কষা দেখছিল, বলল, "আমি করে দিই? আপনার এইখান থেকে ভুল হয়ে গেছে একটু।"

একটা জায়গা দেখিয়ে দিল। অংকেতে খুব পোক্ত, খুব একটা আগ্রহ থাকে।

নিখিল হ্যাঁ, না কিছুই না বলে যেখান থেকে ভুল হয়েছে সেখানটায় একদৃষ্টে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর যেন নিভার আগের কথা ভুলে গিয়েছিল এইভাবে হঠাৎ ঘাড়টা তুলে বলল, "কি দেখিয়ে দিতে বলছ?"

নিভা ম্যাপের কথাটা বলল আবার।

নিখিল বলল, "দাঁড়াও দেখি। সব ম্যাপে আবার এসব ছোট-খাটো জায়গা দেয় না।" খুব ঝুঁকে দেখতে লাগল। নিভাও স্বাভাবিক আগ্রহবশেই অংকটা আরম্ভ করে দিয়েছিল, নিখিল আড়চোখে যখন দেখল তখন অংক শেষ করে পেন্সিলটা রেখে দিয়েছে। ম্যাপে তর্জনীটা টিপে ধরে বলল, "এই তো।"

একটু যেন বিদ্রূপের সুরেই বলল—"কোথায় খুঁজেছিল তুমি?" তারপর কলমটা

তুলে নিয়ে নিজের খাতার দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল—"অংকটা কে কষে ফেলল ?"

"আমি"—কতকটা অপরাধীর মতোই স্তিমিত কণ্ঠে উত্তর করল নিভা।

"কেন, আমি বুঝি পারতুম না ?"—একটু যেন বিরক্তির সহিতই কথাটা ব'লে নিখিল অন্য অংকটায় হাত দিল। এটা আরও গোড়ার দিকে ভুল থেকে যাওয়ায় এগুতে পারছিল না, ক্রমাগতই কাটাকুটি করছিল, একবার চোখ তুলে দেখল নিভা এই দিকে দৃষ্টি ফেলে বসে আছে! কান দু'টো হঠাৎ গরম হয়ে উঠল নিখিলের। আবার চেষ্টা করতে গিয়ে আরও বেশি কাটাকাটি হওয়ায় কান আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় কলমটা খাতায় রেখে দিয়ে বলল,—"এটা দ্যাখো তো একবার। একটা এসে (Essay) লিখতে দিয়েছেন হেডমাস্টার, কোন মতেই এদিকে মন দিতে পারছি না।"

নিভা খাতাটা টেনে নিয়ে টকটক ক'রে অংকটা কষে ফেলছিল, নিখিল বাধা দিয়ে বলল —"দাও, ও খাতাটায় নয়। কাটাকুটি ক'রে ফেলবে। তুমি বরং পেন্সিলে এই রাফ (Rough) খাতাটায় করে ফেল।"

দেরি হোল না। খাতাটা ফিরে এলে দেখে নিয়ে বলল—"হুঁ," ঠিক হয়েছে।" একটু ভাবল, তারপর বলল—"তুমি বরং এক কাজ করো তাহলে, তোমার দিকে দেখতে গিয়ে আমার দেরী হয়ে গেল। অংকগুলো কষে ফেল রাফ কপিতে। ফেয়ার (Fair) করে নোব'খন, ভুল থাকলে ঠিক করে নিয়ে। আমি বরং ততক্ষণ প্রবন্ধটা লিখে ফেলি।"

অংকগুলো যখন শেষ হোল, তখন প্রবন্ধের আধখানা পাতাও শেষ হয়নি নিখিলের। আড়চোখে মাঝে মাঝে দেখছিলই নিভা, পেন্সিল শুদ্ধ খাতাটা এগিয়ে দিতে বলল— "হয়ে গেল ? তোমার অংকটা বোধ হয় ভালো লাগে, না ?"

মাথা দোলাল নিভা।

নিখিল মুখটা বিকৃত করে বলল—"আমার মোটেই ভাল লাগে না। আর এ সব অংক কোন কাজেও তো লাগে না জীবনে! লাগে ?"

নিভা মাথা নেড়ে জানল—না লাগে না। "তাহলে তুমি এক কাজ করো। প্রবন্ধটা ততক্ষণ রাফ কপিটায় লিখে ফেল। 'সাধুতা' যে আমি খানিকটা লিখে রেখেছি। আমি ততক্ষণ অংক ক'টা টুকে ফেলি! নিজের কাজের উপর আবার তোমায় দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে গেলে এত দেরি হয়ে যায়।"

নিভা বলল—"অংকগুলোর আর একটা সহজ প্রসেস (Process) আছে, শীগ্গির হয়ে যায়।"

"সে আবার কি রকম ? দেখি তো ঠিক কি না।"

তারপর বলল—"থাক, অন্যদিন দেখব'খন। তুমি লিখে ফেল প্রবন্ধটা।"

সুরু এই। তারপর এই চলছে। খুব কম দিনই নিজে অংক করে। নিভা রাত্তিরে কষে রেখে সকালে খাতাটা ওর খাতার ভেতর ভাঁজ করে রাখে, নিখিল সুযোগ বুঝে টুকে নেয়। প্রবন্ধও প্রায় সব নিভারই।

তবে ফাঁকি দিতে দিতেও কিছু এগুচ্ছে সাহচর্যগুণে। আবার এদিকে পরীক্ষাও আছে, সাপ্তাহিক অনুশীলন আছে। সহজ প্রসেসগুলো শিখে নিতে হয়। নিভার প্রবন্ধ-গুলোও মুখস্থ করে নিতে হয়। একসঙ্গে থাকতে থাকতে অন্তরঙ্গতা হচ্ছে, ফাঁকির সঙ্গিনী করে নেওয়ার জন্য, বুঝে নিতে, কি ওর প্রবন্ধ আয়ত্ত করে নিতে আর বাধে না।

আর এত প্রভেদও নেই তো, মোটে এক ক্লাশ নীচের ছাত্রী। সার্টিফিকেট ধরে দেখতে গেলে, সে প্রভেদটাও থাকে না। শুধু ভয় করে সেকেণ্ড মাস্টার অভয়পদকে। এসব কথা কিছু তার কানে পেঁছায় না তো—তাই প্রশ্নটা।

তিনটা বছর কেটে গেল। দ্বিতীয় বৎসরে নিখিল পাশ করে বেরিয়ে জেলা-শহরে গিয়ে কলেজে ভর্তি হোল। পরের বছর নিভাও স্কলারশিপ নিয়ে স্কুল ছেড়ে বেরুল। অভয়পদ কলকাতার একটা মেয়েদের কলেজে ভর্তি করে দিয়ে এলেন। হস্টেলে থেকে পড়বে।

এরপর আরও চার বৎসর কেটে গেছে। সময়টা দীর্ঘ, কিন্তু তার মধ্যে যে-সব ঘটনার এ কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে, সেগুলির সংক্ষেপেই উল্লেখ করা যায়।

নিখিলের পিতা মারা গেলেন। ম্যাট্রিক পাশ করে আই-এ পড়তে যাচ্ছিল নিখিল, আর পড়া হল না। পড়াশোনার দিকে কোন কালেই আগ্রহ ছিল না, তার ওপর নূতন আইনের কবল থেকে জমিদারীর কতটুকু রক্ষা করা যায় দেখতে হবে তো,—খুব হিসাবী আর কড়া প্রিন্সিপালে মানুষ হয়ে উঠেছে। এখন ঐ স্কুলেরই সেক্রেটারি ও।

নিভা ভালো করেই আই-এ, বি-এ পাশ করে এম-এ ক্লাশে ভর্তি হয়েছে শোনা যায়। বার চারেক এসেছিল এই ক'বছরে, তার মধ্যে শেষের দিকে দুবার নিখিলের বাড়িতেও এসেছিল। নিখিল জমি-জমার ব্যাপারে জেলা-শহরে বেরিয়ে গিয়েছিল মকদ্দমার তদ্বিরে ; দেখা হয় নি।

অভয়পদ হেডমাস্টার হয়ে দূরে একটা স্কুলে চলে গিয়েছিলেন। একেবারে শেষের খবর, আবার এই স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে ফিরে এসেছেন।

ওঁকেই একটা অনুষ্ঠান করে স্বাগত অভিনন্দন জানিয়ে বাড়ি ফিরছে নিখিল, গাড়ী থেকে নেমে সিঁড়ির শেষধাপে উঠেছে একটি মেয়ে যেন অপেক্ষাই করছিল, যুক্তকরে নমস্কার জানিয়ে বলল—"আসুন। দেরি করে ফেললেন।"

একেবারে হকচকিয়ে গেল নিখিল। মেয়েটির বয়স একুশ-বাইশ হবে, সাজগোজ বেশ ছিমছাম, একদিকে একটু দীর্ঘাঙ্গী আর দাঁড়াবার ভঙ্গিটা সিধা আর অচেনার হিসাবে অতিরিক্ত যেন সপ্রতিভ। নিখিল একটু চেয়ে থেকে বলল—"কিন্তু—চিনতে পারছি না তো দেখেছি কি কোথাও আপনাকে ?"

"আগে নিশ্চয় দেখেন নি, নয়তো মনে থাকত নিশ্চয়। কিন্তু এই একটু আগে যে ভাল করে দেখলেন একথা শপথ করে বলতে পারি। অবিশ্যি আমিও আপনাকে দেখছিলুম —নয়তো জানব কি করে ?"

নিখিল মুখে একটু অপ্রতিভের হাসি ফুটিয়ে তুলেছে, শীলা এসে উপস্থিত হোল, ওর

কোলে এখন এক শিশুকন্যা। বলল—"নিখিলদা, ও নিভা যে! অবশ্য তোমার দোষ দিই না, কী বদলে গেছে পোড়ারমুখী! আমারই ধোঁকা লেগে গিয়েছিল। কী রং হয়েছে কোলকাতার নোনা জলে, সে নুয়ে পড়া কোল-কুঁজে ভাবও নেই, আর সেই চুল—জট ছাড়াতে নাজেহাল হতে হোত—"

"বলোনা, থামলে কেন ?"

খিল খিল করে হেসে উঠল নিভা। হাতে একটা সাদা কি ফুলের গুচ্ছ ছিল, খোঁপায় গুঁজে দিয়ে আরও একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল—"নাও, তোমায় সাহায্য করছি।"

নিখিল একটু অপ্রতিভ ভাবে বলল—"এবার মনে পড়েছে। মাস্টার মশাইয়ের ফাংশানে (Function-এ) ঐ ফুলটা চোখে পড়েছিল বটে মেয়েদের ওদিকে—"

একেবার ডুকরে হেসে উঠল নিভা। বলল—"একেবারে সাফাই গাওয়াটা দেখ শীলা মানুষটির! ঠায় একদৃষ্টে দেখছিলেন আমায়—যখনই চোখ ফিরিয়ে দেখি ঠায় চেয়ে আছেন! এখন বলেন কিনা—শুধু ফুলটা চোখে পড়েছিল!"

শীলা বোধ হয় ভাইয়ের হতভম্ব ভাব দেখে বলল—"নে, ভেতরে আয়, দাঁড়িয়ে রয়েছেন দাদা—দেখবার মত হয়েছিস আজ, দেখেছেন তো ভারী দোষ করেছেন যেন ?"

"আজ ?" ঘুরেই ছিল নিভা, আবার দাঁড়িয়ে পড়ল; চোখ দু'টা কপালে তুলে বলল ..."আজ বলছিস কি তুই ? উনি ভুলেছেন বলে আমি যেন ভুলে বসে আছি। জানিস ? ...বলে দোব নিখিলদা ?"

"কি ?"—অপ্রতিভ ভাবটা সামলাবার যেন অবসর পাচ্ছে না নিখিল।

"জানিস ? স্কুল থেকে বাড়ি যাচ্ছি দু'জনে, আমার সেকালের অভিভাবকটি আর আমি —ঘোষ পুকুরের পরেই ফাঁকা মাঠ তো ? অভিভাবক মশাই হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রে উঠলেন—কোকিলের ডাক তোমার কেমন—"

একেবারে হেসে প্রায় উলটে পড়তে পড়তে কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে শীলাকে ঠেলেই ভিতরে চলে গেল।

এ ভাবটা অবশ্য রইল না। না হয় বদলেছেই নিভা, কিন্তু পরিচয়টা তো পুরো নাই, আর ঘনিষ্ঠও, জড়তাটুকু কেটে যেতে দেরি হোল না নিখিলের।

নিভা বলে—"কি করব বলো নিখিলদা? এই রকমটা দাঁড় করিয়েছে আমায় সবাই মিলে। প্রথমটা তো মামা পথ ধরালেন একগাদা ছেলের মধ্যে জোর করে ফেলে দিয়ে—"

"কিন্তু তাতে তোমার কিছু ইতর-বিশেষ তো হয়নি নিভা—"

শীলা আবার নিখিলকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে—"না, হয়নি! যা বোঝ না তাতে কথা কইতে যেয়ো না দাদা! করে কোকিল ডাকের কথা বলেছিলে—তোমার মনে নেই, অথচ ওর মনে গেঁথে—"

"তুই কি করে জানলি মনে নেই ?" চোখ পাকিয়ে চাইতে গিয়ে নিজেও হেসে ফেলল নিভা, এরাও যোগ দিল। সুযোগ বুঝে নিখিল ঘুরিয়ে নিয়ে কথাটা বলল—"থাক! হয়েছে। প্রথম দোষটা মাস্টার মশাইয়ের ওপর দিয়ে গেল, তারপর ?"

"ভাবলাম—যাক, এবার নিজেদের কলেজ, নিজেদের হোস্টেল, নিশ্চিন্দি। ওমা, একেবারে

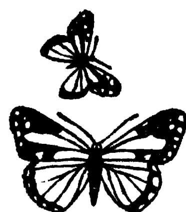
পাগল করে দেওয়ার উপক্রম! মাথা হেঁট করে থাকি, কম কথা কই, মামার ব্যবস্থার ফল তো উল্টোই হয়েছিল—প্রথম স্কলার মেয়ে, গুমুরে, বলে টিপ্টন কেটে কেটে অস্থির করে দিলে। দেখলে সেটাও যখন কাটিয়ে উঠছি—আরম্ভ করল—'বৌমা, বৌঠাকরুণ, ক'নে বৌ, নতুন বৌ'…এই করে পিটে পিটে সায়েস্তা করে এনে এখন আবার বলতে আরম্ভ করেছে—আলট্রা মডার্ণ (Ultra-modern), আলট্রা স্মার্ট (Smart) এমন কি পেছনে ফ্ল্যার্ট (Flirt) পর্যন্ত বলতে ছাড়ে না! কোন দিকে যাই বলো।"

শীলা বলল—"তুই ওদিক ছেড়ে এইদিকে চলে আয় এবার। আমার কথা—"

থেমে গেল। এবারের চোখ পাকানোর মধ্যে হাসি নেই নিভার।

এই হচ্ছে। যত হাসি-তামাসা এইখানে এসে যাচ্ছে শেষ হয়ে।

যত তরলতা এইখানে এসে কাঠিন্যে অচল হয়ে পড়েছে। তবে শীলা হাল ছাড়েনি। নিখিল বলে—"সে কি রকম করে হবে? ও শিক্ষিতা—অবশ্য কম বেশী করে আজকাল সব মেয়েই কিন্তু ও একেবারে বি-এ, তাও সাধারণ একটা বি-এ নয়; এম-এও দিতে যাচ্ছে।"



"তুমি না চাও তো রোখা যায়"—শীলা বলে।

"রোখবার প্রশ্ন ওঠে কি করে? অন্যায় করেছে বা করছে একথা তো বলছি না। তবে আমি তো সামান্য একটা ম্যাট্রিক—কলেজ মাড়াবার না আছে আর ইচ্ছে, না আছে সুযোগ।"

"এ তোমার অভিমানের কথা, না হয় হিংসে।"

"দুটোর একটাও নয়! তাহলে আমায় চিনিসনি তুই। ও বিলেতে কিম্বা আমেরিকায় গিয়ে ডিগ্রি নিয়ে আসুক, খরচ দিচ্ছি। না নিতে চায়, চাকরি করে শুধে দেবে। কিন্তু ঐ কথা, অত বিদ্যে নিয়ে চাকরিই করবে তো—কত স্কোপ রয়েছে আজকাল—নিদেন একটা প্রফেসারিও; আমার সংসারে কি কাজ ওর?"

শীলাকে বললে নিভা, একটু হেসেই বললে—"দ্যাখো কাণ্ড! মাঝখানে থেকে এই মেয়েটা ক্ষেপে গেল। একটা আলট্রা-মডার্ণ মেয়ে চাকরি না করে বাড়ি বসে থাকলে আরও জ্বালাই তো।"

আগে এর চেয়ে স্পষ্ট উত্তর ছিল, এখন এই রকম মন বুঝে নেওয়ার মতো অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। এই ক'রে চলে আসছে।

ছাড়ে না শীলা, ওদিকেও নরম করে আনল, তারপর একদিন দু'জনকেই একসঙ্গে ধরে বসল—"পেটে খিদে, মুখে আপত্তি, এ আমি আর শুনছিনে। ওদিকে মাস্টারমশাই, এদিকে জ্যেঠাইমা দু'জনেই মুখ চেয়ে আছেন—শেষ কথা জানিয়ে দিতে হবে তাঁদের আমায়, স্পষ্ট করে বলো। তার মানে স্পষ্টাস্পষ্টি রাজি হও। নিভাদি তুমি কত স্মার্ট আজ তার পরীক্ষা।"

বাইরের লনে চা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, অভয়পদ আর নিখিলের মাও ছিলেন, দুজনেই ভেতরে চলে গেছেন কিছুক্ষণ হোল।

নিখিল বলল—"আমার মত—চাকরি করতে বাইরে যেতে পারবে না।"

"নিভা কি বলিস ?" শীলা ঘুরে প্রশ্ন করল।

"বেশ তো, এইখানেই করব স্কুলে।"—উত্তর করল নিভা।

"বাঃ, এতো আরো সমস্যা !" বিমূঢ় ভাবেই বলল নিখিল।

মুখটা ঘুরিয়ে চেয়ারের পিঠে রেখেছিল নিভা, বলল—"শীলা, জিজ্ঞেস কর, একটা মেয়ে-স্কুল করে দিলে মেটে না সমস্যাটা ?"

"সে কথা ঠিক রে শীলা ! সত্যি একটা সমস্যা মেটে। স্কুলে মেয়েও বড্ড বেড়েছে এদিকে।"—একটা যেন নূতন আলো দেখতে পেয়ে বেশ উৎসাহ ভরেই বলে উঠল নিখিল। আরাম-কেদারাটায় সোজা হয়ে উঠে বসেছে উৎসাহের মুখেই।

উঠে পড়ছে নিভা। হাসি লুকুতে দু'হাতে নিজের গাল দুটো চেপে ধরেছে, তারই মধ্যে বলল—"বলে দে শীলা, স্কলার ঘরে এলে এরকম অনেক তুচ্ছ সমস্যা আপনি যাবে মিটে।...বাবাঃ ! কি স্মার্ট'ই হোতে হোল পোড়ারমুখীর পাল্লায় পড়ে !"

ছুটে গিয়ে গাড়ীবারান্দায় মোটরের দোর খুলতে খুলতে বলল "আমাকে আর শোফারটাকে ডেকে দিয়ে একটু উপকার করবি, না, শুধু ফিচলেমি করবি বসে বসে ?"

কেউ তত লাজুক নয়



একটা নাম করা সওদাগর অফিসের ওয়েটিং রুম, যারা চাকরি বা অন্য কোন কাজে সাক্ষাৎকারের জন্য আসবে তাদের বসবার জন্য। ঘরটা বিশেষ বড় না হলেও নেহাত ছোট নয়, যার জন্য দু-ধারে দু-খানা সিলিং ফ্যানের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এদিকে মেঝের নীল রঙের মোটা শতরঞ্জি বিছানো, দুধারে দুটো গোল টেবিল, চারিদিকে খান-চারেক করে চেয়ার। মাঝামাঝি একধারে দেয়াল ঘেঁষে একটা বেঞ্চি পাতা, লোক যদি বেশি হয়ে পড়ে তার ব্যবস্থা হিসেবে। টেবিল দুটো খানিকটা তফাতে তফাতেই, একটাতে দুটি অ্যাশট্রে বা সিগারেটের ছাই ঝাড়ার ডিবে, এ ছাড়া স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন রকম নির্দেশ নেই।

একটা গোল দেয়াল-ঘড়িও আছে, তাতে চারটে বেজে কুড়ি মিনিট হয়েছে, তার মানে অফিস বন্ধ হতে আর মাত্র চল্লিশ মিনিট বাকি। উমেদারি বা অন্যবিধ প্রয়োজনের সাক্ষাৎকার প্রায় শেষ হয়ে গিয়ে মাত্র দুজন এখন অবশিষ্ট রয়েছে ঘরটার মধ্যে; একটি মেয়ে, তন্দ্রা, আর একটি যুবা, অনিমেষ। ওরা দুজনেই চাকরির উমেদারিতে এসেছে। অনিমেষ অ্যাকাউণ্ট বিভাগে সহকারীর পদের জন্য, তন্দ্রা সেলস্ বা বিক্রয় বিভাগের স্টেনোগ্রাফারের পদের জন্য। একটি বেশ স্মার্ট লেডি স্টেনো চায় ওরা।

দুটোর সময় এসেছে তন্দ্রা; তখন থেকে একটি কথাই তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। 'স্মার্ট'। শর্টহাণ্ড আর টাইপিঙে ওর হাত খুবই দ্রুত, সেদিকে ও কাউকেই এগিয়ে যেতে দেবে না, এ-বিশ্বাস তার পুরোপুরিই আছে, তবে 'স্মার্ট' কথাটা যে বড় ঘোরাটে,—খুব চটপটে, চোখে মুখে কথা ফুটছে? লজ্জা সংকোচের ধারে-কাছে দিয়েও যায় না, ওঠা-বসা-চলা-ফেরার মধ্যে একটা মুক্ত চপলতা? আলাপ-পরিচয়ের নিঃসংকোচই নয়—খানিকটা যেন এগিয়েই থাকা?

আবার একটা সীমারেখাও থাকবে, নইলে বেহায়া বেপরোয়া। তা হলেই নাকচ। একটু লাজুক মুখচোরা বলেই বদনাম আছে তন্দ্রার; কলেজ, তারপর কমার্শ্যাল ইনস্টিটিউট যেখানে শর্টহ্যাণ্ড-টাইপিং শিখল···কোথাও এটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু এবার অচল অবস্থা। এসেও পড়ল।

কি রকম লোকে নিচ্ছে ইণ্টারভিউটা? বৃদ্ধ, কি মাঝবয়সী, কি আরও কম?

মেয়েদের সঙ্গেও ভাল করে আলাপ করতে পারে না। কেমন যেন একটা মনের

স্বর্ণলতা দাঁড়িয়ে গেছে যে আজকাল সব মেয়েই 'স্মার্ট,' ও-ই শুধু পেছনে পড়ে আছে, মুখ খুললেই ধরা পড়ে যাবে। তবুও চেষ্টা করছে বৈকি। আজ চারজন মেয়ে ছিল, ওকে নিয়ে পাঁচজন। ও-ই খানিকটা ওপর-পড়া হয়ে আলাপ করেছে; মায়া মেয়েটির সঙ্গে ভাবও করে ফেলেছে। এত অল্প সময়ে, আর এ-পরিবেশে, ওর পক্ষে একটা কৃতিত্বই। আর একটা আবিষ্কারও হল—সব মেয়েই স্মার্ট নয়; মায়া তো আবার ওকেও ছাড়িয়ে যায়।

খানিকটা যেন সাহসও এসে পড়েছে। বৃদ্ধ হোক, মাঝ-বয়সী হোক, কম-বয়সী হোক, পারবে। পারতে হবে যে। তন্দ্রা নিজের ওপরই চোখ রাঙিয়ে উঠল—না পার তো ঘরে ঘোমটা টেনে বসে থাকগে, তোমার এত বড় একটা অফিসে চাকরি করতে আসা কেন? পুরুষে গিজ গিজ করছে।

নিজের কাছে ধমক খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠল তন্দ্রা, নড়ে চড়ে বসল।

তা হলে এই মানুষটি থেকেই মহলা শুরু করলে কেমন হয়?

একটু আড়চোখে চাইল তন্দ্রা। ঘাড় হেঁট করে একটা অ্যাশট্রে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘোরাচ্ছে। আগেও কয়েকবার দৃষ্টি পড়েছে। এতক্ষণ কারুর সঙ্গে আলাপ করতে না দেখুক, বসে ছিল অন্তত সোজা হয়ে। তার মানে লাজুক; এই যে একটি ঘরে মাত্র ওরা দুজনে; আর ঘাড় তোলবার ক্ষমতা নেই। একে দিয়ে বেশ আরম্ভ করা যায়। একটু হেসে বলা—"আমাদের দুজনেরই দেখছি এক অবস্থা।" তার পরই আরম্ভ হয়ে যাবে আলাপ। না হয়, আরও একটু কিছু বললেই হবে—"আপনার কোন ডিপার্টমেন্ট?" দিতেই হবে একটা উত্তর।

বলে ফেলতেই যাচ্ছিল, কথাটা আটকে গেল গলায়—"আমাদের দুজনেরই এক অবস্থা।" আলাপ নেই—পরিচয় নেই, হঠাৎ দুজনকে এক সঙ্গে করে নিয়ে একটা মন্তব্য!… একসঙ্গে করে নিয়ে দুজনকে! যতই ভাবছে, লজ্জায় যেন নিজের কাছেই যাচ্ছে গুটিয়ে। বলে ফেলতেই হয়েছিল আর কি! কি মনে করত লোকটা।

প্রশ্নটা আর করা হল না। নিজেকে আবার চোখ রাঙিয়ে উঠল তন্দ্রা—"তোমার আর স্মার্ট হয়ে কাজ নেই, যেমন আছ তেমনি থাকো। কী লজ্জায় যে ফেলতে এক্ষুনি।"

লুব্ধ করল ওদিককার পাখাটা হঠাৎ ঘূর্ণিবেগ কমে এসে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গিয়ে। ফিউজ হয়ে গেল কি, কল বিগড়েছে। একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ এমন দেখা যায় না; কে যেন হাতে দিল ওর। অসহ্য গরম, পাখাতেও যেন কুলোয় না; এবার বেশ বলা যায়—"আপনি এদিকে চলে আসুন না, মিছিমিছি কষ্ট করে লাভ কি?" শক্ত কি এমন?

আজই আসবার সময় মোটরবাসে অভিজ্ঞতার কথাটা মনে পড়ে গেল। অনেকটা এই ধরণের পরিস্থিতি। বড় ভাল লেগেছিল। এখন মনে হচ্ছে সেও যেন তারই অনুকরণের জন্য আগে থাকতে কে রচনা করে রেখেছিল, নইলে তার চোখের সামনেই ঘটবে কেন? তার পরেই এই একই ধরণের ব্যাপার।

একটি মেয়ে একেবারে যাকে বলা যায় আপ-টু-ডেট্। বাস স্টপে গট্‌গট্ ক'রে উঠে

এসে লেডিস সীটের সামনে দাঁড়াল। শুধু মাথা একটু নীচু করে সিটে চোখ ফেলে দাঁড়ালে, কোন কথা নয়। ছিপছিপে, পায়ে হিল তোলা জুতা, ঘাড় থেকে চুলগুলো ওপর দিকে তুলে আঁচড়ে মাথায় আঁট খোঁপা, সিধে দাঁড়াবার ভঙ্গি। আগা-পাস্তলা স্মার্ট, মায় নির্বাকতাটুকু পর্যন্ত। দুটি পুরুষ যারা বসে ছিল, আস্তে আস্তে উঠে সরে দাঁড়াতে বসে পড়ল; পিঠটা টেনে সোজা করে দিল।

চোখ ফেরাতে পারছে না তন্দ্রা। অফিসে নিশ্চয় ঠিক যেন এই রকমটিই চাইছে; হওয়া যায় না?

কয়েকটা স্টপের পর একটি যুবা উঠে এসে পাশে দাঁড়াল। সামনের দুটো বেঞ্চই মেয়েদের জন্য, চারটে করে সীট। একটা পুরোপুরি ভর্তি, একটাতে দুটো সীট খালি। মেয়েটা যুবককে বলল—"আপনি ওটায় তো বসতে পারেন একপাশে। যথেষ্ট জায়গা রয়েছে।"

বসে ছিল দুজন প্রৌঢ়া, তার মধ্যে একজন বিধবা, একজনের কোলে একটি করে থাকবার মতই মেয়ে। সেই ছিল এদিকে, কোল থেকে মেয়েটিকে তুলে পাশে বসিয়ে দিল। অর্থাৎ তার আপত্তি আছে। মেয়েটির দিকে একটু অপ্রসন্ন দৃষ্টি হেনেও সেটা স্পষ্ট করে দিল। যুবতী যুবকের দিকে চেয়ে বলল—"আপনি তা হলে এইখানেই এসে বসুন।" নিজের পাশের সীটটা দেখিয়ে দিল।

"আপনার অসুবিধে হবে।"—যুবক বলল। হওয়ার কথাও; বেচারা একটু স্থূলাঙ্গই। মেয়েটি যতটা পারল জায়গা ছেড়ে দিয়ে বলল—"কিছু না। বসুন আপনি।"

প্রৌঢ়া দুজন আড়ে চেয়ে ঠোঁট একটু কুঞ্চিত করল। তন্দ্রার মনে হলো মেয়েটির শিরদাঁড়া আরও সোজা হয়ে উঠেছে।

"আপনি না হয় এদিকে চলে আসুন না।"

—ঘরের সঙ্গীর দিকে চেয়ে বেশ সহজ কণ্ঠেই বলতে পারল তন্দ্রা। যেমন আন্দাজ করেছিল, ছেলেটি সত্যই লাজুক; মাথাটা আরও একটু যেন নীচুই হয়ে গেল, যেন কোন রকমে অল্প একটু ঘুরিয়ে নিয়ে যেন কোন রকমে বলতে পারল—"থাক, বেশ তো আছি।"

"বেশ কি করে বলি? এই রকম অসহ্য গরম, তার ওপর ওদিককার ফ্যানটাও বন্ধ হয়ে গেল।"

—এতগুলো কথা, কিন্তু বেশ সহজ ভাবেই বলে গেল তন্দ্রা। সেই স্মার্ট মেয়েটার আদর্শ সামনে ধরে রেখে বেশ বল পাচ্ছে মনে; তার ওপর নিশ্চয় অপর পক্ষের দুর্বলতা-টুকুর জন্যও। বেশ একটু জোরের সঙ্গেই জুড়ে দিল—"না, চলেই আসুন আপনি।"

বিস্ময়ের কূল-কিনারা পাচ্ছে না তন্দ্রা। ছেলেটি উঠে আস্তে আস্তে এসে বসল এদিকে, শুধু মাঝে একটা চেয়ারের ব্যবধান রেখে। শুধু বিস্ময় নয়, আত্মপ্রসাদও, একজন পুরুষ, অপরিচিত, সে যে এক কথাতেই এত বাধ্য হয়ে যাবে, এ যে কল্পনাতীত!

কৌতুকও বোধ হচ্ছে, তার সঙ্গে মায়াও। এ ধরণের একটা মিশ্র কৌতুক ও অনুভূতি তার অভিজ্ঞতায় কখনও উপলব্ধি করেনি। ছেলেটির পরণে ধুতি-পাঞ্জাবি, তার ওপর

আবার একটা উড়ুনি। সওদাগরি আফিসে ইণ্টারভিউ দিতে এসেছে! বনগাঁ থেকে এসেছে, না, বাঁশবেড়ে থেকে···কথাটা ওদের কলেজের অনীতা বড্ড বেশী ব্যবহার করত—মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গিয়ে একটা হাসি গুরগুরিয়ে উঠেছে পেটের মধ্যে। এবার ও-ই কিছু বলুক। একটা "ধন্যবাদ"—ও তো খসাল না মুখ থেকে। ঘন ঘন দৃষ্টি তুলে ওদিককার পাখাটার দিকে চাইছে, যেন একবার চলুক, পরিত্রাণ করুক ওকে এ-সংকট থেকে।

হাসি চেপে রাখা শক্ত হয়ে পড়েছে তন্দ্রার পক্ষে। সেজন্যও, আবার নিজেকে বেশ খানিকটা ওপরের স্তরের মনে হওয়ার জন্যও ওই আবার চালু করল কথা। প্রশ্ন করল—"আপনার কোন্ ডিপার্টমেণ্ট?"

"অ্যাকাউণ্টস্। আপনার?"

তন্দ্রা মনে মনে বলল—তবু ভালো। উত্তর করল—'স্টেনোগ্রাফ।"

"ও!···কখন যে ডাকবে!"

"সত্যি। বড্ড দেরি করে নিচ্ছে ইণ্টারভিউগুলো।"

"আর আমরা দুজন পড়েও গেলাম সব শেষে। দেখুন না!"

—বেশ সহজও হয়ে এসেছে অনিমেষের কথাগুলো।

সঙ্গে সঙ্গে কিছুই বলতে পারল না তন্দ্রা। দুজন নিয়ে এই কথাটাই না ওই বলতে চেয়েছিল তখন? একটা ঢোক গিলতে হলো, তারপর অবশ্য হেসেই বলল—"এক যাত্রায় বেরিয়ে থাকব হয় তো।"

বলেই কিন্তু একটু চুপ করে যেতে হল; কেমন যেন হয়ে গেল না কথাটা?

অনিমেষ কখন্ বেশ সোজাসুজি হ'য়ে বসেছে। হেসেই বলল—"এখন যাত্রার শেষটা দুজনের পক্ষেই শুভ হলে হয়।"

একটু চুপ করে থেকে সাহস করে মুখটা তুলল তন্দ্রা। না, সে ধরণের ছেলেই নয়; ওর কথাটাও কোন নিগূঢ় অর্থে ধরেনি, নিজেরটাও বলেনি কোনও নিগূঢ় অর্থে। বেশ হালকা হল মনটা, বেশ খানিকটা কথাও হলো, পরিচয় পরস্পরের, কিছু এদিক-ওদিকও। নেহাত বনগাঁ-বাঁশবেড়ে নাহলেও কতকটা ঐ গোছেরই। সিউড়িতে বাবার বড় ব্যবসা আছে। কতকটা সেই সূত্রেই একটা সওদাগরি আফিসে ঢোকবার চেষ্টা ওর, এদের পদ্ধতিগুলো আয়ত্ত করার জন্যে। বরাবরের জন্য থাকার উদ্দেশ্য নেই।

"আর, আমার এসব ভালও লাগে না"—একটু হেসে, ক্লান্তভাবে বলল অনিমেষ।

"কেন?" প্রশ্ন করল তন্দ্রা।

একটু লজ্জিত হয়ে চেয়ে রইল অনিমেষ। তন্দ্রা হেসে বলল—"বুঝেছি। বলি আমার আন্দাজটা?"

"বলুন।"—লজ্জিতভাবে হাসল অনিমেষ।

"লেখা-টেকার বাই মানে, ঝোঁক আছে।···নিশ্চয়ই কবি।"

অনিমেষ লজ্জিতভাবে হাসতেই লাগল। আরও একটু বেশী লজ্জিতই হয়ে।

তন্দ্রা বলল—"আরও বলি?—এটা আমার ভবিষ্যবাণী।"

"বলুন।"
"করতেও হবে না কাজ এখানে আপনাকে। আপনার এই উড়ুনি আপনাকে রক্ষা করবে।"
খিল খিল করে হেসে উঠেছে, অনিমেষ আরও লজ্জিত হয়েই যোগ দিয়েছে ; এমন সময় আর্দালি এসে জানাল দুজনেরই ডাক হয়েছে ওদিকে।

মেসে ফিরে এসে গল্প করে যেন আশ মিটছে না তন্দ্রার।
সন্ধ্যার পর দোতলায় কমলার ঘরে মেসের মেয়েদের চা-পাঁপরের সঙ্গে একটা জটলা হয়, তন্দ্রা বলে যাচ্ছে নিজের অভিজ্ঞতার কথা। একটা গোটা পুরুষ মানুষকে নাজেহাল করে ছেড়েছে, যা বলেনি, বা করেনি তাও সব জুড়ে জুড়ে জমাট গল্প ফেঁদেছে। হাসির হুল্লোড় উঠছে মাঝে মাঝে। কমলা বলছে—"বিশ্বাস হয় না তন্দ্রা—মেয়েদের মধ্যেই তোর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, তুই একটা গোটা পুরুষ-মানুষকে নিয়ে আঙুলের ডগায় চরকি ঘোরাবি অমন করে—শক্ত বাপু বিশ্বাস করা..."
"ও মা! শুনছি কবি। কবি আবার পুরুষ হলো কবে!"
মুখটা গম্ভীর করে হঠাৎ এমনভাবে বলে উঠল চম্পা যে, আবার একটা হাসির লহর উঠল। তন্দ্রা বলল—"তা সত্যি কমলাদি। স্মার্ট্ বলে বাহাদুরি নিতে চাই না, তবে মানুষটা এতো মুখচোরা যে তার সামনে—এতো মিনমিনে বলো তো আমায়? তা আমিই যেন একটা পুরুষ মানুষ। দ্যাখো না—ইন্টারভিউ দিতে এসেছিস, গায়ে দিব্যি বুশ শার্ট থাকবে, ভাঁজ করা প্যান্ট, পায়ে স্ট্রাপস্। তার জায়গায় কিনা জড়ি পাড়ের..."
পশ্চিমা চাকরটা এসে, বলল—"একঠো বাবুলোক দেখা করতে এসেছে।"
"উড়ুনি না, বুশ-শার্ট?"
—মনীষার বেখাপ্পা প্রশ্নে আরও উচ্চকিত হয়ে উঠল হাসিটা এবার। কমলা বলল...
"চুপ কর তোরা একটু বাপু, কী মনে করবে ভদ্রলোক?"
চাকরটাকে প্রশ্ন করল—"কার সঙ্গে দেখা করতে চায়?"
"কারও সঙ্গে নয়।"
বোকার মত অদ্ভুত উত্তরে সবার মুখ চাপা হাসিতে রাঙা হয়ে উঠল। কমলা বলল—"থাম, বুঝেছি। মেসেই কোন দরকার আছে বোধ হয়; বিশেষ কারুর সঙ্গে নয়। রোস, দেখি।"
নীচে একটা বৈঠকখানার মত আছে। অনিমেষ বসেছিল একটা চেয়ারে, কমলা, এর প্রসঙ্গই তো বলছিল, পোশাকে চিনে নিতেও দেরি হলো না। সামনে গিয়ে বলল—"বসুন। কার সঙ্গে দরকার?"
"মানে—দরকার কারুর সঙ্গে নেই—একটা ইয়ে হয়েছে—একটা ভুল নিশ্চয়—তাই মনে করলাম না হয়..."
থেমেই গেল গুলিয়ে ফেলে। ঠিক মিলে যাচ্ছে তন্দ্রার বর্ণনার সঙ্গে। কমলা অনেক

কণ্ঠে মুখের সহজ ভাব বজায় রেখে বলল —"বলুন।"
অনিমেষ উড়ুনির ভেতর থেকে একখানা বই বের করল, একটা বাংলা নভেল। বলল—"কাল একটি···একজন ভদ্রমহিলা একটা আফিসে ইণ্টারভিউয়ে গিয়েছিলেন আমারও ছিল—ফেরবার সময় দেখি টেবিলের নীচে এই বইটা পড়ে রয়েছে--মনে করলাম তা হলে হয়তো তাঁরই—তাই বলেছিলেন এই মেসে থাকেন—তাই ভাবলাম···"
' নিয়ে এসেছেন কণ্ট করে? নাম লেখা আছে তার?"
"তার নাম তো জিজ্ঞেস করা হয়নি।"
কমলা মনে মনে বলল 'সে ক্ষমতা তোমার থাকলে তো।'
"তবে একটা আছে নাম।" অনিমেষ একটু থেমে জুড়ে দিল।
"দেখি।"
কমলা হাত বাড়িয়ে বইটা নিয়ে বলল—"না, ওর নাম সান্ত্বনা নয়, তন্দ্রা।
"·· তাহলে কি করবেন?"
কি যেন আশা করেছিল অনিমেষ, শুষ্ককণ্ঠে বলল "তাহলে ফিরিয়ে নিয়ে যাই।"
উঠে পড়ল। কমলাও উঠে পড়ল, বেশ একটু চিন্তিত। "আচ্ছা, তাহলে ··" বলে নমস্কারের জন্য হাত তুলে তখনই থেমে গিয়ে বলল— "আপনি না হয় একটু বসুন দয়া করে। বইটাও দিন, দেখি ঐ নামে তন্দ্রার কোন বন্ধুই যদি থাকে।"
"আছেন তন্দ্রা দেবী?"
চৌকাঠের বাইরে পা দিয়াছিল কমলা, ঘুরে দাঁড়াল। বেশ বোঝা যায় যে, ওর পেছন ফেরার সুযোগেই প্রশ্নটা করা। এক মুহূর্ত, তারপরই উত্তর করল "আছে; তবে শরীরটা ঠিক নেই। আপনি বসুন। এক্ষুনি আসছি আমি।"
তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।
ঠোঁটে আঙুল চেপেই ঘরে প্রবেশ করল কমলা; চোখ বড় বড় করে চাপা গলায় বলল—"উড়ুনিই!"
চুপ থাকবার ইঙ্গিত সত্বেও "অ্যাঁ!!" করে সবার কণ্ঠে একটা শব্দ উঠতে যাচ্ছিল, চোখ পাকিয়ে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিল কমলা। বলল "তন্দ্রার জন্যেই এসেছে।"
আমি যাব না বাবা! হাত নেড়ে এমন সভয়ে বলে উঠল তন্দ্রা যে সবাই মানা সত্বেও চাপা গলায় খিলখিল করে হেসে উঠল। বিপাশা প্রশ্ন করল—"বললে তন্দ্রার জন্যেই এসেছে?"
যতই বলুক, "আমি কিন্তু···"
"আঃ! চুপ করতো!" হাত তুলে থামিয়ে দিল কমলা। বলল—"জোর করে লজ্জা ভাঙিয়ে একটা ফ্যাসাদ বাধিয়ে এসে এখন···"
শাড়ির ভেতর থেকে বইটা বের করে বলল "এই বইটা কাল ইণ্টারভিউ দিতে গিয়ে ফেলে এসেছিস তুই?'
"আমি বই ফেলে আসবার মেয়ে!"
"বরং অন্য কিছু ফেলে আসবার কথা···"
"আমি তাহলে চললাম বাপু!" মনীষার টিপ্পনীতে রেগে উঠেই যাচ্ছিল তন্দ্রা, কমলা

হাতটা ধরে বলল—"বোস্। সবটা শুনবি তবে তো।...এই মেয়ের মুখেই এতক্ষণ খই ফুটছিল? বুঝি না বাপু তোমাদের কাণ্ড। বইটা টেবিলের নীচে কুড়িয়ে পেয়েছে। মনে করে দিতে এসেছে। নাম অবিশ্যি লেখা রয়েছে সান্ত্বনা—" "আমি সান্ত্বনা?"
"কারুর যদি তাই মনে হয়।"—চম্পা মন্তব্য করল।
কমলা বলল—"ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তন্দ্রার বই নয় দেখে, আমিই এনেছি, বললাম—দেখি, তন্দ্রার কোন বন্ধুর নামও তো হতে পারে। রীতিমতো একটা সমস্যায় পড়ে গিয়ে..."
"কিছু সমস্যা নয়।"—মনীষা পাশেই বসেছিল, কাতরভাবে একটা হাত জড়িয়ে ধরল, বলল - "আমি বন্ধু সান্ত্বনা সাজছি, একবার দেখে আসতে দাও কমলাদি।"
কাজের কথার এই শেষ পরিণাম দেখে সবাই আবার হেসে উঠেছে, কমলা বিরক্ত হয়েই বলে উঠল—"তাহলে আমিই উঠলাম এবার। কত বড় একটা সমস্যা, কতদিক থেকে ভেবে দেখতে হবে - ঐ একটা মেয়ে দেখছিস কি রকম আবল তাবল বকতে আরম্ভ করেছে, আর মুখে এতক্ষণ ফুলঝুরি ফেটে পড়ছিল—এদিকে একটা ভদ্রলোক মিছিমিছি বই দেওয়ার ছুতো করে ছুটে এসেছে—বুঝছে লজ্জায় পড়ে যাবে, তবু..."
"হয়ে গেল তো দুটো দিক।" বিপাশা মন্তব্য করল এবার।
মনীষা জুড়ে দিল—"এমন কিছু সমস্যাও নয়। বেশ স্পষ্টই—"
দুষ্টু মন্তব্যে আবার হাসিটা উঠতে যাচ্ছিল, কমলা মুখ গম্ভীর করে বলল—"না, আর ভেবে দেখবার কিছু নেই তো, দু'দিক হলেই হয়ে গেল! কলকাতা জায়গা—মেয়েদের মেস, একটা লোক একটা মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার জন্যে মতলব এঁটেছে এক নতুন রকম...এ ছাড়াও সমস্যা আছে।"
"বাবা, বাবাঃ!! কত টেনে টেনে বের করছেন যে কমলাদি।" অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠল বিপাশা—"এমন একটা সহজ ব্যাপার, অথচ..."
—"ধরে নিচ্ছি সহজ। তা কর্তাদের কথাটা ভাবতে হবে না? তোমরা না হয় মডার্ণ হয়েছ, কিছু মানছ না। না তন্দ্রা, তোমরা দুজনে অনেকখানি এগিয়েছ - আগে একটা মতলব করে ঠিকানাটা জেনে নিতে দাও আমায়। আমার হেফাজাতেই দিয়ে গেছেন তোমাদের; শেষে বদনাম কিনব? সব জোগাড়যন্ত্র করে ওঁদের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিত হতে দাও আমায় আগে।"
চুপ করেই গেছে তন্দ্রা, মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে রেগে উঠে বলল—"দ্যাখো কে এগিয়েছে, আর কার ঘাড়ে দোষ! না আমি কার এর মধ্যে নেই বাপু! তোমাদের কাছে গল্প করতে গিয়েই আমার ঘাট হয়েছে। উঠি!"
কাহিনীটা একরকম এইখানেই শেষ হয়ে গেল। ইন্টারভিউ দুজনের মধ্যে কারুরই সফল হয়নি। অত মহলা দিয়ে তন্দ্রা সেখানে নার্ভাস হয়ে পড়েছিল; মহলা দেওটাই কারণ কিনা কে জানে? অনিমেষের বেলায় তন্দ্রার ভবিষ্যৎবাণীটাই খেটে গেছে। ওর উড়ুনিই হল বৈরী।
তবে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ওদের যাত্রাটা শুভই হয়েছিল।

ভাষা ও ভালবাসা



অফিসের বড়—টেবিলটার দু'দিকে মুখোমুখি কাজ করত দু-জনে, সুহৃৎকুমার ও কুশলকুমারী, সুহৃৎ বাঙালীর ছেলে, পুরো নাম সুহৃৎকুমার চট্টোপাধ্যায় ; কুশল বারাণসীর এক ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণের কন্যা, কুমার-কুমারীও দুজনে নামাংশেই নয়, কার্যতও : কিন্তু রইল না বেশিদিন।

টেবিলের এপার-ওপার, পরিচয় হতে বিলম্ব হোল না, সে পরিচয় ঘনিষ্টতায়ও দাঁড়িয়ে গেল অল্পদিনেই। কাজের মধ্যে অল্প-স্বল্প গল্পগুজব এসে পড়ে ব্যাঘাত ঘটাতে লাগল। ক্রমে গল্পের ভাণ্ডার এত স্ফীত হয়ে উঠল যে অফিসের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আর কুলিয়ে উঠল না, মুক্তি চাইল পার্কে, রেস্তোরাঁয়, সিনেমায়। হিন্দীই ছিল মাধ্যম, মাঝে মাঝে একটু আধটু ইংরাজীর ছুট, যেমন হয় এসব ক্ষেত্রে। এরপর কুশল বলল—সে বাংলা শিখবে। বাংলার মতো নাকি কোন ভাষাই তার কানে এত মিষ্টি লাগে না। অনেকদিন থেকে নাকি সাধ ছিল, সুযোগ পায়নি। এবার এত বড় সুযোগটা হাতছাড়া করবে না কোন মতেই। যখন ওদের বিবাহ হোল তখন কুশল মোটামুটি বেশ বাংলা শিখে গেছে ; লিখতে, পড়তে, বলতেও। অবশ্য রাতারাতি নয়, সময় লাগল, তবে তাও যে খুব বেশি এমন নয়। সুহৃৎ একটা পরীক্ষা দিয়ে কাজে এক ধাপ ওঠবার চেষ্টা করছিল, মাস ছয়েক লেগে গেল ওদের বিবাহটা সম্পন্ন হতে। মাস ছয়েক একটা ভাষা আয়ত্ত করার পক্ষে খুব অল্প সময় ? বেশ, মানা গেল। কিন্তু যদি সে রকম উঠে পড়ে লাগা যায় ?

উঠেপড়েই লাগল কুশলকুমারী। পার্ক, সিনেমা, রেস্তোরাঁ -যেখানেই দু'জনে, সেখানেই বাংলা। কথার দিক দিয়ে বাড়িতেই চলল শিক্ষা। শিক্ষক খুঁজতে হোল না। কুশলদের পরিবার ওদিককার হলেও খুব প্রগতিশীল। ছোট পরিবারও। বাপ,

একটি ভাই প্রফেসার, তার স্ত্রী, একটি ছোট মেয়ে, একটি বোন মেডিকেলের ছাত্রী, মেলা; হলেই মতভেদ। সুহৃৎ নিজে এসে যখন বাংলা শেখাতে আরম্ভ করল, আপত্তির কিছু তো উঠলই না কোনখানে, বরং অভ্যর্থনাই করে নিল সবাই তাকে। কুশলের ভাজ গীতা একধাপ এগিয়ে মেয়েকে 'পিসেমশাই' বলেই ডাকতে শিখিয়ে দিল সুহৃৎকে, কোথা থেকে বাংলা কথাটা জেনে নিয়ে। শুধু কুশলকেই বার কয়েক চোখ পাকাল। অন্য সবার মুখে একটা স্মিত স্বীকৃতিই ফুটে উঠল। তখন সবাই তো জেনেই গিয়েছে হাওয়া কোন দিকে। ঝোঁকটা বরং চারিয়েও পড়ল একটু বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে। হু হু করে এগিয়ে যেতে লাগল কুশল। বলে—"সচ্মুচ্ কী রোকম মিষ্টি ভাষা আছে বাংলা সুহৃৎ। কোতোখানি বঞ্চিৎ ছিলাম ভেবে আপ্শোষ রাখবার জগহ্ পাই না।"

মিষ্টি হেসে মুখের দিকে চেয়ে থাকে সুহৃৎ; শোনা নয় তো, পান করা। বলে—"এত মিষ্টি যে তা আমিও তো এর আগে জানতাম না, কুশু।"

ক্রমে 'সুচ্মুচ্'-এর জায়গায় 'সত্যি' এল, 'রোকম' শুধরে 'রকম' হল, 'জগহ' বদলে একেবারে ঘরোয়া বাংলা 'ঠাঁই'। অবশ্য এতে সুহৃতের কাছে মিষ্টতাটুকু বাড়ল কি কমল বলা শক্ত, তবে ভাষার দিক দিয়ে কুশল পুরোপুরি বাঙালি হয়ে উঠল। এই সময় নূতন অফিস-সুপারিনটেন্ডেণ্ট একদিন বিনা নোটিশে অফিস তদারকে বেরিয়ে তার খাতাপত্রের মধ্যে একখানি বাংলা নভেল আবিষ্কার করল। লোকটি কড়া; কুশলকে অন্য টেবিলে সরিয়ে দিয়ে অফিসের ডিসিপ্লিন বজায় রাখবে ভাবছিল, এই সময় সুহৃৎ কুশল দু-জনে গিয়ে তাকে তাদের বিবাহের নিমন্ত্রণ কার্ড দিয়ে এল।

ওদের পরিকল্পনা ঠিকই হয়েছিল। পরীক্ষাটা দিয়ে সুহৃৎ বেশ খানিকটা ওপরে উঠে গেছে, কুশলের অফিস করার পাটই উঠে গেল। সুহৃৎ একটা হোটেলে থেকে অফিস করছিল, ছিমছাম দেখে একটা বাড়ি ভাড়া করল, কুশল এসে সংসার পাতল। কালক্রমে একটি শিশু পুত্র এসে সংসারের পরিধিটা বাড়িয়েও দিল একটু। এই সময়, কচিমুখে বাংলাভাষা যখন মধুর হয়ে উঠেছে, হঠাৎ বিপদটা এসে পড়ল।

রবিবার। সুহৃৎ অফিসের একরাশ কাজ নিয়ে এসেছে, কুশল খোকাকে পেরাম্বুলেটারে শুইয়ে আয়াকে সঙ্গে নিয়ে কাছের পার্ক থেকেই ঘুরে আসতে গিয়েছিল, একটা গাছের তলায় কাগজের হকারকে কেন্দ্র করে খানিকটা জটলা হচ্ছে দেখে এগিয়ে গেল। ছ-সাত জনের জটলা, মেয়ে-পুরুষ, প্রায় সবাই-ই ওদের বয়সী। কি-একটা বিষয় নিয়ে জোর আলোচনাই চলছিল, ও কাছাকাছি হতে হঠাৎ সবার গলা গেল নেমে, সবার তির্যক দৃষ্টিও এসে পড়ল ওর ওপর, বিশেষ করে যেন ওর সাজগোজের ওপর। তারপর একটি খর গোছের মেয়ে তার পুরুষ সঙ্গীর জামায় একটা টান দিয়ে কুশলের দিকে একটা উগ্রতর বক্র দৃষ্টি হেনে বেশ শুনিয়ে শুনিয়ে বলল—"আরে চলিয়ে, ওয়ে আপনে বাংলাহিকে রাষ্ট্র-ভাষা বনাবে, হিন্দীভি কোই চীজ হ্যায়?" (আরে চলো, ওঁরা নিজেরা বাংলাকেই রাষ্ট্র-ভাষা করান গিয়ে, হিন্দী আবার একটা বস্তু নাকি?)

আরও কয়েকটা তির্যক দৃষ্টি এসে পড়ল, স্ফুট-অস্ফুট কিছু মন্তব্যও মেয়ে মুখেই। তারপর এক একখানা করে কাগজ হাতে করে দলটা পাতলা হতে হতে মিলিয়ে গেল। কুশল গিয়েও একখানা কিনল।

বাংলা বনাম হিন্দি। জোর সম্পাদকীয়।...বাঙালী বাবুরা বলতে চান কি? ভারতের এক কোণে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের ভাষা-সংস্কৃতির ওপর নির্ভর, না আছে তার একটা নিজস্ব সত্তা, না আছে আভিজাত্য, সেই ভাষা টেক্কা দিতে চায় হিন্দীর সঙ্গে—কত যুগের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান যে হিন্দী, যে হিন্দীতে লিখে গেছেন সুরবিহারী-তুলসীদাস—যে হিন্দী-জাহ্নবীকে নব ভাগীরথী ধারায় বইয়ে নিয়ে চলেছেন প্রেমানন্দ-মৈথিলীশরণের গোষ্ঠী। স্পর্ধা বাঙালী, তোমার স্পর্ধা।

সরে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসে কাগজখানা আদ্যোপান্ত পড়ে গেল কুশল। কলকাতায় একটা বড় সভা হয়ে বিশিষ্ট বাঙালীরা একজোট হয়ে নাকি হিন্দীর রাষ্ট্রভাষা হওয়ার বিরোধিতা করেছে। তারই প্রতিক্রিয়া।

মুখটা তুলে একটা দিকে স্থিরভাবে চেয়ে চুপ করে বসে রইল কুশল। চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করছে, কান দুটো হয়ে উঠেছে গরম। আয়া পেরাম্বুলেটারটা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, প্রশ্ন করল—"খোকাকে টহলিয়ে নিয়ে আসি মা?"



ওদিককারই মেয়ে, তবে মনিবের বাংলা-প্রীতির জন্য বাংলাই আয়ত্ত করার চেষ্টা করছে। বিশেষ করে, সুহৃতের সঙ্গে হিন্দীতে কথা বললেও কুশলের সঙ্গে বাংলাই চেষ্টা করে। কুশল চকিতে দৃষ্টি নামিয়ে এনে তার মুখের ওপরে রাখল, একটু উগ্র করে নিয়ে এসেই প্রশ্ন করল—"তে হিন্দী ভুল গই?" (তুই হিন্দী ভুলে গেছিস নাকি?)

"আমি তো..."

একটু থতমত খেয়ে গিয়ে কি বলতে যাচ্ছিল আয়া। কুশল কড়া চোখে থামিয়ে দিল—"ব্যাস: কিজিয়ে মেহেরবানি করকে।" (অনুগ্রহ করে থামুন।)

"বাবা দাবো!"

ভালো লাগছিল না খোকার অচল পেরাম্বুলেটারে পড়ে থাকতে আবদার তুলতে যাচ্ছিল, কুশল মুখটা বাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বলল—একটু ধমকের টোনেই বলল—"বোল-বাবুজী যাউঙ্গা।"

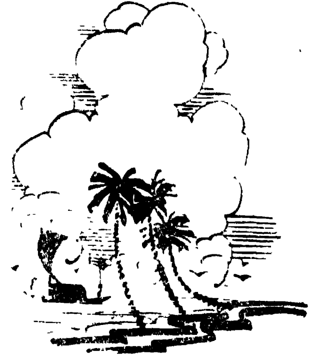
আয়ার দিকে চোখ রাঙিয়ে চেয়ে বলল—"ইসেভি গাবদ: দে রহি হ্যায়!" (এটাকেও মাটি করেছিল)। উঠে পড়ে বাড়িমুখো হয়ে বলল—"লে ওয়াপাস চল।" (নে বাড়ি ফিরে চল।)

সুহৃৎ ফাইল ঘাটতে ঘাটতেই প্রশ্ন করল—"ফিরে এলে যে এক্ষুনি ?"
উত্তর হোল—"এ্যাঁও হি, দিল নেহি লগা।" (এমনি, ভালো লাগল না)।
ফাইল থেকে মুখ তুলে ফিরে চাইল সুহৃৎ, একটু কৌতুক-হাসির সঙ্গে চেয়ে বলল—"বাঃ, হিন্দী ! ··অনেক দিন পরে !"
"কান দুখ্‌তা হ্যায় আপকা ?" (কানে বাজছে ?)—গম্ভীর ভাবেই প্রশ্ন করল কুশল।
"বাজবে ! তোমার মুখে সবই মিষ্টি।"—একটু অভিনয়ের ভঙ্গিতেই বলল সুহৃৎ। এদিকে গাম্ভীর্য একটু বেড়েই গেল—"য্যায়সেকে হিন্দী খুদ্‌হি মিঠি ন হো !" (যেন হিন্দী নিজে হতেই মিষ্টি নয় !)
মনটা রয়েছে ফাইলে, অত আর তলিয়ে বোঝার দিকে গেল না সুহৃৎ। হাসিমুখেই অভিনয়ের ভঙ্গিতেই কলমসুদ্ধ হাতটা একটু চিতিয়ে ধরে বলল—মিঠি ?—আখরি মিঠি ! মুঝে আভি মৎ পিলাইয়ে। নশেমে আ জাউঙ্গা, কাগজাৎ বরবাদ হোয়েঙ্গে।" (মিষ্টি !—যতদূর মিষ্টি হতে হয়। আমায় আর পান করিও না ; নেশা ধরে গিয়ে কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলব।)
একটা অভিনয়ের দৃষ্টি হেনে ঘুরে কাগজে মন দিল।
কথাটা উঠল আবার রাত্রে। সুহৃৎ যখন ক্লাব থেকে ফিরল।
একটা বাংলা কাগজ নিয়েই ফিরল সুহৃৎ। মুখটা থমথম করছে। অন্যদিন হলে উদ্বিগ্ন হয়েই কারণটা জিজ্ঞেস করত কুশল, আজ কথার ভাগ কমিয়ে এনেছে বলেই একটু আড়চোখে চেয়ে দেখল শুধু। সুহৃৎ বলল—"হিন্দী ! হিন্দী ! হিন্দী ! এরা যেন মাথায় চড়ে বসেছে, না সবাইকে গিলিয়ে ছাড়বে না ! আছে কি তোদের হিন্দীতে শুনি, যে সবার কাঁধে তাকে রাষ্ট্রভাষা করে চাপাতেই হবে ? কেন, বাংলাই বা হবে না কেন ? বঙ্কিম—রবীন্দ্রের ভাষা ভারতবর্ষকে বাইরে পরিচিত করে দিল—তার সামনে কিনা এই দেখো না কাগজটাতে কি রকম জোর-কলমে লিখেছে ··"
কাগজটা ছুঁড়ে দিল সামনে। কুশল টেবিল গোচাচ্ছিল, অবাঞ্ছিতের মতো ঠেলে দিতে নিচে পড়ে গেল সেটা।
আরম্ভ হয়ে গেল।
দাম্পত্য কলহের গভীরে প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। সারাংশ—সুহৃৎ তার বাংলা নিয়ে, কুশল তার হিন্দী নিয়ে আলাদা আলাদা রাত কাটাল।
সকালে সুহৃৎ কুশলের পরেই উঠল ঘুম থেকে, যেমন রোজ ওঠে। বাইরে এসে দেখল, কুশল সেজেগুজে তোয়ের। জানাল বাপের বাড়ি যাচ্ছে। হিন্দীতেই জানাল।
সুহৃৎ প্রশ্ন করল—বাংলাতেই অবশ্য—"আর খোকা ? ও-ও তো সেজেছে দেখছি।"
"মা সা পালিয়ে তো রাখিয়ে।"—প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপেই উত্তর দিল কুশল। অর্থাৎ মা'র মতো পালন করতে পার তো রাখো। সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—"কাফি হিন্দী শিখ্ লেতা হ্যায় তো ফিন ভেজ দুঙ্গী।" (হিন্দীটা পুরোপুরি শিখে নিক, তারপর দোব পাঠিয়ে।)

ট্যাক্সি ডাকতে বলে দিয়েছিল, এসে দাঁড়িয়েছে। আয়ার কোলে খোকাকে এগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বেশ কিছু দিন গেল। ওদিককার সম্বল হিন্দী কাগজগুলো, এদিককার সম্বল বাংলা ; তাদের ভাষা রাজ্যে রাজ্যে বিভেদ ঘটাতে সমর্থ, একটা অবুঝ দম্পতি তো কোন ছার। তারপর অবশ্য অচল হয়ে আসতে লাগল। বিশেষ করে সুহৃতের পক্ষে। মাধ্যাকর্ষণের ঝোঁকটা তো চিরকালই মাটির দিকে, আকাশেরই তো আসতে হয় নেমে। তার ওপর খোকার টান আলাদা। একদিন বসে একটা চিঠি লিখল সুহৃৎ। ভাগ্যে খোকা গিয়েছিল, তাই সুবিধা হোল তাকে অবলম্বন করেই লিখতে। সাত-পাঁচ ভেবে হিন্দীতেই লিখল। ওদেশেই মানুষ, অজানা নয়তো!
উত্তর এল। হিন্দীতেই। কুশল ভুলে গেছে বাংলা। সংক্ষিপ্ত উত্তর, খোকার খবরটুকুই দিয়ে।
দীর্ঘতর করতে হোল সুহৃৎকে তার চিঠি। একটা সংগত প্রস্তাব—বেশ, হিন্দী-বাংলা দুই-ই চলুক বাড়িতে, যার যা ভাষা। ছেলেদের মধ্যে একটি সন্তান যাবে হিন্দীর দিকে, তার পরেরটি বাংলা। কিংবা যদি কুশলের পছন্দ হয় তো ছেলে যাবে বাংলার দিকে, মেয়ে হলে সে হিন্দীর ; বেশি কম যার ভাগ্যে যেমন হয়।
কুশল লিখল—সে রাজি। আপাতত খোকা বাংলাতেই কান্নাকাটি করে তার কান ঝালাপালা করে তুলেছে। তাকে যেন শীঘ্র স্থানান্তরিত করা হয়।
ওর তো পরামর্শ দেওয়ার লোক রয়েছে বাড়িতে। ভাজ, বোন।

বারাণসীর দুই প্রান্তে দু-জনের বাড়ি।
সন্ধ্যার একটু আগে একটা ট্যাক্সি করে উপস্থিত হোল সুহৃৎ। বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতেই আরম্ভ করে দিল—"কেঁওরে খোকা। তু···"
ঘর থেকে হন্ত দন্ত হয়ে বেরিয়ে এল তিনজন—ভাজ গীতা, বোন ললিতা আর কুশল নিজে। থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সুহৃৎ জোড়হাত কপালে তুলে বলল—"নমস্তে ভাবিজী, ললিতা দেবী নমস্তে।"
হাত জোড় করেই কুশলের দিকে চেয়ে বলল—"ময়া আ পহুঁছা হুকুম মোতাবেক। অব···"
"তো আইয়ে, বিরাজিয়ে···"
—হিন্দীতে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে কুশল বাংলাতেই হেসে উল্টে পড়ল ভাজ গীতার কাঁধে, বলল—"দ্যাখো তো ভাবিজী, এরকম পাগল মানুষ নিয়ে কি করে চলে আমার!"



বৈদিক ও গান্ধর্ব

যা হল সেটা সম্ভব হল বিবাহটা নিতান্তই কাছাকাছি এপাড়া-ওপাড়ার মধ্যে বলেই। নইলে একজন প্রস্তাবটা করল, তাও মেয়েই, অপর জন রাজি হয়ে গেল, তার পরেই টোপর, মুকুট, মালাবদলের ব্যাপার-এরকম সচরাচর হয় না।

যে বর হল, চিন্ময়, তার বাড়ি উত্তর পাড়ার দক্ষিণে, কনে চপলার বাড়ি দক্ষিণ-পাড়ার উত্তর ঘেঁষে, মাঝখান দিয়ে জেলাবোর্ডের চওড়া রাস্তাটা পূবে-পশ্চিমে বেরিয়ে গিয়ে পাড়া দুটোকে আলাদা করেছে। ঝগড়া-রেষারেষি আছে, পাড়ার মধ্যেই হচ্ছে যখন, নামের প্রভেদ তো একটু হবেই। তবে সেটা নিতান্ত সাময়িক; দুর্গাপুজো কালীপুজোয়; নয়তো রোজকার ব্যাপারে মিলেমিশেই আছে দুটো পাড়া। না হবেই বা কেন? —দক্ষিণপাড়ার কত ঘরে উত্তরপাড়ার মেয়ে রয়েছে; তেমনি উত্তরপাড়ার কত ঘরে দক্ষিণপাড়ার মেয়ে। এই তো চপলা গেল চিন্ময়ের বাড়ি।

আজই বিয়ে হয়ে এই প্রথম নয়। এদের বাড়ি আবার খুব কাছাকাছি। চিন্ময়দের বাড়িটা প্রায় রাস্তার ধারেই। উঠানটায় পেয়ারা জামরুল আর একটা মাদারের গাছের ছায়া, কাছে-পিঠের ক'বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা জোটে, ফলের লোভও আছে, খেলাঘর পাতারও সুবিধা। চিন্ময়ও বাদ যায় নি এককালে।

চপলাদের এজমালি বড় বাড়ি। বার-বাড়ি আর ভেতর বাড়ির মাঝখানে একটা বেশ বড় উঠান। পালা করে ঝুলন-উৎসব হয়, যাত্রার আসর বসে। বছরের বাকি সময়টা ছোট ছেলেদের ফুটবল ক্রিকেটের মাঠ। উত্তরপাড়ায় দক্ষিণপাড়ায় ম্যাচও হয়েছে। উত্তরপাড়ার চিন্ময় গোল খেলে দক্ষিণপাড়ার 'চপী' হাততালি দিয়ে ঝুঁটি-নাড়াও খেয়েছে এককালে।

অনেক আগেকার কথা।

তারপর একদিন গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ করে চিন্ময় সুদূর পশ্চিমে চলে গেল কলেজের পড়াশোনার জন্য। মামাবাড়ি, খানিকটা সুবিধা আছে। বাড়ি এসেছে মাঝে মাঝে, তবে অল্প দিনের জন্য। একেবারে পড়াশোনা শেষ করে যখন এল তখন চপলাদের বাড়ির সবার মনে হল, যে ছেলেটা একদিন বাতাবিনেবুর ফুটবল নিয়ে উঠানেই দাপাদাপি করত তার মধ্যে বিবাহের পাত্র হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। মেয়েদের মধ্য থেকেই আরম্ভ হল, কেননা ওদের দৃষ্টি এসব দিকে বেশি প্রখর। চপলার বাপকে বলা হলে তিনিও চোখ বগড়ে বললেন—"তাই তো! তোল না বোসগিন্নীর কাছে কথাটা।" বোস গিন্নী হাসি-হাসি চোখ বড় করে বললেন—"আমাদের চপা! বৌ হয়ে আসবে! তা আসুক বাপু, অষ্টপ্রহর এই বাড়িই নিয়ে থাকত, ইস্কুল হয়ে যেন ছেড়েই দিয়েছে! এই পেয়ারাতলায় কত খেলাঘর পেতেছে, দুজনেই তো; পাতুক এবার আসল ঘর।"

চপলা পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। শেষ হয়ে গেলে ভাবল, এইবার চিনু-দার সঙ্গে দেখটা করে আসবে। কিন্তু ওমুখো হওয়াই বন্ধ করে দিল। চিন্ময় এসেই ওর কথা তুলেছিল—কিন্তু ওদের বাড়ি গেল সে, কৈ চাঁপিকে তো দেখল না।

মা বলেছিলেন—"তার পরীক্ষা, বই নিয়েই ব্যস্ত থাকে নাকি নিরিবিলি বেছে। তিন-মহল বাড়ি তো।"

"ওরে বাবা! সেদিনের চাঁপি বিদুষী হয়ে উঠেছে, মস্তবড়। দেখা হলে কথা কইবে তো?" মন্তব্য করেছিল চিন্ময়। এখন আর ওর প্রসঙ্গই তোলে না।

চেনা ঘর-বর-কনে, লাখ কথার মাত্র গোটাকতক খরচ হল। বেশি দিনও লাগল না; একদিন জেলাবোর্ডের রাস্তার এপারে-ওপারে শাঁক বাজিয়ে বিয়েটা হয়ে গেল। বোসেদের বাড়ির পেয়ারা তলার খেলাঘর চেহারা পাল্টে মিত্তিরদের বাড়ির দোতলায় গিয়ে উঠল।

অবশ্যই ওদেরটাই। অনেক আগেই পেয়ারাতলা থেকে মিটে গিয়ে যেটা হয়তো মনে মনেই ছিল ওদের, তবে পেয়ারাতলা কখনও খালি হওয়ার নয়। সে চিরন্তন। একদল গেছে এখন আর একদল দখল করেছে এসে। চিনু-চাঁপিদের প্রতিভূ হয়ে এসেছে তুটুন, সমী, বেলা, অম্বর আর রতন, বেলা আর অম্বর চিন্ময়দের দিকে। বাকি ওরা তিনজন মিত্তিরবাড়ির। আরও আছে সব, তবে সবাই যে আসেই রোজ, এমন নয়। খেলা রকমারি। স্কুল পাঠশালা আছে, যাত্রা-থিয়েটার আছে, পূজা আছে, পার্বণ আছে, আছে বিয়েও। জিনিসটার মধ্যে দর-কষাকষি, তত্ত্বতাবাস নিয়ে বেয়ানে-বেয়ানে চিপটেন কাটা প্রভৃতি বৈচিত্র্য থাকায় বেশ রুচিকর, তবে বেশি হয় না। প্রথমতঃ, ও-খেলাটা বড়রা বেশি পছন্দ করেন না; আরও তো আছে খেলা, দ্বিতীয়তঃ, ধারাল ঠোঁটওলা একজোড়া বেয়ান থাকা চাই; তুতি, যমুনা, আদু, এই তিনজনের অন্ততঃ দুজন নইলে জমে না। আর থাকা চাই তুটুন আর অম্বর।

বর-কনে হিসাবে তুটুন আর অম্বর আদর্শ। ফুটফুটে দেখতে, বয়সও সবার চেয়ে

কম·তুটুনের বছর ছয়েকের কাছাকাছি, অম্বরেরও বছর সাতের বেশী নয়। এই চেহারা আর বয়স নিয়ে আরম্ভ, তারপর অভ্যাস বশে পোক্তও হয়ে উঠেছে—শান্ত শিষ্ট, অল্পভাষী, যেখানে অল্প একটু হাসবার হেসেও দেয়, কিছু বলে দিতে হয় না বেশী, যা করবার করে যায়।

অবশ্য কলের পুতুলের মতই, নইলে বর-কনে কি জিনিস, বিয়েটাই বা আসলে কি, সে সম্বন্ধে জ্ঞানটা অত্যন্ত ধোঁয়াটে। বয়সেই জন্যই!

মোটামুটি একটা জ্ঞান আছে তার মধ্যে কোনটা বিয়ে, কোনটা দুর্গা-কালী-পুজো, কোনটা সাধ, কোনটা শ্রাদ্ধ গুলিয়ে ফেলে। আলো, বাজনা, লোকের যাওয়া-আসা, তারপর কলাপাতে খাওয়া, মাটির গেলাসে জল,সব মিলিয়ে সবগুলোকেই যেন এক করে রেখেছে। খাওয়া, তা ও হয়তো ঘুমের ঘোরেই, দেখল, তা-ও হয়তো ভিড়ের মধ্যে দিয়ে কোন রকমে একটু, খেলতে খেলতে ছুটে গিয়ে।

এইবার একটু সুযোগ হয়েছে, আর সে সুযোগও যে এখন ভাবে হবে, কখনও ভাবতে পারে নি তুটুন। কদিন থেকেই বাড়িতে হৈ-চৈ যাচ্ছে, তার নিজের দিদিরই বিয়ে। এবার ধারণাটা অনেকটা স্পষ্ট। এ-বাড়ি ও-বাড়ির বিয়ে, যেন অনেকটা খেলাঘরের মতই, তাই বোধ হয় বুঝতে অতটা বেগ পেতেও হচ্ছে না। মিলেও যাচ্ছে খেলাঘরের সঙ্গে, পরশু ওদের বাড়িতে আশীর্বাদ ছিল চিনুদার—চিনুদার সঙ্গেই চপুদিদির বিয়ে, এও এক মজার কথা! কাল ছিল এদের নিজেদের বাড়িতে চপুদিদির আশীর্বাদ; দুটোই ভাল করে দেখছে তুটুন। আজ সকালে গায়ে হলুদ। এর কাপড়ে ওর গায়ে, তার চুলে—হলুদে হলুদে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল দুটো বাড়ি, রাস্তা পেরিয়ে ছুটে ছুটে দেখছে তুটুন। বিয়ের চেহারাটা এবারে পুজো-সাধ·শ্রাদ্ধথেকে বেশ আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেদেরই বাড়িতো। তারপর আবার নিজেও পড়ে গেল ওর মধ্যে।

দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে ঘুমুচ্ছিল, কদিন হুড়োহুড়ি গেছে, আজ আবার রাত জাগতে হবে, পা ঠেলে ডেকে তুলে দিল—"ওরে তুটুন, ওঠ···! ওঠ না রে তুটুন। নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, দ্যাখো, তোর যে বিয়ে।

ধরমড়িয়ে উঠে বসল তুটুন, জিজ্ঞেস করল—"চপুদিদি করবে না?"

ঘর ফাটিয়ে হাসি উঠল—বড়দিদি, সেজবৌদিদি, মানুদিদি, ও-বাড়ির সিধুপিসি, মানুদিদি চোখ বড় বড় করে বলল—"ভেতরে ভেতরে মতলবখানা দ্যাখ একবার, দিদির বরের ওপরই ভাগ!"

আরও কে কি সব বলল গোলমাল করে। খুব একটা হাসি উঠল। বড়দিদি কোলে তুলে নিয়েই বলল—"চল, দিদিরও হবে, তোরও হবে।"

সাবান মাখিয়ে ধুয়ে-মুছে ওপরের ঘরে নিয়ে গেল ওকে। দিদিকে সাজাচ্ছে, পাশে বসিয়ে ওকেও সাজাতে লাগল, দিদির মত করেই, চোখে কাজল, ঠোঁটে রং, মুখে খড়কে দিয়ে কনে চন্দনের ফোঁটা, পায়ে আলতা, হাতের তোলায় রং, দিদির খোঁপায় জরির ফিতে জড়ানো, ওর চুলের জরির ফিতের ফুল। গলায় মালাও একটা।

একঘর মেয়ে, সাজাতে সাজাতে গল্পও হচ্ছে—"এ বেশ বিবাটি হল —খেলাঘরের বর-কনে, তেমনি আবার নিদ-বর নিদ-কনেও পেয়ারা তলার খেলাঘর থেকে আমদানি হল… হ্যাঁ, অম্বরই তো নিদ-বর হল ওদিকে। চিনুর পিসতুতো ভাই বিকুকে ঠিক করা হয়েছিল, বাইরে থেকে আসছে তাকেই সাজিয়ে গুছিয়ে করবে। সে কলকাতার ছেলে, এসব অত বোঝে না তো…একটু বড় সড়ও, লজ্জায় কি ভয়ে বলা যায় না, একেবারে গা ঢাকা দিলে খোঁজ খোঁজ—থানা ডোবা জায়গা—শেষে ইস্টিশন থেকে ধরে নিয়ে এল।…ভালই হয়েছে বাপু, ছেলেটা বড়ও ছিল। মনে হয় সব যেন বোঝে, মুখ খোলা যেত না বাসরে…"

খুব হাসছে সবাই, প্রায় সব কথাতেই হাসি। মানুদিদি সাজাতে সাজাতে মুখটা হাতের তেলোয় তুলে ধরে বলল—"হ্যাঁরে, তুইও পালাবি নে তো ?"

তুটুন ঘাড় নেড়েই জানাল—না, পালাবে না।

আবার একটা ছাত ফাটানো হাসি উঠল। তার মধ্যেই সেজবৌদিদি বলল "খাষি মেয়ে, পালাবে ? বলে, উল্টে দিদির বরকে বেহাত করতে চায় !"

হাসি, হাসি আর হাসি।

এই হাসিই চারিদিকে ছড়াতে ছড়াতে কখন এক সময় সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল, একটা গোলমাল—"ওরে বিয়ে হয়ে গেল, এবার বাসরটা ঠিক করে ফ্যাল।…বাইরে থেকে বরাসন, ফুলদানি সব নিয়ে এস।…নিদ-বর তো রয়েছে, নিদ-কনে কোথায় ? সে এবার ভাগল না তো ? দ্যাখ দ্যাখ !"

ছাতের রেলিঙের ফাঁক থেকে তুটুন কেনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখছিল, বড়দিদি দাঁড় করিয়ে গেছে,… রতুর দিদিমা সিঁড়ি দিয়ে ফুলের তোড়া নিয়ে উঠতে উঠতে বললেন—"সে আগে থাকতেই এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে ; জান না তো ওকে।"

হাসি, তার পেছনেই বরকনে আর নিদ বরের বেশে অম্বর। অম্বরকে সাজগোজ করে এই প্রথম দেখল তুটুন। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে। ইচ্ছে করছে, গিয়ে কথা কয় ওর সঙ্গে, কারুর সঙ্গে আজ কথা কইতে পারছে না তো ভাল করে। একবার একটু কাছাকাছি হয়ে পড়ে কইতে যাচ্ছিল হঠাৎ চপুদিদির দিকে নজরটা ভাল করে যেতে থেমে গেল। একগলা ঘোমটা, আর ঘরের সবাই কথা কইছে, ওর মুখে একটিও কথা নেই। কনে হলে তাহলে নিশ্চয় কথাও বারণ, নিদ-কনেরও তা হলে নিশ্চয় তাই। অম্বর বরং ওকে দেখে একটু হাসল, তুটুন মুখ ঘুরিয়েই নিল, একটু যেন ভয়েই। এখনই হয়তো ধমক খাবে কারুর কাছে।

এর পরেও দেখল তাই।

অম্বর গিয়ে চিনুদার ডান-দিকে বসল, তুটুনকে বসিয়ে দেওয়া হল চপুদিদির বাঁ-দিকে। এরপর ঘরের মধ্যে কত হাসি হল, গান হল, নাচ হল ; নাচল চিনুদার পিসতুতো বোন, যে কলকাতা থেকে এসেছে। সবাই কথা কইল, চিনুদা তো গান পর্যন্ত গাইল কথা কইল না শুধু চপুদিদি।

তাই কথা কইতে পারল না তুটুনও।

কত রাত পর্যন্ত চলল···আর তেমন ভাল লাগছে না তুটুনের। বড় ঘুম পাচ্ছে···আর তত খারাপ লাগছে না আগের মত···অনেক দূরে কোথা থেকে মিষ্টি গান, মিষ্টি বাঁশির আওয়াজ ভেসে আসছে বোধ হয় চিনুদাদার বাঁশি মামাবাড়ি থেকে শিখে এসেছে—কালো ছোট্ট বাঁশি একটা···সুর বাঁশি মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে···ঘুমিয়ে পড়েছিল তুটুন. চপুদিদির পাশে যে রাঙা নরম বালিশটা, বসে বসে যেটাতে হাত বুলোচ্ছিল সেইটেতেই কখন মাথা দিয়ে। যখন ঘুম ভাঙল, দেখে, ঘর প্রায় খালি, রয়েছে শুধু চিনুদাদা, চপুদিদি আর তিনজন। তার মধ্যে ছিল শুধু চিনুদাদার পিসতুতো বোন, যে কলকাতা থেকে এসেছে আর নেচেছিল। এরা তিন জনেই ঘুমুচ্ছে এখানে ওখানে ছড়িয়ে। বাড়িতেও আর কোন সাড়শব্দ নেই।

জেগে আছে শুধু চিনুদাদা আর চপুদিদি। কথাও কইছে খুব আস্তে আস্তে। তবে একেবারে ফিসফিস করেও না।···চিনুদাদা বলল—"এবারে তুমি ঘুমোও আমি চুলে হাত বুলিয়ে দিই।"

চপুদিদি বলল—"ধেৎ।"

ভয় করছে তুটুনের। বালিশের আড়াল থেকে একটু একটু দেখছিল, খুব টিপে চোখ বুজে ফেলল।

এরপর যখন আবার ঘুম ভাঙল তখন এরা দুজনেও ঘুমিয়ে পড়েছে, সমস্ত ঘরটায় একখানা নিঃশ্বাসের শব্দ ভিন্ন আর কোনও শব্দ নেই।



চিনুদাদার ওপাশে, তুটুনের মতই রাঙা নরম বালিশটায় মাথা দিয়ে অম্বরও ঘুমুচ্ছে। সেই যে খুব গোলমাল-হাসি-গানের মধ্যে তার ভাল লাগছিল না, সে ভাবটা আর নেই তুটুনের। তারপর একবার উঠে চিনুদাদা আর চপুদিদির কথা চুপিচুপি শুনে যে ভয় করছিল, সে ভাবটাও নেই। চারিদিক চুপচাপ, বাইরে থেকে ঝিরঝিরে হাওয়া আসছে. বেশ চমৎকার লাগছে। চমৎকার লাগছে ঘুমন্ত চিনুদাদা আর চপুদিদিকে। যতক্ষণ জেগে ছিল, দুজনকে ভাল করে দেখতেও পারেনিতো। সাজগোজ চন্দনের ফুটকি, গলায় জরি-দেওয়া মালা—কী চমৎকার যে দেখাচ্ছে যেন চোখ ফেরাতে পারছে না তুটুন। চুলে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছিল নিশ্চয় চিনুদাদা, হাতটা চপুদিদির মাথার কাছেই বালিশের ওপর পড়ে রয়েছে ওর খোলা মুকুটের পাশে।

তারপরেই অম্বরের ওপর নজরটা গিয়ে পড়ল, সে ওপাশ থেকে এপাশে ফিরে যেতেই। আরও যেন চোখ ফেরানো যায় না। ধুলো-বালি-নোংরা-গেঞ্জি হাফপ্যান্ট যে অম্বর পেয়ারাতলায় বর সেজে এসেছে এতদিন। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না তুটুন। কী

যে মনে হচ্ছে যেন বুঝতেও পারছে না।

তারপর দেখে দেখে একসময় আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। পা টিপে টিপে চিনুদাদা আর চপুদিদির বালিশের পাশ দিয়ে ওদিকে গিয়ে দাঁড়াল। একটু ভয় ভয় করছে এবার, চিনুদাদা একটু নড়েও উঠল, থমকে দাঁড়াল তুটুন, একটা আঙুল কামড়ে ওর দিকে চেয়ে। তারপর আবার এগুল পা টিপে টিপে। হাঁটু গেড়ে বসল অম্বরের পাশে। তারপর বার দুই হাতটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার টেনে নিয়ে শেষে কাঁধটা চেপে একটু নাড়া দিতেই অম্বর উঠে পড়ে ঘুরে চাইল। ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে চুপ করতে ইশারা করল তুটুন, তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি বলল—"বিয়ে করবি রে অম্ম ?"

সদ্য ঘুম ভেঙে একটু ধাঁধা খেয়ে গেছে অম্বর। একবার ওদের দুজনের দিকে, তারপর সমস্ত ঘরটার দিকে বিমূঢ় ভাবে চাইছিল, তুটুন আবার প্রলুব্ধ করে বলল—"সত্যিকারের বিয়ে। এই চিনুদাদা আর চপুদিদির মতন। তাহলে আয় এই পাশের ঘরে। এখানে দেখে ফেলবে সবাই।"

ভোরে একটু হৈ চৈ উঠতে যাচ্ছিল, বরকনেকে তুলতে এসে। বরের টোপর কোথায় গেল ! কনের মুকুট ! এ কি অলক্ষণ ! ভাল করে বেড়ে ওঠবার আগেই নজর পড়ে গেল পাশের ঘরে কোণের দিকটায় ওদের দুজনের ওপর। মুকুটটা তুটুনের মাথায় তখনও আটকে আছে। টোপর অম্বরের মাথা থেকে একটু দূরেই। মালা দুটোও চিনল সবাই। তুটুনেরটা অম্বরের গলায়, অম্বরেরটা তুটুনের।

দুজনে অকাতরে ঘুমুচ্ছে।

দুটি দিনের ইতিবৃত্ত



মেয়ে বোবা নয় মোটেই, বরং যদি একটু বাচালই বলা হয় তো খুব অন্যায় হয় না। তা না হলে কলেজে নাম লেখাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কলেজ-ম্যাগাজিনের সম্পাদক প্রিয়তোষকে প্রথম সাক্ষাতেই ও ভাবে তর্কে কোনঠাসা করতে পারত না, মফস্বল স্কুল থেকে পাস করা একটা দ্বিতীয় বার্ষিকের মেয়ে, এই সবে দ্বিতীয় বর্ষে পৌঁছেছে। ওদিকে, একজন ষষ্ঠ বার্ষিক এম. এ.-র ছাত্র। একবার ফেল করে সপ্তম বর্ষ চলছে তার সম্পাদকের গাম্ভীর্য বজায় রাখবার জন্যে গোঁফ-দাড়িও রেখেছে এ বয়সে যতটা সম্ভব। একটা প্রবন্ধ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।

"এটা আপনাকে ছাপতে হবে।"

একা নয়, আর একটি মেয়ে তৃষাকে সঙ্গে নিয়েছে গোপা; বোধ হয় পারবে না বলে সংশয় প্রকাশ করেছিল। একটু বিস্মিত ভাবেই চোখ তুলে চায় প্রিয়তোষ, তারপর অবশ্য হেসেই বলল—"ছাপাবার উপযুক্ত কিনা বিচার করে দেখবার একটা স্বাধীনতা আছে আমার।"

"কথাটা শুনে আশা আনন্দ দুই হোল—কেননা দেখছি, স্বাধীনতার মর্যাদা আপনি বোঝেন।" জবাব দিল গোপা। "স্বাধীনতার একটা দিক নিয়েই আমার প্রবন্ধটা।"

ততদিন ধরে সম্পাদনার অভিজ্ঞতায় নিশ্চয় নূতন; প্রিয়তোষ আশ্রয়ের জন্যে একটা কোন-কার্যই খুঁজতে লাগল, প্রবন্ধের প্রথম পাতার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বলল—"তা বেশ, রেখে যান। দেখি।"

গোপা বলল—"ওটা সম্পাদকের অবাঞ্ছিত-বিদায়ের ভাষা, শুনেছি, ক'খানাই বা পাতা

আপনি দেখেই নিন না, আমরা দাঁড়িয়েই আছি, কষ্ট হবে না।"

বেশ একটু সূক্ষ্ম খোঁচা আছে, হঠাৎ আক্রমণে একটু ধাঁধা খেয়ে ভুলটা হয়ে গেছে প্রিয়তোষের, লজ্জিত হয়ে একটু ব্যগ্র ভাবেই বলল—"না, না, বসুন চেয়ার দু-খানায় দু-জনে, দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?...বেশ, এখুনি দেখে আমার মতামতটা জানাচ্ছি।"

পড়তে পড়তে মুখের ভাব বদলে বদলে যাচ্ছে, বেশ রাঙাও হয়ে উঠল বার কয়েক। দুই বন্ধুতে একটু গা-টেপাটেপি করল, শেষ করে প্রিয়তোষ মুখটা তুলে গোপার সপ্রশ্ন দৃষ্টির ওপর রাখল। একটি অপ্রতিভ হাসি মুখে। একটু চুপচাপ, তারপর প্রশ্ন করল—"ছাপতেই হবে ?"

"আমার স্বাধীনতা আপনার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে ?"

"তা নয়।"—সেই ভাবেই হেসে বলল প্রিয়তোষ। "বলছিলাম, বড্ড যেন—কী যে বলে—স্পষ্ট। একটু রেখে ঢেকে বলা যায় না ? দেখুন না নিয়ে গিয়ে একটু চেষ্টা করে।"

"স্বাধীনতা জিনিসটা স্পষ্ট নয় কি ? যা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখছি যা সত্যি বলে অনুভব করছি, মাত্র তাইতো লিখেছি। একটাও যে কপোল-কল্পনা নয় এটুকু তো স্বীকার করবেন ?"

"একশবার। তবু এত—কী যে বলে · আর, একজন মেয়ের হাত থেকে ··"

"মেয়ের কথা মেয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি বলবে এটা তার স্বাধীনতা নয় ?"

ক্রমাগত পুনরুক্ত হতে হতে স্বাধীনতা কথাটির সুড়সুড়িও দিচ্ছিল মনে, প্রিয়তোষ হো হো করে হেসে উঠল, বলল—"নাঃ, দেখছি আমার স্বাধীনতা আপনার স্বাধীনতার কাছে পরাভব মানল। বেশ রেখে যায়, ছাপব।"

ছেপে বেরুলে বেশ একটু গুঞ্জরণ উঠে কলেজের আবহাওয়াটা সরগরম হয়ে রইল কিছুদিন। সবার দৃষ্টির লক্ষ্যস্থল হয়ে রইল গোপা। বেশ মানিয়েও রইলও। গটগট করে সিধা চাল, টপটপ করে সোজা জবাব। স্বাধীনতার একটা জয়পতাকা।

তারপর বছর দুই কেটে গেছে। এর মধ্যে অনেক জল হাওড়ার পুলের নিচে দিয়ে বয়ে গেছে, অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটেছে সংসারে, তার মধ্যে একজন যে স্বাধীনতা হারিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরতে যাচ্ছে, তার কথাই বলি, গোপার বিবাহের কথাবার্তা হচ্ছে।

দেখতে এসেছে পাত্র নিজে আর তার এক বন্ধু। এ ব্যবস্থাটুকুতে গোপার নিজের একটু হাত আছে। এর আগে আর একবার এ হ্যাঙ্গামা হয়ে গেছে। সেবার প্রথমে দেখতে এলেন ছেলের অভিভাবকরা—বাবা, মামা, বড়বোন, পছন্দ করেই গেলেন। তারপর পাত্র নিজে দেখতে এল, সঙ্গে এই রকম একজন বন্ধু। বন্ধু গানের ফরমাস করল।

কলেজ-ম্যাগাজিনের সে উগ্র যুগ হলে কি করত বলা যায় না, তা ভিন্ন বাড়ি আর কলেজে প্রভেদও আছে। গোপা চোখের কোণ তুলে তৃষার দিকে চাইল। দুই সখীতে

ব্যবস্থা করাই ছিল, তৃষা পাত্রের বন্ধুকে বলল—"জিজ্ঞাসা করছে, আপনারা কি গান শুনতে চান ? দু-জনের কথাই জিজ্ঞেস করছে।"

গোপা একটু চোখ পাকিয়ে ওর দিকে চাওয়ায় বোঝা গেল, একটু বাড়িয়েই বলেছে তৃষা, দু-জনকে টেনে বলেনি গোপা,·· এ মেয়েটা আবার দু-বছরে গোপাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

বন্ধু পাত্রের দিকে চাইল। সে কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কি বলতে তৃষাকে জানাল—আশাবরী শুনতে চায় ওরা।

গোপার ঠোঁটে খুব ক্ষীণ একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। বন্ধুর দৃষ্টির সংকেতে তৃষা তার মুখের কাছে কানটা নিয়ে গিয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে বলল—"ও বলছে, জোর করেন তো গায়। সন্ধ্যায় ভোরের আশাবরী—সে তো নেহাত অপছন্দ হওয়ার ভয়েই গাওয়া।"

একটু বেশী চোখ পাকিয়েই চেয়েছিল গোপা, বোঝা গেল এর অর্ধেকও ওর কথা নয়। কিন্তু ভেঙে গেল সম্বন্ধটা, তাই এবার ঠিক হয়েছে, পাত্রই আগে দেখে যাবে। এবার পরিবেশটাও একটু অন্যরকম।

প্রথমতঃ তৃষা নেই, আসতেই চায়নি বাড়ি থেকে। গোপাকে বলেছে—"সেটা যেন কি রকম ছিল, ভাগিয়ে দিলাম তাই, এটিকে তোর কাছ থেকে ভাগিয়ে নিজেই নিতে ইচ্ছে করছে আমার, থাক, আর লোভ বাড়াতে চাই না।"

দ্বিতীয় কথা, আজ অকুস্থলে স্বয়ং গোপার কাকা রয়েছেন!

ওর অভিভাবক। বরের সঙ্গে তার বন্ধু দেখতে আসছে, একটু সংকোচ বোধ করতে, পারে প্রশ্নাদি করতে, তাই সেবার অনুপস্থিত ছিলেন। ফলটা ভালো হয়নি দেখে আর ও সম্ভাবনার পথ খোলা না রেখে নিজে উপস্থিত আছেন, ও'র বন্ধু, পাড়া সম্পর্কে গোপার আর এক কাকাকেও ডেকে নিয়েছেন। আসারটা বেশ একটু গমগম করছে।

দু-খানি কার্পেটের আসনে পাত্র আর তার বন্ধু বসে আছে গোপা দরজার কাছে এসে একটু চোখ তুলেই এমন থমকে দাঁড়াল, মনে হলো যেন ফিরে যেতে চায়।

কাকা বললেন—"কি হলো ? আয়, বোস এসো।"

দৃষ্টিটা আবার নত হয়ে গেছে, এবার আরও বেশীই। গোপা আস্তে আস্তে এসে সামনের গালিচাটার ওপর জড়োসড়ো হয়ে বসল। বাঁ দিকে যে বসে আছে—পাত্রের বন্ধু পাকা মেয়ে-দেখিয়ের মতো মোটা ফ্রেমের চশমার ভেতর থেকে বেশ খুঁটিয়ে দেখল একটু। তারপর অনুমোদনের ভঙ্গিতেই বলল—"বেশ, বেশ! আপনার নাম ?"

এত মুরুব্বিয়ানা করে বলবার বয়স নয়, যদিচ চেহারাটা সাধ্যমতো মুরুব্বি গোছের করে রেখেছে। চোখে মোটা ফ্রেমের গগলস্ মুখে দাড়ি-গোঁফ, কোন্ একটা নাম করা মাসিক-পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীর মধ্যে নাকি রয়েছে।

প্রশ্নে একবার চোখ তুলে আবার নামিয়ে নিল গোপা, এবার ঘাড়টাও নীচু হয়ে গেছে,

উত্তর কিছু দিল না, বা দিতেই পারল না।

সমস্ত ঘরটা থমথম করছে।

একটু অপেক্ষা করে যুবক আবার বলল—"বলুন, সংকোচ কিসের ?"

উত্তর নেই। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেছে, কলেজে কবে কি লিখেছিল না জানুক, বেশ সপ্রতিভ মেয়ে বলেই তো জানে সবাই।

কাকা বললেন—"বলু না নামটা।"

তারপর হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় ওর সংকোচটুকুকেই কাজে লাগালেন, একটু লঘুভাবে হেসে বললেন—"হড্ড লাজুক মেয়ে, ওর নাম গোপা।"

"আমার ধৃষ্টতা মাফ করবেন।" হাতজোড় করেই বলল যুবক—"মেয়ে দেখতে এসেছি, নামটা আর জানব না ?" তবে কিনা…।"

"তা বই কি, ওর মুখ দিয়ে শোনা দরকার তো !" কাকার বন্ধু বললেন। গোপার দিকে চেয়ে বললেন—"বলো মা, নাম বলবে তাতে লজ্জা কি ?"

ফল হলো না। একটি মেয়ে ট্রে করে দু'কাপ চা আর দু'প্লেট খাবার রেখে গেল দু-জনের সামনে।

কাকার বন্ধু বললেন—"একটু মিষ্টি মুখ করে নিন। ততক্ষণ একটু সামলে উঠুক। আজকালকার মেয়েদের মতন তো নয়—মুখে খই ফুটছে একেবারে!… ভীষণ লাজুক যে !"

"ধৃষ্টতা মাফ করবেন আমার। একটা দায়িত্ব নিয়ে এসেছি, ওঁদের গিয়ে সঠিক রিপোর্ট দিতে হবে। এক পেট খেয়েই বসে থাকব আগে- এটা যেন কেমন মনে হয় না ? খাওয়া মানেই তো মুখ বন্ধ করে ফেলা।"



তারপর একাল থেকে নিজেকে সম্পাদকীয় সেকালেই নিয়ে গিয়ে সেকালের উপযোগী করে বলল—"আমাদের বিপদ কি জানেন ? একালের ছেলেরা আবার একালের মতন মেয়েই চায়—ঐ যা আপনি বললেন—মুখে খই ফুটবে। এরা যদি পুরুষের অধিকার নিয়ে কিছু বলতে যায়, ওরা নারীর অধিকার নিয়ে দু' পর্দা চড়িয়ে বলবে।…চায় এ রকম, আপনি আমি কি করতে পারি বলুন।… কি হে বলো না, ভুল বলছি ?"

পায়ের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করতে সে মুখটা নিচু করে নিয়ে একটু লজ্জিত ভাবে হাসল।

"ভুল বলবই বা কেন ? কাগজটা চালাতে তো দেখতে পাচ্ছি নিজেই। ছেলেদের একটু নরম করে লিখতে বললে তবু শোনে। মেয়েদের ?—রামঃ, একটি অক্ষর বাদ দিতে বলুন তো !"

ছেড়ে দিয়ে বলল—"যাকগে দুঃখের কথা, আচ্ছা, নাম থাক। কি পড়াশোনা করছেন আপনি ?"

উত্তর নেই। শুধু ঘাড়টা আরও নেমে গেছে। ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। ওরা দুজনে, গোপার ব্যবহারে কি যুবকের ডেঁপোমিতে রুদ্ধবাক হয়ে গেছেন, বলা শক্ত।

"বেশ থাক, আপনি না হয় এটা থেকে একটু পড়েই শোনান।"

পাঞ্জাবির ওপর বানডি, তার ওপর একটা র‍্যাপার জড়ানো, তার ভেতর থেকে একটা মাসিক পত্রিকা বের করল যুবক। বলল—"এতো আর কিছু বলা নয়, যা লেখা রয়েছে লাইন ধরে পড়ে যাওয়া।"

একটা জায়গা খুলে সামনে ধরে দিয়ে বলল—"এই খানটা পড়ুন।"

বছর দুয়েক আগের গোপার লেখা সেই প্রবন্ধ। এই মেয়ে দেখা নিয়েই, লেখা আছে —"একটা বর্বর প্রথা। পুরুষেরা আরণ্য যুগ থেকে যে আদিম হিংস্র দাম্ভিকতা বহন করে এনেছে তাদের ধমনীর রক্তে, সে-অত্যাচারের উত্তরাধিকার এই মেয়ে দেখা। আর একটা বড় দৃষ্টান্ত এই যাচাই করে নেওয়া, যেমন সে-যুগে বাছাই করে নিত শিকার করা হরিণের সেরা অংশটা তার ভাগে পড়ল কিনা।" লেখা আছে—"যাচাই আমাদেরও করে নিতে হবে এবার · বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াতে হবে ··"

এই ধরণের আরও।

এক জায়গাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে গোপা। কাকা বললেন, কাকার বন্ধু বললেন, ফল হলো না। যুবক তাঁদের বলে যাচ্ছে—"আসতে আসতে প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিঙে পুরানো বইয়ের সঙ্গে দেখলাম পত্রিকাখানা। একটা প্রবন্ধে নজর পড়ে যেতে দেখি খুব জোর লেখা ·· বোবার মুখেও কথা ফুটিয়ে ছাড়বে। নিয়ে নিলাম।"

একটু হাসল। ওর কথাটা ধরেই কাকা বললেন—"ও কিন্তু বোবা নয় মোটেই, এখন হঠাৎ কি রকম হয়ে গেছে। আপনারা একটু খেয়ে নিন, চা'টা হয়তো জুড়িয়ে গেল। বোবা যে নয়, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাবেন।"

"বড় ধৃষ্টতা করে ফেলেছি আজ, ক্ষমা করবেন।"—আবার সেই রকম জোড় হস্তেই বলল যুবক—"খাওয়া মানেই তো মেনে নেওয়া যে পছন্দ হয়ে গেছে। সেটা আর একটু না দেখে—মস্তবড় একটা দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছি তো···ও কি হে!!"

পাত্র একটা নিমকি তুলে নিয়ে মুখে দিয়েছে, মচ করে শব্দ হতে ঘুরে দেখে যেন হাল ছেড়ে দিল যুবক। একটু নিরাশভাবেই কাকার দিকে চেয়ে বলল—"ঐ নিন, তা হলে আর আমার গরজটা কিসের বলুন? ঠিকই আছে।"

গোপার সামনে থেকে পত্রিকাটা সরিয়ে নিয়ে বলল—"আপনি তা হলে যান। মিছিমিছি এই শীতে ঘেমে সারা হয় কেন···প্রমাণ দেওয়ার যথেষ্ট সময় পাবেন।"

শেষের কথাগুলো অবশ্য মাত্র দু জনেই শুনতে পেল, পাত্র আর গোপা।

বিয়ের ফুল



রামতনু সাত-সাত জায়গায় মেয়ে দেখিয়া ফিরিল, কিন্তু পছন্দ আর হইল না। সব গুলিই জবুথবু হইয়া সামনে আসিয়া বসে; হাজার চেষ্টা করিলেও ভাল করিয়া দেখা হয় না। সেইজন্য হাজার সুন্দর হইলেও মনে কেমন একটু খুঁত থাকিয়া যায়। সন্দেহ হয়, আচ্ছা এ যে চোখটা কোনমতেই বড় করিয়া চাহিল না, নিশ্চয়ই কোন দোষ আছে, ওর যে খোঁপার এত ধুম, ওইখানেই গলদ নাই তো? ইত্যাদি।

না'হুক এই সাত ঘাটের জল খাইয়া রামতনু বুঝিল, কন্যামননের এ প্রশস্ত উপায় নহে। একটা প্রশস্ত উপায় মনে মনে ঠাওরইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় বউদির মুখে একদিন শুনিল, তাহার সম্পর্কে এক পিসীর কন্যা সম্প্রতি প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত পাস করিয়া জলপানি পাইয়াছে। রামতনু বেচারা এতদিন বেশিরভাগ পাড়াগাঁয়ে পুঁটি-খেঁদীদেরই সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল, সুতরাং এখন খবর পাইয়া এই সুশিক্ষিতা যুবতীরত্নটির জন্য তাহার হৃদয় একেবারে পিপাসিত হইয়া উঠিল।

'দেখা নাই, বুঝা নাই, এইরূপ হইল কি করিয়া'—ইত্যাকার সন্দেহ যদি কাহারও মনে উদয় হয় তো কৈফিয়ত এই মাত্র দেওয়া যায় যে, প্রেম সবসময় চোখে দেখার তোয়াক্কা রাখে না—'হৃদয় মরুভূমে' আপনার খেয়াল মতই গজাইয়া উঠে। তাই বউদিদি সংবাদটি দিতে একটু অশোভন হইলেও রামতনু প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল "কত বয়স তার, দেখতে কেমন?"

বউদিদি ইহাতে তাচ্ছিল্যের সহিত মুখটা ঘুরাইয়া বলিলেন, "পোড়া কপাল, তোমার বুঝি অমনই নোলার জল এল? পুরুষের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে পাস করে, সে মেয়ের

আবার বিয়ে ! গলার দড়ি জোটে না ? কোন দিন বা কাছা কোঁচা এঁটে পুরুষের সঙ্গে অপিসে বেরুবে !"

রামতনু বেজায় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। বুঝিল, কথাগুলা বড় অসাময়িক হইয়া পড়িয়াছে। বয়স এবং চেহারার সহিত পাস দিবার বিশেষ সম্বন্ধ সে নিজেই তেমন খুঁজিয়া পাইল না। কথাগুলা তাহার মনের আকস্মিক উন্মাদনার খবরই বাহিরে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। সামলাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "না গো না, সে কথা নয়, কত বয়সে পাস দিয়েছে—তোমার গিয়ে, ষোল বছরের কমে—অর্থাৎ কিনা—"

বউদিদি হাসিয়া ফেলিলেন।

রামতনু মুখ-চোখ রাঙা করিয়া আরও দুই-তিন বার 'অর্থাৎ কিনা' 'অর্থাৎ কিনা' করিয়া তখনও বউদিদি হাসিতে দেখিয়া হঠাৎ চটিয়া উঠিল ; বলিল, না বৌদি, সব সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না।"

পূর্বের মতই সুতীক্ষ্ন হাস্যসহকারে বউদিদি উত্তর করিলেন,"বিশেষ ক'রে মনের অবস্থা যে-সময় খারাপ, না ? আহা, শুধু পাস করা শুনেই বেচারীর এই দশা, যখন শুনবে চোদ্দ বছর বয়স, দেখতে পটের ছবিটির মতন, তার ওপর আবার পদ্য লিখতে পারে, তখন বোধ হয় মুচ্ছো যাবে।" মূর্ছা যাইবার লক্ষণ রামতনুর তখনই প্রকাশ পাইতেছিল —রাগের চোটে। কোন রকমে আত্মসংবরণ করিয়া ঘর হইতে সক্রোধে বাহির হইয়া গেল।

এই ঘটনাটির পর ছোকরা হঠাৎ বড় নির্জনতাপ্রিয় হইয়া উঠিল। বৈকালে দেখা গেল, সে মাঠে একলা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং সন্ধ্যার সময় তাহাকে বড় একটা দেখাই গেল না, রাত্রে ডালের সহিত দুধ মাখিয়া এবং মাঝে মাঝে আলুর শাঁস বাদ দিয়া খোসা খাইয়া সে আহার শেষ করিল এবং তাহার পর বিছানায় আশ্রয় লইল। রাত একটার সময়ও সে জাগিয়া মশারির চালে কল্পনার রঙিন ছবি আঁকিতেছে।

তাহার পরদিন কিন্তু মেঘ কাটিয়া গেল, এবং রামতনুকে বেশ প্রফুল্ল দেখা গেল। স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল যে, সে রাতারাতি একটা মতলব আঁটিয়া ফেলিয়াছে। সে স্থির করিল, প্রজাপতির সহিত এ পর্যন্ত সাত-সাতটা বাজি হারিলেও আর এক হাত খেলিয়া দেখিবে। এবার আর পরের কথায় নাচিয়া চট করিয়া কন্যা দেখিতে ছুটিয়া তিক্ত মুখে ফিরিয়া আসা নয়। পূর্বরাগের পালাটা দস্তুরমত শেষ করিয়া অন্য কথা। তবে দেরি আর কোনমতেই করা চলে না। সে মানসচক্ষে দেখিতে পাইল, এই বিদুষী তরুণীটির জন্য যুবকমহলে একটা চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে, এবং স্বয়ম্বর সভায় প্রত্যেক প্রার্থীর মতন যদিও সে নিজেকেই সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় মনে করিল, তথাপি ভাবিল না, দেরি করাটা নিরাপদ নয়। অভাবের মাথায় চাই কি এক অবাঞ্ছনীয়ের গলায়ই বরমাল্য পড়িয়া যাইতে পারে।

সকাল বেলায় একটু এদিক ওদিক করিয়া কাটাইল ; তারপর হঠাৎ বউদিদির নিকট একটা পুরানো টেলিগ্রাম লইয়া গিয়া বিরক্তভাবে বলিল, "এই নাও যা মনে করেছিলুম তাই ;

আমার আর থাকতে দিলে না।"
টেলিগ্রাম দেখিয়া বউদিদির মুখটা শুকাইয়া গিয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।
রামতনু বলিল, "ভয় পাবার কিছুই নেই ; তবে আমায় কালই যেতে হবে।"
"কাল ? এই বললে বারো দিন দেরি আছে !"
"আমি বললেই তো আর হচ্ছে না, বিশ্বাস না হয় টেলিগ্রামটা পড়িয়ে নাও কাউকে দিয়ে।"—বলিয়া পাছে সত্যই কাহাকেও দিয়া পড়াইয়া লওয়া হয়, এই ভয়ে সেটা সঙ্গে সঙ্গে পকেটে পুরিল এবং হঠাৎ অধিকতর বিরক্তভাবে সেটাকে বাহির করিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া বলিল, "আরে রামঃ এমন কলেজেও মানুষ পড়ে !"
এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞা বউদিদি সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "তা ভাই, কি করবে বল ; কামাই করাটা কি ভাল হবে ? তোমার দাদা শুনে আবার চটবেন। কিন্তু এমন কেন হ'ল বল তো ?"
রামতনু পূর্বের মতই রাগভাবেই বলিল, "কে জানে ? শুনেছিলাম লাটসাহেব নাকি কলেজ দেখতে আসবে, তাই হবে বা।"
বউদিদি রাগিয়া বলিল, "মুখে আগুন লাটসাহেবের, সে আর মরবার সময় পেল না ! ঘরের ছেলে দুদিন ঘরে এসে বসবে, তাতেও সোয়াস্তি নেই।"
যেন অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল—এই ভাবে রামতনু বলিল "চুলোয় যাক ; হ্যাঁ তোমার সেই পিসের বাড়িতে যেতে পারব না। সে আগে থাকতেই বলে রাখছি।"
এই সরল হৃদয় রমণী ভাবিলেন কালকের ঠাট্টায় দেবর তাঁহার রাগ করিয়াছে। সেইজন্য সেইখানেই যাওয়াইবার জন্য বেশি জিদ করিয়া বসিলেন। ঠিকানা দিলেন মাথার দিব্য দিলেন, এবং যাহাতে হাঁটিয়া যাইতে না হয় তাহার জন্য ভাড়াও কবুল করিলেন। রামতনু ঠিকানাটা লওয়া উদ্দেশ্য ছিল ; সেটি মনে মনে মুখস্থ করিয়া লইল। বাহিরে কিন্তু খুব মাথা নাড়িয়া বউদিদিকে বলিল, "সে হতেই পারে না, আমি সেখানে যেতেই পারব না ; তুমি আমায় তা হ'লে চেন নি।"
পরদিবসই যাওয়া ঠিক হইল। দাদা তাহার বাড়িতে ছিলেন না। রামতনু ভাবিল, স্ত্রীর মুখে তিনি যখন এই উদ্ভট কথাটা শুনিবেন তখন নিশ্চয়ই ভাবিবেন, রামতনু ভ্রাতৃজায়ার সহিত খুব একচোট ঠাট্টা করিয়া গিয়াছে ; ততদিন সে একটা সুসম্মত কারণ খুঁজিয়া বাহির করিয়া ফেলিবে।
মা বধূমাতার মুখে শুনিলেন। অঞ্চলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, "রামুর আমার পড়া শুনার ঝোঁকটা এই রকম। আহা, ও কি বাঁচবে আমাদের পোড়া অদৃষ্টে ? সবই ভাল বাছার তবে ওই কেমন বিয়ের ফুল আর ফুটছে না !"

যাহা হউক, কোর্টশিপ করিবার উদ্দেশ্যে সুটকেস, বিছানা, স্টীলের ট্রাংক, টিফিন কেরিয়ার ইত্যাদি গাদাখানেক লটবহর সমেত রামতনু কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল। হাওড়ায় পৌঁছিল সন্ধ্যার ঘণ্টা দেড়েক পূর্বে। মনটা তাহার উৎসাহে পূর্ণ হইয়া

উঠিল। এইবার সে সেই বাঞ্ছিতার নিকট পৌঁছিল, যাহাকে আজ তিন দিন ধরিয়া কল্পনা ও স্বপ্নের মাঝে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। পুলটি পার হইলেই তাহার ওই তীর্থরূপানগরী। ওঃ কাল এতক্ষণ!—ভাবিতেও অসহ্য সুখ।

অন্যমনস্কভাবে মালকোঁচা আঁটিয়া ভার নিপীড়িত কুলিটাকে একটা ধমক দিল; এবং নিজেই বিছানার পুঁটলিটা হাতে ঝুলাইয়া লইল। নিকটে একটা ছোঁড়া একটা ফিটনের দ্বার খুলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভারটা নেহাত অসহ্য বোধ হওয়ায় রামতনু না বলিয়া সেটা দ্বারপথে সেই ফিটনের মধ্যে চালাইয়া দিয়া অগ্রগামী দূরবর্তী কুলিটাকে ডাক দিল, ওরে বেটা, এদিকে—এখানে।"

ছোঁড়াটা ব্যাপার দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে আবার কুলিটাকে গাড়ির দিকে আসিতে দেখিয়া অগ্নিশর্মা হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "এটা মালগাড়ি আছে নাকি বাবু—যেতো পারছো চাপাচ্ছে? আমার আয়েসী বিলেতী ঘোড়া; বাজে মাল টানতে পারব না।" তাহার পর রামতনুর সহিত অন্য লোক নাই দেখিয়া বলিল, "আলবৎ, আমি যেতো পারবে এসো তাতে 'না' বোলবার ছেলে নয়।"—বলিয়া ঘোড়াটার চর্মসার জঙ্ঘায় একটা চাপড় দিয়া বলিল, "কিরে বেটা, না?"

রামতনু কথাটা প্রমাণের জন্য একবার 'আয়েসী বিলেতী' ঘোড়াটার পানে চাহিল, দেখিল, সে বেচারী দীন নয়নে মোটগুলোর দিকে চাহিয়া আছে। তাহার সুস্পষ্ট মোটা মোটা পঞ্জরের বেড়ার মধ্যে শিরাবহুল স্থূল পেটটি দেখিলেই বোধ হয় সে তাহারই ভারে কহিল যে, অন্য ভার বাহিবার আর তাহার সামর্থ্য নাই। "ভবে বেঁধে মার সয় ভাল'—ভাবটা যেন অনেকটা এই রকম গোছের।"

কিন্তু অনুকম্পার এ অবসর নহে, বরং দুই পয়সা ভাড়া বেশী দেওয়া যাইতে পারে, সেই বালকের কথায় অনাদর দর্শাইয়া রামতনু বোঝাগুলি কুলির মাথা হইতে নামাইতে ছিল, এমন সময় এক সাহেব—আরোহীর সহিত গাড়োয়ান স্বয়ং আসিয়া দেখা দিল। সুখের বিষয় কোন বচসা হইল না, কারণ এই নবৈশ্বর্যগর্বিত গাড়োয়ানটার সহিত আর বাক্যবৃদ্ধি নিরাপদ নয় জানিয়া রামতনু স্বহস্তেই বোঝাটি গাড়ি হইতে নামাইয়া লইল।

ফিনট চলিয়া গেল। চালকের পাশে আসিয়া সেই ছোঁড়াটা একবার রামতনুর পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে গাড়োয়ানটাকে কি একটা বলিল। কথাটা শুনিতে না পাইলেও রামতনু অপমানের আঘাতে বড় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। তাহার বাঞ্ছিতার ছবিটি মনে এতই সজীব হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার মনে হইল, যেন তাহার সম্মুখেই তাহাকে এই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে।

কিন্তু নিরুৎসাহ হইলে কাজ চলে না। এদিকে সব গাড়িই প্রায় ভর্তি হইয়া আসিতেছে। রামতনু কুলিকে বলিল "নে ওঠা, ও বেটা বড় বেঁচে গেল আজ আমার হাত থেকে।"

কুলিটা থপ করিয়া একটু নীচু হইয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, "না বাবু আমায় চুকিয়ে দিনা আপনি বড়ো ফ্যাসাদে লোক আছেন।"

গাড়োয়ানটার মত কুলিটারও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল বলিতে হইবে। তাই অদূরে কয়েজন

ব্যর্থমনোরথ গাড়োয়ানকে সেই অভিমুখে হুড়াহুড়ি করিয়া আসিতে দেখা গেল এবং তাহাদের মধ্যে একজন বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত আগুয়ান হইয়া মালগুলিতে হাত রাখিয়া সঙ্গীগণকে শাসাইয়া দিল, "বাস করো, মেরা সওয়ারি হ্যায়।" এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহকারী বালককে ডাক দিল, "এ ইসমাইল, আরে চলু শা—"

তাহাকে লইয়াই এত কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া রামতনু আবার বেশ সপ্রতিভ হইয়া উঠিল এবং গাড়ি আসিলে গদিতে একটা চাপ দিয়া বসিয়া বলিল, "হাঁকাও।"

ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষিয়া গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যেতে হোবে বাবু?"

রামতনু একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। তাই তো, কোথায় যাইতে হইবে? সর্বনাশ! এ কথাটা যে রামতনু নিজেই জানে না। কলেজের হস্টেলে যে তালা আঁটা—একথা তো সে একেবারও ভাবে নাই। কি বিভ্রাট! এখন উপায়? এদিকে সন্ধ্যা আগতপ্রায় আর সঙ্গে এই এতোগুলো অতিকায় মোট! এই তিন দিন পড়াশুনা ছাড়িয়া এত যে ছাইভস্ম চিন্তা করিল, তাহার মধ্যে এই এত বড় চিন্তাটা কি মনে একবারও স্থান দিতে নাই?

কবিরা বলেন, প্রেম অন্ধ। তা যখন হইয়াছিল, তখন তো অন্ধ করিয়া ছিল, কিন্তু এখন নেশা কাটিয়া গেলেও রামতনু চক্ষে কিছু দেখিতে পাইল না। শরীর তাহার এলাইয়া পড়িল। গদিতে ঠেস দিয়া সে আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল, কিন্তু আকাশ পাতালের মাঝখানে যে আপাতত কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না।

১৪ নম্বর বিপ্রদাস লেনের কথা একবার মনে হইল। কিন্তু সেখানে তো এ অবস্থায় গিয়া খোঁটা গাড়া চলে না। চলে না তো, কিন্তু উপায় কলেজ খুলিবার তো এখনও পুরো দশদিন বাকি; এই দশ দিন কি গাড়িতে ঘুরিয়া বেড়াইবে? তাহাতেও সে নয় রাজী, কিন্তু গাড়ির মালিক যে নামিয়া আসিয়া এখনই একটা মীমাংসা করিয়া লইবার জন্য উৎকট রকম পীড়াপীড়ি লাগাইয়া দিবে, দশ মিনিটও যাইতে দিবে না।

গাড়িটা স্টেশন ছাড়াইয়া বাইরে আসিল। ইহার মধ্যে গাড়োয়ান আরও দুই-তিন বার মাথা ঝুঁকাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কোথায় যেতে হোবে?"

কিন্তু কোন উত্তর না পাওয়ায় গাড়ি থামাইয়া নামিয়া আসিয়া রুক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাবু, আপনিও একটা মাল আছেন নাকি? কোথা বোলেন না যে? না, আমরা জ্যোতিষ আছি যে, বাড়ি চিনে লেবে?" ঘর্মাক্ত কলেবর রামতনু সোজা হইয়া বসিয়া ধীরভাবে বলিল, "দাঁড়া না বাবা, ততক্ষণ তুই চলু না সামনে, বলছি।" একটা অজানা বিপদের আশঙ্কায় ভীত হইয়া গাড়োয়ান বলিল, "কি মোজার কথা আছে। আপনি নামুন, আমি এ রকম সওয়ারী চায়ে না।" পরে ইসমাইলকে বলিল, "উতারলে বক্সা।"

বিপদ যখন এতই আসন্ন হইয়া পড়িল, রামতনুর চট করিয়া একটা হোটেলের কথা মনে পড়িয়া গেল। সে বলিল, "আঃ চলু না রে ২৫।৭ নম্বর মেছোবাজারে; আমার এই নম্বরটাই মনে পড়ছিল না।"

অপরাহ্নকাল নবদ্বীপ আশ্রম—এর একটি কক্ষে রামতনু গালে হাত দিয়া গাঢ় চিন্তায় আচ্ছন্ন।

আকাশে মেঘ থমথম করিতেছে। অপরাহ্নের তাবৎ চিহ্নগুলাই লোপ পাইয়াছে। রামতনুর মনটা বড় বিষণ্ণ। আজ সকালে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল বলিয়া প্রিয়ার উদ্দেশে যাওয়া হয় নাই ; আর এখনও এই দশা। কাজটাও এমন ধরণের নয় যে একটা গাড়ি ভাড়া করিয়া যাওয়া চলে, যাক, যখন উপায় নেই, তখন আর কি হইবে ? পশ্চিমে হাওয়ায় মেঘগুলো পূবপ্রান্তে জড় হইতেছিল। রামতনু শখ করিয়া ভাবিতেছিল, তাহার মানসপ্রতিমাও ওই দিকটাই আলো করিয়া আছে। পুরাকালে এই মেঘ বিরহী যক্ষের সংবাদ যেমন তাহার প্রেয়সীর নিকট বহন করিয়া লইয়া যাইত, তেমন করিয়াই পূর্বদিকে ১৪ নম্বর বিপ্রদাস লেনে তাহার প্রিয়ার পদতলে চলিয়া পাঠিয়াছে। আহা তাহার বিরহেও এত সুখ !

রামতনুর কিন্তু মনে পড়িল তাহার সহিত যখন একবারও দেখা হয় নাই, তখন এই মন গড়া বিরহ নিষ্ফল। প্রথমে কিরূপে দেখা-সাক্ষাৎ করা উচিত সেইটিই ভাবিবার কথা। বাস্তবিক, আমি অমুকের দেওর বলিয়া উঠিলে চলিবে না তো। না হয় পাঁচ মিনিট ধরিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া পরিচয়ই দিল। তাহার পর যদি জিজ্ঞাসা করে, কি কাজ বাপু এখানে ?

সাত-পাঁচ ভাবিয়া রামতনু স্থির করিল, পরিচয়টা যেন হঠাৎ হইয়া—এইরূপে হইলেই ঠিক।

মিনিট কয়েক চিন্তার পর রামতনুর মাথায় একটা জমকালো মতলবের উদয় হইল। সেটা সংক্ষেপত এই—

সে এখনই বাহির হইয়া বিপ্রদাস লেনটা চিনিয়া লইবে। তাহার পর যতক্ষণ না বৃষ্টি নামে এদিক একদিক ওদিক একটু পায়চারি করিবে। এবং বৃষ্টি নামিবা মাত্রই এই গলিতে ঢুকিয়া পড়িবে ও চোদ্দ নম্বর বাড়ির নিকট গিয়া আর যেন পারিল না—এই ভাবে তাহার বারান্দায় উঠিয়া পড়িবে। ইহাতে চাই কি শ্রীমুখে "আহা" এবং শ্রীহস্তপ্রদত্ত একটি শুষ্ক বস্ত্রেরও আশা করা পারে। তাহা ছাড়া পরিচয়াদির সময়ও পাইবে অনেক। তাহা হইলে আর দেরী করা চলে না। রামতনু তাড়াতাড়ি জুতো জামা পরিয়া বাহির হইয়া পড়িল। চারিদিকে মেঘের আড়ম্বর দেখিয়া একবার মনে হইল ছাতাটা যায় ; কিন্তু ভাবিল, তাহা হইলে ভাল জমিবে না।

ছোট বড় কতকগুলি গলি অতিক্রম করিয়া রামতনু কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে আসিয়া পড়িল। রাস্তার দুই দিকে বিপ্রদাস লেন খুঁজিতে খুঁজিতে সে উত্তর দিকে চলিল। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার মনটা দমিয়া যাইতেছিল। বৃষ্টি আরম্ভ হইল বলিয়া—আর দেরি নাই, তাহা হইলেই তো সর্বনাশ। আশঙ্কা দুর্বল মনে রামতনুর একটা সংশয় উদয় হইল, বউদিদি যদি ভুল বলিয়া থাকেন ! কিংবা তাহার পোড়া বরাতে যাহা বেশি সম্ভব—ইঁহারা যদি বাস বদলাইয়া থাকেন !

বিপন্নভাবে রামতনু এক বৃদ্ধ দোকানীকে বলিল, "ওগো কর্তা, আমি বিপ্রদাস লেনে

খাব।"

বৃদ্ধ কি একটা নেশার ঝোঁকে ঝিমাইতেছিল, মাথা না তুলিয়াই ঘাড়টা একটু হেলাইয়া বলিল, "স্বচ্ছন্দে।"

বৃষ্টি নামিল। এখানে আর বৃথা কালক্ষেপ করা যায় না। দোকানীকে বিড়বিড় করিয়া কি একটা গালি দিয়া রামতনু এক রকম ছুটিতেই আরম্ভ করিল। বৃষ্টির জলে তাহার উৎসাহ স্যাঁতস্যাঁতে হইয়া আসিতেছিল, স্থির করিল, আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিবে। সন্ধান না পায় তো আজ এই পর্যন্ত।

এইরূপ মনস্থ করিয়া রামতনু একজন পথিককে প্রশ্ন করিল। সামনেই একটা গলি ছিল। তিনি দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "এইগলি দিয়ে একটু বেরিয়ে যান, সামনেই বিপ্রদাস লেন।"

রামতনু হাতে স্বর্গ পাইল, কিন্তু মাথার স্বর্গ তাহাকে তীক্ষ্ণ বারিধারায় বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল, আর সেই তীক্ষ্ণতা অতিশয় অসহ্য হইয়া উঠিল যখন রামতনু বিপ্রদাস লেনে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ডাইনে বাড়ির নম্বর ১১১ এবং বামে ১১২।

তাহার মানে এটা গলির শেষ দিক এবং গলিটাও মস্ত বড়। দুঃখ করিয়া আর কি হইবে? দক্ষিণ দিকের বাড়িগুলোর উপর মাঝে মাঝে নজর ফেলিয়া মাথা নীচু করিয়া সে দৌড়াতে লাগিল, তাই কি ছাই বাড়ীগুলোই ছোট? যাহা হউক, এই বড় বাড়িগুলোর নম্বর ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল, এবং রামতনুর নষ্ট উৎসাহ ফিরিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে একবার মাথা উঁচাইয়া রামতনু দেখিল—২১।

তাহার পরে মুখে হাসি দেখা দিল, এবং সে আর মাথাও নীচু করিল না। চোখে জলের ঝাপটা লাগিতেছিল। আসন্ন সুখের কথা ভাবিয়া এই সামান্য অসুবিধাকে উপেক্ষা করিয়া বাড়ির নম্বরগুলিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া রামতনু লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া শৌখিন চালে দৌড়াতে লাগিল। মুখে একটু হাসিও টানিয়া আনিল—যেন ব্যাপারটা সে বড়ই উপভোগ করিতেছে।

ক্রমে ১৮, ১৭, ১৬ নম্বর বাড়ি পার হইয়া গেল, এইবার ১৫, তাহার পর এই ১৪। রামতনু টপ করিয়া উঠিয়া পড়িল। দিব্য বারান্দাওয়ালা বাড়ি।

গলা হইতে চাদরটা নামাইয়া নিংড়াইতে নিংড়াইতে রামতনু বলিল, "কি বৃষ্টি!" এবং একবার চারিদিকটা চাহিয়া দেখিল।

বারান্দার এক কোণে একটা পশ্চিমা চাকর গুনগুন করিয়া গান করিতেছিল—

"কলকাতিয়াকে লোগনিকে নাহি পতিয়ইহ
সমর্ হূ সমর হূ সখি বাট ঘাট যেই হ।"

অর্থাৎ হে সখি, কলিকাতার লোককে প্রত্যয় নাই, অতএব পথঘাট চলিবে খুব সামলাইয়া। সুতরাং এবংবিধ অবিশ্বাস্য একজন কলিকাতাবাসী পথঘাট ছাড়িয়া একেবারে তাহার প্রভুর গৃহে আসিয়া উঠিতে দেখিয়া রুক্ষভাবে সে বলিল, "এ মাশা কিনারে চলিয়ে দাঁড়ান; দালানকে মাঝখানে জল পরসে।"

রামতনুর এতক্ষণ অন্য রকম অভ্যর্থনা পাইবার কথা। কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন না

পাইয়া সে দালানের মাঝখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। এক্ষণেই পরিচয়মাত্রে তাহার কদর দেখিয়া এ বেটার কিরূপ ভ্যাবাচাকা লাগিয়া যাইবে তাহা ভাবিয়া রামতনু বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিতেছিল। কিন্তু আর একটু দাঁড়াইয়া চঞ্চলভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিল, দুয়ারে শিকল আঁটা। এতক্ষণ সে শুধু কাঁপিতেছিল, এইবার দাঁতে দাঁত লাগিতে শুরু হইল। কি কুগ্রহ, মিছামিছি সন্ধ্যার সময় এই বৃষ্টিস্নান! আরে মারঝাড়ু এই কোর্টশিপের মাথায়! ইহার চেয়ে চার ক্রোশ গরুর গাড়ি চড়িয়া মেয়ে দেখতে যাওয়া শতগুণে শ্রেয়!

হঠাৎ পরিচয়ের আশা ছাড়িয়া কাপড় নিংড়াইয়া মাথা মুছিতে মুছিতে রামতনু চাকরটাকে প্রশ্ন করিল, "তোর মনিবরা কোথায়?"

চাকরটা লোকটার চালচলন দেখিয়া সন্দিগ্ধ মনে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তাতে তোমার কি জরুরী আছে? এই পাঁচ মিনিটমে এসে পড়বে।" বলিয়া একবার আড়চোখে নির্জন রাস্তা ও রুদ্ধ গৃহগুলোর উপর নজর ফিরাইয়া লইল।

বেচারা মনিবের সত্বর প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা জানাইয়া এই অজ্ঞাতকুলশীল কলিকাতা-বাসীটিকে তাড়াইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু ইহাতে তাহাকে বরং প্রফুল্ল হইতে দেখিয়া বেজায় অস্বস্তি অনুভব করিল এবং রামতনুর উপর হইতে চোখ না সরাইয়া একটু রাস্তার দিকে সরিয়া বসিল।

রামতনু সেটা বিশেষ লক্ষ্য করিল না। নেহাত চুপ করিয়া না থাকিয়া একটু কথাবার্তা কহিবার জন্য বলিল, "তুই বুঝি চাকর?"

উত্তর হইল, হুঁ লেকিন হামার বড়া ভাই পুলিসে কাম করে।"

রামতনু বড় ভাইয়ের পরিচয়ের প্রয়োজন তেমন বুঝিতে পারিল না, ভাবিল, ওদের বুদ্ধিই এই রকম।

অনেকক্ষণ নীরবে কাটিল, রামতনু মুঠায় চাপিয়া চাপিয়া জল বাহির করিয়া রকের মেঝেই ফেলিতে লাগিল। চাকরটা অসহিষ্ণু ভাবেই বলিয়া উঠিল, "এ মাশা কিনারে দাঁড়ান না, কিস্ মাফিক লোক আপনি?"

রামতনু একটু চটিল; ভাবিল, আচ্ছা বেয়াদব তো! কিন্তু মনে হইল, আহা, চেনে না, ও বেচারার আর দোষ কি? তাই এই অজ্ঞান জনিত ঔদ্ধত্যকে ক্ষমা করিয়া বলিল, "কই মনিব যে তোর আসে না?"

চাকরটা তাহার দিকে ফিরিলও না, তাচ্ছিল্যের সহিত চুপ করিয়া রহিল। রামতনু ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া যাইতেছিল; কিন্তু ভাবিয়া দেখিল, চটিয়া ফল নাই। তাই কঠোর সংযমের সহিত বলিল, "তা যদি দেরিই থাকে তো একটা শুকনো কাপড় নিয়ে আয় দিকিন।"

চাকরটা বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "আর গোরাম গোরাম এক পেয়ালা চাভি আনিয়ে দি? বোড়ো ভিজিয়ে গেলেন—"

রামতনু তখন আরও চটিয়া গেল কিন্তু আরও নরম সুরে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিল, "দেখ ঢের বাংলা বুলি হয়েছে চালাকি রাখ। আমার চাকর হ'লে এতক্ষণ আস্ত

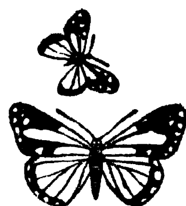
থাকিতস নি, তোর মনিব এলে টের পাবি, আমি কে। তবে নেহাত দেরি হলে আমি যদি চ'লেই যাই তো এই কার্ড রইল। নে একখানা কাপড় নিয়ে আয় দিকিন লক্ষ্মী ছেলের মতন।"

রামতনু পূর্ব হইতেই কার্ড সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। ভিজা একখানা কার্ড বাহির করিয়া তাহার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া চাকরটার হাতে দিয়া বলিল, "নে রাখ, আর এই ঠিকানায় ভিজে কাপড়গুলোও কাল দিয়ে আসবি।"

চাকরটা গম্ভীরভাবে কার্ডটা দুই খণ্ড করিয়া ফেলিয়া দিল এবং দাঁড়াইয়া উঠিয়া হুঁশিয়ারির সহিত গলা উঁচাইয়া বলিল, "হামার নাম রামটহলবা আছে, হামায় ঠকিয়ে কাপড় লিতে আসে তুম?"

রামতনু আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না, কারণ মানষের ধৈর্য এবং শীত সহ্য করিবার ক্ষমতা উভয়েরই একটা সীমা আছে, একে তো শুষ্ক কাপড় পাইল না, তাহার উপর চক্ষের সম্মুখে তাহার কার্ডের এই লাঞ্ছনা হওয়াতে সে একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ঘুঁষি বাগাইয়া সামনে আগাইয়া গেল এবং দাঁতে দাঁত পিষিয়া বলিল, "আমি ঠগ জোচ্চোর? বেটা যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?"

হুঁশিয়ার হইলেই যে সাহসী হইতে হইবে—এখন কোন কথা শাস্ত্রে লেখে না। আবার সম্প্রতি শহরে কয়েকটা ডাকাতি হইয়া গিয়াছিল। রামতনুর উদ্যত ঘুষির নিম্ন হইতে তড়িতের ন্যায় সরিয়া গিয়া মাঝরাস্তায় বৃষ্টি মাথায় করিয়া রমটহলবা আর্তস্বরে ডাকিয়া উঠিল, "খুন ভইল দৌড় হো ডাকু পড়ল বা।"



রামতনু প্রমাদ গনিল। মুহূর্তের মধ্যে নামিয়া পড়িয়া প্রেম ভুলিয়া প্রাণপণে ছুটিল। সামনেই একটা গলি দেখিতে পাইয়া তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং এ গলি সে গলি করিয়া একেবারে হেদোর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হাঁপাইতে লাগিল, যেন বুকের পাঁজরা কয়টা ছিটকাইয়া বাহির হইয়া যাইবে।

কিন্তু তখনও তাহার স্বস্তি নাই। সামনে দিয়া মন্থর গতিতে একটা ঘোড়ার গাড়ি যাইতে ছিল, একবার চারিদিক চাহিয়া গাড়োয়ানকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "মেছোবাজার যাবি।"

রামতনুর বস্ত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গাড়োয়ান বলিল, "না বাবু, গদি ভিজে যাবে।"

"আমি দাঁড়িয়ে যাবো বাবা, গদি ভিজলে তুই দাম পাবি।"

"ডবল ভাড়া লিব বাবু, দেখছেন না কি রকম বাদল আছে?"

"বাদলা না হ'লে আর এইটুকুর জন্য গাড়ি করি ? তা ডবল, ডবলই সই। কত হবে ?"
"দেড় টাকা দিবেন বাবু ; আপনি ভদ্রলোক বড় কষ্টে পড়েছেন কি আর বোলব ?"
নিরুপায় ভাবে গাড়িতে চাড়িতে চাড়িতে রামতনু বলিল, "চার আনার ডবল কি দেড় টাকা হয় বাপু ? তা চল্ তোর ধর্ম তোতেই আছে, একটু জোরে হাঁকাস।"
গাড়ি চাড়বার মিনিট দুয়েকের মধ্যে বৃষ্টিটা হঠাৎ ধরিয়া গেল। বিধিরও এই কঠোর বিদ্রূপ দেখিয়া রামতনুর মনে হইল, গাড়ির দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া মরে।
নামিয়া একটা দোকান হইতে পাঁচ গ্রেন কুইনাইন কিনিয়া লইয়া হোটেলে ঢুকিল তাহার পর ট্রাংক খুলিয়া গাড়োয়ানের জন্য দেড় টাকা বাহির করিয়া লইল, তখন কেবল একটি এক টাকার নোট ও বিকাশিত দন্ত বিদ্রূপের মত একটি টাকা ট্রাংকের মাঝখানে পড়িয়া রহিল।

পর-দিবস বেলা আন্দাজ চারিটার সময় রামতনু বিছানার উপর অলস ভাবে শুইয়া জানালার মধ্য দিয়া আকাশপানে চাহিয়া ছিল। মেঘ ছিল না বলিলেও মিথ্যা বলা হয় না, তবুও ঘর পোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘে ডরায়, সেইরূপে যা দুই খণ্ড মেঘ এদিক-ওদিক করিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা দেখিয়া রামতনুর যথেষ্ট আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল এবং আশু বিবাহের আশা দিয়াও তাহাকে শ্যামবাজারে পাঠাইতে পারা যাইত না। সে ভাবিতে ছিল, মেঘের নামগন্ধ না মুছিয়া গেলে সে আর পাদমপি নড়িতেছে না, এমন পয়সাও নাই যে, গাড়ি করিয়া যাইবে। আর যাইলেও যে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া মস্ত বড় ভিড় দাঁড়াইয়া যাইবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ? বেটা উজবুক চাকরটা সব কাঁচাইয়া দিল।
মেসে একটা লোক খবরের কাগজ দিত, সে দেখা দিল, তাহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া রামতনু কাগজটা লইল। হাতে কোনও কাজ নাই, একটা কাগজের দামও বেশি নয়, রামতনু জিজ্ঞাসা করিল, "বাংলা কাগজ রাখিস ?"
লোকটা সোৎসাহে একখানা 'নায়ক' বাহির করিয়া বলিল, "এই নিন বাবু এরকম গালাগাল পাঁচকড়িবাবু অনেকদিন দেন নি ; প্রাণ খুলে লাট সায়েবকে নিয়েছেন একচোট।"
রামতনু হাসিয়া কাগজখানা লইল, তাহাকে দাম চুকাইয়া দিল এবং বুকে বালিশটা চাপিয়া কাগজটা বিছানায় মেলিয়া পড়িতে লাগিল।
পড়িবে কি ? প্রথমেই বড় বড় অক্ষরে ছাপা হেডিংগুলায় নজর পড়ায় তাহার আক্কেল গুড়ুম হইয়া গেল—"দিনে ডাকাতি ! মাঝ শহরে ভীষণ কাণ্ড !" নিম্নবর্তী দুইটি অনতিক্ষুদ্র প্যারাগ্রাফে লেখা আছে—
"গতকল্য বেলা আন্দাজ ৪॥ ঘটিকার সময় ১৪ নং বিপ্রদাস লেনে শ্রীযুক্তবাবু সারদা-প্রাসাদ দত্তের ভবনে একটি লোম হর্ষণ ডাকাতির উপক্রম হইয়া গিয়াছে। মুষল ধারায় আশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল বলিয়া গলিতে লোক চলাচল বন্ধ ছিল এবং আশেপাশে বাড়ি গুলিরও দুয়ার-জানালা প্রায় সব রুদ্ধ ছিল। সারদাবাবু সপরিবারে ৺কালীঘাটে দেবী

দর্শনে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ছিল মাত্র একটি পশ্চিমা চাকর। এই সময় সুযোগ বুঝিয়া একটি ভদ্রবেশী যুবা ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া বারান্দায় উঠে এবং প্রথমে সোজা কথায় একখানি শুষ্ক বস্ত্র চাহিয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা করে এবং তাহাতেও কৃতকার্য না হইয়া একখানি কার্ড হাতে দিয়া বলে যে সে তাহার প্রভুর আত্মীয়। চাকরটা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কার্ডটা ছিঁড়িয়া ফেলে এবং তাহাকে অর্ধচন্দ্রদানে নিষ্ক্রান্ত করিবার প্রয়াস করে। ইহাতে দুর্বৃত্ত জামার মধ্য হইতে একখানা ভোজালি বাহির করিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। তখন ভৃত্যটা রাস্তায় পড়িয়া চিৎকার করিয়া লোক জড় করে, ইত্যবসরে ভদ্রবেশধারি গুণ্ডাটি চম্পট দেয়, এবং ঠিক এই সময় গলির বাইরে সদর রাস্তা দিয়া একটি মোটরকে ঊর্ধ্বশ্বাসে বৃষ্টির মধ্য দিয়া ছুটিয়া যাইতে দেখা যায়। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।"

"দ্বিখণ্ডিত কার্ডের অর্ধেকটা মাত্র পাওয়া গিয়াছে; সেটার লেখাটুকুও নাকি জল পড়িয়া এখনই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, কিছুই নিরূপিত হয় না। আমাদের লালপাগড়ি ভায়ারা বোধ করি ভাবিতেছেন, লেখাটা পড়া গেলে ব্যাপারটার একটা কিনারা হয়। এমন না হইলে আর বুদ্ধি! আমরা বলি তত মাথা না ঘামাইয়া, বিজ্ঞাপন দিয়া ঠিকানাটা ডাকাতের নিকট হইতে আনাইয়া লইয়া হউক না।"

রামতনুর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। কি সর্বনাশ! সে একজন ফেরারী আসামী! তাহাকে লইয়া শহরময় হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে! ঘামে তাহার বুকে বালিশ ভিজিয়া গেল এবং তাহার মনে হইতে লাগিল যেন মাথার মধ্যে একটা গুবরে-পোকা ঢুকিয়া ভোঁ ভোঁ করিয়া চক্র দিতেছে। ক্রমে পারিপার্শ্বিক জিনিস গুলার ধারণা যেন তাহার এলোমেলো হইয়া আসিতে লাগিল।

মিনিট পাঁচেক পরে সে অতি কষ্টে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইল। বাহিরে গিয়া বেশ করিয়া মাথাটা ধুইয়া ফেলিল। লোকটা সাধারণতঃ দেব দেবী মানিত না, কিন্তু হঠাৎ তাহার তেত্রিশ কোটির উপরই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গেল, এবং যাঁহারা বিশিষ্ট, তাঁহাদের মধ্যে যিনি যাহা পছন্দ করেন, তাঁহার জন্য সেই দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে মানত করিয়া বসিল, আবার ভিতরে আসিয়া কাগজটা আর একবার পড়িয়া তাড়াতাড়ি ভাঁজ করিয়া ফেলিল। তাহাতেও তাহার মন যেন মানিল না, খবরটা শহরের অনেকে পড়িয়াছে এবং পড়িতেছে, কিন্তু তাহার ভীতি এই কাগজখানিতে এমন সংবদ্ধ হইয়া পড়িল যে, সে যেন ইহা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিলেই বাঁচে। তাহার ঘরে এই খবরটা তাহার কেনা কাগজে কেহ পড়িলে যেন তাহার গ্রেপ্তার না হইয়াই যায়!

রামতনু এদিক-ওদিক দেখিয়া ভাঁজকরা কাগজখানা বিছানার নীচে একেবারে মাঝখানে গুঁজিয়া দিল। জানালা দিয়া কাগজখানা রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়াও তাহার নিরাপদ বোধ হইল না।

তাহার পর মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল,এখন পুলিশের হাত হইতে বাঁচিবার উপায় কি? মাতৃবাক্য ঠেলিয়া একেবারে অশ্লেষা-মঘা মাথায় করিয়া আসিয়া কি অঘটনটাই ঘটিল! যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আসা, তাহার মুখ তো এখনও দেখা গেল না!

ভবিষ্যতে যদি দেখা হয় তো পুলিশ পরিবৃত হইয়া। কল্পনাতেও প্রেমের নেশা ছুটিয়া গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে। সে মুখ দেখাইবার বদলে এখন ভগবান যদি তাহার নিজের মুখ লুকাইবার একটু সুযোগ করিয়া দেন তো হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। ধর, শেষ পর্যন্ত জেলে না হয় নাই যাইতে হইল, কিন্তু এই কুটুম্ব-সাক্ষাৎ লইয়া কি কেলেঙ্কারিই না হইবে! শেষে বাড়ি পর্যন্ত টান ধরিবে, তাহার প্রবঞ্চনা করিয়া চলিয়া আসার কথাও জাহির হইয়া পড়িবে এবং সে আসার উদ্দেশ্যও কাহারও অবিদিত থাকিবে না। হা, ঈশ্বর স্বপ্নে দেখাইয়াছিলে মধুর মিলন, আর বাস্তবে দাঁড় করাইলে কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া ডাক্তারের দায়ের এজাহার! তবে ভক্ত বৎসল তোমায় বলে কেন মিছামিছি?

নীচে ঠাকুরের সঙ্গে যেন একটি ভদ্রলোকের কথাবার্তার আওয়াজ শোনা গেল; তাহার পর সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, রামতনু উৎকর্ণ হইয়া রহিল। শব্দটা যেন তাহারই ঘরের দিকে আসিতেছে: বিবশঙ্গা রামতনু দরজার দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

ভদ্রলোকটি দরজার সামনে আসিয়া রামতনুকে নমস্কার করিলেন, তারপর ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চেয়ারখানায় বসিয়া বলিলেন, "মশায় -"

রামতনু ঠিক এতক্ষণে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল "মশায়—"

দুইজনের কথা একসঙ্গে বাহির হওয়ায় দুইজনেই একটু থতমত খাইয়া গেল। সামলাইয়া রামতনু কি বলিতে যাইতেছিল, তাহার আগেই ভদ্রলোকটি বলিলেন। "এখানে—রাম —এই—রাম—অর্থাৎ রাম তারণ বলে কেউ থাকেন?"

রামতনু বুঝিল এ সাক্ষাৎ ডিটেকটিভ্ আর রক্ষা নেই। ঢোক গিলিয়া জড়িত স্বরে বলিল "আজ্ঞে কই না।"

"থাকেন না? তাই তো—আচ্ছা, ধরুন, রামের সঙ্গে কিছু যোগ করে—যেমন—ধরুন রাম-রাম—রাম—"

রামতনুর বক্ষে সজোরে ঢিপঢিপ করিয়া আওয়াজ হইতেছিল। সে ব্যস্তভাবে বলিল, "না না মশায় ওরকম নাম—রামায়ণ থেকে কোন নামই এ বাড়িতে নেই। আপনি বোধহয় ভুল ঠিকানায় এসেছেন।"

লোকটি রামতনুর দিকে একটু অপ্রতিভভাবে চাহিলেন ও বলিলেন, "মশায় মাফ করবেন আপনাকে বোধহয় বিরক্ত করছি, আপনি অসুস্থও বোধ করছেন, কিন্তু একটু হাঙ্গামায় পড়া গেছে।"—বলিয়া পকেটে হাত দিলেন এবং কোণাকুণি ছিন্ন একটা কার্ড বাহির করিয়া পড়িয়া বলিলেন, "আজ্ঞে না, ঠিকানা ঠিক এই, এই দেখুন না।"

রামতনু কার্ড দেখিবে কি, সব আঁধার দেখিতেছিল। এ সেই তাহারই কার্ড রামচইলের হাতে ছেঁড়া। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত কার্ডটার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার আর বাক্য স্ফূর্তি হইল না।

হঠাৎ লোকটি বলিলেন, "আচ্ছা আপনি এখানে আছেন কদিন? সবাইকে চেনেন?"

রামতনুর নেশার মত ভাবটা হাঁত করিয়া করিয়া কাটিয়া গেল, সে মুখ তুলিয়া পাগলের মত ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

লোকটিও ব্যাপারটা আন্দাজ করিতে পারিলেন না। নিজেকে সামলাইয়া বলিলেন,

"না, আপনি রেস্ট নিন, আপনাকে জ্বালাতন করে বড় অন্যায় করছি। আমি বোধ হয় ভুল ঘরে ঢুকেছি; কিন্তু অন্য ঘরগুলোও বন্ধ, তা আমি এই বইটা নিয়ে বসি। অন্যান্য ভদ্রলোকেরা এলে খোঁজ নেবো।" তাহার পর চিন্তিতভাবে নিজের মনে মনেই বলিলেন, "কিংবা হতেও পারে নিজেই বোধহয় ভুল বুঝেছি।" বলিয়া বইখানার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

বলে কি? বসিয়া থাকিবে! রামতনুর মাথায় বাজ পড়িল। বিপদে বুদ্ধিবৃত্তিকে একটু গুছাইয়া লইয়া বলিল, "আজ্ঞে বসে থেকে তো কোন ফল নেই, আমি এ মেসের সবাইকে জানি। আজ চার বছর একটানা এখানে রয়েছি। আপনি মিছামিছি সময় নষ্ট করছেন।"

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন না, শুধু চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া বইয়ের এক জায়গায় কি যেন পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার পর সন্দিগ্ধভাবে রামতনুর মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তা থাকুন মশায় চার বছর, কিন্তু দু মিনিটে আসিয়া টের পেয়েছি, আপনি চার বছরে কেন পান নি, তা জানি না। অর্থাৎ রামতনু বসে এখানে কেউ আছেন, সম্ভবত এই মেসেই থাকেন, আর সম্ভবত আমার সামনেই বসে আছেন। দেখুন তো এই বইখানা বোধহয় আপনার",—বলিয়া রামতনুর যেখানে নামটা লেখা ছিল, সেইখানটা টিপিয়া ধরিয়া তাহার সম্মুখে বইটা বাড়াইয়া ধরিলেন।

রামতনুর মুখটা ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল। লোকটির হাতটা চাপিয়া ধরিয়া নিতান্ত মিনতির স্বরে কহিল, "মশায়, বাঁচান, কিছু দোষ নেই আমার, জেল থেকে—"

"কিছু দোষ নেই, নিতান্ত বলা যায় না। কারণ মিছামিছি আত্মগোপন করতে গিয়ে আমায় যা ভাবিয়েছেন, তাতে একটু দোষ হয়েছে বইকি। তবে তার জন্যে জেলে যেতে হবে না, এ গ্যারাণ্টি আমি দিতে পারি। তারপরে, ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন তো।"

রামতনু ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল না বটে, তবে কিছু কিছু বলিল, অর্থাৎ সরদাবাবুর সহিত তাহাদের কুটুম্বিতা কি প্রকারের আর সেই কুটুম্বিতা সূত্রে আলাপ করিবার প্রয়াসে ব্যাপারটা কিরূপ অহেতুকভাবে ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ইত্যাদি ইত্যাদি। বেশীর ভাগ গোপনই করিল—যেমন আসিবার মুখ্য উদ্দেশ্য কি, আসিল কত বাধাবিপত্তির মাঝে, আরও অনেক কথা।

ভদ্রলোকটির নাম অমিয়বাবু! তিনি বলিলেন, "হাঁ, আমিও অনেকটা এই ধরণের কিছু একটা হবে তা আন্দাজ করেছিলাম। চাকরটা যখন একটা কার্ডের টুকরো দেখিয়া বললে, আবার আমায় কার্ড দিয়ে ভোলাতে এসেছিল, তখনই আমার মনে একটু খটকা লাগে; ভাবলুম, বাংলাদেশে ডাকাতির যুগটা আর নেই। লুঠ করতে এসে ঠিকানা রেখে যাবে, এমন ডাকাতকে অতি-সাহসী অথবা অতি-বোকা বলতে হবে, তা এই সভ্যযুগে এই দুরকমের কোনটাই সম্ভব নয়।"

"পুলিশরা কার্ডের খানিকটা পেয়ে বাকিটা খুঁজতে লাগল। দৈবক্রমে সেটা জলকাদা মাখা হয়ে আমার জুতোর পাশেই পড়েছিল; আমি জুতোর তলায় সেটা চেপে

ধরলাম, এবং সুবিধে মত উঠিয়ে পকেটে পুরলাম। কার্ডের এই আধখানা নিয়ে আমি দুটো সিদ্ধান্ত খাড়া করলাম—প্রথমত, যদি খারাপ মতলবে কেউ এসে থাকে তো এটার কোন মূল্যই নেই ; সে প্রকৃতপক্ষেই চাকরটার কাছে নিজের আত্মীয়তা প্রমাণ করতে গিয়েছিল একটা যা-তা ঠিকানা দিয়ে। আর যদি কোন জানিত লোক দেখা করতে এসে থাকে, তবে এটার যথেষ্টই দাম আছে। আমার নিজের আন্দাজ কাউকেও আর জানালাম না, ভাবলাম, একবার চুপিচুপি দেখা যাবে।"

"ঠিকানাটা বুঝতে ততটা বেগ পেতে হয়নি, তবে নামটা সমস্ত পাওয়া গেল না। এই দেখুন না, আন্দাজে 'রাম'-গোছের একটা কথা দাঁড় করানো যায়, বাস, তার পরে ছেঁড়া। পুলিশের হাতে যেটুকু আছে, তাতে নামের যেটুকু ছিল—একেবারে জলকাদায় মুছে গেছে, নীচে খালি 'লেন' আর তার নীচে 'ক্যালকাটা' পড়া যায়।

"কিন্তু পুরো নামের অভাবটুকুই ব্যাপারটাকে খানিকটা রহস্য দিয়ে একটু জমাট করে তোলে, আর আমার ডিটেকটিভগিরি করার লোভটা বাড়িয়ে দেয়। একটু না থাকলে তো ব্যাপারটা এক রকম বৈচিত্র্যহীনই বলতে হয়।"

"যা হোক, শেষে কিন্তু আপনি বড় দমিয়ে দিয়েছিলেন। আর আপনার এই বইখানি আমায় সাহায্য না করলে আমায় বড় অপ্রস্তুত হয়ে বাসায় ফিরতে হত। আচ্ছা, আপনি কিন্তু এতটা বেগ দিলেন কেন ? সত্যিই ডাকাতি করতে গিয়েছিলেন নাকি ? তা হ'লে গেরস্থের কাছে ঠিকানা দিয়ে আসতে পারলেন, আর বাবার কাছে আত্মপরিচয় দেবার সময় সব সাহস লোপ পেল !"

ভদ্রলোকটি চেয়ারে হেলান দিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন , রামতনু ক্ষীণভাবে তাহাতে একটু যোগ দিল। তাহার পর বিছানার ভিতর হইতে 'নায়ক'খানা বাহির করিয়া বলিল, "পড়ুন এইখানা, তা হলেই শ্রাদ্ধ কতদূর গড়িয়েছে বুঝতে পারবেন। মশায়, মানুষ সাধু কি অসাধু তা আর আজকাল তার নিজের কাজের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে এই সব খবরের কাগজগুলোর মতামতের ওপর।"

অমিয়বাবু উচ্চহাস্যে মধ্যে মধ্যে বিবরণটুকু পড়িয়া কাজটা রাখিয়া দিলেন, বলিলেন, "বাহাদুরি তবে আমারই বেশী, একটা মস্তবড় ব্যাপারের কিনারা ক'রে ফেলেছি। কিন্তু আসল কথাটা যে চাপা পড়ে যাচ্ছে। নিন জামা-টামা পরে, ব্যাপারটা না জুড়োতে পরিচয় হ'লেই ভাল, তাঁদের একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলা যাবে। নিন, আমি ততক্ষণে একটা সিগারেট ধরাই।"

ভয়টা যখন সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল, রামতনুর মনে আবার পূর্বের ভাবটা আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া লইল। অমিয়বাবু তাহাকে বিপদমুক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিশেষ করিয়া তিনি তাহার বাগ্দত্তার আত্মীয় বলিয়া সে সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল এবং তাঁহার আতিথ্যের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অমিয়বাবু যখন সিগারেট ধরাইতেছিলেন, রামতনু প্রচ্ছন্নভাবে একটা টাকা বাহির করিয়া নীচে নামিয়া গেল এবং ঠাকুরকে বাছা বাছা খাবার, এক বাক্স কাঁচি মার্কা সিগারেট ও পানের ফরমাশ দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। তাহার মনে হইতেছিল, হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত বিয়ের ফুলটা

ফুটল তাহলে, ভগবান মুখ তুলে চাইলেন,—ওঃ চাইতেই হবে, অধ্যবসায় বলে একটা জিনিস আছে তো! আর তিনিই শুধু আছেন, ওসব দেবতা-টেবতা কিছু নয়।

ঘরে আসিয়া প্রফুল্লভাবে অমিয়বাবুকে বলিল, "তা নয় টাটকা-টাটকিই দেখাশোনা করা গেল; কিন্তু আগে থাকতে বাড়িতে কে কে আছেন জানা থাকলে পরিচয়ের বিশেষ সুবিধে হয়। অর্থাৎ নূতন পরিচয়ের আড়ষ্ট ভাবটা অনেকটা কেটে যায়। বিশেষ ক'রে আপনাকে ভাগ্যক্রমে পেয়ে আমি এ সুযোগটুকু ছাড়তে রাজী নই।"

রামতনু পূর্বে অবশ্য অনেকটা শুনিয়াছিল, কিন্তু যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আসা তাহার সম্বন্ধে আলোচনার জন্য তাহার তৃষিত মনটা বড়ই ব্যগ্র হইয়া উঠিল—বিশেষ করিয়া তাহারই এই আত্মীয়ের সহিত।

অমিয়বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ সে কথা মন্দ কি! তবে মেলা লোকের মধ্যে গিয়ে আপনাকে হাঁপিয়ে পড়তে হবে না—বাড়িতে ও'দের আছেন মাত্র কর্তা স্বয়ং আর এই গিয়ে একটি মেয়ে, মা আর একটি ছেলে, সে নেহাত ছেলেমানুষ, ইস্কুলের নীচু ক্লাশে পড়ে।"

নিজের অন্তর্নির্দিষ্ট পথে আলোচনাটাকে লইয়া যাইবার জন্য রামতনু বলিল, "হ্যাঁ লেখাপড়ার কথায় মনে পড়ে গেল, সারদাবাবুর মেয়েটি তো খুব উচ্চ শিক্ষিতা।"

"উচ্চশিক্ষিতা এখনও বলা যায় না, ম্যাট্রিকটা পাস করেছেন মাত্র; তবে হ্যাঁ, আরও পড়েন সবারই এই রকম ইচ্ছে।"—কথাগুলো অমিয়বাবু ঘাড়টা একটু নামাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন।

রামতনু বলিল, "যাই হোক, আমাদের মধ্যে এটুকুও বড় একটা পাওয়া যায় না, আলাপ করে তৃপ্তি পাওয়া যাবে। তার ওপর আপনার সঙ্গে পরিচয়টা আগে থাকতেই হয়ে রইল। আপনার সঙ্গে তাঁদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বলে বোধ হচ্ছে যেন।"

অমিয়বাবু পূর্ববৎ হাসিয়া বলিলেন, "সম্বন্ধ কিছুই ছিল না, তবে কয়েক দিন থেকে হয়ে দাঁড়িয়েছে বটে, আর সেটা একটু ঘনিষ্ঠ বলতে হবে বই কি।"

রামতনু বিশেষ কিছু না বুঝিয়া শুধু বাক্যের কৌশলটুকু লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিল, "কি রকম?"

"অর্থাৎ-ওর নাম কি—ও'র সেই মেয়ের সঙ্গে সম্প্রতি আমার বিবাহ হয়েছে।"—বলিয়া পূর্বের মত লজ্জিতভাবে হাসিতে হাসিতে অমিয়বাবু নির্বাপিত সিগারেটটা আবার ধরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; এবং ঠিক সেই সময়ে দরজার আড়াল হইতে উড়ে ঠাকুরটা বিজ্ঞের মত মুচকি হাসিয়া ইশারা করিয়া জানাইল; আতিথ্যের আয়োজন সব হাজির।



নোংরা

১

হাবুল মফস্বল কলেজ হইতে বি. এ. পাস করিয়া কলিকাতায় এম. এ. পড়িতে আসিতেছে। জোড়াসাঁকোয় তাহার কাকার বাড়ি, কয়েক দিন হইতে সেখানে একটু সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বউয়ে-ঝিয়ে, ছেলেমেয়ের পরিবারটি একটু বড় সতর্কতা সত্ত্বেও একটু অপরিচ্ছন্নতা আসিয়াই পড়ে, গৃহিণী বলিতেছেন, "আমি উদয়াস্ত খিটখিট ক'রে হার মানলাম, এইবার তোমরা জব্দ হবে। সে এমন শুচিবেয়ে ছেলে না, একটু কোথাও ময়লা দেখলে হুলুস্থূল কাণ্ড বাধাবে।"

বধূ নিজের দুরন্ত ছেলেমেয়ে দুইটি আর ছোট দেওর-ননদগুলিকে খেলায়-ধুলায়, সাজে-গোজে পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত করাইতেছে; একটু এদিক-ওদিক হইলেই শাসাইতেছে, "ওই গাড়ীর শব্দ, দেখতো রা, বোধ হয় হাবুল ঠাকুরপো এল।" শিশুমহলে একটা আতংক সৃষ্টি হওয়ায় বেশ সুফলও পাওয়া যাইতেছে।

স্কুলগামী ছেলেমেয়ে পাঁচটি। তাহারা পড়ার ঘরদুয়ার ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া বইয়ে সাদা কাগজের মলাট দিয়া, এক প্রকার সশংক আগ্রহের সহিত হাবুলের প্রতীক্ষা করিতেছে, ওদিকে তাহাদের স্কুলে পর্যন্ত হাবুলদাদার অলৌকিক পরিচ্ছন্নতার সংবাদ প্রচার করিয়া সেখানেও একটু বিস্ময়ের গুঞ্জন তুলিয়াছে। বড় মেয়েটি আবার একটু বেশী কল্পনাপ্রবণ, চোখ-মুখ কুঞ্চিত করিয়া সহপাঠিনীদের বলিতেছে, "এতোটুকু ধুলো কি বালি একটু দেখুক দিকিনি হাবুলদা তোমার গায়ে, এই একরত্তি, হুঁঃ মশাই?" পরিণামটুকু তাদের কল্পনার উপর ছাড়িয়া দিয়া আরও ভয়ংকর করিয়া তুলিয়াছে।

ঠিক এতটা না হলেও ছেলেটি এবিষয়ে একটু বাতিকগ্রস্ত বটে। আসিল, দিব্য ফিটফাট;

ট্রেনে জাহাজে যে এই বায়োটি ঘণ্টা কাটাইয়া আসিল, চেহারায় তাহার চিহ্ন খুবই কম, পরিচ্ছদে নাই বলিলেও চলে, জুতা জোড়াটি পর্যন্ত কখন এরই মধ্যে কেমন করিয়া ঝাড়িয়া ঝকঝকে করিয়া লইয়াছে।

ব্যাগটা রাখিয়া কাকীমাকে প্রণাম করিতে ঝুঁকিয়া হঠাৎ একটু পাশে সরিয়া গেল। বলিল, "একটু স'রে এস কাকীমা, একটু যেন নোংরা ওখানটা।"

ছেলেমেয়েরা সসম্ভ্রমে কৌতুহলে এক স্থানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বড় মেয়েটি আগাইয়া গিয়া চারিটি আঙ্গুল দিয়া জায়গাটা মুছিয়া দেখিল, তকতকে শানের উপর একটু জলের সঙ্গে সামান্য যেন ময়লা। সরিয়া আসিয়া চোখ বড় করিয়া সবাইকে দেখাইয়া সেটুকু কাগজে মুছিয়া রাখিতে গেল, সহপাঠিনীদের দেখাইবে—হাবুলদার প্রমাণ।

হাবুল প্রশ্ন করিল, "বৌদি কোথায় কাকীমা? সেই দাদার বিয়ের সময় দেখেছিলাম, সামনে আসতে লজ্জা হচ্ছে নাকি ওঁর?"

বউদি সে ভাবের উৎকট রকম লাজুক নয়, রান্নাঘর হইতে হাতমুখ মুছিয়া আসিতেই ছিল, মাঝপথে ননদের সপ্রমাণ রিপোর্ট পাইয়া ফিরিয়া গিয়া একবার আরশিটা দেখিয়া লইতেছিল। একটু দেরি যে হইয়া গেল, তাহার কারণ, সুন্দরী স্ত্রীলোকের আরশির সামনে দাঁড়াইলে একটু দেরি হইয়া যায়ই। শাশুড়ীর ডাকে আসিয়া হাজির হইল। একটি মিষ্টি হাসি দিয়া দেবরকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "এস ভাই, ভাল আছো তো?"

"মন্দ নয়'—বলিয়া হাবুল পায়ের ধুলো লইল, এবং সত্যই ধুলো লাগিয়েছে কিনা, একবার ত্বরিতে দেখিয়া লইয়া হাতটা কপালে ঠেকাইয়া হাসিয়া বলিল, "ভাগ্যিস কাকীমা ডেকে দিলেন, নইলে মোটে আছি কিনা সে খবর নিতে বড়! অন্যায় বললাম কাকীমা?"

কাকীমা হাসিয়া বলিলেন, "ওই আরম্ভ করাল! উনি তো এসেছিলেনই বাপু।"

বউদি বলিল, না ভাই, আমি এক টেরের ওদিকে একটু কাজে ছিলাম; কেউ এলে গেলে ওদিকে থেকে টের পাওয়ার জো নেই।"

"কাজ রন্ধন তো?"

"পেটুকের জাত তোমরা, শুধু ওইটিকেই চেন বটে, কিন্তু তা ছাড়া আমাদের আর কাজ নেই নাকি?"

"আঁচলের কোণে মসলার ছোপ লাগবে আর কোন কাজে?"

বধূ লজ্জিতভাবে আঁচলের দিকে চাহিয়া মুখ নীচু করিল; এত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও অপযশটুকু লাগিয়াই গেল। আচ্ছা চোখ তো। ননদ আসিয়া পাশ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গোপনে আঁচলটা তুলিয়া ধরিয়া বধূর দিকে চাহিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, "ইস, আমাদের তো চোখেই পড়ে না।'

হাবুল বলিল, "তা হোক, তোমার বউ কিন্তু কাকীমা ছেলেমেয়েগুলিকে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখেছে।"

কাকীমা বলিলেন, "তা বলতে নেই বাপু, সেদিকে বেশ নজর আছে।"
স্বীয় প্রশংসায় একটু সংকুচিত হইয়া বধূ বলিল, "দাঁড়াও, যশ কতক্ষণ টেঁকে দেখ।"
ছোটদের মধ্যে মৃদু একটু চাঞ্চল্য পড়িল, তাহাদের প্রশংসা হইতেছে, ও জিনিসটা তাহাদের বরাতে সচরাচর জোটে না। একজন নিজের পরিষ্কার জামাটির উপর হাত বুলাইয়া নূতন করিয়া একটু ঝাড়িয়া লইল। দেখাদেখি পাশেরটিও তাহাই করিল এবং ক্রমে পদ্ধতিটা সংক্রামক হইয়া উঠিল। একটি ছোটমেয়ের হাতে একটি ধূলিমলিন পেয়ারা লুকানো ছিল। সেটি তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দিল এবং দেহ ও পরিচ্ছদে দুইটিই পরিষ্কার রাখিবার উৎসাহে ফ্রকের মাঝ-বরাবর হাতটা বেশ ভাল করিয়া টানিয়া লইল। ইহাতে যখন সকলে হাসিয়া উঠিল, মেয়েটি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া বধূকে জড়াইয়া তাহার হাঁটু দুইটির মাঝখানে মুখটা গুঁজিয়া দিল। –
"ছাড়, আমার কাপড়ও খাবি এই সঙ্গে?"—বলিয়া বধূ মেয়েকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য না হওয়ায় দেবরের দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখলে তো, সোজা এই ভুত-পেত্নীদের সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে থাকা ঠাকুরপো? বলছ তো—"
অতি-পরিচ্ছন্নতা যে বাড়ির স্বাভাবিক অবস্থা নয়, হাবুল সেটা বুঝিতে পারিয়াছিল এবং এটাও আঁচিয়া লইয়াছিল যে, তাহারই পরিচ্ছন্নতা-বাতিকের জন্য পরিবারটি একটু সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। মনে-মনে একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "তা তোমার যে এত পরিষ্কার-বাই, তা আমার জানা ছিল না বউদি। দাদার ছোট মেয়ে বুঝি ওটি? এস তো আমার কাছে মা, মা তোমার মেমসাহেব নেবে না।"
ভাজ ব্যস্তভাবে মানা করা সত্ত্বেও পেয়ারা-রসসিক্ত মেয়েটিকে বুকে তুলিয়া লইল। ছেলেরা যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল, এত বড় অঘটন তাহারা জন্মে দেখে নাই।
কাকীমা বলিলেন, "ওরে, ওর জুতোর ধুলোয় তোর জামাটা গেল হাবুল, নামিয়ে দে, ওমা! তোর অমন শুচিবাই গেল কোথায়?"
হাবুলের সমস্ত শরীর ঘিনঘিন করিতেছিল, মরীয়া হইয়া মেয়েটির পেয়ারা-চিবানো মুখে একটা চুম্বন দিয়া বলিল, "সেসব চিরকাল থাকবে নাকি কাকীমা? সে ছিল একটা রোগ, যখন ছিল তখন ছিল।"
বড় মেয়েটি একটু নিরাশ হইয়া পড়িল, "হায়, তাহার পূজার প্রতিমার ভিতরে খড়!"

২

হাবুল দিন পাঁচেক কোন রকমে যথাসম্ভব আত্মগোপন করিল, তাহার পর নবাগমনের সঙ্কোচটা কাটিয়া গেলে নিজমূর্তি ধারণ করিল।
কলেজ হইতে আসিয়াছে। হাত-মুখ ধুইয়া মাঝে মাঝে নাক উঁচু করিয়া শরীরে, কাপড়ে কিংবা ঘরে কোথায় অতি সূক্ষ্ম ময়লা আছে তা তাহাই উপলব্ধি করিতেছিল। খুড়তুতো বোন শৈল—সেই স্কুলের ছাত্রী বড় মেয়েটি—আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চা আনব দাদা?"
"তোর নখ দেখি?"

শৈল হাত দুইটি উপুড় করিয়া সামনে ধরিল। ঘটনাক্রমে নখ ছিল না, শৈল আজই ক্লাসে বসিয়া দাঁতে খুঁটিয়া শেষ করিয়াছে। হাবুল বলিল "যাও, জেনে রেখো, নখের ময়লা বিষ, পেটে গেলে— '
শৈল বলিল, ''তা জানি, মরে যায় লোকে।"
ভগ্নীর স্বাস্থ্য-জ্ঞানটা তাহার চেয়েও এত উৎকট রকম প্রবল দেখিয়া হাবুল হঠাৎ কিছু বলিতে পারিল না। একটু থামিয়া বলিল, "হুঁ, জার্‌ম কাকে বলে জান ?—রোগের বীজাণু ?"
শৈল ভাবিতে লাগিল।
"কিসে একজনের শরীর ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে আর সুবিধে পেলে তাকে মেরেও ফেলে অন্য জনের শরীরে রোগ নিয়ে যেতে পারে ?"
শৈল আর একটু ভাবিল, তাহার পর হেঁয়ালির উত্তর দেওয়া গোছের করিয়া বলিয়া উঠিল, "ডাক্তারে !"
হাবুল বিরক্ত হইয়া বলিল, "কোন্ বিদুষী তোমাদের হাইজিন পড়ান ? জার্‌ম এক রকম পোকা, এত ছোট যে একটা সূচের ডগায় লক্ষ লক্ষ থাকতে পারে ; তারা যত রকম রোগ ছড়িয়ে বেড়ায়, বুঝেছ তো ? এখন, এদের হাত থেকে বাঁচতে হ'লে আমাদের কি করতে হবে ?"
"সূচ কিনব না।"
হাবুলের ধৈর্য চরম সীমায় পৌঁছিয়া গিয়াছিল, তবুও সংযতকণ্ঠে বলিল, "পরিষ্কার থাকতে হবে, কেননা ধুলো কাদা পচা জিনিস—এইসব নানান রকম ময়লাতে এদের জন্ম আর বৃদ্ধি। টিটেনাস কাকে বলে, জান ?
"—ধনুষ্টংকার ?"
"অর্জুনের—"
"না না অর্জুনের ধনুষ্টংকার নয়, সে এক রকম রোগ। যা চা-টা নিয়ে আয় !"
দেরি হইয়া যাইতেছে দেখিয়া বড়দিদি নিজেই চা লইয়া আসিল। হাবুল বলিল, একটা সাধারণ রোগের নাম পর্যন্ত জানে না, এরা পরিষ্কার থাকার মানে কি বুঝবে বলতো বউদি ? কাজেই তুমি সর্বদা খড়্গহস্তে হয়ে থাকলেও কোন ফল হচ্ছে না, আমি ঠিক করেছি, ওদের সবাইকে একত্র করে আমি রোজ বিকেলে খানিকটা করে লেকচার দেব। শৈল, সবাইকে ডেকে আনবি।"
বউদি বলিল, "রোগের নাম মুখস্থ করার জন্যে ?"
"শুধু রোগের নাম কেন ? সৌন্দর্যের দিক থেকেও তো পরিষ্কার থাকার একটা মূল্য আছে ! ওই ওই দেখনা, তোমার জ্যেষ্ঠ রত্নটি। এই একটু আগে ফুটফুটে দেখাচ্ছিল ভুত সেজে এল দেখ না ! শৈল, যা, ওকে বাইরেই ঝেড়েঝুড়ে নিয়ে আয়। যা যা এখুনি এসে ওর মাকে জড়িয়ে ধরবে। হুঁ এদের রোগের কথা বললে কি বুঝতে পারবে ? এদের বলতে হবে, বিশ্রী দেখায়। ছেলেপুলে মানুষ করা সোজা নাকি যে —আচ্ছা, তুমি প্রসূতি বিজ্ঞান পড়েছ বউদি ?"

"নাও শুনিনি, নাও তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে লেকচার শুনিয়া বাড়িতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা চঞ্চলতা পড়িয়া গেল, এবং হাবুলকে কেন্দ্র করিয়াই ব্যাপারটা চলিতে লাগিল বলিয়া তাহার দুর্ভোগটা বাড়িল বই কমিল না। তাহাদের মধ্যে কোন্ রকম ময়লায় কি জারম্ বৃদ্ধি পায়, সেই লইয়াই তর্ক হয়, ময়লার আধারটি—পুরানো ন্যাকড়া, ময়লা কাপড়, পচা কি ছাতা ধরা কোন জিনিস হাবুলের নিকট হাজির হয়। সময় নাই অসময় নাই, প্রায়ই দুই-তিনজনে মিলিয়া একজনকে ধরিয়া হাজির করিতেছে—কাপড় কি শরীরে কোথায় একটু ময়লা আছে—হাবুলের কাছে বামালসুদ্ধ নালিশ। হাবুলের পড়িবার ক্ষতি হইতেছে, তাহা ছাড়া এই সব টানা হিঁচড়ানিতে তাহার ঘরের পরিচ্ছন্নতাও কিছু বৃদ্ধি পায় না। সে আশা করিতেছে, এদের অজ্ঞতাটা দূর হইল এবং সৌন্দর্যের জ্ঞানটা একটু ফুটিলে সব ঠিক হইয়া যাইবে। ওদিকে আক্রোশের ভাবটা বাড়িয়া যাওয়ায় ওরা সব ক্রমাগতই পরস্পরের জামাকাপড় নানা ফন্দিতে নোংরা করিয়া মকদ্দমা সাজানোয় হাত রপ্ত করিতেছে।

একমাত্র শৈল সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। সে দাদাকে দেবতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। দেবতার মতই তাহাকে সুদূরে রাখিয়া সসম্ভ্রমে পরিচ্ছন্নতার সহিত পূজা করিতেছে, যত রকম ময়লার যত রকম রোগ হইতে পারে, অবিচল নিষ্ঠার সহিত তাহাদের নাম মুখস্থ করিতেছে এবং তাহার দেবতার প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি গুলোকে কল্পনা এবং ভাষায় মণ্ডিত করিয়া তাহার কয়েকটি মুগ্ধ সহপাঠিনীদের মধ্যে ভাগবতরস বিতরণ করিতেছে।

এদিকে সংবাদ এই। ওদিকে কাকা এবং হাবুলের খুড়তুতো বড় ভাই ভিতরে ভিতরে চিন্তান্বিত হইয়া উঠিতেছিলেন। অবসরমত দুইজনের মাঝে মাঝে এই সমস্যা লইয়া পরামর্শও হইতেছিল। অবশেষে একদিন কাকা বলিলেন, "হাবুল, তুই দেখতে পাচ্ছি পাড়ায় স্যানিটারি ইন্সপেক্টর দাঁড়িয়ে গেছিস, এত কাজের কথা নয়। একটা বছর বাদে তোকে অমন শক্ত এগজামিন দিতে হবে, তুই লেখাপড়া করবি কখন? আমি বলি তেতলার কোণের ঘরটা নে। দিব্যি নিরিবিলি ঘর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসিস সেখানে কোন রকম বালাই জুটবে না।"

হাবুল বলিল, "তা বেশ, কিন্তু এদের আমি অনেকটা ঠিক করেও এনেছিলাম কাকা।"

বারান্দার ও-কোণে বড় নাতিটির আবির্ভাব, বাঁ হাতে একটা সাবান ডান বগলে একটা ভিজা বিড়ালছানা ছটফট করিতেছে। কাকা সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তা দেখছি। যাক্ তুই ওপরেই গিয়ে থাক্। চাকরটাকে বলে দিচ্ছি খাট, আলমারি, টেবিল সব দিয়ে আসুক।"

৩

কাকার প্রতি একটু রাগ হইল। কিন্তু উপরে গিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই সেইটুকু কাটিয়া গেল। মাঝারি গোছের ঘরটি, সামনে প্রশস্ত তেতলার ছাদ। সকালের ঝোঁকে হাবুল

সমস্ত স্থানটি চাকর আর ভক্ত শৈলর সাহায্যে ঝকঝকে তকতকে করিয়া লইল এবং কলেজ হইতে ফিরিয়া যখন দেখিল, যেখনকার যেটি অনাহত শ্রীতে ঠিক সেইখানেই বিরাজ করিতেছে, ঘরের কোণে যত্ন করিয়া সঞ্চিত ভিন্ন ভিন্ন জাতের আধার জড়ো করা নাই এবং বিছানার উপরও কোনও শিশু হাবুলকে সৌন্দর্য এবং পরিচ্ছন্নতা দেখাইবার আগ্রহে জুতার ফিতা বাঁধিতেছে না, তখন সে সত্যই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

দুই দিন পরে আরও আশ্চর্য ব্যাপার চোখে পড়িল। ছেলেমেয়েগুলি প্রকৃতই যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। হাবুল যে উপরে আছে এবং যে কোন মুহূর্তেই নামিয়া আসিতে পারে, এই ধারণাটি অনেক বেশি কাজ হইতেছে। মোটকথা সে নাই বলিয়াই একটি অটল গাম্ভীর্যের কাল্পনিক মূর্তিতে সবার সামনে বিরাজ করিতেছে। আহারের জন্য কিংবা কলেজ হইতে আসা কি কলেজ হইতে যাওয়ার সময় যখন সবার প্রত্যক্ষ হয়, তখন সবাই সসম্ভ্রমে দৃষ্টি নত করিয়া তটস্থ হইয়া থাকে।

দেবতারা দূরে থাকিয়া বৎসরে এক আধবার আমাদের মধ্যে আনাগোনা করেন—এই বন্দোবস্তই ভাল, আমাদেরই একজন হইয়া থাকিলে উভয় পক্ষেরই অনিষ্টের সম্ভাবনা।

বাড়ির বাহিরেও যশ এই অনুপাতেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সর্বদা দেখা যায় না বলিয়া ছেলেমেয়েদের কল্পনায় কিছু আটকাইতেছে না। শৈলকে কোন প্রশ্ন করিলে শৈল অতিমাত্র গম্ভীর হইয়া বলে, "নীচেতেই তিনি ভারি থাকেন কিনা আজকাল!"

"তুই যাস না ওপরে?"

"রক্ষে কর ভাই, ত্রিসীমানার মধ্যে পা দেওয়ার জো আছে?"

কথাটি কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। তেতলার ছাদে, সিঁড়ির ঘরের সঙ্গে লাগোয়া আর একটি ঘর আছে। আকারে ঠিক চতুষ্কোণ নয়. খানিকটা গিয়া একটা ফালি বাঁকিয়া গিয়াছে, ঘরটা দাঁড়াইয়াছে উল্টানো ইংরেজী L অক্ষরের মত। পূর্বে কাঠকুটা থাকিত সম্প্রতি শৈল এটি দখল করিয়াছে। ছাদের এ কোণটায় তাহার ঘর, মাঝে পনেরো ষোল হাত জায়গা, তাহার পরই হাবুলের ঘরটি।

শৈলর সহসা উপরে উঠিয়া আসার কারণটা বুঝিয়া উঠা যায় না; হইতে পারে সে পরিচ্ছন্নতাসূত্রে হাবুলদাদার সহিত একটা সম আভিজাত্য অনুভব করে বলিয়া একই স্তরে থাকিতে চায়; হইতে পারে, তাহার পুতুলের সংসার বাড়িয়া গিয়াছে, এবং নীচে দুইটি ভাইপো ভাইঝি এবং ছোট বোনটির লোলুপ দৃষ্টি এড়ানো ক্রমেই সুকঠিন হইয়া উঠিতেছে। মোট কথা, সখীদের নিকট যাহাই বলুক, শৈল সমস্ত দুপুরটা আজকাল উপরেই হাবুলের ত্রিসীমানার মধ্যেই কাটায়। তবে এটা হয় লুকাইয়া হাবুলকে ব্যাপারটা জানানো হয় নাই। তাহার কারণ বলিতে গেলে শৈলের খেলাঘরের সঙ্গিনী নৃত্যকালীর কথা পাড়িতে হয়।

প্রথমতঃ শৈলর সহিত নৃত্যকালীর সখিত্বটা সম্ভব হইল কি করিয়া, সেই একটা সমস্যা

সেটাকে নিতান্ত একটা আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া ধরিয়া লইলেও হাবুলের নিকট দীক্ষা প্রাপ্তির পরও সখিত্ব যে কি করিয়া বজায় আছে সে তো একেবারেই দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয়।

মেয়েটি যৎপরোনাস্তি নোংরা। সমস্ত অবয়বটি ধুলোমাটিতে এতই প্রচ্ছন্ন যে তাহার আসল রঙটি যে কি, বলা একটু কঠিন। আত্মীয়েরা কুণ্ঠিতভাবে বলে, শ্যামবর্ণ; যাহাদের নিন্দায় আনন্দ আছে, তাহারা প্রমাণ করিয়া দেয়—কালো। মাথাটা একটা আগাছার জঙ্গলের মত, চুল খুব ঘন কিন্তু যত্নের অভাবে বাড়ে নাই। কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো একরাশ স্তবক পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া অর্ধেকটা পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। খোঁপা হয় না, তবে কালেভদ্রে ঘাড়ের উপর অর্ধচন্দ্রাকারের দুইটা সুস্পষ্ট বেড়াবেনী দেখা যায়। দুই-একদিন থাকে, তাহার পর কখন গ্রন্থি খুলিয়া গিয়া বিশৃঙ্খলভাবে এলাইতে এলাইতে আবার আগেকার অবস্থায় ফিরিয়া আসে। দেখিলে মনে হয়, মাথার পিছনে কবে কি হইতেছে, মেয়েটির সে লইয়া মোটেই মাথা ব্যথা নাই।

সারাদিন খেলায় মত্ত থাকে, আর ফলপাকড়ের অত্যন্ত ভক্ত, এবং খেলা ও দুনিয়ার ফলপাকড় হইতে আহৃত ধুলা, কাদা, রস-কষ প্রভৃতি যত রকমের নোংরা সব হাতে-মুখে কাপড়ে-চোপড়ে জমা করিয়া বেড়ায়। সৌন্দর্যচর্চার মধ্যে স্নানটা মাঝে মাঝে করে। তাহাতে ময়লাগুলি গায়ে ভাল করিয়া বসিয়া যায়।

স্বভাব নোংরা মেয়েদের মাঝে মাঝে একটু অসুখ বিসুখ করা ভাল, মা বোনের যত্ন-আত্তি পায় তাহা হইলে একটু নজর পড়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে নৃত্য-কালীর সে বালাই নাই; সে অটুট স্বাস্থ্য এবং অসংস্কৃত শরীর ও বেশ ভুষা লইয়া দূরে দূরেই কাটাইয়া দিতেছে।

গুণের মধ্যে মেয়েটির স্বভাব বড় নরম, অন্তত তাহার চোখ দুইটি এত নরম যে, তাহাকে কাছে কাছে রাখিয়া নিশ্চিন্ত তৃপ্তির সঙ্গে বেশ একটি কর্তৃত্বের ভাব উপভোগ করা যায়। খেলা ঘরের জগতে এ একটা মস্তবড় লোভনীয় জিনিস। শৈল বলিল, "তোমার ছেলে ভাই, হাবুলদাদার মত তিনটে পাশ দিয়ে চারটে পাশের পড়া করছে বলে যে আমার ন হাজার টাকা তোমার ছিচরণে ঢালতে হবে সে আমি পারব না। আমার মেয়ে সুন্দর, তার একটা কদর নেই? আমি বরাভরন-টরন নিয়ে পাঁচ হাজারের ওপর ওঠছিনা; এইতেই তোমায় রাজী হতে হবে।"

অথচ এই কয়দিন আগে, এই নৃত্যকালীকেই শৈলর অপগণ্ড ছেলেটিকে নগদ এগারো হাজার টাকা দিয়া লইতে হইয়াছে।

অন্য সঙ্গিনী হইলে বাঁকিয়া বসিত, অন্তত ঠেস দিয়া দুটা কথা বলিত তো নিশ্চয়। নৃত্যকালী সঙ্গে সঙ্গে চুলের গুচ্ছ বাঁয়ে হেলাইয়া বলিল, "হব রাজী"।

অনুমান হয়, এইসব কারণেই, হাজার নোংরা হইলেও নৃত্যকালী অপরিহার্য। নোড়া-নুড়ি লইয়া খেলা চলে, তাহাতে পরিষ্কারও বেশ থাকা যায়, কিন্তু যতই অপরিষ্কার হউক না কেন, কাদা লইয়া খেলায় একটা বিশেষ সুখ এবং সুবিধা আছে, যেমনটি

ইচ্ছা ভাঙ্গাগড়া চলে।

নৃত্যকালীকে কিন্তু রাখা হয় খুব সঙ্গোপনে। ঘরের যে ফালিটুকু ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে, নৃত্যকালী চুপিচুপি আসিয়া সেই দিকটায় বসিয়া থাকে। হাবুল যদি সিঁড়ি দিয়া ওপরে যায় কিংবা নীচে আসে, ওর অস্তিত্বের খবরই পায় না। শৈলর কড়া হুকুম আছে, যেন ভুলিয়াও কখনও হাবুলদাদার ঘরের দিকে না যায়, কি জোরে শব্দ না করে।

বলে, "তা যদি কর জলার পেত্নী, তো হাবুলদাদা টের পেলে সঙ্গে সঙ্গে আলসে ডিঙিয়ে তোমায় নিচে ফেলে দেবে, আর তোমার সঙ্গে খেলার জন্যে আমার দশা যে কি করবে, ভেবেই পাই না।"

হাবুলের অশুচিতার ভয়ে ঘর ছাড়িয়া কম যাওয়া-আসা করার জন্যই হউক অথবা যে জন্যই হউক, প্রায় মাসখানেক বেশ কাটিল। তাহার পর নৃতকালী একদিন হঠাৎ ধরা পড়িয়া গেল।

যদি বলা যায় হাবুলই ধরা পড়িল, তাহা হইলেও বড় একটা ভুল হয় না। ব্যাপারটা ঘটিল এই রকম—

বৈশাখের দুপুরবেলা। হাবুলদের কলেজ গরমের ছুটিতে বন্ধ হইয়াছে। হাবুল ঘরে বসিয়া একটা কবিতার বই পড়িতেছিল ; হঠাৎ একটা ঘর-ছাড়ানো ভাবে মনটা কেমন হইয়া গেল। সে বাহিরে আসিয়া দুইটা নারিকেল গাছের মাথা একত্র হইয়া ঘরের আড়ালে যেখানে একটি নিবিড় ছায়া ফেলিয়াছে, সেইখানটায় দাঁড়াইল।

স্তব্ধতাটুকু বেশ লাগিল।—ঝিরঝিরে বাতাস দিতেছে, তাহাতে বিশ্রান্ত পল্লীর এখান ওখান হইতে কতকগুলো চাপা সুর মাঝে মাঝে কানে আসিতেছে। সামনা-সামনি খানিকটা দূরে একটা দোতলা বাড়ির খোলা জানালা দিয়া দেখা যায়, একটি মেয়ে মেঝেয় উবু হইয়া একান্ত মনে কি লিখিতেছে। চুলগুলো মুখের উপর দুই পাশ ঢাকিয়া ভূমিতে লুটাইতেছে। ডান দিকে একটা একতলা বাড়ির চিলে কোঠার দেওয়ালে দুইটা পায়রার খোপ আঁটা, ভিতরের পায়রাগুলো ব্যস্ত, খোপের উপর দুইটা পায়রা গায়ে গায়ে সাঁটিয়া চাপিয়া বসিয়া আছে। হাবুল মাঝে মাঝে এই দম্পতিটিকে দেখিতেছিল, মাঝে মাঝে মেয়েটির দিকে দেখিতেছিল, লিপিনিরতাকে লইয়া যে কি ভাঙ্গাগড়া করিতেছিল, সে-ই জানে।

সহসা দেখিল চিলেকোঠায় পাশের ঘরটি হইতে শৈল নীচে নামিয়া গেল।

তাহার বড় কৌতূহল হইল, "শৈল আবার ওখানে করে কি ? খেলাঘরের বাই আছে নাকি ? সে যে একটা মস্ত নোংরামির ব্যাপার। কই এতদিন তো জানিতে দেয় নাই, বা রে শৈল !"

দেখিতে হয়, হাবুল অগ্রসর হইয়া দুইটা সিঁড়ি বাহিয়া ঘরটিতে প্রবেশ করিল, ভিতরে গিয়া দাঁড়াইতেই তাহার চক্ষুস্থির।

যতদূর নোংরা হইতে হয় একটি মেয়ে মেঝেয় পা ছড়াইয়া এবং বালি ঝরা নোনা ধরা দেওয়ালে নিশ্চিন্তভাবে ঠেস দিয়া বসিয়া আছে। পাশে একতাল কাদা ; হাতের

আঙুলগুলো কাদা দিয়া কি একটা গড়িতে ব্যস্ত, তেলো দুইটা শুকনা কাদায় সাদা হইয়া গিয়াছে ; বাঁ গালে কানের কাছটায় সেই রকম বড় দাগ, বোধ হয় হাত দিয়া ঘাম মুছিয়া থাকিবে। আঁচল ভুমিতে বিছানো, তাহার উপর কতকগুলো রাংচিতের পাতা আর ছোট ছোট আগাছার ফল, তাহাদের নীল বেগুনে রসে আঁচলটায় ছোপ ধরিয়া গিয়াছে। এক পাশে তেল-লংকা-মাখানো থেঁতো করা খানিকটা কাঁচা আম।

হাবুলের ছায়ায় ঘরটা একটু অন্ধকার হইতেই মেয়েটি মুখ তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে যেন একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

হাবুল ফিরিয়া যাইতেছিল, ঘুরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শৈল কোথায় ?"

মেয়েটি উত্তর দিতে পারিল না, শুধু জিভ দিয়া শুকনা ঠোঁট দুইটা একটু ভিজাইয়া লইল এবং আঁচলটা একটু টানিয়া লইল। হাবুল প্রশ্ন করিল, "তোমার নাম কি ?"

চুপচাপ। মুখের সেই সাদা দাগটা ঘামে ভিজিয়া একটি তরল কাদার রেখা গালের মাঝামাঝি গড়াইয়া আসিল। মুখখানা ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল, একটু একটু করিয়া রাঙিয়া উঠিতে লাগিল।

হাবুলের কৌতুক বোধ হইতেছিল, উত্তরের আশা না থাকিলেও প্রশ্ন করিল, "তুমি এত নোংরা কেন ?"

ইহাতে মেয়েটি একটু গুটিসুটি মারিয়া গেল, বোধ হয় শৈলর সতর্কতার কথা মনে পড়িল, এইবার বুঝি তাহা হইলে আসিয়া ভিজাইয়া ফেলিয়া দেয়।

হাবুল ঠায়-নতদৃষ্টি এই জড়ভরতের মত মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল। কেন, বলা শক্ত, আরও বলা শক্ত এইজন্য যে, অমন দারুণ নোংরামির মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাহার মুখে কোনও বিকারের চিহ্ন লক্ষিত হইল না। একটু পরে হঠাৎ কি যেন মনে হইল, আর দাঁড়াইল না। দুয়ার পর্যন্ত গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল, বলিল, "হ্যাঁ, দেখ, আমি যে এসেছিলাম কিংবা তোমাদের খেলাঘরের কথা জানি—একথা শৈলকে বলো না। বলবে না তো ?"

মেয়েটি বলিল "না"।

উত্তর পাইয়া হাবুল আর একটু দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "পুতুল খেলছিলে বুঝি ?'

কোনও উত্তর হইল না।

"শৈলর সঙ্গে পড় বুঝি ?"

উত্তর নাই। এদিকে মনের মধ্যে কি রকম একটা গোলযোগ সৃষ্টি হওয়ায় প্রশ্নও যোগাইতে ছিল না। যাইবার জন্য ফিরিয়া আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তুমি রোজ এসো, আসবে তো ?"

মেয়েটি সাহস করিয়া ঘাড় পর্যন্ত নাড়িল না, বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াই হাবুল বলিল, "আমি কিছু বলব না, আসবে তো ?"

মেয়েটি ঘাড় নাড়িল। এমন সময় সিঁড়ির নীচের ধাপে পায়ের শব্দ হইল। হাবুল তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

৪

তাহার পরদিন হাবুল জানালাটি অল্প খুলিয়া সিঁড়ির দিকে উৎকণ্ঠিত ভাবে চাহিয়া রহিল এবং শৈল একসময় পা টিপিয়া টিপিয়া নামিয়া গেলে নোংরা ঘরটিতে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেখিল, মেয়েটি নাই। আরও দুই দিন নিরাশ হইয়া সে বুঝিল, নিজের অপরিচ্ছন্নতার অপরাধে সে ভয় পাইয়াছে। তখন হাবুলের একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল এবং নিজের পরিচ্ছন্নতার অপরাধে মনটি বড়ই ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সিঁড়ির দিকে চাহিয়াই ছিল, অনেকক্ষণ পরে শৈল আসিলে ডাক দিল। শেল ক্ষণেকের জন্য চোখের একটু আড়াল হইয়া মুঠার মধ্য হইতে কি গোটাকতক জিনিস একপাশে ফেলিয়া দিয়া হাতটা শেমিজে মুছিয়া লইল এবং শেমিজটা কাপড়ে ভাল করিয়া ঢাকিয়া সামনে দাঁড়াইল। মুখটি শুকাইয়া গিয়াছে।

হাবুল আসিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল, "আমার ভয়ে খেলার জিনিসগুলো বুঝি ফেলে দেওয়া হল? খেলা একটু চাই বই কি; তাতে রাগ করব কেন? শুধু অপরিষ্কার না হ'লেই হ'ল—বেশি রকম অপরিষ্কার। মাটির পুতুল গড়তে জানিস?"

শৈল মাথা নাড়িয়া জানাইল "না।"

"জানতে হয়; সে একটা শিল্প যে—চারুশিল্প। তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে কেউ জানে না?"

শৈল একটু ভাবিল, সে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল। "নেত্য বেশ জানে, অনেক রকম।"

"তার কাছে শিখে নিলেই পার। নেত্য আবার কে? নৃত্যধন?"

"না, নেত্যকালী, আমার সই—গঙ্গাজল। বড্ড নোংরা যে, মিশতে ঘেন্না করে।"

হাবুল একটু হাসিয়া, কৃত্রিম রোষের সহিত চোখ দুইটা বোনের মুখের উপর ফেলিয়া বলিল "এই বুঝি শিক্ষা হচ্ছে তোমার? কাউকে ঘেন্না করতে আছে? তাও আবার নিজের সইকে? বরং তাকে পরিষ্কার হতে শেখাওনা—বরং তাকে কাছে রেখে।"

শৈল একটু মাথা নিচু করিয়া রহিল, তাহার পর বাহির হইয়া গেল। হাবুল আবার তাহাকে ফিরাইয়া বলিল, "তা বলে যেন আমার ঘরের দিকে কাউকে এনো না, খবরদার। নোংরা হলে আমার কাছে গঙ্গাজলেরও খাতির নেই, বলে দিলাম।"

পরের দিন জানালার অল্প ফাঁক দিয়া তাহার প্রায় ঘণ্টাখানেক একভাবে চাহিয়া থাকিবার পর শৈল ছাদে আসিল। একবার সিঁড়ির দিকে ঝুঁকিয়া চাহিয়া অদৃশ্য কাহাকে থামিবার জন্য ইশারা করিল এবং পা টিপিয়া টিপিয়া হাবুলের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। দেখিল, হাবুল নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। তাহার পর আবার তেমনই ভাবে ফিরিয়া গিয়া নৃত্যকালীকে সিঁড়ি হইতে ইশারায় ডাকিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিল। হাবুলের ঘুম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙিয়া গেল। উঠিয়া আবার ঘণ্টাখানেকের একটি দীর্ঘ যুগ জানালার ফাঁকে চাহিয়া থাকিবার পর হাবুল দেখিল, শৈল কি জন্য নীচে নামিয়া গেল। তখন হাবুল শৈলর চেয়েও নিঃশব্দ পদক্ষেপে খেলাঘরটিতে গিয়া প্রবেশ করিল, কান দুইটিকে যথাসম্ভব সিঁড়ির নিম্নতম ধাপের কাছে মোতায়েন

করিয়া রাখিল।

নৃত্যকালী মাটির তাল হইতে খানিকটা কাটিয়া লইতেছিল ; মুখ তুলিয়া চাহিল, কেন, তাহা ভগবান প্রজাপতিই জানেন। আজ তাহার চোখে ভয়ের বিশেষ কোন চিহ্ন ছিল না, শুধু একটা অবোধ কৌতূহলের ভাব. শাড়িটা আজ যেন একটু ফরসা, তাহাতে ধুলা-কাদার ছোপ আরও স্পষ্ট করিয়া জাগিয়া আছে। কাঁধে অসংলগ্ন বেড়বেনী লতাইয়া আছে।

হাবুল বলিল, "শৈলকে খুঁজতে এসেছিলাম ; কোথা গেছে বলতে পার ?"

"নীচে গেছে।"

উত্তরটা বোকার মত হইল। উপরে যখন নাই, তখন নীচে তো গেছেই। কিন্তু তাহাতে আবার প্রশ্ন করার সুযোগ থাকায় হাবুল খুশিই হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি করতে গেছে বলতে পার ?"

"পারি।"

নিজের অদৃষ্টে প্রসন্ন হাবুল প্রশ্ন করিল। "কি করতে ?"

"আরও কাদা মেখে নিয়ে আসতে, আর খ্যাঁরাকাঠি।"

হাবুলের মনে হইল, স্বরটি মিষ্ট, 'কাদা' 'খ্যাঁরাকাঠি'—এই রকম নোংরা কথাগুলোও এত মিষ্ট লাগিল। বলিল, "কাদা ? সেই তোমাদের বাড়ি থেকে তো ? এ বাড়িতে তো নেই ?"

"হ্যাঁ।"

হাবুল থেবড়ি খাইয়া সামনেটিতে বসিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য স্থানটুকু বেশ পরিষ্কার ছিল না। বলিল, "তুমি বেশ পুতুল গড়তে পার না ?"

নৃত্যকালী মাথাটা একটু নিচু করিয়া ঠোঁটের এক কোণে লজ্জিত ভাবে একটু হাসিল।

হাবুল বলিল, "আমায় একটি গ'ড়ে দিতে হবে।"

অবশ্য শুধু বলিবার সুখটুকুর জন্যই বলিল, কেননা ভগ্নীকে মৃৎশিল্পে উৎসাহিত করিলেও, পুতুলের যা সব নমুনা সামনে পড়িয়াছিল, সেগুলিকে চারুশিল্পের উৎকর্ষ বলিয়া মনে করে এতটা দুর্দশা তাহার তখনো হয় নাই।

মেয়েটি মুখের উপর বাঁ হাত চাপিয়া আরেকটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভালভাবেই হাসিয়া ফেলিল। যখন হাত সরাইয়া লইল, দেখা গেল, ডান গালের নীচে আঙুলের ডগার কাদায় তিনটি দাগ লাগিয়া গিয়াছে। হাবুল বলিল, "ও কি হল ? ইয়েতে যে দাগ লেগে তিনটি দাগ লেগে গেল !"

নৃত্যকালী বুঝিতে না পারিয়া মুখের দিকে চাহিতেই বলিল, "ইয়েতে মানে-ইয়ে-তোমার গালে আর কি। না, হয় নি আর একটু মোছ, আর একটু—ওই পাশটায় এখনো রয়েছে. সমস্তটা টেনে মুছে দাও দিকিন, আঃ, রয়েছে যে এখনও একটু—"

মোটেই আর কিছু ছিল না. এবং অবর্তমান কাদা মুছিতে সুকুমার গালটির যে অবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে হাবুল ভিন্ন আর যে কেহই দয়া অনুভব করিত।

হাবুল বলিল, "আমি না হয় দোব ঠিক করে !"

কোঁচার খুঁট তুলিয়াছিল, বোধহয় দিত ; কিন্তু নীচে যেন শৈলর স্বর শোনা গেল। হাবুল তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "সেদিন যে এসেছিলাম, বলনি তো শৈলকে ?"
নৃত্যকালী মাথা নাড়িল, "না।"
দুয়ারের নিকট হইতে ফিরিয়া হাবুল বলিল, "আর হ্যাঁ, আর এখন যে ওকে খুঁজতে এসেছিলাম, সে কথাও ব'লে কাজ নেই, ভাববে—একটু খেলছি, তাতেও হাবুলদাদার এসে বাগড়া দেওয়া—"

৫

মাঝের চার-পাঁচ দিনের এদিককার ইতিহাস আর দিলাম না। আশাকরি আন্দাজ করিয়া লইতে কাহারও বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।
অপর দিকে খবর এই যে, হাবুল আবার অপরিচ্ছন্নতা বিষয়ে যেন আরও সতর্ক হইয়া উঠিয়াছে। বউদিদিকে বলিল, "তোমরা গুরুজন, বলা ঠিক হয় না ; কিন্তু তোমরা যদি সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক, ছেলেমেয়েরা একটা আদর্শ পায়। এই ধর, তুমি যদি সর্বদা একটা স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে থাক—"
বউদিদি বলিল, "রক্ষে কর ভাই! বরং তুমিই একটি আদর্শ বিয়ে করে নিয়ে এসে আলমারিতে সাজিয়ে রাখ না কেন ?"
নিজের কথাটা ঠাট্টায় উড়াইয়া দিলেও দেবরের খুঁতখুঁতানির চোটে বউদিদিকে আবার কাচিগুলির দিকে কড়া নজর দিতে হইল। তাহাদের সন্ত্রাসটা ছিলই, আবার একচোট উগ্রতরভাবে জাগিয়া উঠিল। শৈল নৃত্যকালীকে বারংবার সাবধান করিতে লাগিল, "তোকে বলে বলে হার মানছি পোড়ারমুখী কিন্তু যদি একদিন ঘুণাক্ষরেও হাবুলদার নজরে পড়ে যাসতো তোর যে কি দুর্গতি করে ছাড়বে তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। আমি তো তোকে এনে ভয়ে যেন কাঁটা হয়ে থাকি। মুয়ে আগুন আবার ঠোঁট চেপে হাসি! কোত্থেকে যে হাসি আসে পোড়ার মুখে, তা তো বুঝি না—"
সেদিন নৃত্যকালী আগে হইতে আসিয়া বসিয়া আছে, ঘরে ঢুকিয়াই চাপা গলায় প্রশ্ন করে, "হাবুলদাদার ঘরের ওদিকে যাস নি তো ?"
নৃত্যকালী বলে, "নাঃ।"
শৈল বলে, "খবরদার! আর দরকারই বা কি আমাদের ওদিকে সবার ভাই? তুমি বাপু খুব পরিষ্কার আছ তো আছ : আমরা দুটিতে না হয় নোংরাই : থাক কোণে তোমার ঘেন্না নিয়ে, কি বল ভাই গঙ্গাজল ?"—এইভাবে নিশ্চিতকে সুনিশ্চিত করিবার জন্য যেমন একদিকে শাসায়, অপর দিকে তেমনি আবার নৃত্যকালীর আত্মসম্মান জাগ্রত করিবার চেষ্টা করে।
নৃত্যকালী বলে, "হুঁ।"
মেয়েটি আজকাল বেশ প্রতারণা শিখিয়াছে। কালই প্রায় ঘন্টাখানেক হাবুলের ঘরে গিয়া গল্পসল্প করিয়াছিল। শৈল বাহিরে কোথায় গিয়াছিল বলিয়া হাবুল ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল।

এর পরে আরও দুইদিন কাটিল। হাবুল অত্যন্ত কবিতা পড়িতেছে এবং বাকিটা সময় নীচে আসিয়া চারিদিকে অপরিচ্ছন্নতা আবিষ্কার করিয়া জর্জরিত হইয়া উঠিতেছে, বলিতেছে, "তোমরা সব শেষ পর্যন্ত আমায় বাড়িছাড়া না করে করে ছাড়বে না দেখছি, আমার অদৃষ্টে লেখাই আছে হস্টেল—"

দুপুরবেলা, আজ শৈলদের স্কুলে প্রাইজ বিতরণ। সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইতেছে, দুয়ারের সামনেই নৃত্যকালীর দেখা। শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "যাবি না ইস্কুলে প্রাইজ দেখতে ?"

নৃত্যকালী নাসিকাটি কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ভাল লাগে না।"

শৈল বলিল, "মুয়ে আগুন। কি ভাল লাগে তবে, শুনি ?"

নৃত্যকালী তাহাকে কাটাইয়া গেলে, হঠাৎ ঘুরিয়া বলিল, "ওমা! তুই যে আজ এসেন্স মেখেছিস লা! পেত্নীর ভাবন দেখে বাঁচি না।"

"কই, ধ্যাৎ।"—বলিয়া নৃত্যকালী ভিতরে চলিয়া গেল।

বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া হাবুলের কাকীমা শুইয়া ছিলেন ভাড়াটেদের নূতন বউটি পাকা চুল তুলিতে ছিল, পুত্রবধূ উপুড় হইয়া শুইয়া একটা নাটক পড়িয়া শুনাইতেছিল। নৃত্যকালীকে দেখিয়া বলিল, "নেত্য একটু জল গাড়িয়ে দিয়ে যাতো দিদি, আর পারি না উঠতে।"

নৃত্য জল দিয়া উপরের দিকে চলিয়া গেল। ভাড়াটেদের বউটি বলিল, "মেয়েটি নোংরা তাই, নইলে—"

কাকীমা বলিলেন, "হ্যাঁ, বেশ ছিরি আছে। আর নোংরাই কি থাকবে চিরদিনটা গা ? বয়েস হয়ে আসছে -যা শুচি বেয়ে আমাদের হাবুলটা নইলে ইচ্ছে ছিল—"

পুত্রবধূ কিছু বলিল না ; ঠোঁটের কোণে একটি অতিসূক্ষ্ম হাসি চাপিয়া অন্যমনস্কভাবে সিঁড়ির দিকে চাহিয়াছিল ; বইয়ে চোখ ফিরাইয়া আনিয়া বলিল, "হুঁ শোন—"

হাবুল নিরাশ হইয়া খেলাঘর হইতে ছিল। দেখিল, সিঁড়ির দরজায় নৃত্যকালী দাঁড়াইয়া বাহির হইতে প্রশ্ন করিল, "খেলবে না ?"

নৃত্যকালী প্রশ্ন করিল, "সই আছে ?"

হাবুলও যেন শৈলর স্কুলে যাওয়ার কথাটা মোটেই জানে না, এই ভাবে উত্তর করিল, "আছে বোধহয় নীচে, আসবে'খন, তুমি ততক্ষণ চল ও ঘরে, বাপরে, যা গরম এ ঘরটায় !"

ঘরে গিয়ে হাবুল টেবিলের সামনে চেয়ারটিতে বসিল, নৃত্যকালী একটু দূরে, পাশটিতে গিয়া দাঁড়াইল।

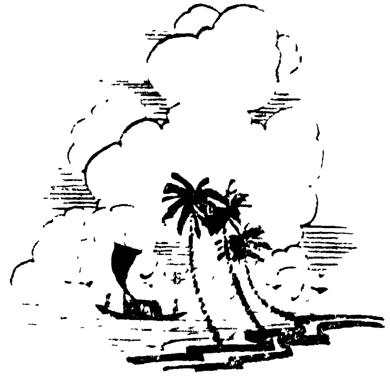
হাবুল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বুঝি ইস্কুলে যেতে ভাল লাগে না নৃত্য ?"

নৃত্য হাসিল মাত্র।

"কি ভাল লাগে ?"

কথাটা বড় ব্যাপক, বোধহয় মিলাইয়া দেখিয়া উত্তর হাতড়াইতেছিল, হাবুল প্রশ্ন করিয়া বসিল, "আমার কাছে আসতে ?"

নৃত্য একবার চোখ তুলিয়া লজ্জিতভাবে ঘাড় নাড়িল, "হ্যাঁ।"
হাবুল জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? বলতে পার?"
"সইয়ের দাদা বলে।"
হাবুল বলিল, "আমারও তোমার কাছে থাকতে ভাল লাগে নৃত্য।"
একটু থামিয়া প্রশ্ন করিল. "কেন তা জিজ্ঞেস করলে না?'
নৃত্যকালী চোখ তুলিয়া চাহিতে বলিল, "বোনের সই বলে।"
কথাটার মধ্যে কোথায় কি ছিল, নৃত্য খিলখিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতে মুখটা ঢাকিতে গিয়া আঁচলটা নীচে পড়িয়া গেল। তখন হাবুল যে হাবুল, একদিন প্রণাম করিতে গিয়া সামান্য একটু ময়লার জন্য কাকীমাকে সরাইয়া লইয়াছিল, সেই শুচিবিলাসী হাবুল, পরম আগ্রহ সহকারে ভুলুণ্ঠিত অঞ্চলটি উঠাইয়া লইল এবং তাহাতে শুচিতার নিতান্ত অভাব থাকিলেও প্রায় বুকের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "বাঃ, চমৎকার পাড়টি তো!"
মেয়েটি আজ বেশি হাসিতেছে, আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, "ভাল কোথায়? কালো নাকি ভাল হয়?"
একরঙা, কোন রকম নক্সাবিহীন কালো পাড়। একে কালোই, ময়লা কাপড়ে আবার সত্যই তেমন ভাল দেখাইতেছিল না। হাবুল একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, 'ভাল, মানে—ভাল, অর্থাৎ তোমার গায়ে বেশ ভাল দেখাচ্ছে।"
সাহস বাড়িয়া যাওয়ায় অঞ্চলটা মুঠায় ভরিয়া লইয়া নিজের নাকে চাপিয়া ধরিল, বোধ করি অধরেও একটু চাপিল. তাহার পর প্রশ্ন করিল, "এসেন্স লাগিয়েছ বুঝি নৃত্য? আমার বড্ড ভাল লাগে, বুঝেছ?"
নৃত্যকালী মুখ নীচু করিয়া একটু হাসিল, এবং একটু বোধ হয় বেশি করিয়া বুঝিয়াই বলিল, "এবার থেকে ফরসা কাপড়ও পরে আসব, আজ দিদি—"
হাবুল হঠাৎ এতটা সচকিত হইয়া গেল যে, তাহার হাত হইতে আঁচলটা আবার মাটিতে পড়িয়া গেল। চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া বলিল, "না না, অমন কাজ করো না। সবাই জানে আমি নোংরা দু চক্ষে দেখতে পারি না, নিশ্চিন্দি আছি, পরিষ্কার হতে গেলেই সর্বনাশ। ভাববে, মেয়েটা হঠাৎ কেন—তুমি বরং কাপড়টা কেচে এসেন্সের গন্ধটাও ধুয়ে ফেলে দিও।"
ছেলেমানুষ অবুঝ, তাহাকে এমনই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। বোধ হয় সেইজন্য টেবিলের উপর হইতে নৃত্যের হাতটা আলতা আর পুঁইফলের নীল ছোপ-ধরা হাতটা তুলিয়া লইয়া নিজের গালে চাপিয়া ধরিয়া বলিল. "এই আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছ? ফেলবে ধুয়ে? আর, কখনও পরিষ্কার হতে যাবে না? হলে ভয়ংকর রাগ করব কিন্তু আমি।"



বিপন্ন

এম. এস-সি. পাশ করিলাম ; সঙ্গে সঙ্গে একটি চাকরিও জুটিয়া গেল। বয়স তখন এত অল্প যে, প্রফেসার সেন তাঁহার নিজস্ব প্রথায় অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন, শৈলেন, তুমি যাকে বলে এঁচড়ে পেকে গেলে।

চাকরি—বেহারে কোন একটি কলেজে প্রফেসারি। সত্বর যোগদান করিবার তাগিদও ছিল, তাহার উপর কাকা 'শুভস্য শীঘ্রম্ শুভস্য শীঘ্রম্' করিয়া বাড়িটাতে এমন একটা উৎকট তাড়ানো-ভাব দাঁড় করাইলেন এবং আমি বালক-সুলভ অবুঝপনার বশে চাকরিটা হারাইবই জানিয়া শেষ পর্যন্ত এমন নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন যে, বাহালি-পত্র পাওয়ার পরদিনই তাড়াতাড়ি যাত্রা করিতে হইল। তাহাতে খুঁটিনাটি অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যই কেনা হইয়া উঠিল না।

কর্মস্থানে পৌঁছিয়া বৈকালের দিকে বাজারে বাহির হইয়া গেলাম এবং একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি বড় দেখিয়া মনিহারী দোকানে প্রবেশ করিলাম। দোকানটিতে বেশ ভিড়, বেশির ভাগ লোকই দাঁড়াইয়া ; কাউণ্টারের সামনে সারি সারি কতকগুলি চেয়ার পাতা, অধিকৃত। আমার একটু বসিতে পারিলেই ভাল হইত, কেন না, অনেকগুলি জিনিস লইতে হইবে, বিলম্ব হইবার কথা। এদিক-ওদিক চাহিতেছি, হঠাৎ নজর পড়িল,একটি কোণাপানা জায়গায় একটি ছোকরা আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। চোখোচোখি হইতেই তাহার চেয়ারটি ছাড়িয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনি এইখানে আসুন না ; দাঁড়িয়ে কেন ?

হিন্দীতে কথা বলিল, তাহা না হইলে বেহারী বলিয়া চিনিবার উপায় ছিল না। মাথায় আধা-বাবরি-গোছের ব্যাক-ব্রাশ চুল, কোঁচায় কাবুলী ফেরতা দেওয়া কাপড় পরা, গায়ে

বোতামের কালো ফিতা বাহির করা একখানি পাশ-বোতাম পঞ্জাবি-টায়টোয়ে কোমরের নীচে পর্যন্ত নামিয়াছে, পায়ে নাগরা-এদেশী নয়, যাহা কলিকাতায় গিয়া বাংলার সুকুমারত্বের ছাপ লইয়া আবার এখানে ফিরিয়া আসিয়াছে। একটু হাসিয়া ইংরেজীতে বলিলাম, না থাক, ধন্যবাদ। আমি বেশ আছি।

এক ধরণের খাতির আছে যাহা অত্যাচারের নামান্তর মাত্র, দেখিলাম এও তাই। তাও কি হয়? —বলিয়া ছোকরা হাসিতে হাসিতে দুই পা আগাইয়া আসিল এবং আমার হাতটা ধরিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিয়া সামনের বিক্রেতাকে বলিল নাও, আমার এখন থাক্, আগে এঁকে দাও; সেই থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক।

সন্দেহ হইল দালাল নাকি? তাই বা কেমন করিয়া হয়? দেখিলাম, কাউণ্টারের উপর তাহার নিজেরই বাছাই করার জন্য একরাশ জিনিস রহিয়াছে। ফুলেল তেল, সাবান, আরশি, চিরুনি, কয়েক রকম সুগন্ধি, লেটারপ্যাড, আরও নানা রকম জিনিস—যাহা শৌখিনও আবার প্রয়োজনীয়ও হয়। ইতিমধ্যে বিক্রেতা কাউণ্টারের কাছ হইতে একখানা চেয়ার তুলিয়া তাহার জন্য এদিকে নামাইয়া দিল। বোঝা গেল, শাঁসালো খদ্দের বলিয়া বেশ খাতির আছে।

আমি বিক্রেতাকে বলিলাম, আগে আমায় একটা স্টোভ দেখাও দেখি; প্রাইমাস হানড্রেড আছে?

দোকানী বলিল, আছে বাবু, তবে একটু দেরি হবে, সামান্য একটু। আজই বাক্স এসে পৌঁচেছে, প্যাকিং খুলে এখুনি নিয়ে আসছি। বলিয়া সে ফিরিল; ছোকরা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, খুলে দাম খতিয়ে নিয়ে এস, নইলে একটা যা-তা দাম ব'লে এঁকে ঠকাবে—। কিছু তাড়াতাড়ি নেই এঁর।

তাহার পর আমায় প্রশ্ন করিল, আপনি কি বেশি ব্যস্ত?

বলিলাম, না, তেমন আর কি! তবে ততক্ষণ বরং অন্য একজনকে ব'লে যাক্ না, আমায় তেল, সাবান, ব্লেড, এইগুলো দিক বের করে।

আচ্ছা সে হচ্ছে। তুই যা শিগগির, দেখিস, যেন আবার মেলা তাড়াহুড়ো ক'রে যা-তা নিয়ে আসিস নি। ও-ই আসুক মশাই, ভাল সেলস্‌ম্যান। সিগারেট খান?

পকেট হইতে একটি সিগারেট-কেস বাহির করিয়া সামনে ধরিল। একটা সিগারেট বাহির করিয়া মুখে দিলাম; ছোকরা নিজেও একটা ঠোঁটের মাঝে আলগা করিয়া ধরিয়া কেতাদুরস্তভাবে দেশলাই জ্বালিয়া আমার সামনে ধরিল। তাহার পর নিজেরটা ধরাইয়া, একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, স্মোক্ ইজ মাই প্যাশন।

একেবারে আপ-টু-ডেট!

লক্ষ্য করিলাম, সিগারেট খাইতে খাইতে খুব চকিত এবং সংযতভাবে দুই-একবার পাশের জিনিসগুলির উপর দৃষ্টিপাত করিল এবং নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে কি যে ভাবিতে লাগিল; তাহার ভাবটা দেখিলে সন্দেহ হয়, যেন কি একটা কথা বলিতে চাহিতেছে, অথচ যেন জো পাইতেছে না।

নিতান্ত চুপ করিয়া থাকার অস্বস্তি কাটাইবার জন্য বলিলাম, ও জিনিসগুলো বুঝি

আপনি পছন্দ করবার জন্য আনিয়েছেন ?

মুখের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে মাথা নাড়িয়া জানাইল হাঁ। সঙ্গে সঙ্গে যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল এইভাবে বলিল, ঠিক কথা এই তো আপনাকে পাওয়া গেছে, দিন তো মেহেরবানি করে আমার গোটাকতক জিনিস পছন্দ ক'রে। বলবেন বোধ হয়, কেন, আপনি নিজে কি পছন্দ করতে পারেন না ? পারি, কিন্তু জানেনই তো টু হেডস আর বেটার দ্যান ওয়ান।

আমার মুখে এরূপ একটা অশোভন আপত্তি ধরিয়া লওয়ায় আমি একটু লজ্জিত হইয়াই বলিলাম সে কি কথা ? আমার দ্বারা যদি সামান্য সাহায্য হয়তো আমি বিশেষ আনন্দিতই হব।

সে আমি বাঙালিদের জানি, তাঁদের সম্বন্ধে আমার ধারণাও খুব উচ্চ। আচ্ছা, এই সাবানের কথাই ধরা যাক্।

সাবানের বাক্সগুলি একে একে সরাইয়া দিয়া বলিল, এই তো ভিনোলিয়া, ইর‍্যাসমিক, হিমানী, ন্যাসকো, পামঅলিভ, ক্যালকাটা সোপ ওয়াকর্স, মাইসোর—আরও এইসব কি কি রয়েছে, আপনি কোন্‌টা রেকমেণ্ড করেন ?

আমি বলিলাম, মাফ করবেন, বিলিতী গুলির সম্বন্ধে আমি কিছু বলব না। তবে—

ছোকরা ভিনোলিয়া, পামঅলিভ, ইর‍্যাসমিকের বাক্সগুলি সঙ্গে সঙ্গে সরাইয়া রাখিয়া বলিল। নিন, বলুন এবার। মানে, ভিনোলিয়া দাবি করে, অমন সফ্‌ট আর ডেলিকেট স্কিন অন্য সাবানে দিতে পারে না। তা যাক গিয়ে ; এদিকে আবার স্বরাজও তো চাই মশাই। এখন এগুলোর মধ্যে আপনার কোনটা পছন্দ ? এক কোম্পানিরই পাঁচ-সাত রকম আছে। আচ্ছা, আপনি সায়েন্স না আর্টস ?

বলিলাম, সায়েন্স।

আই. এস-সি ?

না, এইবার এম. এস-সি. পাস করেছি।

ছোকরা গভীর শ্রদ্ধার সহিত আমার দিকে চাহিল, তাহার পর বলিল, তবে তো কথাই নেই, দি ম্যান ফর ইট। আচ্ছা, সাবানে গায়ের রঙ ইমপ্রুভ করতে পারে ? ধরুন—

সেকেণ্ড কয়েক একটু চিন্তা করিয়া লইল, তাহার পর কহিল, ধরুন—এই ধরুন কেউ যদি পাড়াগাঁয়ে মনে করুন, এই তেরো চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত কাটিয়ে থাকে, জানেনই তো, পাড়াগাঁয়ে ধুলো কাদা মেঠো হাওয়া—এসবের মধ্যে রঙ তো আর ঠিক থাকে না, তা এখন যদি সে রেগুলারলি সাবান মেখে যায় তো রঙটার জলুস বাড়বে ব'লে আপনাদের সায়েন্স গ্যারান্টি দিতে পারে ?

কোথায় ব্যথা এবং আমার এত খাতিরের কারণটাই বা কি এতক্ষণে বুঝিলাম, বলিলাম, কি জানেন ? সায়েন্স যে গায়ের রঙ আর সাবানের কথা ধরেই কোন বিশেষ কথা বলছে তা মনে পড়ে না ; তবে সাবান জিনিসটা লোমকূপগুলো বেশি পরিষ্কার রাখে, বাইরের ময়লাও জমতে দেয় না, কাজেই গায়ের চামড়ার স্বাস্থ্য থাকে ভাল, সেই থেকেই—

ছোকরা গালে হাত দিয়া মাথাটি কাত করিয়া খুব মনোযোগ সহকারে কথাগুলো শুনিতেছিল ; সোজা হইয়া বসিয়া, তর্জনীটা একটু নামাইয়া বলিল, ধেয়ার ইউ আর, হয়েছে। আচ্ছা যদি হয় তো এক বার করে সাবান মাখলে যে পরিমাণ উন্নতি হবে ; দু'বার মাখলে তার চেয়ে বেশি উন্নতিই হবে নিশ্চয়, তিন বার করে মাখলে সেই অনুপাতে তার চেয়েও বেশি ? চার বার-ছবার-আটবার—

হায়রে, চোদ্দ-পনেরো বছরের গাত্রচর্ম, তোমার বিপদও অনেক ! আমি আর না থাকিতে পারিয়া বলিলাম, হেজে যেতে পারে।

ছেলেটি যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। ক্ষণমাত্রে সামলাইয়া লইয়া বলিল, না, ছবার আটবার একটা কথার কথা বলছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সাবান প্রসঙ্গ যেন চাপা দেওয়ার একটা তুলিয়া লইয়া বলিল, তা হ'লে এ সাবানটার সম্বন্ধে কি বলেন ? কোম্পানিটাও ভাল গন্ধটাও ডিসেন্ট—

খুব বড় সাবানবেত্তা বলিয়া আমার কোন কালেই নাম ছিল না ; তবু বেচারাকে সপ্রতিভ করিয়া তুলিবার জন্যই বলিলাম, দেখি, হ্যাঁ, এইটিই আজকাল কলকাতায় খুব চলছে হট ফেভারিট।

মুখটি পুলকে দীপ্ত হইয়া উঠিল, বাক্সটা একটু তুলিয়া ধরিয়া এক পাশে নামাইয়া রাখিল, মনে মনে বুঝিবা কাহার দুটি কংকণ পরা হাতে তুলিয়া দিল। বলিল, এই দেখুন বেয়াদবি, আপনাকে পান অফার করা হয়নি।

পকেট হইতে একটা রুপার ডিবা বাহির করিয়া ডালাটা খুলিয়া ধরিল, জিজ্ঞাসা করিল, জরদা খান ?

না।

আচ্ছা, তেল আজকাল কলকাতায় সবচেয়ে কোন্‌টি বেশি চলছে ?

সাবান সম্বন্ধে সমস্ত কলিকাতাকে টানিয়া আনিয়া ভাল করি নাই দেখিতেছি ; কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, ছোকরা বলিয়া উঠিল, অত কথায় কাজ কি, আপনি নিজে কি ব্যবহার করেন তাই বলুন না ? আপনারও তো চমৎকার চুল দেখছি।

উত্তর করিলাম, আমার কথা ছেড়ে দিন, যখন সেটা হাতের কাছে পাই, খানিকটা দিই মাথায় চাপড়ে।—বলিয়া একটু হাসলাম—

ছোকরা নেহাত যেন খাতিরে পড়িয়া মুহূর্তের জন্য মুখটাতে একটু হাসি টানিয়া আনিল, সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর ব্যস্ততার সহিত জেরা শুরু করিয়া দিল।

আচ্ছা, হাতের কাছে কোন্‌টা বেশি পান ?

তার কি কোন ঠিক আছে। কোনদিন হয়তো দিলামই না তেল মাথায়।

নাছোড়বান্দা, ক্ষণমাত্র ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা না হয় অন্য দিক দিয়েই দেখা যাক, সবচেয়ে কম কোনটা পান।

আমি আর একবার হাসিয়া বলিলাম, সেটা আরও বলিতে পারি না। যেটা সবচেয়ে বেশি পাই, সেটার কথাই যখন মনে থাকে না। তখন সবচেয়ে কমের কথা কি করে মনে থাকবে বলুন ?

আবার একটু অপ্রস্তুত ভাব ; একটু মৌন থাকিয়া বলিল, আচ্ছা আপনাদের সায়েন্স কি বলে, চুলের সঙ্গে তেলের সম্বন্ধ বিষয়ে ?

বলিলাম, কেশ তৈল্য সম্বন্ধে সায়েন্স বিশেষ করে কোথাও বলে গেছে বলে তো মনে পড়ে না। তবে কথা হচ্ছে, তেল-টেল মাখলে, একটু শ্যামপুইং করলে, চুলটা থাকে ভাল।

ছোকরা আমার কথায় সঙ্গে সঙ্গে তর্জনীটা নামইয়া বলিল থাকে ভাল। বেশ, এইবার এই দিক থেকে দেখা যাক, কেশ তৈল্য হচ্ছে মোটামুটি ক্লাসের—তিলের, নারকেলের, আর এণ্ডির, এই তিনের কোন না কোন একটা দিয়ে ভাল কেশ তৈল তৈরী করি ; এখন কি কোশ্চেন ইজ, এর মধ্যে কোনটা চুলের পক্ষে সবচেয়ে ভাল ? আপনাদের সায়েন্স কি বলে ? ধরুন—একটা ঢোক গিলিয়া বলিল এই ধরুন, আমার এক আত্মীয়া প্রায় তের-চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত পাড়াগাঁয়েই ছিল, আমাদের দেশের বাপ-মায়েরা সৌন্দর্য সম্বন্ধে কতটা গাফিল জানেনই তো। বিশেষ করে বেহারে এরা আবার স্বরাজ চায় মশাই! আমার হাতে থাকলে আমি এখন দুশো বছর কিছু দিতাম না। চুল যে সৌন্দর্যের একটা কতবড় অঙ্গ, সেটুকুও যারা জানে না, তারা আবার স্বরাজ চায় কোন মুখে মশাই ? 'স্বাস্থ্য ভাল স্বাস্থ্য ভাল' বলে যে তার বাপ-মা গুমর করে, তাতে তাদের কি বাহাদুরি ? সে তো নেচার দিয়েছে, শুধু চুলটার দিকে তোমরা একটু লক্ষ্য রাখতে পারলে না ? শেম !



বেজায় চটিয়াছে। একবার মনে হইল, বলি, আজকাল তো সভ্য এবং স্বাধীন জগতে চুলটা বাদই দিতেছে—বলিয়া স্বরাজকামীদের এবং তাহার 'আত্মীয়া'র বাপ-মায়েদের উপস্থিতির জন্য বিপন্মুক্ত করি ; কিন্তু কেশের মোহ তাহাকে যেমন পাইয়া বসিয়াছে, এ ধরণের কথায় ফল হইবে না জানিয়া কহিলাম, আপনি যদি তাঁর চুলের উন্নতি চান তো এখনও যে একান্ত না হয় এমন নয়।

ছোকরা ব্যস্তভাবে বলিল কি করে ? আমি এইজন্যই তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, বাঙালী বলেই। আর আমি মশাই, বাঙালীদের একটু ভালবাসি। এদিকে আমরা বলি, বেহার ফর বেহারীজ, ওদিকে আপনারা পাল্টা জবাব দিন, বেঙ্গল ফর বেঙ্গলীজ — এই করে দুটো প্রতিবেশী জাতের মধ্যে ভাবের কিংবা অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান বন্ধ হয়ে থাক্—বাস্, তা হ'লেই স্বরাজ মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে আর কি! নিন, সিগারেট খান। চুলোয় যাক সব, তবে আমাকে আপনার বন্ধু বলেই জানবেন।

বলিলাম, বড় আনন্দ এবং সৌভাগ্যের বিষয়। বলেছেন ঠিকই, পাশাপাশি দুটি জাতের মধ্যে এ ধরণের মনো মালিন্য থাকা উচিতও নয়. আশা করা যায়, থাকবেও না বেশিদিন। ঠিক কথা, কেশ সম্বন্ধে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যা করেন—

ছোকরা তর্জনীটা উৎসাহভরে টেবিলে ঠুকিয়া বলিল, দেয়ার ইউ আর ; আমি সেই কথাই জিজ্ঞাসা করব করব করছিলাম, অথচ লেডিদের কথা তুললে আপনি কি মনে করেবেন ভেবে জিজ্ঞাসা করতে পারছিলাম না। হ্যাঁ, ওঁরা কি করেন ? বাঙালী ছেলেমেয়েদের কেশ সৌন্দর্য নামী। আমাদের এখানে কথায় বলে, 'ছাজা, বাজা, কেশ—তিনে বাংলাদেশ।' 'ছাজা' হ'ল ঘরের ছাউনি, 'বাজা' বুঝতেই পারছেন, বাজনা আর 'কেশ'—এই তিন নিয়ে বাংলাদেশ। আচ্ছা ধরুন, তাঁরা যে উপায় অবলম্বন করেন, তাতে কতটা পর্যন্ত উন্নতি হ'তে পারে ? যার চুল কোমর পর্যন্ত কায়ক্লেশে যায়, কতটা নামাতে পারে তার চুল ? হাঁটু পর্যন্ত ? নাঃ হাঁটু পর্যন্ত আর হতে হয় না, টু লেট, কি বলেন ?

নূতন বিবাহ, নূতন সাধ ; নিরাশ করিয়া আর পাপের ভাগী হই কেন ? বলিলাম, চোদ্দ-পনের আর এমন কি বিশেষ দেরি হল। এই তো মোটে চুল হবার সময় আরম্ভ হয়েছে।

ছোকরা আমার কথাগুলি শুনিতে স্মিতবদনে পানের ডিবা বাহির করিতেছিল, বলিল, আসুন, পান খান। আচ্ছা, চুল কি হাঁটুর নীচেও নামতে পারে ? সে রকম যত্ন নিলে ? এই দেখুন না, এই হেয়ার-অয়েলটার বাক্সের এই ছবিটা !

বেজায় হাসি পাইল। তবুও ভাবিলাম, যাহার এমনই সঙিন অবস্থা যে তুচ্ছ একটা বিজ্ঞাপন ছবিকে ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তাহাকে দমানো নিতান্ত পাষণ্ডের কাজ। বলিলাম, তুলির টানে যতটা সহজে চুল নীচে নামানো যায়, বাস্তবক্ষেত্রে ততটা আশা করা যায় না, তবে চেষ্টার অসাধ্য তো কিছু নেই।

নিশ্চয়ই, নেপোলিয়ান আল্পস ক্রস করেছিলেন কি করে মশাই ? চেষ্টা করেই তো ? তাহলে ধরুন পায়ের গুলির নীচ পর্যন্ত ? যদি খুব যত্ন নেওয়া যায়, প্রাণপনে, সম্ভব ?

বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিতেছে, বিনীতভাবে, যেন এক অনির্দিষ্ট পক্ষের জন্য ওকালতি করিতেছি এইভাবে বলিলাম, দেখুন, ও-রকম যত্ন নেওয়া কি এক উপদ্রবে দাঁড়াবে না ? গোড়ালি পর্যন্ত চুল নিয়ে জীবন-কাটানো - খোঁপা ক'রে রাখলে তার ভারে মাথা ঠিক রাখা দায়, খুলে রাখলে পায়ে জড়িয়ে আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা।

ছোকরা বোধ হয় ঝোঁকের মাথায় নিজের উচ্চাকাঙ্খার অধোগতির বহর দেখিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িল। একটু আমতা-আমতা করিয়া বলিল না, ও একটা এমনই জিজ্ঞাসা করছিলাম, কথায় কথায়। কি জানেন, আপনার কোন আত্মীয়ার সৌন্দর্যটুকু যথাসাধ্য বাড়িয়ে যদি একটু উপকার করতে পারেন তো করেন না কি ? বললে শুনব কেন ? আপনারা, বাঙালীরা, তো এটা একটা কর্তব্যের মধ্যেই ধরেন।

সেই নেহাত নদ্যময় স্থানে, বেচা-কেনার হট্টগোলের মধ্যে রচিত নিভৃতে এই নূতন

প্রণয়ীর মৃদুতা, বিহ্বলতা বেশ মিষ্ট লাগিতেছিল। একবার ইচ্ছা হইল, একটি সুমিষ্ট প্রশ্নের আঘাতে কৃত্রিম অথচ স্বচ্ছ রহস্যটুকু ভাঙিয়া দিয়া ব্যাপারটাকে চরমে আনিয়া ফেলি ; শুধাই আত্মীয়াটি কি ধরণের, অর্থাৎ সৌন্দর্য বাড়াইয়া উপকার করিলে উপকারটি আসলে কোথায় পৌঁছিবে বন্ধু ?

কি ভাবিয়া প্রশ্নটা আর করিলাম না।

* * *

ভালই করিয়াছিলাম।

পরের দিন কর্মে যোগদান করিলাম। প্রিন্সিপ্যাল রায় আমায় সমস্ত কলেজটি একবার ঘুরাইয়া লইয়া দ্বিতীয় বাৎসরিক শ্রেণীর ঘরে লইয়া গিয়া পরিচিত করিয়া দিলেন ; এই ক্লাসেই আমার অধ্যাপনা শুরু।

ক্লাসটির উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইতে গিয়া হঠাৎ চতুর্থ বেঞ্চের এক জায়গায় আমার চক্ষু সেকেণ্ড কয়েকের জন্য নিরুদ্ধ হইয়া গেল, দেখি, একটি ছোকরা একদৃষ্টে আমার পানে চাহিয়া আছে ; চোখে জলন্ত বিস্ময়, তাহাতেই যেন মাথার চিতাইয়া আঁচড়ানো চুল খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, মুখে ছোট্ট একটি গোল হাঁ, বাঁ হাতে কালো ফ্রেমের চশমা ; শখের জিনিস, দৃষ্টিকে নিঃসন্দেহ করিবার জন্য যেন পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে।

কালকের সেই ছেলেটি, দোকানে যাহার সহিত পরিচয় হইয়াছিল। আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলাম।

রোল কল করিতে করিতে মনে হইল, যে ছেলেটি ৮৮-তে উত্তর দিয়াছিল, সে-ই যেন আবার ৯২-তেও সাড়া দিল। প্রক্সি ; আন্দাজে কাহার প্রক্সি তাহাও বুঝিলাম, তবুও দৃষ্টি একবার চতুর্থ বেঞ্চে গিয়া পড়িল। দেখিলাম, সেই কেশবিলাসী ছেলেটির জায়গা খালি, হাজরির বন্দোবস্ত করিয়া কখন নিঃসাড়ে চলিয়া গিয়াছে।

৮৮ এবং ৯২ কে আর একবার ডাকিলেই প্রবঞ্চনাটা হাতে হাতে ধরা পড়িত, কিন্তু তাহা আর করিলাম না। ভাবিলাম, যাক, আপাতত সেও যেমন বাঁচিয়াছে, আমিও তেমনই একটা প্রবল অস্বস্তির হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছি।



কাব্য

১

প্রায় মাসাবধি কাঁচা খাইয়া, পোড়া খাইয়া, অর্ধভুক্ত থাকিয়া, কোন কোন দিন বা একেবারে অভুক্ত থাকিয়া অনেক কষ্টে একটি পাচক ঠাকুর যোগাড় হইল। নিজের হাত-দুখানির দিকে চাহিবার ফুরসৎ হইল একটু ; চোখ ফাটিয়া জল আসে ; পোড়া পেটের গোলামি করিতে কাটিয়া, হাজিয়া, পুড়িয়া একসা হইয়া গেছে ; কুটনা কোটা, ফেন গালা, ডাল সাঁতলানো, সবকিছু ঐ দুটির ওপর দিয়াই তো গেল।

যাই হ'ক, লোকটি পাওয়া গেছে ভাল। প্রথমতঃ, এখানকার লোক নয়। মাস ছয়েক এখানে থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে স্থানীয় লোক রাখিবার আর প্রবৃত্তি নাই ; যেমন অলস তেমনি অকর্মণ্য, আর বাড়ি যদি নিকটে হইল তো আমার এক মাসের ভাঁড়ার পনের দিনে নিঃশেষ করিয়া ছাড়িয়া দিবে, শুধু চাল ডালই নয়, তেল, নুন, হলুদ, তেজপাতা কিছুই বাদ পড়িবে না। সমস্ত দোষ চাপাইবে ইঁদুরের উপর। যদি বলি, 'ইঁদুরের তেল, নুন, তেজপাতার সঙ্গে কি সম্বন্ধ ?' উত্তর হইবে, আমি পুবের লোক, এখানকার ইঁদুরকে চিনি না।'

দ্বিতীয় সুবিধা এই দেখিলাম, লোকটির বয়স হইয়াছে, পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর হইবে। আশা করা গেল শখ-টখের বালাই থাকিবে না, আমার সাবান, মাজন, মাথার তেল অনেকটা নিরাপদ থাকিবে। তৃতীয় পাচক যে রাখিয়াছিলাম, পরে শুনিলাম, সে রাত্রে আমার সিল্কের পাঞ্জাবী আর পাম্প-শু-জোড়া পর্যন্ত নিজের দখলে রাখিত। এ লোকটা সাদাসিধে, দাড়িগোঁফ মাথার চুল সব ক্ষুর দিয়া কামানো, এদিকে বুকপিঠ কালো কালো কোঁকড়া চুলে ভরা ; অর্থাৎ চুলের যে বিভাগ লইয়া শৌখিনি করা চলিত তাহার গোড়া মারিয়া দিয়াছে, যে বিভাগ শৌখিনতার পরিপন্থী সেটাকে রাখিয়াছে জিয়াইয়া। আর একটা কথা, লোকটার বাড়ি বলিল ছাতনার কাছে একটা গ্রামে। ছাতনা চণ্ডীদাসকে লইয়া টানাটানি করে। সত্যমিথ্যা যাই হ'ক, লোকগুলার মনে একটা

ছাপ আছেই। কবির দেশের লোক, কেমন একটা শ্রদ্ধা হইল ; বিশ্বাস হইল অসময়ে দাগা দিবে না ; জিনিসটা মূলে তো একই, প্রেয়সীর দিকে গেলে বলি প্রেম, মনিবের দিকে গেলে বলি প্রভুভক্তি।

এর উপর একবেলা পরীক্ষায় বুঝিলাম, রাঁধেও খাসা।

২

বর্ষাকাল। এদিকে কটা দিন অসহ্য গুমট গিয়াছে, তাহার উপর স্বপাকের পালা ; গুমট, আগুনের তাত, তাহার উপরে আবার উদরেও হুতাশনের প্রদাহ, কি করিয়া যে কাটিয়াছে তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার নয়। যাক্, এবার বিধি প্রসন্ন। সকালেই গোপীনাথকে পাওয়া গেল। বেশ রাঁধিয়াছিল, রাত্রে আরও ভাল,—দেখিয়া-শুনিয়া লইবার সময় পাইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। নিশ্চিন্ততা, তাহার সঙ্গে পেট পুরিয়া ভাল আহার, গুমটের ভাবটা আর বুঝিতেই দেয় নাই। পরের দিনটি আরও চমৎকার। সকালে উঠিয়া দেখি কালো মেঘে সমস্ত আকাশ ছাইয়া গেছে, কোনওখানে এতটুকু ফাঁক নাই। তবুও কিন্তু বিরাম নাই, মেঘের এক একখানা পাতলা স্তর খুব লঘুগতিতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে উড়িয়া চলিয়াছে। বৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই, মনে হইতেছে, আয়োজনে কোথাও যদি একটু ত্রুটি থাকিয়া গিয়া থাকে সেটুকু সারিয়া লইয়া একেবারে পূর্ণ উদ্যমে বৃষ্টি ঢালিবে,—মেঘমহলে তাহারই এই অতিব্যস্ততা। এতটুকু আওয়াজ পর্যন্ত নাই, ধীর সঞ্চারে সমস্ত আকাশপথ ব্যাপিয়া সারারাত ধরিয়া এতবড় আয়োজনটা হইয়াছে। রাত্রে এক আকাশ নক্ষত্র দেখিয়া শুইতে গিয়াছিলাম, সকালে চোখ খুলিয়াই মনে হইল, একটা জাদু হইয়াছে,—কোথায় ছিলাম, রাতারাতি কে আমায় অন্য কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে।

আমার বাসাটি ঠিক কাঁসাই নদীর ধারে। নদী, তাহার পরেই একটা বাঁধ, তাহার পরেই আমার বাসা। মাঠকোঠা, তবে একটু নূতন ধরণের ; ঘরের সামনে পিছনে ওরই মধ্যে একফালি করিয়া বারান্দা গোছের আছে। এটা দেখিতেছি এখানকার স্টাইল।··· এদিকে শুকো গেছে, কিন্তু ছোটনাগপুরের পাহাড়ে নিশ্চয় বর্ষা নামিয়াছে ; গৈরিক রঙের বেগচঞ্চল জলে কাঁসাই নদী টলমল করিতেছে। নদীর ওপার থেকেই ঢেউখেলানো জমি,—নামিয়া উঠিয়া নামিয়া উঠিয়া কতদূর চলিয়া গেছে—একেবারে বহুদূরে দক্ষিণ-পশ্চিমের দিক্‌রেখা ঘেঁসিয়া কালো মেঘের নীচে তরঙ্গায়িত ঘননীলের রেখা—ময়ূর-ভঞ্জের পর্বতশ্রেণী।

বহুদিন পরে একটি মুক্ত আলস্যে আমার মনটি আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। সেদিন আবার আমার সব রেজেস্টারি আপিসের ছুটি, তারই সঙ্গে সুর মিলাইয়া দিনটি দেখা দিয়াছে ; একটি ক্যাম্বিসের চেয়ার বাহির করিলাম, তাহার উপর শরীরটা এলাইয়া দিয়া সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিলাম।···আগের দিনটি গোপীনাথকে আনিয়া দিয়াছিল, সেদিন আমি যেন নিজেকে নিজের কাছে ফিরিয়া পাইলাম। বেশ বুঝিতে পারিলাম, অবিরাম রান্নাঘরের চিন্তা আমার মধ্যেকার যে মানুষটিকে দেশছাড়া করিয়াছিল, মেঘসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সে আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছে। মনে একটা অপরিসীম

ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিতে লাগিল, এমনকি মনে হইল, সদ্য-সদ্যই কাগজ-কলম লইয়া বসিয়া যাই।

গোপীনাথ চা লইয়া আসিল। আমার মন তখন এতটা তরল অবস্থায় যে ইচ্ছা হইল গোপীনাথের সঙ্গেও এই দিক্-প্রসারিত সৌন্দর্য লইয়া দুটো কথা কই। এইসব নির্বান্ধব দেশে যে-লোকটিকেই একটু কাছে পাওয়া যায় তাহার কাছেই যেন মনটাকে উন্মুক্ত করিয়া ধরিতে ইচ্ছা করে, বিশেষ করিয়া এইরকম দিনগুলিতে। কিন্তু ওর মুখের পানে চাহিয়া আর উৎসাহ রহিল না। মুখের প্রতি রেখাটি কঠিন, দৃষ্টি একেবারে ভাবলেশহীন, আর মাথার মাঝখান থেকে চিবুক পর্যন্ত সমস্ত মুখমণ্ডলটাই রান্নাঘরের ধোঁয়ায় পাকা। চাকরি লইবার সময় একটু দম্ভ করিয়া বলিয়াছিল, "আমরা সাতপুরুষ ধরে রাঁধা করছি, বাবুমশয়, ঈতে হটব নাই বটে!"

তবু চণ্ডীদাসের দেশের লোক, লোভ সম্বরণ করা গেল না, বলিলাম, "মেঘের অবস্থা দেখেছ গোপীনাথ? কি মনে হয়?"

গোপীনাথ তাহার মাছের মত ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি মনে হয়—একটা কথা বটে।...আজ খিঁচুড়ি চাপাই, বাবুমশায়, দেবতা ঢালবে আজ্ঞে।"

এরপর আর কিছু বলিতে প্রবৃত্তি হইল না।

গোপীনাথ কিন্তু আমার মনের তন্ত্রীটাকে বর্ষার সুরে যেন আরও ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিয়া গেল। বিশ্বের যত বিরহিনী তাহাদের জন্য আমার মনটা আরও বেশী করিয়া আতুর হইয়া উঠিল। মনে হইল, জীবনের এই ট্র্যাজেডি,—বর্ষা আসে, নিঃসঙ্গ অন্তঃপুরে তার বেদনা জাগে, কিন্তু সে বেদনার প্রতিবেদন জাগে না কোনখানেই। ...বিশ্বের যত পুরুষ সবাইকেই আমার গোপীনাথ বলিয়া মনে হইল, কর্মব্যস্ত, বিরস, এমন বর্ষার দিনেও তাহার মনকে দ্রব করিতে পারে না। পুরুষের বিরহ লইয়া যত কাব্য সব আমার কাছে নিরর্থক অলীক বলিয়া মনে হইল। পুরুষের বিরহব্যথা বলিয়া কোনও অনুভূতি হয় না, খুব বেশী হয় তো একটা সাময়িক অভাব বোধ, সাময়িক আর নিতান্তই শারীরিক।... আমি যেন স্পষ্ট দৃষ্টিতে দেখিলাম দেশ দেশ জুড়িয়া সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বেদনার প্রলেপের মত এই সুনিবিড় মেঘাবরণ, তাহারই ছায়ায় যত অন্তঃপুরের বাতায়নে যত প্রোষিতভর্তৃকার ব্যাকুল নয়ন,—এই আকাশের মতই স্তিমিত, সজল। অথচ যাহাদের জন্য ব্যাকুলতা সেই পুরুষেরা কিন্তু সবাই নির্বিকার, তাহাদের অনবসর পুরুষ জীবনে বর্ষা যদি নিতান্ত কোনও সুখস্মৃতির আলোড়ন তোলেই তো সে খিঁচুড়ির, তাহার, তাহার বেশী ভাবিবার ক্ষমতাই নাই পুরুষের।

আমার মনে হইল মেঘদূতের যক্ষও আষাঢ়ের প্রথম দিনে প্রিয়ার হাতের খিঁচুড়ির কথাই ভাবিয়াছিল, সেই দুঃখ আর লজ্জার কথাটা চাপা দিতেই কবিবরের এত আড়ম্বর। দুপুরের আগেই বৃষ্টি নামিল।

খিঁচুড়িই রাঁধিয়াছিল গোপীনাথ, আমার কাছে কোন উত্তর না পাওয়ায় নিজের

কেরামতি দেখাইবার জন্য বোধহয় বেশী মনোযোগ দিয়াই রাঁধিয়াছিল। বেশ পরিতৃপ্তিতে আহার করিয়া আমি বারান্দায় আসিয়া বসিলাম।

এখানে বর্ষার রূপই অন্যরকম। আমাদের ওদিকে ঘন গাছপালার জন্য এ-রূপটি খুলিতে পায় না, প্রতি পদেই বাধা পাইয়া বর্ষা যেন একটু বিকৃত হইয়া পড়ে। ধারাপাতও খুব প্রবল, একটি হালকা হাওয়ায় অল্প একটু তির্যক রেখায় নামিয়া আসিয়া ভূমিস্পর্শ করিতেছে, মনে হয় যেন ধারাগুলির আদি অন্ত সমস্তটাই দেখা যায়। ক্রমে শীকর বৃষ্টির জন্য চারিদিক অল্প অল্প করিয়া ঝাপসা হইয়া আসিল, ক্রমে বেশী,—দূরে ময়ূরভঞ্জ পাহাড়ের নীল রেখা মুছিয়া গেল, তাহার পর আরও কাছের ঢেউখেলানো জমি, তারপর কাঁসাইয়ের ওপারের তটরেখাও। কতক্ষণ গেল, কাঁসাইয়ের জল আরও উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। একসময় হাওয়াও উঠিল মাতিয়া, শুকোর সময় যেমন ধূলিরাশি লইয়া মাতামাতি করে ঠিক তেমনিভাবেই কুয়াশার মত জলের কণা লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। একটুর মধ্যেই সমস্ত কাঁসাই নদীটাও দৃষ্টিপথ থেকে মুছিয়া গেল।

আমার মন থেকেও মুছিয়া গেল আর সবকিছুই, জাগিয়া রহিল শুধু এই বিক্ষুব্ধ বর্ষা আর যত বিরহিনীর হৃদয়ের এমনই বিক্ষুব্ধ বিরহ-বেদনা। কখন কাগজ-কলম আনিয়াছি, কখন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহার সাড়াও হয় নাই। সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলিল।

৩

যখন অকাল সন্ধ্যার ছায়ায় চারিদিক মলিন হইয়া আসিয়াছে, একটি বিপর্যস্ত ছাতার মধ্যে ভিজিতে ভিজিতে ললিতবাবু উপস্থিত হইলেন। আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম।

ললিতবাবু এখানকার স্কুলের গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক। থানা, সাবরেজেস্টারি আর স্কুল লইয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র কলোনিটির মধ্যে এই একটি লোকের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা হইয়াছে—শুধু অন্তরঙ্গতা বলিলে সবটা বলা হয় না, আমরা এত নিগূঢ়ভাবে পরস্পরকে পাইয়াছি যে পরস্পরের ভরসাতেই এখানে টিকিয়া আছি বলা চলে।

প্রকৃত রসিক আর দরদী লোক। এদিকে আমার সমবয়সী; যখনকার কথা হইতেছে তখন তাঁহারও বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে, কাজেই আমাদের আলাপ-আলোচনা বা ভাবের আদান-প্রদানের মধ্যে কোন অন্তরালের প্রয়োজন ছিল না।

পুলকিত হইলেও একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "আজই চলে এলেন যে!"

হিন্দু-মুসলমানের পর্ব এবং আরও দু-একটা কি মিশাইয়া উহাদের ইস্কুলের সপ্তাহখানেকের ছুটি যাইতেছে; ললিতবাবু বাড়ি গিয়াছিলেন, ছুটি শেষ হয় নাই অথচ ফিরিয়া আসিয়াছেন বলিয়া প্রশ্নটা করিলাম।

ললিতবাবু ক্ষুব্ধকণ্ঠেই একটু হাসিয়া বলিলেন, "টুইশন আছে যে মাস্টারের জীবন···"

হাতে পাইয়াও এমন বর্ষার দিনে যে নীরস উদর সংস্থানের জন্য ছাড়িয়া আসিতে হইল এর সমস্ত বেদনা ঐ কয়টি কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিল, আমি একটা রসিকতা করিতে

যাইতেছিলাম, কিন্তু কথা বাহির হইল না। তাহার পর অবশ্য দু-একটা হালকা রহস্যালাপ হইল, কিন্তু প্রথম আলাপের ঐ বেদনাটুকুই আমাদের সব আলাপ-আলোচনার মূল সুর হইয়া রহিল সেদিন। হইবার কথাও তো– বর্ষা আমার মনে ঐ সুর তুলিয়া ছিল, ললিতবাবুও ঐ সুরেরই বেদনা বাড়ি থেকে বহন করিয়া আনিয়াছেন, সম্ভব কি ও সুরকে আসর ছাড়া করা ?

অন্য একটি ক্যাম্বিসের চেয়ারে ললিতবাবুও শরীর এলাইয়া দিলেন। প্রথমটা একটু আলাপের চেষ্টা চলিল নিতান্ত সাধারণ প্রশ্নোত্তর, এই যে দুজনেই একভাবে অভিভূত হইয়া গেছি এটাকে যেন কতকটা চাপা দিবার জন্যই। তাহার পর মৌন দীর্ঘতর হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহার পর অন্তর যখন কাঁসাই নদীর মতই কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, আমরা দুজনেই একেবারে মুখর হইয়া উঠিলাম। অন্য একটু কারণও ছিল, অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের জগৎটা লুপ্ত হইয়া গেল আমাদের কাছে, জাগিয়া রহিল শুধু হাওয়ার শন্‌শনানির সঙ্গে বর্ষণের শব্দ আর ভেকের কলরব মিলিয়া এক বিচিত্র ঐকতান।

আপিসের পিয়নটাই চাকরের কাজ করে, আলো দিয়া গেল। ললিতবাবু বলিলেন, "নাঃ, এমন রাত্রিটাকে 'সেলিব্রেট' করতেই হবে শৈলেনবাবু, নৈলে আপসোস থেকে যাবে, আপনার কবিতার বইগুলো বের করুন, রবিবাবুর আর যার যার আছে। এসরাজটাও বাঁধুন।"

আমাদের রীতিমত কাব্যে পাইয়া বসিল। গোপীনাথকে ডাকিয়া বলিয়া দিলাম, ললিতবাবু এখানেই আহার করিবেন।

৪

কিন্তু এটা আমার বর্ষার গুণকীর্তন নয়, কাব্যের বিড়ম্বনার ইতিহাস, সেই সিক্ত বর্ষা রাত্রে কাব্যের হাতে অমন নিরবশেষ ভাবে আত্ম সমর্পণ করিয়া কি ভুলই করিয়াছিলাম এইবার সেইটুকুই বলিয়া শেষ করি।

রবীন্দ্রনাথ পড়া হইল, কবিবরের বর্ষার কবিতাগুলি আমার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই থাকে। ললিতবাবুর সুকণ্ঠ—যেমন গানে তেমনি আবৃত্তিতেও, বর্ষার মন্দ্রের সঙ্গে ছন্দ আর ধ্বনি মিলাইয়া একটি একটি করিয়া কবিতাগুলি পাঠ করিয়া চলিলেন, আমি চক্ষু বুজিয়া নিজের সমস্ত সত্তাকে সেই দ্বৈত সঙ্গীতের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিলাম। রবীন্দ্রনাথ শেষ করিয়া অন্য কবিদেরও বাছা বাছা কবিতা পড়া হইল। বাহিরে অন্ধকারের রন্ধ্র-রন্ধ্র সিক্ত করিয়া অবিরাম বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসের শব্দ আরও জাগিয়া উঠিয়াছে, মনে হইতেছে, যত বিরহিনীর হাহাকার সঞ্চিত করিয়া লইয়া দিকে দিকে দিতেছে ছড়াইয়া। অন্য কবিদের শেষ করিয়া আবার রবীন্দ্রনাথে ফিরিয়া আসিলাম। এ পর্যন্ত বোধহয় তেমন ক্ষতি হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ শেষ করিয়া বৈষ্ণব কবিদের লইয়া পড়িয়াছি, কয়েকটি পড়া শেষ হইয়াছে, ললিতবাবুর আবৃত্তির মধ্যে গীতের আমেজ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, এমন সময় গোপীনাথ আসিয়া প্রশ্ন করিল, "আয়োজন কয়া হবেক, আজ্ঞে ?"

আমরা আলো-জ্বালার পরই ঘরে আসিয়া বসিয়াছি ; মনে হইল যেন গোপীনাথ খানিকক্ষণ থেকে বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিল। বোধহয় আমাদের পড়ায় বাধা দিবে কিনা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, তাহার পর যখন দেখিল বৈষ্ণব কবিদের পালা আরম্ভ হইয়া একটু একটু সুরের রেশ জাগিয়া উঠিতেছে, বেশি বিলম্বের আশংকা করিয়া আর অপেক্ষা করিল না, নোটিশটা দিয়া দেওয়াই ঠিক করিল। অবশ্য এটা আমার আন্দাজ, আমি ললিতবাবুর পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কি বলেন, দেবে ?"
বেশ একটু রসভঙ্গ হইয়া গেল। ললিতবাবু আমার পানে চাহিয়া একটু হাসিলেন মাত্র। একটু আগেই তাঁহাকে গোপীনাথ-খিঁচুড়ি রসিকতার গল্প করিয়াছি ; ওঁর হাসিতে যেন এইটুকুই স্পষ্ট হইল, "আপনিও শেষে গোপীনাথ হইয়া গেলেন ?"
গোপীনাথকে বলিলাম, "আমাদের এখন দেরী হবে, তুমি ঢাকাঢুকি দিয়ে ঘুমোতেও পার নিশ্চিন্দি হয়ে, ডেকে নোব 'খন।"
গোপীনাথ প্রশ্ন করিল, "দোরটা ভেজিয়ে দেওয়া কল্লব আজ্ঞে ? জলের ছিটে আসছে বটে।"
বলিলাম, "তা বরং দাও।"
গোপীনাথ চলিয়া গেলে ললিতবাবু বলিলেন, "এবার আপনার এসরাজটা নামান।"
সুরে মূর্ছনায় কাব্য এবার সঙ্গীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ললিতবাবু শুরু করিলেন, "এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর—"
পুরাতন গীত, অতিগীত হওয়ার জন্য বোধহয় আরও পুরাতন ; কিন্তু মনে হইল যুগ যুগ অতিক্রম করিয়া এ সেই প্রথম দিনটিতে চলিয়া গেছে, যেদিন কবি নিজে রচনা করিয়া, মনের সমস্ত দরদটুকু নিংড়াইয়া নিজের কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন। ললিতবাবুর গলাও এত মর্মস্তুদ হইয়া ওঠে নাই, মনে হইল রজনীর সমস্ত বিরহব্যথা দেখিতে দেখিতে গুটিকতক শব্দের মধ্যে মূর্তি ধরিয়া উঠিল।
বোধহয় এতেও ততটা ক্ষতি ছিল না। ললিতবাবু এর পর ভাটিয়ালি ধরিলেন একটা। গানের আগে, কতকটা মনের আবেগে একটু ভূমিকাও করিলেন, বলিলেন, "শৈলেনবাবু, আমার এক-একবার মনে হয় ভাটিয়ালিই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত,—সঙ্গীতই বলুন বা কাব্যই বলুন ; ও যেন নদীর তীরের আপনি-বেড়ে ওঠা লতাটি ; আপনার কি মনে হয় ?"
সত্যই, গান যেন একেবারে মুক্ত বুকের ব্যথা হইয়া মাঠের ভাষায়, মাটির ভাষায় নিতান্ত সহজ লীলায় জাগিয়া উঠিল। অন্ধকারে ঢাকা চারিদিককার এই মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে, এমন কি আমার এই মাটকোঠাটুকুর সঙ্গে ছন্দে সুরে যেন মিলিয়া গেছে। এ জায়গার প্রাণের সঙ্গে এমন করিয়া মেশানো আর অন্য কিছুই যেন হইতে পারিত না।···'বন্ধু গো, তুমি কাজের জন্যে খেয়া পেরিয়ে পারে গেলে, সন্ধ্যে হয়ে এল ; একটা নদীর মাঝ থেকেই আমাকে পাগল করে দিয়েছিল, এখন আর-একটা নদী মাঝখানে এসে গেলে এই বর্ষা ; কি করি আমি বন্ধু, কোথায় যাই ?··
এত স্পষ্ট, সহজ কান্না আর হয় না। মানুষের সেই আদিম কান্না, ভাষার আড়ম্বর যাহাকে আবিল করিয়া ফেলিতে পারে নাই। সেই আদিম নিরাভরণ ব্যথার সুর,

কুটির থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত সবার বুকেই যাহা এক থাকিয়া গেছে, আর অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। যাহাকে চিনিয়া লইতে এক মুহূর্তও দেরি হয় না।

বর্ষার সঙ্গীতে বিনাইয়া বিনাইয়া, সমস্ত দিনের সঞ্চিত আবেগ নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া গাহিয়া চলিলেন ললিতবাবু, যখন শেষ হইল রাত্রি প্রায় বারোটা।

গোপীনাথকে জাগাইতে বেগ পাইতে হইল না। জোরে দু'একটা হাঁক দিতেই দুয়ার খুলিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইল; চোখ দুইটা লাল হইয়া গেছে, খাবার দিতে নামিয়া গেলে ললিতবাবু বলিলেন, "বেচারার প্রতি অত্যাচার হয়ে গেল একটু, ঘুমিয়ে পড়েছিল, আজই অতটা পথ হেঁটে এসেছে।"

আহারের সময় ললিতবাবু গোপীনাথের রান্নার অজস্র প্রশংসা করিলেন, বলিলেন, "দেরিতে পেলেন, কিন্তু ভাল লোক পেয়েছেন শৈলেনবাবু, ছাড়বেন না।"

বলিলাম, "আর খিঁচুড়ি যা রাঁধে! কাল সকালে এখানেই খাবেন ললিতবাবু, যেমন দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি ধরবে না, খিঁচুড়ি খাবার দিনই থাকবে।"

৫

সকালবেলা, একরকম ভোরেই, নিজেকেই ছাতা মাথায় দিয়া ললিতবাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইতে হইল। বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলেন, "হঠাৎ এ দুর্যোগে!—নেমতন্নের কথা মনে করিয়ে দিতে এলেন নাকি মশাই? বামুন যে সেটা মনে নেই?"

বলিলাম, "না, নেমতন্ন নিতে এলাম। ওদিকে আজ অন্টরম্ভা।" ললিতবাবু অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "মানে?

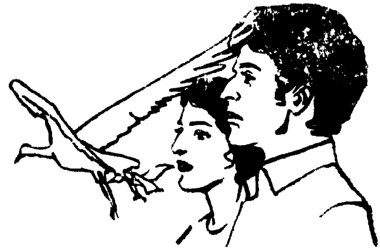
বলিলাম, "গোপীনাথ উধাও। কাল আমরা কাব্য করেছি আর ও বেটা বারান্দায় বসে বউয়ের কথা ভেবে ভেবে হাপুস নয়নে কেঁদেছে। নেহাৎ যেগুলো সাহিত্যিক কবিতা সেগুলোতে ততটা ক্ষতি হয়নি নিশ্চয়,—কাল করেছে আপনার ভাটিয়ালিতে।...সকালে খোঁজ করতে পিয়নটা বললে—এই রকম ব্যাপার, ক্রমাগতই নাকি চোখ মুচেছে আর বলেছে বাড়ির জন্য মন কেমন করছে। পালাবেই যে, পিয়নটা অতটা আন্দাজ করতে পারে নি। বউটা নাকি আবার দোজ পক্ষের..."

ললিতবাবু বিস্মিতভাবেই বলিলেন, "তবে যে বললেন, নেহাৎ বেরসিক কাটখোট্টা-গোছের।"

দুঃখে হাসিয়া বলিলাম. "খুঁচিয়ে রস বের করেই যে বিপদ ডেকে আনা গেল মশাই। নইলে ও-বেটার সাতপুরুষেও বিরহ কাকে বলে জানে না। ভাটিয়ালিতেও আতঙ্ক ধরিয়ে দিল। আপনারটাও পালায় নি তো? এখানে এসে আর গানটান গেয়েছিলেন?"

ললিতবাবু বলিলেন, "আমারটা বুড়ো।"

বলিলাম, "তবু গান টান সমঝে বুঝে গাইবেন, মশাই, বর্ষার এ-কটা দিন,—কখন কি অঘটন ঘটে বসে বলা যায় না, দেশটা একটু বেয়াড়া-গোছের যেন।



স্বয়ংবৃতা

চাকরিটা পেল বটে বিপাশা, কিন্তু বেশ স্বস্তি অনুভব করছে না। মেয়ে শর্টহ্যান্ড-টাইপিস্টের জায়গা, তার জন্যে বয়স জানতে চেয়েছে, ফটো পাঠাতে বলেছে, বিবাহিত কি অবিবাহিত—তাও জানাতে বলেছে। এইতেই কেমন বোধহয়, তার ওপর আছে মাইনেটা। টাইপিস্টের পোস্ট, কী আর এমন, তার জন্যে আরম্ভই করেছে দু'শ প'চাত্তর টাকা দিয়ে, পরে উঠবে চার'শ পর্যন্ত।

চাকরিটা পেলে যেভাবে, তাতেও মনটা খুঁৎ-খুঁৎ করছে। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা নয়, একেবারে নিয়োগপত্র, 'জরুরী' ছাপ মারা। যেন হাতছাড়া হয়ে না যায়, এইভাব। অবশ্য, যা আশংকা করছে তা ছাড়া অন্য কারণও হতে বাধা নেই। হয়তো স্বাস্থ্যবতী কর্মক্ষম টাইপিস্ট চায়, হয়তো অভিজ্ঞতায় দেখছে বিবাহিতা হ'লে তার স্বামী-সংসার ছেলেপুলে নিয়ে বখেড়া অনেক, কাজে ব্যাঘাত হয়। এ সবও সম্ভব, তবু কেমন যেন একটা হরিষে-বিষাদের ভাবই যাচ্ছে, চিঠিটা সকালে পেয়ে পর্যন্ত। ফার্মটার নামে বোধহয়—যেন কোনও বম্বেওলার, সেখানেও একটা অপরিচয়ের আশংকা।

তবু নিল, বা নিতে হল বলাই ঠিক। বছর খানেকের মধ্যে জীবনে হঠাৎ একটা মস্তবড় পরিবর্তন হয়ে গেছে।

গ্রামের মেয়ে। বাবা কলকাতায় একটা সওদাগর অফিসে মেসে থেকে কাজ করতেন, হপ্তাশেষে একদিনের জন্য বাড়ির অতিথি। বিপাশা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলে কলকাতার একটা কলেজে ভর্তি করে দিলেন, হোস্টেলে থেকে আই-এ পড়তে লাগল। বেশ চলছিল, তিনি হঠাৎ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ায় সব ওলট-পালট হয়ে গেল। ছুটি-ছাটার ওপর যে কটা মাস মাইনে পাওয়া গেল, তার জোরে পাসটা করে ফেলল বিপাশা। তার পরই ছাত্রী থেকে একেবারে গৃহী-সংসারীর পর্যায়ে উঠে পড়ল। বাড়ীতে মা, পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবা, দুটি ভাই স্কুলে পড়ছে, একটি আগামী বৎসর স্কুল-ফাইনাল দেবে, উপার্জন এক পয়সা নেই।

হোস্টেল সুপার রেবাদিদির সহায়তায় গার্লস স্কুলে নীচের দিকে শিক্ষয়িত্রীর কাজ জুটিয়ে নিল, ক্রমে দুটি টুইশানিও। অনেকটা সামলে আনছিল, এই সময় রেবাদিদি একটা মফঃস্বল স্কুলে ভালো কাজ পেয়ে চলে যাওয়ার আবার একটা সংকট উপস্থিত হল।

অনেক খুঁজে-পেতে মেয়ে-হোস্টেল একটা পেল বিপাশা। চার্জ বেশি, আরও টুইশনি না যোগাড় করতে পারলে বাড়ি-কলকাতা দুদিক সামলানো যাবে না। কিন্তু একটা বড় সুবিধা হল, জীবনের একটা বড় দিক-চক্রবাল খুলে গেল বিপাশার দৃষ্টির সামনে। গুটি দশ মেয়ে একটি ছোট পার্কের সামনে মেস করে রয়েছে। তার মধ্যে মাত্র দুটি স্কুল-কলেজের ছাত্রী, বড়ো বোনের সঙ্গে থেকে পড়ে বাকি সবাই অন্য স্তরের। দুটি নার্স, একটি মেডিকেল কলেজ তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে, বাকি সবাই চাকুরে, রেলে আছে, গভর্ণমেণ্টে আছে। দিনকতক দুদিক সামলাতে বেশ বেগ পেতে হল, কিন্তু সবাইকে দেখেশুনে মনে আশা জাগল, বেশ সাহস বাড়ল। এক সময় যেটা বড় খারাপ বোধ হত, বেশি বয়সে অপেক্ষাকৃত নীচু ক্লাসের ছাত্রী হয়ে থাকা, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বলেই সেটা হয়েছিল। সেটাও এ পরিবেশে বেশ মানানসই-ই হয়ে গেল। বিপাশা এখানে জন-চারেকের বিপুদিদি, জন-তিনেকের সমবয়সী। সুন্দরী সে বেশই, সেটা চাকরীর ইতিহাস থেকেই টের পাওয়া যায়। এর ওপর আর একটা যেগুণ ছিল, চাপে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, সেটাও আবার স্ফূর্ত হয়ে উঠল আস্তে আস্তে মেলামেশার সঙ্গে; বড় আমুদে মেয়ে বিপাশা, একটু হৈ-চৈ, হাসিখুশী নিয়ে থাকতে, জীবনটা হালকাভাবে নিতেই ভালবাসে। হোস্টেলে সবার প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠল। বেশ চলল। জীবনের সঙ্গে ব্যাপকতর পরিচয়। সঙ্গিনীরা মেডিকেলে পড়ছে, রাইটার্স বিল্ডিঙে কাজ করছে; নিজেরও পা বাড়াতে ইচ্ছা হয়।

রাইটার্স-বিল্ডিঙের নন্দিতাদিদিই ওকে পরামর্শ দিল—"তুমি শর্টহ্যাণ্ড-টাইপটা শিখে নাও।" স্কুলে ভর্তি হয়ে ভালোভাবেই শিখে ফেলল বিপাশা। তারপর এই চাকরিটাও পেয়ে গেছে; স্কুলের পঁয়ষট্টি থেকে একেবারে দু'শ পঁচাত্তর।

হরিষে-বিষাদ। হর্ষের যেটুকু বা ছিল, গ্রহণের বলয়গ্রাসের মতো বিষাদ তার প্রায় সমস্তটুকু গ্রাস করে ফেলেছে। সকালের স্কুল কলেজ, অফিসের ব্যস্ততার মধ্যে সবার মুখেই প্রশ্ন - "বিপুদিদির আজ মুখটা এমন ভার ভার কেন?···গাঁয়ের খবর ভালো তো বিপাশা, বাবা ভাল আছেন তো?···স্কুলে কিছু হয় নি তো? প্রাইভেট স্কুল—হলেই হল।"

মেডিকেলের ছাত্রী সমবয়সী মনীষা বলে—"সিজন চেঞ্জ করছে কিনা। বলিস তো একটা ওষুধ লিখে দি, কিনে নে গিয়ে।"

একে একে সবাই চলে গেল। হোস্টেল খালি হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত অনিশ্চিত-ভাবে বসেই রইল বিপাশা নিজের ঘরে। অনেক ইতস্তত করল; শেষ পর্যন্ত একটা চিন্তাই ওর সব সংশয় কাটিয়ে ওকে সংকল্পে দৃঢ় করে তুলল। বাবা ভালোর দিকে, দুদিন আগে চিঠি পেয়েছে, তাঁকে বায়ু-পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন ডাক্তারে। এখন

সমর্থ নয়, তবে আশা করছেন মাস খানেকের মধ্যে হয়ে উঠবেন যাত্রার উপযোগী।
একটা উৎসাহ এসে গেছে। পারতে হবে, ছায়াকে ভয় করলে চলবে না, এগিয়ে দেখতে হবে কায়াটা আসলে কি। যে বাপ-মায়ের ছেলে নেই উপযুক্ত, তার মেয়েকে হতে হবে ছেলে। এ যুগ সেটা সম্ভব করেছে।
কুলুঙ্গিতে একটা কালীঘাটের পট থাকে, পায়ের কাছে দুটো করে ফুল রেখে দেয় রোজ, কোথাও বেরুলেই সামনে একটু দাঁড়িয়ে যায়।
আজ দাঁড়াতে গিয়ে একঠায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েই রইল বিপাশা।
ভাবছে। তারপর স্থির করেই ফেলল। কালীঘাটটা একবার ঘুরেই যাবে, ভালো-মন্দর দায়িত্বটা আর নিজের ওপর নিয়ে উঠতে পারছে না। অনেকটা ঘুর-পথ হয়ে যাবে, দেরি হয়ে যাবে; তা যাক। চাকরিটা যদি তাইতেই না হয়, তো বুঝবে হওয়ার ছিল না।
বেরিয়ে পড়ল বিপাশা।
সন্ধ্যার সময় হোস্টেলে ফিরল সে, তাও কালীঘাট হয়েই। গাটা একটু ছমছম করছে, তবু তারই মধ্যে বাসার কাছে যতই এগুচ্ছে মুখে একটা কৌতুকের ভাবই স্পষ্ট হয়ে আসছে।
উঠোনে পা দিতেই প্রথমে সদুর সঙ্গে দেখা হোল। হোস্টেলে সবার ছোট, স্কুলের ছাত্রী।
"এই যে বিপুদি, আজ এত…"
তারপরই থমকে গিয়ে মুখের দিকে চেয়ে বিস্মিত প্রশ্ন করল—"কে আপনি ?"
"আমি বিপাশার দিদি"—উত্তরটা প্রস্তুতই ছিল বিপাশার, প্রশ্ন করল—"আছে সে বাড়িতে ?"
সদু উত্তর না দিয়ে দুড়দুড় করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। বিশাপা চাপা গলার আওয়াজ শুনল—"ও মেজদি, বিপুদির দিদি এসেছেন! দাঁড়িয়ে আছেন নীচে!"
কমলা হোস্টেলের সবচেয়ে সিনিয়ার মেম্বার, সদুদের মেজদিদি থেকে আরও সবারই, "বিপুর দিদি! কৈ বলে নিতো কখনও।"—একটু নীচু গলায় বলতে বলতেই বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলল,—"বিপু এখনও ফেরে নি।"
বিপাশা গিয়ে সামনে দাঁড়াতে ভ্রূদুটো কুঁচকে আরম্ভ করেছিল "আপনি বিপুর—"
"পোড়া কপাল! দিদি পাব কোথায় ?" হেসেই উঠল বিপাশা।
আরও অনেকে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, কমলা বলল,—"মরণ! তো রঙ্গ করবারও তো একটা সীমা থাকবে?…কপালে সিঁদুর কেন—"
"বিয়ে হলে সিঁদুর থাকবে না? হিন্দুর মেয়ে…"
"বিয়ে !!"
আর সবাই রুদ্ধবাক হয়েই দাঁড়িয়েছিল, কমলার সঙ্গে চিৎকার করেই উঠল একরকম।
কমলা বলল—"তুই বলা নেই কওয়া নেই—খামোকা বিয়ে করলি কোথায় ?"
প্রশ্নের বাণ ছুটল। মনীষা বলল, "তা বর কৈ ?"

"থামো, এতগুলো সোঁদা মেয়ের মধ্যে নিয়ে আসি তাকে !"
"তা স্কুলে…"
"তাই তো ছেড়ে দিলাম স্কুল, মাগীর দল, লোকে যে দেখে শুনে একটা বিয়ে করবে… তা একি অবিচার ! বিয়ের কনে একটু যে ডেকে বসিয়ে আদর অভ্যর্থনা করবে…"
কমলাই বলল—"ভেতরে আয়।" সদুকে বলল—"ঠাকুরকে শীগ্‌গীর চা করে দিয়ে যেতে বল আগে, দুখীরাম গিয়ে খাবার নিয়ে আসুক—নোন্তা, মিষ্টি মিলিয়ে টাকা খানেকের…"
"আমরা হাঁ করে দেখি।" একটু আড়ালে মুখ ঘুরিয়ে ছায়া বলল। মনীষা নাকি সুরেই অনুযোগ করল—"একে তো বিয়েও হল না।"
একটা হাসি উঠে আসরটা জমে উঠল। কমলা ড্রয়ার খুলে মাথা ঘুরিয়ে আন্দাজ করে নিয়ে তিনটে টাকা বের করে হাতে দিল সদুর, চেয়ারে বসে বিপাশার দিকে চেয়ে বলল—'আগে তোর কাহিনী শোনা। উদ্ভট ব্যাপার যত, সকালে বেরুল মুখ গোমড়া করে, ফিরল খড়দার গোঁসাইমার মতন কপালে এক গাদা সিঁদুর !
সকলে বিছানা, চেয়ার, মোড়ায় গুছিয়ে বসলে আরম্ভ করল বিপাশা—
"গোমড়া মুখ নিয়ে সকালে বেরুবার কথা যে বললে কমলাদি, তখন আমাতে আর আমি আছি কি ? নতুন চাকরির চিঠি পেয়েছি, তা কোথায় যে…"
"নতুন চাকরি !…এই যে বললে বিয়ে !…চাকরি, তা সিঁদুর কেন ! চাকরির শর্ত নাকি বিয়ে…"
—একসঙ্গে জড়াজড়ি করে প্রশ্নের গাদা উঠতে বিপাশা অ্যাপীলের দৃষ্টিতে কমলার দিকে চাইল, বলল—"নিন, ওদের কথার জবাব দিই, কি আপনার কাহিনী বলি বলুন কমলাদি।"
কমলা ওদের বারণ করে দিল—"ওকে বলে যেতে দাও আগে !"
ওকে বলল "তুইও যে একেবারে মাঝখান থেকে আরম্ভ করিল।"
"একটা দরখাস্ত করে দিয়েছিলাম কমলাদি লোভে পড়ে, তোমাদের না জিজ্ঞেস করেই। বম্বেওলার ফার্ম স্টেনোগ্রাফারের পোস্ট, দু-শ পঁচাত্তর টাকা মাইনে—শিউরো না, শিউরোবার ঢের বাকি আছে এখনও ফটো রয়েছে কুমারী হওয়া চাই, তারপর ফটো দেখেই এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার—ভাবনায় মুখ কালো করে বেরুতে হয় কিনা তুমিই বলো না…"
"ভয়ানক রিস্ক নিয়েছ কিন্তু।"—নন্দিতা যেন মন্তব্য না করে পারল না।
"রিস্‌ক্‌টা চাপিয়ে দিলাম মা-কালীর ওপর। মনে করলাম রোজকার মতন শুধু কুলুঙ্গীর মা-কালীর ওপর নির্ভর না করে, যদি একবার কালীঘাটটুকু ঘুরে যাই তো হয়তো মা একটু সজাগ থাকতে পারবেন বেশি করে। তা মা যেন একেবারে হুঙ্কার দিয়ে সজাগ হয়ে উঠলেন।… এই দ্যাখো ! শোনই না আগে।…জুতো পরে রয়েছি, কোথায় রাখব, সেবারের মতন হারালেই মুশকিল, আমি আর মন্দিরে উঠলাম না। জুতো জোড়া খুলে পাশে রেখে মন্দিরের রকেই মাথা ঠেকিয়ে প্রণামটা সেরে নিচ্ছি,

হঠাৎ মনে হল কে যেন সিঁথির মাঝামাঝি কটা আঙুল চেপে ওপরের দিকে টেনে দিল। এক সেকেন্ডের ব্যাপার, তক্ষুনি মাথা তুলে দেখি, ও কমলাদি, মা যেন নিজে মন্দির থেকে নেমে এসেছেন। লাল শাড়ি পরা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ত্রিশূল। কিছু বুঝে ওঠবার আগে হৈ-চৈও উঠে গেল। সধবা-বিধবা-কুমারী মিলিয়ে—আর একটি দল - বড় ঘরেরই মনে হল - চাকরের জিম্মায় জুতো ছেড়ে রেখে ওপরে যাওয়ার ব্যবস্থা করছিল—যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোধাবাড়ি সবার কপালে সিঁদুরের হাত টেনে দিতে লাগল। এক বুলি মুখে—মার কাছে এসেছে, সিঁদুর নেই কপালে! প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়ে মারমুখো হয়ে উঠেছে সবাই…সধবা-বিধবা-কুমারী—কিছুই তো বাছে নি—আমিও কপালে হাত দিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে দাঁত-মুখ-খিঁচিয়ে এগিয়ে যাব - গায়ে আগুন ধরে গেছে তো—চারিদিক থেকে সবাই ছুটে এসে পড়ল—দেখছেন পাগল মানুষ, ওকে মারধর করা চলে?…মার স্থান, ওতে দোষ লাগে না—যার রাখবার নয়, আদি গঙ্গার জলে ধুয়ে ফেলুন গে।" পাগলীর অবশ্য ভ্রূক্ষেপ নেই, যারা যারা বোঝাতে এসেছে, লাফিয়ে লাফিয়ে তাদেরও কপালে লেপে দিতে চায়—হাসি বকাবকিতে একটা রীতিমতো হুল্লোড় পড়ে গেছে, আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম, আদি গঙ্গায় ধোব কি? একেবারে পাকা ব্যবস্থা, তেলের সংগে গোলা সিঁদুর, জলহাত পড়লে আরও লেবড়ে যাবে। চাকরি করতে যাওয়া তো মাথায় উঠল, এ-অবস্থায় বাড়ি ফিরব কি করে সেই এক ভাবনা দাঁড়াল। এমনি পথ চলতেও কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে, অনভ্যেসের ফোঁটা তো; শেষে একটা বুদ্ধি যোগাল কমলাদি, একটা ছোট মনোহারী দোকানের সামনে দিয়ে আসতে একটা ছোট গোল-আরশি কিনে নিলাম, তারপর ওদিক থেকে সরে এসে একটা ট্যাক্সির ওপর উঠে বসে বাড়ির ঠিকানা দিলাম। ঠিক করলাম, পথে যেতে যেতে রুমাল দিয়ে মুছে নোব, রুমালে না কুলোয় শাড়ী দিয়েই।

"খানিকটা বেরিয়ে এসে আরশিটা নীচু করে ধরে রুমালটা আঙুলে জড়িয়ে মুছতে যাব, হঠাৎ একটা বুদ্ধি এসে জুটে গেল, এবার দুর্বুদ্ধিই বলতে হবে। দরকার কি সিঁদুর মুছে? বাড়িই বা ফিরতে যাই কেন? এইভাবেই অফিসে গিয়ে দেখি না অবস্থাটা কি দাঁড়ায়। বড় রাস্তায় উঠে মোড় নিতে যাবে, বললাম—থাক, চল ধর্মতলার দিকে। তখনও একটু দোমনাই হয়ে রয়েছি, একেবারে ঠিকানাটা আর দিলাম না, ভাবলাম—যেতে-যেতে মাথাটা আগে একটু পরিষ্কার করেনি।

"প্রায় সাড়ে-দশটার সময় অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ট্যাক্সিটা। ভাড়া চুকিয়ে লিফটে করে চারতলায় উঠে গেলাম।"

"কপালে ঐ এক ধ্যাবড়া সিঁদুর নিয়ে।" মনীষা চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করল।

"এক ধ্যাবড়া আর কোথায়, এ্যাঁ কমলাদি?" সাক্ষী মানল বিপাশা। "ট্যাক্সিতে বসে আঙুলে রুমাল জড়িয়ে আমি ততক্ষণে দিব্যি মানানসই করে নিয়েছি তো, একেবারে মিহি আধুনিক, আছে কি না আছে, সে আর ইচ্ছে করে করলাম না। একটা মতলব ততক্ষণে এঁটে ফেলেছি তো।"

"মতলবটা শুনতে পাই না ?"—মনীষাই প্রশ্ন করল।
"একটা প্রোটেকশন্ তো !"
-- কমলাই বলল, বাধা দেওয়ার জন্য একটু ধমকের টোনেই। বিপাশাকে বলল—"হ্যাঁ, তারপর ?"
"জায়গাটা লোয়ার চিৎপুর রোডের পেছন দিকটায়। এদিকে বৌবাজারের বাঙালী-পাড়া, ওদিকে চিনে-পট্টি, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টে জায়গাটা পরিষ্কার করছে, নতুন প্যাটার্নের উঁচু উঁচু বাড়ি সব উঠেছে এখানে ওখানে। লিফ্ট্ থেকে বেরিয়ে একটা করিডোর দিয়ে অফিসটার সামনে এলাম। আমাদের অফিসে বার কয়েক গিয়ে একটা আন্দাজ হয়ে গেছে তো, গাটা একটু যে ছমছম করছে না, এমন নয়—তবু সহজভাবেই ঢুকে গেলাম। একটা বেশ বড় হলঘর, তাইতে অফিস, অনেকগুলো লোক—নিজের নিজের টেবিলে কাজ করছে···"
"থেমে থেমেও যাচ্ছে তাদের হাত -" মনীষা কথাটা বলে মুচকি হেসে মুখটা ঘুরিয়ে নিল একটু। বিপাশা অনুযোগ করল—"দ্যাখো কমলাদি ! না আমি বন্ধ করলাম। ···বেশ হোল, চা-খাবারও এসে গেছে।"
নিজের নিজের প্লেট আর চায়ের কাপ পিরিচ গুছিয়ে নিতে একটু যে সময় গেল তাতে মন্তব্য উঠল কিছু কিছু—
"সত্যিই বড় রিস্ক্ নিয়েছ কিন্তু বিপু, বেশ বলো, সবটা শুনি আগে।···ভয় নেই, দেখো তোমরা, ও মা-কালীই ছিলেন নিশ্চয়। সাহস আছে তোর বিপা, আমার তো শুনেই ভির্মি যাওয়ার মতন হয়েছে···ইস্ ! ভির্মি যাবে আজকালকার যুগে ! তুমি ঢুকেছ আমায় টেনে নিও বিপা-দি, আমি একেবারে হলের মাঝখানটায় গিয়ে বসে হাঁক দেবো—কোই হ্যায়।"
শেষেরটা চম্পার। মোটা শরীর, একটু নকুলেও, এমন করে থিয়েটারি ঢঙে বুক চিতিয়ে চোখ পাকিয়ে বলল একটা হাসির হর-রা উঠে গেল। নন্দিতা চায়ে চুমুক দিয়ে বলল "মরণ !"
কমলা বলল—"তুই বল বিপু ! চুপ করো সবাই।"
"সবাই টেবিলে যে-যার কাজ করছিল"—একবার বক্র দৃষ্টিতে চাইল বিপাশা মনীষার দিকে, বলল—"কার কাজ বন্ধ হয়ে গেল, কার চালু রইল, অত গ্রাহ্য না করে আমি গটগট করে টেবিলের সামনে গিয়ে বললাম,"আমি মিস্টার চুড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করব।
"কি দরকার ?"
"চিঠিটা বের করেই রেখেছিলাম, বললাম—এই এপয়েন্টমেন্টলেটারটা তাঁর অফিস থেকে পেয়েছি।"
মিথ্যে বলব না, লোকটা একবার চাইল আমার কপালের দিকে, একটু যেন বলতেই যাচ্ছিল কি, সামলে নিয়ে একটা আর্দালীকে ডেকে তার হাতে একটা স্লিপ দিয়ে বলল— "চেম্বার মে।"
আমায় বলল—"আপনি যান ওর সঙ্গে।"

হলের একপাশে কাঠের একটা মাঝারি গোছের চেম্বার। লোকটা এগিয়েই গিয়েছিল একটু, আমি পেঁছুবার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসে বেশ খাতির করেই সেলাম দিয়ে বলল—অন্দর যাইয়ে।

"মাঝামাঝি একটা স্প্রিঙের কপাট ঠেলে ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি···"

"চক্ষু চড়কগাছ !" মন্তব্যটা করে হেসে মুখটা ঘুরিয়ে নিল মনীষা।

বিপাশা বলল—"তা সত্যি বলছি কমলাদি, সিনেমা বলো, থিয়েটার বলো, অমন মুখের ভাব আমি আর কোনখানেই দেখি নি। এত আশ্চর্য হয়ে গেছে, আর···"

"আর এত নিরাশ !"

মনীষাই আবার ! বিপাশা অনুযোগ করতে কমলা বলল—"নাঃ বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস মণি !"

"বাঃ, আর সে বেচারির দুঃখ কেউ বুঝবে না।" এবার মাথায় বেশ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মনীষা বলে উঠতে আবার একটা হাসির দমক উঠল। বাদ গেল না বিপাশাও। তার মাঝেই—"আঃ, শোনই না !" বলে আরম্ভ করল –

"বেশ মোটাসোটা, বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি—পাক ধরেছে দাড়ি-গোঁফে। গায়ে খদ্দরের লম্বা পার্শি কোট। হ্যাঁ, শৌখিন বৈকি, বেশ ছিমছাম, বুক-পকেট থেকে একটা নীল রুমালের কোণ বেরিয়ে রয়েছে। একটু হাল্কা গন্ধও রয়েছে ঘরটাতে। ভাঙা ভাঙা বাংলা জানে ; সেটা আমি সোজা বলে যাচ্ছি। একটু যেন হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে—

"আপনি ?"

"চিঠিটা সামনে এগিয়ে দিয়ে বললাম—এই লেটার অফ্ অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পেয়েছি আপনার আজ।'

"চিঠিটার দিকে চেয়ে থেকে চোখ তুলে বললেন—কিন্তু আপনি তো বিবাহিতা, আমি কুমারী টাইপিস্ট চেয়েছিলাম।

"বললাম—একরকম কুমারীই, তাই দরখাস্ত করেছিলাম।"

"তার মানে ?"

"কোর্টে রেজেস্টারি করে বিয়ে, আমরা বাঙালীরা ওটাকে তো বিয়ের মধ্যে ঠিকমতো ধরি না।"

"কী ধড়িবাজ মেয়ে বাবা !"—ছায়া মুখটা গোল করে বলে উঠল। মনীষা বলল—"আহা, পেঁচিয়ে কাটা বেচারিকে ! ক্ষণে আশা, ক্ষণে নিরাশা ?"

বিপাশা ঠোঁটে একটু হাসি টিপে নিয়ে বলল—"একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে ব্লটিং-প্যাডের ওপর তার মুখটা টিপে ঘোরালো একটু, তারপর আবার চোখ তুলে বলল—কিন্তু আপনার কপালে সিঁদুর রয়েছে তো !

"বললাম—ওটা একটা প্রসাধন মাত্র, পাকা বিবাহের মূল্য নেই ওতে।

"হাঁ করে চেয়ে রইল একটু।"

মনীষা বলল—"বোধহয় রুজ লিপস্টিক খুঁজছিল বেচারী।"

"নাঃ, আমি এই ছেড়ে দিলাম কমলাদি।" টেবিলে হাতদুটো আছড়ে চোখে টেনে নিয়ে চুপ করে বসল বিপাশা।

ছায়া বলল—"থাক ওসব, আমি জিজ্ঞেস করছি—তোমার একটু ভয় করছিল না বিপা, আশ্চর্য!"

"না, ভয় কি আর করছিল! তা বলতে দেবে তবে তো!

নন্দিতা বলল—"তোরও যে অন্যায় রাগ বাছা, বিয়ে করে এলি, বাসর জাগতে পারল না কেউ বর কনে নিয়ে, দুটো কথা বলেও সাধ মেটাবে না?"

বিপাশা একেবারে খিলখিল করে হেসে উঠল, ওরা একেবারে হকচকিয়ে গেছে, বলল—"যেও না, যেও বরের সঙ্গে বাসর জাগতে, কার কত বুকের পাটা দেখব একবার···"

বলতে বলতেই হাতের আঁজলায় মুখ ঢেকে হাসিতে দুলে দুলে উঠতে লাগল।

কমলা বলল—"দ্যাখো কী জ্বালা! নিজের কথায় নিজেই হেসে কুটি কুটি কি ব্যাপার বলবি তো?"

হাসিতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে। মুছে নিয়ে একটু গুছিয়ে বসে আবার আরম্ভ করল বিপাশা—হাসিটা থুক থুক করে বেরিয়েই পড়ছে মাঝে মাঝে—

"বলে—ভয় করবে না! ভয়ে পা দুটো কাঁপছে জুতোর মধ্যে, বোধহয় পড়েই যাই, এই সময় তো ব্যাপারটা হোল। একটু হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করছে—"তা, আপনার হাজব্যান্ড কে? কোথায় থাকেন তিনি?"

"সত্যি কথা বলতে কি, একেবারে ধাঁধায় পড়ে গেছি, অতটা তো ঠিক করা ছিল না। ধাঁধায় পড়ে এদিক-ওদিক চোখ ঘোরাতে—যেন লজ্জায় বসতে চাইছি না—হাজব্যান্ডের ওপর নজর পড়ে গেল ··উক্। সে সে···"

এবার হেসে একেবারে উল্টে পড়ল বিপাশা। সামলাতেও দেরি হোল, তার ওপর হাসির মধ্যেই ভেঙে ভেঙে বলে চলল—"জানলার মধ্যে দিয়ে চোখ পড়ে গেল কমলাদি নীচে, দুশো গজ দূরে একটা বক্সিং শেখবার আখড়া—দুজনে ঘুষোঘুষি করছে—জন ছয়েক দাঁড়িয়ে দেখছে। যারা করছে বক্সিং হাতে গাব্দা গাব্দা বক্সিং গ্লভ-পরা—একজন ছেলেমানুষই—যাকে দেখিয়ে দিলাম হাজব্যান্ড বলে, নিশ্চয় বক্সিং-মাস্টার-দুষমন কালো-গাঁট্টা-গোট্টা—এই বুকের ছাতি—এই হাতের মাসল—ঘামে চকচক্ করছে—শেখাচ্ছেই, তবু অত দূরে থেকেও মনে হচ্ছে চোখ দুটো যেন জ্বলছে—মাঝে মাঝে হুম-হুম শব্দও আসছে ভেসে—ফটাস-ফটাস করে এক-একটা ঘুষির আওয়াজও! মিস্টার চুড়িওয়ালা?—সে যা মুখের চেহারা, ফটো তুলে বাঁধিয়ে রাখবার মতন। আমি দেখিয়ে দিতে সেই যে নজর গেছে ওদিকে, আর ঘাড় ফেরাতে পারছে না · উফ্! —উফ্! বাবাগো!"

হাসিটা ছড়িয়ে পড়ছে ঘরময়, সেই সঙ্গে - "বলিস কিরে! তাকে নিজের সোয়ামী বলে চালিয়ে দিলি!···একটু বাধল না তোমার বিপুদি!"

···এ কি উদ্ভট স্বয়ম্বর বাবা! এত ফিচলেমি তোর পেটে পেটে। তারপর?"

"তারপর মুখ ঘুরিয়ে প্রথম কথা—আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।··· তা, কি করেন আপনার স্বামী?

"বললাম ওই বক্সিং আর ছোরাছুরি, সেটা ঘরের মধ্যে। জন চল্লিশেক সাকরেদ আছে, তাইতেই চলে যায়, আর···

"··যেন সামলে নিয়েই চুপ করে গেলাম। জিজ্ঞেস করলে হ্যাঁ বলুন, আর কি বলছিলেন।

"ততক্ষণে বেশ বুদ্ধিও খুলে এসেছে, বললাম সবটাই তো গোপনীয় স্যার, এমন কি আমি যে ও'র স্ত্রী এ-কথাটাও। আপনি চাকরি দিচ্ছেন, না বললেই নয়, তাই—

বললে—আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন। এর একটা কথাও বেরুবে না, আপনাকে কথা দিচ্ছি।···আচ্ছা, আপনি না হয় নাই করলেন চাকরি···"

"সরিয়ে দিতে চায় আর কি! কিন্তু বললাম—তখন বুদ্ধি বেশ খুলে গেছে আমার, জিজ্ঞেস করলাম—দিতে চান না কাজটা? তাহলে গিয়ে বলি, উনিই পাঠালেন তো।"

"জিজ্ঞেস করলে—চটে যাবেন?"

"বললাম—চটা—তা চটে যদি যান তো নেহাৎ তেমন কারণ না ঘটলে অনিষ্ট করেন না কারুর, এক সেই ক্যালকাটা রায়টের সময় যা···"

"আবার যেন বলতে গিয়ে সামলে নিলাম, এইভাবে থেমে যেতে একেবারে ব্যস্ত হয়ে মুখটা এগিয়ে এনে জিজ্ঞেস করল—হ্যাঁ, রায়টের সময় কি বলতে যাচ্ছিলেন?

"বললাম—সে আরও গোপনীয় স্যার, তবে আপনাকে বলতে বাধা নেই- রায়টের সময় কিছু হাত ময়লা করতে হয়েছিল –উনি একলা শেষ করেছিলেন একুশজন। ছোরা, ঘুষি, তারপর সাকরেদরা আরও—

"একুশ !! একলা !···সে যা এক চিৎকার স্থান-কাল-পাত্র ভুলে···"

আবার একচোট ফুকরে হেসে উঠে বিপাশা বলল,—"নাঃ, পারছি না কমলাদি, পেটে ব্যথা ধরে গেল। মোটামুটি এই ব্যাপার—মোট কথা চাকরি পাকা—দেখলামও তো খাতিরের বহর, কবার ডাকলেও ডিকটেশন দেওয়ার জন্য, লেখায়, আর ঘুরে ঘুরে জানলার বাইরে চায়। তবে কে ও কুদৃষ্টির নীচে বসে কাজ করবে বলো কমলাদি? মাস পাঁচ-ছয় কোন রকম করে চালিয়ে নেওয়া—বাবাকে একবার চেঞ্জ থেকে ঘুরিয়ে আনা পর্যন্ত। তারপর বাবা এসে কাজে জয়েন করলেই শর্মা আবার কলেজে। এই কটা মাস কোন বাধা বিঘ্ন যদি না হয়···"

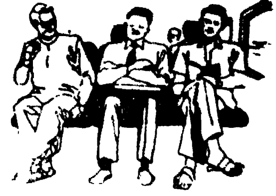
কমলা অনামনস্ক হয়ে কি ভাবছিল, মুখটা ঘুরিয়ে বলল—"হবে না কিছু।"

দিন পাঁচেক পরের কথা, কমলা গিয়ে মিস্টার চুড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করল। বিপাশাকে তার টেবিল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নমস্কার করে বলল—"আপনার স্টেনোর স্বামীর বোন আমি। দাদা বলে পাঠালেন—তিনি ওকে চাকরি দেওয়ার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। শুনেছেন একটা আলাদা চেম্বারও করে দিয়েছেন ওর জন্যে আপনি। আমার ধন্যবাদ জানাতে পাঠালেন, হ্যাঁ, একটা অনুরোধ করলেন, কথাটা যেন একেবারেই গোপন থাকে, রাগী মানুষ নইলে হয়তো··"

ঐ পর্যন্তই ছেড়ে দিল, মিস্টার চুড়িওয়ালা যেন অভ্যাসবশেই একবার বক্সিং রিংটার দিকে চাইল।

খানিকটা অন্তরঙ্গ আলাপ করে চা-টোস্ট খেয়ে উঠে এল কমলা।

তৃতীয় পর্ব



বি এন ডব্লুর ব্র্যাঞ্চ লাইনে

সে মূর্তি লাখের মধ্যেও দৃষ্টি আকর্ষণ করিত ; সুতরাং গাড়ির মধ্যে যখন তৃতীয় ব্যক্তি আর ছিলই না, তখন মূঢ়ভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা ভিন্ন আর উপায়ই ছিল না।

কালো—সে যেমন তেমন কালো নয় ; তাহার উপর বেঁটে এবং মোটা। মাথার ব্রহ্মতলে একটা আব, তাহার উপর একটা সুপুষ্ট চৈতন—যেন গোড়াটি সযত্নে বাঁধানো হইয়াছে। এক কানে একটা কলম, অপর কানে পেন্সিল। রগের পাশ দুইটা হাল-ফ্যাশানে চামড়া ঘেঁষিয়া ছাঁটা। রেল-কোম্পানীর মার্কা-মারা কালো কোট এবং সেই মেলের পেন্টালুন পরিয়া গাড়িতে প্রবেশ করিলেন এবং বসিয়াই চটের ব্যাগটা খুলিয়া ফেলিলেন।

তাঁহাকে যে লোকে বিস্ময়নেত্রে দেখেই—এ জ্ঞানটুকু বোধ হয় স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার দিকে এক রকম না চাহিয়াই বলিলেন—"এই যে দাঁড়ান একটু, বলি সব—"

কোট এবং প্যাণ্ট খুলিলেন। কালো পাঁঠার যেন ছালটা ছাড়াইয়া ফেলা হইল। কোটের নিচে শ্রীশ্রীকালী-ছাপ-দেওয়া লাল নামাবলী ও প্যাণ্টের নিচে রক্তচেলি বাহির হইয়া পড়িল। পেন্টালুন এবং কোট তাল পাকাইয়া এক পাশে রাখিলেন। ব্যাগ হইতে একটা টকটকে জবাফুল বাহির করিয়া টিকিতে বাঁধিলেন ; কপালে একটা জ্বলজ্বলে সিন্দুরবিন্দু পরিলেন, তাহার পর ব্যাগটার মধ্যে কোট আর জামাটা ঠাসিতে ঠাসিতে দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া ব্যাগটাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বটে! নেবে না ভেতরে? ভটচাজ্জির চটের ব্যাগ আবার ইংরিজী কায়দামতো মিতাহারী হয়েছেন—তোর ব্যাগের নিকুচি করেছে।"

ভয়েই হউক আর যে জন্যই হউক, স্ফীতোদর ব্যাগটি কোট ও প্যাণ্টটিকে আশ্রয় দিল। এ অঘটন-ঘটনে আমার বিস্ময়নেত্রে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—"খুব সোজা কথা—এ দেশেরই কারিগরেরা না মসলিন তৈয়ের করে গেছে, যার একটা থানকে থান একটা ঝিনুকের খোলে লুকিয়ে রাখা যেত! যাক সে দুঃখের কথা। চাবিটা কষে দিই এই, তারপর দিচ্ছি সব পরিচয়। কত দূরের পাল্লা?

উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় দরজার কাছে শব্দ হইল—"দণ্ডবৎ বড়হমচারী বাবা, সাহেবকে কেমন দেখলেন? বোড্ডো গোস্সায়ে ছিলো। সোব জবাবদেহি আপনারই কন্ধা পর—"

"আরে, হীরে সিং যে! হ্যাঃ, একটা ইঞ্জিন একটু ডিরেল হয়ে গেছে, তার আবার জবাবদিহি! জল করে দিয়ে এসেছি। এই দেখ, এ কানে কলম, এ কানে পেন্সিল। দেখেই বেটা হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'এ কি বাবু!' যেন আকাশ থেকে পড়লাম, 'দেখেছ, কাজের ভিড়ে কলম-পেন্সিল কানে যেন কায়েমি বাসা বেঁধেছে একেবারে; আর হুজুরের তলব শুনে কি আর জ্ঞানগম্যি কিছু ছিল? লোকে বলে, সিংহের ডাক!' এই তাতটুকু দিতেই মন গলতে আরম্ভ হোল বেটার। বললে, 'কাজ কর আর না কর, অমন বেতর মাতাল হয়ে ইস্টিশনে ঢুকো না বাবু, অনেকগুলো দোষ জমে উঠেছে তোমার, এই ফাইল দেখ।'

ব্যাগের মধ্যে ছ বোতল সেরা বিলাতী মাল নিয়ে গিয়েছিলাম, একেবারে আনকোরা; টেবিলের ওপর সারবন্দী করে বললাম, 'ও পাটই উঠিয়ে দিয়েছি হুজুর, ওই ছটি বোতল ছিল, হুজুরের কাছে জরিমানা দিয়ে যাচ্ছি—এই নাকে হাত দিলাম, এই কানে হাত দিলাম।'

একেবারে জল, বললে, 'এখনও রিপোর্টটা পাঠাই নি, দেখি ভেবে তা হলে। কিন্তু দেখো, সাবধান।'

ছ আণ্টে আটচল্লিশটি টাকা লম্বা হয়ে গেল—তা আর কি করব; বেটা একটু টানে-টোনে বলেই এই করে চালিয়ে যাচ্ছি; না হলে চাকরি কি আর থাকত হীরে সিং? ব্যাগের দিকে চাইছিস? তিনটে বোতল কিনে নিলাম তাড়াতাড়ি—'আজ আবার দাসু খুড়োর ওখানে মায়ের পুজো—তুই বেটা যাবি নি?'

হীরা সিং দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল,—"নাহে, বনাম হোই দেওতা! আজ ডিউটি পড়িয়ে গেলো; নইলে আমার তো ষোড়হো আনা খাইস ছিল।"

"এই দেখ বেটার মতিচ্ছন্ন, নাম শুনেও ডিউটির খেয়ালে গরহাজির হয়ে একটা কাণ্ড বাধাবে দেখছি! নে, উঠে আয়। না না, আর অমত করিস নি হীরে সিং, ওইটুকু বলেই মাকে চেব চটিয়েছিস—তোর আমার আবার ডিউটি কি র‍্যা? এই আমিই কার ওপর সব ছেড়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছি? তাঁর ডিউটি তিনি বুঝে নেবেন, তুই উঠে আয়।"

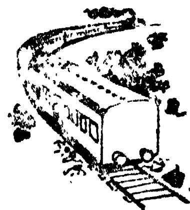
হীরা সিং ইতস্তত করিতেছিল, এমন সময় গার্ড হুইস্‌ল্‌ দিল। বড়ব্রহ্মচারী আমার দিকে না দেখিয়াই বলিলেন—"রঙের চুল-ছাঁটা দেখছেন? ওটা সবারই চোখে ঠেকে। দাঁড়ান, ও বেটাকে তুলি আগে, তারপর সব বলছি। ওটা সেজো আবাগীর আবদার; কিন্তু সব কথা না বললে বুঝতে পারবেন না।···হীরে সিং, উঠে আয় বাপধন, দাসু খুড়ো আজ মার রাজসূয় যজ্ঞ করাচ্ছে; 'কারণে' আজ ডুব-সাঁতার কাটতে হবে—নে, উঠে আয়।"

গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

"ডিউটি ছিল, কাল সাহেব গর্দানা লিবে।—বলিতে বলিতে হীরা সিং গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। দেওতার পায়ে হাত দিয়া, হাতটা কপালে ঠেকাইয়া সামনে বসিয়া পড়িল।"

"জিতা রও বেটা, সুবুদ্ধি হোক।' —দেওতা ব্যাগ খুলিয়া একটি সদ্য-ক্রীত বোতল ও একটা গেলাস বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন—"নে, সিলটা খুলে ফেল দিকিন, একটু পেসাদ করে দিই, তার পরে সাধ থাকে ডিউটির কথা ভাবিস, বেটা কুসন্তান কোথাকার!···এরই নাম জমাদার হীরা সিং। এই তিনটি বোতল তিন চুমুকে সাবড়ে ওই ভৈরবী নদীর নেড়া পুলের উপর দিয়ে গট গট করে পার হয়ে যেতে পারে। জংশন ইস্টিশনের হেড পয়েণ্ট্‌সম্যান, এক কথায় ডিউটি ফেলে মার টানে উঠে এল।"

শেষের কথাগুলি আমায় বলিলেন। হীরা সিং সম্বন্ধে পূর্বে কৌতূহলের তেমন বিশেষ কারণ না থাকিলেও পরিচয়ে উদ্রেক হইল বটে; এবং হীরা সিং-এর মহত্ত্ব ও জংশন-স্টেশনের আসন্ন বিপদের কথা ভাবিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিলাম।



দেওতার পীতাবশিষ্ট পেসাদটুকু নিঃশেষ করিয়া হীরা সিং গোঁফজোড়া মুছিয়া একটু পাকাইয়া লইল; মনে হইল, সে এইবার গাড়ি হইতে লাফ দেওয়া কিংবা নেড়া পুল পার হওয়ার অনুরূপ একটা দুরূহ কার্যের জন্য তৈয়ার হইতেছে; কিন্তু সেসব কিছুই না করিয়া হীরা সিং আস্তে আস্তে টলিতে টলিতে আসিয়া আমার পায়ের উপর তাহার মাথাটা চাপিয়া ধরিল এবং একটু পরে হাউ হাউ করিয়া ক্রন্দন শুরু করিয়া দিল।

ভাবিলাম, এ তো ভ্যালা বিপদ, বেটা আধ ছটাক খাইয়াছে কি না ঠিক নাই! একেবারে ভূত।

বড়হ্মচারী ওর দ্নো টানিয়াও নির্বিকার ; ব্ঝিলাম হাঁ, বড়র ম্খেই ক্ষ্দ্রের প্রশংসা মানায় বটে। বলিলেন—"ওর অনেক দ্ঃখ্, সব বলব 'খান, আর একটু সব্র কর্ন না।...আজ গার্ড ড্রাইভার কে র‍্যা বেটা ? নে, উঠে আয়।"

হীরা সিং আমার পা আরও জোর করিয়া ধরিল ; জড়িত অশ্রনির্দ্ধ কণ্ঠে বলিল—"গরীব হীরা সিং ছ্যামা মাঙছে।"

রাগে একটা হেঁচকানি দিয়া পা ছাড়াইয়া লইলাম, বলিলাম—"আচ্ছা মাতালদের পাল্লায় পড়া গেল তো।"

দেওতা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন—"আরে না না, ও চুমো চাইছে না, ওকে ক্ষমা করতে হবে ; বেটারা 'ক্ষ'-কে 'ছা' বলে সব মাটি করে যে—ভয় নেই—হাঃ হাঃ হাঃ।...আয় বেটা, উঠে আয়, জিবের আড়টা ভেঙে নে দিকিন—একটু হলে কেলেঙ্কারি বাধাতিস আর কি ! ভাব্ দিকিন, যদি উনি কোন বড়ঘরের লেডি হতেন ! আচ্ছা, আমিই ওর হয়ে অ্যাপলজি চাইছি।"—বলিয়া উঠিয়া আসিয়া কর্ণভাবে আমার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া আবার স্বস্থানে গিয়া বসিলেন। দেখিলাম, ক্রমে ক্রমে তাঁহারও অবস্থা সঙিন হইয়া আসিতেছে।

হীরা সিং আবার বজ্রম্ষ্টিতে আমার পা ধরিয়া ছিল। আমি নির্পায় হইয়া তাহাকে ভাল কথায় বলিলাম—"নে, তোকে করলাম ছ্যামা—আর যেন টানিস-টুনিস নি—যা, গিয়ে বস দিকিন এখন।"

"এ জিন্দগিমে, আবার শরাব ? এই গ্রুর শপথ খাচ্ছি, হীরা সিং-এর শপথকে ওই দেওতা চিনেন, দেওতার জন্যে আমার ধন-মান-কুল।" আবার গলা ভারী হইয়া আসিল।

দেওতা ডাক পাড়িতেছিলেন, হীরা সিং আস্তে আস্তে গিয়া পায়ের কাছে বসিল, গেলাসটি হাতে লইল, তাহার পর আমার দিকে বাঁ হাতটা আড়াল করিয়া চুম্ক লাগাইল।

"বড় পাজি জিনিস। অ্যাজ এ ফ্রেন্ড অ্যাডভাইস দিচ্ছি, কেউ মাথার দিব্যি দিলেও ধরবেন না। আমার কথা ? একটু মেডিসিনডোজে চালাই কখনও কখনও, তাও কেন যে ধরেছি সব কথা বললেই ব্ঝতে পারবেন, একটু সব্র কর্ন না, সব বলছি।"

একটু সব্র করিবার পর গাড়ি আসিয়া পরের স্টেশনে থামিল। দেওতা বলিলেন, "যা বেটা, দেখ দিকিন—গার্ড আর ড্রাইভার কে !" হঠাৎ চোখ রাঙাইয়া উগ্রভাবে বলিলেন—"যেই হোক, টিকি ধরে টেনে নিয়ে আসবি, বলবি, বড়হ্মচারী বাবার হ্কুম, ইয়ারকি না, যা।"—বলিয়া পৃথিবীতে তাঁহার হ্কুমগ্লো ঠিকমতো তামিল হইতেছে না, বোধ হয় এই রকম একটা ধারণা করিয়া লইয়া রাগতভাবে ম্খটা গোঁজ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

হীরা সিং ভক্তিভরে তাঁহার পায়ের ধ্লো লইয়া টলিতে টলিতে, নামিয়া গেল ;

প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া শেষ বিদায়ের মতো হাতজোড় করিয়া বলিল—"গরিবকে অসমরণ রাখবেন বাবা।"

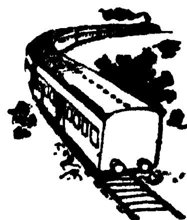
দেওতা অবিচলিতভাবে বসিয়া রহিলেন, হীরা সিং চলিয়া গেলে আবার সহজ ভাব ধারণ করিয়া আমাকে বলিলেন—"সার্থক নাম বেটার—একখানি হীরের টুকরো।" তাহার পর যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন—জংশনের পয়েণ্টগুলো সামলে বিস মা, দশমহা বিদ্যারূপিণী, নয়তো দুর্নাম নিবি বেটী—"

চুপ করিয়া হীরার হীরাত্ব এবং মা আজ দশমহাবিদ্যার কোন রূপটি লইয়া পয়েণ্টগুলির নিকট আবির্ভূত হইবে ভাবিতেছিলাম, এমন সময় হীরা সিং একটা মুসলমান ড্রাইভার ও একজন ফিরিঙ্গী গার্ডকে সঙ্গে করিয়া হাজির হইল। তাহারা আসিয়া হীরা সিংএরই মতো বলিল—"দণ্ডবৎ বড়হ্মচারী বাবা!"

বাবা রক্তচক্ষু এবং কম্পিত হস্ত তুলিয়া নীরবে আশীর্বাদ করিলেন, তাহার পর বোতলটা এবং গেলাসটা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—"তোর ইঞ্জিন চলছে না যে আলিজান, নে, একটু স্টীম করে নে।…কে, পিটার গার্ড সাহেব? নাও একটু চড়িয়ে নাও, ঘাট স্টেশন পোঁছুতে ধার নাম রাত দুটো। আজ দাসু খুড়ো মার পুজো করছে—নেমন্তন্ন রইল। ঘণ্টা দুতিন লাগবে; ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসে কোন প্যাসেঞ্জার আছে নাকি?

পিটার সাহেব গেলাস হাতে করিয়া তাচ্ছিল্যভরে ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"ইয়েস, কোঠিয়াল বিলিয়াস সাহেব সিকিন কিলাসমে হ্যায়। আরে, হ্যায় তো হ্যায়; ওয়েসা সাহেবকো পিটার গার্ড 'সাহেব' নেহি কহতা—কভি ওসব ওলায়েৎ দেখা হ্যায়? হামারা গ্রাণ্ড ফাদার—"

বড়হ্চারী পিটারের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"ওর গ্রাণ্ড-ফাদার প্রকাণ্ড জাহাজের ফায়ারম্যান ছিল—কতবার যে বিলেতে যাওয়া-আসা করেছিল তার হিসেব নেই; পিটার তো এ দেশীয় সাহেবগুলোকে সাহেবই বলে না।" তারপর একটু হাসিলেন—বোধ হয় এহেন কুলীন পিটারের সাহচর্য গৌরবে।



পিটার সাহেব গেলাসে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে দিতে এদেশী সমস্ত সাহেবের উপর অবজ্ঞা ও ক্রোধের নিদর্শনস্বরূপ গেলাসের আড়াল হইতে আমার পানে ঘন ঘন উগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

আলিজানের মুখ-চোখে রঙ ধরিয়া আসিতেছিল, দৃপ্তভাবে বলিল—"কেয়া, হামুভি সাদা চামড়াসে থোড়াই ডর করি। হাম দো ঘণ্টা, চার ঘণ্টা, দশ ঘণ্টা দেরি করেগা, খুশি হামারা। বোলাও সিকিন বিলাসকা সাহেবকো। কালীমাইকা সামনে আঙ্গরেজ ?"

বড়হমচারী বাবা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"করিম বক্স ডাকাত ওরই ঠাকুরদাদার বাবা ছিল কিনা ;—ভয়ানক কালীভক্ত, পুজো করে বেরুলে তাকে রোখে কে ! কত কুঠিয়ালের মাথা নিয়েছিল, তার কি ঠিকানা আছে ? সব একে একে বলছি একটু সবুর করুন না, অত উতলা হলে চলবে কেন মশাই ?"

আলিজান হঠাৎ বিরক্তভাবে পিটারের হাত হইতে গেলাসটি ছিনাইয়া লইয়া বোতল হইতে ছাপাছাপি এক গেলাস ঢালিয়া লইল, তাহার পর এক নিঃশ্বাসে সেটা শেষ করিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে গটগট করিয়া নামিয়া গেল। পিটার অবিচলিতভাবে শূন্য গেলাসটা পূর্ণ করিতে লাগিল। আলিজানের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তাহার ঘাড়ে হঠাৎ তাহার কুঠিয়াল-বিধ্বংসী পূর্বপুরুষের ভূত চাপিয়াছে। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সশঙ্কিতভাবে সেকেণ্ড ক্লাসে একটা হৈ-চৈয়ের প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় একটা প্রচণ্ড রকম ঝাঁকানি দিয়া গাড়িটা একেবারে ভৈরববেগে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া দিল। মনে হইল, ড্রাইভারের ছোঁয়াচ লাগিয়া এঞ্জিনটাও যেন এক মুহূর্তে মাতাল হইয়া উঠিয়াছে।

পিটার সাহেব পকেট হইতে হুইসলটো বাহির করিল। সেইখানে বসিয়াই খুব জোরে ফুঁ দিয়া পকেটে রাখিয়া দিয়া বলিল—"হম আঙ্গরেজকা বাচ্চা, ডিউটি নহি ভুল সাকতা।"

বড়হমচারী বাবা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আলিজান একবার রাগলে কারও রক্ষে নেই।"

আমি গাড়ির মত্ত বেগ লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—"রক্ষের তো উপায় দেখছি না। ঠিক ; তবে হঠাৎ রাগলেন কেন, তা তো বুঝতে পারি না। আপনারা মশায়, এতোগুলো লোকের প্রাণ নেবেন নাকি ? আমি তো পরের স্টেশনে গিয়েই ডি. টি. এস-কে তার করছি।"

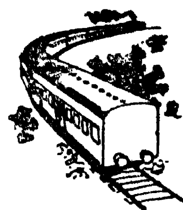
দেওতা ঈষৎ হাস্য করিয়া চাপা কণ্ঠে বলিলেন—"অনেক সময় পাবেন ; আমাদের ওখানে দু-চার ঘণ্টার বেশি লাগবে, তার বাবুর বাড়িতেই আজ মা অবতীর্ণা হবেন কিনা।"

হতাশ হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

হীরা সিং নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া অসাড়ভাবে পড়িয়াছিল।

বড়হমচারী বাবা বোতলটা উপুড় করিয়া গলায় ঢালিয়া দিয়া বিষন্নবদনে পিটারের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"পিটার গার্ড, কক্ষনও তিনটে শাদি করিস নি বাপ, ধনে

প্রাণে মারা যাবি—চারটে কর, আটটা কর, তারা জোড়া বেঁধে নিজেদের মধ্যে খোটাখুটি করে মরবে। তই দিব্যি 'জিতু জিতু মোর মামা' করবি ; কিন্তু যদি একটি বেজোড় ছেড়ে রাখ, সেটি তোমার ঘাড়ে চাপবে। আমার সেজো আবাগীর কথাই ধর না ভাই ; বড়য় মেজোয় হরদম মাথা ফাটাফাটি করছে—বেশ শান্তিতে থাকতাম ; কিন্তু সেজো আবাগীকে এনেই—"



গার্ড সাহেব আমার দিকে দেখাইয়া বলিল—"ই বাবু পিতে নেহি হ্যায় ? দেওতা, দিয়া ইনকো ?"

"নাঃ, উনি এদিকে নেই। কেত্তা কিসিমকা আজব আদমি জগদম্বা বানিয়েছে রে দাদা ; দুনিয়াটা চিড়িয়াখানা। কি যে বলছিলাম, হ্যাঁ, তিনটে শাদি করো না পিটার সাহেব—জেরবার হবে। দশটা কর, বারোটা কর, যোলটা কর, বাধা দেব না ; বেজোড়ের দিকে যেয়ো না, পাঁচটা নয় সাতটা নয়, একুশটা নয়—নাও, বোতলটা খোল।"

পিটার সাহেব বোতলটা হাতে লইয়া বিমর্ষভাবে বলিল—"হামারি আওরাৎ আকেলেহি একশ'ই হ্যায়। কাল দোঠো ওয়াজিব বাত বোলনে গিয়া। ইয়ে দেখো নতিজা।"—দেখাইয়া দিল।

"ও বাবা, তোকে উল্টে মার দেয়। মেয়েমানুষের দাঁত নড়ানো ধুষি !"

"আওর কোই আধা সের লোহু নাকসে নিকলা।"

"ইংরেজ-বউকে ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার বাবা, বেশ আছি ; আমার কোনও আবেগী গায়ে হাত তোলে নি কখনও। ডাইভোর্স করে দিস না কেন মাগীকে ? তোদের জাত বুঝে যীশু তো সে ব্যবস্থা করে গেছে।"

"বোলতি হ্যায়, ডাইভোর্স করনেসে খুন করেগি।"

"না করলেও বা কোন্ বাকি রাখছিস বাপু। এক কাজ কর, আমি হদিস বাতলে দিচ্ছি—দেখবি, অমন দজ্জাল মাগী তো—একেবারে কেঁচো হয়ে গেছে। তিন-তিনটে বাঘিনী নিয়ে ঘর করছি রে দাদা, ওসব ঢের দেখা আছে। সেজো আবাগী অভিমান করে বললে, "একটু ভাল করে ফিটফাট হয়ে থাকতে পার না ?' বুঝলাম, কথাটা যৌবনের রস। তার পরদিনই নাপতে ডাকিয়ে দুই কানের ওপরটার চামড়া বের করে ছোকরা বাবু হয়ে পড়া গেল। আর কিছু আবদার নেই, সব মিটে গেছে...

এখন দেখলে নাক-সিঁটকোয়। যে যেমন, তার সঙ্গে সে রকম চালাও। বড় আবাগী বললে, 'তোমার হাতে পড়ে পাপে তাপে তো জীবনটা দগ্ধে গেল, আর কেন? একটু তীর্থ'টির্থ' করিয়ে আন না? এটুকুও হবে না?' বললাম, 'সে কি কথা! হবে বই কি!' এলাহাবাদ ত্রিবেণীর ঘাটে—ও-ও ডুব দিতে নামল, আমিও বগলে বোতল বাগিয়ে উঠলাম, সাতদিন দুজনের দেখা নেই—দুমাস কথা কয়নি—আজ পর্যন্ত তীর্থের নামও করে না। একটু সবুর কর না, তোকে এসা এক মতলব বাতলে দিচ্ছি—"

'আচ্ছা, একঠো খাসুসি চড়হানেসে তুমলোগোঁকী কালীজী কুছ বন্দোবস্ত কর্ সকতী?"

"খুব খুব; আরে কালী আর তোদের যীশুর মা মেরী তো খুড়তুতো জাঠতুতো বোন ছিল—যার নাম 'চাচেরা বহিন'—বুঝা? তোরা কি আর মার পর?'

এমন সময় দুই-তিন বার ঘ্যাচাং-ঘ্যাচাং শব্দ করিয়া গাড়িটা হঠাৎ থামিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে—'বড়হমচারী বাবা, ও বড়হমচারী বাবা,' 'দাদা দাদা', ও খুড়ো, কোন্ গাড়িতে হে?' ইত্যাকার কতক গুলো অসংলগ্ন আওয়াজে স্টেশন-প্ল্যাটফরমটা সরগরম হইয়া উঠিল। বি. এন. ডব্লুর ব্র্যাঞ্চ ট্রেন—বলাই বাহুল্য যে, কোন গাড়িতেই আলো ছিল না। শেষ পর্যন্ত দেওতার আওয়াজ ও পিটার গার্ডের হুইস্‌ল লক্ষ্য করিয়া যখন উভয় পক্ষের মিলন হইল, তখনকার সেই পৈশাচিক উল্লাস ও চীৎকার মসীজীবী নিরীহ কলমের মুখে প্রকাশ করা যায় না।

দাসু খুড়োকে দেখিলাম। রাজসূয় যজ্ঞ করিবার মতো লোক বটে—লিকলিকে, খর্ব; মদে যদি ভারী হইয়া অমন গড়াইয়া গড়াইয়া না পড়িত তো হাওয়ায় উড়িবারই কথা। যতক্ষণ দেখিলাম ডান হাতে ঘুষি বাগানোই ছিল। বলিল—"দাদা, ব্যাটা ডেন্‌ফোর্ড তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিল সামান্য একটু ডিরেলের জন্যে? আমি দেখে নেব সম্বন্ধী—এই একটি ঘুষি। আলিজান, পিটার গার্ড, ব্যাক কর গাড়ি—চল জংশনে—দেখেগা ক্যায়সা সাহেব হ্যায়—দেসো শালা বেঁচে, আর তোমার কাছে এক্সপ্ল্যানেশন চাইলে দাদা? আমাদের লর্ড বিশপের অপমান!"

আলিজানের নেশাটা একটু ফুরাইয়া আসিয়াছিল। সেইজন্যই হোক আর যে কারণেই হোক, সে ব্যাক করিতে নারাজ হইল; তখন দাসু খুড়ো নিজের শক্তি ও শৌর্যের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে এদিকে নিরাশ হইয়া, মৃতপ্রায় হীরা সিং-এর শরীরটা কাঁধে ফেলিয়া একলা বাসায় লইয়া যাইবার জন্য জিদ ধরিয়া বসিল। এ ব্যাপারের কিরূপ মীমাংসা হইত বলা যায় না, তবে এই নারকীয় গোলমালে এবং তাহার শরীরটা লইয়া টানাটানি করাতে হীরা সিং-এর তন্দ্রা একটু ভাঙিয়া যাওয়ায় সে 'ছুামা'র জন্য আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া হতাশভাবে কাঁদিতে লাগিল। এই সংকল্প জানাইল রে, আমি 'ছুামা' না করিলে বাঙালী তো কোন্ ছার, স্বয়ং হনুমানজী আসিলেও তাহাকে নড়াইতে পারিবে না।

আমি প্রায় বিশ-পঁচিশ বার স্বীকার করিলে যখন তাহার আর মোটে সন্দেহ রহিল না, সে সবাইকে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া আপনিই টলিতে টলিতে নামিয়া গেল।

বড়হমচারী বাবা, হীরা সিং, আলিজান আর ও পক্ষের সবাই হৈ-হৈ করিতে করিতে, টলিতে টলিতে, পড়িতে পড়িতে দাসু খুড়ার বাসার দিকে চলিল। বলিলাম, "গার্ড সাহেব, মিঞা সাহেব, আমার কাল সকালের মধ্যে ঘাট স্টেশনে পৌঁছানো চাই—গবর্মেণ্টের জরুরি কাজ—"

দাসু খুড়ো টলিতে টলিতে ঠেলিয়া আসিয়া তাহার হাড্ডিসার ঘুষি আমার নাকের সামনে বাঁকাইয়া ধরিয়া বলিল—"একটি ঘুষিতে গবর্মেণ্টের বত্রিশ পাটি দাঁত খসিয়ে দেব। তাদের জরুরী কাজ তারা বুঝবে—আমার রিলিজিয়াস টলারেশনে হাত দেবার কে হ্যা?"

বড়হমচারী বাবা ধুরিয়া দাঁড়াইয়া—স্রোতের ধারের বেতগাছের মতো দুলিতে দুলিতে বলিলেন—"আমারও তো ভোরের স্টীমারে ওপারের স্টেশন-মাস্টার রামদয়ালের বাড়িতে যেতে হবে—বড় ঘটা করে রাধামাধবজীর পিঁড়ে প্রতিষ্ঠে করবে কিনা; আপনার এই দাসানুদাসের ওপর সব ভার। ওপার থেকে আর ইস্তক জংশন পর্যন্ত সব ব্যাপারে বাবা এই কালী ব্রহ্মচারী। ডালে আছি, ঝোলে আছি, অম্বলে আছি। ঘাবড়ান কেন? একটু সবুর করে বসে থাকুন—দেখবেন, আপনার এ গোলামের গোলামকে না হলে কারুর এক পা এগুবার জো নেই—শাক্ত হোক, বোষ্টম হোক, শৈব হোক, কেরেস্তান হোক—"

পিটার হঠাৎ তাঁহার হাতটা ধরিয়া একটা টান দিল, ঘৃণার সহিত বলিল—"আরে চলো, কভি, শরাব নেহি পিতা, ওই তুমহারা কদর কেয়া বুঝেগা?"

বড়হমচারী তাঁহার অর্ধনিমীলিত চক্ষুপল্লব যেন হঠাৎ চাড়া দিয়া তুলিয়া আমার দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া শাপ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিলেন—"আমার 'কারণ'কে অপমান করেছিস—মনে থাকে যেন।"

র‍্যাপারটা টানিয়া লইলাম। মুড়িসুড়ি দিয়া রাত্রের মতো বেঞ্চের উপর শুইয়া বি. এন. ডবুর মহিমার এই নূতন স্বরূপটির কথা ভাবিতে লাগিলাম।



গান

ছোট একটি জংশন স্টেশন। রাত সাড়ে এগারটার সময় সদর লাইনের গাড়ি ছাড়িয়া ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করিলাম। দুই রাত আর দুই দিন গাড়িতে কাটিয়াছে, আজকালকার ট্রেনযাত্রা—একেবারে চক্ষু বুজিতে পারি নাই বলিলেই চলে।—কাল সকাল আটটায় আবার গাড়ি। কুলিকে প্রশ্ন করিয়া জানিলাম স্টেশনে খাবার আজকাল একেবারেই পাওয়া যায় না, ময়দা, ঘি, চিনির দেখা-সাক্ষাৎ নাই।...শরীর এতই অবসন্ন যে ঐ যে বিশ-পঁচিশ মিনিট আহারে ব্যয়িত হইত, সেটাও নিদ্রায় দিতে পারিব জানিয়া কতকটা প্রসন্ন চিত্তেই ওয়েটিং রুমের শরণ লইয়াছি।

ভিতরে পা দিয়াই চক্ষু স্থির!

একটা বেঞ্চের সমস্তটা জুড়িয়া এক কাবুলী ঝড়ের মত নাক ডাকাইয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। আসবাবের মধ্যে বেঞ্চের অতিরিক্ত একটি আরাম কেদারা আর ঘরের মাঝখানে একটি গোল টেবিল। টেবিলটির উপর একটা টিনের সুটকেশ আর একটা বড় কাপড়ের পোঁটরি। দুইটিতেই ছোট টেবিলটি প্রায় ভরিয়া গিয়াছে। টিনের মধ্য হইতে যে ভাবে হিঙের গন্ধ নির্গত হইতেছে, বুঝিলাম এ দুটি কাবুলির সম্পদ। আরাম কেদারায় একটা বড় মিলিটারি ওভারকোট আর একটা ন্যাপস্যাক্ নানারকম টুকিটাকিতে ভর্তি; পাশে চামড়ার পাটিতে ঝোলানো একটা জলাধারও রহিয়াছে। কিন্তু কোন লোক নাই।

কি উপায় করিব ভাবিতেছি এমন সময় পাশের বাথরুমে হঠাৎ একটা উৎকট শব্দ উঠিল। প্রথমটা মনে হইল কেহ যেন তীক্ষ্ণ যন্ত্রের দ্বারা আহত হইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল। সেদিকে পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিলাম—খুন নয়, কণ্ঠ সংগীত, একটা গোরা বাথরুমে গান ধরিয়াছে। ক্লাইভের

কপাল জোরে সেরকম সুর কিছু কিছু শুনিতে হইয়াছে, কিন্তু সেরকম কণ্ঠস্বর কখনও কানে আসে নাই। এ পর্যন্ত যেসব সাহেবী গান শুনিয়াছি, মনে হইল সে-সবের গায়কদের গলা ভারতীয় আবহাওয়ায় অনেকটা মোলায়েম হইয়া গেছে, এ যেন সদ্য জাহাজ হইতে নামিয়া সরাসরি এই জংশন-স্টেশনে আসিয়া গলা ছাড়িয়া দিয়াছে।

এদিকে কাবুলীর সেই নাসিকাগর্জন। মুখের উপর গোলাপী রঙের রুমালটা ফেলিয়া রাখিয়াছে—নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে হাওয়ায় ফুলিয়া সেটার মাঝখানটা কয়েক ইঞ্চি উঠিয়া পড়িতেছে আবার নিঃশ্বাস টানার সঙ্গে সেটা নাকের উপর সাঁটিয়া যাইতেছে। নাক ডাকার যে আমাদের দেশী শব্দ-বৈচিত্র্য আছে সে সব তো রহিয়াছেই, তাহার অতিরিক্ত একটা শব্দ মাঝে মাঝে উঠিতেছে যাহা সম্পূর্ণ অপরিচিত—কেমন একটা ড—ড়—ল—ঘ—ঙ—মেশান অদ্ভুত ধ্বনি—সঙ্গে একটা কাবুলী নাকী সুর।

অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি, নাক ডাকাটা হঠাৎ একটু কমিয়া গেল এবং কাবুলী বেঞ্চে দুইটা লঘু চাপড় দিয়া জড়িত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল—"চুপ রও, চুপ রও।"

বুঝিলাম গানটা ঘুমে ব্যাঘাত দিতেছে; তবে এখনও সম্পূর্ণ জাগাইতে পারে নাই কাবুলী ঘুমের ঘোরেই কাল্পনিক গায়ককে ভালো কথায় নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিতেছে। আমি ডাকিলাম—"আগা সাহেব!"

কাবুলী মুখের রুমালটা সরাইয়া উঠিয়া বসিল, ক্লান্ত এবং বিরক্তভাবে মিষ্টি করিয়া বলিল—"গাও মৎ বাবু সাব।"

জানাইলাম আমি তো গাহিতেছিই না, গাহিবার কোন অভিসন্ধিও নাই; আগা সাহেব যদি বেঞ্চের আধখানা ছাড়িয়া দেয় তো আমিও একটু আরাম করি।

ঘুমের ঘোরটা গিয়া কাবুলী তৎক্ষণে আমি যে গায়ক নই এটা টের পাইয়াছে। একবার বাথরুমের পানে চাহিল, একবার আরম কেদারায় রাখা ন্যাপ্-স্যাক, প্রভৃতির পানে চাহিল, তাহার পর মুখটা কুঞ্চিত করিয়া আবার রুমালে মুখ ঢাকিয়া সেইরূপ লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। বুঝিলাম আমি বা আমার কথা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

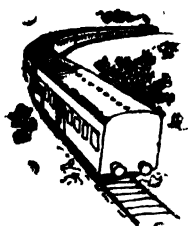
কিন্তু সে আরাম করিয়া নাক ডাকার পালা ক্ষান্ত হইল। গান আরও জমিয়া উঠিয়াছে, কয়েকবার দারুণ বিরক্তিতে "উঁঃ—উঁঃ"! শব্দ করিয়া কাবুলী মুখের রুমালটা সরাইয়া ফেলিল, আমি হোল্ড-অলটা খুলিয়া নিচেই বিছানাটা খুলিবার চেষ্টা করিতেছি, আমার পানে চাহিয়া বলিল—"বাবু, সাব, স্তর-রা কো মানা করো।"

আনন্দই হইল একটু—যখন দেখিতেছি আমাকেও ঘুমাইতে দিবে না। হিন্দিতেই বলিলাম—"ও আমার মানা শুনবে কেন সাহেব? তুমি নিজেই কর না গে।"

শরীরের যে রকম বহর দেখিতেছি এবং মেজাজের যেরূপ অবস্থা; কথা বাড়াইতে যাওয়াই ভুল হইবে। হোল্ড-অলটা খুলিয়া নিচেই বেঞ্চের কাছে বিছানাটা পাতিয়া ফেলিলাম। নিদ্রা যা হইবে বুঝিতেই পারিতেছি, গোরার গান, কাবুলির নাক ডাকা,

তাহার উপর আবার মশার গুঞ্জনও নিতান্ত অবহেলা করিবার মত নয় ; তবু পাৎলা উড়ানী চাদরটা ঢাকা দিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলাম।

গান আরও জমিয়া উঠিয়াছে। কাবুলীর নাকডাকা আরম্ভ হইতেছে, কিন্তু টিকিতেছে না—"উঁ—উঁ।" করিয়া বার দুয়েক শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া যাইতেছে। একটু আনন্দ যে না হইতেছে এমন নয়—আমার সঙ্গে যে ভাবে আচরণ করিল। ঘুমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ওদিকে পরিণাম কি হইতে পারে চিন্তা করিতেছি, এমন সময় জালের দরজা ঠেলিয়া একজন শীর্ণকায় মাঝবয়সী বাঙালী ভদ্রলোক ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল, হাতে সতরঞ্চি জড়ানো একটা ছোট বিছানা। এ মুখ খাবলানো-খাবলানো পাৎলা গোঁফ যেন চেনা চেনা। উড়ানির মধ্য হইতেই ঠাওর করিয়া দেখিতে দেখিতে মনে পড়িয়া যাইতেই দেহে একটু যেন পুলক-শিহরণ খেলিয়া গেল।...দীনু রক্ষিত !!



সেবারের সমস্ত ঘটনাটা মনে পড়িয়া গেল। সে যা দেখিয়াছিলাম তাহাতে বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গিয়াছিল কাবুলী-চরিত্র সম্বন্ধে এত বড় বিশেষজ্ঞ সারা বাঙলায় বোধ হয় দ্বিতীয়টি নাই। কেমন একটা আশা হইল, এইবার একটা সুরাহা হইবেই।

ঘুমানো যে অসম্ভব এটা ধরিয়া লইয়াই দীনু রক্ষিত আমায় শুনাইয়া বাঙলায় বলিল—"বাঃ, এ যে আনন্দমেলা বসে গেছে,...এঁর পাশেই শুয়ে পড়া যাক একটু..."

বিছানা খুলিবে এমন সময় কাবুলী আবার দুইবার—উঁ—উঁ।" করিয়া নাক ডাকানো বন্ধ করিয়া মুখের রুমালটি সরাইয়া ফেলিল ; একটু ক্লান্ত এবং করুণভাবেই দীনু রক্ষিতের পানে চাহিয়া বলিল—বাবুজী, গুরু-রাকো মানা করো।"

দীনু রক্ষিত অল্প একটু হাস্যের সহিত আমার পানে চাহিয়া জনান্তিকে বলিল—"ঘুমুলেন নাকি ?...দেখি একটা ব্যবস্থা হয় কি না।"

কাবুলীকে প্রশ্ন করিল—"কেয়া বোলা আগা সাহেব ?"

গান আরও উৎকট হইয়া উঠিয়াছে—ওদের 'সমের' ঝোঁক দেখিতেছি আবার গাঁটে গাঁটে। কাবুলী উঠিয়া বসিল, চক্ষে ঘুমের জড়িমা একেবারে কাটিয়া গিয়াছে, একটা কানে হাত দিয়া করুণ মিনতির সহিত দীনু রক্ষিতের পানে চাহিয়া বলিল—"বাবুজী, গুরুরা কো মানা করো ; হাম আংরেজী নেহি জানতা।"

দীনু রক্ষিত উঠিয়া গিয়া খালি জায়গাটায় বসিল, বলিল—"আ সায়েব, ওঃপল্টনী গোরা হ্যায়, মানা নেহি বুঝতা হ্যায়, বুঝতা হ্যায় এই···"

—বলিয়া দক্ষিণ হস্তটা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দুইবার নাচাইয়া দিল।···অর্থাৎ, দুটি ঘুষি।

কাবুলী একবার বাথরুমের পানে চাহিয়া লইয়া যেন নিরুপায়ভাবে বলিল—"গরকে ভিতর হ্যায় বাবুজী,।"

চাদরের ভিতর হইতে দেখিতেছি, দীনু রক্ষিতের চোখ দুইটা চক্‌চক্‌ করিতেছে, মুখের একটা কোণ কুঁচকাইয়া লইয়া জানাইল—ঘরের ভিতরের ছিটকিনির বিশেষ কোনই জোর নাই, দুইটা আঙুল দিয়া ঠেলা দিলেই খুলিয়া যাইবে, তাহার পর···

—বাকিটা হাতটা আবার মুঠা করিয়া ইসারাতেই বুঝাইয়া দিল।

গানটা একটা মোড় ঘুরিয়া অন্য খাতে নামিয়াছে।

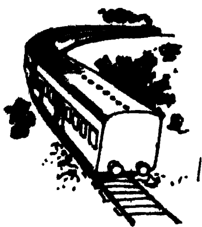
"ইয়া আল্লা!" বলিয়া দুইটা কানেই হাত দিয়া কাবুলী দাঁতে দাঁত পিসিয়া উঠিয়া পড়িল, হন হন করিয়া দুই পা অগ্রসরও হইল; একটা বিপুল সংঘর্ষের আশঙ্কায় কাঁটা হইয়া উঠিয়াছি, কাবুলী হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া অতি দীনভাবে ফিরিয়া আসিয়া নিজের জায়গাটিতে বসিয়া পড়িল, এখনই যেন কী একটা ভুল করিয়া ফেলিত এইভাবে বলিল—"গুরেরা গরকে ভিতর হ্যায় বাবুজী. বে-আইনী ওগা, বড়-বাবু বান্‌ দেগা।"

—হাতকড়ি লাগার ভঙ্গিতে দুই হাতের কব্জি একত্র করিয়া ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল। ও অবস্থাতেও আইনের প্রভাব দেখিয়া বেশ একটু কৌতুক বোধ হইল। মতলবটি খাটিল না দেখিয়া দীনু রক্ষিত বিমর্ষভাবে বলিল—"তাহলে আর কি করবে, সহ্য করে থাক।······বরদাস্ত করো আগা সায়েব, কেয়া করেগা? নসিব।"

এমন সময় দোরের ছিটকিনি খুলিয়া গোরাটা বাহির হইয়া আসিল। আজকাল যেমন অল্প বয়সী আর ক্ষীণজীবী গোরার আমদানী হইতেছে সে ছাঁটের নয়—অবশ্য সেটা গলার বহরেও অন্দাজ করিয়াছিলাম। বেশ লাল টকটকে দশাসই চেহারা—গাঁট্টাগোট্টা, গা-ময় লাল-নীল রঙের উলকি। পরিধানের মধ্যে শুধু একটা পাঁশুটে রঙের হাফ প্যাণ্ট। বাঁ হাতে একটা বোতল, ডান হাতে একটা তোয়ালে,—মদ গিলিয়া স্নানাদি সারিয়া বাহির হল। গান পূর্ববৎই চলিতেছে, বন্ধ দুয়ারের ব্যবধান না থাকায় মনে হইতেছে যেন কানে তালা লাগিয়া যাইবে।

কড়া বিদ্যুতের আলো। পাতলা চাদরের ভিতর দিয়া দেখিতেছি, কাবুলী স্থির সংশয়াপন্ন দৃষ্টিতে গোরাটার পানে চাহিয়া আছে; ভাবটা যেন এই যে, ভিতরে না গিয়াই ভালো করিয়াছিল—গেলে যে সংঘর্ষটা হইত তাহাতে যে সেই জয়ী হইত তাহার কিছু নিশ্চয়তা ছিল না। পাশে দীনু রক্ষিতের মুখের ভাবটা আরও কৌতুকপ্রদ—একটু আড়চোখে, কাবুলীর মুখের পানে চাহিয়া আছে, অল্প একটু

কুটিল হাসিতে মুখের একটা কোন কুঞ্চিত হইয়া লম্বা নাকের অগ্রভাগটা চক্ চক্ করিতেছে—মনের ভাবটা বোঝ, একবার কি ব্যাপারটা ঘটাইতে যাইতেছিলাম।
গোরাটা একটু টলিতে টলিতে আসিয়া ন্যাপ্স্যাকটা নীচে নামাইয়া এবং ওভার কোটটা হাতলের উপর রাখিয়া আরাম কেদারায় গা এলাইয়া দিল। মনে হইল এইবার গানের যেন আরও সুবিধা হইয়াছে, দুইটা হাত নাড়িয়া একবার ছাতের দিকে, একবার এপাশে একবার ওপাশে চাহিয়া যেন কাহাকে সাক্ষী রাখিয়া গলা খুলিয়া দিল।



কাবুলী কিছুক্ষণ সেইভাবে থাকিয়া ললাটে একটা মৃদু করাঘাত করিল, তারপর কি একটু ভাবিয়া লইয়া মিনতির ভঙ্গীতে ডান হাতটা বাড়াইয়া গোরাটাকে হিন্দীতে অনুরোধ করিল—"গুর-রা সাব, মেহেরবাণী করকে বন্দ করো, শোয়েগা।"
মনে হইতেছিল চরম হইয়াছে, কিন্তু কাবুলীর মিনতির পর আরও যেন এক পদ বাড়িয়া গেল।······ঘুম চটিয়া গেছে, এখন ব্যাপারটা কোন্ দিকে গড়ায় সেই ঔৎসুক্যেই চাদরের বাহিরে দৃষ্টি ফেলিয়া রাখিয়াছি; অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে কেমন একটা বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে, দীনু রক্ষিত শেষ পর্যন্ত একটা রাস্তা বাহির করিবেই—ওর চোখমুখ ক্রমেই শয়তানিতে যেন নিটোল হইয়া ভরিয়া আসিতেছে।
উল্টা উৎপত্তি হইল দেখিয়া কাবুলী নিরাশ হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল, একবার গোরাটার পানে চাহিতেছে, একবার সামনে দেখিতেছে একবার দুইটা কান চাপিয়া বলিতেছে "ইয়া আল্লা"···কিছুই যেন ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছে না তারপর হঠাৎ একবার দীনু রক্ষিতের ডান হাতটা ধরিয়া বলিল—"বাবু সাব, গুর-রা হিন্দী নেই সমজতা, তুম অংরেজীমে বোলো! আচ্ছা হিং দেগা বাবু সাব—কাবুলী হিং·····"
দীনু রক্ষিত হাত দুইটা একধার যুক্ত করিয়া তখনই আবার তফাতে সরাইয়া লইয়া বলিল,—"মাফ করো আগা সায়েব, হাম এ ফ্যাসাদমে নেহি হ্যায়, মাফ করো। একঠো বন্দা দেগা ওইসে বাপকা কেয়া নাম থা ভুল যায়গা। কাল আদালতমে কেস্ হ্যায়, উকিল পরলা ওই নামই পুছেগা।"
কাবুলী যেন হঠাৎ মতলব ঠাহর করিয়াছে এইভাবে বলিল—"বাবুজী এক বাৎ শুনো।"

দীনু রক্ষিত বলিল—"কহো না আগা সায়েব—আজকে তো শোনবারই পালা বাবা—কান তো হাট—অধীর করে বসে আছি।"

কাবুলী বলিল—"বরদাস্ত নৈ ওতা হ্যায় বাবুজী, তুম মনা করণে কা অংরেজী বোলা—হাম খুদ কয়েগা গুরু-রা কো।"

"মানা করবার ইংরেজী আমায় বলে দিতে হবে?" চাদরের অভ্যন্তর হইতে দেখিতেছি দীনু রক্ষিতের ঠোঁটের কোন, নাকের ডগা, চোখের প্রান্ত যেন শান দেওয়া ছুরির মতো তীক্ষ্ন হইয়া উঠিতেছে; একবার বলিল—"হামকো ই ফাসদমে কেঁও ঘিঁচতা হ্যায় আগা সাহেব? গরীব বাঙালী, পাঁচটা কাচ্চাবাচ্চা হ্যায় ঘরমে।"

"নেই বাবু বোলো, হিং দেগা, আচ্ছা হিং, কবুলী হিং।"

মনে হইল দীনু রক্ষিতের যে চোখটা আমার দিকে ছিল তাহার দৃষ্টিটা যেন খুব সূক্ষ্মভাবে আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, এদিককার অধরপ্রান্তও ঈষৎ কুঞ্চিত। বলিল—"বেশ বাবা, যথা অভিরুচী, রাম মারণে সে ভি মরেগা রাবণ মারণে সে ভি মরেগা—যায়সা হুকুম আগা সায়েব। শুনো।"

সংগীত যা চলিয়াছে তাহার পর্দা ভেদ করিয়া কোন আওয়াজই উঠিবার উপায় নাই, তবু দীনু রক্ষিত কাবুলীকে একটু নিজের দিকে টানিয়া লইয়া একটু নীচু গলায় বলিল—"বোলো ডোণ্ট্ সিং, ইউ রাস্কেল।"

কাবুলী কানটা আরও আগাইয়া আনিয়া প্রশ্ন করিল—

"কেয়া?"

"বোলো—ডোণ্ট"

"ডুণ্ট।"

"সিং"

"সিং।"

"ইউ"

"ইউ।"

"ডোণ্ট সিং ইউ।"

"ডুণ্ট সিং ইউ।"

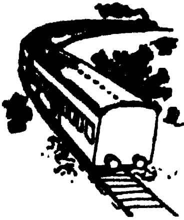
ফিচলেমি বুদ্ধিতে হাসি চাপা দুষ্কর হইয়া উঠায় পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

"ডোণ্ট-সিং-ইউ-রাস্কেল।"

ডুণ্ট-সিং-ইউ-রাস্কেল।"

আরও দুই তিনবার মক্স করিয়া লইয়া কাবুলী গোরার পানে গলা বাড়াইয়া বলিল—"ডুণ্ট্—ডুণ্ট্..." তাহার পরই হঠাৎ গলাটা টানিয়া লইয়া সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করিল—"বাবু সা'ব, রাস্কেল মানে কেয়া হ্যায়?" আমারও সন্দেহ ছিল অতি লোভে দীনু রক্ষিত একটা বোধ হয় ভুল করিয়া ফেলিতেছে। বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য

করিয়াই ছোট্ট করিয়া একবার "এই মজিয়েছে?" বলিয়া দীনু রক্ষিত বলিল—"রাস্কেল মানে—রাসকেল মানে—মিলিটারী টারম্ হ্যায় আগা সায়েব।"
বুঝিলাম একটা গাল ভরা বড় কথায় চাপা দিয়া চিন্তার জন্য সময় লইতেছে। কাবুলী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"মিলটিরী —মিলটিরী…কেয়া কহা বাবুজী?"



"মিলিটারী টারম্—ফৌজী লবোজ"
কাবুলী একটু কি ভাবিল। মনে হইল এই সাধারণ ইংরেজী গালাগালটা কোথায় শুনিয়াছে, বোধ হয় ব্যবহারের প্রসঙ্গটার সঙ্গে দীনু রক্ষিতের "ফৌজী লবোজ"-এর একটা অর্থগত সাদৃশ্য দেখিয়া আর কিছু প্রশ্ন করিলনা। কিন্তু সন্দেহটা ওর ঘুচিল না। আবার একটু চুপ করিয়া ভাবিল, তাহার পর অল্প হাসিয়া বলিল—"বুল্ গিয়া বাবু সাব, তুম বোলো, তুম বোলো। আচ্ছা, উ বাবু জানতা হ্যায়!', না দেখিলেও বুঝিতেছি আমায় লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন। দীনু রক্ষিতই বাঁচাইল, বলিল—"উ বাবু উকিল হ্যায়, কানুন জানতা হ্যায়, জাগানেসে…"
—বোধ হয় তাতে হাতকড়ির ইসারা করিল, কাবুলী—তাড়াতাড়ি বলিল, "চোর দেও বাবু, তুম বোলো, আচ্ছা হিং দেগা…
ওদিকে সেই এক ভাব, গানের না আছে বিরতি, না আছে কিছু।
কাবুলী বোধ হয় হিং বাহির করিবার জন্য উঠিতেছিল, দীনু রক্ষিত তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ঠিক এই সময় হঠাৎ গোরাটাও গানটা বন্ধ করিল। একটা যেন অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে, কাবুলী এইভাবে তাহার পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে আবার বেঞ্চে বসিয়া পড়িল, একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"খোদা খয়ের করে।
গোরাটার গানে বিতৃষ্ণা আসে নাই, অন্য তৃষ্ণা বাড়িয়াছে মাত্র। টলিতে টলিতে উঠিয়া খালি বোতলটা জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল, এবং তাহার পর ন্যাপস্যাক্ হইতে একটা নতুন বোতল বাহির করিয়া ছিপিটা খুলিয়া ঘট্ ঘট্ করিয়া খানিকটা সুরা ভিতরে চালান করিয়া দিল। বোতলটা বাড়াইয়া একবার দীনু রক্ষিত আর একবার কাবুলীকে কি বলিল, তাহার পর টেবিলের উপর চাপিয়া বসাইয়া দিয়া নূতন উদ্যমে গান ধরিল।
কাবুলী ললাটে করাঘাত হানিয়া বলিল—"ইয়া আল্লা। পিনু সয়তান সওয়ার উয়া!

নিতান্ত করুণ এবং অসহায় ভাবে দীনু রক্ষিতকে বলিল—"বাবুজী, মানা করো, খুদা আচ্ছা করেগা।"

দেখিতেছি দীনু রক্ষিতের মুখ-চোখ আবার তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। মাথাটা ঝিম ঝিম করিতেছে, কাবুলী না থাকিলে গানের মধ্যেও বোধ হয় অল্প অল্প অভ্যস্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম, এ এক একটা ফ্যাচাং তুলিয়া ঔৎসুক্য বাড়াইয়া যেন আরও বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। দীনু রক্ষিত করুক কিছু একটা, বাঁচি। কাবুলী আবার তাগাদা দিল—"বাবুজী, মানা, করো…দীনু রক্ষিত ভাল করিয়া শুনিবার ভঙ্গিতে ডান কানের পিছনে হাতটা দিয়া গোরার পানে একটু গলাটা বাড়াইয়া দিল, তাহার পর হাতটা সরাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল—"নেই আগা সাহেব, নেই হোগা, গান বদল দিয়া।"

অত্যন্ত কৌতূহল হইল। বোধ হয় খাজা স্কচ;—আমি তো তখন থেকে গানের এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না, আর সুরতাণ্ডবও তো সেইরূপই চলিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। তবে দীনু রক্ষিতের জ্ঞান এ বিষয়ে এতই সূক্ষ্ম নাকি—ভাষা, সুর দুই বিষয়েই! আশ্চর্য্য ব্যাপার. কিন্তু আমার কেমন যেন বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গেছে আশ্চর্য্য হইলেও দীনু রক্ষিতের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

খুব কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম গানটা। অনেকক্ষণ শুনিয়া কোনো মতে দুইটা কথা উদ্ধার করিতে পারিলাম—এনিমিজ ব্লাড (enemy's blood)। একে মদের গলা, তার ভাষাটাও খুব সম্ভব পুরোপুরী ইংরেজী নয়,—আর একটা কথাও ধরিতে পারিলাম না।

কাবুলী ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—"সয়তান কা গীত গাতা হ্যায় বাবু, মানা করো।"

আমার ঢাকা মুখের উপর চকিত দৃষ্টি ফেলিয়া দীনু রক্ষিত কাবুলীর পানে চাহিয়া চলিল—"ও ইস্‌গান নেই থামাবে গা আগা সাহেব, হাজার কহ্‌ণে—সে ভি নেই থামাবে গা এ উনকা দিল্‌কা গান হ্যায়।"

কাবুলী বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"দিলকা?" দীনু রক্ষিতের মুখটা একটু কুটিল অথচ সরস হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মাথাটা নাড়িয়া নিজের বুকের মাঝখানটিতে টোকা মারিয়া বলিল—"হ্যা, দিলকা ও আপনা প্রেমিককা গীত গাতা হ্যায় আগা সাহেব, রূপেয়া দেনেসে ভোিম্ব নেই ছোড়েগা।" হাসির সঙ্গে চোখটাও একটু নাচাইয়া দিল। কাবুলী, বুক দেখাইয়া এবং বলার ভঙ্গিতে আন্দাজে বোধ হয় একটু একটু বুঝিয়া থাকিবে; মুখটা একটু যেন কিরকম হইয়া গেল; আবার প্রশ্ন করিল—"কিসকা গীত উদ্‌মে বোলো বাবু।"

আমায় শুনাইবার জন্যই দীনু রক্ষিত বাংলায় বলিল—"স্কচ ভাষাও জানতে হবে' —ভাটপাড়ার শিরোমণি ঠাকুর পেয়েছেন!…"

বুকের মাঝখানটা দেখাইয়াই কাবুলীকে বলিল—"প্রেমিকা—মানে দিলকো আওরাৎ জিসকো বোলতা হ্যায়। জিসকো সাদী করনা চাহতা হ্যায়।"

কাবুলীর মুখে একটা পরিবর্তনের ভাব ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। গানের প্রতি সেই যে আতঙ্কের ভাব ছিল, সেটা ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া মুখটা নরম হইয়া আসিতে লাগিল। একটু পরে দেখিলাম গানের উত্তাল তালে একটু একটু শরীরও দোলাইতেছে। ব্যাপারটা কি হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতেছি এমন সময় চাপ দাড়ি গোঁফের মধ্যে যেন গুনগুন করিয়া গানের শব্দ উঠিল।

দীনু রক্ষিত আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিল—"ঘুমুচ্ছেন?—কালোয়াতির লড়াইটা শুনবেন একবার! ওষুধ ধরেছে।"

কাবুলী গলাটা একটু তুলিবার মুখে থামিয়া গিয়া দীনু রক্ষিতকে কহিল—"বাবুজী, হামবী গীত গায়গা।" দীনু রক্ষিত বলিল—"আপকা মর্জি আগা সাব। বহুৎ মিঠা গলা হ্যায়।"

এবার গলা যে আর এক পর্দা উঠিল, তাহাতেই আঁচ পাইয়া বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু গানে বাধা পড়িল। সুরটা কানে যাইতেই গোরা গান থামাইয়া কাবুলীর মুখের পানে চাহিয়া কট্-কট করিয়া কি খানিকটা বকিয়া গেল, ভাষা না জানিলেও এটুকু আর বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না যে কাবুলীর গানে তাহার প্রবল আপত্তি আছে।...টেবিল হইতে বোতলটা তুলিয়া লইয়া দুই ঘোট পান করিয়া বোতলটা রাখিয়া দিল। তারপর উগ্রভাবে আর একবার কাবুলীটার পানে চাহিয়া লইয়া আবার সংগীতে মনোনিবেশ করিল। এবার Enemy's blood কথা দুটো একটু দ্রুত দ্রুত কানে আসিতে লাগিল।

কাবুলী একটু চুপ করিয়া কি ভাবিল, বোধ হয় বাঙালী বাবুর সামনে গোরার হুমকিতে দমিয়া যাইবার লজ্জায়ই গুন গুন করিয়া এক কলি গাহিল, তাহার পর দীনু রক্ষিতকে বলিল—"বাবুজী' উসকো বি থমনে বোলো।"

দীনু রক্ষিত বলিল—"ভালা বিপদ।...ও নেই থামেগা আগা সাহেব...আপন আওরাৎকো খুব পেয়ার করতা হ্যায়—বোলতা হ্যায়, তোমকো বাস্তে জান দেগা।"

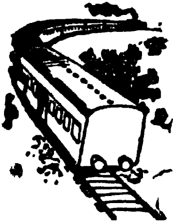
কাবুলী গুম হইয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিল। তাহার পর একটু গা-ঝাড়া দিয়া বলিল—"হামবি জান দেগা বাবুজী।"

দীনু রক্ষিত বলিল—"দেনা রে বাপু তাহলে, এদিকে আমাদের জান দুটো বাঁচে।... তুমবি আপনা আওরাৎ কো পেয়ার করতা হ্যায়?"

"বউৎ পেয়ার করতা হ্যায় বাবুজী, বউৎ-বউৎ।"

"তবে সুরু করো।...ঠাণ্ডা হয়ে যায় কেন?" কাবুলী কিন্তু সুরু না করিয়া আবার চিন্তিতভাবে একটু বসিয়া রহিল, তাহার পর একটু কুণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করিল—"বাবুজী, ইঁয়া গানেসে বড়া বাবু বান দেগা?" সেই আইনের ভয়, বড়বাবু অর্থাৎ

এখানে গাইলে স্টেশন মাষ্টার হাতে হাত কড়ি লাগাইয়া দিবে। দীনু রক্ষিত কি একটু ভাবিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"কোন ক্লাসকা টিকিট হ্যায় ?"
"সিকিন্ কিলাস টিকিট বাপুজী—গাড়িসে বহুৎ বিড় হ্যায়।"—কাবুলী তাহার বড় বটুয়ার ফাঁস খুলিয়া একটা ছোট কৌটা বাহির করিল, এবং তাহার ভিতর হইতে একটা সবুজ রঙের টিকিট বাহির করিয়া দীনু রক্ষিতের হাতে দিল। দীনু উৎসাহিত ভাবে বলিল—"বাঃ, ঠিকই তো সিকিন কিলাস হ্যায়, যেত্তা খুশী গাও ; নাচেগা ?"
"নেই বাপুজী, খালি গায়েগা।"
"ফাষ্ট কিলাস টিকিট রহনেসে নাচনে বি দেতা ; যেত্তা খুশী গাও। ঘুমুলেন নাকি ? আর বিশেষ বিলম্ব নেই, আরম্ভ হোল ব'লে।"



কাবুলী দাড়ির উপর হাত দুইটা কয়েকবার বেশ ভালো করিয়া টানিয়া লইল, তাহার পরে একেবারেই যে পর্দায় আরম্ভ করিল, মনে হইল দু-এক লাইন গাহিয়াই বোধ হয় গোরাকে পিছনে ফেলিয়া যাইবে।
"হোয়াট্স্যাট্ !!" গোছের একটা প্রশ্নের সঙ্গে গোরাটা একেবারে চেয়ার ছাড়িয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর একতোড়ে কি কতকগুলো বলিয়া গিয়া ঘুসি বাগাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।
আর ঘুমের ভাণ করা বৃথা, সতর্ক থাকা দরকার, কে জানে শ্রাদ্ধ কতদূর গড়াইবে ; বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া মুক্ত দৃষ্টিতে ব্যাপারটা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কাবুলীর—সান্নিধ্য আর নিরাপদ নয় বুঝিয়া দীনু রক্ষিত গলা খাঁকারি দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল, প্রবেশ করিয়া আর বেঞ্চে না বসিয়া আমার পাশে আসিয়া বসিল—"অনুমতি দেন তো একটু বসি বিছানাটায় ; ওদিকটা আর নিরাপদ নয়।" বলিলাম "বসুন। কিন্তু মহা এক ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসেছেন যে।" "এক্ষুণি মিটে যাবে, দেখুন না দুটোবেই সরাচ্ছি।" গোরাটা দৃষ্টি উগ্রতর করিয়া কাবুলীর পাণে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, কাবুলী চুপ করিয়াছে, কিন্তু ভয়ের কোন ভাব নাই। গোরাটা একটু পরে আসিয়া নিজের জায়গায় বসিয়া বোতলটাকে আর একটু খালি করিল, বোধ হয় রসভঙ্গ হওয়ার জন্য আরও একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর কাবুলীর পাণে একটা 'রণং দেহি'-দৃষ্টি হানিয়া আবার গলায় একটা ঝাঁকানি দিয়া শুরু করিয়া দিল।

কাবুলী কয়েকবার গোরার পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দীনু রক্ষিতকে ডাকিয়া বেঞ্চটা দেখাইয়া বলিল—"বাবুজী, ইঁয়া আয়কে বৈঠো।"

গোরা গাহিয়া চলিয়াছে, ঘরে আর কি হইতেছে না হইতেছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

দীনু রক্ষিত ঠোঁট বাঁকাইয়া একটু হাসিয়া আমায় বলিল—"যাই আর একটু তাইয়ে দিয়ে আসি ঠিক আইনের কথা ভাবছে, দেখে নেবেন।"

বলিলাম—"আহা কেন বেচারিকে…"

দীনু রক্ষিত উঠিতে উঠিতেই বলিল—"আপনাকে বসতে দিলে না, দেখিনি জ্বালের দরজা দিয়ে?

সব সমান মশাই। এখন দায়ে পড়েছে তাই—বাবুজী—বাবুজী।"

পাশে গিয়া বসিতে কাবুলী প্রশ্ন করিল—"বড়বাবু নেই বানেগা?—ঠিক জানতা?"

দীনু রক্ষিত আড় চোখে আমার পানে একটু চাহিয়া একটা চোখ কুঞ্চিত করিল। উত্তর করিল,—"ওই বাৎতো উকীল বাবুকো পুছনে গেয়া, বাবুভি বোলতা বড়াবাবু কুছ নেই কর সকতা। সিকিন্ কিলাস টিকিট হ্যায়।" "গুরু-রা কা কিৎনারোজকা আওরাৎ হ্যায় বাবুজী?" ধমকে কাবুলীকে ঠাণ্ডা করিয়া গোরা একেবারে চোখ বুঝিয়া কণ্ঠস্বরকে মুক্তি দিয়া দিয়াছে। একটু মন দিয়া শুনিবার ভাণ করিয়া দীনু রক্ষিত জানাইল গোরা বলিতেছে—হে প্রিয়তমে তোমায় মাত্র এক মুহূর্তের জন্য দেখিয়াছিলাম, তাহাতেই পাগল হইয়াই আছি; আমি চিরদিন তোমায় গান গাহিয়া কাটাইব, কোনও দুষমন আমায় থামাইতে পারিবে না। আমি তোমায় অত্যন্ত ভালবাসি।

কাবুলী সবটা শুনিয়া বলিল—"কোই দুষমন নেহি থামা সাকেগা?"

দীনু রক্ষিত জানাইল—"ওই বাৎ তো কহতা হ্যায় গোরা সায়েব।"

কাবুলী হাতের দুইটা আস্তিন গুটাইল, উগ্রভাবে গোরার পানে একবার চাহিয়া লইয়া জানাইল সেও নিজের আওয়াৎকে অত্যন্ত ভালবাসে, তাহাকেও গান গাওয়া হইতে কোন দুষমন নিরস্ত করিতে পারিবে না। গুরু-রার আওরাৎ তো মাত্র এক মুহূর্তের দেখা। সে তাহার দিলকা আওরাতের সঙ্গে আজ নাগাড়ে তেইত্রিশ বৎসর ঘর করিতেছে—নয় ছেলে, তিন মেয়ে—বড় ছেলের নাম ইউসুফ, মেজোর নাম ইসমাইল, তাহার পর সিকন্দর, রসুল, ইব্রাহিম, লতিফ, ইয়ার খাঁ…

বলিতে বলিতে কাবুলী উত্তেজনায় রাঙা হইয়া একসময় ছেলের নামের তালিকা বন্ধ করিয়া সাহেবের পানে চাহিয়া সপ্তমে গলা ছাড়িয়া দিল।

তাহার পরের ইতিহাসটা খুব সংক্ষিপ্ত, ভাবে সংক্ষিপ্ত হইলেও সামান্য নয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েকটা দিনের ব্যাপার যেন কে ঠাসিয়া বসাইয়া দিল।…গলা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোরাটা উগ্র দৃষ্টিতে একবার ফিরিয়া চাহিয়াই—চেয়ারটা লাথি দিয়া ঠেলিয়া একলাফে কাবুলীর ঘাড়ে গিয়া পড়িল, তাহার পর হুঙ্কার, লুটোপুটী কিল

চড়··বেঞ্চ উল্টাইয়া দুইজনে চেয়ারের উপর আসিয়া পড়িল, সেটাকে হাড়গোড় ভাঙ্গা 'দ' করিয়া দিয়া টেবিলটার উপর।—সেটার দুইটা পায়া ভাঙ্গিয়া দুইদিকে ছিটকাইয়া পড়িল···আবার বেঞ্চের উপর আবার টেবিল—কাপড়ের গাঁটরি ছিঁড়িয়া—কাপড় ছত্রাকার হইয়া গেছে, তাহার মধ্যেই এ ওকে জড়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে··· আবার ওঠা, আবার পড়া....বম্বে বায়োস্কোপের বাহিরে সেরকম দৃশ্য দেখিয়াছি বলে মনে পড়ে না। দুই জনে গিয়া এককোণে জড়ো হইয়াছি। স্টেশনে অল্প লোক, কিন্তু সবাই জড়ো হইয়া গিয়াছে। সবাই সবাইকে গিয়া থামাইতে বলিতেছে কিন্তু কেহ এক পা অগ্রসর হইতে সাহস করিতেছে না।

সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা—ওর মধ্যে কাবুলীর গান ঠিক আছে,—একেবারে অভঙ্গ থাকা অবশ্য সম্ভব নয়, তবে যখনই একটু ফাঁক পাইতেছে, কাবুলী এক লাইন আধ লাইন, দুটো কথা—যা পারিতেছে তাহার মধ্যেই গজলের সুর ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।···সব মিলাইয়া এক অদ্ভুত কাণ্ড!

এসব ব্যাপারে সময়ের আন্দাজ রাখা কঠিন, তবে মনে হইল, যেন মিনিট সাতেক পরে দুইজনে ক্ষান্ত হইল, গোরাটা ভাঙ্গা কেদারার পাশে মাথা টিপিয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল—সর্বাঙ্গে কাটা ছড়ার দাগ, মাথায় বোধহয় আরও গুরুতর কিছু; কাবুলী কাপড়ের গাঁটরির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহার উপরই মাথা চাপিয়া একটা অব্যক্ত আওয়াজ করিতেছে—গানের সুরও আছে কিনা ঠিক বোঝা যাইতেছে না।

এই সময় মেন লাইনের একটা গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। স্টেশনের বড়বাবু পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে; দীনু রক্ষিত বলিল—"দেখছেন কি মশাই, এই গাড়ীতে দুজনকে বড় স্টেশনে চালান করে দিন···ফাস্ট এড (First aid) দরকার···"

বিছানা পাতিতেছি, গাড়ী চলিয়া গেলে দীনু রক্ষিত আসিয়া আমার পাশেই বিছানার দড়ি খুলিতে খুলিতে বলিল—"যাক্, সব ঠাণ্ডা।"

বলিলাম—"বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেল কিন্তু।"

দীনু রক্ষিত বিছানা খোলা বন্ধ রাখিয়া বিস্মিতভাবে ঘুরিয়া আমার পানে চাহিল, বলিল,—"বাড়াবাড়ি কি মশাই, ও টুকুও হবে না?—কেউ তো আর পিলেয় ভুগছে না মশাই।···গাড়ি ছাড়ল,—দেখলাম দুজনে একটু হাসতে হাসতে শেকহ্যাণ্ড করছে,—গোরার ডান চোখ ফোলা, আগা সাহেবের বাঁ চোক; প্লাটফর্‌ম্ ছাড়বার আগেই দুজনে হাতে হাত রেখে গান শুরু করে দিল।···আসুন দুর্গা শ্রীহরি বলে শুয়ে পড়া যাক।"



নিকটেই ছিল

ই, বি, রেলের নর্দার্ন সেক্সনে যাঁহাদের যাতায়াত আছে, তাঁহারা গাড়ির দেওয়ালে আঁটা একটি এনামেল প্লেটের উপর নিম্নলিখিত সতর্কবাণীটি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—

"নিজে টিকিট কেন,—মালের উপর নজর রাখ ; জুয়াচোর চোর ও পকেটমার নিকটেই আছে—

এই সতর্ক বাণী সম্বন্ধে সতর্ক করাই এই কাহিনীর উদ্দেশ্য। মনে রাখিতে হইবে বাণীটি বেদের মন্ত্রের-মত অপৌরুষের নয় ; সুতরাং এর ভাষার চটকে ঘাবড়াইয়া গিয়া মন্তব্যগুলি একটু ঢিলা—ঢালা ভাবে লইলে ক্ষতি নাই।—না লইলে ক্ষতি আছে কিনা সেই কথাই হইতেছে—

গাড়িখানি পশ্চিমে চলিয়াছে, বাঙ্গালী আর পশ্চিমা মিলিয়া বেশ ভীড়। রাত্রিকাল, কার্ত্তিক মাসের শেষাশেষি ; অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে। যে কামরাটার কথা হইতেছে তাহাতে পশ্চিমাদের সংখ্যাই বেশি। বাড়িমুখো যাত্রা, তাহারা সব স্ফূর্ত্তিতে'ই চলিয়াছে, ভজন গাহিতে গাহিতে পরস্পরের পরিচয় লইতে লইতে, স্বদেশের গুণকীর্ত্তন এবং বাংলা মুলুকের মুণ্ডপাত করিতে করিতে। একধারে ঘেঁসিয়া কিছু বাঙ্গালী যাত্রী। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বেশ বোঝা যায়, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের ভাবটা বড়ই অপ্রসন্ন আর বড়ই সন্ত্রস্ত,—যেন প্রতি মুহূর্তে'ই সবাই একটা মারাত্মক রকম বিপদের আশঙ্কা করিতেছে। সন্ত্রস্ত বটে ; কিন্তু ত্রাসের ভাবটা মুখ-চোখে ফুটিয়াছে মাত্র, তাহা ব্যতীত সবাই স্থির, অসহায়ভাবে স্থির। জুতার মধ্যে সযত্নে পা দুটি প্রবেশ করাইয়া দিয়া, কোলের মধ্যে পুঁটলি সামলাইয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। যা একটু নড়াচড়া করিতেছে তা গায়ের কাপড়টা একটু গুছাইয়া লওয়া বা নিজের নিজের পকেট কিম্বা টাঁকটা দেখিয়া লওয়ার জন্য। উপরের বাঙ্কে

বাহার ট্রাংক, কি, বড় কোন বোঝা আছে, সে মাঝে মাঝে উঠিয়া একবার হাত বুলাইয়া দেখিয়া লইয়া আবার সামলাইয়া সুমলাইয়া বসিতেছে। কাহারও সহিত কাহারও কথা নাই।

বলা বাহুল্য ইহারা সকলেই লেখা পড়া জানা এবং এনামেল ফলকের সতর্কবাণীটি পাঠ করিয়াছে,—"জুয়াচোর, চোর ও পকেটমার নিকটেই আছে।"

রংপুরে এই কামরায় দুই প্রান্তের দরজা দিয়া দুই জন যাত্রী উঠিল। যেদিকে বাঙ্গালীরা ছিল, সেই দিকে উঠিল একজন পশ্চিমা কুলি হলদে কাপড় পরা, গোলাপী গেঞ্জির উপর হাঁটু পর্যন্ত কালো মলমলের পাঞ্জাবী, পায়ে ফুলকাটা নূতন পাম্পসু—এখনও আয়ত্ত হয় নাই—গোড়ালির পেছনে সাদা ন্যাকড়ার একখানি করিয়া গোঁজ দেওয়া। মাথায় একটা রঙচঙে সস্তা ট্রাংক বগলে মাদুর। মুলুক যাইতেছে।

বাঙ্গালীরা একযোগে খাঁ-খাঁ করিয়া উঠিল।

"ইধার কেন আয়া, ওদিকে তো আমার জায়গা পড়া হ্যায়"…"যাঁ না বাপু নিজের দলে, ওদিকে জ্বালাতে এলি কেন?"…হিঁয়া ভদ্রলোকের মাথা পর বসেগা?

"যাতা হ্যায় বাবু, যাতা হ্যায়" বলিয়া লোকটা সামনের দিকে চলিয়া গেল। যেদিকে পশ্চিমা দল, সেদিকে একজন বাঙ্গালী বৃদ্ধ উঠিলেন। রোগা লম্বা একমুখ ঘন অবিন্যস্ত দাড়ি;—শীর্ণ মুখখানির সহিত এমন বেমানান যে, মনে হয় যেন পরচুলা। হাতে একটা তালা আঁটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ।

উঠিয়াই প্ল্যাটফর্মের দিকে গলা বাড়াইয়া বলিলেন—"তাহ'লে আসি বেহাই মশাই, আর বেশিদিন থাকতে পারলাম না বলে দুঃখ করবেন না; আমি গিয়েই সোনাটুকু সেকরাকে দিয়ে দিচ্ছি। বাণির টাকাটা তা'হলে শীগ্‌গির…

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। মুখটা গাড়ির ভিতর টানিয়া লইয়া বিড়বিড় করিয়া বলিলেন—"চামার, তাড়া দিয়ে দিয়ে এত জোরে ছক্করটা—দৌড় করালে যে হাড় কখানা যেন চুর হ'য়ে গেছে। আর একটা দিন না হয় ফেলই করতাম গাড়ি রে বাপু…

আহা, ঘোড়া দুটো…শ্রীকৃষ্ণের জীব!—

আ—মর! একেবারে খোট্টার পালের মধ্যে ঠেলে তুললে? জানি আজ যাত্রা খারাপ!…এই, কোথায় যাবি?…মাথায় তেল চাপড়েছে দেখ না!"

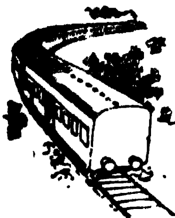
লোকটা মনোযোগ সহকারে একটা পোঁটলার গেরো খুলিতেছিল। খুলিয়া একটা মোটা চাটুর আকারের রুটির গোছা হইতে একখানা তুলিয়া লইল, পাশ থেকে খানিকটা তরকারি লইল, তাহার পর পুঁটুলিটা আবার সযত্নে বাঁধিয়া, সরাইয়া রাখিয়া খালি জায়গাটুক হইতে একটা তরকারির টুকরা ঝাড়িয়া দিয়া বলিল—"আই, বৈঁঠি বুড়া বাবা; আপনি বরাহ্মন্‌ দেওতা আছে? পাঁও লাগি।"

"নিপাত যাও, বেটা ম্লেচ্ছ কোথাকার"—অর্ধস্ফুট স্বরে এই আশীর্বাদ করিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া গেলেন।

চারিদিকেই প্রায় একই অবস্থা। জল, কাদা, নোংরা পোঁটলাপুঁটলি এবং ততোধিক নোংরা মানুষ; ছেলেবুড়ো স্ত্রী-পুরুষ সব ধরণের—যেন একরাশ চুন-সুরখি-খোয়া-মাখান মানুষ—কংক্রিটের চাপ…বেহাইকে গালাগালি দিতে দিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন—"ছি ছি, এমন চামারের বাড়ি থেকেও মেয়ে আনে! চোখের একটু পরদা নেই! একে তো মুখ ফুটিয়ে বলিয়ে নিলি তবে একখানা টিকিট করে দিলি;—তা' কোন একটা ইণ্টের ক্লাসের টিকিটই বা কিনে আনতে পারলি প্রাণ-ধরে? ত'হলে তো আর এরকম যন্ত্রণা হয় না…চামার আর বলেছে কেন?…

বাঙালীদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল; অনেকটা নিজের সংসারে ফিরিয়া আসার মত। একবার চারিদিকটা দেখিয়া লইয়া আত্মীয়তা করিয়া বলিলেন, "যাক্, সব স্বজাতি দেখছি, বুড়োকে একটু জায়গা করে দিতে হবে; উঃ বেটারা যেন নরককুণ্ড করে রেখেছে ওদিকটা!"

আত্মীয়তার কোন প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল না। স্বজাতিরা প্রায় সকলেই যেন কাঠের পুতুলের মতো অনড় হইয়া বসিয়াছিল তেমনই রহিল; শুধু এইটুকু বোঝা গেল, বৃদ্ধের দাড়ির দিকে যেন সবার একটু বেশী কৌতুহল।



অতি শীর্ণ মুখে অতি সুস্পষ্ট দাড়িটি প্রায়ই লোকের নজরে পড়ে। একটু অপ্রতিভ হইয়া পোঁটলা আর ব্যাগটা বাঙ্কের উপর রাখিয়া দিয়া ডান দিকের বেঞ্চে বসিয়া পড়িলেন। বাম পাশের যাত্রীটি মোটাশোটা গোছের মাঝবয়সী লোক তাহার একটা টিনের সুটকেশ, একটা ছোট বিছানা আর একটা মুখ বাঁধা হাড়ি—বাম হস্তে সামলাইয়া বসিয়া আছেন, ডান হস্তটি পকেটের মধ্যে।

দক্ষিণ পাশে একজন মুসলমান, কালো সুচালো দাড়ি, মাথায় ফুলকাটা একটা টুপি। তাঁহার পার্শে একজন বৈষ্ণব, গায়ে নামাবলি, কপালে একটি তিলক, নাকে রসকলি। বয়স ৫০।৫৫ হইবে।

নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া মনটা প্রফুল্ল হইল, এবং আবার একটু আলাপ জমাইবার ইচ্ছা হইল; বিশেষ করে বন্ধ ঘরে ধুঁয়ার মতো বেহাই বাড়ির কটু ইতিহাসটা পেটের মধ্যে আটক থাকিয়া যেন দম বন্ধ করিয়া দিতেছে। তাহাকে একটু মুক্তি দেওয়া চাই-ই। বাড়ি পর্যন্ত অপেক্ষা করা,—সে অনেক দেরি। একটু গলাটা ঝাড়িয়া কাহাকেও না

লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"খোট্টাদের জ্বালায় আর বাড়িটায় চড়বার জো রইল না।…টোপটা কেহই গিলিল না।

আর একবার চেষ্টা করিলেন। ডাইনে বাঁয়ে একবার অনির্দিষ্টভাবে চোখ বুলাইয়া লইলেন, তাহার পর নিজের মন্তব্য সম্বন্ধে নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ থাকিলেও বলিলেন—"যাহোক্, এদিকটা সবাই ভদ্রলোক দেখছি।" কোন উত্তর নাই। তখন মরিয়া হইয়া সোজাসুজি পাশের মুসলমান যাত্রিটিকে প্রশ্ন করিলেন "মশাই কোথায় যাবেন?"

ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া একটু খিঁচাইয়া উত্তর করিলেন,—"যেখানকার টিকিট কিনেছি সেখানেই যাব মশাই, আপনি স্থির হয়ে বসেন তো। আপনি কোথায় যাবেন বলুন দেখি।"

"ডালিমগাঁও হ'য়ে…"

"কি করেন -"—অযথা একটু জোর দিয়েই করলেন প্রশ্নটা ভদ্রলোক। "কিছু চাষবাস আছে, আর কয়েক ঘর…"

"কি ছেলেপিলে? কোথায় থেকে আসছেন? —কত বয়েস? ব্রাহ্মণ না কায়েৎ? এত রোগা কেন? রোগা তো অমন বেহিরের দাড়ি কেন?—বলিতে বলিতে পরিবর্ধমান রাগের চোটে সোজা হইয়া রুখিয়া বসিয়া বলিলেন আসুন দেন উত্তর কত দেবেন।"

বৃদ্ধ একেবারে কিম্ভুতকিমাকার হইয়া গেলেন। বিনীতভাবে বলিলেন—"হয়েছে, আপনি স্থির হয়ে বসুন। অত চটবার কি আছে?"

"আজ্ঞে না; আর অত খাতিরে কাজ নেই, বোঝা গেছে। গাড়িতে ভাব করে স্থির হয়ে বসার ফল হাতে হাতে পাওয়া গেছে,—একমাসও হয় নি। এই নিন আপনাদের গাড়ি; আপনারাই ভাল করে বসুন। এই টুকু আসতে তিনবার গাড়ির কামরা বদলাতে হ'ল, নয় আরও একবার সই।"

দুই পকেটে হাত দিয়া দড়াইয়া উঠিলেন। একটু পরেই গাড়ি ষ্টেশনে পেঁছিল; বৃদ্ধের প্রতি এবং পাশের বৈষ্ণবটির প্রতি তীব্র কটাক্ষ হানিতে হানিতে নামিয়া গেলেন।

বৃদ্ধ বাম পাশের মোটা লোকটিকে প্রশ্ন করিলেন—"পাগল নাকি?"

তিনি কোলের জিনিসপত্র এক ঝোঁক সামালাইয়া লইয়া বৃদ্ধের দিকে আড়ে চাহিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, "অবস্থা গতিকে হয়ে উঠেছে।"

"যা বলেছেন, পশ্চিমেদের যা ভীড়, মাথা ঠিক রাখা দুষ্কর।…মশাইয়ের কোথায় যেতে হবে?

ভদ্রলোক অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিলেন, "এই কাছেই।"

"তবে তো কর্মভোগ শেষ হয়ে এসেছে, আমার এখনও মেয়াদ অনেকক্ষণ। তা,

জিনিষপত্রগুলো কোল থেকে নামিয়ে পাশে রেখে দিন না। কষ্ট হচ্ছে মিছিমিছি। জায়গা তো রয়েছে, আমি আর একটু নয় সরে বসছি। নিন।"

কোলের জিনিসগুলি নামান দূরে থাকুক।

লোকটি গামছায় বাঁধা পুঁটুলিটি পর্যন্ত কোলে তুলিয়া লইলেন। ভদ্রতার উত্তর স্বরূপ বৃদ্ধের দিকে একটি সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি হানিলেন মাত্র।

বৃদ্ধেরও রাগটা সপ্তমে চড়িয়া গেল। আচ্ছা লোকদের পাল্লায় পড়া গেছে তো, সোজা কথাটা বুঝিবে না কেহ।···শরীরে একটা ছোট রকম ঝাঁকানি দিয়া তিনিও লোকটার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিলেন, ওদিকে যেমন ইসারায় অপমান এদিকেও তার যোগ্য উত্তর।

ঝোঁকের উপর উল্টাইতেই বৈষ্ণব বাবাজীর গায়ে একটু পা ঠেকিয়ে গেল। গায়ে করস্পর্শ করিতে যাইতেই, তিনি হাতটা দুইহাতে ধরিয়া সম্মিত মিনতিস্বরে বলিলেন, —থাক্, থাক্ সবই শ্রীকৃষ্ণ থাক্···কোথা থেকে আগমন হচ্ছে মশায়ের?

[২]

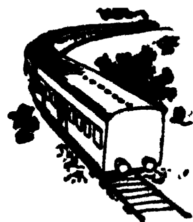
মরুপ্রান্তর ঘুরিয়া এ যেন ওয়েসিস। সুধু এক সঙ্গে এতগুলি কথা নয়; বলিবার ভঙ্গিতেও এমন একটি বৈষ্ণবোচিত মধুর গদগদ ভাব যে, সমস্ত শরীরটি যেন জুড়াইয়া গেল। বৃদ্ধদায়ে—খালাস গোছের একটা নমস্কার করিতে যাইতেছিলেন মাত্র, বাধা পাইয়া—পরম ভক্তি সহকারে মাথা নোয়াইয়া বলিলেন, "প্রণাম হই বাবাজী, যাক, রামা-শ্যামার কাছে তাড়া খেয়ে সাধুসঙ্গ হল, পরম ভাগ্য।"—শেষের কথাগুলি, একটু আগাইয়া আসিয়া অপেক্ষাকৃত নীচু গলায় বলিলেন।

বাবাজী মৃদু হাসিয়া বিনয়ভাবে কলিলেন—কিছু না, সকলেই সাধু সবার অন্তরেই তিনি বিরাজ করছেন, শুধু বিভিন্ন ভাবের—লীলা। তিনি লীলাময়, তিনি ভাবময়, তাঁর ভাবের কি অন্ত আছে? অনুরাগ, বিরাগ···"

বৃদ্ধের এসব তত্ত্ব কথার দিকে তেমন কান ছিল না, ভাবিতেছিলেন,—এমন বেয়াড়ারকম সমদর্শী লোকের কাছে কি করিয়া বেহাই-বাড়ির কুৎসাটা উপস্থিত করিবেন। বলিলেন, "ঠিক ঠিক, একা রাগই প্রকাশ রকম পড়ে রয়েছে! রাধে গোবিন্দ···তা' বৈকি, সবাই হ'ল শ্রীকৃষ্ণের জীব, তাঁর লীলার আধার···হ্যাঁ, শ্রীকৃষ্ণের জীবের কথায় আমার বেহাই-বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল, সেইখান থেকেই আসা হচ্ছে কিনা,—মশায়, আহা-হা-হা। হাড় জিরজিরে দুটি ঘোড়া—বেহাইকে যত বলছি-বেহাই মশাই, গাড়োয়ানকে বারণ করুন—আহা, শ্রীকৃষ্ণের জীব—না হয় আর একটা দিন ফেলই করলাম গাড়ি—ততই গলা বাড়িয়ে গাড়োয়ানটাকে তাগাদা দিচ্ছে গাড়ি ফেল করলে একটি পয়সা পাবি নি; বেহাইকে ভালো মানুষ পেয়ে তোরা যে ক্রমাগতই তাঁর কাজের ক্ষতি করাবি···অথচ আমি সমানে বলে যাচ্ছি—আর একটা

দিন থেকে গেলে আমার কাজের কিছু ক্ষতি হবে না বেহাই মশাই···চণ্ডাল অতবড় ! আপনি দেখেন নি কোথাও···"

বাবাজীর মুখে সেই প্রসন্নতার ভাব। বৃদ্ধ অপ্রতিভভাবে ঝোঁক সামলাইয়া লইয়া একটু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "না আপনি যে সবার অন্তরে তাঁর বিরাজ করার কথা বললেন তা'তো অক্ষরে অক্ষরে সত্যি—লোকটা এমনি খুব সাধু, তবে ব্যাভারে চণ্ডাল। সব আগাগোড়া শুনলে আপনিও বুঝবেন। তা'হলে ছেলের বিয়ের কথাবার্তার সুরু থেকে সব কথা আপনাকে ব'লতে হ'ল।···দাঁড়ান, তবে হয়ে আসি একবার—বহুমূত্র রোগ···আছে কিনা··রাধেশ্যাম, গোবিন্দ বল···এই গায়ের কাপড়টা দয়া ক'রে একটু···" "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি রয়েছি, কোন ভয় নেই, যান।"—অমায়িক হাঁসি নিয়ে কথার পিঠে বললেন বাবাজী।



বাঙ্কের বাক্স ধরিয়া ধরিয়া টলিতে টলিতে চলিলেন। ল্যাভেটরির দরজাটি খুলিতে যাইবেন, বামদিকে দেয়ালে-আঁটা চৌকা একখানি নীল ফলকের উপর দৃষ্টি পড়িল। বিদ্যুতের আলো পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে। দরজার ছিটকিনিতে হাত রাখিয়া চোখ কুঁচকাইয়া বিড়-বিড় করিয়া বলিলেন, "খেলে কচুপোড়া আবার কি বলে ? এর জন্যে আবার আলাদা পয়সা নেবে নাকি ! আগে তো এসব ছিল না ! কি ব'লছে ?—'নিজে টিকিট কেনো···"

"হ্যাঁ তা'হলে হয়েছিল আর কি ! বেহাই অমন ঝানু সহুরে, তার পকেট থেকেই দেড়টা টাকা বেমালুম সরিয়ে নিলে—গেঁয়োই হও, আর সহুরেই হও ; আহ্‌ঘাৎ জানো, আর নাই জানো—নিজে টিকিট কেনো তোর উপদেষের নিকুচি ক'রেছে।"

দরজাটা খুলিয়া ভিতরে একটা পা দিলেন, তাহার পর কি ভাবিয়া আবার পাটা টানিয়া লইয়া পড়িলেন—'মালের উপর নজর রাখ'···তা মন্দ কথা নয়···'জুয়াচোর ও পকেটমার নিকটেই আছে।'

"আ মর !" বলিয়া বৃদ্ধ একরকম হতভম্ব হইয়া পা'টা টানিয়া লইয়াই সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হাতটা যেন নিজে নিজেই খুরিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। একবার সমস্ত গাড়িটা দেখিয়া লইলেন। ফলকের কথা কয়টি একটা মস্ত বড় রহস্যের টীকা—টিপ্পনী করিয়া দিয়া, তাঁহার কাছে সেটাকে একেবারে পরিষ্কার করিয়া দিল—

ও ! তাই সব কথাবার্তা বন্ধ করিয়া যে যাহার নিজের নিজের মাল সামলাইয়া বসিয়া আছে ! তাই সে মুসলমান বেচারি হন্যে কুকুরের মতো ক্রমাগত একগাড়ি হইতে অন্য গাড়ি করিয়া বেড়াইতেছে !—তাই ভক্ত-বিটকেল সাজিয়া তিলক কাটিয়া, ভাব করিয়া অত তত্ত্ব বুঝাইবার ধুম ! বটে-রে !

তাড়াতাড়ি ফিরিলেন। সেখান থেকে একরকম চোখ-মুখ খিঁচাইয়া বাবাজীর দিকে চাহিতে চাহিতে মনে মনে বলিলেন, 'যান আমি রয়েছি, কোন ভয় নেই !···ওরে সাতপুরুষের গুরুঠাউর ! উনি রয়েছেন !

আর এই ছিষ্টিছাড়া কোম্পানীর লোকদেরই বা আক্কেলখানা কি ? 'চোর পকেটমার সব নিকটেই রহিয়াছে। কে তাও হলাম, তাঁদের ত্রিভুবনময় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, খবর দিলেন—তাঁরা সব সভা-আলো ক'রে নিকটেই আছেন। আপনাদের যথা-সর্বস্ব তাঁদের সেবা দিয়ে চরিতার্থ হন !···

নিকটেই আছে তো পাকড়াও কর্ না বাপু···ঢং একটা !"

এক-আধজন প্রশ্ন করিল, "ফিরলেন যে ? কৈ ভেতরে কেউ যায় নি !"

জায়গার কাছে আসিতে বাবাজী একটু অধিকতর বিস্মিত হইয়া প্রশ্নটা করিলেন। বৃদ্ধ উত্তর করিলেন না ; মনে মনে বলিলেন, 'তাই তো, আপনি ভারি বদ লোক তো। আমি এত আশা করে রয়েছি, প্রায় আপনার মুণ্ডপাত ক'রেছিলাম আর আপনি কিনা ফিরে এলেন···বাবাজী না ওর গুষ্ঠির শ্রাদ্ধ।'

ব্যাপারটা কাঁধে তুলিয়া লইলেন উপর হইতে ব্যাগ, পোঁটলা আর খাবারের চাঙারি নামাইয়া নীচে রাখিলেন। ব্যাগের ডালাটা একবার বেশ করিয়া টানিয়া দেখিয়া লইলেন, অতঃপর গুছাইয়া—সুছাইয়া বসিয়া সমস্তগুল একে একে তুলিয়া লইয়া বোধ বৈষ্ণব—বাবাজীর সহিত প্রীতি-ভঙ্গের নোটিশ স্বরূপ শাক্ত দেবীকে টানিয়া আনিয়া, বলিলেন, "কালীতারা বলো মন !"

বাবাজী বেচারি এক বিষম ধাঁধায় পড়িয়া গিয়াছেন। দৃষ্টিশক্তি একটু কম বলিয়া বিজ্ঞাপনটি তাঁহার চোখে পড়ে নাই ; তাই তিনি ঠিক যে বিশ্ব প্রেমিক বৈষ্ণবটি গাড়িতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাই বজায় আছেন। কিন্তু ব্যাপারখানা কি ? গাড়ির যেন ভাবই আলাদা ! একটা মানুষ তবু যদি পাওয়া গেল গাড়িতে এরকম পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারও এই রূপান্তর ! যাক, সবই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা।

একবার জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিলেন না···"মশাই বুঝি তা'হলে এইখানেই নেমে যাবেন ?

বৃদ্ধ একটি বক্র দৃষ্টি হানিলেন মাত্র। মনে মনে বলিলেন "তাইতো গা—আমি কোথায় আশা করে আছি—লম্বা সফরের মধ্যে একবার না একবার দাঁও পাবই, আর, তুমি কিনা নেমে পড়ে রসভঙ্গ করে দিতে চাচ্ছ !···রসিক আমার, নাকে রসকলি চড়িয়েছেন !"

—সমস্ত অবস্থাটি পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন—সব বেটা চোর। সে বেটা গলাবাজি করিয়া সাধুগিরি ফলাইয়া নামিয়া গেল—মস্ত বড় পীর। আসলে এখানে আর সুবিধা হইল না ; গাড়ি গাড়ি রোদ দিয়া বেড়াইতেছেন সেখানে কপাল খুলিয়া যায়! এরা সবাই চিনিয়া ফেলিয়াছে কিনা।···আর, কে কাহাকেই বা চিনিবে?···পাশের ইনিই যে মালের গন্ধমাদন ঘাড়ে করিয়া উর্ধ্বমুখ হইয়া বসিয়া আছেন—ওর মধ্যে তাঁহার নিজের ক'টা কে যানে।

উর্ধ্বমুখ লোকটি ওদিকে অনেক কষ্টে একটা প্রলোভন দমন করিয়া বসিয়া আছে, বুঝি আর রাখা যায় না, ইচ্ছা হইতেছে দিই আর্তকিতে বেটা—বুড়োর দাড়ি ধরিয়া একটা টান—তাহা হইলেই ব্যস, ছদ্মবেশ বাহির হইয়া পড়ে।

কেনা দাড়ি যে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, শুধু সাহসে কুলাইয়া উঠিতেছে না এরা সব মরিয়া লোক, ধাঁ করিয়া ছুরি বসাইয়া দিতে দেরি লাগে না—তারপর চেন টানিয়া গাড়ি থামাইয়া অন্তর্ধান। প্রায়ই তো এই রকম শোনা যাইতেছে।

এক কথায় যদি এদিকে গাড়ির পনের আনা লোকেরই এই চিন্তা এই ধারণা অর্থাৎ সমস্ত গাড়িতে মাত্র একজন সাধু···সে নিজে ; বাকি সব হয় চোর. নয় জুয়োচোর, নয় পকেটমার। কোম্পানী কিছু একটা আন্দাজ না পাইলে কি অমন করিয়া লিখিতে পাবে।

সময় বড় অশান্তিতেই কাটিতেছে।

[৩]

গাড়ি যখন বদরগঞ্জ স্টেশন ছাড়িল, চলন্ত গাড়িতেই দুইজন লোক টপ করিয়া পাদানির উপর লাফাইয়া পড়িল। দরজার কাছের দুইজন লোক হৈ হৈ করিয়া দরজা চাপিয়া ধরিতে যাইতেছিল। আগন্তুকদের মধ্যে সামনেরটি পকেট হইতে কি একটা চোখের সামনে ধরিতেই তাহারা দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করিয়া নিজের নিজের জায়গায় বসিয়া পড়িল। যাহারা ব্যাপারটি বুঝিল না. তাহারা তীব্র উৎকণ্ঠায় নবাগতদ্বয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

লোক দুইটি দরজা খুলিয়া গাড়ির মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং চারিদিকটা ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সামনের লোকটি যে পরোয়ানাটির জোরে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিল তাহা এতক্ষণ মুঠার মধ্যেই মুড়িয়া-সুড়িয়া ধরিয়াছিল, পকেটের মধ্যে অন্যমনস্কভাবে প্রবেশ করাইতে করাইতে সেটা নীচে পড়িয়া গেল। লোকটা সন্ত্রস্তভাবে তাড়াতাড়ি কুড়াইয়া লইয়া পকেটে পুরিয়া ফেলিল ও কিন্তু কড়া বিদ্যুতের আলোকে সকলেই দেখিয়া লইল যে সেটা ঝকঝকে বোতাম আটা খাকী রঙের একটা মোড়া টুপি।

—এদিকে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সাধারণ বেশ। পায়ে একজোড়া হাফ-সু, গায়ে

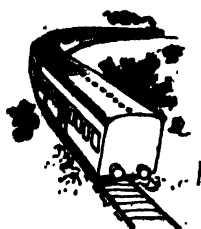
কামিজের ওপর একটা এণ্ডির কোট ; সব পকেটগুলেই ভারি ভারি। চেহারাটাও বেশ ভারিক্কে গোছের, বয়স চল্লিশ—পয়তাল্লিসের মধ্যে। হাতে একটি ছোট সুটকেস। সঙ্গের লোকটি পশ্চিমা। বাম বগলে একটা পোঁটলা, হাতে কাঠের ফ্রেমে জলের কুজা ঝুলিতেছে ; এইভাবেই, একহাতে হ্যাণ্ডেল ধরিয়া গাড়িতে উঠিয়াছে। বাবুর চাকর—সহজেই বোঝা যায়।

গোপনের চেষ্টা সত্ত্বেও কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আগন্তুকদ্বয় দারোগাও পুলিশ, কোন গূঢ় উদ্দেশ্যে বহ্নি নিজেকে ভস্মের আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। বেশ একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল ;

"আসুন, আসুন, এই খানটায় জায়গা রয়েছে।"

"মশাই বরঞ্চ এইখানটায় আসুন, কম্বলের ওপর বসবেন।"

"এই যে আমি ট্রাঙ্কটা উঠিয়ে রাখছি,—দু'জনকারই জায়গা হবে।"



"বেশ কষ্ট ক'রে অত ভেতরের দিকে যাবেন? আপনি বরং এই খানটা,—বৈষ্ণব বাবাজী আর আমার মাঝখানে ব'সে পড়ুন···বাবাজী পরম সাধক লোক, তখন থেকে আলাপ ক'রে বুঝলাম কিনা···আর সিং—জি, তুমি আমার এপাশটায় এসে বসো বাবা। কতদূর যাওয়া হবে মশাইদের?"—বলিয়া বৃদ্ধ বোধহয় ভদ্রলোকটিকে ধরিয়া বসাইবার আগ্রহেই হাত বাড়াইলেন ভদ্রলোক তটস্থ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"আহা—হা, বৃদ্ধ মানুষ আপনি কষ্ট করেন কেন?—বেশ আমি বসছি বসছি। হাঃ-হাঃ-হা, ও বেটার চেহারাটা দেখে সবাই ভুল করে ;—কোন সিংটিং নয়—জেতে কুর্মি। আমি এই এইখানটায় বসি বরং ; হোটেল থেকে একপেট পাঁটা গিলে এলাম, বাবাজীর আর জাত মারব না, হাঃ, হাঃ, হাঃ। বুধন্, তুম্ উস্ কোনাপর বৈঠো··· হাঁ, ঠিক।"

নিজে বৃদ্ধ আর মোটা লোকটির মাঝখানে বসিলেন। একটু নীচু গলায় বলিলেন, "ছোট জাত, ও বেটারা একটু দূরে থাকে সেই ভালো ; দাদা চুলকানি তো বেটাদের অঙ্গের ভূষণ। এ বিষয় আমি মশাই আমাদের গান্ধীজির সঙ্গে একমত হ'তে পারলাম না ; আপনারা রাগ করবেন তো নাচার···হ্যাঁ, কোথায় যাওয়া হবে আপনাদের?"

মাথা ঘুরাইয়া পর পর দু'পাশে দুজনের পানে চাহিলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমি নামব ডালিমগাঁও।"

"আর মশাই ?"

মোটা মোটা লোকটি বলিল. "আমি যাব বড়টক কিশেন গঞ্জ লাইনে সুখাসি ইস্টিশান থেমে যেতে হবে।"

"ওঃ আপনার পৌঁছুতে সেই যার নাম বেলা দশটা : তাও যদি বরাৎ জোরে ট্যাক্সি পাওয়া যায়।"

"আপনার ওদিকে যাওয়া আছে নাকি ?"

"শুধু ওদিকে কেন ? এই লাগোয়া কটা জেলার সব বড় বড় বাজার-হাটেই বছরে দু' একবার করে ঢুঁ মারতে হয়। দিনাজপুরে সামন্য একটু আড়ৎ আছে কিনা অধীনের নাম বনমালি কুণ্ডু—আর ব্যবসাতেও সুখ নেই মশাই, বাবার মুখে গল্প শোনা গেছে—"

হঠাৎ সামনে বেঞ্চিরও-কোণের দিকে চাহিয়া হাঁকিলেন, "বুধন !

সে চাহিতেই চোখের কড়া চাহনির দ্বারা একটা ইসারা করিলেন। সতর্কতা সত্ত্বেও সকলেই দেখিল বুধন অপরাধীর মত পোঁটলা হইতে অর্ধেক বাহির হইয়া পড়া, বেল্ট শুদ্ধ একটা চাপরাশ তাড়াতাড়ি ভিতরে পুরিয়া ফেলিল। বনমালী কুণ্ডু দাঁতে দাঁতে চাঁপিয়া অস্ফুটস্বরে নিজের মনে মনে বলিলেন. "বেটা অসাবধান কোথাকার !"

একটু একটু করিয়া নানারকম গল্প জমিয়া উঠিল—গান্ধীজী, এবারের ম্যালেরিয়, পাটের অবস্থা, রাধারাণী অপহরণের মামলা। এতক্ষণ পরস্পরের প্রতি বৈরীভাব লইয়া যাহারা দম আটকাইয়া মরিতেছিল, তাহারা নিজের নিজের অভিজ্ঞতা মত আলোচনায় যোগদান করিল, গাড়ির মধ্যেকার অস্বাভাবিক স্তব্ধতার ভাবটা কাটিয়া কথাবার্তার মধ্যেই বনমালীবাবু এবার কয়েকজনের কোলের দিকে চাহিয়া একটু আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা আমি একটা বিষয় বুঝতে পারছি না—যদি কিছু মনে না করেন তো বলি—সবার কোলে একরাশ করে পোঁটলাপুঁটলি কেন ?"

ছলনা !—বৃদ্ধ একটু হাসিয়া বলিলেন, "না, আপনি আর বুঝবেন কোথা থেকে ?"

বনমালী বাবু তবুও বিস্মিতভাবে হাঁ করিয়া রহিলেন। মোটা লোকটি বলিলেন, "জোচ্চোর, পকেটমার, এদের অত্যাচার পড়ে গেছে মশাই জিনিসপত্র আর হাতছাড়া করে রাখতে সাহস হয় না, কত ভেখ ধরে কত লোক যে ওঁৎ পেতে বসে আছে। এই ধরুন না আমারই কথা, দাড়ি গোঁফ কামান লোকটি, পরিচয় পেলেন,—নাম এই-পেশা এই—পরের ইষ্টিশনে নেমে একমুখ দাড়ি গোঁফ চড়িয়ে যেন মহর্ষি বাল্মীকি হ'য়ে…

বৃদ্ধের দিকে একটা কটাক্ষ হানিলেন। বৃদ্ধ কথাটা কাড়িয়া লইয়া বনমালী বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন "ঠিক তো—কিম্বা ধরুন এই আমি বুড়ো লোক, এক মুখ দাড়ি-

গোঁফ রয়েছে,—পরের ইষ্টিসনে নেমে গিয়ে, দাড়ি গোঁফ চ'ছে ফেলে টোলের ন্যায়রত্ন মশাই হয়ে—"

মোটা লোকটির উপর একটি মর্মান্তিক প্রতি-কটাক্ষ বর্ষণ করিলেন।

"আপনি ন্যায়রত্ন কাকে বললেন মশাই ?"

"আপনি মহর্ষি বাল্মীকি কাকে বললেন মশাই ?"

বনমালীবাবু দু'দিকে হাত দিয়া থামাইয়া দিলেন—"হয়েছে, হয়েছে। ও, বুঝেছি ব্যাপারটা, তাই বুঝি আপনারা সব গেরস্থালি ঘাড়ে করে বসে আছেন ? —হাঃ, হাঃ হাঃ—বেশ, বেশ যত সাবধান থাকা যায় ততই মঙ্গল, কিন্তু এই ভাবে কতক্ষণ—"

"না, আর এখন অত সাবধান হওয়ার দরকারও নেই"—বলিয়া বৃদ্ধ কোলের বোঝাগুলি আস্তে আস্তে নিচে নামাইয়া রাখিলেন, তাহার পর উঠিয়া, সেগুলি একে একে বাক্সের উপর উঠাইয়া রাখিয়া আবার যথাস্থানে বসিয়া পড়িলেন ; আরও কয়েকজন নিজের নিজের কোল আজাড় করিয়া বসিল। বৃদ্ধ আস্তে আস্তে বলিলেন, "আঃ বাঁচা গেল, ভাগ্যিস মশাই এসেছিলেন।"

বনমালীবাবু ছলনা-সূচক একটা হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন. "কেন, আমি আসাতে আবার কি হ'ল ? সামান্য আড়ৎদার···"

বৃদ্ধ বিজ্ঞতাসূচক একটা হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "ঠিক তো, সামান্য একটা আড়ৎদার মশাই মরতে চললাম, আর লোক চিনি না ? হ্যা, চিনতে পারিনি শুধু এক রংপুরের মাধব চৌধুরীকে। বেটা চামার, মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভুলিয়ে মেয়েটিকে গছিয়ে দিলে, এখন পস্তাচ্ছি। তা আমারও বিশেষ দোষ ছিল না।···তার কথা যদি উঠলই আপনি হ'তে তো গোড়া থেকে আপনাকে···"

মোটা লোকটি বনমালীবাবুর পাশে একটু ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা কোন্ থানার সংলগ্ন আছেন মশাই ? আর যদি কিছু মনে না করেন তো ···"

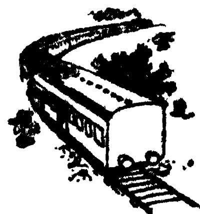
বনমালীবাবু আস্তে আস্তে তর্জনীটি ঠোঁটের উপর রাখিয়া দুই দিকেই চাহিয়া দুইজনকে চুপ করিতে ইসারা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় বলিলেন— "শুনুন।"

দুইজনেই দুই দিক থেকে মাথা সরাইয়া আনিলে ধীরে ধীরে বলিলেন, "যখন জেনেই গেছেন, তখন আর উপায় নেই ; আর আপনাদের দ্বারা একটু সাহায্যও হতে পারে— হ্যাঁ, দারোগাই, গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ,—বনমালী কুণ্ডু নয়, হিমাংশুশেখর দত্ত ; বুধন কুর্মি নয়, মহাবীর চোবে,—ওর পুঁটুলির মধ্যে দু'জনের স্বরূপ। যাঁর পেছু নিয়েছি তিনি এই গাড়িতেই বিরাজমান। কিন্তু এখন সেফ অন্য কথা ; বুঝলেন তো ?

বৈষ্ণববাবাজী এ গাড়ির লোকের সহিত আর আলাপ করার খেয়ালই তুলিয়া দিয়া

গাড়ির জানালায় মাথা দিয়া ঘুমাইতেছিলেন বৃদ্ধ দারোগাবাবুর দিকে একটু ঘেঁষিয়া বসিয়া, ডান চোখের ডান কোণটা টিপিয়া প্রশ্ন করিলেন, "ইনি নাকি ?"

"আর বেশি বলা ডিপার্টমেন্টের নিষেধ"—ফিস্ ফিস্ করিয়া এইটুকু বলিয়া হিমাংশুবাবু মুখ তুলিলেন। সকলে কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া আছে। ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি চাপা দিবার জন্য একজনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া সহজ গলায় বলিলেন, "তা আমি বললাম বলে আপনারা সবাই যথাসর্বস্ব সব আলাদা করে বাঙ্কের উপর থুলেন ? না, এটার আবার ঠিক নয়। মশায়, আমার সব জিনিস ঐ বেটার কাছে, বলতে নেই,—অতি বিশ্বাসী লোক, আজ এগার বছর সঙ্গে রয়েছে, আড়তের সব জিনিসই ওর হাতে ; কিন্তু এই যে দেখছেন ছোট্ট সুটকেসটি এটি প্রাণ থাকতে হাত ছাড়া করি না ; যেহেতু আড়ৎসংক্রান্ত আসল জিনিস সব এইতে। কে জানে মশাই ?—পৃথিবীর লোককে মেলা বিশ্বাস করতে নেই,—বেটা শেষ পর্যন্ত একটা মক্ষম ঘা দেবার জন্যে বিশ্বাস জমাচ্ছে কি না, তাই বা কে বলতে পারে।"



পরিচয়টা প্রায় মুখে মুখে সকলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। ট্রাঙ্ক, ব্যাগ, পোঁটলা প্রভৃতি খুলিয়া কেহ একটা মানিব্যাগ, কেহ কাপড়ে বাঁধা ছোট্ট একটি পুঁটুলি, কেহ হয়তো মকদ্দমার নথিপত্র—যাহার যেরূপ মূল্যবান দ্রব্য সঙ্গে ছিল, কাছে লইয়া বসিল। হিমাংশুবাবু বলিলেন,—"এই ঠিক করেছেন। কি জানেন ?—বিছানা বাক্স মাথায় করে বসে থাকাটা যেমন বোকামি, আবার সবচেয়ে দামী জিনিসপত্র কাছ-ছাড়া রাখাও তেমনি বোকামি—বরং বেশি। চোর, জুয়াচোরের কথা ছেড়ে দিন, ধরুন যদি হঠাৎ একটা কলিশনই হ'ল। যদি বা দৈবক্রমে, কোন গতিকে বেঁচে গেলেন তো টাকা-কড়ি, গয়না-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ, মানে সবচেয়ে দামী যা সেগুলো তো···"

বৃদ্ধ কি ভাবিয়া এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠিয়া ক্যাম্বিসের ব্যাগের তালাটা খুলিয়া আন্দাজ আধহাত লম্বা, ডালার ওপর আংটা, একটা টিনের বাক্স বাহির করিলেন। বাক্সটি হিমাংশুবাবুকে ধরিতে অনুরোধ করিয়া সযত্নে ব্যাগের ডালা আঁটিয়া বসিলেন। হিমাংশুবাবু বাক্সটি ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—"ঠিক করেছেন, ডান হাতে নিয়ে বসুন, বেশ সাবধান হয়ে।" ডানদিকে বৈষ্ণব বাবাজী। বৃদ্ধ

বলিলেন, "না না, বাঁ হাতে নিয়েই বসি। বাঁ হাতটা ভুলো হাত, এই তো? তা আপনি রয়েছেন, কোন ভয় নেই।"

হিমাংশুবাবু অল্প একটু হাসিয়া চুপ করিয়া কি একটু ভাবিলেন; বেশ বোঝা গেল অসহায় বৃদ্ধের এই অতিরিক্ত নির্ভরশীলতায় তাঁহার মনটাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়াছে। একটু থামিয়া মুখটা সরাইয়া আনিয়া বলিলেন—"দেখুন, আমি রয়েছি বটে, কিন্তু যার উপর লক্ষ্য তাকে নিয়ে শীগ্‌গিরই নেমে যাব, তখন? আর একটা গেলেই যে গাড়ি নিষ্কণ্টক হোল এমন নয় তো? বুড়ো মানুষ, ভালো করেননি রাত্তিরে অত গয়নাগাটি নিয়ে একা বেরিয়ে।"

বৃদ্ধ একটু খিঁচাইয়া উঠিলেন—"অত কোথায় পাব মশাই? যা বেল্লিকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করেছি, অত দেবার পাত্র কি না! তবে নেহাৎ ছোটলোকের সঙ্গে ছোটলোক হ'য়ে ভরি দু' এক বের করেছি, এই যা! সে চামারের কথা যদি উঠলই তো···"

[৪]

এই সময় গাড়িটি আসিয়া একটি স্টেশনে দাঁড়াইল। হিমাংশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন—"আমি এক্ষুণি আসছি, এসে শুনছি সব কথা। এইখান থেকে হেড-কোয়ার্টারে একটা টেলিফোন করে দিতে হবে।" গলা নামাইয়া বলিলেন—"বাবাজীর ওপর একটু নজর রাখবেন, আমি এলাম বলে। যদি তেমন বোঝেন মহাবীরকে দিয়ে আটকে রাখবেন।"

স্টেশন ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। টুপিটা হাতে লইয়া স্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে কথা কহিয়া টেলিফোনের দিকে চলিয়া গেলেন। তাহার পর প্রায় গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—"বেহাইয়ের কথা আমায় আর বলবেন কি—আমি নিজেই ভুগছি। মশাই, নরম ধাতের ভালো মানুষ দারোগা বলে আমার মোটেই বদনাম নেই, কিন্তু ঐ একটি জীবকে আমি এখন পর্যন্ত শায়েস্তা করতে পারলাম না। আমার প্রথম ছেলেটির বিয়ে আর বছর দিলাম কিনা।"

একে এমন শ্রোতা, তায় ভুক্তভোগী, বৃদ্ধ আর ধৈর্য ধরিতে পারিলেন না, বলিলেন—কথা ধরিতে পারিলেন না,—"কথা যদি উঠলই আপনি তাহলে একটু অপেক্ষা করুন একবার সেরে এসে নিশ্চিন্দি হয়ে সব বলছি। বহুমূত্রের রোগ আছে কিনা। সেই গাড়িতে উঠেছি ইস্তক—একবার নিয়েছিলুম বটে, কিন্তু···"

"তা হলে একটু থেমে যান ঝাঁকানিতে বড্ড কষ্ট হবে, একে বুড়ো মানুষ। এই স্টেশন এল বলে। এখানে বড্ড ভীড় হয় বটে; তা হোক, আমি রয়েছি।"

গাড়ির গতিবেগ কমিয়া আসিতেছে। বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"তা হলে এই বাক্সটা; নিয়ে যাওয়া তো সুবিধা হবে না।" হিমাংশুবাবু বলিলেন—"ব্যাগে

বন্ধ করে যান ; কিম্বা এঁর কাছেই একটু রেখে যান না, সেই-ই ভালো।"—মোটা ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া দিলেন।
ভদ্রলোকটি ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"না, না মশাই! ও অনুরোধ করবেন না।"
বৃদ্ধ বলিলেন—"বেশ তো, ওঁকে দিতেই বা আপত্তি কি? তা উনি যখন রাজি নন, আপনিই ধরুন মিনিট দু' এক ; গভর্নমেণ্টের ট্রেজারিতে রইল মনে করব।" বলিয়া নিজের রসিকতায় একটু হাসিলেন। গাড়ি প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করিল। হিমাংশুবাবু হাসিয়া বলিলেন—"দিন তা হলে। শেষ কালে মুসলমানদের—"আপ পহিলে চড়িয়ে, তো, আপ পহিলে চড়িয়ে—করতে করতে গাড়ি ফেল হবার যোগাড় হবে? যান, বেশ ভালো করে দেখেশুনে বসবেন, গাড়ি এখানে দাঁড়াবে খানিকক্ষণ। হ্যাঁ, যাচ্ছেন তো ও ব্যাটা কুম্ভকর্ণের টিকিটা ধরে নেড়ে দিয়ে যাবেন তো, ব্যাটা বেঁহুস কোথাকার!"
বৃদ্ধ চলিয়া গেলে মোটা লোকটির পানে চাহিয়া বলিলেন—"বড় ভালো লোক বেচারি, কিন্তু আজকাল আবার বেশি ভালো হওয়াই যে···উঃ, ভাগ্যিস মনে পড়ে গেল!··· মহাবীর ইয়ে···বুধন!"
বৃদ্ধ যাইবার পথে "বুধন বাবু! বুধন বাবু!" বলিয়া একটু নাড়া দিয়া গিয়াছিলেন, সদ্যোত্থিত মহাবীর মনিবের ডাকে জড়িতকণ্ঠে উত্তর দিল—"জী হুজুর!"
"চট করে এদিকে আয় তো একবার, তোর পোঁটলা কুঁজো থাক্, আমি দেখছি।" মহাবীর আসিলে তাহার ঘাড়টা ধরিয়া নামাইয়া নীচু গলায় আদেশ করিলেন—"কাটিহার গ্যাংকেসে (gang case) এখানে বড় সাহেব আসবার কথা ছিল ; চট করে দেখে আয় তো, তাহলে একবার সেলাম বাজিয়ে আসি।"
চাপা সুরে বলিলেও, বেশি উৎকর্ণ থাকার দরুনই হোক বা যে জনাই হোক্ অনেকেই কথাটা শুনিল।
মহাবীর গাড়ি হইতে নামিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও উঠিলেন। দুয়ারের কাছে গিয়া হাঁকিয়া বলিলেন—"স্টেশন ঘরে দেখবি, না থাকে ওয়েটিং রুমে।" দু'পা ফিরিয়া আবার দাঁড়াইয়া বলিলেন—"নাঃ, নিজেই একবার দেখি ; ওর ঐ পোঁটলাটার আর আমার সুটকেশটার ওপর একটু নজর রাখবেন আপনি, আর বৃদ্ধের এইটেও।···ও! আপনি আবার এটা রাখতে নারাজ!"
আরও দু'একজনকে অনুরোধ করিলেন, কেহই রাজি না হওয়ায় বলিলেন—"তবে থাক আমার কাছে, এখনি তো আসছি।"
কথাগুলি বলিতে বলিতেই দুয়ার পর্যন্ত গেলেন এবং সেখানে পাঁচ-সাত সেকেন্ড একটু ইতস্তত: করিয়া দুয়ারের পাশের লোকটিকে ঘুমন্ত বাবাজীকে দেখাইয়া বলিলেন—"একটু নজর রাখবেন ; ওদের ঘুম যে সর্বদা ঘুমই তা নয়"—বলিয়া টুপ করিয়া নামিয়া গেলেন।

শরীরটি বেশ হালকা করিয়া মাঝপথ থেকেই বৃদ্ধ বেহাইয়ের গল্পের সূত্র ধরিয়া আসিতেছেন—যত বেশি জন শোনে ততই সার্থকতা—"সাধ করে কি আর বলি—পাষণ্ড, চামার ? বিয়ের কথাবার্তা কইবার সময় সে কি নীচু ভাব !—'আপনি অতি মহাশয় লোক—আপনি দেবতুল্য—আপনার…' কই, কোথায় গেলেন ইনি ?"

মোটা লোকটি বলিলেন—"বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন বুঝি, এক্ষুণি আসছেন।"

বৃদ্ধ ভেতরে ভেতরে একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা পড়িল। বলিলেন—"আর বুধন—ইয়ে—মহাবীর চৌবে ? তাকেও দেখছি না তো !"

"তাকে আগে সন্ধান নিতে পাঠালেন যে।"

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। আশা রহিল—এই বুঝি আগেকার মতো লাফাইয়া চলন্ত গাড়িতে দুইজনে উঠিয়া পড়েন। পোঁটলা, সুটকেস পড়িয়া রহিয়াছে। গাড়ি প্ল্যাটফরম ছাড়াইয়া গেল। তখনও দু'একজন প্রবোধ দিল—নিশ্চয় অন্য কামরায় উঠিয়াছেন, তাঁহাদের তো এই কাজ—

বৃদ্ধ তবুও দরজার কাছে গিয়া গলা বাড়াইয়া ডাক দিলেন—"হিমাংশুবাবু ! বুধন ! চৌবেজী ! আমাদের গাড়ি এইখানে।"

পরের স্টেশনে সমস্ত গাড়ি তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল—কোথায়ই বা দারোগা হিমাংশুবাবু, আর কোথায়ই বা কনষ্টেবল মহাবীর চৌবে ? শূন্য গহ্বর, ভালো ঢাকনা দেওয়া পুরান সুটকেশ আর পোঁটলার মধ্যে কতকগুলা ছেঁড়া নেকড়া ও একটা নকল চাপরাশ তাহাদের 'স্বরূপে'র পরিচয় দিতে লাগিল।

—এবং "কুম্ভকর্ণ" "বেঁহুস" মহাবীর চৌবের পাশে দু'টি লোকের কাটা পকেট সে পরিচয়টা আরও নিঃসন্দেহ করিয়া দিল।



বর ও নফর

গণশা বলিল, আমার ক-ক-ক্কপালে পরের শ্বশুর বাড়ি গিয়ে সুখ লেখা নেই। সেবারে কালীসটেয় তিলুর বরযাত্রী হয়ে গিয়ে ওই হ'ল; পরশু মাসীর বাড়ী গেছলাম। মা-ম্মাসী ডেকে ডেকে তেইশ জনকে পেন্নাম করালে, তিনজন ফাউ, সেখানে অত গুরুজন আছে জানলে ওদিক মাড়াতাম না। কো-ক্কোমরের ফিক্ ব্যাথাটা এসা আউড়ে উঠেছে!"

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, "ফাউ মানে?"

"তি-তিনটে তাদের মধ্যে দাসী ছিল। মানে, ঘাড় তুলে দেখবার তো আর ফুরসৎ ছিল না।"

কে. গুপ্ত বলিল, "ভিড় জিনিসটা ফুটবলের মাঠেই ভাল মশাই। গাড়িতে বলুন, শ্বশুর-বাড়ি কুটুম-বাড়িতে বলুন —"

গোরাচাঁদ বলিল, "নেমন্তন্নয় বল···বড্ড অসুবিধেয় পড়তে হয়।"

রাজেন জিজ্ঞাসা করিল, "নিজের বিয়ের কি হ'ল র‍্যা গণশা? মামা বলে কি?"

গণশার মুখটা অদ্ভুতভাবে বিকৃত হইয়া পড়িল। একটু পরে সংক্ষেপে বলিল, "কুষ্ঠির মিল হয় তো গু-গু-গুষ্ঠির মিল হয় না; ওরা বলে এক, মামারা বলে আর। বিয়ের কথা হচ্ছে, কিন্তু ব-বউয়ের কথা চাপা পড়ে গেছে।"

ঘোঁৎনা বলিল, "আসলে ওর মামারা ঠাউরেছে, এর মধ্যে একটা চাকরি-বাকরি হয়ে গেলে দাঁও মারবে। গ্যাঞ্জেস মিলে তো সেদিন গিছলি, কি বললে?"

গোরাচাঁদ বলিল, "ভিড়ের কথা যদি বললি তো আমার শ্বশুর বাড়ি ভাল। বউ, শাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী, একটি শালী, শালা আর শালাজ; পিশেমশাই ব'লে ডাকবে, তার জন্যে শালাজের একটি ছেলেও দিয়েছেন ভগবান। মানে, যে কটি দরকার, ঠিক

সাজানো, ফালতু ভিড় পাবে না। বাজে মার্কার মধ্যে এক শ্বশুর, তা সে বেচারী সন্ধ্যের পর আফিম খেয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে, নিশ্চিন্দ।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ গেল, বোধহয় সবাই মনে মনে গোরাচাঁদের কথাগুলি রোমন্থন করিতে লাগিল। একটু পরে গোরাচাঁদ আবার বলিল, "শীগগির একবার যেতে লিখেছে, শাশুড়ী অনেক দিন দেখে নি কিনা।"

রাজেন প্রশ্ন করিল—"কবে যাচ্ছিস?"

"বাবা বলছে, এটা মলমাস; কটা দিন যাক, তারপর।"

গণশা বলিল, "বে-ধেবটাছেলের আবার মলমাস! তুই তো আর স্বামীর ঘর করতে যাচ্ছিস না।"

রাজেন শিস দেওয়া আরম্ভ করিয়াছিল, থামাইয়া বলিল, "আমি তো বুঝি, শ্বশুর-বাড়ি যাব, ঠিক যখন কেউ ভাববে না যে, জামাই আসছে। তা হ'লেই তো যার জন্যে যাওয়া, তাকে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে পাব। বলা নেই, কওয়া নেই, হুট ক'রে গিয়ে পড়লাম, বউ বোধহয় তখন পা ধুয়ে উঠে কালো চুলে রাঙা গামছা জড়িয়ে জল নিংড়োচ্ছে—"

গণশা বলিল, "ঘুম থেকে উঠে কুড়াইমুড়ি চিবোতেও তো পারে, নয়তো মুখ ভেংচে ঝগড়া করছে কারও সঙ্গে—"

গোরাচাঁদ রাজেনের মত কবি না হইলেও রাজেনের কথাটা তাহার মনে লাগিল। নূতন বিবাহ তো। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু তাতে খাওয়া-দাওয়ার একটু অসুবিধে হয়, যোগাড়যন্তর কিছু থাকে না কিনা। আর, আমার শ্বশুর-বাড়ি একটু আবার পাড়াগাঁ গোছেরও।"

ত্রিলোচনের নববিবাহের রসচেতনায় একটু আঘাত লাগিল। বিরক্ত ভাবে বলিল, "তোর শুধু খ্যাটের চিন্তা গোরা। বিয়ে না দিয়ে কাকা যদি তোর একটা হোটেলে ওয়েটারের চাকরি ক'রে দিত তো—"

গোরাচাঁদ বলিল "গণশা কি বলিস, যাব একবার কাউকে কিছু না জানিয়ে?"

গণশা অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল, বলিল, "চ-চল না।"

সকলেই একজোটে বলিয়া উঠিল, "চল না মানে?"

গণশা উত্তর করিল, "আম্মো তা হ'লে একবার দেখে আসি গোরার শ্বশুর-বাড়িটা।"

গোরাচাঁদ একেবারে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, গণশার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "চল মাইরি; আমার বন্ধু জানলে তারা···

গণশা বলিল, "হ্যাঁ, তোর বন্ধু হয়ে গিয়ে বাইরের চালের বাতা গুনি আর তোর আফিমখোর শ্বশুরের বক্তা-র শুনি।"

রাজেন প্রশ্ন করিল, "তবে?"

"ভাবছি, চা-চাকর সেজে গেলে কেমন হয়।"

ত্রিলোচন একটু অন্যমনস্ক ছিল ; বোধ হয় বিনা খবরে শ্বশুর-বাড়ি যাওয়ার কথাটা লইয়া মনে মনে আলোচনা করিতেছিল। আর সবাই উল্লসিতভাবে বলিয়া উঠিল, "গ্র্যান্ড হয়, উঃ!"

ঘোঁৎনা বলিল, "যাবি যে, গোরার বাড়িতে কি বলবে? দুদিন থাকবে তো? তুই বা কি বলবি?"

রাজেন বলিল, "গোরা বলবে, আমাদের কারুর জন্যে মেয়ে দেখতে গেছল কোথাও। তোর শালীর বয়স কত র‍্যা গোরা?"

কে. গুপ্ত বলিল, আর গণেশবাবুর বললেই হবে, চাকরি খুঁজছিলেন।"

গণশা বিরক্ত হইয়া বলিল, চা-চ্চাকরি কি হারানো গাই গরু মশাই যে, তিন দিন ধরে দিন নেই, রাত নেই খুঁজতে থাকবে। ব'লে দিলেই হবে একটা কিছু ; মা-ম্মামাদের তো ঘুম হ'চ্ছে না গণশার ভাবনায়!

[২]

সঙ্গে চাকর যাইতেছে, গোরাচাঁদের মনে একটা মস্ত লোভের উদ্রেক হইয়াছিল, সন্ধ্যা-বাজারের নিকট পোঁছিয়া সেটাকে আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না ; বলিল, "যখন দুজনেই যাচ্ছি গণশা, কিছু গলদাচিংড়ি, দার্জিলিঙের কপি, কড়াইশুঁটি আর নৈনিতাল আলু নিয়ে গেলে হ'ত না? আর কিছু মিষ্টি? মানে, তোর খাবার না কষ্ট হয়, একটু পাড়াগাঁ গোছের জায়গা কিনা! আমরা পোঁছবও সেই যার নাম··· আটটা, রাত হয়ে যাবে!"

গণশা বলিল, "কিন্তু গাড়ির আর মোটে আধ ঘণ্টাটাক দেরী!"

যাহা হউক, বাজারটা একেবারে হাতের কাছে, কেনাই ঠিক হইল। আন্দাজের একটু বেশি সময়ই লাগিল। গোরাচাঁদ তরকারি ঝুড়িটা লইল, গণশা খাবারের হাঁড়িটা। তারপর ক্ষিপ্রতার জন্য গণশা যে বাসটায় উঠিয়া বসিল, কতকটা ক্ষিপ্রতার অভাবে ও কতকটা ঝুড়িটার জন্যও গোরাচাঁদ সেটা ধরিতে পারিল না। দুইটি স্টপ পার হইয়া যাওয়ার পর গণশা সেটা টের পাইল। ফিরিয়া আসিতে, গোরাচাঁদকে খুঁজিয়া বাহির করিতে এবং গায়ের ঝাল মিটাইতে আরও খানিকটা সময় গেল। স্টেশনে আসিয়া প্রায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়া গণশা জিজ্ঞাসা করিল, ডা-ড্ডানদিগেরটা, না, বাঁদিগেরটা র‍্যা গোরা?"

পাশাপাশি দুইটা গাড়ি দাঁড়াইয়া। ঢুকিবার সময় প্ল্যাটফর্মের নম্বর দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছে। সন্দেহ আছে বুঝিলে গণশা আবার পাছে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, সেই ভয়ে গোরাচাঁদ বিন্দু পরিমাণ চিন্তা না করিয়াই বলিল, "না বাঁদিগেরটা।"

গাড়িতে ভিড় ছিল একটু। একেবারে ভিতরের দিকে এককোণে গিয়া দুইজনে একটু

জায়গা পাইল। গোরাচাঁদ চুপড়িটা উঠাইয়া বাঙ্কের এককোণে রাখিল; গণশার হাত হইতে হাঁড়িটা লইয়া চুপড়িটার মধ্যে বসাইয়া দিল।

কয়দিন বৃষ্টি হয় নাই, বেশ গরম পড়িয়াছে; তায় দৌড়াদৌড়ি, তাহার উপর ভিড়। গণশা ঠেলিয়া-ঠুলিয়া আসিয়া প্ল্যাটফর্মের উপর পায়চারি করিতে লাগিল। একটি বৃদ্ধ যাত্রী বলিল, "ফাস্টো বেল হয়ে গিয়েছে বাপু।"

গণেশ দোরটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ প্রশ্ন করিল, "যাওয়া হবে কনে?"

"সিঙ্গুর।" —গণশা উত্তর করিল।

"সিঙ্গুর। সে তো বাবা তারকেশ্বরের লাইন। এ গাড়ি তো নয়, ঐ সামনেরটা। এ গাড়ি তো পশ্চিম যাবে।"

গণশা কতকটা অবিশ্বাসে, কতকটা অনিচ্ছায় বলিল, "কে বললে?"

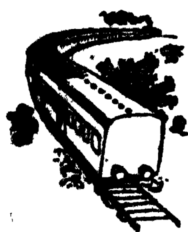
দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল।

বৃদ্ধ বোধহয় একটু রগচটা; বলিল, "কেউ বলে নি; তুমি উঠে এস। ওতে যাবে না, শেষে এটাও হাত ছাড়া করবে। গাঁটের পয়সা দিয়ে যখন টিকিট কিনেছ, উঠে পড় এটাতেই।"

হুইসল দিয়া গাড়ি স্টার্ট দিল। গণশা চিৎকার করিয়া বলিল, "গোরা, শি-শি-শীগগির নেমে পড়, বলছে…"

গোরাচাঁদের খটকা লাগিয়াছিলই একটু। "কে বলছে? কে বলছে র‍্যা?"—বলিতে বলিতে হন্তদন্ত হইয়া লোকেদের পা মাড়াইয়া মোট ডিঙাইয়া আসিয়া কোনমতে নামিয়া পড়িল। গণশা চোখ রাঙাইয়া বলিল, "ত-ওবে যে তুই বললি বাঁদিকেরটা?"

গোরাচাঁদ চলন্ত গাড়িটার দিকে চাহিয়া বলিল, "যা চুপড়িটা থেকে গেল গাড়িতে, হাঁড়ি-সুদ্ধ, হায়, হায়!



একটু অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "মশাই, চুপড়িটা ফেলে দিন না এদিকে, ঐ বাঙ্কে রয়েছে উত্তুর দিকে…মানে, পুব দিকের উত্তুর…মানে উত্তুর কোণটায় আর কি…"

গণশা দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিল, "ছো-চ্ছোট, দৌড়ো দিল্লী পর্যন্ত ঐ বলতে বলতে।"

পাশের গাড়ির প্রথম বেলটা পড়িল। একজন রেলকর্মচারী একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল; গণশা জিজ্ঞাসা করিল, "এটা তারকেশ্বর লাইনের গাড়ি তো স্যার?"

"হ্যাঁ শিগগির উঠে পড় গিয়ে।"

ভুলের সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল, "যে—তারকেশ্বর লাইনে সিঙ্গুর আছে ?"

গণশাও উত্তরটা শুনিবার জন্য ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, একটা ধমক খাইয়া দুইজনে তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়িতে উঠিল। গণশা প্ল্যাটফর্মের দিকের বেঞ্চটায় বসিয়াছিল, গোরাচাঁদ পটেক হইতে মানিব্যাগ বাহির করিতে করিতে বলিল, "গলা বাড়িয়ে দেখ তো গণশা, খাবারের ভেণ্ডারটা আছে কাছোপিঠে ? বেশ খানিকটা ছুটোছুটি হয়রানি হ'ল কিনা ! দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল, হুইসল দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল। গোরাচাঁদ ব্যাগটা যথাস্থানে রাখিয়া দিল। একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, "সে চুপড়িটা এতক্ষণ বোধহয় লিলুয়া পেরিয়ে গেল হাঁড়িশুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত খালি দৌড়োদৌড়ি ; একটাও যে মুখে ফেলে দোব, এমন ফুরসৎ হ'লই না !"

যাহা হউক, গাড়িটার গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুইজনেরই মনমরা ভাবটা কাটিয়া গেল। গণশা, চাকরের মুখে মানায়, এই রকম ভাব ও ভাষায় একটা গান ধরিল, "পরাণ যদি নিলেই রে প্রাণ···"। সেটা জমিয়ে উঠিতে দুই একজন উঠিয়া যাওয়ায় কোলের কাছে যখন একটু জায়গা খালি হইল, গোরাচাঁদ গিয়া সেইখানটিতেই বসিল। প্রথমে গুনগুন করিয়া গানে যোগ দিল, কিন্তু গণশার তোৎলামির জন্য একসঙ্গে কোরাসে অসুবিধা হওয়ায়, গাড়ির বাহিরে হাত বাড়াইয়া শুধু তবলা বাজাইতে লাগিল।

গাড়ি রিষড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলে এক দল বরযাত্রী নামিল। খানিকটা উল্লসিত চেঁচামেচি ; এসেন্সের জুঁইয়ের গোড়ের গন্ধ ; চেলি পরা, কপাল চন্দনের ফুটকি দেওয়া বর। গণশার গানটা মৃদু হইতে হইতে থামিয়া গেল। গাড়ি ছাড়িয়া খানিকটা গেলে বলিল, "হ্যাঁ, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তো শা-শা-শালীর বয়স কত রে গোরা ? মানে, যদি বিয়ের যুগ্যি হয়তো, শিবপুরে পাত্তর টাক্কর দেখি ; একটা ভদ্দলোকের উপগার করতে পারা মস্ত একটা ভাগ্যি কিনা।

গোরাচাঁদ বলিল, "বউয়ের ষোল যাচ্ছে, এ কার্তিকে সতেরোতে পড়বে ; শালী হ'ল দু বছর তিন মাসের ছোট, তা হ'লে—"

গণশা হিসাবের গোলমালের দিকে না গিয়া বলিল, "বিটুইন তেরো অ্যাণ্ড চোদ্দো। হেল্থ কেমন ?"

"বউয়ের চেয়ে ভালই বলতে হবে। বউটা ম্যালেরিয়ায় বড্ড ভুগল কিনা, একেবারেই হাড্ডিসার হয়ে গিয়েছিল, ধন্যি বলতে হবে পান্নালাল ডাক্তারকে, যাকে বলে মরা মানুষ চাঙ্গা ক'রে—"

গণশা প্রশ্ন করিল, "সে দেখতে কেমন ?"

গোরাচাঁদ একটু লজ্জিতভাবে ধমক দিয়া বলিল, "যাঃ !"

"আহা, উনি যেন দেখেননি ! তবে যে বললি সেদিন গোরা, তিলুর বউয়ের চেয়ে

তোর বউয়ের রংটা—" গণশা আর বিরক্তি চাপিতে পারিল না, "তোর শালীর কথা জিজ্ঞেস করছি, তা না বলে স্রেফ 'বউ বউ' করছে সেই থেকে—গোরাচাঁদ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "তাই বল। আমি এদিকে ভেবে সারা হচ্ছি, গণেশ জেনেশুনেও ও কথা জিজ্ঞেস করছে কেন! শালী হচ্ছে, যাকে বলে...হ্যাঁ, সুন্দরী...

"লেখাপড়া কেমন? ক-ক্কথা হচ্ছে, কেউ জিজ্ঞেস করলে আবার খুঁটিয়ে বলতে হবে কিনা! নইলে বলবে, খুব খোঁজ রাখেন তো মশাই! আবার সম্বন্ধ করতে এসেছেন।"

"ছাই লেখাপড়া, ওর চেয়ে বউ অনেক পড়েছে, কিন্তু মুখের কাছে দাঁড়াও দিকিন শালীর।

গণশা হাসিয়া বলিল, "সত্যি নাকি?"

মৃদু হাস্যের সঙ্গে মাথা দুলাইয়া কি চিন্তা করিল খানিকটা, তাহার পরে ধীরে ধীরে ত্রিলোচনের বিয়ের সেই হিন্দী গানটা ধরিল, 'মুহা পঙ্কজ সোঁওরি সোঁওরি..."

শেওড়াফুলিতে পোঁছিতে গোরাচাঁদ বলিল, "তোর খিদে পায়নি গণশা? সে চুপড়িটা বোধহয় এতক্ষণ চন্দননগরে—তোর কি আন্দাজ হয়?"

গণশা বলিল, "খিদের চেয়ে তেষ্টা পেয়েছে বেশি; একটা লেমনেড হ'লে হ'ত।"

গোরাচাঁদ বলিল, "তুই তবে তাই খা, ঐ ভেণ্ডারটা আসছে; আমি দেখি নেমে, যদি খাবার টাবার পাওয়া যায় কিছু।"

গণশা ধমক দিয়া উঠিল, "গ-গ-গর্দভ কোথাকার! আর একটুখানি সহ্য ক'রে থাকবে, তা নয় পথে যা-তা খেয়ে পেট ভরাচ্ছে, শেষে শ-শ শ্বশুরবাড়ি গিয়ে..."

কথাটা গোরাচাঁদের খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। প্রকাশ করিয়া বলিলও, "ঠিক বলেছিস গণশা, পাড়াগাঁয়ের রাত হ'লেও জামাই মানুষ পোঁছেছে, যতদূর সাধ্য করবেই তারা, একটা মস্ত আহলাদের কথা তো! কিছু না হ'লেও পুকুরের মাছ আর গরুর দুধটা তো আছেই। আমিও তা হ'লে একটা লেমনেডই খাই এখন; খিদেটা জলে চাপা রইল। তাতে কোন ক্ষতি হবে না, কি বলিস?"

লেমনেড ছিল না, দুজনে দুইটা সোডাই পান করিল। গণশা একটা ঢেকুর তুলিয়া বলিল, "চা-চাপা কি? খিদেয় একেবারে শান দেওয়া রইল। মাছ যদি তেমন ওঠে তো একবার কালিয়া রেঁধে দেখাব গোরা। পাড়াগাঁয়ে কিন্তু আবার চাকরের রান্না খাবে না যে।"

গোরাচাঁদ উল্লসিত হইয়া বলিল, "রান্নাঘরের দোরগোড়ায় বসে তুই বাতলে দে না কেন শালাজকে, সেই রাঁধে কিনা। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে, গল্প করতে থাকবি, আবার—শালী, বউ সবাই থাকবে। তারা ভাববে, জামাইবাবুর চাকর, ওটার কাছে আবার লজ্জা! চাকর-বাবু যে এদিকে শিবপুরের ডাকসাইটে গণেশরাম।..."

দুজনেই সজোরে হাসিয়া উঠিল।

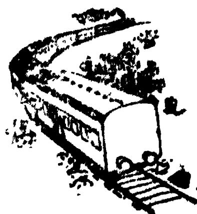
সিঙ্গুরের আর দেরি নেই। গাড়ির এদিকটায় তাহারা মাত্র দুইজনে বসিয়া। গণশা উঠিয়া জামাকাপড় ছাড়িয়া একটা ময়লা ধুতি ও একটা ঘুণ্টি দেওয়া ফরসা পিরান পরিল, মাথায় টেরিটা মুছিয়া ফেলিয়া কানে একটা বিড়ি গুঁজিয়া দিল। জামাকাপড় এবং ক্যাম্বিসের জুতা জোড়াটা গোরাচাঁদের ছোট সুটকেসটায় গুছাইয়া ফেলিল, তাহার পর হঠাৎ চোখ দুইটা ট্যারা করিয়া লইয়া গোরাচাঁদের দিকে চাহিয়া ডাকিয়া উঠিল, "দা' ঠাউর!" দুইজনে আবার একচোট হাসিয়া উঠিল।

[৩]

রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় গাড়ি সিঙ্গুরে পেঁছিল। গল্প করিতে করিতে স্টেশনের বাহির হইয়া দুইজনে চলিতে আরম্ভ করিল। বউয়ের কথা, শালী-শালাজের কথা, খাওয়ার কথা যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, গোরাচাঁদ বলিল, "হ্যাঁ, আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছি যে! এদিকে এসেও পড়েছি অনেকটা; তোকে কি ব'লে ডাকব র‍্যা শ্বশুর-বাড়িতে? মানে, বউটা আবার তোর নাম জানে কিনা!"

হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "এ কোথায় এলাম র‍্যা গণশা? এ যে অনেক ভদ্দরলোকের বাড়ি দেখছি।"

গণশা বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল, তারপর ব্যঙ্গের স্বরে প্রশ্ন করিল, "তুই কি বা—বাগদিপাড়া—কেওরাপাড়ায় শ্বশুর বাড়ি খুঁজছিলি?"



বেশ অন্ধকার। গোরাচাঁদ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া চারিদিকে দেখিতে দেখিতে বলিল, "সে কথা নয়, মানে, শ্বশুর-বাড়িটা এক টেরেয় কিনা, নিজ সিঙ্গুর ছাড়িয়ে খানিকটা ভেতরের দিকে। বাড়িঘর, কি দোকানপাট তো নেই সেদিকে। চল, গপ্প করতে করতে একেবারে উল্টো রাস্তায় এসে পড়েছি, এ দিকটা তো আমার এক জ্ঞাতি পিসশ্বশুরের বাড়ি।"

"না হয় পিসশ্বশুরের বাড়িই রাতটা কাটাবি চল না, সকালে তখন—"

গোরাচাঁদ শিহরিয়া উঠিল; বলিল, "ওরে বাব্বা। তারা তো চায়ই তাই। টের পেলে রাস্তা থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে রাতারাতি কাজ সাফাই করে লাস গুম ক'রে ফেলবে। জমি নিয়ে শ্বশুরের সঙ্গে ভয়ংকর খুনে মোকদ্দমা চলছে কিনা। ওরা তো চায়ই, কেউ একবার আসুক এদিকবাগে, জামাই পেলে তো লুফে নেবে!"

গণশা তাড়াতাড়ি তাহাকে টানিয়া লইয়া ফিরিল। খুবই চটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু স্টেশনে না পৌঁছানো পর্যন্ত কিছু বলিল না। স্টেশনের কাছে আসিয়া খুব একপেট গালিগালাজ করিল গোরাচাঁদকে। আবার ঠিক রাস্তা ধরিয়া দুইজনে যাইতে আরম্ভ করিল। চলিতে চলিতে দুইতিন জায়গায় খবর লইয়া যখন বুঝিল যে, ঠিক রাস্তাতেই যাইতেছে, তখন মনের রাগটা এবং পিসশ্বশুরের আতঙ্কটা অল্পে অল্পে কাটিয়া গেল। যখন বুঝিল কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, গণশার মনটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কথাবার্তাও সরস হইয়া আসিল। সাহস পাইয়া গোরাচাঁদ বলিল, "তুই তো ঐসব বলে ঠাট্টা করছিস শুধু, আমার এদিকে নাড়ী জ্বলে গেল নিজের, ভুল রাস্তার পাল্লায় প'ড়ে রাতও হয়ে গেল বড্ড।"

"না-মাড়ী কি আমারই জ্বলছে না? দেখছি, কালিয়াটা আর হবে না রাত্তিরে। যদি বড় মিরগেল ওঠে তো ভেজেই দিক আপাতত; লুচি তো করবেই—সেফ মিরগেল মাছের পেটি ভাজা আর লুচি।"

গোরাচাঁদ, মুখে রস জমিয়া উঠায় একটা ঝোলটানা গোছের শব্দ করিয়া বলিল, "দুটোই বড় শুকনো হয়ে গেল; তা রাতটা কাটুক ঐ ভাবেই, সকালে তখন দেখা যাবে। বউকে বরং বলব, দুধটাকে নটক্ষিরে করে—; হাতে একটা আধা ইট তুলে নে তো গণশা, এসে গেছি, আমি এই বাঁশের আগালেটা বাগিয়ে ধরছি।"

গণশা দাঁড়াইয়া পড়িয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল, "কেন র‍্যা, আবার কি? কুকুরটা বড় রোখা। রাত্তিরে কেউ এলে ধরে নেয়, চোর কিম্বা পিসশ্বশুরের বাড়ির কেউ; দাঙ্গার পর থেকে ওদের ওপর বড় চটা কিনা! ঐ, ডাকতে আরম্ভ করেছে। তুই যে থান ইট তুলে নিয়েছিস, একবারে থেঁতো হয়ে যাবে যে! আয়, বাঘা বাঘা, চু চু— আমি রে, তোদের জামাইবাবু। আচ্ছা, বাড়ি একেবারে নিশুতি কেন বল তো গণশা? ঘুমিয়েছে নিশ্চয়, রাত দশটা হয়ে গেল।"

গোরাচাঁদ বলিল, "ঘুমুলে কুকুরটার এ রকম ডাকেও ঘুম ভাঙবে না?" দুইজনে কুকুরটাকে আটকাইতে আটকাইতে বাহিরের উঠানে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন একজন ভিতর বারান্দা হইতে জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কে? কে র‍্যা বাব্বা?"

গোরাচাঁদ বলিল, "আমি শিবপুর থেকে আসছি।"

সেই রকম নিদ্রালু স্বরে প্রশ্ন হইল, "কি দরকার রাত দুপুরে?"

এরূপ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের উত্তর গোরাচাঁদের মুখে টপ করিয়া যোগাইল না। গণশা বলিল, "না, দ-দরকার তেমন কিছু নেই তবে ইনি—তোমার গিয়ে না-দ্দাঠাউর এ বাড়ির জামাই।" গোরাচাঁদ ফিস ফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়িটা ঠিক তো? 'জামাই' আবার একটা গালাগাল কিনা!"

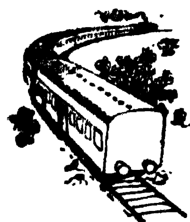
ওদিকে আর কোন সাড়া নাই। লোকটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে নিশ্চয়, ঘুমের মধ্যে হইতেই প্রশ্ন করিয়াছিল। দুইজনে কুকুরটাকে কখন তাড়না, কখন খোশামোদ করিতে

করিতে বারম্বার খোলা রকে উঠিয়া গেল। গোরাচাঁদ লোকটাকে লক্ষ্য করিয়া একটু চড়া গলায় বলিল, "জামাই মানে, শিবপুরের "জামাই গোরাচাঁদ আমি, সঙ্গে এ গণ—, আমার চাকর।" গণশা কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল, "দু-দুখীরাম। আমার চাকর দুখীরাম। তুমি কে কথা কইলে?"
সেই নিদ্রালু স্বর একটু ধমকের সুরে প্রশ্ন করিল, "বলি, তুমি কে?"
গোরাচাঁদ হতাশ হইয়া, গণশার দিকে চাহিয়া বলিল, "বললাম তো একচোট সব খুলে। কি গেরো বলো তো।"
একটু থামিয়া গলা আর একটু চড়াইয়া বলিল, "বাঘা, এখনও চিনতে পারছিস না। সেই লুচি খেতিস হাত থেকে।"
গণশা বলিল, "পিসশ্বশুরের বাড়ির লোক নয় রে বাঘু।"
এবার ঘরের ভিতর হইতে ভারী গলায় প্রশ্ন হইল, "বাইরে কে ব্যাড়র ব্যাড়র করছে? কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে!"
গোরাচাঁদ গণশাকে বলিল, "শ্বশুরের আওয়াজ। আফিমের ঘুম কিনা, ঠিক ধরতে পারছে না।"
চেঁচাইয়া বলিল, "বাবা, আমি আপনাদের গোরাচাঁদ, শিবপুর থেকে আসছি।"
"কে বাবাজী? এস বাবা, এস এস। নিধে। এই বেটা হারামজাদা, পড়লে আর হুঁস থাকে না। রকে জামাই দাঁড়িয়ে যে!"
তাড়া খাইয়া নিধিরাম ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল। বাঁ হাতে কালি-পড়া লণ্ঠনটা লইয়া দুয়ার খুলিল, তাহার পর আলোটা তুলিয়া ধরিয়া চোখ পিটপিট করিতে করিতে টানা জড়িতস্বরে কহিল, "তাই তো, জামাইবাবু যে! এস এস, আজ্ঞে হোক, পেন্নাম হই। তা, বলা নেই, কওয়া নেই—যেন বিনি মেঘে বজ্রাঘাত, বাঃ কি সৌভাগ্য! ওটি কে?"
গণশা বলিল, "আমি দা- ঠাউরের নফর নিধু দা; গড় করি।"

[৪]

তিনজনে ঘরে আসিল। গোরাচাঁদ শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া সামনের একটা পায়া মোচকানো চেয়ারে, প্রতি মুহূর্তেই পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় সতর্ক হইয়া বসিয়া রহিল। গণশাও খুব ভক্তিভরে পায়ের ধুলা লইয়া নীচে উবু হইয়া বসিল। নিধু ঘরের এক কোণে গিয়া তামাক সাজিতে লাগিল।
শ্বশুর খানিকটা নিঝুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। অস্বস্তিবোধ হওয়ায় গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল, "আপনি—আপনারা কেমন আছেন?"
কোন উত্তর হইল না।
গণশা ইসারায় তাগাদা করিল, হাতের কাছে অন্য কোন প্রশ্ন না পাওয়ায় গোরাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "এবার এদিকে, এবার এদিকে বৃষ্টি কেমন হ'ল?" নড়নচড়ন পর্যন্ত

নাই। গণশা আবার প্রশ্ন করিতে তাগাদা করিল, গোরাচাঁদ ভীতভাবে হাত নাড়িয়া ফিস ফিস করিয়া বলিল, "চ'টে যায়।"
আবার খানিকক্ষণ নিঝুম! একটা ঝোঁক কাটিয়া গেলে শ্বশুর হঠাৎ মাথা তুলিয়া বলিলেন, "হুঁ, গোরাচাঁদ এসেছ, না?"
গোরাচাঁদ ব্যাকুলভাবে একবার গণশার দিকে চাহিয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"
"তাই তো!"—আবার খানিকটা চুপচাপ, শুধু গোরাচাঁদের চেয়ার সামলানোর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হইল দুই তিন বার।
নিধিরাম তামাক সাজিয়া দিয়া এক পাশে বসিল। হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া গোরাচাঁদের শ্বশুর একটু চাঙ্গা হইলেন। বলিলেন, "তখন থেকে চুপ করে তাই ভাবছি। হ্যারে নিধে, বাড়ির সবাই বিয়েবাড়ির নেমতন্নয় গিয়ে বসে রইল, জামাই খাবেন কি!"
নিধিরাম কলিকাটির দিকে অর্ধমুদ্রিত সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া ছিল, নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলিল,—"সেই কথাই তো ভাবছি।"



গোরাচাঁদের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। গণশা একটু চাপা, তবু তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল সেও হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। দুইজনের পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া শ্বশুর কি ঠিক করে, সেই প্রত্যাশায় একটু চুপ করিয়া রহিল। আরও খানিকক্ষণ তামাক টানিয়া নিধিরামের দিকে হুঁকাটা বাড়াইয়া শ্বশুর বলিলেন,—"ভাবিয়ে তুললে যে! উপোস করে থাকবেন?"
নিধিরাম কলিকাটা হুঁকা হইতে পাক দিয়া তুলিতে তুলিতে বলিল—"রামঃ, সে কি হয়?"
—"উপায়?"
নিধিরাম পরম ভক্তিভরে কলিকাটা মাথায় ঠেকাইয়া বলিল,—"বাবা আছেন।"
বাবা—এ প্রান্তে তারকেশ্বরের সাধারণ নাম। গণশা গোরাচাঁদের পানে ঠোঁটটা কুঞ্চিত করিয়া মাথা নাড়িল, অর্থাৎ আর কোন আশা নাই।
"আমি বলি"—বলিয়া গোরাচাঁদ কি বলিতে যাইতেছিল।
নিধিরাম হাসিয়া বলিল—"তুমি যা বলবে বুঝতেই পারছি দাঠাকুর খবর দিয়ে

আসতে পারোনি বলে আর খুব রাত হয়ে গেছে বলে পথে শেওড়াফুলিতে খেয়ে এসেছ, এই তো ?···শুনছেন জামাইবাবুর কথা কর্ত্তা ?''

নেশাটা চটিয়া যাইতেছে ; জামাইয়ের হ্যাঙ্গামা না মিটাইলে অব্যাহতি নাই, বৃদ্ধ মিটমিট করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"দাঁত ! সে তুই আমি করতাম বলে কি ও ছেলেমানুষেরাও করবে ? না সেটা উচিত হইত অর্থাৎ সেইটেই উচিত হইত, এবং যদি না হইয়া থাকে তো কাণ্ডজ্ঞানহীন ছেলেমানুষ বলিয়াই হয় নাই।

গণশা, গোরাচাঁদ বিমূঢ়ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল। গোরাচাঁদ কি উত্তর দিতে যইতেছিল, পেটুক মানুষ, পাছে বেমানান কিছু বলিয়া বসে—সেই ভয়ে গণশা তাড়াতাড়ি বলিয়া দিল—"আজ্ঞে বল্লে বিশ্বাস করবেন না দাঠাউর সত্যিই খেয়ে এসেছেন।"

গোরাচাঁদ গণশার দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া মরিয়া হইয়া আবার কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কপাল দোষে হঠাৎ একটা ঢেকুর ঠেলিয়া বাহির হইল। তবুও যথাসম্ভব সামলাইয়া লইয়া বলিল—"আজ্ঞে হ্যা একটা সোডা···।"

গণশা তাহার দিকে একটা ভ্রুকুটি করিয়া মুখ ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "খাবেন না সোডা ? তি-তিন গণ্ডা রসগোল্লা, পোয়াটাক কচুরী সিঙ্গাড়া মিলিয়ে, পো খানেক মিহিদানা খেলেন, শেষে আমি বললাম—"

গোরাচাঁদ হতাশভাবে চাহিয়াছিল, তাহার মুখের ওপর সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া গণশা বলিল—"তখন আমি বললাম, দাঠাউর, একটা সোডা খেয়ে নাও ; তাঁরা তো সেখানে খাবার জন্যে জেদাজেদি করবেনই—

নিধিরাম বলিল, "করব না জেদাজেদি ? ঘরের জামাই এলেন, বাঃ !"

গণশা ক্রমাগত চোখ টেপানি দিতেছে। আর কোনও আশা নাই দেখিয়া গোরাচাঁদ নিরুৎসাহ কণ্ঠে যতটা সম্ভব জোর দিয়া বলিল, "দুখীরামের কথা শুনে আমি বললাম, হাজার জিদ করলেও আমি আর খেতে পারব না। শেষকালে কি মারা যাব ?" —বলিয়া চেষ্টা করিয়া আর একটা ঢেকুর তুলিল।

শ্বশুর নিধিরামের নিকট হইতে কলিকাটা লইয়া বলিল, "আমার কিন্তু বাপু বিশ্বাস হচ্ছে না যে, জামাই পথেই খেয়ে এসেছেন। নিধে কি বলিস ?"

হাঙ্গামা-পোহানোর ভয়ে নিধিরাম অনেকটা সামলাইয়া আনিয়াছে, আবার কাঁচিয়া যায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "অবিশ্বাসের তো হেতু দেখছিনা, কর্ত্তামশাই, নোতুন জামাই মিছে কথা বললেন কি ? তায় আপনার মত দেবতুল্য শ্বশুর তাই তো !"

বৃদ্ধ আরও খানিকটা চিন্তা করিলেন, তাহার পর উৎসাহভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আমি বলি কি নিধে, জামাইকে না হয় নেমতন্ন-বাড়ি নিয়ে যা না কেন, ততক্ষণ আমাতে আর —এটির নাম কি ?"

গোরাচাঁদ উৎসাহভরে বলিল, "দুখীরাম।"

"আমাতে আর ক্ষুদিরামে ব'সে ব'সে গল্প করি না হয়। বেহাই বেহানঠাকরুণ আছেন কেমন ক্ষুদিরাম?"

"বেশ আছেন।"—বলিয়া গণশা তাড়াতাড়ি বলিল, "আজ্ঞে, আমি তো জা—জ্ঞান থাকতে দাঠাউরকে একলা ছেড়ে দিতে পারব না। এই সাপখোপের দেশ। কর্ত্তাবাবু বললেন, দুখীরাম ম-ম্মলমাস ছেলেটা একলা যাচ্ছে, সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকবি, খ-খ-খবরদার!"

গোরাচাঁদ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "নিধু খুব বিচক্ষণ লোকজন—দুখীরাম, ও আবার ঝাড়ফুঁকও জানে। তোর কোন ভাবনা নেই; নিশ্চিন্দ হয়ে বাবার সঙ্গে গল্প কর, আমি একটু হয়ে আসি। কথা হচ্ছে খিদে একেব্বারেই নেই, কিন্তু শাশুড়ী ঠাকরুণকে দেখবার জন্যে প্রাণটা কেমন আইঢাই করেছে; অনেকদিন পায়ের ধুলো নিই নি কিনা!"

"গণশা ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া খাক হইতেছিল, গোরাচাঁদের দিকে একটা উগ্র কটাক্ষ হানিয়া সংযতভাবে কহিল, "বি-ব্বিনি পায়ের ধুলোয় যখন চারটে মাস কাটালে চোখ কান বুজে, ত্যাখন আর একটা কি দুটো ঘণ্টা কোন রকমে কাটাও না দাঠাউর, মা ঠাকুরণও এক্ষুণি নেমতন্ন খেয়ে ফিরবেন ছিচরণ সঙ্গে নিয়ে।"

শ্বশুর মাথা নাড়িয়া বলিলেন "সে আজ সমস্ত রাত আসবে না, তারা কেউ না; সম্পর্কে আমার নাতনীর বিয়ে কিনা, গিন্নী বাসর জাগবে ওকি! ধর ধর!"

শেষ আশা একটু ছিল, শাশুড়ির; সেটুকুও যাওয়ায় গভীর নিরাশায় শরীরটা হঠাৎ শিথিল হইয়া পড়ায় গোরাচাঁদের ভাঙ্গা চেয়ার হইতে আছাড় খাওয়ার দাখিল হইয়াছিল; গণশা নিধিরাম ধরিয়া ফেলিল। শ্বশুর বলিলেন—"আহা, ঘুম ধরেছে।" নিধিরাম বলিল—"চাপ খাওয়া হয়েছে কিনা!"

শ্বশুর উঠিয়া বলিলেন, "তবে বাবাজী, চল, দুর্গা শ্রীহরি ব'লে শুয়েই পড়বে চল। খিদে যখন নেই-ই বলছ, শুধু প্রণাম করবার জন্যে কোশটাক পথ ভাঙার মাঝরাত্রে কি দরকার? ওঠ তা হ'লে। দুখীরামকে না হয় গোটাকয়েক খইচুর এনে দোব?"

গণশা উত্তর দেওয়ার আগে গোরাচাঁদ প্রতিহিংসাবশে বলিল, না, না, খাওয়ার ওপর খেয়ে একটা কাণ্ড করে বসবে শেষে; ওর ভরসায়ই বাবা আমার এখানে পাঠিয়েছেন মলমাস অগ্রাহ্যি ক'রে।"

গণশার পানে না চাহিয়া শ্বশুরের পিছনে পিছনে ভিতরে চলিয়া গেল।

[৫]

প্রায় ঘন্টা দেড়েক আরও কাটিল। গোরাচাঁদ ভিতর-বাড়িতে ক্ষুধার জ্বালায় এবং খাদ্য সম্বন্ধে হতাশায় বিছানাতে পড়িয়া এপাশ-ওপাশ করিতেছিল, এমন সময়ে ঘরের দুয়ারের কাছে গণশা ডাকিল, "দাঠাউর!"

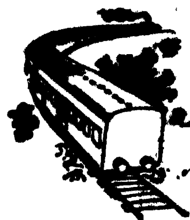
[illegible] দিয়া সে জানালা গলাইয়া জিনিসপত্র কুলির নিকট হইতে লইয়া গাড়িতে জড় করিয়াছে। বোধ হয় মনিবকে ভাল রকম চেনে বলিয়া উত্তর দিল না।

এদিকে উমেশ পাচক বামুনের সাহায্যে দরজা দিয়া জিনিসপত্র তুলিতেছিল। বলিল —"আপনি ব্যস্ত হবেন না। উঠে এসে বসুন। জিনিসপত্র প্রায় সব উঠে গেছে; আমি গার্ড সায়েবকে বলে দিয়েছি, ছাড়বে না গাড়ি।"

ভদ্রলোক দোরের সামনের এবং ওদিকে রামখেলানের নিকট জড় করা লগেজের স্তূপের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া নিরাশভাবে বলিলেন—"সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল; আমি জানি—একটি জিনিস হিসেব মতো ওঠেনি—কাল থেকেই তোমার আর তোমার বোনের যে রকম গড়িমসি—আমি জানি ঠিক এইটি ঘটবে···যা ইচ্ছে তোমাদের কর,—গার্ড সায়েব বোনাই তোমার, গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখবে।"

আধা ঘোমটার মধ্য হইতে দাঁতে পেষা অস্ফুট শব্দ হইল—"মুয়ে আগুন!"

ভদ্রলোক আর কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া শিথিল চরণে উঠিয়া আসিয়া একটি বেহারী ভদ্রলোকের পায়ের উপর প্রায় মণ দুয়েকের চাপ দিয়া বসিয়া পড়িলেন।



উমেশ মোটপত্র সব উঠাইয়া রামখেলান আর পাচকের সাহায্যে উপরে নিচে গুছাইয়া রাখিল। যে ভদ্রলোকটির 'ওগো'-ভীতি সব-চেয়ে বেশি প্রবল, গৃহিণী আসিয়া তাঁহারই বেঞ্চের কাছটিতে কাচ্চা-বাচ্চা লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। নিরুপায় ভদ্রতার খাতিরে তিনি নিজের বিছানা গুটাইয়া অপর দিকে চলিয়া গেলেন।

উমেশ একটা গাঁঠরি খুলিয়া একটা বিছানা পাতিয়া বলিল···"নাও, তোমরা বস দিদি, আপনিও আসুন বাঁড়ুয্যে মশাই এই দিকটায়।···কুলকুচির হাঁড়িটা নিয়ে তেরটা আইটেম্ আছে, কুঁজো চারটেকে একসঙ্গে বেঁধে দিয়েছি; বঁটি, চাকি-বেলুনগুলো বেতের ঝুড়িটার মধ্যে আছে, মাদুরটা···"

ভদ্রলোক বলিলেন—"মানুষ সব উঠেছে?···কুলকুচি পড়ে থাকবে না, তা আমি জানি —তোমার দিদি আমায় ফেলে যেতে পারে; কিন্তু কুলকুচিও পড়ে থাকতে দেবে না, তেঁতুলও পড়ে থাকতে দেবে না; বলি মানুষ সব উঠেছে?"

উমেশ বলিল—"দিদি, দিদির কোলে খোকন—নুটরু—অনাথ—মীনু—বাণী···"

ভদ্রলোক আবার একটু সচকিত হইয়া উঠিলেন—"সাতজন বাবার কথা নয়?"

গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে। উমেশ নামিতে নামিতে হাসিয়া বলিল—"আর আপনি কোথায় গেলেন ? মানুষের বাইরে নাকি ?"

সঙ্গে সঙ্গেই আমার নিজের বেঞ্চ হইতে আবার দাঁতে পেষা শব্দ হইল—"মুয়ে আগুন, ভীমরতি হয়েছে !"

বোধ হয় লজ্জাটাকে চাপা দেওয়ার জন্যই ভদ্রলোক গলা বাড়াইয়া বলিলেন—"চিঠির উত্তর দিও।"

একটু দূরে হইতে আওয়াজ ভাসিয়া আসিল—"স্কুল বন্ধ হলে কুমু আর রাজেনকে নিশ্চয় পাঠিয়ে দেবেন।"

আপনি আপনিই যেন আমার সেই বেহারী ভদ্রলোকটির দিকে নজর পড়িয়া গেল। ডান হাতের পাঁচটি এবং বাঁ হাতের দুইটি অঙ্গুলী একটু সঙ্গোপনে তুলিয়া ধরিয়া সঙ্গীকে কি একটা ইসারা করিতেছেন। বোধ হয় এই যে আপাতত সাতটির খবর পাওয়া গেল।

আমার বাঙ্কের নিচে যে বেঞ্চিটি, গৃহিণী ছেলেমেয়েগুলিকে লইয়া সেটাতে বসিলেন। কর্তা তাহার পরেই মাঝের বেঞ্চিটিতে বসিয়া। যে ভদ্রলোকটির পায়ের উপর তিনি বসিয়াছিলেন তাঁহার ঘুমের নেশা ছুটিয়া গিয়াছে ; উঠিয়া বসিয়াছেন। ডান হাত দিয়া পায়ের গোছটা ধীরে ধীরে মর্দিত করিতেছিলেন, কর্তা বাঙালী হিন্দিতে প্রশ্ন করিলেন—"আঘাত লাগা হ্যায় ?"

ভদ্রলোক নরম প্রকৃতির মানুষ, পায়ের গোছ হইতে হাতটা সরাইয়া লইয়া বলিলেন—"নেহি, কুছ্ চোট নেহি হ্যায় ?"

কর্তা বলিলেন—"থোড়া, ব্যতিব্যস্তো কর দিয়া থা। কাচ্চা-বাচ্চা সাথমে রহনেসে মগজ ঠিক নেহি রহতা হ্যায়।..."

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন—"জি হাঁ, ফিকির তো লগা রহতা হ্যায়।"

কর্তা বলিলেন—"আরও কারণ হুয়া হ্যায়—হামকো কোভি কোন ঝক্কি নহি লেনে দেতা হ্যায় উসবকা মাদার। আর উয়ো সবভি হামেশা মা-কোই পাশমে রহতা হ্যায়, বাপ বোল করকে যে একঠো বস্তু হ্যায়..."

কচি ছেলেটা অত্যন্ত কাঁদিতেছিল, তাহার উপরের ছোট মেয়েটি "মামা কাছে যাবো" বলিয়া বায়না ধরিয়া সুরটা ক্রমে ক্রমে সম্মুখের দিকে লইয়া যাইতেছে। বাঙ্কের নিচে চাপা, কিন্তু সুস্পষ্ট শব্দ শুনিলাম—"অনাথ, জিগ্যেস কর দিকিন কানের মাথা খেয়ে বসে আছে ? একটা মানুষ ক'টাকে সামলাতে পারে ? মুয়ে আগুন !"

ভাষা বুঝিতে পারুন বা না পারুন, বলার সুর হইতে বোধ হয় মানেটা আন্দাজ করিয়া বেহারী ভদ্রলোক কহিলেন—"খোঁখী কো আপ ইধর বোলা লিজিয়ে বাবুজী। উস্ বেঞ্চমে জগহ ভি নেহি হ্যায়, তকলিফ্ হোতা হ্যায়...এসো খুখুমণি তোমি হামাদের কাছে।"

খুকী ফিরিয়া চাহিয়া শঙ্কিত ভাবে মায়ের কাছে আরও ঘেঁসিয়া বসিল। কর্তা উঠিয়া তাহাকে লইয়া নিজের পাশে বসাইলেন। বলিলেন—'ভয় কি খুকু!—এই তো তোমার মামা রয়েছেন। ও মামার চেয়ে কত্তো ভাল—কেমন আরও ফর্সা··· ভয় কি?"

খুব সাদা মনেই বলা, কিন্তু ওপর হইতে দেখিতেছি বেহারী ভদ্রলোকের মুখটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। অন্য বেহারী ভদ্রলোক কয়টিও একবার পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করিল। যখন সাক্ষাৎ ভাগনের মায়ের ভাই তখন নিরুপায়ভাবে সহ্য করিতেই হয়, না হইলে এদেশে মামা কথাটাকে গালগালের মধ্যে ধরে।···

ভুলাইবার খুব একটি চমৎকার উপায় বাহির করিয়াছেন ভাবিয়া কর্তা সাধ্যপ্রাণে বলিয়া যাইতেছেন—"যাবে মামুর কাছে··যাও না··মামী কত···"

ভদ্রলোক প্রসঙ্গটা বদলাইবার জন্য খুকীর মুখটা হাতের চেটোয় তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—"বড়ী খুবসুরৎ হ্যায়।"

এমন কিছু সুন্দর নয় খুকী; কিন্তু কর্তা সহানুভূতিতে গলিয়াই ছিলেন, আরও তরল হইয়া গেলেন। বাঙালী একটু বেশি রকম তরলিত হইলে প্রথম সুযোগেই বৌ বা তৎসঙ্গীয় কথা আনিয়া ফেলে। স্মিতবদনে মেয়েটির মুখের পানে চাহিয়া পিঠে দুইবার হাত বুলাইয়া বলিলেন—"ওতো হোনেই পড়েগা, উসকা মামার বাড়ির তরফকা সবকোই অত্যন্ত সুন্দর হ্যায়। উসকো সেজো মামাকে তো দেখা?"

বেহারী ভদ্রলোকটি নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির, তাহা না হইলে "মামা হইয়াও এমন নিরুপায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিতেন না, বলিলেন—"যো বাবু ইখানে আয়ে থে ?"

কর্তা বলিলেন—"ওই বাবু। কেসা দেখা? নেই, হামকো সম্বন্ধী বোলকেই নেই বোলতা হ্যায়। উঁসি মাফিক চেহারা···"

একটা শব্দ হইল—"মুয়ে আগুন!"

ভদ্রলোক বলিলেন—"জি হাঁ, দেখনেমে তো আচ্ছা হঁ্যায়।"

বিশেষণটি সাধারণ,—কর্তা বেশ ক্ষুন্ন হইলেন একটু, খানিকটা উদ্দীপিত ভাবেই বলিলেন—"আপ হামকো অবাক্ কর দিয়া। হাজার মে উস্‌মাফিক অ্যাকটা চেহারা দেখাইয়ে তো। তব আপকো সুরুসে সব বাৎ কহনে পড়েগা দেখতো হ্যায়। হাম তো উমেশকোই দেখ করকে বিবাহ কিয়া,—বিহাহ বুঝতে হে তো?—সাদি।"

মাঝের দ্বিতীয় বেঞ্চের ভদ্রলোক দুইটিও আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিলেন এবং কথাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। একজন একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"উমেশ বাবুকো দেখ্‌কর সাদি ক্যায়সে কিয়া বাবুজী?"

শ্রোতার সংখ্যা বাড়িতেছে দেখিয়া কর্তা বোধ হয় খুশি হইলেন, একটু ঘুরিয়া ভদ্রলোকের পানে চাহিয়া বলিলেন—"তব্ দেখতা হ্যায় আপকো সব ব্যাপার খোল

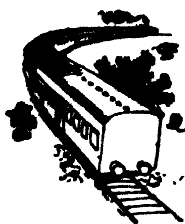
করকে বোলনে হোগা। মানে, হামারা বরাবর জিদ থা বিবাহ করেগা তো আপোন্ চোখসে দেখ করকে করেগা, নেইতো কেইসে জানেগা যে শ্বশুর মশাই বোবা, খোঁড়া কি অন্ধা একঠো গলামে লটকায়ে দেতা হ্যায় কি নেহি? অনেক সম্বন্ধ আয়া, অনেক গেয়া। হাম জীবনমরণ পণ করকে জিদ ধরকে বৈঠা হ্যায়; যোভি কোই সম্বন্ধ আতা হ্যায় শর্মা যা করকে চক্ষু কর্ণকা বিবাদ ভঞ্জন করকে আতা হ্যায়; কিসীভি পাত্রী খোপে টিকতা নেহি হ্যায়। অবশেষে এই উমেশকো বোহীন কা সাথ বিবাহ কা বাৎ লে করকে উমেশকো বাপ উমেশকো সাথমে লে করকে উপস্থিত হুয়া। হামরা বাবুজী উস বখত জীবিত থা, হামরা ভাজকো জিজ্ঞাসা কিয়া—'উসকো পুছো—পাত্রী দেখনে ওয়াস্তে জায়গা?'···হাম ভিতরসে খোঁজ করেকে জানা থা, যে উমেশ পাত্রীকা ছোটা ভাই হ্যায়। ভাজকো বোলা—'নেই; দরকার নেই হ্যায়।' ওয়ান অ্যাণ্ড অল্ সবকোই স্তম্ভিত হো গিয়া। ভাজ তোফারি ভি কিয়া···

একটি অস্ফুট শব্দ হইল—"মুয়ে আগুন।"

দ্বিতীয় ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন—"বাবুজী 'ভাজ' কিসে কহতে হ্যায় আপলোক?"

কর্তা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আপ অবাক্ কর দিয়া! 'ভাজ' কিসকো কহতা হ্যায় নেহি জানতা হ্যায়? দুনিয়ামে তব কেয়া করনেকো আয়া হ্যায়? ভাজ হুয়া বড়া ভাইকো পরিবার···"

ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—"ও সমঝা, আপকা মতলব 'ভাবী' হ্যায়!···তো ফিন্ ভাবীনে কেয়া তফসী কী?"



আমি উপরে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। প্রথম ভদ্রলোকটি যে প্রকৃতির এ লোকটি সে প্রকৃতির নয়। কিন্তু কর্তা এমন লজ্জাজনক অবস্থা করিয়া তুলিয়াছেন যে আত্মপ্রকাশও করিতে পারিতেছি না। নিরুপায়ভাবে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম।

কর্তা বলিলেন—"ভাজ তোফারি কিয়া—ঠাকুরপো আঁখসে নেহি দেখ করকেই ভালোবাসা···।"

সেই অস্পষ্ট-শব্দ—"মুয়ে আগুন!"

বোধ হয় আমার নিচের বেঞ্চে ছেলেমেয়েগুলি ঢুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রথম ভদ্রলোকটি বলিলেন—"বাবুজী, অওর যো বচ্চোঁকো ইধর লে আইয়ে; উন্‌সবোঁকি নিন্দ আই হ্যায়, মাজী কি তকলিফ হো রহি হ্যায়।"

কর্তা একেবারে গলিয়া গেলেন, হাত নাড়িয়া বলিলেন—"কুছভি তক্‌লিফ্ নেহি হ্যায়, পাঁচটা কো জায়গামে যদি পাঁচ দ্‌গ্‌নে দশটা লেড়কা লেড়কি উমেশকো বোহীনকা দেহপর লটকায়কে রহে তোভি—না রাম না গঙ্গা, কুছভি নেহি বোলেগা। শি ইজ্ এ ভেরি কোয়াএট লেডি (অত্যন্ত ঠান্ডা প্রকৃতির স্ত্রীলোক)।"

প্রথম ভৎলোকটি, বোধ হয়, একটা কিছু বলিবার জন্যই বলিলেন···"বাঙালী লেডি সব হোতে ভি হ্যায় বড়া নরম মেজাম কা।"

দ্বিতীয় ভদ্রলোক সমর্থন করিলেন—"বেশ্‌ক, বেশক্।"

কর্তা আরও গলিয়া গেলেন, শরীরটা আরও যেন ভাবাবেশে এলাইয়া আসিল, বলিলেন—"বিশেষ করকে উমেশকো বোহীনকে মাফিক নরম মেজাজ আপলোক কল্পনাও নেহি করনে শকেগা। অকেলা আদমি উদ্বয়াস্ত একঠো না একঠো কাজ লেকরকেই হ্যায়, নিঃশ্বাস ফেকনে কা ফুরসৎ নেহি রহতা। উসকা উপর হামারা আপিস হ্যায়, লেড়কা লেড়কী সবকা স্কুল হ্যায়, বাচ্চা সবকা দৌরাত্যি হ্যায়—লেকিন কোভ্‌ভি কিসিকো একঠো কড়া বাত নেহি বোলতা হ্যায়, মানে দেহমে রাগ বোলকে কোন বস্তু নেহি হ্যায়।"

রাগহীন মানুষটির নিকট হইতে আবার সেই সাগ্নিক বক্তব্য। পরস্ত্রীর এবং স্ত্রীর সামনেই এবং তদুপরি তাহার স্বামীর কাছেই এরকম ঢালোয়া প্রশংসা শুনিয়া বেহারী ভদ্রলোক দুইটিও যেন কি রকম হইয়া পড়িতেছিলেন। প্রথম ভদ্রলোকটি বোধ হয় জড়তাটা কাটাইবার জন্যই বলিলেন—"আপ বড়া ভাগ্যবন্ত হ্যায় বাবু সাহেব।"

কর্তা তখন এত গলিয়া গেছেন যে আর যেন কথা বাহির হইতেছে না। একটু তৃপ্ত হাসির সঙ্গে সামনে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন,—দাম্পত্যরসে মুখখানি দীপ্ত হইয়া গাল দুইটি টক্‌টক্ করিতেছে, স্থূল মাংসল দেহটি গাড়ির দোলায় অল্প অল্প দুলিতেছে, কতকটা যেন তুরীয় ভাব! একটু থামিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"ভাগ্যো কা বাত অগর কহা তো আপলোককো সুরুসে সব বাৎ কহনে পড়েগা। বিবাহ যো হুয়া সে তো বহুৎ কাটখড় পুড়ায়কে। সব কথাবার্তা তো ভাঙ্ গিয়া থা। লেকিন···"

হঠাৎ যেন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া একটু চুপ করিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি প্রশ্ন করিল—"লেকিন কিয়া বাবু সাহেব ?"

প্রথম ভদ্রলোক অপ্রতিভ ভাবেই বলিলেন—"অগর উজুর রহে তো ছোড় দিজিয়ে কহনা।"

ভদ্রলোক বলিলেন—"না, আপলোক কো সামনে উজুর কেয়া। বোলতা থা বহুত রোজ লেকরকে বিবাহকা কথাবার্তা হোনেসে পাত্র আর পাত্রী কা বিচমে একঠো লাভ্—মানে প্রণয় হো জাতা হ্যায় না? ···হাম ইধার কহা উমেশকো বোহিন ছাড়কে

আর কিসকো বিবাহ নোহি করেগা, উধার উমেশকো বোহীন ভি ধনুর্ভঙ্গ পণ কর লিয়া···"

ওদিক হইতে আর কোন মন্তব্য শোনা গেল না, বোধ হয় কর্তা অবস্থাটা বাক্যাতীত করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়াই।

পাটনার আগের স্টেশন গুলজারবাগ আসিয়া পড়িল, আমায় নামিতে হইবে এখানে। কিন্তু ভদ্রলোকের রোম্যান্স তখন প্রবল বেগে নামিবার উপক্রম করিতেছে। বড় দ্বিধায় পড়িয়া গেলাম। একদিকে স্বজাতি অপরদিকে বেহারী ভদ্রলোক, আবার ওদিকে অসহায়া "উমেশকো বোহীন"—জীবন্মৃতা হইয়াই আছেন, বাঙালী দেখিয়া তাঁহার অবস্থা যে কি হইবে···

গার্ড হুইসিল্ দিয়াছে। তাড়াতাড়ি সতরঞ্চি আর চাদরটা গুটাইয়া কোটটা গুঁজিয়া লইলাম। সিল্কের চাদরটা মাথায় জড়াইয়া লইয়া নামিয়া পড়িলাম। কর্তাকেই বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানী উচ্চারণে প্রশ্ন করিলাম—"কোন ইস্টিশান্ বাবু সাহেব?"

কর্তা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, বুঝিলাম জাত ভাল করিয়া ঢাকা পড়ে নাই।···উত্তর করিলেন না। বেহারী ভদ্রলোকেরাও নয়।

উত্তরের দরকার ছিল না। দুয়ারটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া চলতি গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলাম।

-হাত
করতে
লও যদি
হোক।—এই



জামাইষষ্ঠী

হঠাৎ বিজলিবাতি নিভিয়া গিয়া গাড়িটা অন্ধকার হইয়া গেল।

এ লাইনে এরকম হইয়াই থাকে। গুছাইয়া-সুছাইয়া বসিয়া, বইখানি খুলিয়া নিশ্চিতমনে পড়িতে বসিলে দপ করিয়া আলোটা নিভিয়া গেল। 'দুত্তোর' বলিয়া হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িলে, তেমনি হঠাৎ আলোটা জ্বলিয়া উঠিয়া চোখের উপর ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল! এ একরকম ফ্যাসাদ আর কি! রেলবিভাগের অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি; বেহারী হইলে হাতটা চিতাইয়া নির্লিপ্তভাবে বলে, "জানে হলমান্‌জি"; বাঙালী হইলে উল্টাইয়া প্রশ্ন করে, "এ লাইনের-কোন্‌ জিনিষটা ঠিক চালে চলতে দেখেছেন মশায়?"

কোনটাই ঠিক ভাবে চলিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, কাজেই চুপ করিয়া থাকিতে হয়।

প্যাসেঞ্জাররা নির্বিকার, নির্বিকল্প। থার্ড ক্লাসে বসিলে প্রায় শোনা যায়, 'কল্কর' সাজিতে সাজিতে কিংবা খৈনিতে তালি দিতে দিতে এখানকার অনুকরণীয় গ্রাম্য হিন্দীতে কেহ বলিতেছে, "আস্‌মানকে বিজলী বানু?"···ইত্যাদি, অর্থাৎ আকাশের বিদ্যুৎ—ও তো এমনি দপ করিয়া নিভিবেই, দপ করিয়া জ্বলিবেই,—এ আর কি নতুনটা দেখিলে সবাই?

তড়িৎ-বিজ্ঞানের এমন বিশদ ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রোতার দল তুষ্ঠ হইয়া বলে, "ওয়াজিব—ওয়াজিব" অর্থাৎ—হ্যাঁ, ঠিকই তো···।"

দুই বন্ধুতে অনেকদিন পরে দেখা। নৃপেন বলিতেছিল, "সো গ্ল্যাড! তারপর, খবর কি? শুনেছিলাম কার মুখে যেন যে এই কলেজেই ভর্তি হয়েছিস। কাছেই থাকি, কিন্তু একবার এসে যে···"

এই সময় হঠাৎ আলোটা নিভিয়া গেল। ওদিক গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল ; লাঠি পাগাড়ি সমেত একদল এদেশী লোক সাঙ্গপাঙ্গোদের হাঁক দিতে দিতে, এবং তারই মধ্যে দু-একজন তারস্বরে মকাই-এর বাজ্ঞাদর আলোচনা করিতে করিতে গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সঙ্গে : —"ই ডেওঢ়া বা হো !" বলিয়া জটলা বাঁধিয়া নামিয়া গেল। থানায় আটব্যাগ আন্যার জলের মতো দুটি লোক অবশিষ্ট রহিয়া গেল। :খন প্রবল

নৃপেন বলিল, "বিলকুল রেহাইদিকে স্বজা-গেল দু'টোকে ছেড়ে !"

ইণ্টার ক্লাসের গাড়ীটা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার কাছাকাছি প্লাটফর্মে আলো নাই, তায় আকাশে মেঘ, তবুও আন্দাজে একটু লক্ষ্য করিয়া দেবেশ বলিল, "না, এরা ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে, বাজে দলটা সবই নেমে গেছে।"

কামরায় তিনটি বেঞ্চ। একটিতে গদি নাই, একটিতে একখানি বিশাল বপু কপট নিদ্রায় সতর্কভাবে নাক ডাকাইতেছে। আগন্তুক দু'টি অন্ধকারে একটু এদিক ওদিক করিয়া দেবেশের বেঞ্চির এক কোণেই বসিয়া পড়িল।

নৃপেন বলিল, "সে যাই হোক, যখন হাতের মধ্যে পেয়েছি, ছাড়ছি নে। আমার বাড়ি তিনটি স্টেশন পরেই, নেমে অন্তত একটা দিন কাটিয়ে যেতেই হবে। ভালো কথা, —যাওয়াটা হচ্ছে কোথায় তাও তা জিজ্ঞেস করিনি ; পেটে এত কথা হুড়োহুড়ি করেছে যে, কোনটে রেখে কোনটে যে জিজ্ঞেস করব…"

দেবেশ বলিল, "ভাই, যেখানে যাচ্ছি তা যদি তোমায় জানাই তো ভয় হয় নেমন্তন্ন কেটে উল্টে সঙ্গ না নিয়ে বস।"

"কি রকম, কি রকম ?"

"যাচ্ছি শ্বশুরবাড়ি, পুশারোড্ স্টেশনে ; তোমার আগেই নেমে যাব। আশা আছে, নিজে অনভিজ্ঞ হলেও…"

'শ্বশুরবাড়ি !'—বলিয়া নৃপেন বিস্ময়ে একরকম চিৎকার করিয়াই উঠিল। "বিয়ে করলে কবে ? কৈ ঘুণাক্ষরেও তো জানাওনি !"

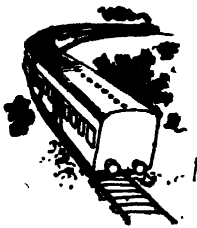
"ঠাকুরমার অসুখের কল্যাণে ব্যাপারটা একেবারে হঠাৎ হয়ে গেল। তবু অপরাধ স্বীকার করছি ; দণ্ডাদেশ করো।"

গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছিল। পাশে দুইটি ভদ্রলোক আছে বটে, তবে তাঁহারা নিশ্চয় বেহারী, তাহার উপর অন্ধকারে তাহাদের মুখ দেখা না যাওয়ায় চক্ষুলজ্জার বালাই নাই। বিশ্রম্ভালাপ খুব জমিয়া উঠিল। বাধামুক্ত গলা গাড়ির আওয়াজেরও দুই পর্দা উপর দিয়া চলিল—শ্বশুরবাড়ির কথায় হৃদয়ের দুয়ায় একেবারে হাট—আদুড় করিয়া দেয় কিনা !

নৃপেন হাসিয়া বলিল, "কি সাজা দোব ? তোমার কাছে এখন রাজার রাজ্যও তো অকিঞ্চিৎকর।" একটু ভাবিয়া বলিল, "বেশ, দিচ্ছি দণ্ড—এক একটি মুহূর্ত এখন

তোমার কাছে অমূল্য, তাই থেকেই তোমায় মোটা রকম কিছু বঞ্চিত করলাম,—অর্থাৎ আমার ওখানেই তোমার আপাতত যেতে হচ্ছে”—বলিয়া আরো জোরে হাসিয়া উঠিল।

দেবেশ জানালার পাতলা আলোর সামনে হাত জোড় করিয়া বলিল, “এই তো হল দণ্ড। এখন আমার স্বপক্ষে একটু আপীল করতে চাই; ভরসা আছে মাননীয় বিচারপতি মহাশয় নিজে মর্মাহত না হলেও যুক্তির সারবত্তা দেখে তাঁর মন টলবে। তা'হলে ধর্মাবতার, প্রণিধান করিতে আজ্ঞা হোক।—এই সামান্য দোষে এক মুহূর্তের জন্যও শ্বশুরবাড়ী থেকে বঞ্চিত করার লঘু পাপে গুরুদণ্ড হ'য়ে পড়ে, কেননা, ধরার তাপদগ্ধ মানবের একমাত্র চরম সান্ত্বনা এই শ্বশুরবাড়ি। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ব'লে গেছেন—ভ্রমর জগতের অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত। সব—গোবিন্দলালেরই আপন—আপন 'ভ্রমর' সম্বন্ধে একথাটা সমানভাবে খাটলেও, তাঁদের নিজের নিজের পিতৃগৃহে সব 'ভ্রমরই' আর অনেকানেকের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর, নিতান্ত খেলো; কেননা তাঁদের চেয়েও এমন সব মধুরতর—মধুরতম জীব সেখানে বিহার করেন যাদের মহিমা বর্ণনায় ভাষাও মৌন হয়ে পড়ে। সেখানে থাকেন শালী—তিনি ধরায় স্বর্গ, স্বর্গে অপ্সরা, অপ্সরায় উর্বশী! সেখানে থাকেন শালাজ—তিনি আবার শালীর চেয়েও শক্তিশালী। ধরার আদেখলো জীব আমরা, হদ্দ স্বর্গ আর উর্বশী পর্যন্ত কায়ক্লেশে ধারণা করতে পারি, সুতরাং এঁদের বর্ণনার চেষ্টা করে কল্পনাশক্তিকে আর অপদস্থ করব না।



শ্বশুরবাড়ীর মর্ম যে শুধু আমরাই বুঝেছি তা নয়; দেবতারাও বাদ যান না। আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতাদের জ্বাল দিয়ে ক্ষীর করলে তিনটি বড় বড়তে এসে ঠেকেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ব্রহ্মা আগে কি রকম ছিলেন বলা যায় না, তবে বার্ধক্যে এসে পিতামহ হওয়া পর্যন্ত চরাচরে শ্বশুরবাড়ি সৃষ্টি করা নিয়ে মেতে আছেন। বাকি রইলেন বিষ্ণু আর মহেশ্বর; এদের শ্বশুরবাড়ী—প্রীতি ব্যাখ্যান ক'রে কবি কি মন্তব্য দিচ্ছেন ধর্মাবতারের শুনতে আজ্ঞা হোক—

হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে পয়োনিধৌ
অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুর-মন্দিরম্।

"হর, অর্থাৎ মহেশ্বরের শ্বশুরবাড়ী হল হিমালয়ে, তিনি সারা জীবনটা সেখানেই কাটিয়ে দিলেন। হরির, কি না বিষ্ণুর শ্বশুরবাড়ী হল পয়োনিধি অর্থাৎ সমুদ্র, কেননা বিষ্ণুজায়া লক্ষ্মীর উদ্ভব সেইখানেই; তাই তিনি সেইখানেই শয়ন করে কাটালেন। এইসব দেখেশুনে কবি বলছেন, এই অসার সংসারে 'শ্বশুর মন্দিরম্'ই হচ্ছে সার বস্তু। সুতরাং ধর্মাবতার যদি অধমকে এ হেন শ্বশুর মন্দির থেকে বঞ্চিত করেন তো···"

পাশের ভদ্রলোকটি বেশ একটু জোরে গলা খাঁখারি দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বসিল। দেবেশ নৃপেনের গা-টা টিপিয়া গলা নামাইয়া বলিল, "বোধ হয় বাংলা বোঝেরে।"

কথাগুলো নৃপেনের লাগিতেছিল ভাল এবং ক্রমে খোদ বন্ধুপত্নীর সরসতর প্রসঙ্গে আনিয়া ফেলিবার বাগ খুঁজিতেছিল, আস্তে বলিল, "বোঝে তো মাথা কেটে নেবে, হ্যাঃ।" তাহার পর জোরেই বলিল, "এ যুক্তির ওপর তোমায় মার্জনা করা যায় না; বৈষ্ণবিক ভাষায় বলতে গেলে 'এহ বাহ্য', আরও কিছু থাকে তো বলো।"

পাশের সহযাত্রীটির গলার আওয়াজে যে একটু কুণ্ঠা আসিয়া পড়িতেছিল তাহা আর জমিতে পারিল না। তাহা ভিন্ন শ্রোতার শুনিবার ইচ্ছার চাহিতে বক্তার বলিবার ইচ্ছা কম বলবতী ছিল না। দেবেশ বলিয়া চলিল, "একে তো এ-হেন শ্বশুরবাড়ী যাত্রা তাতে আবার যাত্রার উপলক্ষ্যটা গুরুতর; কাল জামাইষষ্ঠী। এই দিনটার দিকে সাধারণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমিও সারাটি বছর সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছি, যদি বঞ্চিত হই তো আয়ুক্ষয় হবে, আবার একটা বছর বেঁচে থাকার উৎসাহ হারাব। তিনশ' পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে ভগবান প্রজাপতি এই দিনটি লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে আমাদের জন্যে আলাদা করে দিয়েছেন। এদেশটা নীরস! এই গাড়ী যদি বাংলাদেশের গাড়ী হ'ত তো আদমসুমারী করলে দেখা যেত, এর শতকরা নব্বই জন জামাই। হরেক রকমের জামাই —সিদে জামাই, কুঁড়ো জামাই, আনকোরা, দোজবরে জামাই, চেঙা জামাই, বেঁটে জামাই, মাকুন্দা আর গুঁপো জামাই—মোটকথা যতরকমের জামাই আজ পর্যন্ত বিয়ের বাজারে বেরিয়েছে। বাকী দশজন হচ্ছেন শ্বশুর কিংবা সম্বন্ধী জাতীয় শহর থেকে জামাইষষ্ঠীর বাজার ক'রে ফিরছেন। আহা, চিন্তায়ও সুখ,—বাড়িতে কিংবা হস্টেলে যার দিকে দিনান্তেও কেউ একবার ফিরেও তাকায় না, আছি কি গেছি—সেই নগণ্য দ্যাবার জন্যে শাশুড়ী এতক্ষণ বোধ হয় চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় তৈরী করতে ঘর্মাক্ত; শালীমহল সুমিষ্ট প্রবঞ্চনার নতুন নতুন উপায় আবিষ্কারে ব্যস্ত। ছোট শহর, সেখানে সব জিনিস পাওয়া যায় না, শ্বশুরমশাই আজ সারাটি দিন বোধ হয় রোদবৃষ্টি মাথায় ক'রে আমারই রসনাতৃপ্তির জন্যে সারা মজঃফরপুর ঘেঁটে বেড়িয়েছেন—কে জানে বোধহয় এই গাড়ীতেই কোথাও বসে হৃষ্টচিত্তে ভাবছেন—যাক্, দিব্যি আমগুলো পাওয়া গেছে, দেবেশ আমার ল্যাংড়া যেমন ভালবাসে। সে বেচারির এইতেই ফূর্তি। দেবেশ ভালবাসে এইতেই তিনি কৃতার্থ—হাত্তোর বোকারাম রে!

"এই জন্যেই তো গিন্নীকে শাসিয়ে রেখেছি—দেখ, যদি মেয়ে হয় তো তোমায় ডাইভোর্স করব কিন্তু। আমি করব উপার্জন, তার ওপর আবার বাজার করতে পায়ে ঘাঁটি পড়াব, আর সে-ব্যাটা জামাই—নবাব খাঞ্জা-খাঁ আমার বিবি পায়ের ওপর পা দিয়ে···"

শেষ হইবার পূর্বেই দুজনে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং পাশের লোক দুটিও অর্ধস্ফুট হাসিতে কাঁপিতে লাগিল। মুখ দেখা না গেলেও দেবেশ তাহাদের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপলোক বাঙলা সমঝেতেহেঁ মালুম পড়তা; ঠিক হ্যায় কি নেহি কহিয়ে না—হাম মরে কামা করকে, আওর···মেরা দামাদ···"

নৃপেন হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আর যদি জামাই হয়ই তোমার দুর্ভাগ্য-বশত?"

দেবেশ বলিল "তা হলে আমার চেয়ে তারই দুর্ভাগ্য বেশী! বাবাজী যেমনি পাঞ্জাবী দুলিয়ে, কোঁচা লুটুতে লুটুতে জামাইমার্কা মৃদুহাস্য করতে করতে লটবর চালে গাড়ী থেকে নেমে এসে প্রণাম করবেন, অমনি গলাটি টিপে ধরে রাস্তার দিকে মুখটি ফিরিয়ে দিয়ে বলব, যাও, সিধে উল্টোমুখে। মেয়ে দিয়েছি, হয়ে গেছে, আবার এখানে কি মনে করে সোনার চাঁদ···?"

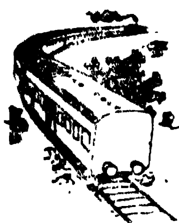
হাসি চলিতে লাগিল। পাশে দুইটি অপরিচিত লোক, এই চিন্তায় যা বা একটু সংকোচ ছিল সেটা ক্রমে ক্রমে একেবারেই কাটিয়া গেল। ক্রমশ এ-দুজনের চক্ষে তাহারা রসিক ও সমঝদার হিসাবে যেন দলভুক্তই হইয়া পড়িল। অন্ধকারে বয়সও ভাল বোঝা যায় না, এবং সেইজন্যই সমবয়সী বা কাছাকাছি ঐরকম বলিয়া ধরিয়া লইতেও আটকাইল না। দেবেশ মাঝে মাঝে তাহাদের সাক্ষী মানিতে লাগিল, "ঠিক হ্যায় কি নেহি, সাহেব,—কহিয়ে—"

অন্ধকার ভেদ করিয়া এবং নিবিড়তর অন্ধকার গর্ভে পুঞ্জীভূত করিয়া গাড়ি ঠায় চলিয়াছে। এই রহস্যময় আবেষ্টনীকে নব্য জামাতার কৌতুকময় শ্বশুরালয় রহস্য বেশ একটি অদ্ভুত রসে আর্দ্র করিয়া তুলিল।

নৃপেন বলিল, "আপীলের যুক্তি খুব সাবধান বটে! এইরকম একজন ভাবী শ্বশুরকে তার নিজের শ্বশুরমন্দিরে যেতে দেওয়া তবেই চলে, যদি তার নিজের শ্বশুর সমুচিত অভ্যর্থনার জন্য লগুড়হস্তে দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে থাকতে রাজী হন। তা' তোমার শ্বশুরের মতামত যখন এখানে পাচ্ছি না···"

কণ্ঠস্বরে ভয়ের অভিনয় করিয়া দেবেশ তাড়াতাড়ি বলিল, "না, ধর্মাবতার, মাফ করা হোক, ওটা সাক্ষীর temporary insanity, সাময়িক মস্তিষ্ক বিকার—আপনার মূলে দণ্ডের আদেশ শুনে অবধি তার মাথার ঠিক নেই কিনা···আর একটা কথা তোমায় আগে বলতে ভুলে গিয়েছি ভাই,—প্রফেসর গুপ্টার কল্যাণে তোমার দণ্ড আমি আগে থাকতেই ভোগ করে বসে আছি, আর বল কেন; না হলে বেলা দেড়টার গাড়িতে

কোথায় আলোয় আলোয় আলো ক'রে যাব, না, অন্ধকার রাত্রে এই যমালয় যাত্রার দুর্ভোগ। লোকটা দিলে না ছুটি কোন মতে হে!"
নৃপেন একটু বিরক্তভাবে বলিল, "ওটার কথা আর বোল না; একটা বেরসিক ভূত··· শ্বশুরবাড়ির নামে অত খেপচুরিয়াস কেন রে বাপু! নিজে বিয়ে করলিনি করলিনি, কপালে নেই; তা ব'লে···"
বাধা দিয়া দেবেশ বলিল, "বিয়ে করলে না! তুমি তাহলে লেটেস্ট দাম্পত্য-বুলেটিন অবগত নও দেখছি;—আরে, গুপ্টা সাহেব যে মুড়িয়েছেন মাথা শেষপর্যন্ত; তুমি আছ কোথায়? আর দুর্ভাগ্যক্রমে পুশাই হয়েছে তাঁর প্রয়াগক্ষেত্র; তাই তো নেহাৎ শিষ্যসমভিব্যারে যেতে হবে বলে···"
"থ্রি চিয়ার্স ফর প্রফেসর গুপ্টা হুররে!' অন্ধকারেই হস্তটা তুলিয়া নৃপেন চিৎকার করিয়া উঠিল।



ও বেঞ্চের স্থূলকায় লোকটি সশব্দ কপট নিদ্রার মধ্য দিয়া কখন অনাড়ম্বর অকপট নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল; হুড়মুড়িয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে জিন্তে-ও?" সঙ্গে সঙ্গে ভুলটা বুঝিতে পারিয়া আবার শুইয়া পড়িয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।
দেবেশ হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয় মাড়োয়ারী, আজ কলেজটাউন ক্লাব ম্যাচে কিছু টাকা ধরে থাকবে···নাও, আর থ্রি-চিয়ার্সে কাজ নেই।··বেজায় চটেছি লোকটার ওপর। ওর সাবজেক্টে পার্সেন্টেজটা কম আছে, ভাবলাম, কাজ কি—হাজরিটা একটু দিয়েই সোজা ওই দিক দিয়েই চলে যাব। কমন রুমে গিয়ে ব্রজেশের কাছে সিল্কের পাঞ্জাবী আর চাদরটা রেখে তার কোটটা খুলে গায়ে দিলাম; প্রফেসার্স রুম থেকে গুপ্টা সাহেব বেরুচ্ছে—যথাসম্ভব বিষণ্ণ হয়ে, মাথা নীচু করে বললাম, 'স্যার, বাবা খবর পাঠিয়েছেন—পিসিমা খুব অসুস্থ—যদি এটেণ্ডেন্স্ নিয়ে ছুটি দেন তো দেড়টার গাড়ীতে···অবস্থা নাকি বড়ই সংকটাপন্ন—ডিলিরিয়ামে খালি আমার নাম ক'রে···'
টপ করে, কি বললে জানো?—বললে 'তাই—তাড়াতাড়ি এসেম্সে বোঝাই হ'য়ে চলেছে বুঝি ছুটে—?'
"কমনরুমে পাঞ্জাবিটা খোলবার সময় বুক-পকেট থেকে রুমালটা প'ড়ে গেল, তুলে

কোটের পকেটে তাড়াতাড়ি গুঁজে নিই, অত কি মনে থাকে ?···সব তো বুঝিস বাপু—কে সঙ্কটাপন্ন—কার ডিলিরিয়াম্—বকবার অবস্থা—ভায় নতুন বিয়ে করেছিস, ভাজ করেই বুঝিস. দিলেই পারতিস একটু ছুটি, কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত ?···সেখানে সে বেচারি হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে আছে···"

নৃপেন দুঃখের ভান করিয়া বন্ধুর মুখের দিকে হাতটা বাড়াইয়া বলিল, "আর বোল না, আমি হঠাৎ কবি-বাল্মিকী হ'য়ে বুঝি শাপ দিয়ে বসি—'মা গুণ্টা প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতি সমা'···ওঃ. লোকটা কী নৃশংস হে ! তোমার এইরকম উৎকট আঘাত দিয়ে কোন মুখে আবার নিজে শ্বশুরবাড়ী যাবে ?"

দেড়টা হইতে রাত আটটা পর্যন্ত এই যে বিরহ, তাহার আলোচনায় দেবেশের মনটা তাহার অজ্ঞাতসারেই একটু ভারী হইয়া পড়িল, ওদিককার বিরহবিধুর মুখখানি বোধ হয় বড় স্পষ্ট হইয়া উঠিল, বলিল, "চুলোয় যাক, তুমিও যেমন !···পকেটে দেশলাই রাখ : একটু ধোঁয়া খেতে হবে, দেশলাইটা আনা হয়নি ।"

নৃপেন বলিল, "না, আমার ও হাঙ্গামা নেই. তুমিই বা ধরলে কবে থেকে ?—আগে তো খেতে না ।" সিগারেটের বাক্সটা বাহির করিতে করিতে দেবেশ পাশের লোক দুটির দিকে চাহিয়া বলিল, "আপলোগ দিয়াশলাই রখতে হ্যায় ?"

একজন খুক্ খুক্ করিয়া একটু কাসিল মাত্র, অপর লোকটি কোন কথা না বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ওদিককার গদিবিহীন বেঞ্চের উপর গিয়া বাহিরের দিকে মুখটা বাড়াইয়া বসিয়া রহিল ।

তাহার গতিবিধিটা এতই আকস্মিক এবং অসংগত যে দুই বন্ধুতেই যথাসম্ভব চাপা-গলায় হাসিয়া উঠিল। দেবেশ হাসিতে হাসিতেই বলিল, "একেবারে স্থানত্যাগেন দুর্জনম্ ! তা' যাক, বাঁচা গেছে ।" একটু চাপা গলায় বলিল, "এখন ইনি গেলে আরও একটু প্রাণ খুলে কথা কই !···হ্যাঁ, সিগারেট ধরবার কথা জিজ্ঞেস করছিলে ? ভাই, শ্বশুরমশাই দেখে শুনে অনেক খোঁজখাঁজ নিয়ে দিব্যি একটি অতীব শান্তশিষ্ট, সচ্চরিত্র ছেলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিলেন,—পানটি পর্যন্ত খায় না, মাটি থেকে চোখ তুলে কথাটি কয় না. নিরীহ গোবেচারি, এককথায় বলতে গেলে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। তাঁর মেয়ে কিন্তু এ-হেন জামাতা-রত্নটিকে, একেবারে বিগড়ে দিলে—চারিদিক দিয়ে—"মস্তকটি চর্বণ করে দিলে আর কি, অবশ্য ক্রমশঃ···

"একদিন, কি যে বলে বেশ, একটা ইয়ের জন্যে খোসামোদ করছি,—গিন্নি হঠাৎ বেঁকে বসলেন—'অত লক্ষ্মী, ভালো মানুষ, তোমার আবার এসব শখ কেন ? এদিক তো চুলটি পর্যন্ত আঁচড়াতে জানো না, পানটি খেতে জানো না !'

সদ্য সদ্য প্রাণের দায়ে শ্রীহস্তের একটি পান খেয়ে সে-ঝোঁকটা সামলান গেল ।—অধোগতির প্রথম ধাপ ।

পরের বারে শ্বশুরবাড়ী যাবার আগে—,সেলুনে ঢুকে দিব্যি দশ-আনা ছ'-আনা ক'রে চুল ছাঁটিয়ে নিলাম। মাথায় প্রথম টেরি উঠল।

"দেবী প্রথম দিকটা বেশ প্রসন্নই রইলেন, উৎসাহ পেয়ে যখন আবদার খুব বাড়িয়ে দিয়েছি, হঠাৎ পরিবর্তন। 'অপরাধ?'—সবিনয় কাতর প্রশ্নের উত্তর হোল—

'ছোট পিসেমশাই যখন আসেন, সিগারেটের গন্ধে বেশ মনে হয়—হ্যাঁ, বাড়িতে জামাই এসেছে বটে। আমার সে সাধ মেটাবার নয়, আমিও কারুর এ সব বিদঘুটে সাধ মেটাতে চাই না...'

"কি করব বলো?—ধরলাম।—পিসশ্বশুরের টিন থেকে চুরি করা চারটে 'গোল্ড-ফ্লেক' আমার ব্রতভঙ্গের জন্য অপেক্ষা করছিল, শ্বশুরের কন্যা সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।..তারপরে গোঁফজোড়াটির উপর শুভদৃষ্টি পড়ল। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি নৃপেন, আমার অমন যত্ন ক'রে পোষা নিরীহ গোঁফ জোড়াটির ল্যাজ কেটে তাকে এরকম উগ্র আর তেজী ক'রে তোলবার আমার কখনই ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু কি রকম বেকায়দায় আমায় ফেলে যে...তা যদি শোন..."

"নিশ্চয় শুনব"—বলিয়া নৃপেন বন্ধুর দিকে আর একটু ঘেঁসিয়া বসিল; তাহার পর যেন বড়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এইভাবে বলিল, "কিন্তু তুমি যে ভয় পাইয়ে দিলে হে—ওঁদের মন পাওয়া তো নেহাৎ চাড্ডিখানি কথা নয় দেখছি! বছর ঘুরতে না ঘুরতে শ্রীপাদপদ্মে ভালো ছেলে ব'লে যে এতদিনকার সুনাম তা জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে, ঘাড়ের চুল; গোঁফের মূল বলিদান দিতে হয়েছে—অথচ এখনও আইবুড়োর গন্ধ ভাল ক'রে যায়নি গা থেকে।...আচ্ছা প্রফেসর গুপ্টা তাহ'লে কি দিয়ে দেবী-মর্যাদা রক্ষা করলেন? সে বেচারির তো গোঁফসম্পদও ছিল না; আর সিগারেট তো তাঁর একটা অঙ্গাবিশেষই ছিল বললেই চলে..."

দেবেশ বন্ধুর কাঁধে ভর দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি বুঝি গুপ্টা সাহেবকে দেখনি এদিকে?—তাঁকে বাবরী চুল রাখতে হয়েছে, চাপদাড়ি আর গোঁফ কালচার করতে হয়েছে—যেন মাঝবয়সের রবিবাবুটি; সিগারেটের পাটই উঠিয়ে দিতে হয়েছে, তার জায়গা নিয়েছে শুদ্ধ, সনাতন পান আর দোক্তা—ভিন্নরুচিহি স্ত্রীলোকাঃ...এখন যদি সামনে গুপ্টা সাহেবকে দেখ তো আর চিনতে পারবে না—সে স্মার্টনেস কোথায় গেছে—এখন দেখবে দিব্যি নাদুসনুদুস গেরস্ত "

"বটে।"

"তবে আর বলছি কি?—তুমি এসো না একবার কলেজে, একবার নব কলেবরটি দেখে যাও,—চলে এস একবার..."

অতদিন অপেক্ষা করিতে হইল না।—

এই সময় গাড়িটি পুশা রোড় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিয়া গতিবেগ কমাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে, কি নিগূঢ় কারণে তা' হনুমানজিই জানেন, বিজলি বাতি দুইটি সমস্ত

কামরাটি অত্যুজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত করিয়া হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল—সুপ্তোত্থিতের মত যেন—একেবারে তাজা হইয়া।

দুই বন্ধুতেই দেখিল—পাশেই দাড়ি গোঁফে আবৃত মুখ, বাবরীর মাঝখানে সিঁথে কাটা, নাদুসনুদুস গেরস্ত গোছের একটি বাঙালী ভদ্রলোক বসিয়া আছে, মুখের পান চিবোন হঠাৎ বন্ধ করায় গালদুটি ঈষৎ ফোলা, গায়ে শ্বশুরবাড়ির উপযুক্তই বেশভূষা ···চিনিতে আর কাহারও বাকী রহিল না।

পানটা চিবাইতে আরম্ভ করিয়া জড়িত রসনায় কহিলেন, "এই যে দেবেশ দেখছি···ইয়ে তোমার পিসিমা···মানে, এই গাড়িতেই যাচ্ছ বুঝি ?···"

উত্তর দরকার হয় না,—এই গাড়িতেই তো যাইতেছেই, একসঙ্গে আসিতে হইল অতটা ; তবুও সম্মোহিতের মত দেবেশ মাথা নিচু করিয়া বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ—মাসিমার ভারি ··ইয়ে, পিসিমার বড্ড···আপনি বুঝি···এই গাড়িতেই ?...."

ঘুরিয়া তাড়াতাড়ি দরজার দিকে পা বাড়াইল। গদিহীন বেঞ্চ হইতে অপর ভদ্রলোকটি ততক্ষণ উঠিয়া ঘাড় গুঁজিয়া দরজামুখো হইয়াছেন। সামনে কুলির মাথায় একটা বড় চ্যাঙাড়ি, ওপরে বাছা বাছা কটা ল্যাংড়া আম দেখা যায়। দেবেশ ঘুরিতেই চোখাচোখি হইয়া গেল।—

"এই যে বাবাজি···এই গাড়িতেই বুঝি আসা হ'ল ?···আমি ভাবছিলাম বুঝি···থাক্ থাক্ দীর্ঘজীবী হও···প্রণাম হয়েছে—ওঠ...."

ভক্তিমান জামাইয়ের তখন মাটি ছাড়িয়া ওঠা যে কি ঘোর সমস্যা শ্বশুর বোধ হয় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন।



দীনু রক্ষিত

গাড়িটা আসিতেছে লোহার থেকে। যাত্রীদের অনেকে আসিতেছে আরও ওদিক থেকে। পেশোয়ারের লোকও আছে। বেশি না হোক অন্ততঃ একজন তো আছেই, একটি কাবুলী। সে একটা ছোট কামরায় একখানা গোটা বেঞ্চ দখল করিয়া আড় হইয়া শুইয়া মালা জপিতেছে।

সমস্ত গাড়িটাতেই খুব ভিড়; তবে এ কামরাটায় ভিড়ের একটা বিশেষত্ব আছে—যা কিছু ভিড় এদিককার দু'খানা বেঞ্চে আর বাঙ্কে। বাঙ্কের উপর মোটমাটের সঙ্গে একটি লোক কুঁজো হইয়া বসিয়া আছে। নিচের দু'খানা বেঞ্চ ঠাসা;—প্রায় একখানা গোটা বেঞ্চ জুড়িয়া সপরিবার একটি পশ্চিমা ভদ্রলোক, বাকি জায়গাটুকু এবং অপর বেঞ্চ মিলাইয়া সাত জন। নিচের স্থানটুকুতে পা পাতিবার জো নাই। ওদিকে রাস্তা জুড়িয়া দুইজন বসিয়া আছে, একজন একটা বিছানার গাঁঠরির উপর এবং একজন একটা বাক্সের উপর।

গাড়ির বাকি দুইটি বেঞ্চের মধ্যে ধারেরটিতে কাবুলী ঐ ভাবে শুইয়া জপ করিতেছে। মাঝখানেরটিতে তাহার জিনিসপত্র। জিনিসপত্র রাখিয়াও একটু জায়গা খালি আছে; কিন্তু কোন লোক নাই।

আসানসোল স্টেশনে গাড়ি থামিলে দু'একবার উঁকিঝুঁকি মারিয়া একটি বাঙালী উঠিল—রোগা রোগা চেহারা, বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়স, গায়ে পাঞ্জাবী, হাতে একটা ছোট—এটাচি-কেস। গাড়ির অবস্থা দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর দ্বিতীয় বেঞ্চে সেই খালি জায়গাটুকুতে বসিয়া বলিল—"সেলাম আলেকুম আগা সাহেব।"

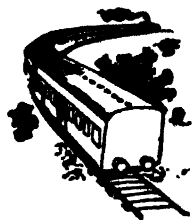
মধ্য দিয়া সে জানালা গলাইয়া জিনিসপত্র কুলির নিকট হইতে লইয়া গাড়িতে জড় করিতেছে। বোধ হয় মনিবকে ভাল রকম চেনে বলিয়া উত্তর দিল না।

এদিকে উমেশ পাচক বামুনের সাহায্যে দরজা দিয়া জিনিসপত্র তুলিতেছিল। বলিল —"আপনি ব্যস্ত হবেন না। উঠে এসে বসুন। জিনিসপত্র প্রায় সব উঠে গেছে; আমি গার্ড সায়েবকে বলে দিয়েছি, ছাড়বে না গাড়ি।"

ভদ্রলোক দোরের সামনের এবং ওদিকে রামখেলানের নিকট জড় করা লগেজের স্তূপের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া নিরাশভাবে বলিলেন—"সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল; আমি জানি—একটি জিনিস হিসেব মতো ওঠেনি—কাল থেকেই তোমার আর তোমার বোনের যে রকম গড়িমসি—আমি জানি ঠিক এইটি ঘটবে···যা ইচ্ছে তোমাদের কর,—গার্ড সায়েব বোনাই তোমার, গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখবে।"

আধা ঘোমটার মধ্য হইতে দাঁতে পেষা অস্ফুট শব্দ হইল—"মুয়ে আগুন!"

ভদ্রলোক আর কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া শিথিল চরণে উঠিয়া আসিয়া একটি বেহারী ভদ্রলোকের পায়ের উপর প্রায় মণ দুয়েকের চাপ দিয়া বসিয়া পড়িলেন।



উমেশ মোটপত্র সব উঠাইয়া রামখেলান আর পাচকের সাহায্যে উপরে নিচে গুছাইয়া রাখিল। যে ভদ্রলোকটির 'ওগো'-ভীতি সব-চেয়ে বেশি প্রবল, গৃহিণী আসিয়া তাঁহারই বেঞ্চের কাছটিতে কাচ্চা-বাচ্চা লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। নিরুপায় ভদ্রতার খাতিরে তিনি নিজের বিছানা গুটাইয়া অপর দিকে চলিয়া গেলেন।

উমেশ একটা গাঁঠরি খুলিয়া একটা বিছানা পাতিয়া বলিল···"নাও, তোমরা বস দিদি, আপনিও আসুন বাঁড়ুয্যে মশাই এই দিকটায়।···কুলকুচির হাঁড়িটা নিয়ে তেরটা আইটেম্ আছে, কুঁজো চারটেকে একসঙ্গে বেঁধে দিয়েছি; বঁটি, চাকি-বেলুনগুলো বেতের ঝুড়িটার মধ্যে আছে, মাদুরটা···"

ভদ্রলোক বলিলেন—"মানুষ সব উঠেছে?···কুলকুচি পড়ে থাকবে না, তা আমি জানি —তোমার দিদি আমায় ফেলে যেতে পারে; কিন্তু কুলকুচিও পড়ে থাকতে দেবে না, তেঁতুলও পড়ে থাকতে দেবে না; বলি মানুষ সব উঠেছে?"

উমেশ বলিল—"দিদি, দিদির কোলে খোকন—লুটরু—অনাথ—মীনু—বাণী···"

ভদ্রলোক আবার একটু সচকিত হইয়া উঠিলেন—"সাতজন যাবার কথা নয়?"

গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে। উমেশ নামিতে নামিতে হাসিয়া বলিল—"আর আপনি কোথায় গেলেন ? মানুষের বাইরে নাকি ?"

সঙ্গে সঙ্গেই আমার নিজের বেঞ্চ হইতে আবার দাঁতে পেষা শব্দ হইল—"মুয়ে আগুন, ভীমরতি হয়েছে !"

বোধ হয় লজ্জাটাকে চাপা দেওয়ার জন্যই ভদ্রলোক গলা বাড়াইয়া বলিলেন—"চিঠির উত্তর দিও।"

একটু দূর হইতে আওয়াজ ভাসিয়া আসিল—"স্কুল বন্ধ হলে কুমু আর রাজেনকে নিশ্চয় পাঠিয়ে দেবেন !"

আপনি আপনিই যেন আমার সেই বেহারী ভদ্রলোকটির দিকে নজর পড়িয়া গেল। ডান হাতের পাঁচটি এবং বাঁ হাতের দুইটি অঙ্গুলী একটু সঙ্গোপনে তুলিয়া ধরিয়া সঙ্গীকে কি একটা ইসারা করিতেছেন। বোধ হয় এই যে আপাতত সাতটির খবর পাওয়া গেল।

আমার বাঙ্কের নিচে যে বেঞ্চিটি, গৃহিণী ছেলেমেয়েগুলিকে লইয়া সেটাতে বসিলেন। কর্তা তাহার পরেই মাঝের বেঞ্চটিতে বসিয়া। যে ভদ্রলোকটির পায়ের উপর তিনি বসিয়াছিলেন তাঁহার ঘুমের নেশা ছুটিয়া গিয়াছে ; উঠিয়া বসিয়াছেন। ডান হাত দিয়া পায়ের গোছটা ধীরে ধীরে মর্দিত করিতেছিলেন, কর্তা বাঙালী হিন্দিতে প্রশ্ন করিলেন—"আঘাত লাগা হ্যায় ?"

ভদ্রলোক নরম প্রকৃতির মানুষ, পায়ের গোছ হইতে হাতটা সরাইয়া লইয়া বলিলেন—"নেহি, কুছ্ চোট নেহি হ্যায় ?"

কর্তা বলিলেন—"থোড়া, ব্যতিব্যস্তো কর দিয়া থা। কাচ্চা-বাচ্চা সাথমে রহনেসে মগজ ঠিক নেহি রহতা হ্যায়।..."

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন—"জি হাঁ, ফিকির তো লগা রহতা হ্যায়।"

কর্তা বলিলেন—"আরও কারণ হুয়া হ্যায়—হামকো কোভি কোন ঝক্কি নহি লেনে দেতা হ্যায় উসবকা মাদার। আর উয়ো সর্বভি হামেশা মা-কোই পাশমে রহতা হ্যায়, বাপ বোল করকে যে একঠো বস্তু হ্যায়..."

কচি ছেলেটা অত্যন্ত কাঁদিতেছিল, তাহার উপরের ছোট মেয়েটি "মামা কাছে যাবো" বলিয়া বায়না ধরিয়া সুরটা ক্রমে ক্রমে সপ্তমের দিকে লইয়া যাইতেছে। বাঙ্কের নিচে চাপা, কিন্তু সুস্পষ্ট শব্দ শুনিলাম—"অনাথ, জিগ্যেস কর দিকিন কানের মাথা খেয়ে বসে আছে ? একটা মানুষ ক'টাকে সামলাতে পারে ? মুয়ে আগুন !"

ভাষা বুঝিতে পারুন বা না পারুন, বলার সুর হইতে বোধ হয় মানেটা আন্দাজ করিয়া বেহারী ভদ্রলোক কহিলেন—"খোঁখী কো আপ ইধর বোলা লিজিয়ে বাবুজী। উস্ বেঞ্চমে জগহ ভি নেহি হ্যায়, তকলিফ্ হোতা হ্যায়...এসো খুখুমণি তোমি হামাদের কাছে।"

খুকী ফিরিয়া চাহিয়া শঙ্কিত ভাবে মায়ের কাছে আরও ঘেঁসিয়া বসিল। কর্তা উঠিয়া তাহাকে লইয়া নিজের পাশে বসাইলেন। বলিলেন—'ভয় কি খুকু!—এই তো তোমার মামা রয়েছেন। ও মামার চেয়ে কত্তো ভাল—কেমন আরও ফর্সা··· ভয় কি?"

খুব সাদা মনেই বলা, কিন্তু ওপর হইতে দেখিতেছি বেহারী ভদ্রলোকের মুখটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। অন্য বেহারী ভদ্রলোক কয়টিও একবার পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করিল। যখন সাক্ষাৎ ভাগনের মায়ের ভাই তখন নিরুপায়ভাবে সহ্য করিতেই হয়, না হইলে এদেশে মামা কথাটাকে গালগালের মধ্যে ধরে।···

ভুলাইবার খুব একটি চমৎকার উপায় বাহির করিয়াছেন ভাবিয়া কর্তা সাদাপ্রাণে বলিয়া যাইতেছেন—"যাবে মামুর কাছে··যাও না··মামী কত···"

ভদ্রলোক প্রসঙ্গটা বদলাইবার জন্য খুকীর মুখটা হাতের চেটোয় তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—"বড়ী খুবসুরৎ হ্যায়।"

এমন কিছু সুন্দর নয় খুকী; কিন্তু কর্তা সহানুভূতিতে গলিয়াই ছিলেন, আরও তরল হইয়া গেলেন। বাঙালী একটু বেশি রকম তরলিত হইলে প্রথম সুযোগেই বৌ বা তৎসঙ্গীয় কথা আনিয়া ফেলে। স্মিতবদনে মেয়েটির মুখের পানে চাহিয়া পিঠে দুইবার হাত বুলাইয়া বলিলেন—"ওতো হোনেই পড়েগা, উসকা মামার বাড়ির তরফকা সবকোই অত্যন্ত সুন্দর হ্যায়। উসকো সেজো মামাকে তো দেখা?"

বেহারী ভদ্রলোকটি নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির, তাহা না হইলে "মামা হইয়াও এমন নিরুপায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিতেন না, বলিলেন—"যো বাবু ইখানে আঁয়ে থেঁ?"

কর্তা বলিলেন—"ওই বাবু। কেসা দেখা? নেই, হামকো সম্বন্ধী বোলকেই নেই বোলতা হ্যায়। উসি মাফিক চেহারা···"

একটা শব্দ হইল—"মুয়ে আগুন!"

ভদ্রলোক বলিলেন—"জি হাঁ, দেখনেমে তো আচ্ছা হ্যাঁয়।"

বিশেষণটি সাধারণ,—কর্তা বেশ ক্ষুণ্ণ হইলেন একটু, খানিকটা উদ্দীপিত ভাবেই বলিলেন—"আপ হামকো অবাক্ কর দিয়া। হাজার মে উস্‌মাফিক অ্যাকটা চেহারা দেখাইয়ে তো। তব আপকো সুরুসে সব বাৎ কহনে পড়েগা দেখতো হ্যায়। হাম তো উমেশকোই দেখ করকে বিবাহ কিয়া,—বিহাহ বুঝতে হেঁ তো?—সাদি।"

মাঝের দ্বিতীয় বেঞ্চের ভদ্রলোক দুইটিও আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিলেন এবং কথাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। একজন একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"উমেশ বাবুকো দেখ্‌কর সাদি ক্যায়সে কিয়া বাবুজী?"

শ্রোতার সংখ্যা বাড়িতেছে দেখিয়া কর্তা বোধ হয় খুশি হইলেন, একটু ঘুরিয়া ভদ্রলোকের পানে চাহিয়া বলিলেন—"তব্ দেখতা হ্যায় আপকো সব ব্যাপার খোল

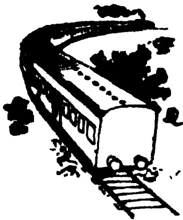
করকে বোলনে হোগা। মানে, হামারা বরাবর জিদ থা বিবাহ করেগা তো আপোনা চোখসে দেখ করকে করেগা, নেইতো কেইসে জানেগা যে শ্বশুর মশাই বোবা, খোঁড়া কি অন্ধো একঠো গলামে লটকায়ে দেতা হ্যায় কি নেহি? অনেক সম্বন্ধ আয়া, অনেক গেয়া। হাম জীবনমরণ পণ করকে জিদ ধরকে বৈঠা হ্যায়; যোভি কোই সম্বন্ধ আতা হ্যায় শর্মা যা করকে চক্ষু কর্ণ'কা বিবাদ ভঞ্জন করকে আতা হ্যায়; কিসীভি পাত্রী ধোপে টিকতা নেহি হ্যায়। অবশেষে এই উমেশকো বোহীন কা সাথ বিবাহ কা বাৎ লে করকে উমেশকো বাপ উমেশকো সাথমে লে করকে উপস্থিত হুয়া। হামরা বাবুজী উস বখত জীবিত থা, হামরা ভাজকো জিজ্ঞাসা কিয়া—'উসকো পুছো —পাত্রী দেখনে ওয়াস্তে জায়গা?'···হাম ভিতরসে খোঁজ করেকে জানা থা, যে উমেশ পাত্রীকা ছোটা ভাই হ্যায়। ভাজকো বোলা—'নেই; দরকার নেই হ্যায়।' ওয়ান অ্যাণ্ড অল্ সবকোই স্তম্ভিত হো গিয়া। ভাজ তোফারি ভি কিয়া···

একটি অস্ফুট শব্দ হইল—"মুয়ে আগুন।"

দ্বিতীয় ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন—"বাবুজী 'ভাজ' কিসে কহতে হ্যায় আপলোক?"

কর্তা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আপ অবাক্ কর দিয়া! 'ভাজ' কিসকো কহতা হ্যায় নেহি জানতা হ্যায়? দুনিয়ামে তব কেয়া করনেকো আয়া হ্যায়? ভাজ হুয়া বড়া ভাইকো পরিবার···"

ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—"ও সমঝা, আপকা মতলব 'ভাবী' হ্যায়!···তো ফিন্ ভাবীনে কেয়া তফরী কী?"



আমি উপরে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। প্রথম ভদ্রলোকটি যে প্রকৃতির এ লোকটি সে প্রকৃতির নয়। কিন্তু কর্তা এমন লজ্জাজনক অবস্থা করিয়া তুলিয়াছেন যে আত্মপ্রকাশও করিতে পারিতেছি না। নিরুপায়ভাবে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম।

কর্তা বলিলেন—"ভাজ তোফারি কিয়া—ঠাকুরপো আঁখসে নেহি দেখ করকেই ভালোবাসা···।"

সেই দন্তপিষ্ট-শব্দ—"মুয়ে আগুন!"

বোধ হয় আমার নিচের বেঞ্চে ছেলেমেয়েগুলি ঢুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রথম ভদ্রলোকটি বলিলেন—"বাবুজী, অওর দো বচ্চোঁকো ইধর লে আইয়ে; উন্ সবোঁকি নিন্দ আই হ্যায়, মাজী কি তকলিফ হো রহি হ্যায়।"

কর্তা একেবারে গলিয়া গেলেন, হাত নাড়িয়া বলিলেন—"কুছভি তাক্লিফ্ নেঁহ্ হ্যায়, পাঁচটা কো জায়গামে যদি পাঁচ দ্গ্নে দশটা লেড়কা লেড়কি উমেশকো বোহীনকা দেহপর লটকায়কে রহে তোভি—না রাম না গঙ্গা, কুছভি নেহি বেলেগা। শি ইজ্ এ ভেরি কোয়াএট লেডি (অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির স্ত্রীলোক)।"

প্রথম ভদ্রলোকটি, বোধ হয়, একটা কিছু বলিবার জন্যই বলিলেন…"বাঙালী লেডি সব হোতে ভি হ্যাঁয় বড়া নরম মেজাম কা।"

দ্বিতীয় ভদ্রলোক সমর্থন করিলেন—"বেশ্‌ক, বেশক্।"

কর্তা আরও গলিয়া গেলেন, শরীরটা আরও যেন ভাবাবেশে এলাইয়া আসিল, বলিলেন—"বিশেষ করকে উমেশকো বোহীনকে মাফিক নরম মেজাজ আপলোক কল্পনাও নেহি করনে শকেগা। অকেলা আদমি উদয়াস্ত একঠো না একঠো কাজ লেকরকেই হ্যায়, নিঃশ্বাস ফেকনে কা ফুরস্ৎ নেহি রহতা। উসকা উপর হামারা আপিস হ্যায়, লেড়কা লেড়কী সবকা স্কুল হ্যায়, বাচ্চা সবকা দৌরাত্ম্য হ্যায়—লেকিন কোভ্ভি কিসিকো একঠো কড়া বাত নেহি বোলতা হ্যায়, মানে দেহমে রাগ বোলকে কোন বস্তু নেহি হ্যায়।"

রাগহীন মানুষটির নিকট হইতে আবার সেই সাগ্নিক বক্তব্য। পরস্ত্রীর এবং স্ত্রীর সামনেই এবং তদুপরি তাহার স্বামীর কাছেই এরকম ঢালোয়া প্রশংসা শুনিয়া বেহারী ভদ্রলোক দুইটিও যেন কি রকম হইয়া পড়িতেছিলেন। প্রথম ভদ্রলোকটি বোধ হয় জড়তাটা কাটাইবার জন্যই বলিলেন—"আপ বড়া ভাগ্যবন্ত হ্যাঁয় বাবু সাহেব।"

কর্তা তখন এত গলিয়া গেছেন যে আর যেন কথা বাহির হইতেছে না। একটু তৃপ্ত হাসির সঙ্গে সামনে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন,—দাম্পত্যরসে মুখখানি দীপ্ত হইয়া গাল দুইটি টক্‌টক্ করিতেছে, স্থূল মাংসল দেহটি গাড়ির দোলায় অল্প অল্প দুলিতেছে, কতকটা যেন তুরীয় ভাব! একটু থামিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"ভাগ্যো কা বাত অগর কহা তো আপলোককো স্রুসে সব বাৎ কহনে পড়েগা। বিবাহ যো হুয়া সে তো বহুৎ কাটখড় পুড়ায়কে। সব কথাবার্তা তো ভাঙ্ গিয়া থা। লেকিন…"

হঠাৎ যেন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া একটু চুপ করিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি প্রশ্ন করিল—"লেকিন কিয়া বাবু সাহেব?"

প্রথম ভদ্রলোক অপ্রতিভ ভাবেই বলিলেন—"অগর উজুর রহে তো ছোড় দিজিয়ে কহনা।"

ভদ্রলোক বলিলেন—"না, আপলোক কো সামনে উজুর কেয়া। বোলতা থা বহুত রোজ লেকরকে বিবাহকা কথাবার্তা হোনেসে পাত্র আর পাত্রী কা বিচমে একঠো লাভ্—মানে প্রণয় হো জাতা হ্যায় না? …হাম ইধার কহা উমেশকো বোহিন ছাড়কে

আর কিসিকো বিবাহ নেহি করেগা, উধার উমেশকো বোহীন ভি খনুর্ভঙ্গ পণ কর লিয়া···"

ওদিক হইতে আর কোন মন্তব্য শোনা গেল না, বোধ হয় কর্তা অবস্থাটা বাক্যাতীত করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়াই।

পাটনার আগের স্টেশন গুলজারবাগ আসিয়া পড়িল, আমায় নামিতে হইবে এখানে। কিন্তু ভদ্রলোকের রোম্যান্স তখন প্রবল বেগে নামিবার উপক্রম করিতেছে। বড় দ্বিধায় পড়িয়া গেলাম। একদিকে স্বজাতি অপরদিকে বেহারী ভদ্রলোক, আবার ওদিকে অসহায়া "উমেশকো বোহীন"—জীবন্মৃতা হইয়াই আছেন, বাঙালী দেখিয়া তাঁহার অবস্থা যে কি হইবে···

গার্ড হুইসিল্ দিয়াছে। তাড়াতাড়ি সতরঞ্চি আর চাদরটা গুটাইয়া কোটটা গুঁজিয়া লইলাম। সিল্কের চাদরটা মাথায় জড়াইয়া লইয়া নামিয়া পড়িলাম। কর্তাকেই বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানী উচ্চারণে প্রশ্ন করিলাম—"কোন ইস্টিশান্ বাবু সাহেব?"

কর্তা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, বুঝিলাম জাত ভাল করিয়া ঢাকা পড়ে নাই।···উত্তর করিলেন না। বেহারী ভদ্রলোকেরাও নয়।

উত্তরের দরকার ছিল না। দুয়ারটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া চলন্ত গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলাম।



জামাইষষ্ঠী

হঠাৎ বিজলিবাতি নিভিয়া গিয়া গাড়িটা অন্ধকার হইয়া গেল।

এ লাইনে এরকম হইয়াই থাকে। গুছাইয়া-সুছাইয়া বসিয়া, বইখানি খুলিয়া নিশ্চিতমনে পড়িতে বসিলে দপ করিয়া আলোটা নিভিয়া গেল। 'দুত্তোর' বলিয়া হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িলে, তেমনি হঠাৎ আলোটা জ্বলিয়া উঠিয়া চোখের উপর ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল! এ একরকম ফ্যাসাদ আর কি! রেলবিভাগের অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি; বেহারী হইলে হাতটা চিতাইয়া নির্লিপ্তভাবে বলে, "জানে হলমান্‌জি"; বাঙালী হইলে উল্টাইয়া প্রশ্ন করে, "এ লাইনের-কোন্ জিনিষটা ঠিক চালে চলতে দেখেছেন মশায়?"

কোনটাই ঠিক ভাবে চলিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, কাজেই চুপ করিয়া থাকিতে হয়।

প্যাসেঞ্জাররা নির্বিকার, নির্বিকল্প। থার্ড ক্লাসে বসিলে প্রায় শোনা যায়, 'কঙ্কর' সাজিতে সাজিতে কিংবা খৈনিতে তালি দিতে দিতে এখানকার অনুকরণীয় গ্রাম্য হিন্দীতে কেহ বলিতেছে, "আস্‌মানকে বিজলী বানু?"...ইত্যাদি, অর্থাৎ আকাশের বিদ্যুৎ—ও তো এমনি দপ করিয়া নিভিবেই, দপ করিয়া জ্বলিবেই,—এ আর কি নতুনটা দেখিলে সবাই?

তড়িৎ-বিজ্ঞানের এমন বিশদ ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রোতার দল তুষ্ট হইয়া বলে, "ওয়াজিব—ওয়াজিব" অর্থাৎ—হ্যাঁ, ঠিকই তো...।"

দুই বন্ধুতে অনেকদিন পরে দেখা। নৃপেন বলিতেছিল, "সো গ্ল্যাড! তারপর, খবর কি? শুনেছিলাম কার মুখে যেন যে এই কলেজেই ভর্তি হয়েছিস। কাছেই থাকি, কিন্তু একবার এসে যে..."

এই সময় হঠাৎ আলোটা নিভিয়া গেল। ওদিক গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল; লাঠি পাগড়ি সমেত একদল এদেশী লোক সাঙ্গপাঙ্গোদের হাঁক দিতে দিতে, এবং তারই মধ্যে দু-একজন তারস্বরে মকাই-এর বাজারদর আলোচনা করিতে করিতে গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই—"ই ডেওঢ়া বা হো!" বলিয়া জটলা বাঁধিয়া নামিয়া গেল। থানায় আটকানো বন্যার জলের মতো দুটি লোক অবশিষ্ট রহিয়া গেল।

নৃপেন বলিল, "বিলকুল রেহাই দিলে না,—গেল দু'টোকে ছেড়ে!"

ইণ্টার ক্লাসের গাড়ীটা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার কাছাকাছি প্লাটফর্মে আলো নাই, তায় আকাশে মেঘ, তবুও আন্দাজে একটু লক্ষ্য করিয়া দেবেশ বলিল, "না, এরা ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে, বাজে দলটা সবই নেমে গেছে!"

কামরায় তিনটি বেঞ্চ। একটিতে গদি নাই, একটিতে একখানি বিশাল বপু কপট নিদ্রায় সতর্কভাবে নাক ডাকাইতেছে। আগন্তুক দু'টি অন্ধকারে একটু এদিক ওদিক করিয়া দেবেশের বেঞ্চির এক কোণেই বসিয়া পড়িল।

নৃপেন বলিল, "সে যাই হোক, যখন হাতের মধ্যে পেয়েছি, ছাড়ছি নে। আমার বাড়ি তিনটি স্টেশন পরেই, নেমে অন্তত একটা দিন কাটিয়ে যেতেই হবে। ভালো কথা, —যাওয়াটা হচ্ছে কোথায় তাও তা জিজ্ঞেস করিনি; পেটে এত কথা হুড়োহুড়ি করেছে যে, কোন্‌টে রেখে কোন্‌টে যে জিজ্ঞেস করব···"

দেবেশ বলিল, "ভাই, যেখানে যাচ্ছি তা যদি তোমায় জানাই তো ভয় হয় নেমন্তন্ন কেটে উল্টে সঙ্গ না নিয়ে বস।"

"কি রকম, কি রকম?"

"যাচ্ছি শ্বশুরবাড়ি, পুশারোড্ স্টেশনে; তোমার আগেই নেমে যাব। আশা আছে, নিজে অনভিজ্ঞ হলেও···"

'শ্বশুরবাড়ি!'—বলিয়া নৃপেন বিস্ময়ে একরকম চিৎকার করিয়াই উঠিল। "বিয়ে করলে কবে? কৈ ঘুণাক্ষরেও তো জানাওনি!"

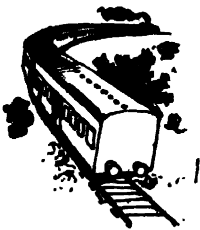
"ঠাকুরমার অসুখের কল্যাণে ব্যাপারটা একেবারে হঠাৎ হয়ে গেল। তবু অপরাধ স্বীকার করছি; দণ্ডাদেশ করো।"

গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছিল। পাশে দুইটি ভদ্রলোক আছে বটে, তবে তাঁহারা নিশ্চয় বেহারী, তাহার উপর অন্ধকারে তাহাদের মুখ দেখা না যাওয়ায় চক্ষুলজ্জার বালাই নাই। বিশ্রম্ভালাপ খুব জমিয়া উঠিল। বাধামুক্ত গলা গাড়ির আওয়াজেরও দুই পর্দা উপর দিয়া চলিল—শ্বশুরবাড়ির কথায় হৃদয়ের দুয়ায় একেবারে হাট—আদুড় করিয়া দেয় কিনা!

নৃপেন হাসিয়া বলিল, "কি সাজা দোব? তোমার কাছে এখন রাজার রাজ্যও তো অকিঞ্চিংকর।" একটু ভাবিয়া বলিল, "বেশ, দিচ্ছি দণ্ড—এক একটি মুহূর্ত এখন

তোমার কাছে অমূল্য, তাই থেকেই তোমায় মোটা রকম কিছু বঞ্চিত করলাম,—অর্থাৎ আমার ওখানেই তোমার আপাতত যেতে হচ্ছে"—বলিয়া আরো জোরে হাসিয়া উঠিল।

দেবেশ জানালার পাতলা আলোর সামনে হাত জোড় করিয়া বলিল, "এই তো হল দণ্ড। এখন আমার স্বপক্ষে একটু আপীল করতে চাই; ভরসা আছে মাননীয় বিচারপতি মহাশয় নিজে মর্মাহত না হলেও যুক্তির সারবত্তা দেখে তাঁর মন টলবে। তা'হলে ধর্মাবতার, প্রণিধান করিতে আজ্ঞা হোক।—এই সামান্য দোষে এক মুহূর্তের জন্যও শ্বশুরবাড়ী থেকে বঞ্চিত করার লঘু পাপে গুরুদণ্ড হ'য়ে পড়ে, কেননা, ধরার তাপদগ্ধ মানবের একমাত্র চরম সান্ত্বনা এই শ্বশুরবাড়ি। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ব'লে গেছেন—ভ্রমর জগতের অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত! সব—গোবিন্দলালেরই আপন—আপন 'ভ্রমর' সম্বন্ধে একথাটা সমানভাবে খাটলেও, তাঁদের নিজের নিজের পিতৃগৃহে সব 'ভ্রমরই' আর অনেকানেকের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর, নিতান্ত খেলো; কেননা তাঁদের চেয়েও এমন সব মধুরতর—মধুরতম জীব সেখানে বিহার করেন যাদের মহিমা বর্ণনায় ভাষাও মৌন হয়ে পড়ে। সেখানে থাকেন শালী—তিনি ধরায় স্বর্গ, স্বর্গে অপ্সরা, অপ্সরায় উর্বশী! সেখানে থাকেন শালাজ—তিনি আবার শালীর চেয়েও শক্তিশালী। ধরার আদেখলো জীব আমরা, হদ্দ স্বর্গ আর উর্বশী পর্যন্ত কায়ক্লেশে ধারণা করতে পারি, সুতরাং এঁদের বর্ণনার চেষ্টা করে কল্পনাশক্তিকে আর অপদস্থ করব না।



শ্বশুরবাড়ীর মর্ম যে শুধু আমরাই বুঝেছি তা নয়; দেবতারাও বাদ যান না। আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতাদের জ্বাল দিয়ে ক্ষীর করলে তিনটি বড় বড়তে এসে ঠেকেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ব্রহ্মা আগে কি রকম ছিলেন বলা যায় না, তবে বার্ধক্যে এসে পিতামহ হওয়া পর্যন্ত চরাচরে শ্বশুরবাড়ি সৃষ্টি করা নিয়ে মেতে আছেন। বাকি রইলেন বিষ্ণু আর মহেশ্বর; এদের শ্বশুরবাড়ী—প্রীতি ব্যাখ্যান ক'রে কবি কি মন্তব্য দিচ্ছেন ধর্মাবতারের শুনতে আজ্ঞা হোক—

হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে পয়োনিধৌ
অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুর-মন্দিরম্।

"হর, অর্থাৎ মহেশ্বরের শ্বশুরবাড়ী হল হিমালয়ে, তিনি সারা জীবনটা সেখানেই কাটিয়ে দিলেন। হরির, কি না বিষ্ণুর শ্বশুরবাড়ী হল পয়োনিধি অর্থাৎ সমুদ্র, কেননা বিষ্ণুজায়া লক্ষ্মীর উদ্ভব সেইখানেই ; তাই তিনি সেইখানেই শয়ন করে কাটালেন। এইসব দেখেশুনে কবি বলছেন, এই অসার সংসারে 'শ্বশুর মন্দিরম্'ই হচ্ছে সার বস্তু। সুতরাং ধর্মাবতার যদি অধমকে এ হেন শ্বশুর মন্দির থেকে বঞ্চিত করেন তো···"

পাশের ভদ্রলোকটি বেশ একটু জোরে গলা খাঁখারি দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বসিল। দেবেশ নৃপেনের গা-টা টিপিয়া গলা নামাইয়া বলিল, "বোধ হয় বাংলা বোঝেরে।"

কথাগুলো নৃপেনের লাগিতেছিল ভাল এবং ক্রমে খোদ বন্ধুপত্নীর সরসতর প্রসঙ্গে আনিয়া ফেলিবার বাগ খুঁজিতেছিল, আস্তে বলিল, "বোঝে তো মাথা কেটে নেবে, হ্যাঃ।" তাহার পর জোরেই বলিল, "এ যুক্তির ওপর তোমায় মার্জনা করা যায় না ; বৈষ্ণবিক ভাষায় বলতে গেলে 'এহ বাহ্য', আরও কিছু থাকে তো বলো।"

পাশের সহযাত্রীটির গলার আওয়াজে যে একটু কুণ্ঠা আসিয়া পড়িতেছিল তাহা আর জমিতে পারিল না। তাহা ভিন্ন শ্রোতার শুনিবার ইচ্ছার চাহিতে বক্তার বলিবার ইচ্ছা কম বলবতী ছিল না। দেবেশ বলিয়া চলিল, "একে তো এ-হেন শ্বশুরবাড়ী যাত্রা তাতে আবার যাত্রার উপলক্ষ্যটা গুরুতর ; কাল জামাইষষ্ঠী। এই দিনটার দিকে সাধারণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমিও সারাটি বছর সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছি, যদি বঞ্চিত হই তো আয়ুক্ষয় হবে, আবার একটা বছর বেঁচে থাকার উৎসাহ হারাব। তিনশ' পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে ভগবান প্রজাপতি এই দিনটি লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে আমাদের জন্যে আলাদা করে দিয়েছেন। এদেশটা নীরস ! এই গাড়ী যদি বাংলাদেশের গাড়ী হ'ত তো আদমসুমারী করলে দেখা যেত, এর শতকরা নব্বই জন জামাই। হরেক রকমের জামাই —সিদে জামাই, কুঁড়ো জামাই, আনকোরা, দোজবরে জামাই, চেঙা জামাই, বেঁটে জামাই, মাকুন্দা আর গুঁপো জামাই—মোটকথা যতরকমের জামাই আজ পর্যন্ত বিয়ের বাজারে বেরিয়েছে। বাকী দশজন হচ্ছেন শ্বশুর কিংবা সম্বন্ধী জাতীয় শহর থেকে জামাইষষ্ঠীর বাজার ক'রে ফিরছেন। আহা, চিন্তায়ও সুখ,—বাড়িতে কিংবা হস্টেলে যার দিকে দিনান্তেও কেউ একবার ফিরেও তাকায় না, আছি কি গেছি—সেই নগণ্য দ্যাবার জন্যে শাশুড়ী এতক্ষণ বোধ হয় চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় তৈরী করতে ঘর্মাক্ত ; শালীমহল সুমিষ্ট প্রবঞ্চনার নতুন নতুন উপায় আবিষ্কারে ব্যস্ত। ছোট শহর, সেখানে সব জিনিস পাওয়া যায় না, শ্বশুরমশাই আজ সারাটি দিন বোধ হয় রোদবৃষ্টি মাথায় ক'রে আমারই রসনাতৃপ্তির জন্যে সারা মজঃফরপুর ঘেঁটে বেড়িয়েছেন—কে জানে বোধহয় এই গাড়ীতেই কোথাও বসে হৃষ্টচিত্তে ভাবছেন—যাক্, দিব্যি আমগুলো পাওয়া গেছে, দেবেশ আমার ল্যাংড়া যেমন ভালবাসে। সে বেচারির এইতেই ফুর্তি। দেবেশ ভালবাসে এইতেই তিনি কৃতার্থ—হাত্তোর বোকারাম রে !

"এই জন্যেই তো গিন্নীকে শাসিয়ে রেখেছি—দেখ, যদি মেয়ে হয় তো তোমার ডাইভোর্স করব কিন্তু। আমি করব উপার্জন, তার ওপর আবার বাজার করতে পায়ে ঘাঁটি পড়াব, আর সে-ব্যাটা জামাই—নবাব খাঞ্জা-খাঁ আমার দিব্যি পায়ের ওপর পা দিয়ে…"

শেষ হইবার পূর্বেই দু'জনে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং পাশের লোক দুটিও অর্ধস্ফুট হাসিতে কাঁপিতে লাগিল। মুখ দেখা না গেলেও দেবেশ তাহাদের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপলোক বাঙলা সমঝেতেহে মালুম পড়তা ; ঠিক হ্যায় কি নেহি কহিয়ে না—হাম মরে কামা করকে, আওর…মেরা দামাদ…"

নৃপেন হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আর যদি জামাই হয়ই তোমার দুর্ভাগ্যবশত ?"

দেবেশ বলিল "তা হলে আমার চেয়ে তারই দুর্ভাগ্য বেশী। বাবাজী যেমনি পাঞ্জাবী দুলিয়ে, কোঁচা লুটুতে লুটুতে জামাইমার্কা মৃদুহাস্য করতে করতে লটবর চালে গাড়ী থেকে নেমে এসে প্রণাম করবেন, অমনি গলাটি টিপে ধরে রাস্তার দিকে মুখটি ফিরিয়ে দিয়ে বলব, যাও, সিধে উল্টোমুখে। মেয়ে দিয়েছি, হয়ে গেছে, আবার এখানে কি মনে করে সোনার চাঁদ…?"

হাসি চলিতে লাগিল। পাশে দুইটি অপরিচিত লোক, এই চিন্তায় যা বা একটু সংকোচ ছিল সেটা ক্রমে ক্রমে একেবারেই কাটিয়া গেল। ক্রমশ এ-দুজনের চক্ষে তাহারা রসিক ও সমঝদার হিসাবে যেন দলভুক্তই হইয়া পড়িল। অন্ধকারে বয়সও ভাল বোঝা যায় না, এবং সেইজন্যই সমবয়সী বা কাছাকাছি ঐরকম বলিয়া ধরিয়া লইতেও আটকাইল না। দেবেশ মাঝে মাঝে তাহাদের সাক্ষী মানিতে লাগিল, "ঠিক হ্যায় কি নেহি, সাহেব,—কহিয়ে—"

অন্ধকার ভেদ করিয়া এবং নিবিড়তর অন্ধকার গর্ভে পুঞ্জীভূত করিয়া গাড়ি ঠায় চলিয়াছে। এই রহস্যময় আবেষ্টনীকে নব্য জামাতার কৌতুকময় শ্বশুরালয় রহস্য বেশ একটি অদ্ভুত রসে আর্দ্র করিয়া তুলিল।

নৃপেন বলিল, "আপীলের যুক্তি খুব সাবধান বটে ! এইরকম একজন ভাবী শ্বশুরকে তার নিজের শ্বশুরমন্দিরে যেতে দেওয়া তবেই চলে, যদি তার নিজের শ্বশুর সমুচিত অভ্যর্থনার জন্য লগুড়হস্তে দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে থাকতে রাজী হন। তা' তোমার শ্বশুরের মতামত যখন এখানে পাচ্ছি না…"

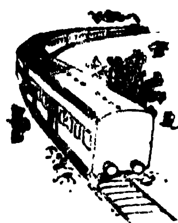
কণ্ঠস্বরে ভয়ের অভিনয় করিয়া দেবেশ তাড়াতাড়ি বলিল, "না, ধর্মাবতার, মাফ করা হোক, ওটা সাক্ষীর **temporary insanity**, সাময়িক মস্তিষ্ক বিকার—আপনার মূল দণ্ডের আদেশ শুনে অবধি তার মাথার ঠিক নেই কিনা…আর একটা কথা তোমায় আগে বলতে ভুলে গিয়েছি ভাই,—প্রফেসর গুপ্টার কল্যাণে তোমার দণ্ড আমি আগে থাকতেই ভোগ করে বসে আছি, আর বল কেন ; না হলে বেলা দেড়টার গাড়িতে

কোথায় আলোয় আলোয় আলো ক'রে যাব, না, অন্ধকার রাত্রে এই যমালয় যাত্রার দুর্ভোগ। লোকটা দিলে না ছুটি কোন মতে হে!"

নৃপেন একটু বিরক্তভাবে বলিল, "ওটার কথা আর বোল না; একটা বেরসিক ভূত··· শ্বশুরবাড়ির নামে অত খেপচুরিয়াস কেন রে বাপু! নিজে বিয়ে করলিনি করলিনি, কপালে নেই; তা ব'লে···"

বাধা দিয়া দেবেশ বলিল, "বিয়ে করলে না! তুমি তাহলে লেটেস্ট দাম্পত্য-বুলেটিন অবগত নও দেখছি;—আরে, গুপ্টা সাহেব যে মুড়িয়েছেন মাথা শেষপর্যন্ত; তুমি আছ কোথায়? আর দুর্ভাগ্যক্রমে পুশাই হয়েছে তাঁর প্রয়াগক্ষেত্র; তাই তো নেহাৎ শিষ্যসমভিব্যারে যেতে হবে বলে···"

"থি্র চিয়ার্স ফর প্রফেসর গুপ্টা হুররে!" অন্ধকারেই হস্তটা তুলিয়া নৃপেন চিৎকার করিয়া উঠিল।



ও বেঞ্চের স্থূলকায় লোকটি সশব্দ কপট নিদ্রার মধ্য দিয়া কখন অনাড়ম্বর অকপট নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল; হুড়মুড়িয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে জিস্তে-ও?" সঙ্গে সঙ্গে ভুলটা বুঝিতে পারিয়া আবার শুইয়া পড়িয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

দেবেশ হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয় মাড়োয়ারী, আজ কলেজটাউন ক্লাব ম্যাচে কিছু টাকা ধরে থাকবে···নাও, আর থ্রি-চিয়ার্সে কাজ নেই।···বেজায় চটেছি লোকটার ওপর। ওর সাবজেক্টে পার্সেন্টেজটা কম আছে, ভাবলাম, কাজ কি—হাজরিটা একটু দিয়েই সোজা ওই দিক দিয়েই চলে যাব। কমন রুমে গিয়ে ব্রজেশের কাছে সিল্কের পাঞ্জাবী আর চাদরটা রেখে তার কোটটা খুলে গায়ে দিলাম; প্রফেসার্স রুম থেকে গুপ্টা সাহেব বেরুচ্ছে—যথাসম্ভব বিষন্ন হয়ে, মাথা নীচু করে বললাম, 'স্যার, বাবা খবর পাঠিয়েছেন—পিসিমা খুব অসুস্থ—যদি এটেন্ডেন্স্ নিয়ে ছুটি দেন তো দেড়টার গাড়ীতে···অবস্থা নাকি বড়ই সংকটাপন্ন—ডিলিরিয়ামে খালি আমার নাম ক'রে···'

টপ করে, কি বললে জানো?—বললে 'তাই—তাড়াতাড়ি এসেন্সে বোঝাই হ'য়ে চলেছে বুঝি ছুটে—?'

"কমনরুমে পাঞ্জাবিটা খোলবার সময় বুক-পকেট থেকে রুমালটা প'ড়ে গেল, তুলে

কোটের পকেটে তাড়াতাড়ি গুঁজে নিই, অত কি মনে থাকে ?···সব তো বুঝিস বাপু—কে সঙ্কটাপন্ন—কার ডিলিরিয়াম্—বকবার অবস্থা—তায় নতুন বিয়ে করেছিস, ভাল করেই বুঝিস, দিলেই পারতিস একটু ছুটি, কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত ?··· সেখানে সে বেচারি হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে আছে···"

নৃপেন দুঃখের ভান করিয়া বন্ধুর মুখের দিকে হাতটা বাড়াইয়া বলিল, "আর বোল না, আমি হঠাৎ কবি-বাল্মিকী হ'য়ে বুঝি শাপ দিয়ে বসি—'মা গুপ্টা প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতি সমা'···ওঃ, লোকটা কী নৃশংস হে ! তোমায় এইরকম উৎকট আঘাত দিয়ে কোন মুখে আবার নিজে শ্বশুরবাড়ী যাবে ?"

দেড়টা হইতে রাত আটটা পর্যন্ত এই যে বিরহ, তাহার আলোচনায় দেবেশের মনটা তাহার অজ্ঞাতসারেই একটু ভারী হইয়া পড়িল, ওদিককার বিরহবিধুর মুখখানি বোধ হয় বড় স্পষ্ট হইয়া উঠিল, বলিল, "চুলোয় যাক, তুমিও যেমন !···পকেটে দেশলাই রাখ ? একটু ধোঁয়া খেতে হবে, দেশলাইটা আনা হয়নি ।"

নৃপেন বলিল, "না, আমার ও হাঙ্গামা নেই, তুমিই বা ধরলে কবে থেকে ?—আগে তো খেতে না ।" সিগারেটের বাক্সটা বাহির করিতে করিতে দেবেশ পাশের লোক দুটির দিকে চাহিয়া বলিল, "আপলোগ দিয়াশলাই রখতে হ্যায় ?"

একজন খুক্ খুক্ করিয়া একটু কাসিল মাত্র, অপর লোকটি কোন কথা না বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ওদিককার গদিবিহীন বেঞ্চের উপর গিয়া বাহিরের দিকে মুখটা বাড়াইয়া বসিয়া রহিল ।

তাহার গতিবিধিটা এতই আকস্মিক এবং অসংগত যে দুই বন্ধুতেই যথাসম্ভব চাপা-গলায় হাসিয়া উঠিল । দেবেশ হাসিতে হাসিতেই বলিল, "একেবারে স্থানত্যাগেন দুর্জনম্ ! তা' যাক, বাঁচা গেছে ।" একটু চাপা গলায় বলিল, "এখন ইনি গেলে আরও একটু প্রাণ খুলে কথা কই ।···হ্যাঁ, সিগারেট ধরবার কথা জিজ্ঞেস করছিলে ? ভাই, শ্বশুরমশাই দেখে শুনে অনেক খোঁজখাঁজ নিয়ে দিব্যি একটি অতীব শান্তশিষ্ট, সচ্চরিত্র ছেলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিলেন,—পানটি পর্যন্ত খায় না, মাটি থেকে চোখ তুলে কথাটি কয় না, নিরীহ গোবেচারি, এককথায় বলতে গেলে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না । তাঁর মেয়ে কিন্তু এ-হেন জামাতা-রত্নটিকে, একেবারে বিগড়ে দিলে—চারিদিক দিয়ে—"মস্তকটি চর্বণ ক'রে দিলে আর কি, অবশ্য ক্রমশঃ···

"একদিন, কি যে বলে বেশ, একটা ইয়ের জন্যে খোসামোদ করছি—গিন্নি হঠাৎ বেঁকে বসলেন—'অত লক্ষ্মী, ভালো মানুষ, তোমার আবার এসব শখ কেন ? এদিক তো চুলটি পর্যন্ত আঁচড়াতে জানো না, পানটি খেতে জানো না !'

সদ্য সদ্য প্রাণের দায়ে শ্রীহস্তের একটি পান খেয়ে সে-ঝোঁকটা সামলান গেল ।—অধোগতির প্রথম ধাপ ।

পরের বারে শ্বশুরবাড়ী যাবার আগে—,সেলুনে ঢুকে দিবিব্য দশ-আনা ছ'-আনা ক'রে চুল ছাঁটিয়ে নিলাম। মাথায় প্রথম টেরি উঠল।

"দেবী প্রথম দিকটা বেশ প্রসন্নই রইলেন, উৎসাহ পেয়ে যখন আবদার খুব বাড়িয়ে দিয়েছি, হঠাৎ পরিবর্তন! 'অপরাধ?'—সবিনয় কাতর প্রশ্নের উত্তর হোল—

'ছোট পিসেমশাই যখন আসেন, সিগারেটের গন্ধে বেশ মনে হয়—হ্যাঁ, বাড়িতে জামাই এসেছে বটে। আমার সে সাধ মেটাবার নয়, আমিও কারুর এ সব বিদঘুটে সাধ মেটাতে চাই না···'

"কি করব বলো?—ধরলাম।—পিসশ্বশুরের টিন থেকে চুরি করা চারটে 'গোল্ড-ফ্লেক' আমার ব্রতভঙ্গের জন্য অপেক্ষা করছিল, শ্বশুরের কন্যা সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।··তারপরে গোঁফজোড়াটির উপর শুভদৃষ্টি পড়ল। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি নৃপেন, আমার অমন যত্ন ক'রে পোষা নিরীহ গোঁফ জোড়াটির ল্যাজ কেটে তাকে এরকম উগ্র আর তেজী ক'রে তোলবার আমার কখনই ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু কি রকম বেকায়দায় আমায় ফেলে যে···তা যদি শোন···"

"নিশ্চয় শুনব"—বলিয়া নৃপেন বন্ধুর দিকে আর একটু ঘেঁসিয়া বসিল; তাহার পর যেন বড়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এইভাবে বলিল, "কিন্তু তুমি যে ভয় পাইয়ে দিলে হে—ওঁদের মন পাওয়া তো নেহাৎ চাড্ডিখানি কথা নয় দেখছি! বছর ঘুরতে না ঘুরতে শ্রীপাদপদ্মে ভালো ছেলে ব'লে যে এতদিনকার সুনাম তা জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে, ঘাড়ের চুল; গোঁফের মূল বলিদান দিতে হয়েছে·—অথচ এখনও আইবুড়োর গন্ধ ভাল ক'রে যায়নি গা থেকে।···আচ্ছা প্রফেসর গুপ্টা তাহ'লে কি দিয়ে দেবী-মর্যাদা রক্ষা করলেন? সে বেচারির তো গোঁফসম্পদও ছিল না; আর সিগারেট তো তাঁর একটা অঙ্গবিশেষই ছিল বললেই চলে···"

দেবেশ বন্ধুর কাঁধে ভর দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি বুঝি গুপ্টা সাহেবকে দেখনি এদিকে?—তাঁকে বাবরী চুল রাখতে হয়েছে, চাপদাড়ি আর গোঁফ কালচার করতে হয়েছে—যেন মাঝবয়সের রবিবাবুটি; সিগারেটের পাটই উঠিয়ে দিতে হয়েছে, তার জায়গা নিয়েছে শুদ্ধ, সনাতন পান আর দোক্তা—ভিন্নরুচিহি স্ত্রীলোকাঃ···এখন যদি সামনে গুপ্টা সাহেবকে দেখ তো আর চিনতে পারবে না—সে স্মার্টনেস কোথায় গেছে—এখন দেখবে দিবিব্য নাদুসনুদুস গেরস্ত—"

"বটে।"

"তবে আর বলছি কি?—তুমি এসো না একবার কলেজে, একবার নব কলেবরটি দেখে যাও,—চলে এস একবার···"

অতদিন অপেক্ষা করিতে হইল না।—

এই সময় গাড়িটি পুশা রোড় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিয়া গতিবেগ কমাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে, কি নিগূঢ় কারণে তা' হনুমানজিই জানেন, বিজলি বাতি দুইটি সমস্ত

কামরাটি অত্যুজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত করিয়া হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল—সুপ্তোত্থিতের মত যেন—একেবারে তাজা হইয়া।

দুই বন্ধুতেই দেখিল—পাশেই দাড়ি গোঁফে আবৃত মুখ, বাবরীর মাঝখানে সিঁথে কাটা, নাদুসনুদুস গেরস্ত গোছের একটি বাঙালী ভদ্রলোক বসিয়া আছে, মুখের পান চিবোন হঠাৎ বন্ধ করায় গালদুটি ঈষৎ ফোলা, গায়ে শ্বশুরবাড়ির উপযুক্তই বেশভূষা …চিনিতে আর কাহারও বাকী রহিল না।

পানটা চিবাইতে আরম্ভ করিয়া জড়িত রসনায় কহিলেন, "এই যে দেবেশ দেখছি…ইয়ে তোমার পিসিমা…মানে, এই গাড়িতেই যাচ্ছ বুঝি ?…"

উত্তর দরকার হয় না,—এই গাড়িতেই তো যাইতেছেই, একসঙ্গে আসিতে হইল অতটা ; তবুও সম্মোহিতের মত দেবেশ মাথা নিচু করিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ—মাসিমার ভারি ••ইয়ে, পিসিমার বন্ধু…আপনি বুঝি••এই গাড়িতেই ?...."

ঘুরিয়া তাড়াতাড়ি দরজার দিকে পা বাড়াইল। গদিহীন বেঞ্চ হইতে অপর ভদ্রলোকটি ততক্ষণ উঠিয়া ঘাড় গুঁজিয়া দরজামুখো হইয়াছেন। সামনে কুলির মাথায় একটা বড় চ্যাঙাড়ি, ওপরে বাছা বাছা কটা ল্যাংড়া আম দেখা যায়। দেবেশ ঘুরিতেই চোখাচোখি হইয়া গেল।—

"এই যে বাবাজি••এই গাড়িতেই বুঝি আসা হ'ল ?••আমি ভাবছিলাম বুঝি••থাক্ থাক্ দীর্ঘজীবী হও••প্রণাম হয়েছে—ওঠ...."

ভক্তিমান জামাইয়ের তখন মাটি ছাড়িয়া ওঠা যে কি ঘোর সমস্যা শ্বশুর বোধ হয় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন।



দীনু রক্ষিত

গাড়িটা আসিতেছে লোহার থেকে। যাত্রীদের অনেকে আসিতেছে আরও ওদিক থেকে। পেশোয়ারের লোকও আছে। বেশি না হোক অন্ততঃ একজন তো আছেই, একটি কাবুলী। সে একটা ছোট কামরায় একখানা গোটা বেঞ্চ দখল করিয়া আড় হইয়া শুইয়া মালা জপিতেছে।

সমস্ত গাড়িটাতেই খুব ভিড়; তবে এ কামরাটায় ভিড়ের একটা বিশেষত্ব আছে—যা কিছু ভিড় এদিককার দু'খানা বেঞ্চে আর বাঙ্কে। বাঙ্কের উপর মোটমাটের সঙ্গে একটি লোক কুঁজো হইয়া বসিয়া আছে। নিচের দু'খানা বেঞ্চ ঠাসা;—প্রায় একখানা গোটা বেঞ্চ জুড়িয়া সপরিবার একটি পশ্চিমা ভদ্রলোক, বাকি জায়গাটুকু এবং অপর বেঞ্চ মিলাইয়া সাত জন। নিচের স্থানটুকুতে পা পাতিবার জো নাই। ওদিকে রাস্তা জুড়িয়া দুইজন বসিয়া আছে, একজন একটা বিছানার গাঁঠরির উপর এবং একজন একটা বাক্সের উপর।

গাড়ির বাকি দুইটি বেঞ্চের মধ্যে ধারেরটিতে কাবুলী ঐ ভাবে শুইয়া জপ করিতেছে। মাঝখানেরটিতে তাহার জিনিসপত্র। জিনিসপত্র রাখিয়াও একটু জায়গা খালি আছে; কিন্তু কোন লোক নাই।

আসানসোল স্টেশনে গাড়ি থামিলে দু'একবার উঁকিঝুঁকি মারিয়া একটি বাঙালী উঠিল—রোগা রোগা চেহারা, বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়স, গায়ে পাঞ্জাবী, হাতে একটা ছোট—এটাচি-কেস। গাড়ির অবস্থা দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর দ্বিতীয় বেঞ্চে সেই খালি জায়গাটুকুতে বসিয়া বলিল—"সেলাম আলেকুম আগা সাহেব।"

বিশাল বপ্‌ থেকে একটা খস্‌খসে ঈষৎ নাকী স্বরে আওয়াজ হইল—"উদর-যা করকে বৈঠো।"

ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইল। গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে, কোনখানে জায়গা না পাইয়া—দরজায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া বিছানার গাঁঠরির উপর উপবিষ্ট লোকটির দিকে চাহিয়া বিরক্তভাবে বলিল—"আচ্ছা তামাশা তো। দুটো বেঞ্চ জুড়ে বসে আছে—কাউকে বসতে দেবে না? বাক্সটা নামিয়ে জিনিসগুলো তার ওপর রাখলেই পারে তো..."

একজন উত্তর করিল—"ওর ভয়, বাঙকসুদ্দ্‌ ছিঁড়ে পড়ে যাবে।"

ভদ্রলোক খিঁচাইয়া উঠিয়া বলিল—"আর ওদিকে ছিঁড়ে পড়ে যাবে না?—মানুষ পর্যন্ত তো নিশ্চিন্দি হয়ে বসে আছে।"

একজন উত্তর করিল—"ওকেই বলুন না মশাই, আমি তো মানা করিনি।"

ভদ্রলোক একটা বিড়ি ধরাইল, একগাল ধুঁয়া ভরিয়া হাত নাড়িয়া ওই ভদ্রলোককেই কি বলিতে যাইতেছিল, পূর্বস্থান থেকে আবার সেই রকম কণ্ঠেই আওয়াজ হইল—"ধুঁয়া মৎ ছোড়ো।"

ভদ্রলোক একবার আড়চোখে চাহিয়া বিড়িটা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া এবার বাক্সের উপর উপবিষ্ট লোকটির দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"ধুঁয়ো ছাড়ব না—কারুর ভয় নাকি মশাই? ইস্‌, আসুক অণ্ডাল, ধুঁয়ো ছাড়ি কি না ছাড়ি দেখাচ্ছি,—এখনও খাঁ সাহেবের সঙ্গে মোলাকাৎ হয়নি কি না..."

সে ভদ্রলোক বলিল—"আমায় কি বলছেন মশায়? মেয়ে গাড়িতে ওয়াইফ আর ছোট ছেলেটা রয়েছে, নইলে দেখতাম কত বড় কাবুলী..."

বাঙ্কের উপর যে বসিয়াছিল বলিল—"ও ব্যাটা কপালের জোরে যাচ্ছে মশাই—নইলে হাওড়া তো দূরের কথা, রাণীগঞ্জের মুখ দেখতে হত না। আসানসোলে এক বেটা ক্রু এল, গায়ে একশ'-এক পয়েন্ট তিন জ্বর, একটা কনেস্টবলকে ডাকলে—গায়ে জ্বর নেই, কিন্তু মাংসও নেই; মিলেমিশে থাকবার পরামর্শ দিয়ে নেমে গেল। অমন ধার্মিক কনেস্টবল দেখা যায় না।"

দরজার কাছের সেই নবাগত লোকটি বলিল—"আপনারা সবাই থাকুন মিলেমিশে মশাই, আমার দ্বারা হবে না বলে দিচ্ছি। দীনু রক্ষিত একেবারে অন্য ধাতের মানুষ তা জেনে রাখবেন। মিলেমিশে থাকা মানে আমি বুঝি না। এই সুটকেসের মধ্যে তিনখানি নম্বুরী মামলার নথিপত্র। জেয়লগাছের পাশে পাশে একটি বিঘৎ জমি—মণ্ডলের পো বলে, 'ঘেরে নেব।' বললাম, নেয়াচ্ছি ঘেরে তোমায়'...বলে এলাম—'মণ্ডলের পো! ...জমি ঘেরবে কি?—তোমার ঘেরে যদি জেলে না টেনে তুলি তো..."

কাবুলী বলিল—"জাদে বোলো নেহি। আচ্ছা নেহি লাগতা!"

লোকটি চুপ করিয়া গেল। নিতান্ত অভ্যাসবশতঃ একটা বিড়ি পকেট থেকে বাহির করিয়াছিল; পরীক্ষা করার মতো একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, তাহার পর

সুতোর বাঁধুনিটা পাক দিয়া একটু শক্ত করিয়া দিয়া আবার পকেটে রাখিয়া দিল। একটু অন্যমনস্ক হইয়া সেই পোঁটলার উপরের লোকটির পানে হাসিয়া বলিল—"ওর ভাল লাগে না বলে কেউ আর যেন কথা কইতে পাবে না! ভাল লাগছে না তো তুমি যাও না অন্য কামরায় বাবা, কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়ে দুটো বেঞ্চি দখল করে থাকতে বলেছে? কেই বা তোমায়…"

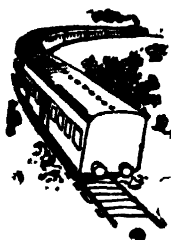
"বাহার পেক্ দেগা।"

"দিলেই হোল বাইরে ফেলে! কে কাকে ফেলে দেখাব—শুধু যদি খাঁ সাহেবের দেখা পাই অণ্ডালে"—বলিতে বলিতে দীনু রক্ষিত তাড়াতাড়ি মোটমাট ডিঙাইয়া গাড়ির মাঝামাঝি চলিয়া আসিতেছিল, বিছানার গাঁঠরির উপর যে ছোকরা বসিয়াছিল, একটু সিধা হইয়া বসিয়া বলিল—"এদিকে আবার কোথায় আসছেন মশাই?"

"আলবৎ আসব মশাই, গাড়ি কারুর কেনা নয়।"

"কেনা নয় বলে ঘাড়ে এসে উঠবেন? বেশ তো ছিলেন, ওখানে যান না।"

"আপনি যান না।"



"আমি তো ওখানে ছিলাম না, এইখানেই বরাবর বসে আছি।"

"এবার ওখানে যান।"

"এবার ওখানে যান!—আপনার হুকুম নাকি?—যান, ফিরে যান, নৈলে…" ছোকরা উগ্রমূর্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

দীনু রক্ষিতও ঘাড় বেঁকাইয়া দাঁড়াইল—"যেতে দিন মশাই, ভালয় ভালয়, একে মেজাজ ভাল নেই আমার…"

অন্য দুইজন ভদ্রলোক থামাইতে চেষ্টা করিতে ব্যাপারটা আরও ঘোরাল হইয়া উঠিল।

"আপনি মেজাজ দেখান কাকে?"

ধনুকের মতো বেঁকিয়া উঠিয়াছে।

"শুধু মেজাজ নয়, আরও কিছু দেখাচ্ছি" এই বলিয়া দীনু রক্ষিতও রুখিয়া দাঁড়াইল। প্রায় হাতাহাতি হয় হয়, পিছন থেকে সেই রকম খস্‌খসে নাকী সুরে আওয়াজ হইল—লড়ো মৎ।"

দীনু রক্ষিত পিছনে একবার বিরক্তির সহিত চাহিয়া হাতটা নামাইয়া লইল। সামনের

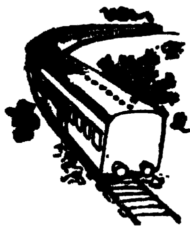
দিকে ফিরিয়া দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—"ওর সঙ্গে তো লড়ছি না, ওর এত মাথাব্যাথা কেন ?···আচ্ছা, আর বেশি দেরি নয়, অণ্ডাল এসে গেল।"
এই বলিয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া অপ্রসন্নভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

[২]

আমি এদিকে আর এক গোঁয়ারকে লইয়া ফ্যাসাদে পড়িয়াছি। আমি বসিয়া আছি এদিককার কোণটায়, পাশেই যজ্ঞেশ্বর। আমরা যখন উঠি, গাড়িতে ভিড় ছিল না। উগ্র কাবুলী-হিঙ্গের গন্ধ থেকে অব্যাহতি পাইবার জন্য আমরা ইচ্ছা করিয়াই গাড়ির অপর দিকটা আশ্রয় করিয়াছিলাম। কিন্তু কাবুলীর অত্যাচারে যজ্ঞেশ্বর ক্রমাগতই ফোঁস-ফোঁস করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে ঠেলিয়াও উঠিতেছিল। আমি অনেক কষ্টে তাহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া—ঠাণ্ডা করিতেছিলাম—"কাজ কি একটা ঝগড়া-মারামারি করে ? তোর বাইসেপ্‌স্ হাজার ডেভেলপ্‌ড্ হলেও তুই ওর সঙ্গে পারবিনি, আর এরা যে তোকে সাহায্য করবে, মনেও ভাবিসনি। ক'টা স্টেশন বৈ তো নয়, চুপচাপ করে কাটিয়ে দে···"
কাবুলী দীনু রক্ষিতকে এক একবার এক একটা থাবা দেয় আর যজ্ঞেশ্বর ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টা করে। আমি হাতটা চাপিয়া বসাইয়া দিই, বলি, "কিই-বা অন্যায় করেছে ভেবে দেখ একটু,—বিড়ি খেতে দিচ্ছে না, লোকটার ফাঁকা আওয়াজ করা অভ্যেস, সেটা বন্ধ করে দিচ্ছে—অন্যায়টা করেছে কি ?"
এবার কিন্তু আর যজ্ঞেশ্বরকে ঠেকাইতে পারা গেল না। মুখটা খিঁচাইয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল—"ও বেচারীরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে—ওর কি তাতে ?"
আমাকে জবরদস্তি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"আলবৎ লড়েগা, তুম্‌হারা ক্যা হ্যায় ?···আপনারা আরম্ভ করুন মশাই, দেখি ও-ব্যাটা কি করে।"
এমন নিরীহ নির্জীবের মধ্যে থেকে হঠাৎ একজনকে এরকম উগ্রভাবে আগাইয়া আসিতে দেখিয়া কাবুলী প্রথমটা একটু হকচকিয়া গেল। যজ্ঞেশ্বরের শরীরটাও অনেকটা অন্য ধরনের, তায় তাহার যেখানে যত দেখাইবার মতো শিরা-পেশী আছে সব জাগাইয়া তুলিয়াছে। কাবুলী একটু দেখিল, তাহার পর সোজা হইয়া বলিল—"নেই লড়েগা। হাম মানা করতা।"
যজ্ঞেশ্বর কাবুলীর সামনের বেঞ্চটাতে পা বাড়াইয়া দিল। বলিল—"আলবৎ লগেড়া। তুমহারা সাথ লড়েগা, উঠো।"
দীনু রক্ষিত বলিল—"লেগে যান মশাই দুগ্‌গা বলে, আমরা পেছনে রয়েছি।

ততক্ষণে অণ্ডাল জংশনও এসে পড়বে। যদি খাঁ সাহেবকে পাই, ও বেটা কেঁচো হবে যাবে দেখবেন! মাঝে মাঝে আদায়পত্রে আসে এদিক পানে···যদি বরাতগুণে পেয়ে যাই দেখা···"

কাবুলী তাহার পানে ফিরিয়া চাহিতে, থামিয়া গেল। কিন্তু দীনু, রক্ষিত থামিলেও বেশ বলিষ্ঠ একজনকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আর সকলে নিজের চাপা ক্রোধকে মুক্তি দিয়া চেঁচামেচি করিয়া উঠিল—"দিন পেটে একটা গোঁত্তা মশাই···উতারো বেঞ্চিসে সব চিজ্···আগে দাড়িটা বাগিয়ে ধরুন মশাই···যত কিছু বলছি না, ততই আস্করা বেড়ে যাচ্ছে ?···"



কয়েকজন মোটমাট ডিঙাইয়া আগাইয়া গেল। ব্যাপারটি অতিশয় ঘোরাল হইয়া উঠে দেখিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। কাবুলীর-অত্যাচারটা আমারও অসহ্যই হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু এই লইয়া পথের মাঝে গোলমাল হয়, সেটা তেমন বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হইতেছিল না। আমি উঠিয়া যজ্ঞেশ্বরকে পিছনে টানিয়া লইলাম।

"ছেড়ে দে আমায়....ছেড়ে দে, দেখে নেব কত বড় কাবুলী"—বলিতে-বলিতে কাবুলীর মুখ থেকে দৃষ্টি না সরাইয়া যজ্ঞেশ্বর নিজের জায়গা হইতে আবার গর্জাইতে লাগিল।

কাবুলী বলিল—"হাম্ খালি তুম্‌কো সাথ নেহি লড়েগা, সবকো লে আও। দেখো হামারা হাত, দেখো সিনা···"

কুর্তার আস্তিন গুটাইয়া চুলেভরা সুপুষ্ট কব্জি তুলিয়া ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে বুকটা চিতাইয়া বসিল।

স্টেশন আসিতেছে, যজ্ঞেশ্বর অসহিষ্ণুভাবে আমায় ঝাঁকুনি দিয়া বলিল—"আমায় ছাড়, নৈলে তোর সঙ্গে একচোট হবে এবার। আমি ওর কব্জি আর বুকের ছাতি দেখান বের করব···"

দীনু রক্ষিত গাড়ির দেয়ালে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, নাকমুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"এ আবার এক অন্য ফ্যাসাদ! আপনি ছেড়ে দিন না মশাই! ভদ্রলোক যা বুঝবেন করবেন। আমরা একটা বোঝাপড়া করতে যাচ্ছিলাম—কাবুলীর পছন্দ হোল না। ও ভদ্রলোক কাবলীকে দু' ঘা দেবে, ওর পছন্দ নয়। গেরো এক!"

[৩]

অ‍ণ্ডালে গাড়ি থামিতেই দীনু রক্ষিত দরজা খুলিয়া একবার কাবুলীর দিকে কটাক্ষ-পাত করিয়া নামিয়া গেল। একজন লোক গাড়িতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কাবুলী হ্যাণ্ডলটা ধরিয়া থাকায় দু'একবার গজগজ করিয়া—কয়েকজন তাহাও না করিয়া অন্য গাড়ির উদ্দেশে চলিয়া গেল। যজ্ঞেশ্বরকে ধরিয়া রাখা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল। বুঝাইলাম—"একটু থাম্ না, যদি কণ্টকে নৈব কণ্টকম্ ব্যবস্থাটা খাটে তো মন্দ কি? দীনু রক্ষিতকে যেমন বুঝছি—গায়ে শক্তি না থাক, ধড়িবাজ লোক, খাঁ সাহেব সম্বন্ধে যেমন বলছে, তাতে যোগাযোগটা দেখবার মতনও হবে…"

সকলে একটা উৎকট কাবুলী-সংঘর্ষ দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি এমন সময় যজ্ঞেশ্বর ঘাড়টা নিচু করিয়া সামনের দিকে চাহিয়া বলিল—"কাকে যেন আনছে টেনে!…"

দেখি সত্যই প্ল্যাটফরমের একেবারে ও-কোণ থেকে দীনু রক্ষিত একটা লোককে এক হিসাবে টানিয়া টানিয়াই লইয়া আসিতেছে। যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই আমাদের বিস্ময়ের সীমা ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল।

লোকটা কাবুলী; কিন্তু এমন কাবুলী আমি জন্মে দেখি নাই। যেমন ঢেঁঙা, তেমনি রোগা, তেমনি কাহিল। রংটা মেটে কালো। শীর্ণমুখে দাড়ির রাশি কেমন যেন পরচুলা বলিয়া মনে হয়। পোশাকটি আগাগোড়া কাবুলী—পাগড়ির উপর রাঙা কুল্লাটি পর্যন্ত।

কাহিল এত যে, লোকটা যেন দীনু রক্ষিতের সঙ্গেও পাল্লা দিতে পারিতেছে না। কাছে আসিলে দেখিলাম—হাঁপাইতেছে।

কয়েকজন বিমূঢ়ভাবে বলিয়া উঠিল—"এই ওর খাঁ সাহেব মশাই? ওকে তো ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবে!'

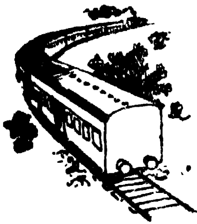
দীনু রক্ষিত দরজা ঠেলিয়া প্রথমে নিজে উঠিল, তাহার পর হাত ধরিয়া খাঁ সাহেবকে তুলিতে তুলিতে বলিল—"দেখ, খাঁ সাহেব, প্ল্যাটফরমটা আবার নিচু…আজকে পালা যাচ্ছে নাকি, হাতটা একটু গরম গরম ঠেকছে যেন?"

চিঁ চিঁ করিয়া একটা আওয়াজ হইল, তাহার পর খাঁ সাহেব আসিয়া উপরে দাঁড়াইল। আগা সাহেব উল্টাদিকে মুখ করিয়া নাস্তার জন্য রুটি, মাংস বাহির করিয়া গোছাইতেছিল, পিছনে ফিরিয়াই একেবারে প্রস্তরবৎ স্থাণু হইয়া গেল; খাণিকক্ষণ আর চোখই সরাইতে পারিল না; তাহার পর সামনের খালি জায়গাটা দেখাইয়া নিজেদের ভাষায় বসিতে বলিল এবং খাঁ সাহেব বসিলে রুটি গোছান বন্ধ করিয়া ঠায় তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল—যেন ভূত দেখিতেছে এই রকম একটা বিমূঢ়, ত্রস্ত দৃষ্টি।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

দীনু রক্ষিত আবার যথাস্থানে আসিয়া দেওয়ালে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। কি একটা বিজয়ের আনন্দে তাহার শীর্ণ মুখটা দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে—নাকের মেদহীন চামড়াটা চকচক করিতেছে। খিক্-খিক্ করিয়া একটা কুটিল হাসি হাসিয়া বলিল—"ওষুধ ধরেছে। শুনে রাখুন দীনু রক্ষিতের কথা, যদি এমন হয় যে, ও এই প্রথম কলকাতায় যাচ্ছে তো বর্ধমানের ওদিকে যাবে না, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে। ব্যাপারটা কি হয় জানেন না?—ওদের আত্মীয়স্বজন এখান থেকে ওদের বাংলাদেশের বড়াই করে চিঠি লেখে—টাকার জায়গা, হাওয়ায় টাকা উড়ছে, রাস্তায় টাকা ছড়ান—হেন-তেন সাত সতের। বড্ড গরীব দেশ, লোভে পড়ে ওরা কিছু টাকা যোগাড় করে পাড়ি দেয়। যদি কলকাতা পর্যন্ত সু-ভালাভালি পেঁৗছে গেল তো টেঁকে গেল, আর যদি মা-দুর্গার কৃপায় পথে খাঁ সাহেবের মতো কারুর সঙ্গে মোলাকাৎ হয়ে গেল তো···দেখুন না, কথাবার্তা আরম্ভ হয়ে গেছে···জিগেস করছে গায়ের খুন কোথায় গেল? গোস্ত কোথায় গেল? বুঝি কিনা একটু ভাষা ওদের—খাঁ সাহেবের কাছে শিখেছি···" দীনু রক্ষিত আমাদের দিকে চাহিয়া আবার খিক্-খিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল—"কব্জি আর বুকের ছাতি দেখাচ্ছিলেন! সেই কব্জি, সেই ছাতি কিসে গিয়ে দাঁড়াবে বুঝুন একবার!"

একটু হাত উঁচাইয়া বোধ হয় আমাদের অধৈর্য হইতে বারণ করিয়া বলিল—খাঁ সাহেব বলছে জুরারা-বোখার—মানে, ম্যালেরিয়া আর কি···জিগ্যেস করছে—কি করে হয়? বলছে মশা কামড়ালে···মুখের চেহারা হয়েছে দেখুন! জিগ্যেস করছে, কোথায়?··· বললে—যেখানে সেখানে, এই গাড়িতেও থাকতে পারে···খিক্-খিক্-খিক্···"



এমন সময় খাঁ সাহেব একটু যেন গুটিসুটি মারিয়া দীনু রক্ষিতের পানে চাহিয়া ভাঙা-ভাঙা বাংলায় বলিল—"রক্ষিতবাবু, বোর্ধোমানে লামিয়ে নেমেন, এঁসে গেলো, আজকাল ঠিক এই সোমোয়ে আঁসছে···"

কাঁধে একটা র‍্যাপার ছিল, প্রায় বলিতে বলিতেই সেটা মুড়ি দিয়া গুটিসুটি মারিয়া শুইয়া পড়িল।

দীনু রক্ষিত এমনভাবে হাসিয়া উঠিল, কে যেন তাহাকে কাতুকুতু দিয়াছে, বলিল—"আজ আবার সোনায় সোহাগা মশাই—এখানেই জবর এসে গেল। একবার ওদিকে চেহারা দেখবেন··কব্জি আর বুকের ছাতি দেখাতে বলুন না, মশাই···আমাদের কাছে! খিক্-খিক্-খিক্।"

কাবুলীর মুখের চেহারা অবর্ণনীয়। রোগের পরিণাম দেখিয়া তাহার অর্ধেক হইয়া গিয়াছিল, এখন সাক্ষাৎ তাহার কার্যপদ্ধতি দেখিয়া তাহার এমন অবস্থা হইয়াছে, কি করিবে কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দীনু রক্ষিতকে জিজ্ঞাসা করিল—"পেশোয়ার কা গাড়ি কব মিলেগা?"

দীনু রক্ষিত একবার আমাদের দিকে চকিতে চাহিয়া লইয়া বলিল—"কলকাত্তামে মিলেগা।"

"হাম কলকত্তা নেহি যায়গা।"

দীনু রক্ষিত বলিল—"দেখলেন তো? এ-ব্যাটার এই প্রথম। সারা কলকাতা শহরটা ওকে দিয়ে দিলেও যাবে না। এই নিয়ে তিনটে কাবুলী আমার চোখের সামনেই ফিরে গেল। খাঁ সাহেব আমার পাহারাদার হয়ে বসে আছে।"

কাবুলী ডাকিল—"এই শুনো!"

দীনু রক্ষিত একরকম ধমকের সুরেই বলিল—"কেয়া শুনেগা? কোলকাতায় নেই যায়গা তো হাম ক্যা করেগা? হিঁয়া পেশোয়ার কা গাড়ি তুমকো কাঁহাসে দেগা?···আবদার পেয়েছেন?"

দেখিলাম দীনু রক্ষিত আমাদের চেয়ে লোক আর অবস্থার তারতম্য বেশি বোঝে। কতকটা ব্যাকুলভাবেই কাবুলী বলিল—"বাবুজী, হামকো পেশোয়ার কা গাড়ি দেখা দেও।"

আশ্চর্য বোধ হইতেছিল—সেই কাবুলী, আর সেই দীনু রক্ষিত!

এই সময় কোন কারণে সামনে সিগন্যাল না পাওয়ায় গাড়িটা হঠাৎ গতিবেগ কমাইয়া একটা ছোট স্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। পাশে একটা মালগাড়ি দাঁড়াইয়াছিল, আমাদের কামরাটা তাহার গার্ডের গাড়ির প্রায় সামনাসামনি গিয়া দাঁড়াইল। গার্ড সাহেব স্টেশনে গিয়া থাকিবে; গাড়িটা খালি। কাবুলী প্রশ্ন করিল—"মালগাড়ি কাঁহা যায়েগা বাবুজী?"

দীনু রক্ষিত আমাদের দিকে একটা চটুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া খুক্-খুক্ করিয়া হাসিয়া উত্তর করিল—"পেশোয়ার!"

কাবুলী ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। একেবারে খানতিনেক মোট ঘাড়ে করিয়া বলিল—"হটো, দরবাজা কোলো।"

মরিয়া হইয়া গিয়াছে। এদিককার দোরটা খুলিয়া সকলে ভিড়ের মধ্যেই ঠাসাঠাসি করিয়া একপাশে দাঁড়াইল। কাবুলী মোটগুলি নিচে ফেলিয়া আবার ফিরিয়া আসিল।

আরও দুইটা লইয়া যখন ফেলিতে যাইবে, গাড়ি হঠাৎ হুইস্‌ল দিয়া ছাড়িয়া দিল। বাক্সটা বাকি ছিল, "বক্সা দেও, বক্সা দেও" করিতে করিতে নামিয়া পড়িল। ওদিক থেকে কেহ অগ্রসর হইল না, আমি উঠিতে যাইতেছিলাম, দীনু রক্ষিত তাড়াতাড়ি গিয়া বাক্সটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"থামুন না মশাই, খাঁ সাহেবের ফিস চাই না ?

ততক্ষণে গাড়ি বেশ জোরও দিয়া দিয়াছে। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম মালগাড়ির গার্ড সাহেব স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে বাহির হইল, তাহার পর ইঞ্জিনের দিকে সবুজপাখা দেখাইয়া নিজের গাড়িতে উঠিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—যেন এমন কিছু একটা দেখিয়াছে, যাহা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আমাদের গাড়িটা একটু ঘুরিয়া যাইতে আর কিছু দেখা গেল না।

বিজয়গর্বে কাবুলী-পরিত্যক্ত বেঞ্চটায় দীনু রক্ষিত হাত-পা ছড়াইয়া বসিয়া একটি বিড়ি ধরাইয়া বলিল—"কাল খবরের কাগজে দেখবেন গার্ড সাহেবের সঙ্গে বে-আইনী করবার জন্যে এক বেটা কাবুলী বর্ধমানের হাজতে পচছে। না দেখতে পান, একটা কুকুর পুষে তার নাম রেখে দেবেন দীনু রক্ষিত···খিক্‌-খিক্‌-খিক্‌···"



গণৎকার

বাড়ির ছেলে অ, আ, ক, খ, লিখিতে শিখিয়াছে। দেয়ালে ক-খ, মেঝেয় ক-খ, বালিশে ক-খ, ভাতের থালায় ক-খ ; কয়লার আঁচড়ে, খড়ির দাগে, শ্লেট-পেন্সিলে, নখের টানে —যেখানে যেটি মানায়। গৃহস্থ বিপন্ন, সামাল-সামাল রব পড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু বিপন্ন কি শুধু গৃহস্থই? ছেলেটির দিক দিয়াও তো ভাবিয়া দেখা উচিৎ একবার। নবার্জিত বিদ্যার ভারে সে বেচারারও যে ভারসাম্য বিচলিত হইতে বসিয়াছে, সে-কথা ভুলিলে চলিবে কেন? দুগ্ধপোষ্য শিশু মাঝে মাঝে এ দুর্বহ বোঝা নামাইয়া একটু দম না লইলে তাহার চলে কেমন করিয়া? আর, শুধু শিশু বেচারাই কি এত দোষ করিয়াছে? বিদ্যার এক অবস্থায় এই মোক্ষম চাপের অভিজ্ঞতা কি আমাদের নিজেদেরই নাই? চুনোপুঁটিদের ছাড়িয়া লাহিড়ি মহাশয়ের কথাই ধরা যাক্। আমাদের জ্ঞান লাহিড়ি। বিদ্যার জাহাজ, তিনটি বিষয়ে ফার্স্ট ক্লাশ এম. এ., তাহার উপর পি-এইচ-ডি। প্রোফেসার হিসাবে সারা দেশটায় কয়টা লোকই বা তাহার পাশে দাঁড়াইতে পারে? বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য সম্বন্ধে কবে একটা প্রবন্ধ দিবেন, দেশ-বিদেশের পত্রিকার সম্পাদকেরা হাঁ করিয়া আছে। প্রবীণ মনীষী ব্যক্তি, —কলেজের লেকচাররুমেই প্রবেশ করুন, বা, কোন বিদ্বৎসভায়ই যান, প্রজ্ঞার একটি অলক্ষ্য জ্যোতি যেন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকে। সমস্ত জায়গাটিতে ছাইয়া পড়ে থমথমে গাম্ভীর্যের ভাব।

কিন্তু এ-জ্ঞানের চাপের কথা বলিতেছি না। কেন না এর গুরুত্ব বাহিরে যতটা অনুমিত হয় স্বয়ং লাহিড়ি মহাশয়ের কাছে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। নিঃশ্বাস-বায়ুর মতোই এটা তাঁহার জীবনে সহজ হইয়া গিয়াছে।

শিশুর কথা অবতারণা করিয়াছি লাহিড়ি মহাশয়ের নবার্জিত বিদ্যার প্রসঙ্গে। তিনি কিছুদিন হইতে সামুদ্রিক বিদ্যা শিখিতেছেন—অর্থাৎ হাত দেখিয়া অদৃষ্ট গণনা। অবিকল শিশুর মতোই ব্যাপার।

লাহিড়ি মহাশয়ের বহির্বাটীর বারান্দার সিঁড়ি দিয়া উঠিতেই ডানদিকের গোল থামটিতে লক্ষ্য করিলে, এবং লক্ষ্য না করিলেও দেখিবেন পেন্সিল দিয়া একখানি মানুষের করতল আঁকা, মধ্যে সোজা, তির্যক, অনেকগুলি সুস্পষ্ট রেখা। প্রথমে মনে হইবে কোন শিশুর কীর্তি, গৃহের প্রবেশ পথেই কি ভাবিয়া চপেটাঘাতের ইংগিতে প্রহারের প্রহরী বসাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিবেন অঙ্কিত করতলটির পাশে ছোট-বড় নানা আকারের নানারকম অঙ্ক—যোগ বিয়োগ হইতে আরম্ভ করিয়া রেখাগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি নানারূপে দুরূহ কাণ্ড!

জিনিসটা লাহিড়ি-মহাশয়ের হাতের "ক-খ"। হয়তো কোনদিন কলেজে যাইবার সময় অন্যমনস্ক হইয়া বিদ্যার ভার থামের গায়ে নামাইয়া গেছেন—গুরুভার না নামাইয়া আর পাদমপি চলিতে পারেন নাই।

আপনি বোধ হয় উঠিয়া গিয়া বারন্দার গোল টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসিয়া একখানি খবরের কাগজ তুলিয়া লইবেন। প্রথমেই নবীনতম সংবাদটির জন্য 'স্টপ প্রেস'-এর স্তম্ভটির উপর নজর ফেলিলেন। দেখেন সেই থামের হাত, পাশে যোগ চিহ্নের মত চেরাকাটা নক্সা, তাহার ঊর্দ্ধে নিচে দুই পাশে রাশিচক্রের বিচিত্র নাম সব—কর্কট, মিথুন, তুলা, তাহার নীচে সেই রকম দুর্বোধ্য হিসাব।

অন্তঃপুরে আপানার প্রবেশ নাই, নতুবা দেখিতেন সামুদ্রিক বিদ্যার জোয়ার ঘরের আসবাবপত্র, এমন কি মাথার বালিশ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য, একদিন গভীর রাত্রে লাহিড়ি মহাশয় গৃহিণীর ঘুমন্ত পিঠে পর্যন্ত করকোষ্ঠির ছক আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া যে বাড়ীতে একটা অধাচাপা প্রবাদ আছে তাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলিতে পারি না।

অন্য বিদ্যার সম্বন্ধে ঝঞ্ঝাট বিস্তর, প্রথম, বই কিনুন, বা অন্য উপায়ে যোগাড় করুন আহৃত বই রাখিবার হাঙ্গামা আছে,—আলমারি, র‍্যাক, বুককেস, টেবিল, যা হয় একটা; যথাস্থান হইতে লওয়া, পড়িয়া আবার যথাস্থানে রাখা, আবার সেই যথাস্থান হইতে কার্যগতিকে যদি দূরে রহিলেন তো বিদ্যাও তৎকালের জন্য ধামাচাপা রহিল।

এ বিদ্যায় ও-ধরনের বখেড়া খুব অল্প, কেন না প্রত্যেকটি মানুষ—ছেলে হোক, বুড়া হোক, যুবা বা প্রৌঢ় হোক, স্ত্রী হোক, বা পুরুষ হোক—এ শাস্ত্রের দুইখানি পুস্তক সর্বদাই দুই পাশে লটকাইয়া ঘুরাফিরা করিতেছে। শুধু একবার সংকোচ কাটাইয়া চাহিয়া লওয়া; দোকানে হোক, ট্রামে হোক, বাসে হোক, খেলার মাঠে হোক, স্টীমার ঘাটে হোক। তাহার পর এই রকম ধরনের একটা বার্তালাপ ঃ—

"ইস! আপনার যশো-রেখাটা!…খুব বিশিষ্ট কি না, নজর পড়তেই চোখ আটকে গেল।"

"জানেন না কি সামুদ্রিক বিদ্যা আপনি ?"

"জানি যে এমন বলতে পারি না, কেন না সমুদ্রের মতোই অতল, তবে কৌতূহল আছে।…

দেখতে পারি কি হাতটা ?—খুব রিমার্কেব্‌ল্‌ (remarkable) কয়েকটা বিষয়ে… আপত্তি যদি না থাকে তো…"

"নাঃ, আপনি আর কি ? কিই বা আমার যাবে-আসবে ? তবে, মাফ করবেন, খুব বিশ্বাস নেই জিনিসটায়…"

বিশ্বাস নাই বলিয়া যে আপনি বক্তার হাতটা পাইবেন না এমন নয়, কেন না, বিধাতা হস্ত বা, ললাট যেখানেই হোক্‌ এমন একটা কূট রেখা বসাইয়া দিয়াছেন যে, বিশ্বাস না করিলেও অদৃষ্ট সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যা যাহা কিছু হোক শুনিবার জন্য মানুষ সর্বদা উন্মুখ। এই অদ্ভুত উন্মুখতার লজ্জা ঢাকা দিবার জন্য সে হাতটা বাড়াইয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে, "দেখুন, তবে বিশ্বাস করতে মন যায় কি না।"

ওদিকে আঁচড় কাটা আর এদিকে মাঠে ঘাটে সর্বত্রই এইভাবে ইতর-ভদ্র সকলের হস্ত পরীক্ষা করিয়া লাহিড়ি মহাশয়ের নূতন লব্ধ বিদ্যায় আর মরিচা পড়িতেছে না। আর সর্বদাই শান-পড়া অস্ত্রের মতো উৎকটভাবে পরীক্ষোন্মুখ।

বাড়ির সব হাত মুখস্থ, পাড়ারও প্রায় সব হাতেরই পাঠোদ্ধার হইয়া গিয়াছে। যশের ফাঁস নানা রংবেরঙের দূরের হাত সমস্ত আকৃষ্ট করিয়া হাজির করিতেছে। এত সব ব্যাপারের মাঝে কিন্তু একটা মস্ত বড় ফাঁক থাকিয়া গেছে। অতি যশস্বী ভিষকের মতো লাহিড়ি মহাশয় নিজের দিকে চাহিবার অবসর পান নাই—নিজের হাতটা একবার দেখিয়া রাখিবেন এ ফুরসৎটা আজ পর্যন্ত হইয়া উঠে নাই। দেখিয়া রাখিলে কিন্তু হইত ভাল।

ঢাকায় সাহিত্য কিংবা বিজ্ঞান সম্মেলন, কিংবা দুই একসঙ্গে, ঠিক মনে পড়িতেছে না, কেন না এক খরচে একাধিক মেয়ের বিবাহের মতো বাঙ্গালী আজকাল অনেক সময় সাহিত্য, বিজ্ঞান ইতিহাস, দর্শন সবগুলোকেই এক বেদীতেই উৎসর্গ করিয়া লইতেছে। অনুষ্ঠানে গোলমাল হোক্‌ না—হোক্‌ স্মৃতির গোলমাল না হইয়াই পারে না।

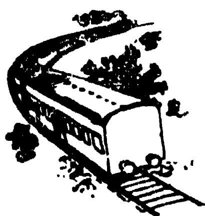
ঢাকা মেল দাঁড়াইয়া আছে। সব পিছনে সম্মেলন-যাত্রীদের জন্য একখানি রিজার্ভ গাড়ি। অনেকে আসিয়া গিয়াছেন, বিছানা…পত্র পাতিয়া গুছাইয়া-টুছাইয়া বসিয়াছেন। নানা রকম গল্প আরম্ভ হইয়া গিয়াছে,…."অতুলদা তো এখন আসবেন না সেকেণ্ড বেল পেয়ে গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করবে ঠিক সেই সময়ে থল্‌থলে শরীর নিয়ে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়, কোমরের কাপড় আলগা হয়ে গেছে, কুলি ও-দিকে মাল

তুলে দিয়েছে, মালের মালিক নিয়ে ব্যস্ত"…ঢাকাই—অভ্যর্থনায় এবারেও সেই রকম "চাইলেনি অষ্টগণ্ডা মরিচের" ব্যবস্থা থাকবে নাকি মশাই ?…তা হ'লে শর্মা ফেরৎ গাড়িতেই…বাঁচলে তবে তো সম্মেলন ?…উস্, সে কি ঝাল মশাই !…এখনও জিভের ডগা বিষিয়ে আছে !"….এ র‍্যাগ্ কোথাকার ?…মেসোপটেমিয়ায় নিয়েছিলেন ? সেই ফাস্ট' গ্রেট-ওয়ারের সময়কার ? এখনও এ-রকম রয়েছে !—তা হবে না কেন বলুন !—ওদের দেশের উটের পিঠের লোম, কী রকম রোদটা টেনেছে !—"

কোণের দিকে বেশ প্রশস্ত একটি বিছানা পাতিয়া একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। একেবারে কোণটিতে একটি বড় গোছের সুটকেশ, তাহার উপর জড়সড় করিয়া রাখা একখানা ওভারকোট।

ভদ্রলোকের কোটের গায়ের বোতাম খোলা, তাহার নীচে পশমী কামিজেরও বোতাম খোলা, দেখিলে মনে হয় শীতকে ভয়ানক ভয় করেন, অথচ গরমকেও মোটেই বরদাস্ত করতে পারেন না।

ভদ্রলোক খুব নিবিষ্ট মনে একজনের হাত দেখিতেছিলেন। পাশে এবং সামনের বেঞ্চিতে —গাড়ির অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা ভিড় একটু বেশি, এবং একটু একটু করিয়া আরও বাড়িতেছে। কয়েকজন হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে, একজন স্থির নয়নে নিজের হাতের পানে চাহিয়া আছে, দুই-একজন হাতে হাত ঘসিয়া রেখাগুলা স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে।



নায়ক যে স্বয়ং আমাদের লাহিড়ি মহাশয় তাহা বোধহয় আর বলিয়া দিতে হইবে না। যে-হাতটা দেখিতেছিলেন সেটা সম্বন্ধে যাহা বলিবার বলিয়া লাহিড়ি মহাশয় প্রসারিত অন্য একটি হাত টানিয়া লইয়া আবার তখনই ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "ডান হাত দিন ; বাঁ হাত মেয়েদের।"

গাড়ির দুয়ারের নিকট হইতে একজন চেঁচাইয়া বলিলেন, "জ্ঞানদা এখানে আমি আছি। ওদিকে তো অক্ষরে-অক্ষরে ফলে গেল—এখন এই নতুন কেতুর প্রবেশ হয়েছে, রেখা-গুলোতে কিছু…"

পাশের ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন, "হাত দেখতে জানেন নাকি উনি ?"

কেতু-কবলিত ভদ্রলোক সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "হাত দেখতে জানেন !—বাংলার চীরো (Cheiro) বলছে আজকালে ও'কে !" "অভ্রান্ত !"

"রীয়েলি ?—আমার ও জিনিসটায় তত ফেথ্ নেই, কিন্তু একবার দেখালে হয়, লাগে ইণ্টারেস্টিং—মন্দ নয়।"

দ্বিতীয় ঘণ্টি পড়িল, গার্ড হুইসিল্ দিল। অতুলবাবুর জন্য একটা উদ্বিগ্নতা পড়িয়া গেছে। যে ভদ্রলোকটি চিনিতেন শুধু তিনিই তখন নিশ্চিন্তভাবে প্ল্যাটফর্মের গেটের দিকে চাহিয়া আছেন ; এমন সময় সত্যই দেখা গেল আধভেজান গেট ঠেলিয়া, পাশের চেকারদের স্থানভ্রষ্ট করিয়া একজন গৌরকান্তি স্থূলকায় ভদ্রলোক হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছেন। ডান হাতে কোমরের কাপড় আর কোঁচার উপরের ভাগটা মুঠা করিয়া ধরা, বাম হাতে একটা ওভারকোট, একটা ছাতা, একটা মোটা লাঠি; একটা পাককরা র‍্যাগ, আর একটা দীর্ঘ টর্চ। তিন-চার গজ আগে বিছানা, সুটকেস্, টিফিন-কেরিয়ার, জলের কুঁজো প্রভৃতি লইয়া একটা কুলি। গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে, রিজার্ভ কামরার মধ্যে থেকে কয়েকজন হাতমুখ নাড়িয়া চীৎকার করিতেছে ; "শীগ্‌গির আসুন দাদা"…"গার্ড সাহেব থামাও একটু"—শুধু সেই অভিজ্ঞ লোকটি নির্বিকার ভাবে বসিয়া সবাইকে আশ্বাস দিতেছেন, "উনি ঠিক উঠবেন—আপনারা ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ?"

কুলি জিনিসপত্র ভিতরে দিয়া ভদ্রলোককে যথারীতি গাড়িসাৎ করিলে, ভদ্রলোকের প্রথম প্রশ্ন, "লাহিড়ি এসেছে ?"

"ঐ যে উনি—যথারীতি জমিয়ে বসেছেন।"

"একবার হাতটা দেখাতে হবে, কেন এরকম বার বার হচ্ছে যে !…"

গাড়িতে তখন বেশ মোশান দিয়াছে, এমন সময় মাঝবয়সী গোছের একজন ভদ্রলোক পাদানিতে টুপ করিয়া লঘু চরণে উঠিয়া পড়িলেন। হাতে একটি মাঝারি সাইজের সুটকেশ, আর কিছু নয়।

সমস্বরে কয়েকজন আপত্তি করিয়া উঠিলেন, "এটা রিজার্ভ মশাই !"

ভদ্রলোক দরজা ঠেলিয়া উঠিতে উঠিতে মিনতির স্বরে বলিলেন, "পরের স্টপেজেই নেমে যাব, এইটুকু !"

ওদিকটায় অনেকেই নিজের আসন ছাড়িয়া লাহিড়ি মহাশয়কে ফিরিয়া জড় হইয়াছে ; আগন্তুক অল্প একটু জায়গা লইয়া নিতান্তই সংকুচিতভাবে বসিলেন।

লাহিড়ি মহাশয়ের আরও দুই তিনখানি হাত দেখা হইয়া গিয়াছে। এখন সেই দরজার কাছের ভদ্রলোকটির হাত পরীক্ষা হইতেছে। লাহিড়ি মহাশয় বলিতেছেন, "ফলাফল আপনাকে যা বলে দিয়েছিলাম তাই—আরে রোজ রোজ তো আর মত বদলাচ্ছে না বিধাতা পুরুষের, তবে, আপনি একটা পলা ব্যবহার করবেন…আপনার এই রেখাটার ওপর একটু শনির দৃষ্টি আছে, এই ক্রস মার্কটা দেখছেন তো ? ঐ পলা এটাকে আর স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেবে না।"

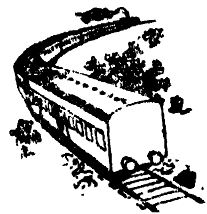
'মদনমঞ্জরী'র বিজ্ঞাপনে যেমন দেখা যায়—সেই রকম প্রসারিত হস্তের গাদি লাগিয়া

গিয়াছে। লাহিড়ি মহাশয় প্রসন্ন হাস্যের সহিত এক একটি লইয়া রায় দিতেছেন—
"অষ্টমাধিপতির আগমনের যোগ, একটা পোখরাজ পরবেন···আপনার এখন বৃহস্পতির দশা—অর্থ-বিদ্যার যোগ—শিক্ষকতার একটা উন্নতির যোগ আসছে···
উত্তর হইল, "আছে যোগ সত্যিই?···শুনেছি, তো প্রিন্সিপ্যাল একটা ফেভারেব্‌ল কন্‌ফিডেন্সিয়্যাল রিপোর্ট দিয়েছে।"
"তাহলে কথাটা ঠিক—হাতের মার্কে ধরা পড়বে?"···"পড়তে বাধ্য। আগে রেখা তার পর ঘটনা, বাদ যাবার জো আছে?"
সবচেয়ে শেষে যে ভদ্রলোকটি উঠিয়াছিলেন, উঠিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "এত ভিড় কিসের?"
"জ্ঞান লাহিড়ি হাত দেখছেন।"
"খুব বিচক্ষণ না কি?"
"বাংলায় জোড়া নেই এখন। দেখাবেন নাকি?"
ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, "না, কাজ নেই; দেখালেই তো শুনব মৃত্যুযোগ··· দেখলেন না, গাড়ি ধরতেই কি রকম একটা ফাঁড়া গেল!"

একটু থামিয়া বলিলেন, "তবে, সেদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রুদ্রাক্ষ পরা একটা পাঞ্জাবী কি কতগুলো যা তা আউড়ে গেল, বিশ্বাস যত করি আর না করি, মনে খানিকটা ধোঁকা লেগে আছে বটে; দেখলে হত এঁর সঙ্গে মেলে কি না। কিন্তু ওই ব্যুহের মধ্যে ঢোকাই মুস্কিল। আর, যদি দেখাতেই হয় তো কাছে বসে দেখানই ভাল, এখান থেকে হাত টেনে নিয়ে দেখবেন, নড়া ছিঁড়ে যাবে মশাই, এতে রাজি নই···"

যে-হাতটা দেখা হইতেছিল সেটা শেষ হইলে যাহার সঙ্গে কথা হইতেছিল সেই ভদ্রলোক বলিলেন, "জ্ঞানদা, এই ভদ্রলোকের হাতটা একবার দেখুন তো···ইনি আবার এক পাঞ্জাবী গেরুয়াধারীর পাল্লায় পড়েছিলেন, কি সব বলে দিয়েছে ভদ্রলোককে··· উনি আবার পরের স্টপেজ ব্যারাকপুরেই নেমে যাবেন।"
"সত্যি না কি, আসুন তো দেখি।"—লাহিড়ি মহাশয় একটা হাত দেখিবার জন্য সবে হাতে করিয়াছিলেন, ছাড়িয়া দিয়া উৎসুকভাবে আগন্তুকের পানে চাহিলেন।
ইণ্টারেস্টিং কেস বলিয়া সকলে জায়গা ছাড়িয়া দিল, ভদ্রলোক গিয়া লাহিড়ি মহাশয়ের পাশটিতে বসিলেন।
গাদাগাদিতে বেশ গরম পড়িয়াছে, অন্তত লাহিড়ি মহাশয়ের পক্ষে তো বটেই, তিনি কোটটি খুলিয়া পাশে রাখিলেন। ভিড়ের চোটে সত্যই একটু গরম বোধ হইতেছে, ভদ্রলোকটিও গায়ের র‍্যাপারটা খানিকটা পাশে কোটটার উপর জড় করিয়া রাখিলেন, তাহার পর ডান হাতটা বাহির করিয়া আগাইয়া দিলেন।

লাহিড়ি মহাশয় হাতের চারটা আঙুল একটু উল্টোদিকে টিপিয়া হাতটা ভাল করিয়া চিতাইয়া লইলেন, তাহার পর ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলেন, "কি বলেছে সে পাঞ্জাবীটা মশাই ?"
ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, "কেন বলুন তো ?"
"ওয়াণ্ডারফুল হাত মশাই ! এই এতগুলো হাতের মধ্যেএকটাও এ-রকম রিচ্ (rich) নয় !···একটা কথা বলুন তো, আপনি কি কোন একটা বড় রকম স্পেকুলেশান (Speculation) নিয়ে যাত্রা করেছেন ? মানে, কোন একটা বড় রকম লাভ-লোকসানের ব্যাপার নিয়ে ?"



ভদ্রলোক বিস্মিতভাবে মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "সেটা পর্যন্ত ধরা পড়েছে রেখায়, আশ্চর্য তো !"
লাহিড়ী মহাশয় ভালো করিয়া দেখিবার সুবিধার জন্য ওভারকোট্টা সুটকেশের উপর হইতে সরাইয়া ভদ্রলোকের র‍্যাপারের উপর রাখিলেন এবং সুটকেস্টা খাড়া করিয়া একটু জায়গা করিয়া লইয়া সরিয়া বসিলেন, তাহার পর হাতটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিজের মাথাটাও নানাভাবে নাড়িয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "ঠিক তো ? সেই স্পেকুলেশানে ষোল আনা লাভ আপনার, আর সেও এখন থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। বৃহস্পতির এ-রকম যোগ দেখা যায় না সচরাচর—স্পেকুলেশানে লোকের নিজেরও গাঁট থেকে কিছু বের করতে হয়, আপনার যেন সেটুকু লোকসানও নেই···দেখি, এই দিকটা ওল্টান্ তো···লাইন্ অফ্ লাক্—(Line of luck) ওয়াণ্ডারফুল ?"
রাতারাতি বড়লোক হইয়া অন্য মানুষ হইয়া যাইবে—হঠাৎ এমন এক সৌভাগ্যশালীর আবির্ভাবে সকলে অতিমাত্র কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠিল।
ভদ্রলোক লজ্জিতভাবে বলিলেন, "কিছু ভুল হচ্ছে না তো ? আমার কপালে সদ্য লাভ একথা তো এ-পর্যন্ত কোন গণৎকার বললে না। পাঞ্জাবীটা বরং বললে—মস্ত বড় একটা লোকসানের যোগ যাচ্ছে—তা সে তো সদ্য সদ্য তার হাত দিয়েই আরম্ভ হয়ে গেছে। অন্য লাভের কথা...."
"যদি না হয় তো আমার সমস্ত বইগুলো নিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দোব।....আপনার অ্যাড্রেসটা বলুন তো। কলকাতা থাকেন তো ?"

ভদ্রলোক ঠিকানা দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আর কি বলে ?

লাহিড়ি মহাশয় হাতটা আবার নানাভাবে নাড়িয়া-চাড়িয়া অনেকক্ষণ নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, "এদিকে তো চমৎকার চলেছে—শুধুই লাভের যোগ। ওদিকে অনেক পরে শনির একটা যোগ আছে—তা'তে সমুদ্রযাত্রা সূচিত করে।···কোন বিপদ আছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না, একটু ভালোরকম ক্যালকুলেশান করে না দেখলে ধরতে পারছি না···।

এমন সময় গাড়ির বেগ কমিয়া আসিতে লাগিল। ভদ্রলোক বলিলেন, আমায় এখানেই নামাতে হবে···" তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, আবার কি সমুদ্রযাত্রার বিপদের কথা বলে দিলেন মশাই ?"

একজন ভদ্রলোক বলিলেন, "আপাতত মোটা দাঁও মারুন তো। আর, বিপদের কথা কি বলছেন মশাই ? ও তো স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাছে, লাভের পর লাভে মোটা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স (Bank-Balance), তার পরে লম্বা ইউরোপীয়ান টুর···সঙ্গে নেবেন মশাই···"

গাড়ি প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিয়াছে। কয়েকজন ভাগ্যবানকে খানিকটা আগাইয়া দিল। একজন দুয়ারটা খুলিয়া হাসিয়া বলিল, "ইউরোপীয়ান টুর তো দূরের কথা, আপাতত নগদ লাভের একটা ফীস্ট্ পাওনা রইল মশাই, ঢাকা থেকে এসেই হাজির হ'ব সদলবলে, ঠিকানা তো জানাই রইল।"

ভদ্রলোক নামিয়া গেলে, গাড়ি ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে একজন-এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ক্রু উঠিল।

ওদিকে হাত দেখা আবার সুরু হইল। সকলের কৌতূহল যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। একজন বলিল, "অথচ পাঞ্জাবী গেরুয়াধারী ভদ্রলোককে কি সব দুর্ভাবনার কথাই বলে দিয়েছিল ! বোগাস্।" আবার একজন লাহিড়ি মহাশয়কে প্রশ্ন করিল, "ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফলবে বলছেন আপনি ? আশ্চর্য উন্নতি করেছে তো পামিস্ট্রি !"

লাহিড়ি মহাশয় বলিলেন, "ফলে কি না—ফলে ঢাকা থেকে এসে জিজ্ঞেস করলেই বুঝতে পারবেন, এই তিন চারটে দিনের অপেক্ষা। ভদ্রলোক ঠিকানা তো দিয়েই গেলেন।"

অত অপেক্ষাও করিতে হইল না। ক্রু ওদিকে চেক করিতে করিতে এই কোণে আসিল ; হাতটা সকলের সামনেই প্রসারিত করিয়া বলিল, "টিকিট প্লীজ।"

একে একে টিকিট দেখাইতে লাগিল সকলে। লাহিড়ি মহাশয় ওভারকোটটা সরাইয়া কোটটা তুলিয়া লইলেন। ভিতর পকেটে হাত দিতেই মুখটা বিবর্ণ হইয়া গেল। বুক পকেটে হাত দিলেন, পাশের দুই পকেটে, তাহার পর শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "ব্যাগটাই পাচ্ছি না যে ! তাতে টাকা পঞ্চাশেকের নোটও ছিল !"

সকলে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

একজন বলিল, "ওভারকোটের পকেটে রাখেন নি তো?"

রাখা হয় নাই, তবুও দেখা হইল, সুটকেশ খুলিয়াও দেখা হইল, আসে পাশে বিছানা তুলিয়া কোথাও ব্যাগ নাই।

লাহিড়ি মহাশয় যেন আর এক ঝোঁক বিচলিত হইয়া কোটটা তুলিয়া লইলেন, বুক-পকেটে হাত দিয়া শূন্য হাতটা বাহির করিয়া বলিলেন, "ঘড়িটাও নেই, সোনার চেন-সুদ্ধু।..."

এক গাড়ির আওয়াজ ভিন্ন গাড়িটাতে অন্য কোন শব্দ নাই। সকলেই যেন কাষ্ঠ-পুত্তলীর মত নিশ্চল নির্বাক হইয়া গিয়াছে, লাহিড়ি মশাইয়ের ভাবটা বর্ণনাতীত। বেশ কিছুক্ষণ পরে একজন শুধু ভাগ্যফলের সদ্য লাভের বহরটা নির্ধারিত করিবার জন্য কৌতুহলপরবশ হইয়া প্রশ্ন করিল, "কত দাম ছিল ঘড়িটার?....এদিকে তো নগদ পঞ্চাশ টাকা গেছে বলছেন।...কেমন কৌশল করে আপনার কোটটার ওপর গায়ের র‍্যাপার খানিকটা বিছিয়ে দিলে! ওর জন্য হাতটা যে ভেতরে ভেতরে নিজের কাজ গুছোচ্ছে তখন অতটা খেয়াল করি নি।"

অপর একজন বলিল, "তার ওপর উনিও আবার নিজের ওভারকোটটা চাপিয়ে দিলেন; ওর হয়ে গেল পোয়াবারো!"

তৃতীয় একজন বলিল, "চাপিয়ে না দিয়ে উপায় আছে? ওর যে মস্ত বড় একটা লাভের যোগ যাচ্ছে। সবাইকে হাতের কাছে জুগিয়ে দিতে হবে না?"

অতুলদা নিতান্ত সাদাসিধা প্রকৃতির লোক, কোন কথা কি ভাবে দাঁড়ায় অতটা হিসাব রাখেন না, বলিলেন, "গেল বটে থোক টাকা একটা, কিন্তু সার্থক শিক্ষা তোমার লাহিড়ি!...চব্বিশ ঘণ্টাই বা কোথায় গো? এদিকে মুখ থেকে কথা বেরুল, আর ওদিকে সঙ্গে সঙ্গে লাভ; একটি পয়সা খরচ নেই, একটু হাঁকু পাঁকু নেই, একরত্তি দৌড়-ঝাঁপ নেই। ধন্যি শাস্ত্র বাবা!...আরও সমুদ্রযাত্রাও তোমার মিথ্যে বলা নয়, শেষ পর্যন্ত বেটার কপালে 'কালাপানি' আছেই আছে, এই বলে দিলাম।"



রেলে

দোলের ছুটিতে বাড়ি আসিতেছি।

ইণ্টার ক্লাসে আমার কায়েমী সঙ্গী একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক। আর কিছু কিছু উঠিতেছে, দু'এক স্টেশন পরে নামিয়া যাইতেছে—এই রকম! ভদ্রলোক মোগলসরাইয়ে উঠিয়াছেন, দৌড় চন্দননগর পর্যন্ত। এদিকে সঙ্গী হিসাবে মন্দ নয়, কিন্তু বৃহস্পতি-বারের বারবেলায় বাহির হইয়াছেন বলিয়া একটা কিছু ঘটিবেই সেই আশঙ্কায় মাঝে মাঝে নিঝুম মারিয়া যাইতেছেন। বলিলেন—"সবাই বললে—কাশী বাবার ত্রিশূলের ওপর, এখানে যাত্রার দিন দেখতে হয় না। বিশেষ কাজে এলাম চলে, কিন্তু…"

বাবাকে খোলাখুলিভাবে চটাইবার ভয়ে 'কিন্তু'র পরের বক্তব্যটুকু আর প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন না।

বক্সারে তাঁহার এক আত্মীয় থাকেন, আসিয়া দেখা করিবার কথা। গাড়ি ছাড়িয়া গেলে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দেখলেন তো?—এল না, একটা কিছু নিশ্চয়…"

আমি বলিলাম—"তিনি যখন বেরস্পতিবার দেখে আর বেরোনই নি, তখন তো কিছু দুর্ঘটনার ভয় নেই তাঁর দিক দিয়ে।"

ভদ্রলোক সন্দিগ্ধভাবে স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"ঠাট্টা করছেন?"

দানাপুর পর্যন্ত আর কেন কথা কহিলেন না। দানাপুর হইতে গাড়ি ছাড়িলে আমিই প্রশ্ন করিলাম—"এইবার পাটনাই তো?"

পাটনা আমার খুব চেনা, ছাত্রজীবনের একটা মোটা অংশ পাটনায়ই কাটাইয়াছি; তবুও দুইজনের মধ্যেকার মৌনতাটা বড় অস্বস্তিকর ঠেকিতেছিল বলিয়া প্রশ্নটা করিলাম।

ভদ্রলোক তূষ্ণীম্ভাব থেকে হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন—"তাই তো, পাটনাই তো এবার আসছে। যাক্ নিশ্চিন্দি! অপরেশ বাবাজীরও তো যাবার কথা…"

সঙ্গে সঙ্গেই নিরুৎসাহ হইয়া থামিয়া গেলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন—"না,

তার যে বেরস্পতিবার পেঁছিবারই কথা, তা হলে তো সে কালই রওয়ানা হয়ে গেছে …দুর্যোগে একটি লোক পাশে থাকলে উপকার হোত ; তা, সবাই তো আমার মতো তালকানা নয় যে বার-ক্ষণ না দেখে হুট করে বেরিয়ে পড়বে…"

প্রশ্ন করিলাম—"অপরেশ বাবাজীটি কে ?"

"ভাইঝি-জামাই।…এখানকার কলেজের প্রফেসার। হীরের টুকরো আগে নামেই শুনেছিলাম মশাই, ভাইঝির বিয়ে দিয়ে চোখে দেখলাম !"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"এমন !"

বৃহস্পতিবারের বারবেলার শঙ্কাটা লুপ্ত হইয়া ভদ্রলোকের চোখ-মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বলিলেন—"লাখে একটি পান কিনা সন্দেহ। দুটো বিষয়ে এম. এ., দুটোতেই গোল্ড মেডেল ; কিন্তু দেখে কেউ বলুক দিকিন ছেলেটার পেটে বিদ্যে আছে—একটু টুঁ শব্দটি নেই মুখে—সাত ডাকে উত্তর দিতে জানে না। বিয়ের পর দু'বার গিয়েছিল—একবার জোড়ে, একবার আর কিসে: য মনে পড়ছে না…হ্যাঁ, ঠিক, শৈলীর মেয়ের অন্নপ্রাশনে, তা একটি দিন কেউ টের পেলে যে, বাড়ীতে একটা জামাই এসেছে ? কি ধীর শান্ত ভাব ! কি বিনয়ী কথা বলেছে তো আদ্দেক তার মুখের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে। এক-বাড়ী শালী-শালাজ—ডবল এম. এ. বলে তারা তো আর খাতির করবে না ! ঠাট্টা-তামাশায় ব্যতিব্যস্ত করবার ফিকির করছে—উহুঁ, সে ভিড়বেই না তো তুমি ঠাট্টা করবে কার সঙ্গে ?…আর আজকালকার ছেলেও সব দেখছি তো ? …দুটো ইংরিজি অক্ষর পেটে গেছে কি না-গেছে—মুখে যেন তুবড়ী ফুটছে মশাই।"

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এতটা প্রশংসা শুনিয়া কিছু না বলিলে ভাল দেখায় না বলিয়া আমি কহিলাম—"যার হবার ঐ রকমই হয়—!"

"সিগারেট কি বিড়ি ?…রামঃ—পান পর্যন্ত ত্রিসীমানার মধ্যে আসবার যো নেই !… অমন দেখেননি মশাই, ঐ যে বললাম, লাখের মধ্যে একটি পাওয়া দুষ্কর। দাদা যেমন দিলেন সুচুর বিয়ে অনেক দেখেশুনে অনেক খোঁজাখুঁজি করে, তেমনি জামাই পেয়ে আর ক্ষোভ রইল না মশাই। দুঃখ রয়ে গেল সে কাল চলে গিয়েছে, না হলে দেখিয়ে দিতে পারতাম—আর, একবার দেখলে, একটু পরিচয় হলে ভুলে যেতে পারতেন ভেবেছেন ?—রামোচন্দ্র বলুন।"

এমন সময় গাড়ি গরদানীবাগে প্রবেশ করিল। "সর্বনাশ, পাটনা এসে গেল হে।" বলিয়া ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বিছানাটা ভাল করিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া লইয়া হঠাৎ আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলাম। ভদ্রলোক খানিকটা ঢাকা থাকিয়া মুখটা বাহির করিয়া বলিলেন—"বুঝলেন না ব্যাপারটা ? অসুখ হয়েছে, নিঝুম হয়ে পড়ে আছি। না হলে যা পাটনায় ভিড় !…গাড়িতে ঠেলে উঠলে একটুও বসবার জায়গা পাওয়া যাবে

নাকি? অবশ্য ঘুম আজকে হবে না; বেরস্পতির বারবেলায় বেরুনো—কালশনের মস্তবড় একটু ধুকপুকুনি রয়েছে যে এদিকে। কিন্তু ঘুম না হলেও বসে বসে তো সমস্ত রাতটা কাটান যায় না মশাই!···এই এসে গেল স্টেশন···আমি তা হলে ঢুকলাম মশাই, গুড্ নাইট···যা অসুখ মনে আসে—আমি মাঝে মাঝে গ্যাঙাতে থাকব। সমস্ত রাত ঠায় বসে প্রহর গোণার চেয়ে শুয়ে মাঝে মাঝে একটু গ্যাঙান ভাল মশাই। গুড্ নাইট।"

কানের কাছে যদি একটা লোক সমস্ত রাত গ্যাঙাতে থাকে তো সব প্রথম তো আমার ঘুমের দফা নিকেশ। বলিলাম—"না গ্যাঙাবার দরকার নেই! ধরুন যদি ঘুমই আসে তখন আবার ঐ গ্যাঙানি বন্ধ হবার ভয়ে ঘুমাতেই পারবেন না। সে এক উল্টো ফ্যাসাদ। তার চেয়ে ঘুপটি মেরে পড়ে থাকুন, আমি সামলে নেব'খন।"

গাড়ি প্ল্যাটফরমে ঢুকিয়াছে। "তবে তাই ঠিক; গুড্ নাইট।" বলিয়া ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি মুখটা ঢাকিয়া ফেলিলেন।

পাটনায় ভিড় বটে! গাড়ি থামিলেই প্রায় দশ-বারোজন বাঙালী যুবক সুটকেস, ব্যাগ, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি লইয়া আমাদের গাড়িতে ঢুকিয়া পড়িল। প্রায় সকলেই যুবক, দু'একজনের বয়স একটু বেশী, বেশভূষা কথাবার্তায় সবাইকে বেশ শিক্ষিত বলিয়া বোধ হইল। গাড়িটা যেমন খালি ছিল ঠিক সেই পরিমাণ ভর্তি হইয়া গেল। আমি একটা বেঞ্চে বিছানা পাতিয়া দখল করিয়াছিলাম, বিছানাটা গুটাইয়া লইতে হইল। ভিড়ের শেষ অংশ ভদ্রলোকের বেঞ্চে গিয়া হানা দিল।

"মশাই, ও মশাই···।"

বলিলাম,—"উনি অসুস্থ, ওঁকে দয়া করে আর তুলবেন না।"

"কি অসুখ মশাই?"

বলিতে যাইতেছিলাম জ্বর, কিন্তু দেখিলাম দলের মধ্যে একজন ডাক্তার, পকেটে স্টেথোস্কোপ রহিয়াছে, সামলাইয়া লইয়া বলিলাম—"বিদেশে জ্বরে পড়েছিলেন, সবে কয়েকদিন পথ্যি পেয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন···রেস্ট দরকার···"

"ও!···আপনার কেউ হন?"

"না, একসঙ্গে আসছি অনেক দূর থেকে; তা ভিন্ন, পথে, সবাই সবার বন্ধু, বিশেষ করে যখন স্বজাতি···"

"তা তো বটেই, তা তো বটেই। তা হলে ও বেঞ্চটা ছেড়েই দিই সবাই। আমরা এই দিকেই কোন রকম করে কুলিয়ে নেব'খন। বলে, যদি হয় সুজন—তেঁতুলপাতায় ন'জন।"

সকলে বক্তার পানে চাহিল। একে প্রবাদটা নিতান্ত মেয়েলি, তাহাতে বলিবার মধ্যেও বেশ একটা টান ছিল। একজন হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"কার কাছে পাওয়া এ স্যাম্পেল-টুকু মশাই? হার্ হাইনেস্?"

যুবকের মুখে একটা বার্ডসাই, কায়দা মাফিক সেটা দুই আঙুলে সরাইয়া ধুম্রা ছাড়িয়া বলিল—"নো, হার্ ইম্পিরিয়েল ম্যাজেস্টি, মহামহিমান্বিতা শাহাজ ঠাকরুন। আমি আপনাদের proverb (প্রবাদ)-টা শোনালাম কোন রকমে, কিন্তু সরি (sorry), ডেলিভারির (delivery) মাধুর্যটা কিছুই ফোটাতে পারলাম না, আর এ কাংস্যনিন্দিত কণ্ঠে সে বীণানিন্দিত স্বর আসবেই বা কোন্ দুঃখে?—কী সে সুর, কী ভঙ্গী, কী গমক—আপনারা একটা 'প্রোভার্ব'মাত্র শুনলেন, আমার কানে ওটা তানলয়-সমন্বিত একটা অপ্সরা-কণ্ঠের সঙ্গীতের মতন বেজেছিল—যদি হ—য় সু—জো—ন তো তেঁতুল পাতায় ন—জোন···"

খুব চমৎকার ভাবে মেয়েলি কন্ঠের নকল করিয়া, হাত আর গলা খেলাইয়া—যুবক মুখচোখের ভঙ্গি সহকারে এমনভাবে প্রবাদটা আওড়াইল যে সকলে হাস্য করিয়া উঠিল।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। সকলে এক একটা জায়গা লইয়া বসিল। যুবক আমার বেঞ্চে বসিয়া পড়িয়া হাত জোড় করিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল—'বেয়াদপি মাফ করবেন; হোলির ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি সব—অনেকে আবার বাড়ির চেয়েও উৎকৃষ্ট জায়গায়! সকলে দুটো প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি, প্রথমত গাড়িতে ঘুমুব না, দ্বিতীয়ত প্রাণে যা অনুভব করছি তা খোলা প্রাণে বলব, কারুরই। তোয়াক্কা করব না, অবশ্য এক মহিলা ছাড়া। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বশত গাড়িতে কোন মহিলা নেই। আপনি নয়ই (মাফ করবেন); আশা করি যিনি শুয়ে রয়েছেন তিনিও কোন মহিলা নন। এ-অবস্থায় আমরা যদি আমাদের যা-অনুভব-করা তাই বলার প্রতিজ্ঞা পালন করতে চেষ্টা করি তো আশা করি অপরাধ নেবেন না; শুধু আজকের রাতটুকুর জন্য আমরা এই লিবার্টিটুকু নেব....।"

ওদিক থেকে একজন বলিল—"তোমার রসনা তো চিরকালই ঐ রকম চাঁদ, শুধু আজ কেন?"

যুবক আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"বিশ্বাস করবেন না মশায়। ও যেমন এই উৎকট অপবাদ দিচ্ছে, আমি তেমনি এক সেট সাক্ষী দিতে পারি যাদের জবানবন্দি ঠিক উল্টো। যাক, মোটের ওপর শুধু আজ রাতটুকুর জন্য এই লিবার্টিটুকু নিচ্ছি। আমরা হোলিকা দেবীর বাসর জাগছি, প্রগল্ভতা মাফ করতে হবে। এ-অনুগ্রহের জন্য আমরাও আপনার খুব বড় একটা উপকার করতে রাজী আছি—"

হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম—"কি উপকার শুনি? যদিও উপকার না করলেও চলবে; আপনারা আমোদ-আহলাদ করতে করতে যান সে তো ভালই।"

যুবক বেশ সপ্রতিভভাবে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"উপকার এই,—আপনিও যদি ঐরকম মুড়িসুড়ি দিয়ে শোন তো আমরা সবাই বলব—'উনি অসুস্থ, সেই দিল্লী থেকে ঐরকম মুড়িসুড়ি দিয়ে আসছেন।' এমন কি যদি আপত্তি না

থাকে তো পর্দানশীন মহিলাও বলে চালাতে পারি"—বলিয়া যুবক হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আর সকলেও যোগ দিল।

প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম বটে, কিন্তু যুবকের কথাবার্তায় সত্যই এমন একটা নির্দোষ প্রাণখোলা ভাব ছিল যে রাগ করিতে পারিলাম না।···

দেখিলাম বকার অভ্যেসটা যুবকের খুব রপ্ত। বার্ডসাইয়ে গোটাকতক টান দিয়া আবার শুরু করিল—"না বিলীভ্ মি, পর্দানশীনের ব্যাপারটা কল্পনা মাত্র নয়; কাজেও একবার পরীক্ষা হয়ে গেছে। পাটনাতে এই চাকরির জন্যে ইণ্টারভিউ করতে আসছি। সকালে নেমেই এক ঘণ্টা পরে ইণ্টারভিউ, সুতরাং রাত্রে ঘুমটা বিশেষ দরকার। হাওড়ায় গাড়িতে উঠেই এক মতলব করা গেল। গাড়িটায় তখন আমি ছাড়া মাত্র আর একটি প্যাসেঞ্জার উঠেছেন, আমার চেয়ে বয়সে একটু বড়, হিন্দু ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রফেসর। সব খুলে ভদ্রলোককে বললাম। বললেন—"তা তো বুঝলাম, কিন্তু উপায় কি? অসুখের নাম করে শুয়ে থাকবেন?' ···বললাম—'অসুখে আবার একটু ছটফটানি, কাৎরানি না থাকলে সব সময় ফল হয় না। অসুখের চেয়ে লোকে স্ত্রীলোককে বরং বেশি ভয় করে;—ভয় করেই বলুন বা খাতির করেই বলুন—একই কথা, কেন না খাতিরটা ভয়েরই রূপান্তর।'···তখন আমার নতুন গোঁফদাড়ি বেরিয়েছে—নানা রকমের ঘন ঘন পরীক্ষা চলছে; মাস দুই নিয়ে তখন সেই অল্পকেই যথাসাধ্য আয়ত্ত করে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখছি। ভদ্রলোক আমার মুখের পানে চেয়ে শিউরে উঠে বললেন—'স্ত্রীলোক! আপনি!'···বললাম—'আগা পাস্তালা মুড়ি দিয়ে শোব আপনার এই এণ্ডির চাদরটা দিন,' বলে তিনি অনুমতি দেওয়ার আগেই চাদরট তুলে নিলাম। ভদ্রলোক বললেন—'তা না হয় হোল, কিন্তু একা একা স্ত্রীলোক যাচ্ছেন—এটা কি রকম হবে?'···এবার আমার আশ্চর্য হওয়ার পালা; চোখ-মুখ কপালে তুলে বললাম—'সে কি মশাই? একা একা কি? আপনার ওয়াইফ্—স্বামী সঙ্গে রয়েছেন, তাঁর চাদর গায়ে!···বলুন ধর্ম সাক্ষী করে যে আপনার চাদর নয়!···"

গাড়ির সবাই, উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, সেটা থামিলে প্রশ্ন করিলাম—"পেঁছুলেন তো নিশ্চিন্দি হয়ে?"

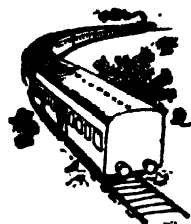
যুবক ধুঁয়াটা অন্যদিকে ছাড়িয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"আজ্ঞে না; আমিই তো দুনিয়ার শেষ বুদ্ধিমান নয়. তা ভিন্ন তখন বাংলাদেশটাও ছাড়িয়ে আসেনি গাড়িটা। বর্ধমান পর্যন্ত ভদ্রলোক ঠেকিয়ে রাখলেন কোন রকমে। আসানসোলে একটি ডিগডিগে গোছের ছোকরা উঠল। প্রফেসারের কথা শুনে একটু নিরাশ হয়ে বললে—'মহিলা? তা হলে থাকুন শুয়ে।'···সরল না কিন্তু; আমি এণ্ডির চাদরটার মধ্যে দিয়ে দেখছি সে জায়গায়ই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উস্‌খুস্ করছে। একটু পরে আমার নতুন কেনা ব্রোগ জুতো জোড়াটা তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলে—'এ জোড়াটা কি ওঁরই?'

আবার গাড়িতে হাসির একটা হররা, উঠিল। সেটা থামিলে কয়েকজন একসঙ্গে প্রশ্ন করিল—'তারপর? তারপর?"

যুবক বলিল—"তারপরেও আবার বলতে হবে? পড়ে থাকলেই বোধ হয় চলে যেত কোন রকমে'—প্রফেসার সামলাবার চেষ্টাও করছিলেন। লোকটাও সে-চেহারা নিয়ে সাহস করে সন্দিগ্ধ মহিলার গায়ে হাত দিতে পারত না; কিন্তু শরীরের জোরের ওপর ভরসা করেই তো বাঙালী বেঁচে নেই; খাঁটি বাংলায় এমন চিপটেন কাটা শুরু করলে যে শেষ পর্যন্ত সোয়ামীর চাদরের মধ্যে মেজাজ ঠিক রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল; মেজাজের সঙ্গে হিসেবও গেল বিগড়ে—বিধাতা যে মহিলার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখবার ব্যবস্থা করেননি সেটা ভুলে গিয়ে গায়ের চাদর টান মেরে ফেলে···"

বাকি গল্পটা হাসি হুল্লোড়ের মধ্যে আর বলাই হইল না।

কিউল জংশনে যখন গাড়ি পঁহুছিল তখন রাত সাড়ে বারোটা। হাসি-হুল্লোড়ে দলটা বেশ একটু শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। যুবক নতুন নতুন গল্প করিয়া উৎসাহটা চাড়া দিয়া আসিতেছে, তবুও যেন একটু ঝিমুনি ধরিয়াছে দলটায়। যুবকের ভাণ্ডারও যেন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। মোগলসরাইয়ের ভদ্রলোক খাঁটি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।



কিউল হইতে গাড়ি ছাড়িলে যুবক হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিল, হাতে একটা সাপ্তাহিক টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া পাকাইতে পাকাইতে বলিল—"জেন্‌টেল্‌মেন, আই ভোট্ দ্যাট্ উই সেলিব্রেট দি হোলি ইভ ইন্ এ মোর্ বিফিটিং ম্যান্যার (আমার প্রস্তাব—হোলির পূর্বের রজনীটা আরও উপযুক্তভাবে ব্যয়িত করা হোক)।"

দলটা আবার একটু সচকিত হইয়া উঠিল, প্রশ্ন হইল—"শোনাই যাক ব্যাপারটা কি?

যুবক সেই রকম ভাবে কাগজটা পাকাইতে পাকাইতে লেক্‌চার দেওয়ার ভঙ্গিতে দুলিয়া দুলিয়া বলিল—"হোলির অপর নাম বসন্তোৎসব, বসন্তকে চিনতে হলে, উপভোগ করতে হলে, সৌন্দর্যকে চেনা চাই। সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমাদের সব ধারণাই বাতিল হয়ে যায়—যদি নারীকে না দেখতে জানি, কেন না বিশ্বের সব সৌন্দর্য কেন্দ্রীভূত হয়েছে নারীর মধ্যে। কাল আপনারা সকলেই বসন্তোৎসবে যোগদান করতে

যাচ্ছেন, বিফোর ইউ ভু, আই উড্ পুট্ ইওর সেন্স্ অব্ বিউটি টু টেস্ট্ (যোগদান করবার আগে আপনাদের সৌন্দর্যজ্ঞানের পরীক্ষা করতে চাই)।"

সকলে সকৌতুক ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া রহিল। যুবক বার্ডসাইটা দাঁতে চাপিয়া কাগজটা খুলিয়া একটা ছবির পাতা বাহির করিল এবং সেটা ঘুরাইয়া সবাইকে দেখাইয়া বলিল—"জেন্টেল্মেন্, লেট মি প্রেজেণ্ট টু ইউ মিস্ লিলিয়ান স্মিথ, অ্যাণ্ড মিস্ ডোরা কেনেডি—বিউটি কুইন অ্যাণ্ড রানার-আপ্ ইন্ দিস্ ইয়ারস্ বিউটি কম্পিটিশান (আমি এ বৎসরের সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতায় নির্বাচিতা সৌন্দর্য-রাজ্ঞী মিস্ লিলিয়ান স্মিথ এবং তাহার পরবর্তিনী মিস্ ডোরা কেনেডিকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি)। আপনাদের চক্ষে কে শ্রেষ্ঠা প্রতিপন্ন হয় দেখা যাক; আমাদের মাপকাঠি আর ওদের মাপকাঠির তফাতটা টের পাওয়া যাবে। প্রত্যেকের একটি করে ভোট, নিন্ আসুন; আশা করি কাল যখন সবচেয়ে বেশি যাকে ভালবাসেন তার গায়ে রং দেবেন তখন রংটা বেশি মিষ্টি হয়ে ফুটবে। আসুন।"

কাগজটা লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যুবক সকলের ভোট সংগ্রহ করিতে লাগিল। হাস্যে-রহস্যে, কৌতুক-কৌতূহলে মতামতের কাটাকাটিতে ব্যাপারটা অল্পের মধ্যে জমিয়া উঠিল। এর পূর্বে মোকামায় একজন পশ্চিমা ভদ্রলোক উঠিয়া বাঙ্ক্ আশ্রয় করিয়া শুইয়াছিলেন, তাঁহাকেও মত দিতে হইল। এমন কি একজন শ্মশ্রুধারী মুসলমান বৃদ্ধ কিউলে উঠিয়া এক কোণে বসিয়াছিলেন, যুবকদের আব্দার-পীড়াপীড়িতে পড়িয়া তিনিও একটি অভিমত না দিয়া অব্যাহতি পাইলেন না। যুবক বলিল—"জনাব মেহেরমান, আপনাকে দেখে আমার মহাকবি ওমর খৈয়ামের কথা মনে পড়ছে, সৌন্দর্যের যাচাই-এ আপনার ভোট তো আমাদের না হলেই নয়।"

যুবক ছবি দুইটার পাশে নাম লিখিতেছিল। সবার শেষ হইলে একটির পাশে নিজের নাম বসাইয়া গুনিয়া বলিল—"জেন্টেল্মেন্, আই বেগ লীভ্ টু ডিক্লেয়ার দি রেজাল্ট অব্ দি ভোটিং (আমি ভোটের পরিণাম জানাইতে চাই)। দেয়ার হ্যাজ্ বীন্ এ টাই —ইচ গেটিং সেভেন্ ভোট্স (উভয়েই সাত ভোট করিয়া পাওয়ায় একই স্তরভুক্ত হইয়াছেন)। এখন উপায়?"

সকলেই একটু মৌন হইয়া রহিল, যেন সত্যই একটা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। শেষে ওদিক থেকে একজন যুবক বলিল—"দুজনকেই সমান মর্যাদা দেওয়া হোক না কেন?"

একজন সমর্থনও করিল—"হ্যাঁ, দুজনকেই সন্তুষ্ট করা ভাল, ও-জাতের কাউকে চটান সমীচীন মনে করি না।"

যুবক ঘুরিয়া বলিল—"মাফ করবেন, ও-জাতকে চেনেন না বলেই ও-কথা বলতে সাহস করছেন। ওঁদের একজনকে সন্তুষ্ট করে তাঁরই আজ্ঞানুবর্তী হয়ে থাকাই নিরাপদ। ওঁদের দুই বা ততোধিক জনকে একসঙ্গে সন্তুষ্ট করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাক্, এই

মহাসঙ্কটে আমি একটু আলোর সন্ধান পেয়েছি···” চারিদিক থেকে ব্যস্ত প্রশ্ন হইল— “কি আলো ?” একজন বলিল—“হোয়াট ডেভিল্‌রি আর ইউ আপ্‌টু নেক্সট? (এর পরেও কি শয়তানি মতলব এঁটে রেখেছেন ?)”

যুবক বলিল—“গাড়ির মধ্যে এখনও একজনের ভোট বাকি আছে।”

সকলে প্রথমটা বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর যুবকের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া চাদর-ঢাকা মোগলসরাইয়ের ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—“না, না, ও ভদ্রলোক অসুস্থ, ঘুমুচ্ছেন।” আমিও আপত্তিতে যোগ দিলাম। যুবক দাঁড়াইয়াই ছিল, চুরুটে একটা বড় টান দিয়া বাঁ হাতে সরাইয়া লইয়া বলিল—“এক্‌স্কিউজ্‌ মি জেন্‌টেল্‌মেন্‌—আমি বলতে বাধ্য—দুঃখেরই সহিত বলতে বাধ্য, উনি পাটনা থেকে এখান পর্যন্ত এক মুহূর্তও নিদ্রা যাননি। কলেজ-হোস্টেল, গাড়িতে নিদ্রিতা মহিলা রূপে এবং নববিবাহে আড়ি পাতার অত্যাচারে আমায় বহুবার নাক-ডাকিয়ে ঘুমুতে হয়েছে, সুতরাং আমি ও জিনিসটির স্বরূপ চিনি—কোথায় খাঁটি, কোথায় মেকি বুঝতে পারি। এখন আপনাদের অনুমতি প্রয়োজন অথবা প্রয়োজনের গুরুত্ব হিসাবে নিষ্প্রয়োজনও বলতে পারি, সুতরাং ভগবানের আশীর্বাদ নিয়ে আমি আমার কর্তব্যে তৎপর হই।” এই বলিয়া যুবক উঠিয়া ভদ্রলোকের পিঠে একটু ঠেলা দিয়া ডাকিল—“মশাই।”

চাদরের নীচে আড়ামোড়া ভাঙ্গার ঈষৎ চঞ্চলতা হইল একটু।

যুবক পিঠেই হাতটা রাখিয়া বলিল—“মশাই, যখন জেগেই আছেন, জাগতে বলছি না ; কিন্তু দয়া করে মুখটা খুলে আমাদের একটা গভীর সমস্যা···”

আর অগ্রসর হইতে হইল না। ভদ্রলোক মুখ খুলিয়াছেন। সে-চাহনি জন্মে কখনো ভুলিব না, যুবকেরও সেই রকম স্তম্ভিত চিত্রার্পিত ভাব। হাত থেকে কাগজটা পড়িয়া গিয়াছে—সৌন্দর্য-সম্রাজ্ঞী ভূলুণ্ঠিতা !

“কে !···ইয়ে—ওর নাম কি—আমাদের অপরেশ বাবাজী ?···কালকের গাড়িতে তাহলে ···আমি ভাবলাম যেমন লিখেছিলে, বুঝি কালই চলে গেছ। তা হলে দেখছি···” “আজ্ঞে —মানে—কাকাবাবু যে !—না কাল আর শরীরটা কেমন আছে আপনার ?···মানে···”

* * *

এর পরে অপরেশ বাবাজীর যতটুকু দেখিলাম তাহার সঙ্গে তাহার খুড়শ্বশুরের বর্ণনা হুবহু মিলিয়া গেল,—সত্যই, কি ধীর, কি বিনয়ী !—বন্ধুদের হাজার প্ররোচনায়ও কথা বলে না, বলেই তো তার অর্ধেক কণ্ঠেই থাকিয়া যায়—হীরার টুকরা—সত্যই লাখে একটা মেলে না এমন ছেলে···!



ক্ষণিকা

পূর্বাহ্নেই বলিয়া রাখা দরকার যে নিম্নবর্ণিত ঘটনাটি বিয়াল্লিশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সময়। লাইন ভাঙা, লুটতরাজ প্রভৃতি অনেক রকমই কাণ্ড হইয়াছিল—কিন্তু এ যা ঘটিয়াছিল তাহার জন্য একেবারেই আমি প্রস্তুত ছিলাম না—লুকাইব না, সত্যই একবার মনে হইয়াছিল—বুঝি **Thief of Baghdad**-এর যুগ আবার ফিরিয়া আসিল।

ইণ্টার ক্লাসের ভিড় সহ্য করিতে না পারিয়া মাঝের ভাড়াটুকু দিয়া একটি রসিদ লইয়া সেকেণ্ড ক্লাস আশ্রয় করিলাম। দিব্য নিরিবিলি। একটি মাত্র আরোহী ছিলেন, তিনিও আমি যে স্টেশনে উঠিলাম সেই স্টেশনে নামিয়া গেলেন ; রহিলাম একা।

কিন্তু এ সুখটুকুও বেশিক্ষণ টিকিল না।

পরের ষ্টেশনে গাড়ি থামিতেই একটি এদেশী বড় বরযাত্রীদল আসিয়া কামরাটি আক্রমণ করিল। প্রথমেই একটি লাল মখমলের ঘেরাটোপ দেওয়া পাল্কি গাড়ির দরজায় লাগাইয়া দিয়া, একরাশ কাপড়, উড়ানি, আলোয়ান আর সোনারূপার গহনায় মোড়া, আবক্ষ ঘোমটা টানা একটি মেয়েকে কোন রকমে গাড়িতে তুলিল। তাহার পর দানের জিনিসপত্র—ময়দার আঠা দিয়া রঙিন কাগজে মোড়া নানা গঠনের বড় বড় চ্যাঙারি, তাহার উপর বাঁশের পাতলা রঙিন চ্যাচারি দিয়া তৈরি নানা রকমের ফুল পাখী ; চারখানা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খোলা চ্যাঙারিতে বিপুলকায় মিহিদানা—এদেশীয় ভাষায় লাড্ডু ; বড় বড় ছাঁচির ছয় ছাঁচি দই ; মুখঢাকা গোটাকতক তোলো ; গয়ে নানা রকম কুটজ চিত্র। এ ভিন্ন তিনখানা তোরঙ্গ ; একটা নূতন একটা পুরাতন সুটকেস, একটা হারমোনিয়ামের বাক্স, একটা গ্রামোফোন। আউধ-ত্রিহুত রেলওয়ের ছোট গাড়ি—মাঝের খালি জায়গাটা, দুইটা বাঙ্ক্ এবং তিনখানা বেঞ্চের একখানা বেঞ্চ পর্যন্ত ভরিয়া গিয়া কামরাটা থৈ-থৈ করিতে লাগিল।

বাঁচোয়া এই যে মানুষের মধ্যে আর উঠিল শুধু বর। বাকি সবাই ইণ্টার এবং থার্ড ক্লাসের পানে চলিয়া গেল। ঘণ্টি পড়িল, গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

বরটিও দেখিলাম কনের পদ্ধতিতেই সজ্জিত,—পরনে লালরঙে ছোবান কাপড়, পায়ে লাল রঙের মোজা, গায়ে মখমলের একটা প্রকাণ্ড উড়ানির উপর লাল রঙের খুব কাজ করা কাশ্মীরী শাল ; কানে দুইটি বড় বড় সোনার কুণ্ডল, চোখে কাজল, মাথায় এদেশী অর্থাৎ মৈথিল পাগড়ি। ছেলেটির বয়স বাইস-তেইশ হইবে।

একটি অতি আধুনিক বাষ্পীয়যানের সেকেণ্ড ক্লাসে অতি পুরাতন যুগের এই ভগ্নাংশটিকে বেশ লাগিতেছিল। চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময় বেশ বিশুদ্ধ ইংরেজীতে প্রশ্ন হইল—"আপনি কোথায় যাবেন জানতে পারি কি?"

আমার লক্ষ্যস্থল জানাইয়া ছোকরারও গন্তব্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম ; জানিতে পারিলাম—মাঝখানের একটা স্টপেজ বাদ দিয়া পরের স্টপেজ পর্যন্ত গতি। গাড়িটা একস্প্রেস, প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগিবে।

দেখিলাম গাড়ি প্রথম স্টপেজের কাছে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ছোকরা ততই যেন চনচনে হইয়া উঠিতে লাগিল। কয়েকবার আড়চোখে আমার পানে চাহিল, বলা বাহুল্য বেশ প্রসন্নদৃষ্টি নয়। বার তিনেক মরিয়া হইয়া একটু একটু করিয়া বস্ত্রের সজীব পুঁটুলিটির দিকে ঘেঁষিয়া গেল, একবার মুখটা বাড়াইয়া পুঁটুলিটির যেখানে কান থাকিবার কথা সেইখানে কি যেন বলিবার চেষ্টাও করিল। তারপর কি মনে হইল, ও পন্থাটাই ছাড়িয়া দিয়া আবার পূর্ব স্থানটিতে আসিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ গেল, তাহার পর কিছু না করিতে পারার উপর কিছু না বলার অস্বস্তিটা এড়াইবার জন্য আমার পানে চাহিয়া মন্তব্য করিল—"উঃ, সেকেণ্ড ক্লাসেও কী ভিড় দেখুন তো—কী দুর্দিনই যে পড়েছে।"

একটি মাত্রও অতিরিক্ত লোকে ভিড় মনে হয় এমন অবস্থার কথাটা ভাবিয়া অতি কষ্টে একটা হাসি চাপিয়া রাখিলাম ; কিন্তু আর যেখানেই হোক দুর্দিনটা যে এ-কামরায় প্রবেশ করে নাই সেটা বলিয়া ছোকরাকে আর অপ্রতিভ করিতে মন সরিল না। মুখে বলিলাম—"তা বই কি, ভিড়ের কথা আর বলবেন না।"

ছোকরা একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল। তাহার পর বাহিরের দিকে মুখ করিয়া একটু উদাস চিন্তিত দৃষ্টিতে বসিয়া রহিল। সিগারেটের ধুঁয়া আরও ঘনীভূত করিয়া লইয়া তাহার অন্তরাল হইতে দেখিয়া যাইতে লাগিলাম।

গাড়ি আর একটা ষ্টেশন ছাড়াইয়া গেল, মাঝে মাত্র একটি স্টেশন, তাহার পরই গাড়িটা থামিবে। ছোকরার আমার দিকে আড়চোখ চাহনি এত দ্রুত হইয়া উঠিল যে কয়েকবার আমার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল। শেষে আবার ইংরেজীতেই বলিল—"অত্যন্ত দুঃখিত, আমার এই সব জিনিসপত্রে আপনাকে অত্যন্ত অসুবিধায় ফেলেছি।"

বলিলাম—"কিছু না, একটা গোটা বেঞ্চ তো আমি দখল করে রয়েছি।"

আবার একটু চুপচাপ গেল।

তাহার পর ছোকরা আবার যেন কথাটাকে মনে মনে বশ করিয়া ভাঁজিয়া লইয়া বলিল—"আপনি বলেছেন বটে অসুবিধে হচ্ছে না, কিন্তু সেটা আপনার উদারতা। আমি এদিকে বেশ অস্বস্তি বোধ করছি।"

বলিলাম—"কেন? আপনার তো অস্বস্তির কোন কারণ দেখছি না।"

এর উপর বেশ ভাল রকম উত্তর না থাকায় ছোকরার মুখে কোথায় যেন একটু বিরক্তি ফুটিয়া উঠিল; ভাবটা—উপকার লইতে চায় না, ভেতরকার কথাও বোঝে না—এ ভ্যালা এক বেরসিকের পাল্লায় পড়া গেল তো!

নিরুপায়ভাবে মুখটা ঘুরাইয়া আবার বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল।

খানিকক্ষণ পরে আবার ঘুরিয়া বসিল এবং একটু কি ভাবিয়া আমার সবচেয়ে কাছে যে চ্যাঙারিগুলা ছিল, উঠিয়া আসিয়া সেগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল—"আমিই নেমে অন্য গাড়িতে যেতাম, কিন্তু এই একরাশ জিনিসপত্র ছেড়ে যাওয়া··· আমি ওদের তখনই বললাম—এগুলো অন্য গাড়িতে তোল—তা···"

আমি একটু হাসিয়াই বলিলাম—"ওরা তো বেশ গুছিয়েই রেখে গিয়েছিল, আপনি বরং এই ফুলপাখীওয়ালা চ্যাঙারিগুলো এদিকে এনে একটু অসুবিধের ফেললেন আমায়।"

ছোকরা আমায় কক্ষচ্যুত করিবার জন্য চ্যাঙারি কয়টা ইচ্ছে করিয়াই এমনভাবে রাখিয়াছিল, কি ভুল করিয়া বলিতে পারি না, তবে বড় যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।—"মাফ করবেন, বিশেষ দুঃখিত, অতটা নজরে পড়ে নি"—বলিয়া সেগুলাকে আবার তফাতে সরাইয়া, অন্যগুলাকেও সত্যই আরও একটু ভালভাবে গুছাইয়া নিজের জায়গাটিতে গিয়া বসিল।

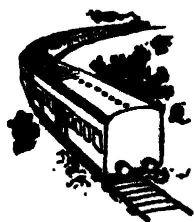
একটু বেশ স্থিরভাবেই—কতকটা যেন হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর আবার সেই অবস্থা; একবার বস্ত্রান্তরাল বর্তিনীর পানে চায়, একবার আমার পানে তির্যক্ দৃষ্টি হানে। খানিকটা এই ভাবে কাটিবার পর আমার দিকে ঘুরিয়া বসিয়া বলিল—"আপনাদের—বাঙালীদের বেশ ব্যবস্থা।"

প্রশ্ন করিলাম—"কি সম্বন্ধে বলছেন?"

"এই বরের সঙ্গে যা দেওয়ার, টাকা ধরে দিয়ে দিলে—নিশ্চিন্দি। কাঁড়ি প্রমাণ এই সমস্ত জিনিস গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া, বিশেষ করে আজকালকার দিনে!—নিজের কষ্টের কথা ছেড়েই দিই, গাড়ির অন্য লোকদেরও তো বিপর্যস্ত করতে হয়, কি অধিকার আছে আমার বলুন?....ধরুন আপনি যদি রাগে আর বিরক্তিতে এ কামরাটা ছেড়ে চলে যান,—আমার পক্ষে কতবড় একটা ক্ষোভের কারণ হয় বলুন তো!"

আবার একটি উদ্বেল হাসি চাপিয়া বলিলাম—"যদিও আমার বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে না আর চলে গিয়ে আপনাকে ক্ষুন্ন করবার সম্ভাবনা নেই,—তবু পুরনো যুগের প্রথাগুলো এ যুগে একটু ছেঁটে কেটে নেওয়াই ভাল বটে! তা আপনি তো বেশ শিক্ষিত বলে মনে হচ্ছে, একটু সংস্কারের চেষ্টা করেন না কেন?"

ছোকরা রাগিয়া উঠিল—"সংস্কার! আপনি আমাদের হতভাগা সমাজকে চেনেন না, তাই ওকথা বলছেন। সারা মানুষকে এখন পর্যন্ত জড়পদার্থের সামিল বলে মনে করে, কোন পথ দিয়ে সে যাচ্ছে, কোথায় সে এল, কোথায় বসল তা পর্যন্ত চোখ মেলে দেখতে দেয় না, তাদের মধ্যে আপনি সংস্কারের আশা করেন? তারা মানুষ যে...." অনুচিত হইলেও আমার নজরটা কোণে গুটিসুটি মারা সত্যই নিতান্ত জড়পুত্তলিবৎ বধূটির উপর গিয়া পড়িল; তখনই সেটা ফিরাইয়া লইয়া বলিলাম—"এও তো আপনাদেরই ঠিক করতে হবে, আপনারা শিক্ষা পাচ্ছেন, সমাজের ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল..."



পূর্বের ন্যায়ই চটিয়া নিজের একটা কানের কুণ্ডল টানিয়া ধরিয়া ছোকরা বলিল—"ওতো বড় কথা হোল মশাই, বিয়ের সময় কচি খোকার মতো কানে এই কুণ্ডল পরতে আপত্তি করেছিলাম বলে আমার পিতা তক্ষুণি টেলিগ্রাম করে কলেজ থেকে আমার নাম কাটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন! বিশ্বাস করতে পাচ্ছেন কথাটা?—এ যুগে!"

সঙ্গত উত্তরও ছিল না, তাহা ভিন্ন বৃথা চটাইয়া লাভ নাই, কথাটা ঘুরাইয়া লইবার জন্য প্রশ্ন করিলাম—"কলেজে পড়েন আপনি?"

ছোকরা নিজের কথাগুলা লইয়া মনে মনে রোমন্থন করিতেছিল, বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, পাটনা কলেজ ফিফ্‌থ ইয়ার আর্ট্‌স।"

কথাগুলায় এমন ঝোঁক দিয়া বলিল যাহাতে কুণ্ডলের অত্যাচারটা আমার কাছে মোটেই অস্পষ্ট না থাকে। কি ফল হইল লক্ষ্য করিবার জন্য আমার মুখের পানে একটু স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আমার আর বলিবার কি আছে? অথচ কথা ঘুরাইতে গিয়াও ছোকরাকে নিজের অভিভাবক, নিজ সমাজের উপর অযথা চটাইয়া তুলিতেছি মাত্র। আবার প্রসঙ্গটাও বদলাইবার একটু চেষ্টা করিলাম, বলিলাম—"আপনি মৈথিল ব্রাহ্মণ বলে বোধ হচ্ছে..."

আমার আরও বলিবার ইচ্ছা ছিল, অর্থাৎ—আপনাদের মধ্যেও তো আজকাল অনেকে সংস্কারমুক্ত হচ্ছে, উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতযাত্রাও করছে—কিন্তু ছোকরা মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া আরও উগ্রভাবে বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যবশতঃ।"

সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মুখে তোড় নামিল—'দুর্ভাগ্যবশতঃ' কথাটা আর একবার গভীর ব্যঙ্গের সহিত উচ্চারণ করিয়া বলিল—"কুণ্ডল পরতে আপত্তি করাতে পিতা গর্জন করে বললেন—'রামচন্দ্র যখন বিবাহ করতে আসেন এ-ই মিথিলায় তখন তাঁর কানে কুণ্ডল ছিল, সেই রামায়ণের যুগ থেকে প্রথাটা চলে আসছে, আজ আমার ছেলে দুপাতা ইংরেজী পড়ে বলে সেটা লোপ করে দেবে!'···শুনলেন তর্কের পদ্ধতিটা, অথচ তিনি নিজে ন্যায়ের একজন বড় পণ্ডিত, একটা বড় সংস্কৃত কলেজের ন্যায়ের অধ্যাপক!....অথচ আমি যদি বলতাম, "রামচন্দ্র নিজের স্ত্রীকে পর্দার অভিশাপ থেকে বের করে বনে বনে সঙ্গে করে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, বাইরের দৃশ্যের কত সৌন্দর্য বাইরের জীবনের কত বৈচিত্র্য একসঙ্গে উপভোগ করেছিলেন, তাঁকে সম্পূর্ণ নিজের মনের মতন করে গড়ে নিজেদের দাম্পত্য জীবন···"

আমার দৃষ্টি আর একবার অনিচ্ছাসত্বেও বধূটির উপর গিয়া পড়িতে বোধ হয় ছোকরার সম্বিৎ হইল, হঠাৎ থামিয়া গেল।

একটু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে, বেশ অনেকক্ষণ বাহিরের দিকে মুখ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

আরও একটি স্টেশন অতিক্রান্ত হইয়া গেল, এর পরেই গাড়িটা থামিবে। ছোকরা আবার উসখুস্ করিতে লাগিল, তাহার পর ফিরিয়া বসিয়া একটু কুণ্ঠিত থাকিয়া বলিল—"আমি এক উপায় ঠিক করেছি। এই আগের স্টেশনে গাড়িটা থামলে আমরা দু'জনে নেমে অন্য সেকেণ্ড ক্লাসে চলে যাব।"

আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম—"কেন?"

উত্তর হইল—"বা, আমাদের সমাজের কু-সংস্কারের জন্য আপনি কষ্ট পাবেন কেন? আমরা নেমে গিয়ে ওদিককার কতকগুলো জিনিস এই বেঞ্চটাতে গুছিয়ে রেখে আপনার ওখানটা পরিষ্কার করে দিই...."

ভিতরে একটা প্রবল হাসি ঠেলিয়া উঠিতেছিল, সেই সঙ্গে কষ্টও হইতেছিল—আহা আর কত স্পষ্ট করিয়া বলিবে বেচারি? রেলের এই ঘণ্টাখানেকের একটু মুক্তি, দু'জনে মিলিয়া গাড়ির দু'ধারে অপসৃয়মান দৃশ্যের মধ্যে, গতিবেগের আনন্দে নূতন জীবনটাকে একটু উপলব্ধি করিয়া লওয়া, তাহার পর তো আবার পুরাতনপন্থী পরিবারের মধ্যে সেই চিরন্তন অবরোধ, দিনান্তে একটু চোখের দেখার জন্য সেই হা-হুতাশ···

স্টেশন আসিয়া গিয়াছে, গাড়ির গতিবেগটা কমিয়া আসিতেছে, ছোকরায় ছটফটানি যেন উগ্র রকমভাবে বাড়িতেছে—সত্যই তো আর গাড়ি থেকে দুজনে নামিয়া যাইতে পারে না; অথচ আমি কি মনের কথাটা একটুও বঝিতে পারিতেছি না? ঘুণাক্ষরেও না?···এই বাঙালীকে আবার বুদ্ধিমান জাত বলে!···

গাড়ি আসিয়া স্টেশনে দাঁড়াইতেই আমি উঠিয়া পড়িয়া বলিলাম—"আপনি কুণ্ঠিত

হবেন বলে বলতে পারছিলাম না, কিন্তু সত্যিই আমার একটু কষ্ট হচ্ছিল, এধরনের নানা রকম জিনিসের গাদাগাদির মধ্যে রেলযাত্রায় কখনো অভ্যস্ত নই কিনা।...আপনি অনুগ্রহ করে যদি আমার তোরঙ্গ আর বিছানাটার উপর একটু লক্ষ্য রাখেন তো অন্য সেকেণ্ডে ক্লাসে গিয়ে বসি ততক্ষণ।"

উত্তরের প্রয়োজন ছিল না, বলিতে বলিতেই দরজাটা খুলিয়া নামিয়া গেলাম। ছোকরা মুখটা নিচু করিয়া একেবারে চোখের কোণ দিয়া আমার পানে মিটিমিটি চাহিয়া রহিল।

এই দৌড়টা আরও একটু লম্বা, মাঝে প্রায় সাত আটটা স্টেশন। যে সেকেণ্ড ক্লাসটায় গিয়া উঠিলাম সেটাতে চ্যাঙারির ভিড় না থাকিলেও একটু লোকের ভিড় ছিল, বেশ আরাম করিয়া বসিতে পারিলাম না। কিন্তু একটা মস্ত বড় কাজ করিয়াছি বলিয়া মনে মনে একটা তৃপ্তি অনুভব করিতেছিলাম। এই অনুভূতিটি মনকে বেশ সিক্ত করিয়া তুলিতে একটা সিগারেট ধরাইতে ইচ্ছা হইল। পকেটে হাত দিয়া বুঝিলাম সিগারেটের কেসটি পূর্বের কামরার বেঞ্চে ফেলিয়া আসিয়াছি, দেশলাইটি সুদ্ধ। গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে, প্ল্যাটফরম ছাড়াইয়া গেছে।

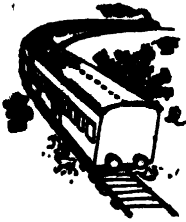
মনটা বড় অপ্রসন্ন হইয়া পড়িল এবং যদি বলি একটা সামান্য ভাবাবেশে ঐ কামরাটা ছাড়িয়া আসিবার জন্য নিজের প্রতিই বিরূপ হইয়া উঠিল তো বিশেষ মিথ্যা বলা হয় না। খুব ঘন ঘন সিগারেট খাই না, তবে সরঞ্জাম দূরে পড়িয়া থাকিবার জন্য অভাবটা ক্রমেই উগ্রতরভাবে অনুভব করিতে লাগিলাম। এই অভাব আর আত্মধিক্কারের মধ্যে কখন বেশ একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি হঠাৎ ব্রেক কসিয়া গাড়িটা থামিয়া যাইতে জাগিয়া উঠিলাম। দেখি স্টেশন নয়, কোন কারণে গাড়িটা মাঝপথে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে, মুখ বাড়াইয়া বুঝিলাম দূরের একটা কামরায় কে ভ্যাকুয়াম ব্রেকের চেনটা টানিয়া দিয়াছে। গার্ড নামিয়া আসিয়া তদন্ত করিতেছে।

আমার হঠাৎ খেয়াল হইল এই সুযোগে নামিয়া গিয়া সিগারেটের কেস আর দেশলাইটা লইয়া আসি। একই গাড়ির মাঝখানে প্রথম শ্রেণী, দুইপাশে দুইটি দ্বিতীয় শ্রেণী। তাড়াতাড়ি নামিয়া পূর্বের কামরাটির কাছে গেলাম। অস্বীকার করিব না, একটু কুণ্ঠা জাগিয়াছিল মনে, দম্পতিকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়া এভাবে হঠাৎ আবির্ভাব হওয়াটা ঠিক হইতেছে না। পা-দানির কাছে গিয়া ক্ষণমাত্র দ্বিধাভাবে দাঁড়াইলাম, তাহার পর হাতের সময়টুকুর অনিশ্চয়তার জন্যই হোক বা যে জন্য হোক আর অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া পা-দানির উপর উঠিয়া পড়িলাম।

উঠিয়া হাতল ঘুরাইয়া প্রবেশ করিতে যাইব—দারুণ বিস্ময়ে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

সেই মৈথিলী দম্পতি কামরার মধ্যে নাই। তাহার চেয়ে আরও আশ্চর্যের বিষয় আমি

ওদিককার যে বেঞ্চটায় বসিয়াছিলাম একটি বাঙালী যুবা এবং একটি যুবতী বসিয়া। যুবার গায়ে স্মার্টনেক কামিজের উপর একটি কৃষ্ণ-নীল সার্জের গলাখোলা কোট, আণ্ডারওয়্যারের উপর সূক্ষ্মভাবে কোঁচান ফিনফিনে ধুতি, বাঁ-হাতে একটি ধূমায়মান সিগারেট। মেয়েটির একেবারে হালফ্যাশান একটি শাড়ির উপর একটি ফার-বসানো লেডিজ্ ওভারকোট, পায়ে হীলতোলা স্ট্র্যাপ-সু। গাড়িটা হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়ার কারণ বুঝিবার জন্য দু'জনেই ওদের শরীরের বেশ খানিকটা করিয়া জানালা হইতে বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু গাড়ির 'আলো' নেভানো, সেটাও খুব অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল না, তবে যখন দেখিলাম গাড়িরা জিনিসপত্র সব যথাস্থানে রহিয়াছে, মায় বেঞ্চের ওপর আমার বিছানা আর টাঙ্ক পর্যন্ত, তখন আমায় বেশ একটু ধাঁধায় পড়িতে হইল।



একটা কথা বলিয়া দেওয়া দরকার—আমি যে বেশ খানিকক্ষণ ধরিয়া এই সব পর্যবেক্ষণ করিতেছিলাম এমন নয়। বোধ হয় আধ মিনিটেরও কমে তীব্র বিস্ময়ে সমস্তটার উপর চোখ বুলাইয়া আমি নামিয়া পড়িলাম। নামিয়া পড়া বোধ হয় উচিত ছিল না, কিন্তু সে আলোচনা এখানে হইতেছে না, যাহা করিয়াছিলাম তাহাই বলিতেছি। বিগত রাজনৈতিক আন্দোলনের জের টানিয়া ট্রেনে অনেক কিছুই ঘটিতেছে, আরও কত কি যে ঘটা সম্ভব আন্দাজই করা যায় না। খবরের কাগজে প্রায় প্রতিদিনই লাইন কাটা থেকে আরম্ভ করিয়া চলন্ত গাড়িতে অদ্ভুত অদ্ভুত চুরি-ডাকাতির খবর পাওয়া যাইতেছে, এ যেন আরও একটু নতুন ধরনের। আমি নামিয়া পড়িয়াই ক্ষণমাত্র চিন্তা করিলাম, একবার ভাবিলাম চেঁচাইয়া লোক জড় করি, তাহার পর মনস্থির করিয়া পা বাড়াইলাম—গার্ডকে গিয়া আগে সব কথা বলা যাক্। নিজের কামরার কাছে পৌঁছিয়াছি গাড়িটা হঠাৎ ছাড়িয়া দিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। উঠিতেই এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন—"কি করলে লোক দুটোকে মশাই!"

একটু বিস্মিতভাবে চাহিয়া একটু এলোমেলো উত্তর দিয়া ফেলিলাম—"জানি না তো. তারা তো বসেই আছে।"

"বসেই আছে!"—বলিয়া ভদ্রলোক একটু বিমূঢ়ভাবে আমার পানে চাহিলেন। একটুর মধ্যেই গাড়ির সবার আলোচনায় তাঁহার প্রশ্নের তাৎপর্যটা বুঝিতে পারিলাম,—গাড়ি থামার কারণ হইতেছে দুইটি লোক মুসলমানী বোরখা ঢাকা দিয়া স্ত্রীলোকদের

গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ কি করিয়া টের পাইয়া মেয়েরা শিকল টানিয়া দেয়। গার্ড তাহাদের ধরিয়া, সাহায্যের জন্য আরও জন তিনেক যাত্রীসহ নিজের গাড়িতে লইয়া গিয়াছে। ভদ্রলোকের প্রশ্নটা তাদের সম্বন্ধেই।

দুর্ঘটনাটিতে সেকেণ্ড ক্লাসের ব্যাপারটিতে যেন একটু আলোকসম্পাত করিল।

একবার মনে হইল ও-ব্যাপারটাও সকলকে শুনাইয়া একটা যথাকর্তব্য স্থির করিয়া ফেলি—সেখানে তো আবার দুইটা জলজ্যান্ত মানুষই লোপাট হইয়া গিয়াছে। তাহার পরে মনে হইল আগে নিজেই একটা আন্দাজে ঠিক করিয়া লই, হঠাৎ ভয়ে সংবাদটা বিকৃত করিয়া দেওয়ার চেয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া ভদ্রলোকের বুদ্ধি এবং বিশ্বাসের যোগ্য করিয়াই দেওয়া ভাল। বাঙালী দম্পতিই হোক বা ছদ্মবেশী অন্য কেহই হোক, মাঝপথে চেন টানিয়া যে পালাইবার অভিসন্ধি আছে এরূপ মনে হইল না, সেটা নিশ্চয় সুবিধাজনকও নয় ওদের পক্ষে। নিশ্চয় চুপিসাড়ে পরের স্টেশনে নামিয়া ভিড়ের মধ্যে মিশাইয়া যাইবে, তাহার পর হয়তো বেশ পরিবর্তন করিয়া লইবে; হইতে পারে, নামিবেই একেবারে বেশ পরিবর্তন করিয়া, একটু লক্ষ্য রাখিলে বিনা গোলমালেই ধরা যাইতে পারে। আমায় যে দেখিতে পায় নাই সেজন্য নিশ্চয় নিশ্চিন্তই আছি।

তাহা যেন হইল, কিন্তু মৈথিল দম্পতিটি গেল কোথায়? খুন?—চিন্তাতেই সমস্ত শরীরটা কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু যে কারণেই হোক এতবড় উগ্র একটা কিছুতে মনটা যেন সায় দিতে চাহিল না। তবে?—হাত পা মুখ বাঁধিয়া বাথরুমে ফেলিয়া রাখিয়াছে?—সেইটেই যেন বেশি সম্ভব বলিয়া মনে হইল। কিন্তু আসিল কখন এরা; আর কোথা হইতে? শিবাজীর মতো মেঠাইয়ের চ্যাঙারির মধ্যে আসার কথাই উঠে না। বাথরুমে লুকাইয়া ছিল?—অসম্ভব নয়, তবে খুবই কি সম্ভব?—তবু বাথরুমে যাইবার আমার প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া সন্দেহটা লাগিয়াই রহিল।···

তাহার পর হঠাৎ একটা কথা মনে হইল, অন্ধকারে যেন একটা আলোকরশ্মি পাইলাম, —পূর্বেই বলিয়াছি আমি খানিকক্ষণ বেশ তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহার মধ্যেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ি নাই তো? গাড়িটা আর একবার আমার অজ্ঞাতসারেই মাঝে থামে নাই তো? এদেরই কোনরূপ চক্রান্তে? হয়তো সেই সুযোগেই উঠিয়া ক্ষিপ্রহস্তে মৈথিল দম্পতিকে অভিভূত করিয়া গয়না, ঘড়ি, চেন, আংটি প্রভৃতি হস্তগত করিয়াছে। মেয়েদের গাড়িতে দুইটা লোক ধরা পড়িয়াছে স্ত্রীবেশে—বাঙালী স্ত্রীপুরুষ বেশধারী এরাও যে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয় কে বলিবে?—যেমন উদ্বিগ্নভাবে গলা বাড়াইয়া লক্ষ্য করিতেছিল।

সামান্য একটা ভাবাবেশে গাড়িটা ছাড়িয়া আসিবার জন্য মনটা আবার ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিল—এবার সিগারেট কেসের জন্য নয়—কে জানে, দুইটি জীবনই বোধ হয় অকালে বিনষ্ট হইল।

পাশের ভদ্রলোকটিকে প্রশ্ন করিলাম—"গাড়িটা মাঝপথে কি আরও একবার থেমেছিল ?"

গাড়িটাতে একবার একটা কাণ্ড হইয়া যাওয়ার ঔৎসুক্যের হাওয়া বহিয়াছে, তাহার পাশেই দুইটি ভদ্রলোক পর্যন্ত আমার পানে মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলছেন ?"

প্রশ্নটার পুনরুক্তি করিলাম ! শুনিয়া তিনজনেই আমার পানে এমনভাবে চাহিলেন, বুঝিলাম আমার মাথা ঠিক আছে কি না সে বিষয়ে তাঁহাদের যথেষ্ট সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। "না আর থামে নি তো" বলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। পরে লক্ষ্য করিলাম আড়চোখে এক একবার আমার দিকে ফিরিয়া চাহিতেছেন,—ভাবটা গাড়িতে থাকিয়াও গাড়ি থামিয়াছিল কিনা প্রশ্ন করে, এ আবার কোন্ দেশের মানুষ !

ফল এই হইল যে ভাবিয়া চিন্তিয়া সমস্ত ব্যাপারটা যে সকলের গোচরে আনিব সে উপায় আর রহিল না। আমি যে একটা খুব অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়াছি যে কথাটা দেখিলাম ধীরে ধীরে সমস্ত গাড়িটাতে বেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং কানাঘুষার সঙ্গে আমার পানে কৌতুকপূর্ণ কটাক্ষের ধূমটা পড়িয়া গেছে। বড় অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। এদিকে এইমাত্র একবার চেন টানার হাঙ্গামাটা হইয়া যাওয়ার সেদিকেও কিছু করিবার সাহস হইল না, যদি টানিতে যাই তো ইহারা যে আমায় ধরিয়া ফেলিবে সেটাও বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।…মনের শঙ্কা-সন্দেহ মনে চাপিয়া ব্যাপারটা লইয়া তোলাপাড়া করিতে লাগিলাম। স্থির করিলাম আগে দস্যুদ্বয়কে হাতে নাতে ধরি, তাহার পর অমন অদ্ভুত প্রশ্ন যে কেন করিয়াছিলান সেটা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া যাইবে, ততক্ষণ নীরব থাকাই শ্রেয়।

নীরব থাকিয়া ভালই করিয়াছিলাম।

তর্কে তর্কে ছিলাম, স্টেশনে গাড়ি থামিতেই নামিয়া গিয়া পূর্বের কামরার দরজার কাছটিতে দাঁড়াইলাম। তীব্র উত্তেজনায় বুকটা ধড়ফড় করিতেছে।

বাঙালী দম্পতিটি নাই ! বরকর্তা প্রভৃতি সকলে তাড়াহুড়া করিয়া আসিয়া যাহাদের নামাইল তাহারা সেই মৈথিল বর এবং মৈথিল বধূই,—বরের কানে কুণ্ডল, রাঙা মোজা, রাঙা ধুতি, এদিকে আগাগোড়া সোনারূপার নিরেট-গয়না, সুপ্রচুর বস্ত্ররাশি। আবক্ষ ঘোমটা !…খুব সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া বোধ হয় কোন পূর্ব-যুগের নবপরিণীত রামচন্দ্র আর সীতার আদর্শ-মতোই রথ হইতে অবতরণ করিল,—নিরীহ, শান্ত, অতিশয় সুশীল বর একেবারেই জ্ঞানহীনা নববধূ।

মুহূর্তমাত্র ধাঁধা লাগিয়াছিল, তাহার পরই ব্যাপারটা বুঝিলাম। হালফ্যাশানে সজ্জিত বাঙালী দম্পতি বাহিরের কেহ ছিল না। নিষ্ঠুর অবরোধ এবং পৌরাণিক শাসন থেকে, আধুনিকতার মধ্যে ক্ষণিক মুক্তি পাইবার জন্য এই মৈথিল দম্পতিই

নিজেদের বাঙালী বরবধূতে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছিল--কাজেই তাহার সরঞ্জাম পূর্বে হইতেই যোগাড় করা ছিল, পাটনা কলেজের ফিফ্‌থ ইয়ারের নবালোকপ্রাপ্ত যুবক কোন খুঁটিনাটিই বাদ দেয় নাই। হয়তো নিজেই কিনিয়া পুরাতন সুটকেসটিতে সঙ্গোপনে রাখিয়া দিয়াছিল, কিংবা এও হইতে পারে পাটনা কলেজের কোন বাঙালী সহপাঠীর—নববিবাহিত বাঙালী সহপাঠীর নিকট সংগ্রহ করা। এই সরস কূটবুদ্ধিটুকুও বোধ হয় বাঙালীরই উর্বর-মস্তিষ্ক-প্রসূত—স্বাতটার মাথা তো চারিদিকেই খেলে !

রক্তের কথা ?—বুঝিলাম ওটা ছিল আমার ভীতিবিহ্বল মনের বিকৃত কল্পনা। পরে টের পাইলাম প্রচুর মুক্তির মধ্যে প্রচুর তাম্বূল চর্বণ করিয়া শ্রীমতী সমস্ত কামরাটিকে রসরঞ্জিত করিয়া গেছেন।

ভয় হইয়াছিল, নিষিদ্ধ পোশাকগুলির সঙ্গে, দিয়াশালাই সহ আমার রূপার সিগারেট কেসটিও পুরাতন সুটকেসটির মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে।

গাড়িতে উঠিয়া দেখিলাম,—না, যথাস্থানেই আছে। অবশ্য একটি সিগারেট যে কম সে কথা বলাই বাহুল্য।



মুনাফা

রাত প্রায় একটায় মোকামাঘাটে আসিয়া নামিলাম।

স্টেশনটা গঙ্গার ধারেই ; টানা একটা বারান্দা, তাহার পরেই তীরভূমি ঢালু হইয়া নামিয়া গেছে। নূতন বর্ষার গঙ্গা অনেকখানি উঠিয়া আসিয়াছে, ওয়েটিংরুম হইতে কাকজ্যোৎস্নায় গৈরিকধারার বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়।

ছোট ঘরটি একটি বরযাত্রী দলে একরকম ঠাসা, কি উপায় করিব ভাবিতেছি এমন সময় আপ্ ট্রেনের ঘণ্টা পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই বরযাত্রীদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল এবং গাড়ি আসিয়া পৌঁছিবার আগেই ঘরটি একেবারে খালি হইয়া গেল। রহিল মাত্র এক মাড়োয়ারী শেঠজি। খুব চাপাচাপির মধ্যে ছিল, ভিড় হালকা হওয়ায় মনের স্ফূর্তিতে একটু অভ্যর্থনাই করিয়া লইল আমায়—"আসেন বাঙ্গালীবাবু, ই জগহ্‌টা বেশ হাওয়াদার আছে।...উ সবই বক্তিয়ারপুরের বোরযাত্রী ছিল, সব গঙ্গামাইকি কৃপা।"

দরজাটির মুখে বিছানা করিয়া শুইয়াছিল আমিও পাশটিতে গিয়া আমার হোল্ড-অল খুলিয়া বিছানাটা পাতিয়া লইলাম। ভদ্রলোক একটু আলাপপ্রবণ বিছানাটা আর একটু সরাইয়া আনিয়া কথাবার্তা জমাইয়া আনিয়াছে, এমন সময় আপ্ ট্রেনের একজন যাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেশ অবস্থাপন্ন লোক বলিয়া মনে হইল ঃ আয়েসপুষ্ট বিরাট বপু গলার পাশে ঘুণ্টি-দেওয়া ফিনফিনে একটি পাঞ্জাবী, তাহার ভিতরে একছড়া সরু সোনার চেন চিক চিক করিতেছে, হাতে রিস্ট-ব্যাণ্ড দেওয়া শৌখিন ঘড়ি, রুপার বাঁধানো একটি শৌখিন ছড়ি ; এদিকে হোল্ড-অল ট্রাঙ্ক, সুটকেশ, জলপানের জন্য একটি রুপার ঝারি, শরীরের

অনুপাতে একটি মোরাদাবাদী ধাতুর টিফিন কেরিয়ার,—মোট কথা চমৎকার একটি স্বচ্ছলতার আবহাওয়া লইয়া প্রবেশ করিলেন ভদ্রলোক। নিশ্চয় রিজার্ভ করা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্থে আরামে ঘুমাইতেছিলেন, চোখে ঘুমের জড়িমা লাগিয়া আছে।

সঙ্গে একটি চাকর। বেশ তৎপর। প্রথমেই আসিয়া ওয়েটিংরুমের আরাম কেদারাটা গঙ্গার দিকের বারান্দায় বাহির করিয়া দিল। ভদ্রলোক গিয়া তাহাতে গা এলাইয়া দিলেন, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাসিকাগর্জন আরম্ভ হইয়া গেল। চাকরটা আসিয়া মোটঘাটগুলো অল্পসময়ের মধ্যেই গুছাইয়া হোল্ড-অল খুলিয়া বিছানাটা পাতিয়া ফেলিল, দোরের আংটায়, জানালার গরাদে, দেয়ালে-গাঁথা আলনায় দড়ি বাঁধিয়া একটি পরিষ্কার নেটের মশারি খাটাইয়া দিল, তাহার পর বাহিরে গিয়া দুই-তিন গলাখাঁকারি দিয়া খবর দিল—"তৈয়ার বা।"

ভদ্রলোক উঠিয়া আসিয়া শয্যার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, চাকরটা বেশ ভালো করিয়া মশারিটা চারিদিকে গুঁজিয়া দিল; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হইয়া গেল।

সব লইয়া মিনিট পাঁচেকও লাগিল না; যেন আলাদিনের প্রদীপের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ হইয়া গেল।

এদিকে শেষ হইলে চাকরটা জিনিসপত্রগুলোর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া লইয়া আমাদের দুইজনের দিকে মিনতির দৃষ্টিতে চাহিয়া সেগুলোর উপর একটু নজর রাখিতে অনুরোধ করিল।

শেঠজি উৎসাহের সঙ্গে বলিল—"যাও, তুম বেফিকির শো রহো। কোই ডর্ নেহি।"

আমি একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলাম—"কেন, সে তো নিজেও শুইয়া থাকিতে পারে—এত দামী জিনিসপত্র রহিয়াছে ঘরের মধ্যে।" উত্তরটা শেঠজিই দিল, আমার অজ্ঞতায় জিভটা কাটিয়া চোখ দুইটা একটু বড় বড় করিয়া বলিল—"আরে রাম কহিয়ে বাবুজী, চাকর আর মনিব এক্‌হি ঘরে শোবে!—হাজার কল্ যুগ হোক!"

চাকরটাকে বলিলেন—"যাও তুম, কোই ডর নেহি।"

সে চলিয়া গেলে শেঠজী নিদ্রিতের পানে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—"আরাম বোলবেন তো একেই বলুন বাঙ্গালী-বাবু, জিন্দগিকে কেমোন ভোগ করছে। ট্রেনে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে যত্তো আরামের ব্যাবোস্থা। আর আমাদের কাঁহা দু' পয়সা মুনাফা, ছোট্ লোটা কম্বল নিয়ে—না খাবার ঠিকানা, না শোবার ঠিকানা।"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—"মুনাফার পেছনে ছোটাটাই তো আদৎ জিন্দগী শেঠজি, ঘুমিয়ে কাটানো সে তো তার উল্টো বরং।"

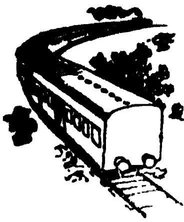
কথাটা মনের মতন হওয়ায় শেঠজির মুখে হাসি ফুটিল, মনটা দ্রব হইল, এবং সেই

তরলতার জন্যই বোধহয় হঠাৎ ধর্মভাব আসিয়া পড়িল, একটু করুণ সুরে বলিল—"লেকিন, কী হোবে বাবু মুনাফা হাঁসিল করে?—সঙ্গে লিয়ে যেতে পারব ওখানে?" —আকাশের পানে হাত বাড়াইয়া দেখাইল।

বলিলাম—"কি জানেন শেঠজি, এইটে হচ্ছে শুরু, এই মুনাফার হিসাব করতে করতেই ওখানে নিয়ে যাবার যুগ্যি মুনাফার হিসেব আসে, ঠিক নয় কি?"

শেঠজি একেবারে বিগলিত হইয়া গেল, বলিল—"যা বলেছেন বাঙ্গালীবাবু তাতে কোন ভুল না আছে, লেকিন ঐখানের কথা আমাদের সব সময় অস্মরণ থাকে না, দুনিয়ার মুনাফা নিয়ে মশগুল হয়ে থাকি আমরা। তুলসীদাস কি বলেছেন?"

তুলসীদাসের পরে আসিলেন কবীর, কবীরের পর সুরদাস, শেঠজির দোহাচৌপাইয়ের অনর্গল স্রোত বহাইয়া চলিল।



এদিকে অসম্ভব রকম মশা, অতগুলো মানুষের জায়গায় কুল্যে দুইজন, হন্যে হইয়া আক্রমণ লাগাইয়াছে। শেঠজির দিকে কান রাখিয়া তাহাদের তাড়া দিতে দিতে কখন ক্লান্তিবশেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, একটা শাণ্টিং ইঞ্জিনের হুইশিলে হঠাৎ ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। রাত্রি খুবই গভীর, গাড়ি স্টিমার কিছু নাই, স্টেশনের এদিকটা একেবারে নিস্তব্ধ, শুধু সেই ভদ্রলোকের তৃপ্ত নাসিকাগর্জন; বাহিরের বারান্দা থেকে আর একটি ক্ষীণতর গর্জন দরজার পথে ভাসিয়া আসিতেছে, বোধ হয় তাঁহার চাকরের।

হওয়াটা নরম হইয়া গিয়া মশার উপদ্রব আরও বাড়িয়াছে, আত্মরক্ষার জন্য একটা পাতলা ওড়ানি ঢাকা দিয়া শুইয়াছিলাম, আরও একটু যুৎ করিয়া টানিয়া লইব, এমন সময় হঠাৎ পাশের দিকে দৃষ্টি পড়ায় একেবারে স্থাণুবৎ নিশ্চল হইয়া গেলাম।

আগেই বলিয়াছি আমার পাশেই শেঠজির বিছানা, দরজা-পথে হাওয়াটুকুর জন্য চাকরটা তাহার মণিবের বিছানাটি শেঠজির পাশেই করিয়া দিয়াছে, অপেক্ষাকৃত একটু বেশি ব্যবধান ছাড়িয়া।···শেঠজি কনুইয়ে ভর দিয়া আধ-শোওয়া হইয়া ওদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে, এবং সবচেয়ে যা বড় আশ্চর্য, ভদ্রলোকের মশারির খানিকটা তুলিয়া ধরিয়া গভীর অভিনিবেশের সহিত ভিতরে কি নিরীক্ষণ করিতেছে।···ঘুমের ঘোরে এমন অদ্ভুত দৃশ্যে আমার তো মাথা গুলাইয়া গেল, ব্যাপারখানা কি?—ছিঁচকে চোর নাকি? সন্দেহ যখন মনে প্রবেশ করিল, ওর কথাবার্তা চালচলন সব

কিছুই সেটাকে পুষ্ট করিয়া তুলিল—আমার কাছে বিছানাটা টানিয়া আনা, চাকরটাকে অত ভরসা দিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া, তারপর এই ধর্ম লইয়া বিট্‌লেমি।—প্রথমটা মনে হইল হাতটা চাপিয়া ভদ্রলোককে ডাকিয়া তুলি। তাহার পর ঠিক করিলাম, না, আর একটু দেখাই যাক, যদি যাহা ভাবিয়াছি তাহাই হয় তো একেবারে বামাল-সুদ্ধ ধরা যাইবে। চাদরটা আস্তে আস্তে মাথা পর্যন্ত টানিয়া নিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। অদ্ভুত কাণ্ড। শেঠজি মশারিটা নামাইয়া দিয়া খুব সন্তর্পণে উঠিয়া এদিকে প্ল্যাটফর্ম আর ওদিকে গঙ্গার ধারের বারান্দাটা একবার দেখিয়া আসিল, তাহাও কেমন যেন সন্দেহজনক ভাবে, ঘরের মধ্যে থেকেই গলা বাড়াইয়া। আমার আগাগোড়া ঢাকা, তাহারই উপর হইতে বেশ ভালো করিয়া আমায় দেখিয়া তাহার পর আবার মশারিটা তুলিয়া ধরিল, এবার একটু বেশি উঁচু করিয়া। অনেকক্ষণ রহিলও একভাবে এবার, ঘুমন্ত লোকটির দিকে এমন ভাবে মাথা ঝুঁকাইয়া আছে, বেশ বোঝা যায় তীব্র উৎসুক দৃষ্টির একটুও নড়চড় নাই। আমার মাথা গুলাইয়া যাইতেছে; এদিকটা এমন নিস্তব্ধ, মনে একটা ভয়ও ঠেলিয়া উঠিতেছে—খুনটুন করিবে না তো—নাকে ক্লোরোফর্ম চাপিয়া ধরিতেও পারে—দলবদ্ধ নয় তো? —হয়তো সঙ্গীরা বাহিরে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে অপেক্ষা করিতেছে···

আর একবার ঐভাবে উঠিয়া, দেখিয়া শুনিয়া, আমার সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হইয়া মশারিটা তুলিয়া ধরিতেই, আমি আর এদিক-ওদিক না ভাবিয়া পিছন হইতে দুইটা হাত চাপিয়া ধরিলাম, মুখটা ফিরাইতেই প্রশ্ন করিলাম—"ব্যাপারখানা কি! তুমি তখন থেকে ভদ্রলোকের মশারি তুলে কি মতলব হাঁসিল করবার···"

শেঠজি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল, আমি যে ঘাপ্‌টি মারিয়া পড়িয়া সব লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিলাম যেন বিশ্বাসই করিতে পারিতেছে না, তাহার পর জিভ কাটিয়া, চাপা গলায় বলিল—"আরে ছিঃ, বাঙ্গালীবাবু, রাম বলো, কি বোলছেন আপনি। আমার মতিহারীতে তিনটে গোলা, কোলকাত্তায়, কানপুরে মস্তো কারবার—আরে ছিঃ—হাত ছাড়িয়ে দিন বাবুজি···"

হাত ছাড়িলাম না, বলিলাম—"কলকাতা-কানপুর-মোতিহারীর খবর জানবার উপায় নেই—কিন্তু চোখের সামনে তখন থেকে যা দেখছি—চাকরকে সরিয়ে দিতে—তারপর ভদ্রলোকের সোনার চেনের দিকে···"

শেঠজি ঘুরিয়া মুষ্টিবদ্ধ অবস্থাতেই ডান হাতটা আমার মুখের ওপর চাপিয়া ধরিল; মুখে নিতান্তই একটা ব্যাকুলতার ভাব, বলিল—"আরে ছিঃ বাবুজি, অমন কোথাটি বোলবেন না, গঙ্গাজীর কিনারা আছে। সরিয়ে আসেন, শুনেন, ভোদ্দোরলোক এখুনি জেগে পড়বে, প্রেমসে ঘুমোচ্ছে।"

অস্বীকার করিব না, বলিবার ভাবে আমি আবার একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেছি।

হাত দুইটি ছাড়িয়া দিলাম, দুইজনে আসিয়া আমার বিছানায় বসিলাম।

শেঠজি অসীম করুণার দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"গঙ্গামাইয়ের কিনারা আছে, একবারটি বাহিরের দিকে নজর দিয়া দেখেন আপনি…"

বলিলাম—"তাই যা কিছুই করুন না এখানে, কোন দোষ লাগবে না?"

"আরে ছি ছি বাবুজি, ওমোন কথা বলবেন না, গঙ্গাজির কিনারা আছে, পুণ্যকা অস্থান, তাই কুছু পরলোকের জন্য হাঁসিল করে নিচ্ছিলো।"

এত বিমূঢ় হইয়া গেছি যে মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

শেঠজি বলিয়া চলিল, চোখে-মুখে সেইরূপ অপরিসীম কারুণ্য—"দেখুন বাবুজি মচ্ছরদের ওবোস্থা! —আপনারা বাঙ্গালীরা মোশা বোলেন—একঘর মানুষের লোহু খাচ্ছিল গঙ্গামাইকে কৃপাসে—বড়কা ভোজ—তারপর হুম্ দুজোনটি রয়ে গেল—আহা-হা-হা! জরাসা ভাবুন! —তারপর আপনি ভি চদ্দর ঢাকা দিয়ে দিলেন—একলা আমি রোগা হাড্ডিসার মানুষ—ভাবুন বাবুজি বেচারীদের ওবোস্থাটা! রাজার হাল থেকে কাঙালী বোনে গেল। গঙ্গাজির কিনারা, পুণ্যকা অস্থান একটু পুণ্য হাঁসিল করে নিচ্ছিলো মশারিটি তুলে ধরে—উ জমিদারবাবুর ওতো বোড়ো লাস, দুছটাক লোহু এলেই বা কি গেলেই বা কি—থোরা ঠিক হিসাবসে ভাবিয়ে দেখেন বাবুজি; আমি মশারিটি তুলে একটু পরলোকের মুনাফা হাঁসিল কোরে নিচ্ছিলো, ব্যস্।"



কুইট্ ইণ্ডিয়া

'ও. টি. আর' এর একখানি প্যাসেঞ্জার গাড়ি আসিতেছে গোরক্ষপুরের দিক থেকে। ভিড় যথেষ্ট আছে, তবে প্রথম শ্রেণীর কামরাটা একেবারে খালি, মাত্র আমি আছি আর একটি ইংরাজ যুবতী; ইংরাজ বলিয়াই যুবতী বলিলাম, বয়স প্রায় সাতাশ-আটাশ হইবে। গোটা-দুই স্টেশন একত্রে আসার পর তিনি একটু গল্প-প্রবণ হইয়া উঠিলেন।

অনেকগুলি কারণ ছিল, প্রথমত অন্য সঙ্গীর অভাব, দ্বিতীয়ত আমি সামরিক পোশাক পরিহিত, সুতরাং অতটা অপাঙ্‌ক্তেয় নই। তৃতীয়ত, যাহা কথাবার্তায় টের পাইলাম, তিনি সদ্য বিলাত হইতে আসিয়াছেন, এদেশটা সম্বন্ধে কৌতুহলও টাটকা আর এখনও কৃষ্ণবিদ্বেষটা উগ্র হইতে পায় নাই। নাম বলিলেন মিস্ ফ্লোরা গ্রেস্। ছাপার কাছাকাছি একটা জায়গায় কে একজন মিস্টার ট্রেভার কিছু জমিদারি এবং কৃষিসম্পত্তি লইয়া আছেন, তাঁহারই সাক্ষাৎকারে যাইতেছেন। মিস্ গ্রেস্ নিজে মাস কয়েক হইল দেরাদুনের নিকটবর্তী কোন একটি জায়গায় একটি ইংরাজ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা লইয়া আসিয়াছেন। মিস্টার ট্রেভার সম্প্রতি সেখানে শৈলবিহারে গিয়াছিলেন, আলাপ হয়, নিমন্ত্রণ রাখিয়া আসিয়াছিলেন।

অর্থাৎ কোর্টশিপ চলিতেছে। আন্দাজের কথাটা আমিই বলিলাম, তবে অত স্পষ্ট করিয়া নয়। একটু হাসিয়া বলিলাম—"মিস্টার ট্রেভারের সৌভাগ্যে তাঁকে অভিনন্দিত করছি যে, এক নিদারুণ গ্রীষ্ম অগ্রাহ্য করে আপনি তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন।"

মিস্ গ্রেসের হাসিতে একটু লজ্জা জড়াইয়া পড়িল, বলিলেন—"কিন্তু আমি তাঁর সৌভাগ্যকে প্রীতির চক্ষে দেখতে পাচ্ছি না মিস্টার মুখার্জি—যদি সৌভাগ্যই হয় সেটা, —উঃ, কী অসহ্য গরম—নরক একেবারে!"

সত্যই অসহ্য গরম। জুন মাস, তায় সময়টাও দুপুরের কাছাকাছি, পাখা চলিতেছে—কে যেন অদৃশ্য আগুন লইয়া দেয়ালীর আঁজি-বাঁজি খেলিতেছে। বলিলাম—"কিন্তু মিস্টার ট্রেভারেরই তো এই সময় শৈলনিবাসে থাকা উচিত ছিল, তা না করে আপনাকে সুদ্ধ এই অগ্নিপরীক্ষায় টানলেন যে?"

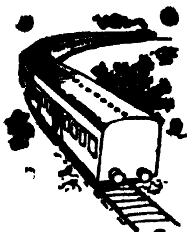
মিস্‌ গ্রেসের মুখটা গম্ভীর হইয়া গেল, জানালার দিকে ফিরাইয়া লইয়া নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন। একটু বেশ অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম, কিছু বেফাঁস হইয়া গেছে নাকি? অথচ আসল যেখানে ঠাট্টা করিলাম সেখানে তো বিরক্তির কোন লক্ষণই দেখা গেল না, বরং ইঁহারা বেশ সময়মতো ঠাট্টাগুলা যেমন প্রীতিভরেই গ্রহণ করেন, সেই ভাবেই গ্রহণ করিলেন। কিছু বলিয়া সামলাইতে যাওয়া ঠিক হইবে কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় মিস্‌ গ্রেস্‌ মুখটা আবার ফিরাইয়া আনিলেন। রাগ নয়—কপট রোষের অভিনয় করিয়া বলিলেন—"শুনুন মিস্টার মুখার্জি, সত্যি কথাটা যদি বলতেই হয়, এর জন্য দায়ী আপনারাই।"

একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম—"কি করে তা জানতে পারি কি?"

"সব দিক দিয়েই, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আমরা আপনাদের যা শান্তি আর স্বাচ্ছন্দ্যতা দিয়েছি, তার বদলে আপনারা আমাদের শান্তি হরণ করতে বসেছেন। বেশি দিনের কথা নয় যে আপনাদের স্মৃতিপথ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে,—এই কিঞ্চিদধিক শ' দেড়েক বৎসর—একবার ভেবে দেখুন কি অবস্থা ছিল এই দেশের—যুদ্ধবিগ্রহে দেশ ছিন্নভিন্ন, প্রতিটি রাজদরবার চক্রান্তের কেন্দ্র, রাস্তাঘাট নেই বললেই চলে, যা বা আছে দিনে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ নয়। যানবাহন সেই আদম-ঈভের সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—আপনারা যে জগতের সর্বপুরাতন জাতিদের অন্যতম একথা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু যে-অবস্থায় আপনারা ছিলেন তখন, তাতে আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার আদিম জাতিদের চেয়ে খুব বেশি প্রভেদ ছিল না। এর জায়গায় আমরা কি দিয়েছি একবার ভেবে দেখুন মিস্টার মুখার্জি—শক্তিমান কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করে প্রথমত দরবারে দরবারে চক্রান্ত আর পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের নিরসন করেছি। রাস্তাঘাট এমন সুগম এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ, যানবাহনে আপনারা বোধ হয় পৃথিবীর সভ্যতম জাতির সমকক্ষ। সভ্যতা আর কৃষ্টির দিক দিয়েও দেখুন—আমাদের প্রবর্তিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্ট আপনাদের কবি, বৈজ্ঞানিক জগতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নোবেল প্রাইজ পর্যন্ত অর্জন করে নিয়ে এসে আপনাদের দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন। অল্পাধিক দেড় শতাব্দীর ব্যবধানের ভারতবর্ষের এই দুটি রূপ, অথচ আজ আপনারা এই ভাবে তোয়ের হয়ে নিয়ে আমাদেরই উল্টে বলছেন—'কুইট ইণ্ডিয়া!' আমার রূঢ়তাটা মাপ করবেন মিস্টার মুখার্জি, কিন্তু আমি একটা কথা জিগ্যেস করি—অকৃতজ্ঞতা কি এর চেয়ে বেশি দূর যেতে পারে?"

দেখিলাম সংযমের জ্ঞান যথেষ্ট থাকিলেও মিস্ গ্রেস্ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন। বেশ একটু ফাঁপরে পড়িলাম—স্ত্রীলোক, তায় গাড়ির মধ্যে নিঃসঙ্গ, ও'র বাঁধা গতের মতো তর্কগুলোর উত্তর দিতে তো পারিলাম না, এমন কি নোবেল প্রাইজ পাওয়া লইয়া যে সাংঘাতিক ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে, সেটাও দূর করিতে কেমন যেন একটা দুরূহ সঙ্কোচ বোধ হইল। ঠাণ্ডা করিবার জন্যই বলিলাম—"একটা জাত স্বাধীনতার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে মিস্ গ্রেস্—তাদের দোষ-ত্রুটি বা আতিশয্যগুলো আপনাদের মতো স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের একটু ক্ষমার চক্ষেই দেখা উচিত নয় কি ?"
মনটা বোধ হয় একটু ভিজিয়া থাকিবে, কেননা মিস্ গ্রেস্ আরম্ভ করিলেন একটু নরম সুরেই, কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই রকম উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন—হয়তো একটু বেশিই বলিলেন—"তর্কের খাতিরে আপনার কথাটা মেনে নিলেও এটা আপনাকে খোলাখুলি জানিয়ে দেওয়াই ভাল মনে করি মিস্টার মুখার্জি যে, আপনারা একটা ধুয়ো তুলেছেন বলেই যে আমরা এ-দেশ ছেড়ে চলে যাব এটা আপনারা যেন স্বপ্নেও না ভাবেন। আপনাদের গলার জোর থাকতে পারে, কিন্তু তর্কের মধ্যে কোন জোরই নেই। আর আমাদের জাত যদি কোন জিনিসকে মর্যাদা দিতে অভ্যস্ত থাকে তো তা তর্কের সারবত্তা, কণ্ঠের শক্তি নয়। কণ্ঠশক্তি নিয়োগ করার মধ্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য থাকতে পারে মিস্টার মুখার্জি, ভয় দেখানো ; যে জাত নিজের শক্তি আর অধ্যবসায়ের গুণে অর্ধেক পৃথিবীতে তার উপনিবেশ স্থাপন করলে সে কি এতই ভয়প্রবণ যে আপনাদের গলাবাজিতেই তাদের অধিকার ছেড়ে পালিয়ে যাবে ?"
একটু না ঠুকিয়া পারিলাম না, তবে যতটা সম্ভব রমণীপ্রকৃতির উপযোগী করিয়াই বলিলাম—"মাপ করবেন মিস্ গ্রেস্—পৃথিবীতে আপনাদের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য। জাতি হিসাবে সবচেয়ে বড় বিধানদাতা (Lawgiver) বলে আপনাদের একটা খ্যাতিও আছে—তাই জিগ্যেস করছি অধিকার জিনিসটা এল আপনাদের কোথা থেকে ? আপনি বিদুষী,—অধিকারের মূলে যা যা থাকে তা তো নিশ্চয়ই আপনার অজ্ঞাত নয়..."
উল্টা ফল হইল, মিস্ গ্রেস্ এক একম অসংযত হইয়াই উঠিলেন, মুখ একেবারে সিঁদুরবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠাধরও মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, যে তর্কের সারবত্তার উপর এত শ্রদ্ধা তাহার ধার দিয়াও না গিয়া বলিলেন—"দেখুন মিস্টার মুখার্জি অধিকার সম্বন্ধে পাঠ আমাদের অন্যের কাছ থেকে নিতে হবে না, সে জ্ঞান আমাদের যথেষ্টই আছে এবং আমাদের অধিকার কি করে রক্ষা করতে হয় তা আমরা ভাল রকম জানি। তা হলে কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করেই বলি—মিস্টার গ্রেভার আর আমার মধ্যে বাগ্‌দান হয়ে গেছে। কংগ্রেস গবর্নমেন্ট ফিরে আসায় আবার 'কুইট ইণ্ডিয়া' রব ওঠায় এবং আপনি যে ঐ অধিকারের কথা বললেন, সে প্রশ্ন নিয়েও চারদিকে গুলতান ওঠায় তাঁকে তাড়াতাড়ি এই অগ্নিকুণ্ডে নিজের জমিদারিতে ফিরে আসতে হয়েছে। আশা ছিল যুক্তির জয় হবে, তা তাঁর যে ক'খানি চিঠি পেয়েছি

তার প্রত্যেকটিতেই এই খবর যে, অবস্থা দিন দিনই খারাপ হয়ে উঠছে। শেষে আমি পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে এই চলেছি। কেন তা আন্দাজ করতে পারেন?"
দীর্ঘ উচ্ছ্বাসে বেশ বিপর্যস্তই হইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিলাম—"আজ্ঞে না, কৈ আন্দাজ করতে পারছি না তো কিছু।"



অর্থাৎ এবার ভালমন্দ কিছুই বলিলাম না, যদি এভাবেই উত্তাপটা কমে। কিন্তু না। মিস্ গ্রেস্ এবার দৃষ্টিতে খানিকটা শাসনের ভাব মিশাইয়া বলিলেন—"ইংরাজ রমণী হিসাবে আমি তাঁর বিপদে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছি মিস্টার মুখার্জী, কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটা সংকল্প নিয়ে—যদি তিনি ভয়ে বা অন্য কোন কারণে এদের অন্যায় আবদারে নিজের অধিকার ছেড়ে সরে দাঁড়ান তো তাঁকে আরও একটি জিনিসের মায়া ছাড়তে হবে···"
মিস্ গ্রেস্ আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"অর্থাৎ আমায়; আমি যাচ্ছি, হয় আমাদের এনগেজমেণ্ট দৃঢ় করে আসব, নয় একেবারেই চিরতরে ভেঙে দিয়ে আসব। ভীরুতাকে প্রশ্রয় দেওয়ায় আমি অভ্যস্ত নই। আপনাদের অধিকার আমাদের চেয়ে যে বেশি, তা সাব্যস্ত করতে হলে আমরা খুব বিশ্বাসজনক প্রমাণ চাই মিস্টার মুখার্জী; যদি মনে করেন, মুখে 'কুইট ইণ্ডিয়া' বললেন, আর আমরা তল্পি-তল্পা বেঁধে···"
এমন সময় গাড়িটা একটা স্টেশনে আসিয়া পড়িল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কামরায় যেন একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। গাড়ির দুই পাশে দোর-জানালা দিয়া দুইটা যাত্রিদল পিল-পিল করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়া গাড়িটা একেবারে ভর্তি করিয়া ফেলিল—কেহ নিজের শক্তিতে উঠিল, কাহাকেও ভিতর থেকে টানিয়া তুলিল, কাহাকেও বাহির হইতে ঠেলিয়া তুলিল; নানা রকমের ছোটবড় জিনিসপত্র আসিয়া যেখানে সেখানে পড়িতে লাগিল এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যে অমন যে খালি কামরাটা তাহাতে তিল ফেলিবার ঠাঁই অবশিষ্ট রহিল না। ছোট স্টেশন, ইতিমধ্যে ট্রেনটা হুইসিল দিয়া ছাড়িয়া দিল এবং গোলমাল যে হইতেছিল, সেটাকে ছাপাইয়া ভিতর এবং বাহির থেকে একটি চিৎকার উঠিল—"বর ওঠেনি—বর ওঠেনি!—বর ছেড়ে গেছে!—"
কয়েকজন দুইধার থেকে এলার্ম চেন টানিয়া ধরিল এবং গাড়িটা ভাল করিয়া থামিবার

পূর্বে দুই দিকের জানালা গলিয়া দুইটি বর দুই দিক হইতে হাতে-হাতে পাঁজায়-পাঁজায় গাড়ির মাঝখানে আসিয়া পড়িল। গাড়ি আবার ছাড়িতে যেটুকু বিলম্ব হইল তাহাতে সবাই আরও কতকগুলো লোককে গাদিয়া দুই দিক হইতে চালান করিয়া দিল।

মিস্ গ্রেস্ একেবারে হতভম্ব হইয়া গেছেন; খানিকটা যে ভীতও, সেটা বেশ বোঝা যায়। অত যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, মুখে একেবারে রা নাই। শুধু বিস্ফারিত নেত্রে সব দেখিয়া যাইতেছেন। ভিড় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁহাকে কোণের জায়গাটিতে বসাইয়া নিজে পাশে বসিয়াছি এবং মাঝখানে আমাদের দুই-জনের সুটকেস রাখিয়া একটা অন্তরালের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি। এতক্ষণ ভিতরের ব্যাপারই লক্ষ্য করিতেছিলেন, গাড়িটা একটু অগ্রসর হইলে একবার বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইয়া ত্রস্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"মিষ্টার মুখার্জি, একবার বাইরে চেয়ে দেখুন। এ কি! এমন দৃশ্য তো জীবনে দেখিনি!"

গলা বাড়াইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা অভিনব বটেই। গাড়ির পা-দানে আগে থাকিতেই বেশ কিছুটা লোক ছিলই—আগাগোড়া—এখন সেখানেও রীতিমতো ভিড়, তাহার উপর যা সমস্ত দৃশ্যটাকে আরও দর্শনীয় করিয়া তুলিয়াছে, তাহা ভিড়ের গায়ে বিলম্বমান নানা রকম বাজনা—ঢাক, জয়ঢাক, বড় বড় করতাল, ক্ল্যারিয়নেট, কর্নেট, আরও সব জটিল বিলাতি বাজনা; ব্যাগপাইপ, দেশী ঢোল, ঢাক, সানাই, রামশিঙা—রকমারি ব্যাপার একেবারে!—আমাদের গাড়ির দুই দিকে একেবারে দুই-তিনখানা গাড়ি পর্যন্ত। ওদিকেও নিশ্চয় এই অবস্থা। আর এই সমস্তের উপর ছাপরা জেলার জুন মাসের ভর দুপুরের রোদ যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। ভিতরের হাওয়াই আগুনেই হল্কা।

মিস্ গ্রেস্ সেই রকম বিমূঢ় দৃষ্টিতেই চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কিছু ঠাহর করতে পারছেন?—যেন মিলিটারী ব্যাণ্ডের মতো দেখাচ্ছে, মতলবখানা কি ওদের?"

বেশ বোঝা যায়, আগষ্ট বিদ্রোহের আতঙ্কের সুর রহিয়াছে কণ্ঠে। বলিলাম—"না অন্য ব্যাপার কিছু নয় মিস্ গ্রেস্, এ আমাদের দেশের একটা সাধারণ ব্যাপার—বিবাহ হতে চলেছে। এর সঙ্গে বাজনা-বাদ্য থাকাটা আমাদের একটা রেওয়াজ। আপনি সবে এদেশে এসেছেন, তাই আপনার নতুন ঠেকছে। দেখবেন মিস্টার ট্রেভার এতে বেশ অভ্যস্ত।"

মিস্ গ্রেস্ স্থিরদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন, কি বলিবেন, যেন, কথা জোগাইতেছে না, শেষে ধীরে ধীরে টানিয়া টানিয়া বলিলেন—"এমন অসাধারণ একটা ব্যাপার এখানকার সাধারণ রেওয়াজের মধ্যে মিস্টার মুখার্জি? বলেন কি আপনি? এদের প্রাণশক্তি দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি!"

আশ্চর্য হইবার তখনও অনেক কিছুই বাকি ছিল এবং এর পর যাহা দেখিলেন, তাহাতে

মিস্‌ গ্রেস্‌ একরকম বাক্‌শক্তি-রহিত হইয়া বসিয়া রহিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মিস্‌ গ্রেসের প্রশ্ন করিবার ক্ষমতাই যেন লুপ্ত হইয়া গেল এবং অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও কোন প্রশ্ন করিলে বোধ হয় আমাকেও নিরুত্তরই থাকিতে হইত।

নবাগতদের মধ্যে জায়গা লইয়া খুই একচোট কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। ছাপরা জেলা, কেউ হটিবার পাত্র নয়, বচসা প্রচণ্ডতর হইতে হইতে ক্রমে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। তাহার পর ওরই মধ্যে কয়েকজনের মধ্যস্থতায় সবাই একরকম ঠাণ্ডা হইয়া গেল। কতকটা ব্যবস্থাও হইল—ওদিককার বেঞ্চে ওদলের মাতব্বরেরা বরকে লইয়া গুছাইয়া-সুছাইয়া বসিল। এদিককার বেঞ্চেও সেই ব্যবস্থা হইল, বাকি সবাই দাঁড়াইয়া রহিল বা মালপত্রের উপর গাগাগাদি করিয়া বসিয়া রহিল। ওরই মধ্যে দুইটা দলের মধ্যে কিন্তু পার্থক্যটা বজায় রাখিয়া চলিল।

আমার পাশেই যে ভদ্রলোকটি বসিয়াছিলেন তাঁহার নিকট হইতে কিছু ভিতরকার খবর যোগাড় হইল। বরপক্ষীয়েরা একই জায়গার লোক, পরস্পরের জ্ঞাতি, জাতিতে রাজপুত ; স্টেশন থেকে মাইল ছয়েক দূরে সিমরি গ্রামের জমিদার। একদল নামিবে ছাপরা, একদল সোনপুর। ওদিকে মোটা গোঁফ আর গালপাট্টা সমন্বিত প্রবীণ ভদ্রলোকটি ওদিককার বরের পিতা। নাম বাবু গুলজার সিং। ভয়ংকর রাশভারি আর ফরিয়াদী লোক। এদিককার কর্তা বরের বড় ভাই, এই বেঞ্চের শেষদিকে তিনি বসিয়া আছেন—মাথায় বাবরি, গোঁফ অত বড় নয়, তবে একটা রাজপুতী ঢং আছে, অত্যন্ত রগচটা মানুষ। নাম বলবন্ত সিং।

উভয় পক্ষের মধ্যে তিনপুরুষ ধরিয়া বৈরিভাব চলিয়া আসিতেছে।

বলিলাম—"এরকম ফরিয়াদী আর খাপ্পা মেজাজের লোক একদিনেই বরযাত্রী নিয়ে যাচ্ছেন, বৈরিভাবও বলছেন বনেদী, উঠলেনও এক কামরায়, এতে হ্যাঙ্গাম বাধবে না তো?"

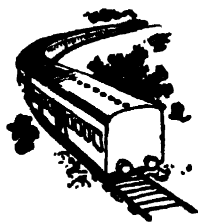
ভদ্রলোক একটু হাসিয়া নির্বিকারকণ্ঠে বলিলেন—"সেটা জগদম্বার ওপর নির্ভর করছে। তাঁর যদি ইচ্ছা হয় গোটাকতক শির ধড় থেকে নাববে, আপনি আমি কি রুখতে পারব বাবুজি? রাজপুতের বিয়ে—আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন? প্রায় তো লেগেছিল, জগদম্বার ইচ্ছেয় থেমে গেল তাই তো? তাঁরই মর্জি হলে আবার বেধে যেতে কতক্ষণ? দুই কর্তার মুখের ভাবটা একটু লক্ষ্য করুন না!"

সত্যই লক্ষ্য করিবার বিষয়। দুইজনেই বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন, অত্যন্ত গম্ভীর। ওরই মধ্যে ঘাড় ফিরিইয়া কয়েকবার পরস্পরের দিকে দেখিলেন, বার দুয়েক বোধ হয় চোখাচোখিও হইয়া গেল, তাহাতে মুখ দুইটা আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল—ভিতরে খুব উগ্র রকম কোন চিন্তাধারা চলিতেছে।

মেমসাহেব নিথর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন, বাহিরে অমন জ্বলন্ত হাওয়া, তবু মুখটা এক-একবার একটু বাড়াইয়া দৃশ্যটা না দেখিয়া লইয়া যেন পারিতেছেন না।

ভীষণতার যে একটা মোহিনী শক্তি আছে সেটা যেন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। কিছু বলিতেছেন না কিন্তু—নিশ্চয় পারিতেছেন না বলিতে।

অবশ্য গাড়ির মধ্যে উভয় পক্ষ মিলিয়া একটা হৈ-হল্লা চলিয়াছে। তবে সেটা মিশিয়া যাইতেছে না, এদিকে-ওদিকে পার্থক্যটা মোটামুটি বাহিরে বজায় আছে। মিশিয়া গেলে অর্থাৎ এই অবস্থায় আবার বচসা শুরু হইয়া গেলে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইবে ভাবিতেছি, এমন সময় আমাদের দিকে হঠাৎ কোথায় একটা রামশিঙার আওয়াজ উঠিল। মিস্ গ্রেস্ একরকম চমকাইয়া মুখটা বাড়াইয়া তখনই টানিয়া লইলেন, চক্ষু দুইটি বিস্ময়ে আরও বিস্ফারিত হইয়া গেছে। কিছু একটা প্রশ্ন করিতেন, কিন্তু আরও রুদ্ধবাক হইয়া গিয়া যেন পারিতেছেন না। ও'র কথাটা নিজের হইতেই আমার মনে পড়িয়া গেল—"**Mr. Mukherjee, I am surprised at their stamina !**"



এর পরেই লক্ষণীয় ছিল দুই বরকর্তার মুখের ভাব। ঘটনাটা আমাদের দিকের, এই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে কেহ রামশিঙায় ফুঁ দিতে পারে এটা বাবু বলবন্ত সিং-এর রাজপুতী কল্পনারও অতীত নিশ্চয়, তিনি একবার ঝুঁকিয়া চাহিয়া লইয়া গোঁফে একটু তা দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত হইলেও তাঁহার ব্যঙ্গ দৃষ্টির খানিকটা তির্যক রেখায় বাবু গুলজার সিংএর উপর গিয়া পড়িল। তিনি বোধ হয় এই রকম একটা কিছু প্রত্যাশাই করিয়াছিলেন, ঘাড় ফিরাইতে একটু চোখাচোখিও হইয়া গেল দুইজনের। সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র গুম্ফ আর গালপাট্টার নিচে তাঁহার সুগৌর মুখমণ্ডল একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল। ব্যাপারটা দুই দিকের সবাই লক্ষ্য করিল এবং হঠাৎ সমস্ত গাড়িটাতে একটা থমথমে ভাব আসিয়া পড়িল। বাবু গুলজার সিং মুখটা খানিকক্ষণ বাহিরের দিকেই করিয়া রাখিলেন—রাগে ফুলিতেছেন। মেমসাহেব নিশ্চয় অতটা কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না, রামশিঙার বিস্ময়েই অভিভূত হইয়া আছেন। আমি কিন্তু দুই রাজার লড়াইয়ে উলুখড়ের নসিবের কথা চিন্তা করিয়া ভিতরে ভিতরে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছি—বিশেষ করিয়া এই বিদেশিনীর জন্য। বাইরের লোক হিসাবে প্রয়োজন হইলে আমার এর মধ্যে পড়িয়া দুই পক্ষকে ঠাণ্ডা করিতে যাওয়া ঠিক হইবে কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় বাবু গুলজার সিং গর্জন করিয়া উঠিলেন—"তেওয়ারী !"

এই প্রথম তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিলাম, শুনিবার জিনিস বটে!

ডাকটা সবার কণ্ঠেই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দরজার কাছে—"গরীব পরবর!" বলিয়া একটা প্রত্যুত্তর হইল এবং একটি লোক ভিড় ঠেলিয়া হন্তদন্ত হইয়া সামনে আসিয়া কুর্নিশ করিয়া দাঁড়াইল—যেমনি লম্বা তেমনি আড়ে, মাথায় গোলাপি রঙের বিরাট শাফা, হাতে পেতলে বাঁধানো লাঠি, পাশে ঘুণ্টি-দেওয়া পাঞ্জাবীর ওপর সোনার তাগার একটা মালা।

এ তরফেও হুকুমের প্রত্যাশায় সবাই বাবু বলবন্ত সিং-এর মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

শ্রাদ্ধটা কিন্তু ওদিকে গড়াইল না, সবাই একটু বেশি প্রত্যাশা করিয়া বসিয়াছিল। বাবু গুলজার সিং সেই রকম জলদ-গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন—"এটা বিয়ে হতে যাচ্ছে, না শ্মশানযাত্রা?"

কথাটার তাৎপর্য তেমন বুঝিতে না পারিয়া তেওয়ারী শুধু আর একটা কুর্নিশ করিয়া বেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

আরও এক পর্দা চড়া সুরে প্রশ্ন হইল—"বাজনদারেরা যদি ছেড়েই গেল তো আমাদের আসবার কি দরকার ছিল—আমার ছেলের বিয়ে দিতে যাচ্ছি, কি আমায় শ্মশানযাত্রা করাচ্ছ তোমরা? বলো, কথা কইছ না কেন?..."

তেওয়ারী একবার পিছনে সবাইর উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইল এবং সে ও আরও কয়েকজন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—"বাজনদারেরা তো এসেছে হুজুর, চারটে দল—তাদের আগে চড়িয়ে আমরা তবে উঠেছি—সে কি কথা হুজুর, তাদের না চড়িয়ে আমরা উঠতে পারি কখনও!"

"এসেছে যে তার প্রমাণ কি? বাজনা কোথায়?"

সবাই চুপ করিয়া রহিল, এ অবস্থার মধ্যেও যে বাজনার প্রত্যাশা করে তাহাকে কি উত্তর দেওয়া যায় যেন ভাবিয়া পাইতেছে না। শেষে মোসাহেব গোছের একজন একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—"হুজুর, তারা সব এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে কোন রকমে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে, বাজাবার একটু কোনও উপায় থাকলে তারা ছাড়ত না, সে পাত্রই নয় তারা—"

এই সময় রামশিঙায় আর একটা আওয়াজ উঠিল এবং ওদিকে বাবু বলবন্ত সিং নিজের কয়েকজন লোকের উপরই দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া ঈষৎ হাসিয়া গোঁফে একটু চাড়া দিলেন।

বাবু গুলজার সিং মোসাহেবের কথায় গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—"এর পরের স্টেশনেই সবাই নেমে যাবে, ফিরে যেতে হবে। তোমরা ভেবেছ গুলজার সিং মরেছে, কিন্তু সেটা তোমাদের ভুল ধারণা বাবা!"

এর পরে আর কিছু বলিলেন না। ভিড়ের ও-অংশে সেই রকম থমথমে ভাবটা লাগিয়া রহিল, শুধু তেওয়ারীকে লইয়া কয়েকজন মাতব্বর একত্র হইয়া কি একটা

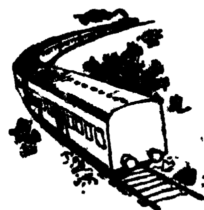
পরামর্শ আঁটিতে লাগিল। গাড়ির বেগ কমিয়া আসিল, গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, একটা স্টেশন আসিতেছে।

গাড়ি থামিলে তেওয়ারী নামিয়া গেল। ছোট স্টেশন, মিনিট দুয়েক থাকিল গাড়িটা, চলিতে আরম্ভ করিলে তেওয়ারী আসিয়া আবার উঠিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে এদিক পানে অনির্দিষ্টভাবে এমন একটা কটাক্ষ হানিল, যাহার অর্থ দাঁড়ায়—'এইবার চলে এসো।' তাহার পর রামশিঙাটি বাজিয়া উঠিতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ওদিকে চারটে দলের যত রকম যন্ত্র থাকিতে পারে—করনেট, ক্লারিওনেট, ব্যাগপাইপ, সানাই, রামশিঙা—সেই অগ্নিবর্ষী আকাশের নিচে একসঙ্গে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। মিস্ গ্রেসের চোখ দুইটা বিস্ময়ে যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিবে, আমার পানে চাহিয়া বলিলেন—"এ যে পুরোদস্তুর সঙ্গীত, মিস্টার মুখার্জি! (**This is full-fledged music, Mr. Mukherjee !**)"

অবশ্য ঠিক সঙ্গীত বলিতে যা বোঝায় তাহার কিছুই নয়—তবে কোন যন্ত্র বোধ হয় বাদ নাই, সুর-তালকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া সবগুলো যেন একটা প্রলয়-তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছে।

বাবু বলবন্ত সিংএর মুখ দেখিলাম একেবারে ছাইপানা হইয়া গেছে। বাবু গুলজার সিং জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"ফরসী!"

চিলমচি অপেক্ষাই করিতেছিল, তাওয়াদার চিলিম আর গড়গড়ার ব্যবস্থায় মোতায়েন হইয়া গেল।



সমস্ত পথ একটানা ঐ ব্যাপার চলিল। বাবু বলবন্ত সিং একবারও গাড়ির দিকে মুখ ফিরাইলেন না। ক্রোধে, অপমানে, আক্রোশে জ্বলন্ত আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। গাড়ির গতিবেগ কমিয়া গেল, স্টেশন আসিল, গাড়ির শব্দ রহিত থাকায় বাজনার ঝঞ্ঝা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। বাবু বলবন্ত সিংএর সান্ত্রী একবার গাড়ির ওদিকে দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করিয়া গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িল। গাড়িটা মিনিট দুই-তিন থামিল। বাজনা ওদিকে আরও ঝঞ্ঝাময় হইয়া উঠিল। তাহার পর গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবু বলবন্ত সিং-এর সান্ত্রী এক লাফে আবার গাড়ির উপর লাফাইয়া উঠিল, তেওয়ারীর সেই বিজয়-দৃষ্টিকে সুদে-আসলে ফিরাইয়া

দিয়া বেশ ঘটা করিয়া মনিবকে একটা কুর্নিশ করিয়া আবার পাহারায় দাঁড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দিকের আগে-পেছনের কয়েকটা গাড়ির পা-দান থেকেও বিশ-পঁচিশটা বাদ্যের সেই উৎকট ঝনঝনা।···বোধ হয় সম্বন্ধে আটকায় বলিয়া বাবু বলবন্ত সিং আর 'ফরসী'র ফরমাসটা করিলেন না, তবে গোঁফে চাড়া দেওয়ায় যতটা সম্ভব বিশিষ্টতা ফুটাইবার চেষ্টা করিলেন এবং নিজের সান্ত্রীর দিকে এমন একটি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন যাহাতে স্পষ্টই বোঝা গেল একটা মোটা বকশিশ তাহার কপালে নাচিতেছে।

বাবু গুলজার সিং-এর মুখটা আবার আরক্তিম হইয়া উঠিল, বাহিরের দিকের অনেকটা পথ অতিক্রম করিলেন, তাহার পর আবার মেঘমন্দ্রস্বর উঠিল—"তেওয়ারী!"

তেওয়ারী ভিড় চিরিয়া তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল।

"এমন গুঙা (বোবা) বাজনা কোথা থেকে জোগাড় করেছ তোমরা? জবাব দাও, চুপ করে কেন?"

দলের সবাই আবার স্তব্ধ হইয়া গেল, এমন কি ও-দলের লোকেরা পর্যন্ত।

অর্থটা বোধ হয় ধরিতে না পারায় তেওয়ারী একটু ব্যাকুলভাবে একবার সবার মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া আনিল, শেষে সেই মোসাহেব ভদ্রলোক আবার সাহস সঞ্চয় করিয়া করজোড়ে নিবেদন করিল—"কেন, আওয়াজ তো হচ্ছে হুজুর। বাজনা তো গুঙা নয় আমাদের।"

কর্তা হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন—"কিন্তু ঢাকঢোলের আওয়াজ কোথায় মশাই? বাজনায় ঢাক নেই, বিয়েতে তো তা হলে কনে না থাকলেও চলে।"

সকলের মুখ আরও অন্ধকার হইয়া গেল।

এই সময় মিস্ গ্রেস্ আমায় প্রশ্ন করিলেন—"আবার কি চায় ভদ্রলোক?"

বলিলাম—"বাজনায় ঢাকের অভাব ওকে পীড়া দিচ্ছে।"

"কিন্তু তা কি করে সম্ভব, মিস্টার মুখার্জি?"

সবাই এক হাতে—তাও আবার ডান হাতে হ্যাণ্ডেল বা জানালার ফ্রেম ধরিয়া আছে, অন্য হাতে বাঁশী শিঙে ধরিয়া পরিত্রাহি ফুঁ দিয়া যাইতেছে, যো-সো করিয়া দু'একটা আঙুলেই কোন রকমে এক-আধটা চাবি টিপিয়া, কিন্তু ঢাক সামলাইবে কি করিয়া? উত্তর আর কি দিব? বিমূঢ়দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম।

এবার স্টেশনটা খুব কাছে, অল্পের মধ্যে গাড়ির গতিবেগ স্তিমিত হইয়া আসিল। থামিলে দুই সান্ত্রীতে পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ হানিয়া গাড়ি হইতে তড়াং তড়াং করিয়া লাফাইয়া পড়িল।

আমায় এর পরের স্টেশনেই নামিতে হইবে; বেশি দূরেও নয় সেটা। গোছগাছ করিতেছি এমন সময় মিস্ গ্রেস্ যেন দারুণ আতঙ্কে বলিয়া উঠিলেন—"দেখুন! মিস্টার মুখার্জি, এদিকে দেখুন! ও মাই গড!!"

একটা গাঁটরি মুক্ত করিতেছিলাম, যতক্ষণে মুখ বাহির করিয়া দেখিব ততক্ষণে গাড়িও ছাড়িয়া দিয়াছে! সঙ্গীত আরম্ভ হইয়া গেছে। এবার একেবারে স-ঢাক!

বাহিরে মুখ বাড়াইয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম, একেবারে কল্পনাতীত ব্যাপার! এদিকে আমাদের গাড়ি আর আমাদের পেছনের দুইটা গাড়ির ছাদ আর ওদিকে সামনের তিনটা গাড়ির ছাদ বোঝাই হইয়া গেছে। ঢাকী সানাইয়ের কর্নেটি রামশিঙে ওয়ালা কেহ বাদ নাই। লোকের উপর বাজনার চাপে ছাদ যেন ভাঙিয়া পড়িবে। গাড়ির বেগ যত বাড়িতে লাগিল, বাজনা ততই হইয়া উঠিতে লাগিল উগ্রতর। গাড়ির মধ্যের উত্তাপই বোধ হয় তখন একশ' পনের ষোল ডিগ্রী, বাহিরে টিনের ছাদের উপর কত তাহা অনুমান করাও শক্ত....

একবার বেশ খানিকটা বুক পর্যন্ত বাহির করিয়া না দেখিয়া থাকিতে পারিলাম না। এদিকে তিনটা ছাদ আর ওদিকে তিনটা, দু'দিকের এই ছয়টা ছাদে দুইটা দল পরস্পরের দিকে উগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া গলা ফুলাইয়া, কপালের শির ফুলাইয়া, কাসিয়া ঘামিয়া যেন সঙ্গীতের গোলা দাগাদাগি করিতেছে। আগুনের হল্কার মতো হাওয়াটা আর সহ্য করিতে না পারিয়া আবার নিজেকে টানিয়া লইলাম।...দেখি বাবু বলবন্ত সিং গোঁফে তা দিতেছেন, বাবু গুলজার সিং শান্ত মর্যাদায় ফর্সী সেবন করিতেছেন।

পরের স্টেশনে নামিলাম। কুলি নাই; তবে বরযাত্রীর লোকেরাই ভদ্রতা করিয়া জিনিসপত্রগুলি নামাইয়া দিলেন। কুলির জন্য হাঁকাহাঁকি করিতেছি, মিস্ গ্রেস্ও ধীরে ধীরে ছোট সুটকেসটি হাতে করিয়া নামিয়া আসিলেন।

বলিলাম—"আপনার তো এখানে নামবার কথা নয়!"

বাজনার লড়াই বিপুল বিক্রমে চলিতেছে, মিস্ গ্রেস্ অন্যমনস্ক হইয়া সেইদিকে চাহিয়াছিলেন, উত্তরে বলিলেন—"আমার এর পরের স্টেশন, মিস্টার মুখার্জি। এইখানেই অপেক্ষা করব, মিস্টার ট্রেভারকে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি, কারটা পাঠিয়ে দেবেন। নিশ্চয় রাস্তা আছে?"

বলিলাম—"রাস্তা তো আছে, কিন্তু..."

মিস্ গ্রেস্ আবার ওই দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন, আমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"আর জানেন মিস্টার মুখার্জি—আমার সংকল্পটাও বদলে ফেলেছি।"

প্রশ্ন করিলাম—"কি রকম?"

"মিস্টার ট্রেভারকে এদেশ ছাড়তে আমি বাধ্য করব, আর যদি না ছাড়েন তো..."

গাড়ি ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সঙ্গীত আরও ক্ষিপ্ত। মিস্ গ্রেস্ ওদিকে চাহিয়া অন্যমনস্কভাবেই কথাগুলা এই পর্যন্ত বলিয়া, হঠাৎ আমার মুখের পানে চাহিয়া থামিয়া গেলেন। মিস্টার ট্রেভারকে কেন যে এ দেশ ছাড়িতে বাধ্য করিবেন—অধিকারজ্ঞান হঠাৎ কেন এত শিথিল হইল সে বিষয়ে আর কিছুই টের পাওয়া গেল না।



ভাড়া

[১]

কাজটা বোধ হয় অন্যায় হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কাঠ-রসিকতার জ্বালায় মনের অবস্থা তখন এমন দাঁড়াইয়াছিল যে, ও কথাটা ভাবিয়া দেখিবার অবসর হয় নাই। এখনও যে খুব অনুতপ্ত আমি একথাও ধর্ম সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি না।

বরদাত্রীর দল, কলিকাতা হইতে লুপ লাইনে সাহেবগঞ্জ যাইতেছে। একে বরযাত্রী, তায় কলিকাতার, তাহার উপর আবার যাইতেছে বেহারে—সকলেরই যথাসম্ভব স্মার্ট আর রসিক হইবার চেষ্টা! কিন্তু সুবিধা হইতেছে না। শেষে লুপ এক্সপ্রেসটা যখন কোন্নগর পার হইল তখন একজন বলিল—"না, এ জমছে না, শ্রীরামপুর গাড়ি থামলে বরদা খুড়োকে টেনে নিয়ে আসতে হবে বরের গাড়ি থেকে—বাঃ, ওঁরা বরও নেবেন আবার বরদাও নেবেন।"

গাড়িটা প্রায় ওরাই বোঝাই করিয়া রাখিয়াছে, সমর্থনের একটা তুমুল কলরব উঠিল—"খুড়োকে চাই!···খুড়োকে চাই!···আমাদের খুড়োকে চাই!··বাঃ, বর বরদা দুই নেবে মাংনা নাকি?···"

অযথাই কলরবের সঙ্গে একটা হাসি উঠিল, একজন দাঁড়াইয়া উঠিয়া "খুড়ো হে!—এসো হে—আধ আঁচরে বোস হে!"··বলিয়া যাত্রার জুড়ির মতো হাত খেলাইয়া তান ধরিয়া দিল, একজন উঠিয়া তাহার টুঁটিটা ধরিয়া নাড়া দিয়া গানের গিটকিরি তৈয়ার করিয়া চলিল। হাসির আর একটা তোড় উঠিল।

এদের সঙ্গে আমায় বর্ধমান পর্যন্ত যাইতে হইবে, অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। যাই হোক, একটু আশান্বিত হইলাম যাহার নাম উচ্চারণেই এতটা উল্লাস তাহাকে দেখিবার জন্য কৌতুহল লইয়া বসিয়া রহিলাম।

গাড়িটা শ্রীরামপুরে থামিতে প্রায় অর্ধেক লোক হৈ-হৈ করিতে করিতে নামিয়া গেল ; বরের গাড়িতে হাসি-হল্লার মধ্যেই একটা টানাটানি পড়িয়া গেল—ওরাও ছাড়িবে না, এরাও নিরস্ত হইবে না—তাহার পর "থ্রি চিয়ার্স ফর্ খুড়ো !···লং লিভ খুড়ো !··· খুড়ো জিন্দাবাদ !"—বলিতে বলিতে সমস্ত প্ল্যাটফরম কাঁপাইয়া একটি লোককে মাঝে করিয়া সবাই এ-কামরায় আসিয়া উঠিল। গাড়িটা ছাড়িয়া দিল।

লোকটা বেঁটেসেঁটে গোলগাল, মাথায় টাক, তাহার নিচে বাবরি ; মোটা একজোড়া গোঁফ বাটারফ্লাই করিয়া ছাঁটা, সর্বসাকুল্যে চেহারাটায় একটু হাসির উদ্রেক করে, তাহার উপর মুখটা আর চোখ দুইটা এমনভাবে একটু কুঞ্চিত যে, মনে হয় যেন এখনই ভয়ানক একটা হাসির কথা বলিবে বা হাসির কিছু একটা করিবে। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হইবে।

গাড়ির মধ্যে আসিয়াই লোকটা হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল, চোখমুখ আরও কুঞ্চিত করিয়া চারিদিকে একবার চাহিয়া লইল ; অত যে গোলমাল এক মুহূর্তেই ঠাণ্ডা হইয়া গিয়া সবাই মস্ত বড় কিছু একটা প্রত্যাশা করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, দু' একটা চাপা হাসির খুক্-খুক্ শব্দ হইল, একটু থাকিয়া একজন বলিল—"কি খুড়ো ! তুমি যে একেবারে স্ট্যাচু মেরে আলোর দিকে চেয়ে রইলে !"

খুড়ো বিমূঢ়ভাবে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিল—"এ কি ! আমার গান পাচ্ছে কেন এতো ?"

চাপা হাসি আরও বাড়িয়া গেল, একজন বলিল—"তা গান পাচ্ছে তো গাও না বাবা, সেই জন্যই তো তোমায় পাকড়াও করে আনা···"

খুড়ো বাঁ হাতে কানটা ঢাকিয়া ডান হাতটা লম্বা করিয়া বাড়াইয়া দিয়া একেবারে সপ্তমে তান ধরিল—"শ্মাশনে কেন মা গিরিকুমারী, কেন বা তোমার এ-হেন বে-এ-এ-শ !"

প্রচণ্ড হাসির চোটে মনে হইল যেন ছাতটা ভাঙ্গিয়া পড়িবে, সেই সঙ্গে নানা রকম বুলি—"থ্রি চিয়ার্স ফর খুড়ো !···এন্‌কোর খুড়ো এন্‌কোর !···এন্‌কোর।"

তোড়টা একটু থামিলে দু' একজন হাসিতে হাসিতে বলিল—"গান খুঁজে পেলে না বাবা ?···বাসর ঘরে এই গানই হয় নাকি খুড়ো ? এ যে বরযাত্রী গো···"

খুড়ো হাত দুটো চিতাইয়া নিরীহভাবে বলিল—"বরযাত্রী কি শ্মশানযাত্রী কি করে বুঝব বাপধনেরা ? একেবারে যে নিঝুমের পালা চলেছিল···"

সবার হাসির মধ্যেই এদিকে চাহিয়া হঠাৎ আমায় সাক্ষী মানিল—"কি মশাই, একেবারে শ্মশান করে রাখেনি ?"

আমার পিত্ত জ্বলিয়া যাইতেছিল, ভাবিয়াছিলাম যে রকম জুলুম করিয়া আনা, বোধ হয় একজন প্রকৃত হাস্যরসিকের সঙ্গ পাওয়া যাইবে, এ একেবারে চড়কতলার সং ! উত্তর দিবার প্রবৃত্তি না থাকায় চুপ করিয়া ছিলাম। খুড়ো ভয় এবং দুঃখের

অভিনয় করিয়া বলিল—"কি মশাই, একটু সমর্থন করুন, একা পড়ে যাচ্ছি যে,—করে রাখেনি শ্মশান ?"
একটু খুক্-খুক্ করিয়া শব্দ হইল, বোধ হয়। একটি অপরিচিত ভদ্রলোককে এ ভাবে কোণঠাসা হইতে দেখিয়া আমি বলিলাম—"আজ্ঞে, এতক্ষণ ততটা বুঝতে পারিনি, এখন শেয়ালডাকার শব্দে আর সন্দেহ নেই বটে।"
খুক্-খুক্ শব্দটা আরও কয়েক কণ্ঠে চারাইয়া পড়িল, খুড়ো একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল ; কিন্তু একেবারে দু'কান কাটা, তখনই সামলাইয়া লইল ; আমার দিক থেকে ফিরিয়া বলিল—"শুনলে তো ? একবার একটা বিড়ি কি সিগারেট ছাড়ো দিকিন, শেয়ালের গলা ভেড়ে গেছে, একবার শাণিয়ে নিতে হবে—"
••বলিয়া মুখটা উঁচু করিয়া হাত দুটো বাড়াইয়া ধরিল এবং গলাটা চাপিয়া ভাঙা গলার মতো করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"হুয়া কাক্কা—বিড়ি। হুয়া কাক্কা—সিগারেট"। আবার একটা প্রচণ্ড হাসির তোড় উঠিল এবং আমার পরাভবে কয়েকটা তির্যক দৃষ্টি আমায় উপর আসিয়া পড়িল। এই সময় কোন কারণে সিগনেল না পাওয়ায় গাড়িটা আসিয়া শেওড়াফুলিতে দাঁড়াইয়া পড়িল।

[২]

একজন চাষাভূষা গোছের লোক হঠাৎ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আমাদের গাড়ির হ্যাণ্ডেলটা ধরিল এবং ঘাড়টা প্ল্যাটফরমের দিকে ঘুরাইয়া হাঁকিল—"ইদিকে—ও ঘোষের পো! ও বদন! ও বেচারাম !....ইদিকে !"
গাড়ির পিছন দিক থেকে একসঙ্গে কয়েকটি কণ্ঠে উত্তর হইল—"এরা কইচে এ-গাড়ি লয়, উঠুনি তুমি•••"
লোকটা পা-দানে একটা পা তুলিয়া দিয়াছিল, টানিয়া লইয়া একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া প্রশ্ন করিল—"কারা—কারা কইচে গো ?"
সিগনেল পাইয়া গাড়িটা হুইসেল দিল।
খুড়ো টপ্ করিয়া উঠিয়া পড়িল, দরজার দিকে ত্রস্তভাবে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল—"না হে মোড়লের পো, এই গাড়ি, উঠে পড়ো, উঠে পড়ো, গাড়ি ছেড়ে দিলে বলে•••"
খাঁ করিয়া দরজাটা খুলিয়া লোকটাকে একরকম টানিয়া তুলিয়াই দরজা দিয়া গলাটা বাড়াইয়া হাঁকিল—"এই গাড়িই গো ঘোষের পো, বোসের পো, বদনচন্দ্র, বেচারাম—উঠে পড়ো তোমরাও...."
গাড়িটা ছাড়িয়া দিল এবং যে হাসি বোধ হয় এইটুকুর জন্যই আটকানো ছিল সেটা একেবারে প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। লোকটি কিম্ভূতকিমাকার হইয়া

গেছে, গদি-আঁটা গাড়ি, তাহার উপর যাত্রী সব একেবারে সেরা কাপড়-চোপড়-পরা ভদ্রলোক—গায়ে গন্ধ ভুর-ভুর করিতেছে—ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। খুড়ো একজনকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল, বলিল—"বাঃ, কী আমার মামার বাড়ির আবদার রে, মোড়লের পো দাঁড়িয়ে—আর উনি নবাব খাঞ্জাখাঁর মতো গদিয়ান হয়ে বসে থাকবেন।..."

লহরে লহরে হাসি চলিতেছে। নিজের কোমরে বাঁধা সিল্কের চাদরটা তাড়াতাড়ি থিয়েটারি ঢঙে খুলিয়া জায়গাটা ঝাড়িয়া খুড়ো বলিল—"এই বোস কর্তা, কোথায় যাওয়া হবেন কর্তার?"

ঝুঁকিয়া দুই হাঁটুতে ভর দিয়া গভীর বিনয়ের অভিনয় করিতে হাসিটা আর একটা তোড়ে ভাঙিয়া পড়িল।

গাড়ি বেশ জোর দিয়াছে। আমি বিস্ময়ে একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেছি। ভাঁড়ামি অনেক দেখিয়াছি, গা-জুরি ফুর্তি জমাইবার চেষ্টায় বরযাত্রীদের মধ্যে সেটা যে আরও কিরূপ বিকৃত রূপ ধারণ করে তাহার অভিজ্ঞতাও কম নয় আমার, কিন্তু এ ধরনের ব্যাপার কখনও চাক্ষুষ করি নাই। একেবারে থ হইয়া গেছি। উচিত ছিল তখনই চেন টানিয়া দিয়া স্টেশনের লোক ডাকিয়া সদ্য সদ্য এর একটি বিহিত করা, কিন্তু যখন চৈতন্য হইল তখন গাড়ি অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছে।



কোথায় যাইবে শুনিবার জন্য আমিও কৌতূহলী হইয়া সামনে ঝুঁকিয়া বসিলাম। খুড়োর প্রশ্নের উত্তরে লোকটা ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিল—"আমি যাবো বাবু সাঁইতেড়ে, মানকুণ্ডুর টিকিস আমার, সেখানে নেমে রেল পেইরে তারপর হাঁটাপথে চালদাডাঙ্গা হয়ে বড় রাস্তায়..."

খুড়ো গভীর মনোযোগের সহিত শুনিতে শুনিতে মুখটা একটু কুঞ্চিত করিয়া খুব একটা হাসির কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল, বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"ও বাব্বা মানকুণ্ডুতে নেমে, রেল পেইরে, চালদাডাঙ্গা হয়ে তারপর বড় রাস্তা। তার চেয়ে এক কাজ করো কত্তা—সাহেবগঞ্জে নেমে মোটরে একেবারে বিয়েবাড়িতে খাটের আসনে—লুচি, পোলাও, কোর্মা, কোপ্তা, রাবড়ি মালাই।..."

ডান হাতটা ভুরিভোজনের ইঙ্গিতে মুখ এবং একটা কাল্পনিক পাত্রের মাঝে ওঠানামা

কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটার মধ্যে আবার হাসির একটা হররা উঠিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম মন্তব্য "হ্যাঁ, সাহেবগঞ্জেই চলো কত্তা···নিয়ে চলো খুড়ো···কত্তাকে ছাড়া হবে না··চলো হে কত্তা···রাবড়ি-মালাইয়ের দেশ ঘুরে আসবে !···"
আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, সামনে হেলিয়া বলিলাম—"মশাই, মাফ করবেন, এটা আপনাদের কি ধরনের রসিকতা হচ্ছে জিগ্যেস করতে পারি কি ?
হাসি-হল্লা সব একেবারে চুপ হইয়া গেল খুড়োও একটু থতমত খাইয়া গেল। তাহার পর তাহার মুখটা খুব অল্প হাসির আভাসে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, হাত জোড় করিয়া আমার দিকে ঝুঁকিয়া আমারই মতো করিয়া বলিল—"মশাই, মাফ করবেন,···রসিকতার ধরনটা বললে আপনি বুঝতে পারবেন কি ?"
খুক্-খুক্ করিয়া চারিদিকে আবার চাপা হাসির শব্দ উঠিল। আমি উত্তর করিলাম —"বলুনই না, চেষ্টা করে দেখি।"
"শৃগা-আ-আ-আ-ল রসিকতা !"
উচ্চ উৎকট হাস্যে সবাই একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। খুড়ো আমার দিক থেকে মুখটা ফিরাইয়া দলের দিকে ঘুরিয়া 'হুয়া-ক্কাক্কা, হুয়া-ক্কাক্কা' করিয়া হাসির সঙ্গে শেয়ালের ডাক মিশাইয়া এমন একটা অদ্ভুত আর বিকট রব করিতে লাগিল যে হাসিটা আর থামার অবসর পাইল না অনেকক্ষণ ধরিয়া।
অবশেষে খানিকটা প্রশমিত হইলে আমি বলিলাম—"কিন্তু রসিকতার পরিণামটা কি ভেবে দেখেছেন ?"
খুড়ো আমার দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল—"সাহেবগঞ্জে আসনে বসে লুচি, পোলাও, কোর্মা, কোপ্তা···"
আবার হাসির তোড় নামিল। আমার রাগটা তখন বেশ বাড়িয়া গেল, হাসির উপরে গলাটা তুলিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম—"অতদূর পর্যন্ত এগুবার দরকার হবে না ; চন্দননগরেই তার ব্যবস্থা করছি, একেবারে রাজ-অতিথি হয়ে লুচি পোলাও ওড়াবেন —আপনারা একটা নিরীহ পাড়াগেঁয়ে লোককে জবরদস্তি ভুল গাড়িতে তুলে !"
সবার হাসির মধ্যে খুড়ো গলাটা ওদের মধ্যে বাড়াইয়া ভয়ের অভিনয়ের সহিত চাপা গলায় বলিল—"উকিল।"
আবার হাসিটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আমি আপাতত আর বাক্যব্যয় নিরর্থক দেখিয়া নিজের জায়গাটিতে ঠেস দিয়া বসিলাম। এটা পরোক্ষভাবে আমার হার স্বীকার বলিয়া ধরিয়া লইয়া উহারা আরও ভাল করিয়া লোকটাকে লইয়া পড়িল। খুড়ো দুইটা সীটের পর বসিয়াছিল, লোকটার পাশে আসিয়া বসিতে বসিতে বলিল—"সরো দিকিন তোমরা, কত্তার সঙ্গে একটু আলাপ জমাই....তা তোমায় অত ভাবতে হবে না কত্তা, প্যাসেঞ্জারে সব মাটি মাড়াতে মাড়াতে আসতে, এ একেবারে শেওড়াফুলি থেকে চন্দননগর, সঙ্গে সঙ্গে কত্তার জন্যে ব্যাণ্ডেলের দিক থেকে ডাউন প্যাসেঞ্জার, তাইতে

চড়ো টুপ্ করে এসে মানকুণ্ডুতে নেমে পড়া ; সেই ভাল, না, সেই খিকুড-খিকুড়ে-খিকুতে...”
লোকটা একেবারে অকূলে পড়িয়াছিল, একটা উপায় হওয়ায় খুড়োর শেষের দিকে খোঁড়ার চলনের নকল করিয়া বলিবার ভঙ্গিতে একটু হাসিয়াই ফেলিল—“বাবুরা যখন রয়েছেন...”
“কত্তা হেসেছে ! কত্তা হেসেছে !” বলিয়া খুড়ো খানিকটা লাফাইয়া উঠিল ; হাসির সঙ্গে ধুয়াটা সমস্ত গাড়িতে ছড়াইয়া পড়িল—“কত্তা হেসেছে ! কত্তা হেসেছে !”
আমি মুখটা বাহিরের দিকে ফিরাইয়া লইলাম ; শৃগাল-রসিকতার মধ্যে গাড়িটা মাঝের স্টেশনগুলি ছাড়াইয়া চন্দননগরে আসিয়া দাঁড়াইল।

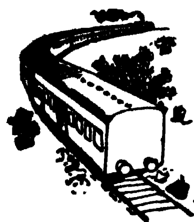
[৩]

চন্দননগরে একজন ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রী আর তিন-চারটি ছেলেমেয়ে লইয়া দরজার সামনে আসিতে সকলে হৈ-চৈ করিয়া তাঁহাকে ভাগাইয়া দিল, অবশ্য খুড়োই অগ্রণী। ভদ্রলোক খানিকটা দূরে চলিয়া গেলে অস্ফুট স্বরে বোধ হয় কিছু একটা অভদ্র রসিকতা করিতে কাছাকাছির সবাই চাপা গলায় হাসিয়া উঠিল। যাহারা শুনিতে পাইল না কৌতূহলী হইয়া উঠিল, একটু কানাঘুষা হইল, তাহার পর সেই চাপা হাসিটা গাড়িময় চারাইয়া পড়িল। গা ঘিন-ঘিন করিতেছে, ইচ্ছা হইল নামিয়া যাই, কিন্তু সব গাড়িতেই অসহ্য ভিড়, জায়গা পাওয়া প্রায় অসম্ভব, গাড়ি থামিবেও অল্প। তাই নিরুপায়ভাবে বসিয়া রহিলাম।
ইতিমধ্যে সেই লোকটা নামিয়া গেছে, বোধ হয় পুল পার হইয়া গিয়া থাকিবে। খুড়ো গলাটা বাড়াইয়া ডাকিল—“ও কত্তা ! ও মোড়লের পো !”
তাহার পর হঠাৎ গলাটা নামাইয়া বলিল—“আরে উকিল করেছিলি, ফি নিয়ে আর বেটা—লাউ ডাঁটা কুমড়ো ডাঁটা যা হয়...”
আর একজন বলিল—“বেটা খুব ফাঁকি দিলে খুড়ো।”
আমি প্ল্যাটফরমের উল্টা দিকে বসিয়া আছি, তবুও সব শুনিতে পাইতেছি, কেননা সেইভাবেই বলা। খুড়ো ঘাড়টা একটু বাঁকাইয়া—আড়-চোখে তাহার পানে চাহিয়া খুব গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল—“না, একেবারে ফাঁকি দেয়নি, তা কি পারে ? বাপরে, উকিল মানুষ !”
“কি দিয়েছে ?—কি দিয়েছে খুড়ো ?” —বলিয়া সকলে তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে গম্ভীর হইয়া দুই হাতের আঙুল দুইটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—“কেন, অম্ভরম্ভা !”

সকলে খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল, তির্যকভাবে আবার অনেকগুলি চক্ষু আমার উপর আসিয়া পড়িল।

এমন সময় খুড়ো হৈ-হৈ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"এসেছে, এসেছে। ঐ দেখ ; তোদের খুড়োর কথা মিথ্যে ভেবেছিস ? বাবা, এই মুখে শাপ দিলে আগে সঙ্গে সঙ্গে ভস্ম হয়ে যেত—বেশি দিনের কথা নয়, এই মাত্র কয়েক লাখ বছর আগে, দ্বাপরযুগে।—এইখানে ! এইখানে ! নিয়ে এস হে।"

চন্দননগরে প্ল্যাটফরমে কলার কাঁদি বিক্রয় হয়। খুড়োর 'অষ্টরম্ভা' বলার সঙ্গে সঙ্গে সত্যই কলা পৌঁছিতে দেখিয়া আবার একটা তুমুল হাসির ঢেউ উঠিল, সেই সঙ্গে একটা চিৎকার—"এসেছে অষ্টরম্ভা ! অষ্টরম্ভা !



ঠিক এই সময় একটা মোটাসোটা গোছের লোক বোধ হয় ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগেই গাড়িটাতে উঠিয়া পড়িল। ওদিকে স্টার্টার দিয়াছে, ইঞ্জিন বাঁশি বাজাইল।

কাঁদি লইয়া লোকটা সামনে আসিল।

"কত দাম ?"

"এজ্ঞে, তিন টাকা।"

"অত হবে না, দু'টাকায় রফা করো।"

গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

"এজ্ঞে, আর চারগণ্ডা পয়সা দেন।"

"আচ্ছা দাও।"

খুড়ো কাঁদিটা লইয়া লইল। তাহার পর এক হাতে পকেট থেকে একটা ব্যাগ বাহির করিয়া বেশ ভাল করিয়া চাপিয়া ধরিয়া হাঁকিতে লাগিল —"ওরে আমার ব্যাগ থেকে দামটা বের করে দে না কেউ....দে নারে কেউ।" দু'একজন চেষ্টা করিল, কিন্তু বজ্র আঁটুনিতে উদ্দেশ্যটা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া ছাড়িয়া দিল। গাড়ি ততক্ষণে বেগ দিয়াছে। লোকটা কাতরাইতে কাতরাইতে খানিকটা অগ্রসর হইল, তাহার পর গোটা কতক বাছা বাছা গালাগালি ছাড়িতে ছাড়িতে পিছাইয়া গেল। খুব একটা হাসি পড়িয়া গেল।

একজন ছোকরা একটু সাধুতার ভান করিয়া রাগ-রাগভাবে বলিল "না খুড়ো, এ ভারি অন্যায় হোল, এরকম প্র্যাক্‌টিক্যাল জোক্‌..."

খুড়ো এক হাতে কাঁদিসুদ্ধ তাহার দিকে ত্বরিতে ঘুরিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিল—"অন্যায় ! অন্যায় কোন্‌খানটা ? বুঝিয়ে দাও আমায় ।"

সবাই বড় কিছু একটা শুনিবার আশায় ঝুঁকিয়া পড়িল ।

ছোকরা বলিল—অন্যায় নয় ? জিনিস নিয়ে দাম না দেওয়া...."

"দাম তো দিয়েছি ! বাঃ !"

"দিয়েছ ? কৈ !"

"অষ্টরম্ভার দাম অষ্টরম্ভা, তা আবার দেখতে পাবে নাকি ?"

অনেকক্ষণের প্রত্যাশার পর হাসির রুদ্ধ বেগটা ছাড়া পাইয়া গাড়িটা যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। টিকা-টিপ্পনীবচনে যেন আবার নরক গুলজার হইয়া উঠিল ।

নিরর্থকই বলা, তবুও গায়ের জ্বালায় আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, আবার গলাটা বেশ উঁচাইয়া ওদের খুড়োকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলাম—"মশাই, আপনারা মানুষ ?"

সবার হাসি বন্ধ হইয়া গেল, শুধু গোটা কতক খুক্‌-খুক্‌ শব্দ রহিল জাগিয়া । খুড়ো আবার খুব গম্ভীরভাবে আমার মুখের ওপর চোখ রাখিয়া বলিল—"আজ্ঞে না তো !"

"তা তো দেখছি, তবে কী আপনারা—তাই ঠিক করতে পারছি না !"

"আমরা ?—আজ্ঞে, আমরা ছিলাম শেয়াল, এখন হয়েছি হনুমান ।"

সঙ্গে সঙ্গেই মচ্‌ করিয়া একটা কলা ভাঙ্গিয়া না ছাড়াইয়াই মুখে পুরিয়া দিয়া এবং গাল ফুলাইয়া কাঁদিটা কাঁধে করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচ শুরু করিয়া দিল। এবার আর সবার হাসিতেও শেয়াল আর হনুমানের ডাক রহিল মেশান,—সত্যই হার মানিয়া আমি আবার নিজের সীটে এলাইয়া পড়িলাম ।

[৪]

কাঁদিটা বেশ প্রমাণ সাইজের, তার প্রায় আগাগোড়াই পাকা, হনুমৎ-পর্ব শেষ হইতে বেশ খানিকটা সময় লাগিল। হুল্লোড় যাহা হইল তাহাতে মনে হইতে লাগিল যেন কিষ্কিন্ধ্যার একেবারে মাঝখানটিতে বসিয়া আছি ।

শেষ হইলে খুড়োর নবাগতের দিকে দৃষ্টি গেল,—ফাঁকতালে যেটি ঢুকিয়া পড়িয়াছে । চাষাভুষা মানুষ, তবে মনে হয় যেন সচ্ছল অবস্থার। বেশ হৃষ্টপুষ্ট, সমস্ত শরীরে কোঁকড়ান চুল, মুখে বড় বড় গোঁফ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কানেও লম্বা চুল। গায়ে একটা

ফতুয়া, তাহার আগাগোড়া খোলা, হাতে একটা দাঁড় দিয়া বাঁধা ছাতা। নিশ্চয় থার্ড ক্লাসের টিকেট, উঠিয়া নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া দোরের কাছটিতে গুটাইয়া-সুটাইয়া বসিয়া আছে, কতকটা অপ্রস্তুত এবং যেন একটু ভীতও।

কলা খাওয়া শেষ হইলে খুড়োর নজর পড়িল, কিংবা বোধ হয় আগেই পড়িয়াছিল এবং ইতিকর্তব্য তখনই শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। যেমন হঠাৎ দেখিতে পাইয়াছে এইভাবে একটু থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ভ্রূ কুঁচকাইয়া গভীর অভিনিবেশের সহিত খানিকক্ষণ দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"আরে, তুমি ?"

আবার হাসি আরম্ভ হইয়া গেল। কয়েকজন জিজ্ঞাসা করিল—"চেনা নাকি খুড়ো ?"

খুড়ো এক পা আগাইয়া গিয়া বলিল—"চেনা নয় ?—কী বলছিস তোরা !—সখা জাম্ববান যে !"

শরীরে কেশের বাহুল্যের জন্য বলা, সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লোকটিও একটু অপ্রতিভ হইয়াছে এবং বোধ হয় ভুলটা ভাঙিবার জন্যই কতকটা খোশামোদের ঢঙে একটু হাসিয়া মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আজ্ঞে আমার নাম রিদয় মালাকার, বাড়ি বাসুলি, বংশবাটির সন্নিকটে।"

খুড়ো আস্তে আস্তে যাত্রার ঢঙে আগাইয়া গিয়া দুই হাত দিয়া লোকটির দুই বাহু ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল—"ওঠ সখা, এ প্রবঞ্চনা কেন ?—বহুদিন পরে দেখা হলেও কি ভুল করতে পারি আমি ? বলো বলো আমাদের প্রভুর কি সংবাদ, ওঠ তুমি, এরকম করে বসে কেন সখা ?"

তারপর ঘাড় ফিরাইয়া কয়েকজন সঙ্গীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"সখা নল, সখা নীল, সখা গয়, সখা গবাক্ষ, তোমরা উঠে দাঁড়াও, আমি জাম্ববান সখাকে উপবিষ্ট করাই।"

"এই যে আসুন, আসুন"—বলিয়া হাসির মধ্যে চারজন উঠিয়া দাঁড়াইল।



লোকটি খুব অপ্রতিভ হইয়া গিয়া কাতরভাবে বলিতে লাগিল—"আমায় কেন ? আমায় ছাড়ান্ দেন্, আমি গরীব চাষাভূষো মানুষ, আপনাদের সঙ্গে বসবার যুগ্যি নয়—" কিন্তু কোন ফল হইল না, যত আপত্তি ততই বেশি হৈ-চৈ-এর মধ্যে তাহাকে তুলিয়া উপরে বসাইয়া দিল খুড়ো, নিজেও পাশে বসিল। নানা রকম ভাঁড়ামি লাগাইয়া দিল। লোকটির বয়স হইয়াছে, তাহার উপর একেবারে হেলো চাষা নয়,

সম্ভ্রম-জ্ঞান আছে, প্রশ্নটা হাসিয়া কাটাইবার চেষ্টা করিল, শেষে রাগিয়া গেল। তাহাতে ভাঁড়ামি আর সেই সঙ্গে হাসির মাত্রা আরও গেল বাড়িয়া। খুড়ো একটু তফাতে ছিল, একেবারে গায়ে এলাইয়া পড়িয়া বলিল—"এ কি সখা, এত বিরূপ কেন? আহ্! সখার গা কি মোলায়েম, যেন তুলোর বস্তায় শুয়ে আছি। সখা আবার ইণ্টার ক্লাসকে ফাস্ট ক্লাস করে দিয়েছেন। এমন না হলে আর সখা! আহ্!"

লোকটা রাগিয়া একটু সরিয়া বসিতে খুড়ো সরিয়া গিয়া আরও চাপিয়া বসিল। ফল নাই জানিয়াও আমি নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় আবার বলিলাম—"মশাই, আপনাদের কি একটা সীমাজ্ঞান নেই? দূরে দূরে যা হচ্ছিল, হচ্ছিল—একেবারে গায়ে পড়ে… একটা বয়স্থ লোক…"

খুড়ো আমার দিকে চাহিলও না,—ঘাড়টা ঘুরাইয়া লোকটির একেবারে মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া যাত্রার ঢং-এ বলিল—"সখা কি দেহরক্ষীকেও সঙ্গে করে এনেছ?"

প্রবল তোড়ে আবার একটা হাসি উঠিল। অনেকে এবারে সোজাসুজিই আমার পানে ফিরিয়া চাহিল।

একজনকে স্বপক্ষে পাইয়াই বোধ হয় লোকটি আরও চটিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতে যাইতেছিল, খুড়ো দুইটা হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল—"একি সখা, তা কি হয়?" তাহার পর হাত দুইটা ধরিয়াই একটু ঘুরিয়া পিঠ দিয়া চাপিয়া বলিল—"অমন উল্টো গাও কেন বাবা? গাড়ির জন্য ভাড়া দিচ্ছি, না হয়, তোমাকেও ভাড়া দেব—এমন নরম ঠেস দেওয়ার গদি আমি ছাড়ব না…আহ্ তোমরা একটু ধরে ধরে থেকো সখাকে। কেউ একটা সিগারেট ছাড়ো দিকিন।"

ব্যাণ্ডেল স্টেশন আসিয়া গেছে। লোকটি নিরুপায় হইয়া বসিয়াছিল, বলিল—"এবার আমায় ছেড়ে দিন, নামব।"

"মাইরি প্রাণ!"—বলিয়া খুড়ো সোজা হইয়া বসিল, নূতন হাসির হররায় মধ্যে বলিল—"আমি গুছিয়ে ঠেস দিয়ে বসে সিগারেটটি ধরাব ভাবছি, আর তুমি বেরসিকের মতন নেমে যাবে? মাইরি?"

প্ল্যাটফরমে ঢুকিয়াছে গাড়ি। লোকটা ফতুয়ার পকেট থেকে একটা থার্ড ক্লাসের টিকিট বাহির করিয়া বলিল—"এই দেখুন না মশাই, মিথ্যা কইব কেন?"

খুড়ো হাতে টিকিট লইয়া পড়িতে পড়িতে যেন অজ্ঞান হইয়া যাইবার মতো হইয়া পড়িল, অতি ক্ষীণ অভিনয়ের স্বরে বলিল…"অ্যাঁ! সত্যই সখা জাম্বুবান চললেন আমার! অ্যাঁ!—"

লোকটা প্ল্যাটফরমে নামিয়া একরাশ অশ্রাব্য গালাগালি দিতে দিতে চলিয়া গেল। তাহাতে আরও একটা প্রবলতর হাসি উঠিল মাত্র। থামিলে খুড়ো বলিল—"একটু চটে না গেলে জমে না। তা হঠাৎ নেমে গেল যে বেটা ঠিক জমে ওঠবার মুখটিতে—"

আমার পানে একটা আড় কটাক্ষ করিল ; তাহার পর উঠিতে উঠিতে বলিল—'আমি এবার যাই ও গাড়িতে—তোরা থাক লক্ষ্মীটি হয়ে! বখামি না করে বরং কিছু তত্ত্বকথা শোন, পরকালে কাজ দেবে।”

আর একবার আমার দিকে কটাক্ষ হানিল। একটা তুমুল কলরব উঠিল, কয়েকজন ধরিয়াও ফেলিল—“না খুড়ো, তুমি গেলে চলবে না, তুমি গেলে আমরা অনাথা হব খুড়ো!···একি বাবা, নিজেও শেষকালে উল্টো গাওনা ধরলে!—দর বাড়াচ্ছ কেন খুড়ো!···”

খুড়ো হাসিয়া বলিল—“না রে, আমার কাছে সব—টাকাকড়ি, টিকিট বিলকুল বুড়ো আমার কাছে রেখে দিয়েছে, এমন কি ওদের সেকেণ্ড ক্লাসের পাঁচখানা পর্যন্ত।”

পকেটে ব্যাগটা বাজাইয়া দিল।

সবাই আবার চিৎকার করিয়া উঠিল—“ব্যাগ কি তোমার আমরা কেড়ে নিচ্ছি?···সে হবে না খুড়ো—এই তো পাশের গাড়িতে রয়েছে বাপ।”

খুড়ো যেন জ্বালাতন হইয়া পড়িবার ভান করিয়া হাসিয়া বলিল—“তোরা বুঝছিস না, বুড়ো ওদিকে হেদুচ্ছে ; ও-গাড়িতেও এক মেড়োকে নিয়ে দিব্যি জমিয়ে আনছিলাম, তোরা মাঝখানেই গিয়ে···”

কলরবটা বাড়িয়া উঠিল—“তুমি ঠিক দর বাড়াচ্ছ খুড়ো—আমরা সত্যাগ্রহ করব?—”

আমি ভাবিয়াছিলাম বরকর্তাকে গিয়া বলিব ; সেও এই দলের দেখিয়া কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় নিতান্ত হন্তদন্ত হইয়া একটি লোক দোরের হ্যাণ্ডেলটা ধরিয়া ব্যস্ত মিনতির স্বরে বলিল—“বাবুরা, একটু জাগয়া দিন, আমি দাঁড়িয়েই থাকব।”

আমি অপরিসীম বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। লোকটার কপালে তিলক, নাকে একটি রসকলি, গলায় তুলসীর কণ্ঠী ; নিচে বোধ হয় একটা পিরান আছে, তাহার উপর একটা মোটা মটকার চাদর জড়ানো, পায়ে কটকী চটি।

দরজার কাছে যে দাঁড়াইয়াছিল, ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—“কি খুড়ো?”

খুড়ো ভিতরের দিকে ছিল, চোখ টিপিয়া ঘাড়ে একটা ঝাঁকানি দিল, তাহার পর চাপা গলায় বলিল—“আরে আসতে দে বেটা,—বোষ্টম বাবাজি না হলে চটিয়ে সুখ!···”

“আসুন বাবাজি! আসুন, আসুন! কি সৌভাগ্য আমাদের আজ! আসুন আসুন।”

—বলিতে বলিতে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে দুই হাত প্রসারিত করিয়া আগাইয়া গেল।

আমি একটি নিশ্বাস মোচন করিলাম এবং এতক্ষণ পরে আমার মুখেও একটু হাসি দেখা দিল। হুইসিল দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

লোকটি উঠিয়া একবার অবোধ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া লইল, তাহার পর অপ্রতিভভাবে একটু হাসিয়া গাড়ির দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইতে যাইতেছিল, খুড়ো তাহার হাত দুইটা ধরিয়া গভীর মিনতির স্বরে বলিল—“ওকি প্রভু, আপনি দাঁড়িয়ে থাকলে আমরা কি করে বসব?—আসুন, আধ আঁচরে বসুন—”

লোকটি আরও অপ্রতিভভাবে হাসিয়া হাসিয়া বলিল—"না বাবুরা, আপনাদের সাথে কি আমি বসতে পারি? আমার টিকিসও থার্ট্‌ কেলাসের..."
খুড়ো সবার দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল—"ওগো, তোমরা সবাই শোন, প্রভুর আমার থার্ট্‌ কেলাসের টিকিস।—থার্ট্‌ কেলাস! থার্ট্‌ কেলাস।..."
কলরবের মধ্যে একজন গলা উঁচাইয়া বলিল—"আমাদের সব টিকিট প্রভুকে সমর্পণ করলাম, উনি আসুন।"
একটা নারকীয় কলরব উঠিল—"হাঁ, আসুন।...প্রভুর ভাবনা কি?—পাঁচখানা সেকেণ্ড ক্লাস, কুড়িখানা ইণ্টার ক্লাস টিকিস্‌ প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করছি।...আমরা বেঁচে থাকতে প্রভুকে কে কি বলিবে?"
খুড়োও জোর দিল, আরও দু'একজন সাহায্য করিল, টানিয়া ঠেলিয়া লোকটিকে একটা কোণে সবচেয়ে ভাল জায়গাটিতে আনিয়া বসাইল। খুড়ো একেবারে পাশটিতে বসিল।
আবার সেই ব্যাপার চলিল। আগেকার লোকটির মতো না হোক, তবুও বেশ গোলগাল চেহারা লোকটির। খুড়ো তাহার বাহু, কাঁধ টিপিয়া টিপিয়া বলিল—"আহা কি নরম!—মালপো সাঁটিয়ে সাঁটিয়ে প্রভুর আমার সমস্ত শরীরখানি মালপো হয়ে উঠেছে! কোথায় আশ্রমটি প্রভুর? গিয়ে দিন কতক থাকতে হবে।"
'আমাদেরও সঙ্গে নিয়ো খুড়ো, মালপো আর মালসাভোগে!'-



লোকটা কিন্তু চটার ধার দিয়াও যাইতেছে না, অমন করিয়া ঠেলিয়া আনার মধ্যেও নয়, টীকা-টিপ্পনীর মধ্যেও নয়। সেই মৃদু হাসি আর অপ্রতিভ দৃষ্টি লইয়া সত্যই বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের সঙ্গে বসিয়া আছে। বলিল—"মালপো মালসাভোগ কোথায় পাব বাবুরা? গরীব গেরস্ত মানুষ—আমি আশ্রমই বা কোথায় পাব—মালপোই বা কোথায় পাব?..."
খুড়ো হঠাৎ সরিয়া বসিল, বেঞ্চের উপর পা দুইটা তুলিয়া লোকটির গায়ে পিঠ দিয়া কীর্তনের ঢঙে গাহিয়া উঠিল—"ওগো এই সেই আশ্রম পেয়েছি! এই সে আমার শ্যামের কুঞ্জ—এই সে আশ্রম পেয়েছি—আমি নড়ব না গো—আমায় একটু তোরা গুড়ুক দেগো—আমি না গো গো!..."

নারকীয় উল্লাসের মতো তিন-চারজন সিগারেট আর দেশলাই বাড়াইয়া ধরিল। খুড়ো একটা ধরাইয়া, ধুঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে আঁকর জুড়িয়া জুড়িয়া গাহিতে লাগিল—"হও যদি নিষ্ঠুর প্রিও, তোমার কুঞ্জের ভাড়া নিও, আমি নড়ব না গো—তুমি কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে নিও—আমি না ছোড়ব এ মিলন কুঞ্জো—ও-ও-ও !..."

লোকটি কোণ-ঠাসা হইয়াই ছিল, যতটা পারিল আরও গুটাইয়া সুটাইয়া বসিল। খুড়ো পিঠ দিয়া আরও চাপিয়া ধরিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কীর্তন গাহিতে লাগিল। কোন রকমে চটাইবার চেষ্টা ; বুঝিতে পারিতেছে ভাঁড়ামিতে একঘেঁয়েমি আসিয়া পড়িতেছে, না চটাইলে হাসির খোরাক জোগানো দুষ্কর হইয়া উঠিবে। দু'একবার আমার পানেও চাহিল, বেশ বুঝিতেছি অভাবে যদি আমিই চটি তো এবার আমার লইয়া পড়িতে ওর বাধিবে না। আমার আর সে সুযোগ দিবার প্রয়োজন নাই, চুপটি করিয়া নিজের জায়গায় বসিয়া দেখিতে লাগিলাম।

গাড়ির দৌড়টা এবার বড়,—ব্যাণ্ডেল ছাড়িয়া একেবারে বর্ধমানে থামিবে। মিলন হইল, মাথুর হইল, খুড়ো কখনও সাজিল রাধা, কখনও সাজিল বৃন্দা, শ্রীকৃষ্ণের নাক টিপিয়া, দাড়ি ধরিয়া অত্যাচারের চূড়ান্ত করিল। শেষে "তোর পীতধড়া কেড়ে লব—" বলিয়া তান ধরিয়া মটকার চাদরের খানিকটা পর্যন্ত টানিয়া লইয়া নিজের গায়ে জড়াইয়া লইল।

স্টেশনের পর স্টেশন ছাড়াইয়া গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে। এদিকে হুল্লোড়ের এতটুকু বিরতি নাই। লোকটা কিন্তু চটিল না, সেই একভাবে, অসীম ধৈর্যে গুটাইয়া বসিয়া রহিল, মাঝে মাঝে শুধু একটা মিনতি, একটা বিনয়—'আমাকে নিয়ে কেন ?—আমি আপনাদের পায়ের ধুলোর যুগ্যিও নয়, গরীব বোষ্টম ..'

আমি দৃষ্টি যতটা সম্ভব সূক্ষ্ম করিয়া লইয়া নিজের কোণটিতে বসিয়া দেখিয়া যাইতেছি। হ্যাঁ, ধৈর্য্য বলিতে হয় তো এই একেই !

শ্রীরামপুর থেকে বর্ধমান—হাসি ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছে, এর পরে বোধ হয় চাদরটা একেবারে টানিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য রসিকতা খুড়োর হাতে ছিল না, কিন্তু সেটুকু বাকি রহিয়া গেল। বর্ধমান আসিয়া গেল, এবং বাবাজি অনুনয়-বিনয়ের সঙ্গে চাদরটা ছাড়াইয়া লইয়া নিজের গায়ে জড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এইখানে নামিয়া তাহাকে কাটোয়ার গাড়িতে চড়িতে হইবে। একটা খুব হৈ-হৈ হইল আবার—খুড়ো চিৎকার করিয়া ঘন ঘন মূর্ছা যাইতে লাগিল। অন্য সবাই মিনতি করিয়া, জোর করিয়া বাবাজিকে ধরিয়া রাখিবার অভিনয় করিল, তাহারই ভিতর একই ধরনের হাসি লইয়া বিনয়বচন আওড়াইতে আওড়াইতে লোকটা নামিয়া প্ল্যাটফরমের ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

আমি আমার সুটকেসটা লইয়া সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়াছিলাম, ধরিলাম গিয়া একেবারে

বাহিরে, যেখানে ঘোড়ার গাড়িগুলি দাঁড়ায়। বলিলাম—"তোমার সঙ্গে একটা দরকারী কথা আছে, একটু আমার সঙ্গে আসতে হবে।"

লোকটা এরই মধ্যে বেশভূষা অনেকটা বদলাইয়া ফেলিয়াছে, থতমত খাইয়া একটু মুখের পানে চাইয়া রহিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল, "আমায় বলছেন? কেন?"

বলিলাম—"সেটা এখানে বললে ভাল হবে কি?"

একটু বিস্মিতভাবে চাহিল, বলিল—"বাঃ, কেন মশাই! . আপনাকে তো চিনি না।" কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিল। আমি সদর রাস্তায় একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন আধ-অন্ধকার জায়গায় গিয়া দাঁড়াইলাম। নির্জন, অথচ ডাকিলেই লোক জোটান যায়।

বলিলাম—"তুমি আমায় চেন না, কিন্তু আমি চিনি,—এর আগে তোমায় দেখি ধানবাদে, একটি সোনার ঘড়িসুদ্ধু রেলওয়ে পুলিশ তোমায় প্ল্যাটফরম দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল; তিন বছর আগেকার কথা…"

লোকটা আবার উল্টা চাপ দিবার চেষ্টা করিল—"বাঃ, তুমি ভদ্দর-লোক সেজে রাহা-জানি করবার মতলবে আছ—ভয় দেখিয়ে? বাঃ, এক্ষুণি আমি লোক জড় করব—"

বলিলাম—"তা করবে না, ভয় নিজেরই আছে তোমার। তোমার পকেটে কুড়িখানা ইণ্টার ক্লাস, পাঁচখানা সেকেণ্ড ক্লাস আর বাহাত্তরটি নগদ টাকাসুদ্ধু একটা ব্যাগ আছে যাদের ব্যাগ তাদের গাড়ি এখনও ছাড়েনি—ডাকবে লোক? তা হলে আর আমায় কষ্ট করে চেঁচাতে হয় না।"

লোকটা হাঁ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম—"ভয় নেই; আজ কিছু বলছি না, তবে ব্যাগটি বের করো। আজ হজমটা আর করতে পারবে না, বাজে মেহনৎ হোল। নাও চট্‌পট্; আমায় সত্যিই কাটোয়া লাইনে যেতে হবে।"

ব্যাগটা বাহির করিল। তাহার পর মুখের পানে চাহিয়া একটু আমতা-আমতা করিয়া বলিল—"আধাআধি…আসুন—যখন ভাই বেরাদারির মধ্যেই…"

ব্যাগটা লইয়া দশ টাকার একটি নোট হাতে দিয়া বলিলাম—"এটা তোমার ভাড়া, বাকিটা আর একজনকে পাঠাতে হবে। পিঠে ঠেস দেওয়ার জন্যে বলছিল না ভাড়া দেবে? তা এই তোমার ভাড়া—যাও এবার লক্ষ্মী ছেলেটির মতন…"

বাহাত্তর টাকার কথাটা ভাঁওতা আমার, গুণিয়া দেখিলাম বোধ হয় রাহাখরচ ইত্যাদি বাবদ তেত্রিশ টাকা তেরো আনা পয়সা রহিয়াছে। পরদিন মনিঅর্ডার করিয়া বাকি টাকাটা হৃদয়নাথ মালাকারের কাছে পাঠাইয়া দিলাম—গ্রাম বাসুলী, পোষ্ট অফিস বংশবাটি, জেলা হুগলী।

তবু এখনও গায়ের জ্বালা মেটে নাই; অনুতাপ হওয়া তো পরের কথা।



স্বরাজ রেলে

কুমুদবন্ধু বি. এ. রেলওয়ের পার্বতীপুর স্টেশনে কাজ করিতেছিলেন। চেষ্টা-চরিত্র করিয়া বদলির হুকুমগুলো রদ করাইয়া সতের বৎসর এক জায়গায় কাটিল ; দু-পয়সা পাইতেন, শহরে জায়গা-জমি কিনিয়া বাড়ি বাগান করিয়া বেশ গুছাইয়া লইয়াছিলেন, এমন সময় গোলমাল আরম্ভ হইল। কলিকাতা, ঢাকা, নোয়াখালি। তাহার পর পার্বতীপুরেও দু-একটা মাঝারি গোছের ধাক্কার সাক্ষাৎ পরিচয় দিয়া গেল। তাহার পর আসিল স্বাধীনতার সঙ্গে দেশ-বিভাগ এবং সেই সঙ্গে লোক-বিভাগও। কর্মচারীদের বলা হইল তোমরা কে কোন্‌দিকে থাকিতে চাও বাছিয়া লও। পরাধীনতার আমলেই পাকিস্থানী স্বাধীনতার নমুনা পাওয়া গিয়াছিল, কুমুদবন্ধু হিন্দুস্থানের সপক্ষে নাম লিখাইলেন। কিছুদিন পত্রাচারে কাটিল, তাহার পর যখন এদিকেও অতিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, ওদিকেও আশার কোন লক্ষণ নাই, এমন সময় যুক্তপ্রদেশের একটি বড় রেল অফিস হইতে ডাক পড়িল, পার্বতীপুরের সতের বৎসরের বাস উঠাইয়া কুমুদবন্ধু সপরিবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নিতান্ত কম নয়—নিজে, স্ত্রী, দুইটি কন্যা, চারিটি পুত্র—বছর দশের মধ্যে ; বিধবা এক দিদি, তাঁহার একটি ছোট দৌহিত্র।

আসিয়াই একেবারে অকূলে পড়িলেন।

প্রথম সপ্তাহটা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কাটাইতে হইল। তাহার পর ওয়েটিং-রুমের সামনের বারান্দায়। দিদি মহামায়া খুব শক্ত মেয়েমানুষ, কিন্তু তিনিও এক সপ্তাহের অধিক অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তবে লড়াইয়ের জন্য পা পুঁতিবার একটা জায়গা পাইলেন এবং দুইদিন পরেই ওয়েটিং-রুমের একটি কোণ স্বীয় পরিবারের জন্য দখল করিলেন।

কোন ব্যবস্থা নাই, অসংখ্য লোক পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আসিয়া পড়িয়াছে প্রতিদিনই আরও আসিতেছে। কাহারা ডাকিতেছে, কি উদ্দেশ্যে, কিছুরই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। সকালবেলায় উঠিয়া মহামায়া তোলা উনানে ওয়েটিং-রুমের মধ্যেই রান্নার ব্যবস্থাটা করিয়া ফেলেন, দুইটি কোনরকমে নাকেমুখে গুঁজিয়া কুমুদবন্ধু সেই যে বাহির হন, ফেরেন একেবারে সন্ধ্যার সময়। ইহার মধ্যে কত আফিস ঘোরেন, কত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন—কোন ফলই হয় না। এই রেলটার

অব্যবস্থার কথা পূর্বে শোনা ছিল, কিন্তু সেটা যে এ-ধরণের কিছু হইতে পারে এমন জানা ছিল না। মাসখানেক ওয়েটিং-রুমে কাটিল, পশ্চিমের শীত বেশ ভাল করিয়া জাঁকিয়া আসিতেছে, দিদির মেজাজ অত্যন্ত বিগড়াইয়া যাইতেছে, প্রত্যহই ওয়েটিং-রুমটায় রান্নাঘরের ধোঁয়া জমিয়া উঠিলে স্টেশন-মাস্টার থেকে স্টেশনের যত কর্মচারী আসিয়া দরজার বাহিরে জমা হয়, ওদিকে মহামায়াও আসিয়া দাঁড়ান, গাছকোমর বাঁধা, হাতে খুন্তি ; মুখে তুবড়ি ছুটতে থাকে—"ড্যাকরারা, অলপেয়েরা, ডেকে এনে না দেবে চাকরি, না দেবে থাকবার জায়গা, ঐ ম্লেচ্ছ কাপড়-চোপড় নিয়ে আমার রান্না-ঘরের চৌকাঠের এদিকে পা দিলে একধার থেকে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব ! আয় না, হেম্মৎ থাকে, আয় !"

এংলো-ইণ্ডিয়ান স্টেশনমাস্টার একবার দায়ে খালাস হওয়া গোছের চেষ্টা করিয়া সরিয়া পড়ে এদের 'স্বরাজ' পাওয়ার সঙ্গে ও বেচারাদের দুর্দিন পড়িয়াছে ; এখন সবই সম্ভব, খুন্তিপেটা খাইলেও 'আহা' বলিবার কেহ নাই। দেশী কর্মচারীরাও একে একে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়, মহামায়াই রোজ জেতেন, কিন্তু এভাবে আর চলে না। কুমুদবন্ধুর কতবার মনে হইয়াছে আবার পার্বতীপুরে গিয়াই যেমন করিতেছিলাম সেইরূপ চাকরি করি, কিন্তু কয়েকবারই সন্ধান লইয়া জানিয়াছেন ও-পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এদিকে এরা মুসলমানদের জন্য দুয়ার খুলিয়া রাখিলেও, ওদিকে ওরা অর্গলিত করিবারও হাঙ্গাম রাখে নাই, দুয়ারের জায়গায় দেয়াল তুলিয়া দিয়াছে, আর কোন আশাই নাই।

শীত প্রচণ্ড হইয়া আসিল, হাতের পয়সাও ফুরাইয়া আসিয়াছে, অবশেষে তিক্ত-বিরক্ত হইয়া কুমুদবন্ধু চাকরির আশা ত্যাগ করিয়া নিতান্তই অদৃষ্টের ওপর নিজেদের ছাড়িয়া বাড়িতে ফিরিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছেন, এমন সময় পার্বতীপুর অফিস ঘুরিয়া তাহার হাতে একখানি বড় খাম আসিয়া পড়িল। খুলিয়া দেখিলেন—তাহার চাকরি হইয়াছে এই স্টেশনেই, হিসাবের সেরেস্তায় ; বাসাও ঠিক হইয়াছে, একখানি চার-চাকার, অর্থাৎ সবচেয়ে যা ছোট, সেই রকম মালগাড়ি। কুমুদবন্ধু ওটাকে লেখা-পড়া করাইয়া আট-চাকার করাইয়া লইলেন, এর পেছনে এংলো-ইণ্ডিয়ান স্টেশনমাস্টার ও অন্যান্য কর্মচারীদের যে অক্লান্ত চেষ্টা ছিল এটুকু না বলিলে অধর্ম হয়, অবশ্য তাহার পিছনে ছিল মহামায়ার রান্নার খুন্তি আর ক্ষুরধার জিহবা।

ওয়েটিং-রুম ছাড়িয়া সকলে নূতন সচল বাসায় গিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন।

[২]

একেবারেই অভিনব ধরণের পল্লী। বিরাট স্টেশন প্রাঙ্গণের একধারে এমন প্রায় দেড়শখানা মালগাড়ি, চার-চাকার, ছয়-চাকার, কয়েকখানা আট-চাকারও, ঐ এক একখানা বাড়ি। অসহ্য কষ্ট, জায়গা নাই, দিনের বেলায় তাতিয়া ওঠে, শীতের দিন বলিয়া আরামের না হইলেও খুব বেশি কষ্টও হয় না, কিন্তু রাত্রে অসহ্য। প্রায় সবই

পূর্ববঙ্গের লোক, পশ্চিমের নিদারুণ শীতে যেন জমিয়া যাইবার মতো হয়। কয়লাও প্রচুর নয়। সন্ধ্যার একটু আগে প্রত্যেক বাসার সামনে সারি সারি তোলা উনুনে আগুন জ্বলিতে থাকে, সমস্ত পাড়াটা ধুমে ধুম্রাকার হইয়া ওঠে; উনুন ধরিলেই সেগুলো গাড়ির মধ্যে উঠিয়া যায়, তাহাতে রান্না, তাহাতেই যতটা সম্ভব তাপ সঞ্চয়। শেষ রাত্রে শীতে আর কাহারও ঘুম হয় না, সবাই গুটিসুটি মারিয়া বসিয়া থাকে।

তবুও মানুষ পরের দুরাবস্থা দেখিয়া আশ্বাস পায়, শত শত লোক প্ল্যাটফরমে পড়িয়া আছে, এ তবুও তো একটা আচ্ছাদন। দিনের বেলা এই দুঃখের জীবন থেকে যতটা পারে রস নিংড়াইয়া লয় লোকেরা, ছেলেরা হুটোপুটি করে, গৃহিণীরা বৌ-ঝিয়েরা এ-বাসা সে-বাসা ঘুরিয়া আলাপ করিয়া বেড়ায়, কোয়াটার্সের জন্য কোথায় ইট পড়িতেছে সেই সব আলোচনা লইয়া আশায় বুক বাঁধে। মানুষের সবই সয়, তা ভিন্ন এটা বিশেষ করিয়া সহিবারই যুগ, একটা কল্পনার ভবিষ্যৎ গড়িয়া লইয়া মানুষ কল্পনাতীত এই বাস্তব বর্তমানকে ভুলিতেছে। কুমুদবন্ধু পরিবারও ধীরে ধীরে এই দলে মিশিয়া যাইতেছে। পাঞ্জাবে যা কাণ্ড হইতেছে সে হিসাবে এতো স্বর্গ, পার্বতীপুরের কথা আর ভাবাও যায় না।

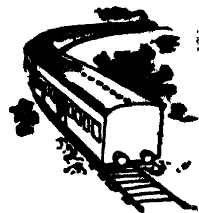
কিন্তু এ স্বর্গও কপালে বেশি দিন টিকিল না।

প্রথমটা বাদ সাধিল পয়েণ্টস্‌ম্যান রামদিন, পাইলট ড্রাইভার করিম শেখের সহযোগিতায়। অবশ্য ভুল করিয়াই, তবে সে ভুলেও এই রেলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বাসাগুলি স্টেশন-প্রাঙ্গণের নিতান্ত একদিকে পড়িয়া আছে বটে, তবে একেবারে যে স্থানু এমন নয়। লাইনের ওপর মাঝে মাঝে চলাফেরা করে। প্রত্যহ নূতন বাসা আসিতেছে, তাহাদের জায়গা দিতে হয়, রোজই দু'খানা করিয়া পুরানো বাসা স্থানান্তরিত হইতেছে। হয়ত কেহ অন্য স্টেশনে বদলি হইল, হয়ত কোন বাসার অধিকারী পাকা কোয়ার্টার্স পাইল, তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিতে হয়। ডিপার্টমেণ্টে হুকুম দেয়, পয়েণ্টস্ ম্যানের নির্দেশে পাইলট ইঞ্জিনে কাজটা সম্পন্ন করে। ছেলে-মেয়েরা, বধু-গৃহিণীরা মাঝখান থেকে খানিকটা গাড়ি চড়ার আনন্দ উপভোগ করিয়া লয়। এমনও হয়, কর্তা অফিস থেকে আসিয়া দেখেন বাসা নাই। হয়ত লাইনের ভেতরের দিকের একটি বাসা অন্য স্টেশনে বদলি হইয়াছে, তাঁহার বাসাটিকে পথ ছাড়িয়া অন্য লাইনে একটু-সরিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। খানিকক্ষণ পরে পাইলট ইঞ্জিন আবার ল্যাজে করিয়া আনিয়া রাখিয়া গেল।

এই রকম কিছু একটা ব্যাপার কুমুদবন্ধুর বাসা লইয়াও হইতেছিল সেদিন সন্ধ্যাবেলায়।—

পয়েন্টস্‌ম্যান রামদিনের ডিউটির শেষ দিক এটা। এইটুকু শেষ করিয়া নিজের বাসায় যাইবে, এক লোটা ভাঙ্ তৈয়ার আছে সেবন করিয়া দড়ির খাটিয়ায় গা এলাইয়া দিবে। একটু ব্যস্ত আর অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে। পাইলট করিম শেখের ডিউটির এই

আরম্ভ, একটু বাঁধামাত্রার নেশা করিয়া কাজে নামে, কাজ-করিতে করিতে সেটা কাটিয়া যায়। ঠিক কাটার অবস্থাটা এখনও দাঁড়ায় নাই।



কুমুদবন্ধু অফিস থেকে ফিরিয়া একটু জলযোগ করিয়া এই সময়টা ক্লাবে যান, সেখানেই গেছেন। শীত বেশ জমিয়া আসিয়াছে। লোহার উনুনটা ধরিয়া গেছে, সেটাকে গাড়ির মধ্যে তুলিয়া দু'দিককার ঝাঁপ বন্ধ করিয়া রান্নার আয়োজন হইতেছে, এমন সময় রামদিনের গলার 'হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!' শব্দ হইল এবং পাইলট ইঞ্জিন আসিয়া আস্তে আস্তে গাড়িটার সঙ্গে যুক্ত হইল। মহামায়া দরজার ফাঁক দিয়া মুখটা বাড়াইয়া বলিলেন—"কে রামদিন? আমরা রান্না আরম্ভ করেছি, আস্তে নাড়াচাড়া করতে বলো ড্রাইভারকে।"

"আপনি মজেসে রসুই করুন মাইজি, কুছু ভয় নেই"—বলিয়া রামদিন কাপলিংটা বসাইয়া দিল, ইঞ্জিন ধীরে ধীরে বাসা লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

খানিকটা দূরে অন্য একটা লাইনে গাড়িটাকে দাঁড় করাইয়া ইঞ্জিনটা আবার এই লাইনে প্রবেশ করিল, কুমুদবন্ধুদের পাশের গাড়িটা মুড়িয়া আবার সেইভাবে বাহির করিয়া লইয়া প্লাটফর্মের কাছাকাছি একটা লাইনে রাখিয়া আসিল। অন্য দুই-তিনটি লাইনে প্রবেশ করিয়াও গোটাকতক গাড়ি লইয়া ঐ রকম টানা-পোড়েন করিল; ততক্ষণে রাত্রি হইল, রামদিনের ডিউটি শেষ হইয়া আসিল, পরের পয়েণ্টসম্যান রামচরিত্তরকে কোথার কোন্ গাড়ি যাইবে, কোন্ গাড়ি বাহির হইবে সব বুঝাইয়া দিয়া নিজের কোয়ার্টার্সে চলিয়া গেল।

[৩]

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় এই মাস দুয়েকের অভ্যাস মত ইয়ার্ডের বিদ্যুতের আলো আর টর্চের সাহায্যে লাইন ডিঙাইয়া ডিঙাইয়া যথাস্থানে আসিয়া কুমুদবন্ধু মেজ ছেলের নাম ধরিয়া ডাকিলেন "ওবিনেশ?"

অবিনাশ দোরের কাছে কিছু জিনিসপত্র থাকিলে সরাইয়া লইবে, তাহার পর কুমুদবন্ধু গাড়িতে উঠিবেন, এই হইতেছে প্রাত্যহিক ব্যবস্থা, কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। দারুণ শীতে, আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া হি-হি করিতে করিতে কুমুদবন্ধু আবার হাঁকিলেন—"ওবিনেশ! শুনছিস না? জিনিসগুলো সরিয়ে নে, উঠব—"

বন্ধ দরজা খুলিয়া উঠিতে যাইবেন, ভিতর থেকে একটি পশ্চিমা ছেলে বলিল—"ই গাড়ি নেহি।"

"তবে!"—বলিয়া কুমুদবন্ধু তিন হাত পিছাইয়া আসিলেন। ঠাহর করিয়া দেখিলেন এটা তাহার পাশের গাড়িটা, পাশাপাশি তিনটা আটচাকার লম্বা গাড়ি ছিল, তাই ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন দারুণ শীতের এই জবড়জঙ্গ অবস্থায়। সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু শীত ছাড়িয়া গিয়া কালঘাম ছুটিল—তাহা হইলে তাঁহারটা কোথায়?

সেই ছেলেটিকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আমারটা কোথায় তা হলে?"

"শাণ্টিংমে লে গিয়া।"

"কখন?"

"সামকো!"—অর্থাৎ সন্ধ্যার সময়।

"কোথায়? কোন দিকে? এখনও ফেরে নি কেন?"

ছেলেটি তিনটি প্রশ্নের কোনটিরও উত্তর দিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত কুমুদবন্ধুর মুখ দিয়া কোন প্রশ্ন সরিল না। এরকম ব্যাপার এখানে কয়েকবার হইয়াছে, একবার তিনিও ভুক্তভোগী, কিন্তু সে কয়েক মিনিটের জন্য, হদ্দ আধঘণ্টা। অফিস হইতে আসিয়া দেখেন বাসা নাই, তাহার পর তখনই আবার পাইলট ইঞ্জিন রাখিয়া গেল। এযে সন্ধ্যা থেকে উধাও, রাত ন'টাতেও দেখা নাই!

তৃতীয় গাড়িটা একজন বাঙালীর, এই অফিসেই কাজ করেন, কুমুদবন্ধবাবু সামনে গিয়া ডাকিলেন—"গোপেশবাবু!"

গাড়ির দরজা খুলিয়া গোপেশবাবু মুখ বাহির করিলেন।

"আমার গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না মশাই।"

"তার মানে

"আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনলাম সন্ধ্যের সময় শাণ্টিংএ নিয়ে গিয়েছিল—নিশ্চয় মিশিরজীর গাড়ীটা বের করবার জন্যে, তাঁর তো বদলি হয়ে গেল,—সেই থেকে এখনও পর্যন্ত ফিরে আসে নি—সব নেশাখোরের কাণ্ড, কারুর তো নজর নেই এদিকে—"

"কাছাকাছি ইয়ার্ডটা দেখেছেন?"

না, দেখি নি এখনও, এই শুনলাম সুরুজপ্রসাদবাবুর ছেলের কাছে।"

"দাঁড়ান, আসছি।"

ওভারকোট—র‍্যাপার—কম্ফর্টারে আপাদমস্তক ঢাকিয়া গোপেশবাবু নামিয়া আসিলেন। দুইজনে কাছাকাছি সমস্ত ইয়ার্ড খুঁজিলেন, তাহার পর দূরেও। পয়েণ্টস্ম্যান, পাইলট ড্রাইভার দুইজনকে প্রশ্ন করিলেন, গাড়ির কিন্তু কোন হদিস পাওয়া গেল না। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক হয়রান হইয়া অবশেষে ইয়ার্ডের এক প্রান্তে দেখা গেল একটি আট-চাকার গাড়ি একক দাঁড়াইয়া আছে। আশায় বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল, তাহার পর দুইজনে আগাইয়া নম্বরের উপর টর্চ ফেলিয়া দেখেন মিশিরজীর

গাড়িটা। ডাকাডাকি করিয়া মিশিরজীকে তুলিলেন, খবর পাইলেন পার্সেল এক্সপ্রেসের পেছনে তাঁহার গাড়িটা আজ জুড়িয়া তাঁহার নূতন কর্মস্থানে পেঁছাইবার কথা ছিল, কিন্তু জোড়ে নাই। কারণটা জিজ্ঞাসা করায় এই রেলওয়েটাকে একটা কুৎসিত গালাগাল দিয়া বলিলেন—কারণ তিনি জানেন না, শুধু এইটুকু জানেন এ রেলে সবই সম্ভব ; যবে খুশি হইয়া যাইবে, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছেন।

কি সর্বনাশ যে হইয়াছে বুঝা গেল। দুইজনে স্টেশনে ছুটিলেন। স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে দেখা করিয়া জানাইলেন—তাঁহার গাড়িটা ভুলক্রমে মিশিরজীর গাড়ির পরিবর্তে সাতটা বাইশের পার্সেল এক্সপ্রেসে যুক্ত হইয়া স্টেশন ছাড়িয়া গিয়াছে, সন্ধান লইয়া সেটাকে আটকানো দরকার। সমস্ত ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত বলিয়া গেলেন।

এ ধরনের বা এর চেয়েও গুরুতর এত ব্যাপার নিত্য হইতেছে এ-রেলে যে, স্টেশন মাস্টারের মুখে বিশেষ কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। অলসভাবে টেলিফোনটা তুলিয়া লইয়া ডাকিলেন—"হ্যাল্লো কনট্রোল !—"

সাড়া পাওয়া গেলে প্রশ্ন করিলেন—"সেভেনটি সিক্স ডাউন পার্শেল এখন কোথায় ?"

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটা, গাড়িটা সব জায়গায় ধরে না, চার ঘণ্টায় অনেকগুলি স্টেশনই পার হইয়া গিয়াছে, কনট্রোল একটু অনুসন্ধান করিয়া সঠিক অবস্থানটা জানাইল—রাস্তায় আছে আর মিনিট পাঁচেক পরেই একটা বড় স্টেশনে পেঁছিবে।

স্টেশন মাস্টার ব্যাপারটা জানাইলেন—অমুক নম্বরের গাড়ি অমুক স্টেশনে যাইবার কথা, তাহার স্থানে ভুলক্রমে অমুক নম্বরের গাড়ি চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে খুলিয়া লইয়া পরবর্তী এক্সপ্রেস বা কোন প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে জুড়িয়া পাঠাইয়া দিতে হইবে। নির্দেশটুকু দিয়া ফোন ছাড়িয়া তিনজনে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া রহিলেন। একটু যে গল্প হইল তাহাতে স্টেশন মাস্টার জানাইলেন—"ও গাড়ি এখন বিশ-বাঁও জলে।"

"কেন ?"

একটু থামিয়া নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলিলেন—"এই দেখুনই না, এটা কী রেল ভুলে যাচ্ছেন যে, এর নামই পড়েছে ওল্ড টায়ার্ড (old tired) রেল—আসল নামের অক্ষর দুটো ধরে।"

এমন সময় টেলিফোনটা বাজিয়া উঠিল, স্টেশন মাস্টার তুলিয়া লইয়া সাড়া দিলেন—"হ্যালো—ইয়েস—তাই নাকি ?—তা হ'লে ?—বেশ, পার্টি বসে আছেন ততক্ষণে—খোঁজ নিয়ে বলুন।"

টেলিফোনটা রাখিয়া দিয়া কতকটা বিজয়ের হাসি হাসিয়াই বলিলেন—"ঐ নিন, সে গাড়ি পেঁছোয়ই নি ও স্টেশনে। আপনাকে বললাম না ?"

"পেঁছোয় নি ! তা হলে ?"—কুমুদবন্ধু একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

"থামুন, খোঁজ নিচ্ছে। এ স্টেশনে আবার গার্ডের বদলি হ'ল, আগেকার গার্ড রানিং রুমে চলে দিয়েছে, তার কাছে লোক পাঠানো হয়েছে।"

"কিন্তু সে তো সমস্ত কাজ বুঝিয়ে যাবে—"

"বোধ হয় এটা ছেড়ে গিয়েছে—রেলটা যে কি ভুলে যাচ্ছেন যে আপনি—এর আগেকার নাম রেখেছিল—বদমাইস, না লায়েক—"বি. এন. ডব্লিউ (B. N. W.) থেকে। সেও—"

এমন সময় টেলিফোনে শব্দ হইল···স্টেশন মাস্টার আবার তুলিয়া লইলেন—

"হ্যাল্লো—আচ্ছা—বেশ—আচ্ছা—আচ্ছা—"

টেলিফোনটা রাখিয়া দিয়া সেই রকম নিরুদ্বেগ কণ্ঠে জানাইলেন টেলিফোনে বলিতেছে ···এ স্টেশন ছাড়িয়া পরের স্টেশনে পেঁছাইয়া গাড়ির শেষের দিকের মালগাড়ি থেকে কান্নাকাটি হট্টগোল ওঠে। স্টেশনের সবাই জড়ো হইয়া টের পায়—এক গাড়ির বদলে অন্য গাড়ি জুড়িয়া লইয়া চলিয়াছে পার্শেলটা। গাড়িটাকে কাটিয়া সাইডিঙে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এদিকে ও মুখো আর গাড়ি নেই, একেবারে শেষ রাত্রির দিকে এক্সপ্রেস, তাহাতেই জুড়িয়া ফেরৎ দেওয়া হইবে।

আর কিছুই তাহা হইলে করিবার নাই। বেশি দূর নয়, এদিক থেকে ধরিলে ছয়টা স্টেশন পরেই, কিন্তু ডাউনেরও কোন গাড়ি নাই যে, কুমুদবন্ধু গিয়া পরিবারের সঙ্গে মিলিত হন। মালগাড়ি থাকিলেও চলিত, কিন্তু খবর পাইলেন যে তাহাও আর নাই; একটা ছিল, মিনিট দশ হইল ছাড়িয়া গিয়াছে।

স্টেশনে মাস্টার আর একটা খবর দিলেন। এই ধরণের দুর্ঘটনার সম্প্রতি বাড়াবাড়ি হওয়ায় এর জন্য অফিসে একটা বিভাগই খোলা হইয়াছে। সকাল ছয়টা হইতে বসে; এক্সপ্রেসে যদি মালগাড়িটা আসিয়া না পড়ে কুমুদবন্ধু যেন অফিসেই খবর নেন, কেননা সকাল থেকে স্টেশন কর্মচারীদের হাতে কাজের চাপ, ইচ্ছা থাকিলেও এই রকম টেলিফোন ধরিয়া সাহায্য করিতে পারিবে না। অফিসটার সন্ধানও দিয়া দিলেন।

কুমুদবন্ধু একটু ভীত ভাবেই বলিলেন—"সকালের এক্সপ্রেসে নিশ্চয় এসে পড়বে—"

স্টেশন মাস্টার শুধু একটু মুচকি হাসিলেন, বলিলেন—"এসে পড়ে ভালই। আপনাকে আর অফিসে দৌড়োতে হবে না।"

[৪]

এক্সপ্রেসটা পেঁছিবার সময় পাঁচটা, সাতটায় আসিল। মালগাড়িটা নাই। কুমুদবন্ধু চারিটা থেকে আসিয়া বসিয়া আছেন, অবসন্ন শরীরে নূতন অফিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

একটি ছোট ঘর, মাঝখানে টেবিলের সামনে একজন অত্যন্ত স্থূল আধ-বুড়োগোছের ভদ্র বসিয়া আছেন, বাঙালই। অন্য একটি টেবিলের মুখোমুখি হইয়া দুই জন পশ্চিমা ছোকরা কেরানি, একজন টাইপিং লইয়া, আর-এক জন কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত রহিয়াছে। শীতের সকাল, তায় নূতন অফিস, এখনও অনেকে সন্ধানই জানে না তবুও কাউণ্টারে পাঁচ-সাত জন লোক ভিড় করিয়া রহিয়াছে।

কুমুদবন্ধু দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন—আমি রেলেরই লোক, এই স্টেশনেই থাকি, ভেতরে আসতে পারি কি ?"

"আসুন"—ভদ্রলোক টানিয়া কথাটা বলিয়াই কাশিতে আরম্ভ করিলেন, সেই অবস্থাতেই ডান হাতটা সামনের চেয়ারের দিকে বাড়াইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। গলাটা একটা কম্ফর্টারের ওপর র‍্যাপার জড়ানো, কাশিটা থামিলে দুটোকেই আরও টানিয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি ব্যাপার ?"

"একটা বড় বিপদে পড়া গেছে—ইয়ে পাকিস্থান থেকে এসেছি, আছি মালগাড়িতে, কাল সন্ধ্যেয় সেটা পার্শেল এক্সপ্রেসে—"

"টেনে নিয়ে গেছে ?—প্রাতর্বাক্যে বলা ঠিক নয়, কিন্তু আর আশা নেই—"

"আশা নেই কি মশাই !!"

ভদ্রলোক টানিয়া টানিয়া কথা বলেন, এদিকে একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব লাগিয়া আছে, তুড়ি দিতে দিতে হাই তুলিলেন, তাহার মাঝখানেই কাশি আসিয়া পড়িল, সব শেষ হইলে বলিলেন—"আত্মারাম, লষ্ট ওয়াগনস্-কা ফাইল সব উতারো তো।"

কুমুদবন্ধু লক্ষ্য করিলেন অফিস নূতন হইলেও ফাইলের গাদা লাগিয়া গেছে এরই মধ্যে। একজন কেরানি উঠিয়া কাঠের র‍্যাক্ থেকে এক থাক নামাইয়া আনিল ! ভদ্রলোক সেই রকম অলসকণ্ঠে বলিলেন—"ঐ দেখুন, বিশ্বাস না হয়—পঁয়ত্রিশখানা মালগাড়ি সমস্ত লাইনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মা-বাপ নেই। (Classification) ক্লাসিফিকেশন, আত্মারাম—"

"ট্রেন উইথ্ ফ্যামিলি হুজুর অলেমুন উইথ্ ফ্রেট, ফোরটিন্, এমপ্টি—না—আত্মারাম জানাল ফাইল দেখিয়া।

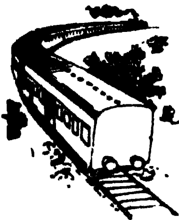
"ঐ নিন—দশখানা আপনার মত পরিবার নিয়ে, এগারখানায় মাল, বাকি খালি।—প্যাঁকাল মাছের মতন পিছলে পিছলে বেড়াচ্ছে সমস্ত লাইনে, ধরবার উপায় নেই। আজ খোঁজ পেলেন এই পাশের স্টেশনে, ধরবেন ক্যাঁক করে, কাল খবর একশ মাইল দূরে একটা সাইডিঙে পড়ে আছে—"

হাই তুলিয়া কাশিয়া কম্ফর্টার র‍্যাপার টানিয়া দিয়া বলিলেন—"খেলে কচুপোড়া ; বুড়ো বয়সে বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে এসে এক ছেঁড়া ন্যাতা হাতে দিয়ে...তারপর আর কিছু পেয়েছেন খবর, না ঐ পর্যন্ত !"

কুমুদবন্ধুর মুখ একেবারে শুকাইয়া গেছে, বলিলেন..."কাল রাত্তিরে খবর পাওয়া গেল এখান থেকে পাঁচটা স্টেশন-আগে একটা সাইডিঙে পড়ে আছে...এদিককার নামগুলোও মনে থাকে না—পার্শেলের ফার্স্ট স্টপেজ আর কি—ঠিক ছিল সকালের এক্সপ্রেসে জুড়ে নিয়ে আসবে, তা আসে নি।"

ভদ্রলোক অলসভাবে টেলিফোনটা তুলিয়া লইলেন, ডাকিলেন—হ্যালো কন্ট্রোল।—"সাড়া পাওয়া যাইতে আগাগোড়া সমস্ত খবরটা দিয়া গেলেন। তাহার পর টেলিফোনটা

রাখিয়া দিয়া বলিলেন—"খোঁজ নিচ্ছে।"
একটু যে সময় পাওয়া গেল তাহাতে নিজের দুঃখের কথা তুলিলেন—নাম অনুকূল ভাদুড়ী। রিটায়ার করিয়া বসিয়াছিলেন—ছোট মেয়েটির বিবাহ দিয়া এইবার দু'জনে কাশীবাসী হইবেন, আবার ডাকিয়া এই ফ্যাশাদ—হাতে পাত্র-টাত্র 'একটা ?—এই পেটে একটু বিদ্যে থাকে—কিছু জমি-জমা—নেহাত চাকরির ওপরই না ভরসা—চাকরির মুখ তো দেখাই যাইতেছে—
এমন সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। তুলিয়া বলিলেন—"হ্যালো।—আচ্ছা—ঠিক—" রাখিয়া দিয়া একটু বিজয়ের হাসি হাসিয়াই বলিলেন—"ঐ নিন, যা বলেছিলাম—সে গাড়ি ও স্টেশনে আর নেই—" "নেই—বলেন কি, আমি ভেবেছিলাম বুঝি পুলে···"
"নেই।—তার কারণ হয়েছে হাণ্ড্রেড টোয়েণ্টি সিক্স ডাউন গুডস্ রাত আড়াইটের সময় শাণ্টিং করতে করতে ভুল করে তুলে নিয়ে গেছে সেখান থেকে।"
"তার পর!"
"কোন স্টেশনে ড্রপ করলে খবর পেতে দেরি হবে, এক এক করে জিজ্ঞেস করবে তো প্রত্যেক স্টেশনে।"
বহু দূরে দুইটা স্টেশনের নাম করিয়া বললেন, মালগাড়িটা এখন সেই দুইটার মাঝখানে, ঘণ্টা দুয়েক তার কোন খবর নাই, হয়তো ইঞ্জিন ফেল করিয়া মাঝপথে দাঁড়াইয়া আছে।
তাহার পর একটু নিম্ন কণ্ঠে বলিলেন—"ফেলই কি করে সব সময় মশাই? মাঝপথে দাঁড় করিয়ে এটা ঠুকছে, ওটা ঠুকছে, ওদিকে ওয়াগন্ খালি করে মাল সরিয়ে নিচ্ছে—ট্রিক্স্ (Tricks)—আমরাই কিছু করতে পারলাম না।"
উপায় নাই, একবার অফিসে বাহির হইবার সময় ঐদিক হইয়া যাইতে বলিলেন—যত দূর সম্ভব খোঁজ খবর লইয়া রাখিবেন। মেয়ের বিবাহের কথাটা মনে রাখিতে বলিলেন, —"আমরা হলাম ভাদুড়ী—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ—বাগচি, সান্ন্যাল—মানে ভাদুড়ী ছাড়া আর যা হয়—ছেলেটির যেন খাওয়ার-পরবার একটু সংস্থান থাকে—"



[৫]

এগার দিন হইয়া গেছে গাড়ির কোন সন্ধান নাই; ঠিক যে সন্ধান নাই এমন নয়; পাওয়া যাইতেছে খবর, সব ব্যবস্থা ঠিক, আবার কি করিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে,

আজ এক জায়গায়, কাল হয়ত দেড়শ' মাইল দূরে। দিদির কাছ থেকে খান তিনেক চিঠিও পাইলেন। হতাশায় ভরা, আর গালাগালি—রেলওয়েকে, আর এমন রেলওয়েতে কাজ করার জন্য কুমুদবন্ধুকেও।

কুমুদবন্ধুও একেবারে আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। বার দুয়েক সব ঠিকঠাক করিয়া নিজে পর্যন্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার আগেই গাড়ি উধাও হইয়াছে, একে বারে সামনের দিকেই, একবার এদিকে আসিয়া পাশের একটা জংশন স্টেশন হইয়া ব্রাঞ্চ লাইনে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

হতাশায় হতাশায় এমন অবস্থা হইয়াছে যে একটা বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গেছে আর ইহজন্মে পাওয়া যাইবে না। দিনে তিন-চারবার করিয়া অফিসে যান, খোঁজ পান অমুক স্টেশনে রহিয়াছে, তাহার পর আবার নিরুদ্দেশ। অনুকূলবাবু নির্বিকার কণ্ঠে মেয়ের জন্য পাত্রের কথা তোলেন ; সর্বোচ্চ অফিসার পর্যন্ত চিঠি লিখিয়া হয়রান হইয়া গেছেন, সবগুলো অনুকূলবাবুর অফিসে আসিয়া জমা হয়। এদিকে ফাইলের সংখ্যাও পঁয়ত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাউণ্টারে লোকেদের ভিড়, গুলতন গেছে বাড়িয়া।

মরিয়া হইয়া এক ঝোঁকে গাড়ির সন্ধান লইতে লইতে এক নাগাড়ে পাঁচ দিন সময়, লাইনটা এমুড়ো ওমুড়ো চষিয়া ফেলিলেন, ধরা গেল না। পশ্চিমের শীতে, অনিয়মে শরীর ভাঙিয়া গিয়াছে, আবার হেড কোয়ার্টারে ফিরিয়া আসিলেন!

তাহার পর ব্যাপারটা চরমে আসিয়া ঠেকিল।

একদিন নিজের অফিসে চেয়ারে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, পাশের সঙ্গী কেরানিরা যখন যাহার অবসর হয়েছে সান্ত্বনা দিতেছে—গাড়ি যখন লাইনের ওপর আছে, ভয় কি ?—একদিন না একদিন পাওয়া যাইবেই—এতো সমুদ্র নয়, কোথায় ঝড়ে ডুবিল, কোথায় পাহাড়ে ঠোক্কর লাগিল—এ যতই কিছু হোক, বাঁধা লাইন ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না—ঐ তো পাঞ্জাবে পরিবারকে পরিবার নষ্ট হইয়া গেল, এতো তাহার চেয়ে ঢের ভাল—ধরা যাক, যদি নাই আর দেখা হয়, বাঁচিয়া তো থাকিবেই সবাই—

এমন সময় অনুকূলবাবুর পিয়ন আসিয়া খবর দিল, বাবু সেলাম দিয়াছেন।

কাশিতেছিলেন, সেই অবস্থাতেই দক্ষিণ হাতটা বাড়াইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন! বেগটা থামিলে ব্যাপার আর কম্ফর্টার ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া বলিলেন—"নিন মশাই, টেনে তুলেছি, এসব ব্যাপারে অত হেদুলে চলে ? এই বার গিন্নী এসে পেঁছুলে একটা ভোজ দিয়ে দিন—"

নিজের রসিকতায় হাসিতে গিয়া আবার একচোট কাশি আসিয়া পড়িল।

কুমুদবন্ধুবাবু ব্যাকুল আগ্রহে প্রশ্ন করিলেন—"এসে গেছে ?"

"এসে গেছেই বলতে পারেন ; টু ডাউন এক্সপ্রেস নেক্সট স্টপেজ থেকে তুলে নিয়ে স্টার্ট করেছে—মাঝে পাঁচটা স্টেশন—"

ঘড়িটা দেখিয়া বলিলেন—"আর আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বে—"

"তা হলে উঠি আমি—"

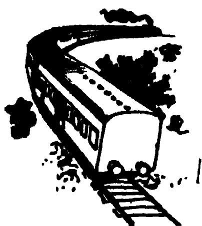
"আরে বসুন, আধঘণ্টা বললাম বলে কি আধ ঘণ্টাই ভেবেছেন নাকি? হয় তো শুনবেন কোথাও ইঞ্জিন ফেল করে বসে আছে, কিম্বা কোন স্টেশনে লাইন ক্লিয়ারই পায় নি, ছিলেন "বি. এন. আর্'-এ, সব কাণ্ড তো জানা নেই।"—পেলেন পাত্রের খোঁজ? মেয়েটিকে তো আর রাখা যায় না; এই দেখুন না, গিন্নী যা চিঠি লিখেছেন তাতে পতি-গুরুর গুরুত্ব আর কিছু রাখেন নি। আমরা হলাম ভাদুড়ী—ঐটুকু মনে রাখতে হবে, বাগচি, সান্ন্যাল—"

কোন রকমে মুক্ত হইয়া স্টেশনে আসিয়া দেখেন গার্ডের গাড়ির দিকে একটা তুমুল জটলা, এক রকম ছুটিতে ছুটিতে গিয়াই উপস্থিত হইলেন।

ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে গিয়া দেখেন একটা রেলের সাঁওতালী কুলীর পরিবার; মেয়ে, মা, কাচ্ছা বাচ্ছা মিলাইয়া আট দশজন; বলা নাই, কওয়া নাই, তাহাদের নিজের স্টেশন থেকে টানিয়া আনিবার জন্য একধার থেকে সবাই মিলিয়া অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিতেছে, একটা লোক কাপলিংটা খুলিয়া গাড়িটাকে ছাড়াইয়া লইতেছে।

অফিসে আসিয়া খবর পাইলেন, সেই স্টেশনেই আপ্ পার্সেল এক্সপ্রেসটা দাঁড়াইয়া ছিল, টু ডাউন পেঁছিবামাত্র কুমুদবন্ধুর গাড়িটা জুড়িয়া লইয়া উল্টা দিকে চলিয়া গিয়াছে। শরীর গেছে, মন দিন দিনই ভাঙিয়া পড়িতেছে; ওদিকে কুড়ি বৎসরের তিল তিল করিয়া সঞ্চয় করা সম্পত্তি নষ্ট হইল, তাহার পর এই—একেবারে মূলে আঘাত। বৈরাগ্য অনেক দিন থেকেই প্রবেশ করিয়া ছিল মনে, ক্রমে ক্রমে উগ্র হইয়া উঠিল।

আর অনুকূলবাবুর অফিসেও যান না, নিজের অফিসে গিয়া টেবিলের সামনে বসিয়া সান্ত্বনা শোনেন, ছুটি হইলে উঠিয়া আসেন। ওয়েটিং-রুমের একটা কোণে পড়িয়া থাকেন, হোটেলে নেহাৎ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এক মুঠো খান।



দিন আষ্টেক পরের কথা। একজন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন কুমুদবন্ধু, তিনি তত্ত্বজ্ঞান দিয়াছেন সমস্ত জীবনটাই এই রকম বৃথা অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ানো; ঠিক হইয়াছে সব ত্যাগ করিয়া এই দিক দিয়াই গিয়া হিমালয়ে উঠিবেন। কাজ ইস্তফা দিয়া সকাল সকালই অফিস হইতে বাহির হইয়া গেটের কাছে আসিয়াছেন, ডাক পিয়ন

প্রবেশ করিতেছিল, হাতে একটা চিঠি দিল। খামের ওপর অনেকগুলি মোহরের ছাপ। কুমুদবন্ধু তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলিয়া পড়িলেন—

পার্বতীপুর
সোমবার

আশীর্বাদ জানিবা,

আমরা অনেক কষ্টে তিনদিন হইল এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বাড়ির চারখানা দরজা আর দুইটা জানালা খুলিয়া লইয়া গিয়াছে; তাহার পরই পাড়ায় পুলিস মোতায়েন হয়, আর কিছু করিতে পারে নাই। এখানে আর হাঙ্গামাও কিছু নাই; শুনা যাইতেছে এখানকার মুসলমানদের সঙ্গে পশ্চিমা মোছলাদের বনিতেছে না। কাল কলিমুদ্দি আসিয়া অনেক দুঃখ করিল—বলিল—মা ঠাকুরুণ, যখন এয়েছেন আর যাবেন না, ওরা আপনাদের তাড়িয়ে—আমাদেরও তাড়াবে। কলিমুদ্দির ছেলে তো কলেজে লেখাপড়া করিতেছে, সেই নাকি ভেতরের কথা টের পাইয়া এই সব বলিয়াছে। আমায় চিঠি লিখিয়া দিল অম্বিকার ছেলে ললিত। উহারাও আসাম থেকে ফিরিয়া আসিয়াছে। বলে তাদের চেয়ে ঘরের মুসলমান ঢের ভাল! তারা বাঙালীকে একেবারে পছন্দ করে না।

যাই হোক, তুমি পত্রপাঠই ইস্তফা দিয়া চলিয়া আসিবা, আর ও সুখের চাকরিতে কাজ নাই—যা আছে তাহাতেই চলিয়া যাইবে। আমরা কি করিয়া পরিত্রাণ পাইয়া পলাইয়া আসিয়াছি এক ভগবানই জানেন, চিরদিনই বোধ হয় রেলে ঘুরিতে হইত।

আমরা শরীর গতিক ভাল। ফসল ভাল হইয়াছে; কলিমুদ্দি, পাঁচু সেখ, জয়নাল, সাতকড়ি মণ্ডল সবাই বলিতেছে আমাদের অংশ আমরা পাইব।

তুমি চলিয়া আসিতে বিলম্ব করিবা না। পুনরায় আশীর্বাদ জানিবা। ইতি—

আশীর্বাদিকা
দিদি



নীতি ও রাজনীতি

স্টীমারটা গঙ্গায় এপার ওপার পাড়ি দিচ্ছে। আমি একটা ডেক-চেয়ার টেনে নিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলাম। দুটি কুলির মাথায় মোটঘাট দিয়ে একটি বাঙালী পরিবার উঠে এসে পাশের বেঞ্চটি দখল করলেন। কর্তা নিজে, তাঁর স্ত্রী, একটি বছর দশেকের ছেলে, একটি বছর আটেকের মেয়ে; তারপর আবার একটি বছর পাঁচ ছয়েকের মেয়ে; তারপর বছর তিনেকের মধ্যে পিঠোপিঠি দুটি ছেলে; একটি বাঙালী পরিবার যেমন হওয়া উচিত। কোলের ছেলেটিকে কর্তা নিয়ে রয়েছেন, গৃহিণী ঝাড়া-হাতপাই একরকম, ডান হাতে শুধু একটি পাখা আর একটি নিকেলের পানের কৌটা।

কুলি দুটির মাথায়, কাঁধে, পিঠে, একটি পুরো সংসার। গোছগাছ করে নিয়ে কর্তা বেঞ্চের শেষ দিকটায় আমার কাছাকাছি হয়ে বসলেন; শিশুটিকে কোলে নিয়ে। মাঝে ছোট ছেলেটি আর মেয়েটি, তারপরেই গৃহিনী বেঞ্চের মাঝামাঝি ওদিকে মুখ করে বসে পাখার বাতাস খেতে লাগলেন। বড়ছেলেটি আর মেয়েটি উঠে গিয়ে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগল।

শিশুটি কাঁদবার উপক্রম করতে কর্তা পায়ের দোল থামিয়ে নিলেন, তারপর আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—"পার হতে টাইম কতক্ষণ নেয়?"

বললাম—'আজকাল ঘণ্টাখানেকের ওপর লেগে যাচ্ছে, ঘাট দূরে সরে এসেছে তো। আবার চড়ায় ঠেকে গেলে সে আলাদা হ্যাঙ্গাম, জল কম তো?"

"ছাড়বে কখন?"

বললাম—"আধঘণ্টা তো বটেই বেশিও হতে পারে; কিছু ঠিক নেই।"

বললেন—"ঠিক তো কিছুরই দেখতে পাচ্ছি না মশাই, অদ্ভুত জায়গা। গাড়ির ব্যাপারটা তো দেখেই আসছি, ভাবলাম দুর্ভোগ বুঝি কাটল, আপনি আবার বলেছেন স্টীমারেরও এইদশা দেখছি এদিকে কারুর কিছুতেই মাথাব্যাথা নেই; কেন বলুন তো?"

শিশুটি আবার হাঁ করতে দোল দিয়ে থামিয়ে মেয়েটিকে বললেন, "তোমার মাকে ফিডিং বট্‌লটা বের করে দিতে বলতো বাণী"।

গৃহিণী পাখাটায় একটু জোরে দিয়ে চাপা গলায় বললেন, বেতের বাস্কেটটায় আছে, বের করে নিতে বল।"

বোধ হয় ব্যাপারটা ঠিক 'মাথাব্যথা'র প্রসঙ্গের পরেই এসে পড়ায় আমার খবরের কাগজটা আড়াল করে একটা হাসি চেপে নিতে হল; তারপর আবার সহজভাবেই প্রশ্ন করলাম—"আপনি আসছেন কোথা থেকে?"

"সে আর বলবেন না, দুর্ভোগ। ছাপরা সেওয়ান লাইনে ডোরোণ্ডা জংশন, সেখান থেকে নেমে মহারাজগঞ্জ, সেখান থেকে তেরো মাইল ইন্‌টিরিয়রে—কাঁচা-রাস্তা মোষের গাড়ি। বলে ছাপড়া জেলা, জলহাওয়া ভালো।···কে জানে মশাই, দু'হপ্তা ছিলাম, গায়ে কারুর কিছু লাগল কিনা লাগল টের পাইনি, যদি লেগেই থাকে তো এই এক দিনের হিড়িকেই সুদে-আসলে উসুল করে নিয়েছে—পুরো একদিনই বা কোথায়? রাত্তির তিনটের সময় মোষের গাড়িতে চেপেছি আর এই।"

মুখের দিকে চাইলেন। বললাম—"গরমও পড়েছে সেইরকম।"

"গরম! একে গরম বলবেন আপনি?···ঐ শেষ রাত্রিটার দিকে একটু যা ঠাণ্ডা মতন ছিল, তারপরেই অগ্নিবৃষ্টি। গরম তো আমাদের ওদিকেও আছে মশাই, কিন্তু পৃথিবীর কোনও প্রান্তে যে এরকম অভদ্র গরম থাকতে পারে, ধারণাই ছিল না। রীতিমতো সেদ্ধ হতে হতে আসছি, ঐ শিশু থেকে নিয়ে···"

গৃহিণী পাখাটা বেশ জোর ক'রে দিলেন।

প্রশ্ন করলাম—"আপনাদের বাড়ি কোথায়? এ অঞ্চলে বুঝি আশা যাওয়া নেই?"

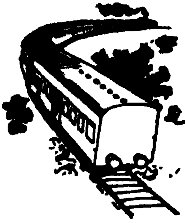
কর্তা দুটো হাতই কপালে তুলতে যাচ্ছিলেন, ছেলেটি ফিডিং বট্‌ল্ ছেড়ে হাঁ করায় একটা হাত ওদিকে দিয়ে একটা হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন—"মাফ করবেন, এই প্রথম আর এই শেষ। এসেছিলাম এক মাসের জন্যে, এই তাড়াতাড়ি পালাচ্ছি;—ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি। তাও আসতে কি চেয়েছিলাম মশাই? কতদিন থেকে ওঁরা বলছেন—পূর্বপুরুষদের দেশ একবার হয়েই যাও তা বখেয়া অনেক যে ঘর ছেড়ে বেরতে, তায় অনেক দূর পথও সোজা নয়···"

বললাম—"মাফ করবেন, একটু বাধা দিচ্ছি, পূর্বপুরুষদের দেশ—ঠিক বুঝলাম না কথাটা।"

"ও, তাও বটে, বুঝবেন কি করে? অরিজিন্যালি আমরা এই জেলারই লোক কিনা, আমার প্রপিতামহ বাবু অনন্তরাম পাণ্ডে বাড়িতে ঝগড়া করে পাটনায় পালিয়ে গিয়ে নবাব সরকারে একটা চাকরি নেন; পাটনা থেকে মুঙ্গের, সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ। নবাব সককারে তখন এদিককার লোকও তো কিছু ছিলেন, ওখানেই বিবাহ করেন, শ্বশুরের কিছু সম্পত্তি পান, কিছু বাড়ানও নিজে; সেই থেকে আমারা ও দেশেই। ঘর ছেড়ে পালানো সে-সময়ের ছেলেদের একটা রোগ···'

পাখা-সঞ্চালনটা হঠাৎ এত, অসহিষ্ণু হয়ে উঠল যে, আমার মনে হয় তাহাতেই কর্তা

কথাটা একেবারে ঘুরিয়ে নিলেন—
"তবে আমাদের তো মনে হয় কী বুদ্ধিমানের কাজই যে করেছিলেন পালিয়ে গিয়ে। ওঃ, এ কি একটা থাকবার দেশ! না এলেই ভাল করতাম। পূর্বপুরুষদের দেশ, চিরজন্মের জন্য এরকম একটা আতঙ্ক না দাঁড়িয়ে গেলেই ছিল ভালো, তা ইনি অনেক-দিন থেকে বলছেন, তারপর জ্ঞাতি-কাকা রঘুনন্দন বাবু ছেলের বিয়েতে একেবারে লোক পাঠিয়ে বসলেন, সন্তোষকে নিয়েই আসবে কোনরকম করে (আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নাম সন্তোষকুমার); এদের মা-ও বললে একবার না হয় পূর্বপুরুষের ভিটেটা…"
পাখাটা আবার সজীব হয়ে উঠল। কর্তা এবার কি করে সামলান দেখবার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠেছি, এমন সময় আর একটি পরিবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমাদের দিকেই অগ্রসর হয়ে এলেন। কর্তা, গৃহিণী, একটি বছর সাতেকের ছেলে, গৃহিণীর কোলে একটি বছর দুয়েকের মেয়ে।



কর্তার বয়স বছর পঞ্চাশের কাছাকাছি। স্থূল তবে বেশ আঁট-সাঁট, মাথার চুল কাঁচা পাকা, একজোড়া সুপুষ্ট গোঁফ, হাতে একটা পাখা, সেইটে নাড়তে নাড়তে কুলিকে দিয়ে জিনিসপত্র গোছগাছ করিয়ে নিয়ে তাকে বিদায় করে দিলেন। বেঞ্চটা লম্বালম্বি দুভাগে বিভক্ত করা, এঁরা এদিকটায় বসে ছিলেন, ওঁরা বসলেন ওদিকটা। কর্তা বসলেন এ কর্তার পাশে ও-গৃহিণী বসলেন এ-গৃহিণীর মুখোমুখি হয়ে।
এঁদের কোন কারণে দেরি হয়ে গিয়েছিল আসতে, একটু পরে ঘণ্টা বাজিয়ে স্টীমারটা ছেড়ে দিল।
শিশুটি একটু বেশী চঞ্চল হয়ে উঠেছে, ফিডিং বট্‌ল্ থেকে মুখ সরিয়ে কাঁদবার গোটা দুই-তিন নোটিস দিতে নবাগত কর্তা পাখাটা এদিকে বাড়িয়ে বললেন—"নিন একটু হাওয়া করুন, গরম বরদাস্ত করতে পারছে না বাচ্চা।"
ইনি একটু বিনয়ের প্রত্যাখানের সঙ্গে বললেন—"থাক, ঠিক হয়ে যাবে।"
নবাগত কিন্তু নিরস্ত হলেন না; নিজেই ব্যজন শুরু করে দিয়ে বললেন, "ঠিক কেমন কোরে হোবে; বাচ্চা-তো?…চুপ করো খোঁকা—দেখো কেমোন ঠাণ্ডা হাওয়া গঙ্গাজীর।…এ বোতলের আদত কেন করিয়েছেন বাচ্চারে? এতে বাচ্চা আরাম…"
ব্যাপারটা হঠাৎ এত ডেলিকেট হয়ে পড়ল যে আমরা উভয়েই যেন গুটিয়ে গেলাম;

এমন সময়, ভগবানের দয়া, প্রসঙ্গটা একেবারে অন্য পথ ধরল। নবাগতা গৃহিণী বোধ হয় এতক্ষণ সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, বোধ হয় কর্তার অন্তরঙ্গতাতেই সাহস পেয়ে ঠিক এই সময়টা আধঘোমটা-দেওয়া মুখটা আর একটু বাড়িয়ে এনে সঙ্গিনীকে বললেন—"আপনি বঙালীন্ ?···আমিও বংলা কথা জানি, বংলা কিতাব পড়ি···"

কর্তা বাচ্চার আরাম আয়েসের কথা ছেড়ে একেবারে হো-হো করে হেসে উঠলেন—

"শুনিয়ে! আরে আমরা বাঙালী, বাংলা কথা জানব না, বাংলা কিতাব পড়ব না—এতে বোঝাবার কি আছে?—"

—শিশুকে তুলে নিজেকেই হাওয়া করতে করতে দুলে দুলে হাসতে লাগলেন!

দুজনেই বিস্মিত হয়ে গেলেও সন্তোষবাবুর অবস্থা বোধ হয় বাক্যাতীত; আমিই প্রশ্ন করলাম—আপনার বাড়ি··কোথায় জানতে পারি কি?"

সুস্থ শরীরে হাসির লহর একবার উঠলে সহজে থামতে চায় না, ভদ্রলোক তারই জের টানতে টানতে বললেন—"কোন্ বাড়ির কথা বোলবো—বর্ধমান, না ছাপরা জিলার? বর্ধমানে আমাদের বাড়ি লোকনাথপুরে জৌগ্রাম থেকে সাত মীল দখ্‌ছিন। আমার নাম লোকনাথ মকুর্জী—বাবা আমার বাবুজীকে বললেন—গাঁয়ের সাথে তো সম্বন্ধ কেটে গেল, তোর বেটার নাম লোকনাথ রাখছি।···ই বাচ্চার নাম রাখছি অস্নেহময়ী, ও বাচ্চার নাম সুরেন্দরনাথ; ও সবের আরও দুই ভাই আছে, বড়া ভাইয়ের নাম পরকাশচন্দ্র, মেঝলার নাম আরুণকুমার—সোব ওদের মতারী—বাংলা নোভেল থেকে রাখিয়েছে।···লিন, এবার বলুন আমরা বঙালী নই। হেসেই বললেন।

বললাম—নামগুলি বেশ মিষ্টিও।···তা সেইখানেই যাচ্ছেন নাকি—লোকনাথপুরে?"

ভদ্রলোক হাসি থামিয়ে চোখ একেবারে কপালে তুলে বললেন, বললেন—"মাফ করুন, সাঁয়তিশ সালে একবার যাইয়েছিলাম, ঠিক এক্কৈশ বরষ হল। জ্ঞাতি ভাই অনুকূলচন্দ্রের বেটির বিবাহ ছিল ছোটোমোটো জমিন্দার তো, নিজের দারোয়ানের সঙ্গে ছেলেকে পাঠিয়ে দিলে, বচপন্ থেকে যাই নি, দাদাপরদাদার দেশ, অস্নেহময়ীদের মতারীও আগ্রহ করলে--বাংলা মুলুক দেখিনি, চলো দেখে আসি—সেই একবার যাইয়েছিলাম—আজ থেকে এক্কৈশ বরষ আগে, সেই থেকে নাককান মলিয়েছি···"

নাক এবং কান দুটো স্পর্শ করলেন। সন্তোষবাবু একবার তির্যক দৃষ্টিতে চাইলেন একটু হেসেই; আমিও হেসেই প্রশ্ন করলাম "কেন, কি হল?"

"দুপা যাও তো পোখর—এতোটুকু, এতোটুকু, পোচাজল, জঙ্গল, দিনে শিয়াল ডাকে···"

"আর এদিকে কোথায় থাকা হয়—ছাপরা জেলায়?"

এবার প্রশ্নটা করলেন সন্তোষবাবুই; একটু হেসেই, তবে একটু যেন আক্রোশবশেই।

আমার বেশ কৌতুক বোধ হচ্ছিল। যোগাযোগটি বড় সুন্দর. পথটি কাটবে ভালো, যদি এঁদের নিজের দেশের ওপর টান বাঁকা পথ ধরে শেষ পর্যন্ত অপ্রীতিকর কিছু না

সৃষ্টি করে বসে। তাই একটুখানি খটকা লাগার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা হালকা ক'রে ফেলবার চেষ্টা করলাম, বললাম, "দেখবেন, উনি আবার খাস বাংলার লোক, বেশি নিন্দে বরদাস্ত করতে পারবেন না।

"আরে এখোন তো অনেক বাকি আছে, ম্যালেরিয়া, মচ্ছর, গোসাপ···"

আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন। সন্তোষবাবুও হেসেই বললেন "আপনার দেশ থেকেও তো এই যাচ্ছি মশাই। ধুলো, গরম, পুকুরে জল নেই, যেদিকে তাকান যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে···"

"আরে দুনিয়াটাই তো দুলো মিট্টি···"

"যেখানে থাকেন তাই মনে হবার কথা বটে। আসুন না একবার আমাদের ওদিকে, থাকুন না দিক কতক, তখন আবার এই আপনিই বলবেন, দুনিয়াটাই নন্দনকানন।"

হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে উচ্ছ্বসিতই হয়ে উঠলেন—

"সত্যই নন্দনকানন মশাই। এতটুকুও বাড়িয়ে বলা নয়; আরও বিশেষ করে যেন টের পেলাম এদিকে এসে। এই এত খরা এদিকে তো, ওখানে যান সবুজে সবুজে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। এসময়েও। বর্ষা, কি শরৎকালের কথা বাদই দিলাম। নদীর ওপারই গ্রাম আমাদের, রূপখালি,—কী কাকচক্ষুর মতন জল! এদিকে সেরকম একটা নদীই দেখান তো—তারপর মুর্শিদাবাদ মালদা, আম-কাঁঠালের দেশ, এক-একটা বাগান দেখলেই আপনাকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে হবে। আমি একটু ঘুরেছি মশাই—এদিকটায় আসি নি—না এলেই ছিল ভাল—তবে পাঁচটা জায়গা ঘোরা আছে। এদের মার আবার একটু তীর্থ তীর্থ বাই আছে—তা ঠিক আমাদের ওদিককার মতন তো কোন জায়গাই দেখলাম না। এক শহর থেকে একটু বেশি ইনটিরিয়ারে, এই যা একটু অসুবিধে, ওইটুক যদি ধরেন···"

বললাম—"তাই বোধ হয় আছেনও ভাল।

দোষটুকু শুনে দাঁড়িয়ে যাওয়া ভদ্রলোক আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন—



"তা যদি বলেন তো সে কথা একশ' বার। শহরের আঁচ লাগেনি বলে সত্যিই বেঁচে আছি মশাই। জিনিসপত্র পর্যন্ত। মাছ যত চান, আর রকমারি। দুধ—এখনও টাকায় ছসের-আটসের করে, একেবারে গোরুর বাঁটের খাঁটি দুধ···আর দুধ-ঘির

জায়গা ছাপরা' মাফ করবেন, ও'দের বাড়িতে তিনটে মোষ আছে, এর অতিরিক্ত একছটাক দুধ জোগাড় করতে হলে গলদঘর্ম হয়ে যেতে হয়—মাটা তোলা দুধ, যে যত চান পাবেন, গ্রামেই দুটো মাখন—তোলা কল···"

লোকনাথবাবু মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসছেন, থেমে গিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন—"কি এখানে পড়ে আছেন মশাই, চলে আসুন দেশে। খানা-ডোবা সেখানে আছে, তা বলে কি সমস্ত দেশটাই খানা-ডোবা বন-বাদাড় হয়ে গেল ?"

লোকনাথবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন আবার বললেন,—"তা হলে একটা গ্রামে দুটো মক্ষণের কল আছে বলে, সমস্ত দেশটাই কি মক্ষণের কলের দেশ হয়ে গেল ? আপনি একবার আমাদের ওদিকে আসুন।"

এ'র দিকটা শোনা হল, এবার ও'র দিকটাও শোনা দরকার ; আমি বললাম—"কিন্তু উনি তো বলছেন পালাচ্ছেন এখান থেকে, মাসখানেকের জায়গায় চোখ-কান বুজে পনেরোটা দিন কোন রকমে কাটিয়ে।"

"সে যেখান থেকে পালাচ্ছেন সেখান থেকে পালাচ্ছেন ; আমাদের যদি পালাবার জগহ্ হত তো আমার পিতামহ ঘর থেকে পালিয়ে ঐ-জগহ্ কেন আসতো বলুন ?"

উভয় দিকে সাদৃশ্যটা দেখে আমিই প্রশ্ন করলাম—"আপনার পিতামহও পালিয়ে এসেছিলেন ?—ঐ পণ্ডোলীতেই ?"

"পণ্ডোলীতে কি করে পালাবেন ? সবচেয়ে নজদিকের শহর বেড়িয়া, সেও উনৈশ মীল দূরে। পালিয়ে এসেছিলেন ছপরা, ছপরা থেকে হাথোয়া রাজে নোকরি নিয়ে হাথোয়া ; ঐখানেই বাড়ি করলেন, তারপর তহসিলদারি কাজে পণ্ডোলী ইলাকায়, ব্যস্।"

প্রশ্ন করলাম—"মারা গেলেন ওখানে ?"

লোকনাথবাবু আবার হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন— "মারা যাবে তাঁর দুশমন। যখন বদলির হুকুম এল রাজসরকার থেকে তখন পিতামহের উমর তিপ্পন্ বয়সী, বললেন—আমি পণ্ডোলী ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। বেনামীতে জমীন-উমিন কিনে রেখেছিলেন, কাজে ইস্তফা দিয়ে পণ্ডোলীতে বসে গেলেন। তারপর গুণে আরও চালিশ বরস বেঁচেছিলেন। জী হাঁ ! ঘি-দুধের কথা ছেড়ে দিন, ঘি-দুধ তো এখনও পণ্ডোলীর রাস্তায় গড়ায়—হাওয়াপাণির এ রকম গুণ। লোকনাথপুরে ওর আওর্ ভাইরা ছিল। জ্ঞাতিরা ছিল বাবুজীর মুখে শুনিয়েছি—সত্তর বাহাত্তর ব্যস কেউ প'চত্তরও পুরা করতে পারেনি, অব্নাশ মুকুজী তিরানব্বে ঠেকিয়ে ছেড়ে দিলেন। বাবুজী মারা যান সত্তাশী। লিন, ঘি,-দুধ হাওয়া-পানির হিসেব।—আমার উমর কত বলে আন্দাজ হয় ?"

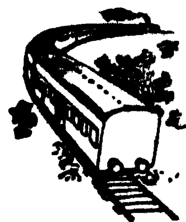
মুখটা সামনে ধরে উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

বললাম—কত আর ?—পঞ্চাশ।

সন্তোষবাবুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—আপনার আন্দাজ ?

উনি একটু দেখে নিয়ে বললেন—ঐ হবে ; না হয় বছর খানেক এদিক-ওদিক।
আবার সেই প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলেন লোকনাথবাবু—
"তিরষট্ ?···জী হাঁ, তিরষট্।" একবার আমার দিকে চেয়ে একবার পাণ্ডেজীর দিকে চেয়ে আরও বারতিনেক আওড়ালেন কথাটা। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ; ভাবটা—এর পরেও যদি তোমাদের কিছু বলবার থাকে তো বলো, তারপর দেখছি। সন্তোষবাবুর এদিককার রেকর্ডটা নিশ্চয় অমন নয়, তবে মন্তব্যটা যা করলেন তাতে দেশের বৈশিষ্ট্য বোল আনাই আছে, একটু ব্যঙ্গের সঙ্গেই ঠোঁটের কোণ চেপে বললেন, অবশ্য হাসি মুখে—বাবাঃ ! ঠাণ্ডাও তো এই রকম হাড়ভাঙা হবে।···',
"আরে সিরফ্ গর্দা, গরমী ঠাণ্ডা !—থোড়া আ করকে দেখিয়েভি তো সহি।···"
গভীর হয়ে গেছেন, ও'রও উচ্ছ্বাস এসে গেছে, তারই ঝোঁকে সহজ ভাষা যা, অর্থাৎ হিন্দী-বাংলা মেশানো সেটা আপনিই বেরিয়ে এসেছে মুখ থেকে। তখনি কিন্তু ওদিকটা সামলে নিলেন, যদিও উচ্ছ্বাসের দিকটা রইলই। বলে চললেন—নেপাল তরাইয়ের নীচেই পণ্ডোলী এলাকাটা, তরাইটা সেখানে শেষ হয়েছে—এদিক থেকে গিয়ে পড়েছে মোতিহারি জেলা, ওদিক থেকে ছাপরা—দুটো জেলার মাঝখানে দিয়ে চলে গেছে নারায়ণী নদী, গ্রামের মাইল দুয়েক তফাত দিয়ে—তার একটা ছোট সুতী গ্রামের মাঝখান দিয়ে ঘুরে আবার নদীতেই গিয়ে পড়েছে। রুক্ষতা কোথায় ? তরাইয়ের উর্বর জমি, সমস্ত বছরই কোন না কোন একটা শস্য রয়েছেই মা ঠ, যেদিকেই চোখ ফেরাও সবুজের পর সবুজ, সেই দূরে মুক্ত আকাশের নীলে গিয়ে মিলেছে। উত্তরে একবারে দূরে হিমালয়ের গাঢ় নীল রেখা, পরিষ্কার দিনে নীচের পাহাড়ের বনজঙ্গল পর্যন্ত চোখ পড়ে, ওদিকে একেবারে শীর্ষদেশের তুষারস্তূপ, সকালে সন্ধ্যায় মনে হয় নগরাজ যেন সোনার মুকুট মাথায় দিয়েছেন।···পিতামহ অবিনাশ মুকুর্জী ছিলেন কবি, তিনি কি শুধু ঘি-দুধের লোভেই রাজ-সেরেস্তার সম্মানের কাজ ছেড়ে পণ্ডোলীকে আঁকড়ে পড়েছিলেন !···কত কবিতা রয়েছে তাঁর, আগে বাংলাতেই লিখতেন, তারপর শ্রোতার অভাবে হিন্দীতেই আরম্ভ করেন, তার মধ্যে পণ্ডোলী, আর আশপাশের দৃশ্যগুলি নিয়েই কতো ! বিস্তীর্ণ নারায়ণী—বৈশাখের রূপে, আবার বর্ষার ; তার ওপরের দিগন্তলীন ঘন জঙ্গল।—আরও কত সব ; পণ্ডোলীর বসন্ত, পণ্ডোলীর বর্ষা।···পাণ্ডেজী—ও'র দেশকে নন্দনকানন বলে একেবারে শেষে কথাটা বলে দিয়েছেন, তারপরেও যদি কিছু থাকে সে হচ্ছে পণ্ডোলী।
এধরণের একটা মানুষ হঠাৎ একটা জিনিস নিয়ে এত ভাবালু হয়ে পড়তে পারে, এর আগে কখনও দেখে নি। উচ্ছ্বাসের মাথায় এক-একবার লাইনের পর লাইন হিন্দী বেরিয়ে যাচ্ছে মুখ দিয়ে আবার সামলে নিচ্ছেন, মুখটা হয়ে উঠছে রাঙা, তাতে একটা অদ্ভুত আত্মতৃপ্তি মাখানো, পণ্ডোলীর স্তবগান আজ যেন সার্থক হয়ে উঠল !
শেষ করে নিজের উচ্ছ্বাসে বোধ হয় একটু অপ্রতিভই হয়ে থাকবেন, সন্তোষবাবুর দিকে

চেয়ে বলেছেন—"দিন, এর চেয়েও আপনার দেশ ভালো ?
সন্তোষবাবু হেসে বললেন—"আপনি হচ্ছেন কবি পিতামহের নাতি, নিজেও কবিই ; অত সাজিয়ে বলতে পারলে আমিও আমার দেশকে ওর ওপরে তুলে ধরতে পারতাম।"
আবার সেই বিরাট হাসি লোকনাথের। আমার দিকে চেয়ে বললেন—"দেখুন, বংলা দেশের মানুষ তো, হেরেও হারবেন না ; কভি না !"
কবির লড়াই এগিয়ে চলল। কবির লড়াই-ই বৈকি তবে, এত শুচি-স্নিগ্ধ কিছু শুনি নি এর আগে। বেহারী, তিনি বাংলাকে আপন করে নিয়ে তার যশকীর্তনে পঞ্চমুখ ; বাঙালী, তিনি বিহারকে কারুর কাছে নত হতে দেবেন না। সবচেয়ে চমৎকার যেটা এক সময় আশঙ্কা করেছিলাম—উষ্মা বা উত্তাপ কিছু নেই লড়াইয়ের মধ্যে ; সন্তোষবাবুর আত্মসমর্পনের মধ্যে যেটুকু বা ব্যঙ্গের রেশ ছিল প্রথম দিকে, লোকনাথবাবুর নির্মল প্রাণখোলা হাসির তরঙ্গে সেইটুকুও ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তখন যা বিতর্ক রইল তা যেমন নির্দোষ তেমনি প্রীতিতে ছলছল ; অন্যের দেশ নিয়ে বিদ্রুপ না রইল এমন নয়, তবে সে শুধু হাসিতে ভরা কুঙ্কুম।
প্রসঙ্গক্রমে এও টের পাওয়া গেল, দুজনেই অল্পবিস্তর শিক্ষিতও। সন্তোষবাবু—নবাব সরকারের ইংরাজী সেরেস্তায় কাজ করতেন, রূপকলির বিচ্ছেদ সইতে না পেরে গ্রামেই ফিরে গেছেন, লোকনাথবাবু গ্রামে চেষ্টা চরিত্র করে একটা মিড্‌ল স্কুল করিয়েছেন, তারই সেক্রেটারি !
পরিবেশটিও বড় স্নিগ্ধ ; মাঝগঙ্গায় এসে হাওয়াটা হয়ে গেছে ঠাণ্ডা। শিশুটি ঘুমিয়ে পড়েছে, সন্তোষবাবুর আর পা দোলাতে হচ্ছে না। এদিকে আমাদের আলাপ, ওদিকে গৃহিণী দুজনেরও জোর আলাপ চলেছে, সুবিধের জন্যে আরও ওদিকে সরে গেছেন দুজনে। পানজর্দার আদান-প্রদান চলছে, মাঝে-মাঝে একটু-আধটু হাসি, আমাদের এদিকে যে হাসি উঠছে তারই সংক্রামকতায়। একবার হাসিটা মনে হল যেন ওদের নিজস্ব। ঘুরে দেখি পণ্ডোলী-গৃহিণীর পোঁটলায় একটা যে হুঁকোর নলচে বেরিয়ে আছে—তারই দিকে আঙুল বাড়িয়ে শ্রীমতী পাণ্ডে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কি জিজ্ঞেস করছেন আর খিলখিল করে চাপা গলায় হেসে উঠছেন ; উনিও ওদিকে হাসির ছোঁয়াতে গেছেন পড়ে।



এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিও হল এমনি ভাবেই। লোকনাথের ছেলেটি এসে বিশুদ্ধ

ছাপরেয়ে ভোজপুরীতে বললে, "বাবা, মা বললেন, বাক্স থেকে চাচাদের জন্যে বাড়ির লাড্ডু আর তিল-পাপড়ি বের করে দিতে, চাবি আপনার কাছে আছে।"

এবার যা হাসি লোকনাথের তাতে কোথা থেকে একটা সংকেচে এসে পড়ে সেটাকে যেন আরও মিষ্ট করে তুললে ; বললেন—"আরে আমাদের লাড্ডু তিলপাপড়ি ও'র ভালো লাগবে কি রোকম করে ? সন্দেশ-রসগুল্লার দেশের লোক।...প্যার, তব্‌ভি...."

উঠে বাক্স খুলে আটটা বড় বড় মুগের লাড্ডু আর আটখানা সাদা ধবধবে তিলপাপড়ি বের করে আমাদের সামনে ধরলেন, বললেন, "এই আমাদের ওখানের মিঠাই..."

আমার দিকে চেয়ে বললেন, "আপনিও দুটো করে লিন। ভালো কি লাগবে ? তব্‌ভি...

আমি তুলে নিয়ে বললাম, "গন্ধ আর চেহারাতেই তো ভুলিয়ে দিয়েছে আপাতত।"

লজ্জিতভাবে হেসে অঞ্জলিটা সন্তোষবাবুর সামনে বাড়িয়ে ধরলেন। তিনি নিতে নিতে লজ্জিতভাবেই বললেন, "কিন্তু আমায় যে লজ্জায় ফেললেন, যশ তো গাইলাম দেশের, এখন রাখি কি দিয়ে ?"

গৃহিণীর হাতের পাখাটা একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ আবার সচল হয়ে উঠল। কতখানি সচলতায় কি ইঙ্গিত নিশ্চয় জানাই আছে, সন্তোষবাবু উঠে গেলেন। নির্দেশ নিয়ে ফিরে এসে লজ্জিতভাবেই বললেন, "পাটালি নিয়ে এসেছিলাম, কি করে বেঁচে গেছে দুখানা আমাদের ওদিকের খেজুরে গুড়ের পাটালির নাম আছে অবশ্যি এখন গরম পড়ে গেছে—

লোকনাথ উল্লসিত হয়ে উঠলেন—পাটালি ! সে তো অমৃত। ঐকৈশ বরস আগে লোকনাথপুরে খাইয়েছিলাম, এখনও জমানে লেগে রয়েছে !"

অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে অমৃতের মতোই ও'র কুণ্ঠিত হস্ত থেকে গ্রহণ করলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ত করি। এমন একটি দুর্লভ শুভযোগ, তার পরিসমাপ্তি যে এমন করুণ আর হাস্যকর হয়ে উঠবে, তার কল্পনাও করে উঠতে পারি নি। তা যদি পারতাম তাহলে অন্তত আমার দ্বারা যে ভুলটুকু হল, সেটুকু কি আর হতে দিই ? যেমন হয়, শেষের দিকে কথা ফুরিয়ে এল, ক্রমে থেমেও গেল। পাটনার দিকে এসে গেসে স্টীমার, দুজনেই এক হিসেবে বাইরের লোক, ওদের দৃষ্টি ওদিকেই গিয়ে পড়েছে, আমিও খবরের কাগজটায় মন দিলাম।

একটু পরে সন্তোষবাবু বললেন, 'দেখি একখানা পাতা।" বাইরেরটা পড়ছিলাম, ভেতরেরটা টেনে ও'র হাতে দিলাম। একটু পরে মুখ তুলে চাইতে সন্তোষবাবুর মুখের ওপর দৃষ্টি পড়ায় বেশ একটু বিস্মিতই হয়ে গেলাম, একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম। তারপর কিন্তু কৌতুহলবশে যতবারই চোখের কোনে চাই, দেখি মুখটা আরও অন্ধকার। তার পরেই হঠাৎ খেয়াল হল আমার।

কলকাতার একটা দৈনিক কাগজ। বাংলা-বিহারের সীমানা নিয়ে যে প্রশ্নটা উঠেছে,

তাই নিয়ে চুটিয়ে গাল দিয়েছে, বেহারকে। কিন্তু সন্তোষবাবু বাঙালীর চেয়েও বাঙালী তাঁর তো উপভোগ করবারই কথা।

এই সময় স্টীমারের কাগজ হরকরাটা উপরে উঠে এসে দাঁড়ালো। পাটনার কাগজ অমুক অমুক নেবেন বাবুরা?"

দুর্দৈব। লোকনাথ একখানি নিলেন। আমি উৎসুক কৌতুহলে চেয়ে রইলাম। হিন্দী কাগজ সকাল বেলায় ছাপরায়, পড়েছি—গালাগালি কুৎসায় বাংলার আর কিছু বাকি রাখে নি। একটু এখান-ওখান করে লোকনাথের দৃষ্টি গিয়ে সেই সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপর পড়ল, তার পরেই মুখে নামল সন্ধ্যা, ক্রমে প্রথম প্রহর, তারপরই শেষের দিকে একেবারে দ্বিপ্রহর রাত্রি। কাগজটাকে খামচে ধরে চুপ ক'রে বসে রইলেন।

আমি উঠে রেলিঙের ধারে গিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছি, একটু ঘুরে ফিরে গিয়ে পাশে দাঁড়ালেন, একবার ওদিকে বোধহয় সন্তোষবাবুর দিকে দেখে নিয়ে নীচু গলাতেই বললেন, "পড়েছেন আজকের এই কাগজটা, বাংলার আধা হিস্‌সা গিয়ে বসে আছে, তার ওপর গালাগালের ঘটা দেখেছেন? মানভুম কোবে থেকে বিহার হলো মশাই? জবরদস্তি।"

আমি হেসে বললাম—"বাউণ্ডারি কমিশনই যখন ঠিক করবে, আমরা মিছে মাথা ঘামাই কেন?"

"না, না হোশ-আক্কেলের কথা হচ্ছে···"

বোধ হয় উৎসাহ না পেয়েই একটু এদিক-ওদিক করে সরে গেলেন। সন্তোষবাবু উঠে এলেন না। আমি গিয়ে বসলে কাগজটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন—তা বললেন ভদ্র করেই" দেখেছেন এর এডিটোরিয়ালটা?···আমাদের বাঙালীদের কেমন একটা যেন জাতিগত দোষ দাঁড়িয়ে গেছে—পরের জিনিসের জন্য হাত বাড়ান, তাও যে ভাষায় একটা সংযম থাকবে—কিছু নয়।···ন্যায্য কথাটা তো মানতে হবে, মানভূম আমাদের কবে ছিল মশাই যে আজ বিহারের কাছ থেকে কেড়ে নিতে হবে?···আর তার জন্যে অকথ্য গালাগাল।···

স্টীমার জেটিতে ভিড়ল। এ দিকে দুজনের আর বাক্যালাপ নেই। গৃহিণীদের মধ্যে চলছিল একটু, সন্তোষবাবু কুলির মাথায় জিনিসপত্র তুলে একটু ধমকের সুরেই বললেন, "চলে এসো না, গল্পের আর শেষ নেই।"

লোকনাথের ছেলেটি মাকে নিজস্ব ভাষায় কি বলছিল,—লোকনাথ দাবড়ি দিয়ে উঠলেন—"আর যেতো বলি বাংলায় কথা বোল, মাতারীর সঙ্গেও করতানি, যাতানি, করতাড়, যাতাড়।···কচ্চুপোড়া খেলে!

শেষ যা চোখে পড়ল—জেটির পুল পার হবার সময় সন্তোষবাবুর হাত থেকে নেকড়ায় বাঁধা লাড্ডু আর তিলপাপড়িগুলি জলে পড়ে গেল। লোকনাথ পেছনে আসছিলেন, কি রকম একটা কৌতুহল হতে ফিরে দেখি তিনি স্পষ্ট হাত ঝেড়েই পাটালি, দুটির বোঝা গঙ্গায় দিলেন নামিয়ে।



দুর্ঘটনা

রেলের কলিশন, তারই বীভৎসতার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

সামনের দু'খানা গাড়ি চুরমার হয়ে গেছে, প্রথমটা ছিল ব্রেকভ্যান, তাই কতকটা রক্ষা। তৃতীয় আর চতুর্থ গাড়ি দুটোও জখম হয়েছে মন্দ নয়, তার পরের চারখানায় উগ্র ঝাঁকুনি লেগেছে মাত্র—বিশেষ কিছু হয় নি। যাত্রী কিন্তু সব গাড়ি থেকেই এসেছে বেরিয়ে। রাত্রির ব্যাপার, একটা হাল্কা জ্যোৎস্না আছে, কিন্তু তাতে দুর্ঘটনার রূপটা স্পষ্ট করতে না পারার জন্যেই পেছনকার লোকদের আতঙ্কটা যেন আরও বেড়েই গেছে; আর্তনাদের সঙ্গে যারা অক্ষত তাদেরও ত্রস্ত কোলাহল মিলে সমস্ত জায়গাটায় যেন কান পাতা যায় না।

আমাদের কক্ষে দুটি রিজার্ভ বার্থে আমরা ছিলাম দুজন! দৈবক্রমে, আমার যিনি সঙ্গী, তিনি একজন ডাক্তরই তবে নিরৌষধি, সুতরাং নিরুপায়। কলে যাচ্ছেন বাইরে, সঙ্গে ছোট যে একটি সুটকেস, তাতে নেহাৎ হয়তো স্টেথোস্কোপটা আর ইন্‌জেকশনের সরঞ্জাম থাকতে পারে। তবু দুজনের সঙ্গে ধুতি পাঞ্জাবী অল্পবিস্তর যা ছিল,—মায় আমার বিছানার চাদর পর্যন্ত সে সব ছিঁড়ে সাদা ব্যান্ডেজ বেঁধে যথাসাধ্য সাহায্য করতে লাগলেন তিনি। আমিও রইলাম খানিকক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেইসব উৎকট কাটা-ছেঁড়া নিয়ে ঘাটাঘাটি করা সহ্য হোল না, মাথা ঘুরতে লাগল, তাই তাঁরই পরামর্শে এক সময়ে তাঁর থেকে আলাদা হয়ে পড়লাম।

তবে বীভৎসতার একটা মোহ আছে, তারই টানে পড়ে জায়গাটা আর ছাড়তে পারছিলাম না। তা ভিন্ন দুর্বল মনকে যথাসাধ্য শক্ত করে নিয়ে কিছু করতেও হয় এ অবস্থায়, সহ্য করতে পারি আর আমার দ্বারা কিছু হয়ও এই ধরনের কোথায় কি আছে, খুঁজে পেতে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

বাঁধের নীচে একটা টানা গোঙানি শুনে নেমে গিয়ে দেখি একটা মাঝবয়সী লোক হাত ভেঙে পড়ে রয়েছে, তাকে তুলে নিয়ে এসে ওপরে শুইয়ে দিলাম। একটি বৃদ্ধ রাতকানা তার ছেলে খুঁজে পাচ্ছে না। বছর বারো-তেরোর ছেলেটি ভেতরে কোথাও চোট খেয়ে হাত কয়েক দূরেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল; বৃদ্ধকে আগে কিছু না বলে কাঁধের নিচের একটা খুঁট ভিজিয়ে একটু জল নিয়ে এলাম, তারপর ছেলেটিকে চাঙ্গা করে বাপের কাছে বসিয়ে দিলাম। এই রকম ছোটখাট ব্যাপার যা সামর্থ্যে কুলুচ্ছে সামলাতে সামলাতে এগিয়ে চলেছি। দরকার পড়লে ডাক্তারকেও টেনে নিয়ে আসছি মাঝে মাঝে; ও অবস্থায় যতটা সম্ভব সামলে দিচ্ছেন বা পরামর্শ দিয়ে আবার ওদিকে চলে যাচ্ছেন।...কতকটা অভ্যস্ত হয়ে পড়লে মাথাটাও একটু যখন পরিষ্কার হোল, বরফ-ভেণ্ডারের কামরাটা খুঁজে বের করলাম। ইঞ্জিন থেকে তৃতীয় গাড়িখানায় ইংরাজি আর হিন্দীতে লেখা ছোট্ট সাইনবোর্ডটা প্রবল ধাক্কায় দুমড়ে গেছে। খালি গাড়িতে ভেণ্ডারটা অজ্ঞান হয়ে বেঞ্চের নিচে পড়ে আছে। মাথায় বরফ দিয়ে তাকে সচেতন করে তুলতে একটা বিপদ হোল, বললে, বরফ সে ছাড়বে না, চড়া দামে বিক্রি করবে। মাথা তখন পরিষ্কার হবার দিকেই, মরবে না, যদি মরেই নেহাৎ তো যমের বাড়ি গিয়ে ব্যবসা ফেঁদে সুখেই থাকবে। বচসা করে তাকে খুব একচোট বকিয়ে আবার অজ্ঞান করে ফেললাম। বরফ সংগ্রহ হলে মনে পড়ল আমার গাড়িতে ফার্স্ট ক্লাসে এটাচি-কেস্ হাতে দুটো গোরাকে কতকটা মত্ত অবস্থাতেই উঠতে দেখেছিলাম। গিয়ে দেখলাম আমার আন্দাজটা ঠিকই আছে, দুটোই-দুর্ঘটনার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন; একটা বেঞ্চের ওপর, আর একটা মেঝেয় হাত-পা ছড়িয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। তিনটে ভরা আর একটা আধ-ভরা বিলাতি মদের বোতল সংগ্রহ হোল।

ডাক্তারের সঙ্গে তখন আরও জন পাঁচেক যুবক জুটে গেছে, তার মধ্যে অন্তত দুজনকে মনে হোল, হয় মেডিকেলের ছাত্র, না হয় নূতন ডাক্তারই।

বরফ আর মদের বোতল তিনটে তাঁর এলাকায় করে দিতে, ডাক্তার বিস্মিতভাবে আমার দিকে একটু চেয়ে রইলেন। বেশ কিছু প্রশংসাও ছিল দৃষ্টিতে, কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করার মতো সময় একেবারে হাতে নেই, একটা জটিল ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হচ্ছিল, ঘুরে তাইতে আবার মনোনিবেশ করলেন।

দাঁড়িয়েই ছিলাম, একটু পরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে না ঘুরেই বললেন—"অন্তত কাটবার একটা যন্ত্রপাতি পেলে হোত, করাত, ছেনি, যা হয়, আর খানিকটা টিংচার আয়োডিন..."

চিকিৎসাব্রতী দুটি যুবকের মধ্যে একজন একটু হেসে বললে—"আপনার আশাও কম নয়।..."

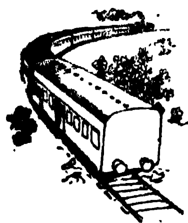
ওরা বেশ মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে এ-সব অবস্থায়। দ্বিতীয়টি হেসেই বলল—"আশা একটু আস্কারা পেয়েছে কিনা—ব্রাণ্ডি আর বরফ পেয়ে।..."

ব্যাণ্ডেজে গেরোটা দিয়ে ডাক্তার ঘুরে চাইতে আমার দিকে নজর পড়ল, বললেন—
"আপনি রয়েছেনই ?···তা আশা আস্কারা পাওয়াই বটে ; মাথা ঠাণ্ডা রেখে, গাড়িতে যে বরফ থাকে এ কথাটাই মনে রাখা শক্ত, আপনি আবার তার ওপর এল্‌কোহল এনে হাজির ; কী উপকার যে হোল ।"

এই দুর্বিপাকের মধ্যে একটু করতে পারা তার ওপর এই প্রশংসা, মনে যে একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠল, তাহাতেই বলে বসলাম—"করব আর একবার না হয় চেষ্টা ?"

এবার ডাক্তারের মুখে একটু বিদ্রূপের হাসিই ফুটল, বললেন—"বরফ আর কোথায় পাবেন ? চেষ্টায় তো জল জমিয়ে ফেলতে পারবেন না। ঘুমন্ত গোরাও তো আর নেই গাড়িতে ।"

বললাম—"না, যন্ত্রপাতি আর আয়োডিনের কথা বলছি ।"



ডাক্তার হেসেই উত্তর করলেন—"আপনার আশা দেখছি আমার আশার চেয়েও বেশি। আস্কারা পেয়েছে ৷।"

ভাবের ঘোরে বাধাটা পেয়ে একটু অপ্রতিভ হয়ে গেছি বোধ হয়, সেইটে কাটাবার জন্যেই একটু বেশি জোর দিয়ে বললাম—"আমি দৈব বিশ্বাসী—সবই তো সম্ভব তাঁর রাজ্যে··কে বলতে পারে ?"

ডাক্তার এবার একটু জোরেই হেসে উঠলেন, আরম্ভ করলেন—"আশার চেয়ে আপনার বিশ্বাসটা আবার···"

আমি চাপা দিলাম—"কেন, দেখুন না, এতবড় কলিশনটা যে হবে, তা এই এতগুলো লোকের মধ্যে একজনও জানত ?"

ডাক্তার একবার চোখ তুলে কি ভাবলেন ; তারপর আমার মুখের ওপর দৃষ্টি নামিয়ে একটু অন্যভাবে হাসলেন এবার ।

কিন্তু সময় নেই মোটেই। হাত কয়েক দূরেই একটা বড় খারাপ কেস্‌, পা বাড়িয়ে বললেন—"তা হলে দেখুন, উইশ ইউ লাক্‌···অন্তত এর মধ্যে দাড়িয়ে থাকা চলবে না আপনার ।"

ওখান থেকে সরে এসেই বুঝতে পারলাম কথাগুলো নিতান্তই তর্কের ঝোঁকে বেরিয়ে

গেছে মুখ থেকে। কাটবার যন্ত্রপাতি কে নিয়ে বসে আছে আমার জন্যে? আয়োডিন তো দূরে থাক্।

খুবই লজ্জায় পড়তে হবে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হলে; তা আর ওদিকে না মাড়ালেই হোল। রিলিফ ট্রেনটা এলে আস্তে আস্তে গিয়ে চেপে বসলেই হবে।

ক্লান্তি এসেছে বেশ; আসল কথা, মনের ওপর দুর্ঘটনার চাপটা বরদাস্ত করতে পারছি না, নৈলে খাটুনি যে খুব বেশি হয়েছে এমন নয়। ঠিক করলাম শরীরটা এলিয়ে দিয়ে একটু জিরিয়ে নিই, তারপর আবার না হয় ঘুরে-ফিরে দেখব কতটুকু কি করতে পারি; কাজ তো রয়েছে, কিন্তু শরীর যেন বইছে না।

নিজের সেকেণ্ড ক্লাস কামরাটাতেই উঠতে যাব, ভেতর থেকে একটা কর্কশ শব্দ এল— মেঝের ওপর দিয়ে ভারী ট্রাঙ্ক বা সুটকেস টানাটানি করলে যেমন হয়। ডাক্তার বা আমার ও ধরনের কিছু ছিল না, শুধু বার্থে দুজনের দুটো বিছানা পাতা ছিল, সেই অবস্থাতেই রেখে নেমে গেছি। একটু বিস্মিত হয়ে শব্দটা অনুধাবন করবার মধ্যেই হঠাৎ খেয়াল হোল এই রকম দুর্ঘটনায় চুরিচামারির হিড়িকটাও যায় বেড়ে। তাতাতাড়ি উঠে পড়লাম।

দেখি, সত্যিই একটা লোক মেঝেয় হামাগড়ি দিয়ে একটা বেঞ্চের নিচে একেবারে কোণের দিকে কি একটা ঠেলে রাখছে যেন; আমার ওঠার শব্দে তাড়াতাড়ি সরে এসে সামনাসামনি হয়ে একটু থতমত খেয়ে দাঁড়াল!

আমার একটু ভুলই হয়েছিল, কিন্তু তরল জ্যোৎস্নায় লক্ষ্য করে দেখলাম—না কাছে কোন অস্ত্রশস্ত্র নেই। এদিকে পোশাকপরিচ্ছদে ভদ্রলোক বলেই মনে হোল।

প্রশ্ন করলাম—"কি ব্যাপার?"

বাঙালী নয়; উত্তর করলে—কুছু নয়।"

"হঠাৎ এ কামরায়?—ছিলেন না তো আপনি।"

"আমারটা ভাঙিয়ে গিয়েসে।"

ভেঙে গেছে!···কোনটাতে ছিলেন আপনি?"—একটু উৎসুক দৃষ্টিতেই আগাগোড়া একবার দেখে নিলাম॥

উত্তর হোল—"তিসরা গাড়িতে।"

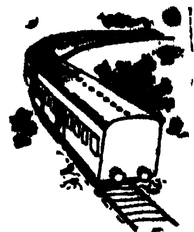
"খুব বেঁচে গেছেন তো আপনি।"

"ঈশ্বর মালিক।"—বলে ওপরের দিকে হাত তুললে। কথাবার্তার পরিণতিতে বেশ যেন নিশ্চিন্তও হয়েছে বলে মনে হোল! তাতেই আমার খটকাও লাগল একটু; আর কেউ সঙ্গে ছিল কিনা জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম, কথাটা উল্টে প্রশ্ন করলাম—"তা ভেতরে কি রাখছিলেন আপনি অমন করে?···"

আবার "কুছু না।"—বলাতেই আমার সন্দেহ গেল বেড়ে। বেশ একটু গম্ভীরভাবেই প্রশ্ন করলাম—"কিছু নয় তো দেখতে পারি কি?"

মুখের পানে তেমনি ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল ; আরও বেড়েই গেল সন্দেহটা আমার। এগুতেই যাচ্ছিলাম, আমার পথ আটকে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গেই হাতটা ধরে কাতরভাবেই বললে—'শোনেন বাঙালীবাবু, আমার দাবাইকা বকসা আছে।"
কথাটা কানে যেতেই আমি নিজে এক পা পেছিয়ে গেলাম, বললাম—"দাবাইয়ের বাক্স! ···আপনি ডাক্তর ?"
"না, আমার দাবাইয়ের দোকান আছে···"
"কোথায় ?···কি কি দাবাই আছে ?···টিংচার আইডিন ? ইনজে্কসন, অ্যান্টিটিটেনাস ?"
চঞ্চল হয়ে উঠেছি অতিমাত্র ; উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললাম—"ও বাক্স আমার চাই—এক্ষুনি—কাজের ওষুধ নিশ্চয় আছে কিছু—কিছু না কিছু পড়বেই বেরিয়ে···"
আমার হাত ছেড়ে স্থিরদৃষ্টিতেই মুখের পানে চেয়ে শুনছিল, আবার হাতটা ধরে শান্তকণ্ঠে বললে—"আপনি বেচৈন হচ্ছেন বাঙালীবাবু, আসুন দোঠো জরুরী বাত আছে। বসুন অস্থির হোয়ে শুনুন।"
বসল বেঞ্চটায়। আমিও কি ভেবে পাশে বসে শান্ত কণ্ঠে বললাম—"কি বাত, বলুন।"
দেখলাম পকেট থেকে এর মধ্যে দুটো দশ টাকার নোট বের করছে ; কতকটা যেন লুকিয়ে অথচ দেখতেও পাই এইভাবে হাতে ধরে রেখে বললে—"বাত এই যে, ডাগদারবাবু যেখানে ইলাজ করছেন, আমি ভি সেইখানে ছিলো ; সব বাত শুনিয়েছে। সেইজন্যে তাড়াতাড়ি এসে মাল সরিয়ে ফেললো !"
শান্তকণ্ঠেই বললাম—"কিন্তু সরিয়ে কি ভাল করলেন ? এতগুলো লোকের প্রাণ···"
"শোনেন বাঙালীবাবু, জান কোই কারু নিতেও পারে না, কোই কাউকে দিতেও পারে না···আমার হকের মাল—নেপাল তরাইয়ে আমার দোকান···"
ভুল হয়ে যাচ্ছে, চোরাকারবারী ভেবে থাকতে পারে হাতে নোট দুটো দেখে আমি নরম হয়ে গেছি। এদিকে দেরিও হয়ে যাচ্ছে, আমি সোজা দাঁড়িয়ে উঠলাম। বললাম—"দেখুন, ওষুধ আপনাকে দিতেই হবে ; দেরিও হচ্ছে যাচ্ছে।"
উঠে রুখে দাড়াল—"আমি দিবে না বাবু।"
"এর জন্যে আপনি পুলিস কেসে পড়বেন—শক্ত সাজা—জানেন না বোধ হয়···"
"আপনি উকিল ?"
সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর করলাম—"হ্যা—পাটনায় প্র্যাকটিস করি।"
থমকে মুখের দিকে চেয়ে একটু চুপ করে রইল। তারপর আরও শক্ত হয়ে উঠে বললে—"তা উকিল আছেন, ভালোই আছেন, ভগবান আপনার তরক্কি করুন। লেকিন্ আমার হকের মাল। আমি ছাড়ব না···"

"আপনার হকের মাল—তার প্রমাণ ?"
নিমেষেই পকেটে হাত পুরে একটা কাগজ বের করে সামনে ধরলে—"সাবুত নেই ভেবেছেন ?—ই দেখুন চালান..."
কাগজটায় চোখ বুলিয়ে আমি আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। ভাল ওষুধ যা সদ্য ডাক্তারবাবুর কাজে লাগবে—টিংচার আওডিন, বেনজিন, আরও অন্য রকমের অ্যাণ্টিসেপটিক, মায়—ব্যাণ্ডেজ, বোরিক তুলো পর্যন্ত...এদিকে অবশ্য কুনিন্, প্যালোড্রিন জাতীয় ওষুধও আছে। তালিকার শেষে দামটায় দেখলাম—প্রায় সাড়ে আট শত ; অবশ্য তরাইয়ে গিয়ে সাড়ে আট হাজরে দাঁড়াবে।
কিন্তু ধৈর্য রাখতে পারিনিই বা কেমন করে বলি ? একটু বুদ্ধি ছিলই যে, যদি লোক ডাকাডাকি করে ব্যাপারটা বলি তো ওকে মেরে তক্তা করে মাল খালাস করবে।



একলাই লেগে গেলাম। কি ভেবে ও-ও চেঁচামেচি করলে না। বেশ একটা ভদ্রলোকের ধ্বস্তাধ্বস্তি যে হোল তাতে একটু আধটু জখমও হলাম দুজনে। তারপর বেঞ্চের কোণে কপালটা ঠুকে বেশ খানিকটা কেটে গেল লোকটার। আমার তখন খুন চেপে গেছে। বললাম—"হয়েছে কি ? তোমায় শেষ করে নিয়ে যাব বাক্স আমি।"
রুমাল বের করে চেপে ধরছে কপালটা। বললে—"কুছ দোরকার নেই বাঙালীবাবু, আপনি খুশিসে নিয়ে যান বক্সা।"
সঙ্গেই নিয়ে যাচ্ছে। খুব ভাল করে ঠোকা ছিল না বাক্সটা। ছেলেরা খুলে ফেললে। ডাক্তার ওদিকে খুব ব্যস্ত, হাতের কাজ শেষ হলে সাজানো শিশি-বোতল-ব্যাণ্ডেজ-অ্যাম্পুলগুলোর দিকে চেয়ে একবার আমার মুখের দিকে চাইলেন, একটু হেসে বললেন—"ভাগ্যিস আমার কথা কইবার ফুরসৎ নেই মশাই, নইলে কি ভাষায় যে আপনার তারিফ করতাম—সমস্যায় পড়ে যেতাম একটা..."
আমি ওঁদের সব কথা বললাম না। গল্প শোনবার মতো ফুরসৎও নেই কারুর। তবু একটু কৌতূহল যে হয়েছিল সেটা এই বলে মেটালাম যে, বাক্সটা নিতান্ত দৈবক্রমেই একটা গাড়িতে পেয়ে গেছি।
ইতিমধ্যেই রাগটা পড়ে গিয়ে একটা ঠিক করেও ফেলেছি। আহা, ব্যবসাদার লোক, অযথা ক্ষতিই বা করাতে যাই কেন ? ঠিক করলাম, দরকারের অতিরিক্ত যা ওষুধপত্র

বাঁচবে, তা ফিরিয়ে দেবে লোকটাকে।' তারপর চালানটা হাতেই রয়েছে, যে ওষুধ ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি ব্যবহার হোল গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে যাতে তার দামটাও পায়, তার চেষ্টা করা যাবে। উপকার যা হচ্ছে, সত্যিই তার হিসাব হয় না। লোকটা যে রকমই হোক, ওই তো সবটুকুর মূলে। এক সময় আমি ওর প্রতিরোধের ভাবটা ভুলে সত্যিই অন্তর দিয়ে ক্ষমা করতে পারলাম ওকে—আহা, কি করবে? ওই ওর রুজি! স্বার্থের মুখে সব সময় সবার মনের অবস্থা তো ঠিক থাকে না। জখমও হয়েছে বেচারী; শেষ চোটটা কি রকম ছিল, রাগের মাথায় দেখাও হয় নি।

দুর্ঘটনার দৃশ্যাগুলো ক্রমে সয়েও আসছে নজরে। ওরা দরকার মতো সব ওষুধগুলোই পেয়ে চিকিৎসায় মেতে উঠেছে। দেখছি দাঁড়িয়ে, আর যতই দেখছি ততই মনটা লোকটার প্রতি সহানুভূতিতে ভরে উঠছে। আর কিছু কি করা যায় না ওর জন্য?

করা যায় বৈ কি। কাজ হয়ে যাক, তারপর ডাক্তারকেও দলে টানব। বলব, 'গোড়ায় বলা দরকার মনে করি নি—ওষুধের বাক্সটা একটা ব্যবসায়ীরই এবং সে স্ব-ইচ্ছাতেই আমার হাতে চিকিৎসার জন্য তুলে দিয়েচে।' এর পর ডাক্তারকেও রাজী করানো শক্ত হবে না বলতে যে সত্যই লোকটা নিজে হাতেই বাক্সটা চিকিৎসার জন্য তাঁর হাতে দিয়েছিল—এমন কি নিজেই ঘাড়ে করে যে পেঁাছে দিয়েছিল—একথা বললেও তিনি নিশ্চয় আপত্তি করবেন না। এই করে ও'র সাক্ষ্যের জোরে মূল্য ব্যতীত গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে একটা মোটা পুরস্কারও পাইয়ে দিতে পারা যাবে লোকটাকে।

তা হলে খুঁজে বের করে যত শীঘ্র তাকে আমার সংকল্পটা জানিয়ে সান্ত্বনা দিতে পারি। ইতিমধ্যে একটু চিকিৎসাও তো দরকার। সেদিকেও একটা অন্যায় হয়ে যাচ্ছে আমার তরফ থেকে।

বেরিয়ে পড়লাম ওখান থেকে।

বেশি দূর যাই নি, পেছন থেকে কে ডাকল—"বাবুজী!"

ঘুরে দেখি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটা আড়াল থেকে একজন লোক বেরিয়ে আসছে, প্রথমটা সন্দেহ হয়েছিল সেই লোকটাই—আগেও যেমন আড়াল থেকে আমাদের সবকথা শুনেছে বললে, এবারেও বোধ হয় তাই করছিল! খানিকটা এগিয়ে আসতে কিন্তু আমার সে ধারণাটা গেল, হাতে পায়ে কাঁধে—সর্বত্র ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, ছেঁড়া ধুলধুকড়ি জামা, কাপড়টাও ছেঁড়া আছে—যেটুকু কোমরে সেটুকুও সমস্তটার আধখানার চেয়েও কম। বেশ বোঝা যায়, চারিদিকে ব্যাণ্ডেজ যা বেঁধেছে, তা বাকী আধখানা থেকে। সবচেয়ে দ্রষ্টব্য হয়েছে মুখের ব্যাণ্ডেজটা—মাথায় জড়িয়ে একটা চোখ ঢেকে গলায় পাক দিয়ে এমনভাবে বাঁধা যে, সমস্ত মুখটাকে একেবারে বিকৃত করে তুলছে। এর ওপর গায়ে জামায় কাপড়ে সর্বত্রই রক্তের ছোপছাপ।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে খানিকটা কাছে এসে পড়তেই আমি শিউরে উঠে বললাম—"এৎনা চোট! আপ্ চলিয়ে নেহি, ডাক্তারকে বোলা লে আতা..."

সেই ভাবে আরও একটু এগিয়েই এসে মুখের দিকেএকটু চেয়ে রইল। তারপর—বললে—"আপনি পহ্ছানছেন না বাঙালীবাবু, আমি সেই দাবাইয়ের মালিক…"

ব্যান্ডেজের চাপে কথাগুলোও ভাল করে বেরুচ্ছে না।

বিস্ময়ে আমার মুখেও রা সরছে না। খানিকক্ষণ চেয়েও রইলাম। তারপর ধীরে ধীরে বললাম—"আপনি দাবাইয়ের মালিক!…তা এত আঘাত!…মাপ করবেন, আমিই এর জন্য দায়ী নয় তো?…কিন্তু এত চোট তো আপনার তখন…লেগেছিল কি এ রকম চোট?…যাই হোক, আপমি চলুন ডাক্তারবাবুর কাছে…যে জনাই হোক, সত্যিই আমি বড় দুঃখিত, আমায় মাপ করুন…"

বিকৃত মুখে একটু হাসি টেনে সমস্ত কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল, শেষ হলে এগিয়ে এসে আমার হাতটা ধরলে! তারপর সেই ব্যান্ডেজের চাপের মধ্যে থেকে বললে—"কিছু হামার দোরকার নেই বাঙালীবাবু, দুটো প্রাইভিট বাত আাছ, একটু সরিয়ে আসুন।"

একটু নিরিবিলি দেখে আমরা এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম—

"কপালের চোটটা লাগতে আমার মগজটা একটু সাফ হয়ে গেল বাঙালীবাবু—ভাবলুম, কে ওষুধ নিয়ে দুনিয়ায় এসেছে, কে ওষুধ নিয়ে দুনিয়া থেকে যাবে? তার থেকে এক আকিলকা কাজ করা যাক। হনুমানজী আমায় লাখোগুণ দিয়ে দেবেন তাতে!…দ্যাখেন বাঙালীবাবু, আপনি উকিল, উদিকে ডাগদরবাবু আপনার দোস্ত, উকিলের কাছে ছিপালে চলবে না,—ই যে দেখছেন সব ব্যান্ডেজ, ই সব…"

অতিরিক্ত বিস্ময়ে মুখ দিয়ে বেরিয়েই পড়ল—"সব মিথ্যে!"

বিকৃত মুখেই একটু চতুর হাসি, উকিল-মক্কেলের মাঝে যা চলে।

"বিলকুল যে ঝুট তা বলতে পারি না বাঙালীবাবু, তবে উকিলের কাছে ছিপালে চলবে না—যেখানে একগুণ সেখানে…"

"দশগুণ করেছেন?"

হাসলে।

"কাজের কথা শোনেন বাঙালীবাবু—যা মতলব বের করেছি—ডাগদরবাবু আপনার দোস্ত, তাঁকে দিয়ে এক জবরদস্ত সার্টিফিটি—কম্ সে কম্ পচাশ হাজারের ডামিজ রেলবী কোম্পানীর কাছ থেকে…দিব বাঙালীবাবু, ডাগরবাবুকে জবরদস্ত ফি ভি দিব তাঁর সার্টিফিটির জন্যে—আর আপনি—আপনি তো আমার উকিলই থাকবেন—তার জন্যে সণ্ডন হিসেবে যা হুকুম কোরেন—পচিশ—পচাশ—যোতো টাকা খুশি আপনার…"

—



প্যাটার্ন

সূত্রপাত সামান্য কথা থেকে, কিন্তু হ'য়ে পড়ল তুমুল কাণ্ড।

ভদ্রলোক একটু অদ্ভুত প্রকৃতির বৈকি, অন্তত এই দিক থেকে যে, এখনও সেই ইংরেজী আমলের মেজাজটার জের ধরে আছেন। বিলাতী সুট-পরা একথা বলাই বাহুল্য; মুখে একটা লম্বা চুরুট। সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ি, যাত্রীর মধ্যে এদিকে উনি আর আমি দুখানা বেঞ্চ জুড়ে; একেবারে উল্টাদিকের বেঞ্চে ওঁর স্ত্রী আর একটি বছর চারেকের শিশুপুত্র। জিনিসপত্রও যা, সব ঐদিকেই। একটু আলাপ জমাবার চেষ্টা করছিলুম, কিন্তু লোকটিই এত জমাট যে গলানো গেল না। গাড়ির দেওয়ালে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে একটা বিলাতী পত্রিকা পড়ছিলেন, অল্প একটু ঘাড় ফিরিয়ে চুরুটের ফাঁক দিয়ে উত্তর হিসাবে অল্প যে কয়েকটি কথা বেরুল তাতে এই ইঙ্গিতটাই স্পষ্ট হয়ে রইল যে অনধিকার প্রবেশ হচ্ছে। আর এগুনো গেল না। বর্ধমানে গাড়িটা পোঁছালে কাগজের হকার অমৃতবাজার বাড়িয়ে ধরলে চুরুট টিপে জিজ্ঞেস করলেন স্টেটস্‌ম্যান্ আছে কি না। নেই বলাতে নিজের কাঁধের ওপর বুড়ো আঙ্গুলটা বেঁকিয়ে স'রে যেতে বললেন। ঠোঁটে চেপে একটু ইংরাজীই ঝাড়লেন···"ক্লিয়ার আউট।"

একটা বাংলা কাগজ কিনেছিলুম, সেইটে সামনে ধ'রে মনে মনে জাতীয় জীবনের পূর্বাপর আলোচনা করতে করতে যখন টালিট পেরিয়ে খানা জংশনে এসে পড়েছি সেই সময় ব্যাপারটুকুর সূত্রপাত হোল। একটি ভদ্রলোক কিছু বেশিই লটবহর নিয়ে আমাদের গাড়িতে এসে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে তার স্ত্রী. একটি বছর ছয়েকের মেয়ে এবং কোলেও একটি শিশু, তার ফিডিং বট্‌ল্‌টা মহিলাটির হাতেই রয়েছে। স্ত্রী আর মেয়েটিকে তুলে দিয়ে বাক্স, সুটকেশ, হোল্ড আল্, পোঁটলা, শিশুর ফোল্‌ডিং মশারি,

নানা রকম জিনিসভরা বেতের টুকরি, টিফিন কেরিয়ার, জলের কুঁজো প্রভৃতি একে একে সব দোরের সামনে ঠেলে ঠেলে দিয়ে কুলি দুটোকে পয়সা চুকিয়ে দিয়েছেন এমন সময় গাড়িটা ছেড়ে দিলে। ভদ্রলোক জিনিসগুলো টপকে এদিকে এসে দাঁড়ালেন। তারপর একবার সেগুলোর ওপর দৃষ্টি দিয়ে গাড়ির চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন, বোধ হয় কোথায় কি ভাবে রাখবেন আন্দাজ ক'রে নেওয়ার জন্যেই।

আমার নজর কয়েকবারই সুটধারী ভদ্রলোকটির মুখের ওপর গিয়ে পড়েছে বুঝলুম বেশ গরম হয়ে উঠেছেন। আমার কেমন লোভ হোল একটু, আগন্তুককে বললুম—আপনি এক কাজ করুন। এদিককার বাঙ্কটা তো ভর্তি—আমারই জিনিস ওগুলো—আপনি মেয়েদের ঐদিকে দিয়ে জিনিসপত্রগুলো এইদিকেই নীচে গুছিয়ে রাখুন, ওঁদের দিকে আর গাদা লাগিয়ে কাজ নেই, কোথায় যাবেন ?"

অনুভব করলুম সুটধারীর বক্রকটাক্ষ চকিতে আমার মুখের ওপর পড়ে আবার বিলাতী কাগজখানার আড়াল হয়ে গেল।

আগন্তুক বললেন…"যাব মধুপুর।…সেই ঠিক, এই দিকেই রেখে দিই।"

স্ত্রীকে ওদিকে গিয়ে বসতে বলে মালপত্রগুলো টেনে টেনে আমাদের বেঞ্চ দুখানার মধ্যে গুছিয়ে রাখতে লাগলেন। আমি বার তিনেক সুটধারীর দিকে না চেয়ে পারলুম না, একবার চোখোচোখিও হয়ে গেল। এই সময় মেয়েদের দিকে হঠাৎ ব্যাপারটা আরম্ভ হয়ে গেল।

"এ কি!"—ব'লে বেশ একটু চড়া গলায় একটা প্রশ্ন শুনে ঘুরে দেখি সুটধারী ভদ্রলোকের স্ত্রী বেশ রুক্ষভাবেই চেয়ে আছেন ছেলেটির নিকার-বোকারের কাঁধের কাছটা একটু টেনে ধরে ; যিনি নূতন এলেন, শিশুটির জননী শিশুটিকে কোলে নিয়ে একটু অপ্রতিভভাবে সেইদিকে রয়েছেন চেয়ে, বললেন—"মাফ করবেন, ছিপিটা ঘ্যাসটা-ঘ্যাসটির মধ্যে কখন আলগা হয়ে গেছে একটু তাইতেই চলকে পড়ল দুধটুকু।"

দাঁড়িয়েই ছিলেন, ছোট মেয়েটি পোঁটলা থেকে কাঁথা বালিশ বের ক'রে বিছানা করছিল, ছিপিটা আবার এঁটে দিতে দিতে শিশুটিকে শুইয়ে দিতে যাবেন, প্রথম গলাটা একটু নামালেও মন্তব্যটা বড় রূঢ় করেই পরিবেশন করলেন—ফিডিং বটল ব্যবহার করতে জানেন না তো ও—স্টাইল কেন ?"

শিশুর মা একটু ঝুঁকেই ছিলেন, শিশুটিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে, একেবারে সিধে হয়ে উঠলেন। একটু যেন অবাক হয়েই চেয়ে রইলেন, তারপর চকিতে একবার এদিকে কর্তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে, প্রথমার একটু বেশি আধুনিক-ঘেঁষা বেশভূষার ওপর সেই দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বললেন—"দেখুন, যারা সর্বদাই স্টাইলের স্বপ্ন দেখে তারাই এ ধরনের কথা বলতে পারে ; নৈলে ফিডিং বটল্ একটা স্টাইল না, দরকার।"

"ক্ষমতা, শিক্ষা, আর রুচি থাকলে স্টাইলের স্বপ্ন দেখবেই লোকে।"

"স্বপ্নই তো—বেশির ভাগ অক্ষমতা আর কুশিক্ষা, কুরুচি থাকলেই ওটা এসে উপদ্রব করে।"

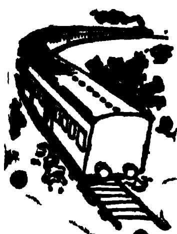
"মুখ সামলে কথা বল।"

—ভদ্রমহিলার গলা খন্‌খন্‌ ক'রে উঠল, আগেকার চেয়েও চড়িয়ে দিয়েছেন। শিশুর জননীও এবার বেশ উগ্র হয়েই উত্তরটা দিতে যাচ্ছিলেন, তাঁর স্বামী এতক্ষণ যেন মূঢ় ভাবে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঠিক উত্তরের মাথায় মুখটা ঘুরিয়ে একটু ধমকের সুরে বললেন—"চুপ করো না, তুমিই বা সু-শিক্ষার কি পরিচয় দিচ্ছ?"

এদিক থেকে সুটধারী একেবারে গর্জন করে উঠলেন—"শাট্‌ আপ্‌ !!"

উঠে বসেছেন।

আরম্ভ থেকে এ-পর্যন্ত সমস্তটুকুতে বোধ হয় এক মিনিটও লাগল না, সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধটা ও-কেন্দ্র থেকে এই কেন্দ্রে এসে পড়ল।



আগন্তুক ঘাড়টা এই দিকে ঘুরিয়ে ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে প্রশ্ন করলে—"এর মানে? একেবারে অগ্নিশর্মা হ'য়ে উঠলেন দেখছি যে!"

"ইয়েস্‌। শিক্ষা আপনাদের দু'জনের কারুরই নেই।"

আগন্তুক শান্ত কণ্ঠেই উত্তরটা দিয়েছেন। একেবারে ঘুরে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—"খবরদার। মেয়েদের টেনে কথা বলবেন না!"

সুটধারীও উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—"আলবৎ বলব। আপনি আরম্ভ করেছেন!"

"আমি আমার ওয়াইফ্‌কেই বলেছি।"

"ইট্‌ ওয়াজ এ ফিং এ্যাট্‌ মাই ওয়াইফ্‌।" (ওটা আমার স্ত্রীকেই ঘেঁসে বলা!)

"নেভার!"

"সিওর!···শিক্ষা আপনাদের হওয়া দরকার।"

"আবার 'আপনাদের'।....দিন শিক্ষা তাহলে; দেখি কত মুরোদ!"

—কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গেই আগন্তুক একরকম লাফ দিয়েই এগিয়ে গেছেন, আমি মাঝখানে গিয়ে পড়লুম। বললুম—"এ কি হচ্ছে একটা ভুল বোঝাবুঝির ওপর! শান্ত হ'য়ে বসুন দুজনে।"

আগন্তুক বললেন—"ভুল বোঝা কি মশাই? ভুল বোঝা সে একবার হতে পারে, উনি রিপীট করলেন কথাটা···"

"আবার করব—একশ বার করব···"

"জিভ উপড়ে নোব!"—বলে আগন্তুক আমায় ঠেলে এক পা এগিয়ে গেছেন এমন সময় ঘটনার মোড়টা হঠাৎ ফিরে গেল। গাড়ির ওদিকে মেয়েরা একেবারে যেন ভ্যাবাচাকা মেরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, উনি পা-টা বাড়াতেই প্রথমা আতঙ্কে চীৎকার করে উঠে ওদিকের চেনটা ধরে খ্যাঁচ করে টেনে দিলেন। কট্‌কট্‌ শব্দ করতে করতে গাড়ীটা খানিকটা গিয়েই থেমে গেল।

সবাই একটু যেন কি রকম হয়েই গেল; বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেল তো। আমার মুখ দিয়েই কথাটা আগে বেরুল, প্রথমায় দিকে চেয়ে অনুযোগের সুরেই বললুম—"এ কি করলেন আপনি হঠাৎ, কেলেঙ্কারীটা বাইরে পর্যন্ত পড়িয়ে পড়ল যে!"

একটু চুপচাপ গেলই, তারপর ওঁর স্বামীই ওঁকে সমর্থন করলেন, বললেন—"ঠিক করেছে, উনি আমায় অ্যাসল্ট করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আপনি সাক্ষী আছেন। গড়াক বাইরে কতদূর গড়াবে, আমি প্রস্তুত আছি।"

আগন্তুক বললেন—"সাক্ষীর দরকার নেই তো, অস্বীকার করছে কে?—তবে ওঁকে বলতে হবে প্রোভোকেশন্‌টা কত বড়; আপনি ফ্যামিলী নিয়ে অপমানসূচক কথা বলেছেন; মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া নয়, রিপীট পর্যন্ত করেছেন।···আমিও প্রস্তুত।"

প্রস্তুত হয়ে দু'জনে আপসাতে পেছু হটে দুটো বেঞ্চে বসে পড়লেন।

মনে করলুম—যাক্‌, যে করেই হোক ব্যাপারটা আপাততঃ ঠাণ্ডা হোল। গাড়ির চেন টানাটা আজকাল একটা নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে, নিয়ম-লঙ্ঘন নয়; কেউ কিছু বলে না বিশেষ। হাওড়া থেকে এ পর্যন্ত আসতে বার-দুই হয়ে গেছে, থেমে পড়েছে, ইঞ্জিন থেকে লোক নেমে এসে পাখাটা ঠুকে ভেতরে করে দিয়ে গেছে, আবার গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। যদি আসেই কেউ তো একটা মন-গড়া কিছু বলে দেওয়া যাবে'খন।

আমি ভাবছি—দু'জনেরই মনোমত হয়, এমন কি একটা ওজুহাত বের করা যায়। ওঁদের মুখের ভাবও যেন একটু নরম হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে গাড়ির আবহাওয়াটা তাহলে বোধ হয় হয়েই এল সহজ।

কিন্তু তা কি হবার জো আছে?

এদিকটা যদি ঠাণ্ডা হোল তো ওদিকটা আবার আস্তে আস্তে গরম হয়ে উঠতে লাগল। ···খানিকটা রাত্রি হয়েছে। অন্ধকার মাঠের মাঝখানে গাড়িটা রয়েছে দাঁড়িয়ে, লাইনের পাশে আগাছার ঝোপে একটানা ঝিল্লির ডাক ছাড়া চারিদিকে নিস্তব্ধ, আমরা যে-যার চিন্তা নিয়ে কেউ আসে কিনা তার প্রতীক্ষা করছি, পেছনের দিকে মৃদু গুঞ্জন উঠল—

"আমি তখুনি বলেছিলুম—গাড়িটা এত খালি যখন, বুঝে-সুঝে ওঠো, হামেশাই তো লোকের অভাব নেই।…লোকে রাতবেরাতের পথে একটু ভাল সঙ্গী চায়।"

একটু নিস্তব্ধতা, তারপর অপর কণ্ঠে—

"আমি বারণই ক'রে দিয়েছিলুম—দোরের কাছে রয়েছ, যাকে তাকে ঢুকতে দিও না।"

"আবার একটু চুপচাপ, তারপর—

"মগের মুল্লুক যেন ; আইন নেই তো !"

এবার সঙ্গে সঙ্গেই, তবে আত্মগত ভাবেই—

"আইন শুধু যাদের স্টাইল আছে, তাদের জন্যেই যেন !…"

আর আত্মগত নয়, আওয়াজও চড়া—

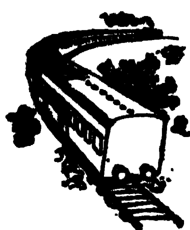
"আপনি আবার স্টাইলের কথা মুখে আনছেন।"

"আপনি আগে এনেছিলেন !"

—বেধে গেল।

"হ্যাঁ এনেছিলুম। এইবার যা নিয়ে গোড়াপত্তন সেই স্টাইলের নিকুচি করছি !"

কাঁপতে কাঁপতে প্রথমা ঘুমন্ত শিশুর কাঁথার ওপর থেকে ফিডিং বট্‌ল্‌টা তুলে নিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জননীও "ও মাগো !…বাছার !…বলে দাঁড়িয়ে উঠে ও'র হাতটা ধরেছেন, আমরাও তিনজনে "কি হোল !" ব'লে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছি, এমন সময় ব্যাপারটা হঠাৎ একটা জায়গা পর্যন্ত উঠেই যেন নিশ্চল হয়ে থেমে গেল। প্রথমার হাতে বোতলটা, নিশ্চয়ই ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই তালে শিশুর জননী কব্জীর ওপরটা চেপে ধরেছেন এবং ঠিক সেইভাবে হাত দুটো উঁচু করে থেমে গেছেন দু'জনে। দুগাছা সোনার চুড়ি বিদ্যুতের কড়া আলোয় ঝক্‌ঝক্ করছে। আমরা এদিকে কিছু বুঝতে না পেরে কিস্তুতকিমাকার হয়ে গেছি।



সবচেয়ে আশ্চর্য প্রথমার ভঙ্গিটা নবাগতার তোলা হাত দুটোর দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে যেন সম্মোহিত হয়ে গেছেন, একেবারে সাড় নেই।

তারপর মুখে একটু একটু হাসি ফুটে উঠল, সেই সঙ্গে একটু লজ্জাও। হাত আস্তে আস্তে নামিয়ে নিলেন। বললেন—"আসুন, ঐ দিকটায়ই বসি।"

ঐ দিকটায় মানে শেষের বেঞ্চটায়, যেটা ও'রই দখলে ছিল।

পাশাপাশি হয়ে বসেছেন সখীর মতো দু'জনে ; কৌতূহলকে সাধ্যমতো সংযত করে আমি আবার গাড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে খবরের কাগজটা সামনে ক'রে নিলুম। সুটধারী ভদ্রলোকেরও সে সুবিধা আছে ; শুধু আগন্তুককে পেছন ফিরেই বসতে হোল ; শ্রুতি যতটুকু সাহায্য করে।

প্রথমা শিশুর জননীর ডান হাতটি আলগাভাবে তুলে ধরেছেন—

"আপনার চুড়ির এই প্যাটার্ণটি ভাই অনেক দিন আগে একটি মেয়ের হাতে দেখেছিলুম, একটা বিয়ে বাড়িতে, তারপর কত খোঁজ করেছি, তা একবারও কি আর চোখে পড়ল যে সেইমতো ফরমাস দিই ?—শেষে হার মেনে এই দেখুন না···"

নিজের হাতটা একটু চিৎ করে ধরলেন।

শিশুর জননী বাঁ হাতে চুড়িগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে বললেন—"এও তো বেশ ভাই ; আমার চোখে তো লাগছে।"

"অবিশ্যি, খুব খারাপ নয়। তা ব'লে আপনার এর কাছে। কী যে বলেন, যেন চোখ ফেরানো যায় না !···কোথা থেকে কেনা ভাই ? না, গড়ানো ? ঠিকানাটা দিতে পারেন ? আর প্যাটার্ণের নাম যদি কিছু থাকে।"

"খুকীর বাপ কোথা থেকে যে এনেছিল—কলকাতারই একটা দোকান, তবে বড় কোন নয় ; জেনে বলতে পারি।"

"ও বাবা ! যা চটিয়ে দিয়েছি ; চুড়ির বদলে হাতকড়ির ব্যবস্থা হচ্ছে, দেখছেন না ?"

—একটু চাপা গলায় ; দুজনের কণ্ঠেই একটু তরল হাসি ছলকে উঠল।

শিশুর জননী বললেন—"তা এক কাজ করুন না। আপনার ঠিকানাটা দিন। গিয়েই একটা নক্সা এঁকে পাঠিয়ে দোব। ছোট দোকান একটা—ঢাকার এক রিফিউজি এসে করেছিল নাকি। এখন আছে কি না আছে তাই বা কে জানে।···কোথায় থাকেন ?"

"মধুপুর !···মুশকিল—নক্সা দেখে জিনিস গড়ে দেবে তেমন শ্যাকরা কোথায় সেখানে ?···তবু, উপায় কি ? তাই না হয় দেবেন ; যতটা আনতে পারে আদল।"

"উপায় থাকবে না কেন ? একগাছা চুড়িই পাঠিয়ে দোব ডাকে। হয়ে গেলে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। আমার বাড়ী মুঙ্গেরে।···এখুনি দিতুম, কিন্তু সোনা নাকি পথে আলাদা করতে নেই।"

প্রথমা অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন একটু—বিস্ময়, লজ্জা, কৃতজ্ঞতা, কত কী যে রয়েছে দৃষ্টিতে ! তবু, তখুনি সে ভাবটা লুকিয়ে ফেলে আবার চাপা গলায় খিল খিল ক'রে হেসে উঠলেন—বুঝেছি, কর্তার সঙ্গে একজোট হয়ে গিন্নীও হাতকড়ির ব্যবস্থা করছেন !··না ভাই, অত সাহস হয় না ; আপনারও অত করার দরকার নেই ; নক্সাই একটা দেবেন পাঠিয়ে।"

"আচ্ছা, সে যেমন বুঝি করব'খন ; আপনি ঠিকানাটা তো দিয়ে দিন।···

কর্তা দুজনে হতবাক হয়ে গেছেন যেন! আগন্তুক বেশ ঘুরে দেখতে পাচ্ছেন না, তবু অনুভূতি তো খুবই সজাগ হয়ে উঠেছে। সুটধারী ভদ্রলোক বিলাতী পত্রিকার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে তীর্যক দৃষ্টি ফেলছেন। তবে দুজনেরই মুখের ভাব যেন একরকম। শাস্ত তো হোয়েই গেছে, কতকটা যেন অনুতপ্তও ; ভাবটা কতকটা যেন —বিশ্বাস করতে আছে এ জগতকে! এদের হয়েই আমরা এখুনি মাথা ফাটাফাটি করতে যাচ্ছিলুম!

ওদিকে গল্প জমে উঠেছে, চাপা হাসি এক একবার ফুল ছাপিয়ে উঠেছে। তার সংগে বেদনাও ; প্রথমা সুপ্ত শিশুর গায়ে হাত বুলুতে বুলুতে বলছেন—"আপনি আবার এই মানুষকে বিশ্বাস ক'রে হাতের চুড়ি খুলে পাঠাইতে চাইছেন ভাই? কচি ছেলের মুখের গ্রাস দিচ্ছিলুম ফেলে! মুখে আগুন! চণ্ডালেরও যে এমন কুমতি হয় না! চেনটানার বাড়াবাড়ি চলেছে আজ ; তিনবার হোল। গার্ড নিজেই এসেছে চলে তার লণ্ঠন নিয়ে। একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান।

"—ব্যাপার কি! ট্রেনটাকে আপনারা আজ এগুতে দেবেন না?" আমিই উত্তরটা দিলুম, তৈরি করে রেখেছিলাম একটা। বললাম—ব্যাপার কিছুই নয় সাহেব, মেয়েটি গরাদের মধ্য দিয়ে অনেকখানি গলা বাড়িয়ে দিয়েছিল, হঠাৎ আতঙ্কে ওর মা চেনটা টেনে দেন।

ডান হাতটা একটু উলটে দিয়ে আস্তে আস্তে নেমে গেল।

একটু চুপ থাকার পর বিশ্রান্তালাপ আবার জমে উঠেছে ওদিকে। গাড়ীও আবার সচল হোল। সব চুকে যাওয়ার জন্যেই বোধহয় আগন্তুক পকেট থেকে সিগারেট কেস বের ক'রে একটা ধরাতে যাচ্ছিলেন, সুটধারী বললেন—"ওয়েল, নো আপনাকে আমার একটা চুরুট খেতে হবে—ইউ মাষ্ট্।"

একটু হেসে চামড়ার কেসটা বাড়িয়ে ধরলেন।

এও হয়তো সব চুকে গেল বলেই। তবে ঐ যেমন বললুম তাও তো হতে পারে—অর্থাৎ এ জাতের জন্য আমরা পুরুষেরাই বা তবে মাথা ফাটাফাটি করে মরি কেন?

আগন্তুক অল্প হেসে হাতটা বাড়িয়ে বললেন—"মাইল্ড তো? আমার করা চলে না।"

"খুব মাইল্ড্ এ্যাণ্ড্ নট লাইক ইটস্ ওনার, আই ক্যান্ এণ্ড্যার ইউ" (আর, আপনাকে ভরসা দিচ্ছি, ওর অধিকারীর মতন নয়)।

দুজনের মুখেই একটু জোরে হাসি ছলকে উঠ্‌ল এবার ; ওদিককার হাসির সঙ্গে মিলেও গেল।



পরিচয়

আমার বধূমাতা খাঁটি বৈষ্ণব পরিবারে মেয়ে ; আমার বাড়িতে এসে কিন্তু গোত্রান্তরের সঙ্গে তাঁর আর একটি বড় পরিবর্তন ঘটেছে, তিনি এখন শাক্ত পরিবারের বধূ। মেয়েদের স্বভাবধর্মে উনি এখন শ্বশুর পরিবারের সঙ্গে বেশ ভালভাবেই মিশ খেয়ে গেলেও, আমার মনে হয় ওঁর অন্তরে কোথায় যেন একটি অভাব-বোধ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমি একটু বেদনাই অনুভব করি এবং সুযোগ পেলেই এটা যথাসাধ্য মেটাবার চেষ্টা করি ; বৈষ্ণব মহাজনদের প্রসঙ্গ তুলে, ওঁর বাপের বাড়ির কথা তুলে, সেখানে মাঝে মাঝে যে কীর্তনের আসর বসে, যেসব সাধুসমাগম হয় সে সম্বন্ধেও আলোচনা করে। শাক্ত হলেও আমাদের পূর্বকালের সে গোঁড়ামি আর নেই ; ভাবি, এর ওপর যদি ওঁর মনে একটা ধারণা গড়ে ওঠে যে, উনি আসায় আমরা ধীরে ধীরে ঐদিকেই একটু একটু করে আকৃষ্ট হচ্ছি তো, সেটা আরো ভালো। এবং সেদিন ওঁকে নিয়ে আসতে আসতে যে ব্যাপারটুকু হয়ে গেল, তার মূলেও কতকটা এই কথাই ছিল।

ট্রেনে আসছি। গোড়া থেকেই বেশ ভীড় ছিল, তবু আমরা তিনজনে কোণের দিকে একটু গুছিয়ে গাছিসে বসতে পেরেছিলাম। পরের স্টেশনে আরও বেড়ে গেল ভীড়টা। অল্পক্ষণ থামে গাড়িটা, সেজন্য সবারই দরজার ভেতরে কোন রকমে ঢুকে পড়বার চেষ্টা থাকায়, ঐখানেই ভীড়টা জট বেঁধে উঠল প্রথমে। তারপর, গাড়িটা ছেড়ে গেলে ভেতরের দিকে ছড়িয়ে পড়ল সেটা ; কয়েকজন বসতেও গেল। কেউ কেউ কাকুতি-মিনতি ক'রে ওরই মধ্যে একটু জায়গা করে নিল, কেউ কেউ বসল মোটঘাটের ওপর। শেষ পর্যন্ত জন তিনেকের কিন্তু কোন ব্যবস্থাই হোল না।

তার মধ্যে একজন বাঙালী।

বয়স পঞ্চাশের কিছু ওপরেই হবে। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, একটু বড় বড় ; মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি। একটু নজরটা পড়েই প্রথমে, বিশেষ করে বাঙালী ব'লে। কিন্তু কিছু করতে তো পারছি না, রয়েছেন একেবারে গাড়ির ওদিকে দরজার কাছে। ক্রমে আমার মনটা অন্যদিকে চলে গেছে, জানালার বাইরে দৃষ্টি ফেলে রয়েছি, বধূমাতা আস্তে আস্তে ডাকলেন—"মেজ কাকা!"

প্রশ্ন করলাম—"কি মা?"

"বাবাজীর কথা বলছিলাম—ঐ যে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।"

কথাটা উনি বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছেন, "বাবাজী" মানেই বৈষ্ণব সাধু মহাজন।

আমি একটু ভালো ক'রে দেখলাম, কিন্তু বৈষ্ণবত্বের তো কোন বাহ্যিক লক্ষণ চোখে পড়ল না। একটা গেরুয়া রঙের সাধারণ পাঞ্জাবী প'রে আছেন, সেটা কিন্তু ছোবানো নয়। এদিকে 'কোখ্‌টি' বলে ঐ রঙের এক রকম তুলা হয়, তারই সুতার কাপড় তৈরি। এর অতিরিক্ত মুখে একটি নির্লিপ্ত বৈষ্ণবোচিত ভাব আছে বটে, কিন্তু যেটা হোল জায়গা না পাওয়ায় এবং পাওয়ার কোন উপায় না দেখার জন্যই ; বেশ বোঝা গেল এই দুটির ওপরই বধূমাতা আন্দাজটা গড়ে তুলেছেন, তার সঙ্গে দাড়ি এবং বড় বড় চুলও বোধ হয় যোগ দিয়ে থাকতে পারে। যাই হোক, আমি আর সেকথা না তুলে প্রশ্ন করলাম—"তোমার জানাশোনা কি উনি? দেখেছ আগে?"

"না, তবে সাধু মানুষ, দাঁড়িয়ে থাকবেন ..."

আর সংশয়ের দিকেই গেলাম না আমি, বললাম..."তা তো বটে, কিন্তু..."

বললেন—"আমি একটা উপায় ঠাউরেছি ; বেঞ্চের নিচে আমার যে ট্রাঙ্কটা আছে, সেটা টেনে বের করে আমি ওর ওপর বসছি, উনি আমার জায়গাটায় এসে বসুন!"

খাঁটি বৈষ্ণবোচিত প্রস্তাব। কিন্তু আমি তো শাক্তই, মাকে ট্রাঙ্কে বসিয়ে নিজে ওপরে বসে থাকতে পারি না, বললাম—"আচ্ছা, সে যা হোক একটা ব্যবস্থা হবে, তাহলে ডাকতেই বলছ?"

ওঁর কথাটা ব্যবহার করেই ডাকলাম—"বাবাজী! আপনি না হয় এদিকে চলে আসবেন?"

বোধ হয় বাঙালী দেখেই আমাদের দিকে চাইছিলেন মাঝে মাঝে, মনে হোল একটু যেন চকিত হয়েই প্রশ্ন করলেন—"আমায় ডাকছেন?"

বললাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ যদি চলে আসেন ডিঙিয়ে—ডাঙিয়ে তো একটু বসবার জায়গা বোধ হয় হতে পারে।"

একটু যেন ভাবলেন—তারপর বললেন—"না ডিঙিয়ে যেতে হ'লে এঁদের কষ্ট দেওয়া হবে, তা ভিন্ন জায়গাও তো নেই ওখানে। থাক্ বেশ আছি।"

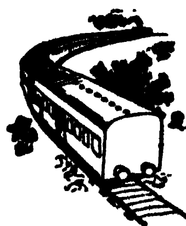
এত অপারিসীম বিনয়ের সঙ্গে অল্প হেসে হাত দুটি জোড় করে কথাগুলি বললেন যে

আমার আর সন্দেহ রইল না বধূমাতার আন্দাজটাই ঠিক, বৈষ্ণব কন্যার সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে উনি ঠিকই চিনেছেন সাধুপুরুষকে। অবশ্য বৈরাগী নয়, গৃহস্থই, তবে সাত্ত্বিক হওয়া সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না।

জিদ করলাম—"না আসুন চলে, ভীড়ে একটু-আধটু কষ্টের জন্যে সবাই প্রস্তুত থাকেই তো?

মাঝখানে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের দিকেও চেয়ে বললাম—"জরা সাধু বাবাকো আনে দেনেকী কৃপা কবেতো···" বলবারও দরকার ছিল না। ও'র বিনয়ের ভাবে সবাই যেন একটু আকৃষ্টই হয়ে পড়েছিল, আমি শেষ করবার আগেই বলে উঠল—"জরুর, জরুর···আইয়ে মহারাজ, কদম্ বঢ়াইয়ে···"

ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে ঝুঁকে বসে পথ করে দিল। উনি খুব সন্তর্পণে পা তুলে তুলে আসছিলেন, একজন একটু আবদারের হাসি হেসে বলল—"বাবা থোড়ী চরণ ধুলি গিরনেভি তো দিজিয়ে, সোভি তো পরম সৌভাগ্য হ্যায়।"



কয়েকজন সমর্থন করে উঠল—"অবশ্য! অবশ্য!" বিনয়ে একেবারে যেন গলে গেলেন। পূর্বেই বলেছি গৃহস্থ-বৈষ্ণব, এক হাতে একটি এলুমিনিয়ামের টিফিন-কেরিয়ার আর অপর হাতে একটি পুরনো ছোট সুটকেস নিয়ে এগুচ্ছিলেন, সেই অবস্থাতে দুটি হাত একত্র করে বাংলা হিন্দী মিশিয়ে বললেন, "নেই বাবা, হাম তো সামান্য ব্যক্তি হ্যায়, আপলোক ক্ষমা কিজিয়ে, ক্ষমা কিজিয়ে···"

আমি ইতিমধ্যে ট্রাঙ্কটা তলা থেকে টেনে বের করেছি, উনি এলে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের জায়গাটা দেখিয়ে বললাম—"আসুন, বসুন।"

বধূমাতা একেবারে কোণটিতে বসেছিলেন তারপর ও'র বোনঝিটি, তারপরেই আমি, বাবাজী জায়গাটা দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—"আর আপনি?"

ট্রাঙ্কটা দেখিয়ে বললাম—"এই তো বসছি এখানে।"

প্রবল অপত্তি তুললেন—"না, সে কোন মতেই হতে পারে পরে না, আমায় নিজের গদি আঁটা জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে আপনি বসবেন ঐ ট্রাঙ্কের ওপর! কোন মতেই হয় না তা।"

আমি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করতে লাগলাম, কিন্তু কোন মতেই রাজী হলেন না।

বললেন—"আর কিছু না হোক, মায়ের আমার কষ্ট হবে তো নিশ্চয়ই। দেখছেন, আমি মোটা মানুষ, আপনার প্রায় দ্বিগুণ।" একটু হাসলেন।

বধূমাতা কোণের দিকে আর একটু গুটিয়ে নিলেন নিজেকে ; বোনঝিটিকেও টেনে নিয়ে একটু লজ্জিতভাবে হেসে বললেন—"বসুন আপনি।"

আমি বললাম—"তা যদি বললেন, আপনি না বসলে আরও কষ্ট হবে ওঁর। মা আমার একটু সাধু-সন্ন্যাসীর ভক্ত, নিজের জায়গাটাই ছেড়ে দিতে চাইছিলেন।"

বললেন—"সত্যি নাকি ? তা, মা-ই-তো।"

বধূমাতার দিকে চেয়ে বললেন—"কিন্তু আমি তো সাধুও নয়, সন্ন্যাসীও নয়।"

বধূমাতা লজ্জিতভাবে একটু হাসলেনই। আমি উত্তর দিলাম—"সেইটে না স্বীকার করাই তো আরও বড় লক্ষণ !"

একটু ভালোভাবেই হাসলেন এবার, বললেন—নাঃ, যতই বলব আমি কিছুই নয়, তৃণাদপি নীচ, ততই আপনি ওপরে ঠেলে তুলবেন। তার চেয়ে আদেশ পালন করে বসাই ঠিক।"

পাশের সবাইও বেশ একটু শ্রদ্ধাপূর্ণ কৌতূহলের সঙ্গে শুনছিল আমাদের কথা, উনি বসতে উদ্যত হলে—"আইয়ে মহারাজ, আইয়ে"—বলে একটু ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে আরও খানিকটা জায়গা করে দিল ওরই মধ্যে।

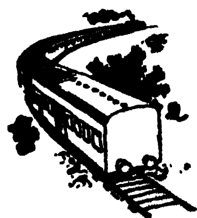
একবার ওপরে-নিচে চেয়ে সুটকেস আর টিফিন-কেরিয়ারটা দেখিয়ে বললেন—"আর এ জঞ্জাল দুটো ?"

আমি বাক্সের ওপর আমার হোল্ডঅল, বাক্স আর টিফিন-কেরিয়ারটা একটু সরিয়ে-সারিয়ে দিয়ে ওঁর হাত থেকে ও-দুটো নিয়ে রেখে দিলাম। উনি বসলেন।

যতটুকু দেখতে পাচ্ছি, মনে হচ্ছে সত্যই একজন খাঁটি বৈষ্ণব। যেমন বিনয়ী তেমনি স্বল্পভাষী। অনেকদিন পরে বধূমাতার সাধুসন্দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে। ধর্ম-সংক্রান্ত আলোচনায় আমি নামাতে চেষ্টা করলাম ওঁকে, যোগ দিলেনও অল্পবিস্তর, কিন্তু যেন নিজেকে আড়ালে রেখে ; কী জানেন, কতটা জানেন কোন মতেই দিলেন না বুঝতে। থেমে থেমে 'রাধে-শ্যাম' বলবার একটা অভ্যাস আছে দেখলাম। তাইতে এবং ওঁর বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও স্মিতহাস্যে আমরা যেমন আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম, বেশী বাগবিস্তার করলে তেমনটা কোন মতেই হতাম না।

তবে, নিজের ধর্মজীবন এবং নিজের জ্ঞান সম্বন্ধে স্বল্পবাক্ হলেও গুরুর কথা উঠলে গুণাবলী সম্বন্ধে বেশ মুখরই হয়ে উঠলেন। কথার মাঝে মাঝে তার উদ্দেশ্যে কপালে যুক্তকর ঠেকাতে লাগলেন, নাম করলেনও নবদ্বীপের একজন বেশ জানিত বৈষ্ণব মহাজনের। রাস্তাটা চমৎকার কাটল। যাবেন উনি পাটনা, আমাদের পথ উল্টো দিকে, বধূমাতা একবার একটু একান্তে আমায় মৃদুস্বরে বললেনও—"যদি বরাবর সঙ্গে যেতেন তো বড় ভাল হোত, না মেজোকাকা ?"

আমি হেসে বললাম—"হলে তো খুবই ভালো হোত, কিন্তু..." কথাটা একটু হেসে ওঁর দিকে চেয়ে সহজ কণ্ঠে বলায় উনি প্রশ্ন করলেন—"কি বলছেন মা আমায় ?"
কথাটা শুনে বললেন—"এক পথে কি সবাই শেষ পর্যন্ত চলতে পারে মা ? তাহলে তিনি এত বিভিন্ন পথ তৈরি করে রেখেছেন কেন ?"
সঙ্গটা ছাড়তে হচ্ছে, সেইজন্যই বোধ হয় তারও বেশি করে এই তত্ত্বকথাটুকু বধূমাতার মর্মস্পর্শ করে থাকবে, দেখলাম চোখ দুটি যেন হঠাৎ ছল ছল করে আসছে। আমি তাড়াতাড়ি বললাম—"কিন্তু গঙ্গার ওপর যে আমরা এতক্ষণ ধরে সাধুসঙ্গ পাব, এই কি একটা কম লাভ ?"
হাত দুটি যুক্ত করে বিনীতভাবে হাসলেন একটু।

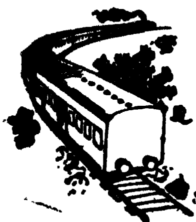


মিথিলার লোকেরা শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে বাবার মাথায় জল ঢালবার জন্য বৈদ্যনাথ ধামে যাচ্ছে। ঘাট-স্টেশনে আসতে রাত্রি হয়ে গেল, তার ওপর গাড়ির ভীড়টা এত প্রচণ্ড স্রোতে নামল যে আমাদের ঐখানেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। এরপর স্টীমারের অল্প পরিসরের মধ্যে সেই ভীড়টা এমন চাপ বেঁধে উঠল, এত অবিন্যস্তও হয়ে পড়ল যে, কেউ কাউকে যে খুঁজে বের করবে তার কোন উপায় রইল না। গঙ্গার উপর সাধু-সঙ্গের যে আশাটুকু ছিল সেটা এভাবে বিলুপ্ত হওয়ায় বধূমাতা বেশ মনঃক্ষুণ্ণ হয়েই রইলেন; খানিকটা উদ্বিগ্নও; একবার বললেনও—"বাবাজী একটু জায়গা-টায়গা পেলেন কি না কে জানে। আহা !"
মনটা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বললাম—মানুষ—মায়ের কাছেই যে রকম আদর পেলেন উনি, মা-গঙ্গা দেবতা হয়ে কি একটু ব্যবস্থা না ক'রে থাকতে পারবেন ?"
বোধহয় পেলেন একটু আশ্বাস। মুখে একটু হাসি ফুটল, বললেন—"আহা, করেন ব্যবস্থা মা তাহলেই ভালো। আমি তো খুবই করলাম ! একটু জায়গা, তাও তো আপনিই ছেড়ে দিলেন।"
নামতেও সেই প্রচণ্ড জনস্রোত। প্ল্যাটফর্মে এসেও ভীড়টা এলোমেলো-ওলোমেলো ছড়িয়ে পড়ল। যে যেখানে গিয়ে আস্তানা গাড়ল সেখানে থেকে যে একটু নড়বে তার উপায় রইল না। গাড়ি আসবে, সেখানে আবার কী অবস্থাটা দাঁড়াবে সেই ভাবনাই মনটা জুড়ে রইল।

এক সময় গাড়ি এসে দাঁড়াল, আমাদেরটাই এল প্রথমে। ভীড় ঠেলে উঠে পড়লাম ; তারপর সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে, বেঞ্চে দুজনের বিছানা পেতে নিয়ে বললাম— "এইবার টিফিন-কেরিয়ারটা খোল মা, খাওয়া সেরে নেওয়া যাক। এরপর আর জলও পাওয়া যাবে না।"

টিফিন-কেরিয়ারটা টেনে নিলেন বৌমা। এদিকে নিশ্চিন্ত হয়ে মনটা আবার ওইদিকে চলে গেছে, বললেন—"আহা, এক সঙ্গে গেলে ভেবেছিলাম আমাদের খাবারের থেকে বাবাজীকে কিছু সেবা করাতাম। ওঁর কেরিয়ারে সেই তো দুটো ফলফুলুরি···না হয়···।"—বলতে বলতেই থেমে গেলেন। খুলতে যাচ্ছিলেন, একটু ভ্রূকুঁচকে কেরিয়ারটার দিকে চেয়ে বললেন—"এতো আমাদেরটা মনে হচ্ছে না মেজকাকা, এত কড়া ছিল না, আর এটা যেন একটু নতুনও।"

বললাম—"তাই নাকি ? বাবাজীরটার সঙ্গে অদল-বদল হয়ে গেল নাতো ? সাইজটা যেন একই রকম ছিল। আর ছিলও তো দুটো একসঙ্গে।"



"দাঁড়ান দেখি। ও মেজকাকা, এযে ঠাসা লুচি ; আমাদের তিনজনেরও এতটা ছিল না !

বাটিটা তুলে ফেললেন।

"ও মেজকাকা, এতে ভরা একবাটি রসগোল্লা। আমাদেরটায় ছিল মাত্র গোটাকতক পানতুয়া, আহা !"

ও বাটিটাও তুললেন।

"ও মেজকাকা, সর্বনাশ ?"

"কি হোল ?"

শুয়েছিলাম, উঠিছি, এবার ঝুঁকে পড়লাম সামনে।

"এযে মাংস মেজোকাকা ! আর মনে হচ্ছে যেন পাখির মাংস। কী পাখি কে জানে।"

কেরিয়াটা ছেড়ে একটু গুটিয়ে বসলেন। আমি টেনে নিলাম ওটা। মাংস সম্বন্ধে আমিও খুব বিশেষজ্ঞ নই, তবে এটা যেন চেনা চেনাই বোধ হ'ল, সাধ্যমতো উঁচু মর্যাদা দিয়ে যেটাকে 'রামপাখি' বলে অভিহিত করা হয়েছে, যেন তাই।

গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছে। আমরা দুজনে স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। বধূমাতা যে কথা কইতে পারছেন না, তার কারণ নিশ্চয় বেশ খানিকটা লজ্জায়ও পড়ে গেছেন। এক সময় আর মনের ভাবটা চেপে রাখতে না পেরে বললেন—"কী ঠগ্ দেখুন মেজকাকা! কত বড় জোচ্চোর একটা! এসব লোককে পুলিসে দেওয়া উচিত নয়?"

"পুলিস!"—আমি একটু চকিত হয়ে উঠেই বললাম। প্রশ্ন করলাম—"কেন? পুলিসে দেওয়ার মতো কি হয়েছে?"

বললেন—"এই রকম টিফিন-কেরিয়ারে অখাদ্য পাখির মাংস লুকিয়ে রেখে বোষ্টম-বাবাজি সেজে···"

ওঁর বিপর্যস্ত, খানিকটা রুষ্টভাব দেখে হাসি সামলাতে না পেরে বললাম—"লুকুতে যাবেন কেন মা? তেমনি, সবাইকে ডেকে ঘটা করে বলবারও তো কোন কারণ হয়নি। আর বোষ্টম-বাবাজির সাজার কথা যে বলছ—গায়ে একটা গেরুয়া দেখলেই যদি ভক্তিতে গদগদ হয়ে বোষ্টম-বাবাজি বলে ধরে নিই আমরা তো উনি কি করবেন? এটাকে ঠকানো না বলে শখ করে ঠকতে যাওয়া বলাই ঠিক নয় কি?···"

ঘাট-স্টেশনের একটু পরেই মোকামা-জংশন, আমাদের কথার মধ্যে গাড়ি এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল। আমার যুক্তিগুলো বধূমাতার পক্ষে রুচিকর হয়নি নিশ্চয়, মুখ একটু ভার করেই বসেছিলেন। গাড়ি থামতে অনুযোগের স্বরে বলে উঠলেন—"যা বুঝলাম—খুব ভালোমানুষ। কিন্তু আমি আপনাকে এখন কী খেতে দিই বলুন তো!··· টিফিন কেরিয়ারটা পর্যন্ত হাতিয়ে নিয়ে···মা এত করে গুছিয়ে-গাছিয়ে দিলো!··· লুচি, সন্দেশ, আলুরদম···ঠিক এই সময় খাবারের ভেণ্ডারটা বাজখেঁয়ে গলায় হাঁক দিতে দিতে এসে দাঁড়াল—"পুরি—অরবিকচ্চুকা তরকারি—গরম গরম!!"

একটু দুঃখের হাসিই এসেই গেল ঠোঁটে। বললাম—"পুরি-কচুরিও নয়? একেবারে কচুর ঘাট!···বেশ, তোলো পাভর।"

শ্বশুরের ভুরিভোজের সদ্যসদ্য এমন ব্যবস্থায় বধূমাতা লজ্জার সঙ্গে হাসি মিলে একেবারে বেঞ্চের সঙ্গে মিশে যাওয়ার মতো অবস্থা; আমি কোনরকমে হাসি চেপে রেখে মনিব্যাগ থেকে পয়সা বের করে দেওয়ায় মনোনিবেশ করলাম।



সহযাত্রিণী ও সহধর্মিণী

হুইশিল দিয়া ইঞ্জিন স্টার্ট লইয়াছে, এমন সময় প্রায় ছুটিতে ছুটিতে দুইটি মেয়ে আমাদের গাড়ীর সামনে আসিয়া পড়িল। নিরাশায়, উদ্বেগে মুখ-চোখের ভাব অবর্ণনীয়। সামনে খানিকটা দূরে সেকেণ্ড ক্লাস; তাহার জানালা হইতে একজন বর্ষীয়সী মহিলা ও তিন চারজন মেয়ে উৎসুকভাবে গলা বাড়াইয়া ইহাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন মহিলাটি বলিলেন, "আর এগিও না, তোমরা ওই গাড়ীতেই উঠে পড়ো।" আমরা প্ল্যাটফর্মের দিকেই বেঞ্চটাতেই বসিয়াছিলাম, আমি তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলিয়া দিলাম....দ্বিতীয় মেয়েটি যখন চড়িতে যাইবে তখন একটু বেগ হইয়াছে গাড়ির। সামান্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া মেয়েটির হাত ধরিয়া উঠিয়া আসিতে সাহায্য করিলাম। সমর আমার মুখের পানে একবার বিস্মিতভাবে চাহিল। মেয়েটি ভিতরে আসিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া বলিল, "থ্যাংকস।"

ছোট ইণ্টার ক্লাস কামরা। ওদিকের দুটি বেঞ্চে একজন মাড়োয়াড়ি ভদ্রলোক এবং তাহার স্ত্রী বিছানা পাতিযাছে। এদিককার বেঞ্চে আমি আর সমর, সামনের বেঞ্চটি খালি। মেয়ে দুইটি একবার গাড়িটা দেখিয়া লইয়া খালি বেঞ্চটায়, বসিয়া পড়িল। দারুণ উদ্বেগের পর নিশ্চিন্ততার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শেষের মেয়েটি বলিল, "খুব পাওয়া গেল গাড়িটা!"

প্রশ্ন করিলাম, "কোথায় যাবেন আপনারা?"

সমর চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া আবার আমার মুখের পানে চাহিল। —হাত ধরিয়া তুলিলাম, আবার আলাপ জমাইতে চাই।—আমার ধৃষ্টতা বা দুঃসাহসটা সে যেন

বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। একেবারে আধুনিক প্রথায় সজ্জিত মায় মণিবন্ধের উপর ঝোলানো ভ্যানিটি ব্যাগ পর্যন্ত। কথাবার্তায়, গতিবিধিতে একটুও আড়ষ্টভাব নাই; তবে, একেবারে যে নির্লজ্জ তাও নয়,—বেশ একটু প্রফুল্ল, সপ্রতিভ ভাব। যাহাকে প্রশ্ন করিলাম, সে কপালের কয়েকগাছা স্বেদসিক্ত বিস্রস্ত কেশ আঙুলের ডগা দিয়া গুছাইয়া লইয়া বলিল, "যাব সেরামপুর, নেক্‌স্‌ট্‌ স্টপেজ। আপনারা?"
যেমন আমার দিকে চাহিয়াছিল, অনেকটা সেই রকমভাবেই সমর এবার মেয়েটির পানে চাহিল।
আমি বলিলাম, "আমরা যাচ্ছি বর্ধমান···আপনারা আর একটু হ'লেই ফেল করতেন গাড়িটা।"
মেয়েটি একটু হাসিয়া মাথাটি ঈষৎ নোয়াইয়া বলিল, "ফেল তো করেইছিলাম। আপনি সাহায্য না করলে···"
তাহার পর সঙ্গিনীর পানে চাহিয়া বলিল, "দোষ তোমার ইলা; আমি অত করে বললাম···"
ইলা বলিল, "তাহলেও আমরা ঠিক সময়ে পৌঁছতাম, দু'জায়গায় ট্রাফিক পুলিশ যে অনেকক্ষণ আটকে রাখলে ট্যাক্সিটা।···এমন রাগ ধরছিল।···"
অপর মেয়েটি সাক্ষী হিসাবে একবার আমার মুখের পানে চাহিয়া ইলাকে বলিল, "বা রে, তারা নিজের ডিউটি করবে না?"
ইলা মুখটি কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ছাই ডিউটি, পরের গাড়ি ফেল করবার জোগাড় করে।"
আমরা দু'জনেই হাসিয়া উঠিলাম, এমন কি সমর পর্যন্ত না যোগ দিয়া পারিল না। খানিকটা চুপচাপ গেল। মাড়োয়াড়ি ভদ্রলোক তাহার স্ত্রীকে কি একটা বলিল, সে আবক্ষ অবগুণ্ঠনসুদ্ধ মুখটা একবার আমাদের পানে ফিরাইয়া আবার ঘুরাইয়া লইল। গাড়ি তখন উগ্র শব্দের সঙ্গে লিলুয়া স্টেশন পার হইতেছে। সমর আমার কানের একটু কাছে মুখটা আনিয়া বলিল, সেরামপুরে কোথায় যাচ্ছেন এঁরা?"
—অর্থাৎ কথাবার্তাটা চালাইতে চায়। বলিলাম, "জিগ্যেস কর না কেন? আমি কি করে জানব?"
সমর একবার বক্রদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল একটু, তারপর বুকে যেন খানিকটা দম ভরিয়া লইল এবং গাড়ির আওয়াজটা নরম হইলে সগলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তা-ইয়ে আপনারা—যাচ্ছেন কোথায়?"
দুজনে সমরের পানে চাহিলে, তাহার পর তাহাদের মুখ দু'খানি ধীরে ধীরে যেন দীপ্ত হইয়া উঠিল। ইলা অপর মেয়েটির পানে চাহিল। সে-ই হাসিয়া বলিল, আমরা বেরিয়েছি রবিবার করতে সেরামপুরে নেমে ট্যাক্সিতে করে সোজা ঘাটে যাব। নৌকো করে একেবারে ব্যারাকপুরের কোম্পানির বাগানে। পারমিশন নেওয়া আছে,

সেখানে পিক্‌নিক হবে। আবার ট্যাক্সি করে বরানগর, সেখান থেকে স্টিমারে জগন্নাথ ঘাট।"

ইলা হাসিয়া পূরণ করিয়া দিল, "তারপর আবার বন্দী—অন্ততঃ হপ্তাখানেকের জন্যে তো বটেই।"

সেই চিন্তাতেই যেন মুক্তির মধ্যে ওরা দু'জনে আর কোন খুঁৎই থাকিতে দিবে না।

এতগুলি বাক্যের স্রোতে সমরের অবশিষ্ট জড়তাটুকু যেন ভাসাইয়া লইয়া গেল; প্রশ্ন করিল, "আসছেন কোথা থেকে আপনারা ?„

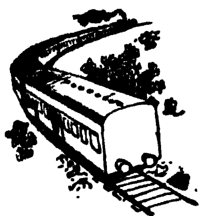
"ভিক্টোরিয়া বোর্ডিং থেকে।"

"কলেজে পড়েন ?"

"হ্যা।"

"সেকেন্ড ক্লাসে উনি কে ?"

"আমাদের বোর্ডিঙের লেডি রেকটার, মিস্ নাগ। ওঁর সঙ্গে আরও পাঁচছজন সঙ্গিনী আছে আমাদের। আমরাই সমস্ত রেলজার্নিটায় অলাদা পড়ে গেলাম।"



কথাটা বলিয়া দুজনেই একটু বিষণ্ন হইয়া পড়িল, এই নৈরাশ্যের মুখে আমরাও আর কিছু বলিতে পারিলাম না। সমর শুধু একবার আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া প্রশ্ন করিল, "বলা চলবে যে—আমাদের সৌভাগ্য ?"

চাপাগলায় বলিলাম, "মাথা খারাপ হয়েছে।"

সমর একটু দমিয়া গেল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আবার কখন কথাবার্তা অল্পে অল্পে জমিয়া উঠিল। সমর এক সুযোগে আমাদেরও পরিচয় দিয়া দিল। তখন কলেজের পড়াশুনা লইয়া খানিক্ষণ আলোচনা হইল, তাহার পর রাজনীতি, তাহার পর খানিকটা বিশ্বসাহিত্যও। গাড়ি রিষড়া যখন পার হইল তখন নারী-প্রগতি লইয়া চলিতেছে। তর্ক নয়, কেন না চারজনেই স্বপক্ষে—আমরা দুইজন মেয়ে দুইটির চেয়েও বেশি স্বপক্ষে, সমর আবার এত বেশি যে, নারী-প্রগতির গতিবেগে আমাদের গাড়িটাকে পিছনে ফেলিয়া গেলেও যেন তাহার আশা মিটিবে না। আলোচনাটা শেষ পর্যন্ত সে-ই প্রায় একচেটে করিয়া লইল এবং প্রগতির উদ্দীপনায় সামনেই অবগুণ্ঠিতা মাড়োয়াড়ি মহিলার দৃষ্টান্ত

দেখাইয়া পরুষজাতির উপর এমন উগ্র রকম খাপ্পা হইয়া উঠিল যে গাড়িটা এই সময় শ্রীরামপুরে আসিয়া থামিয়া না গেলে ব্যাপারটা যে কোথা পর্যন্ত গড়াইত বলা যায় না।

গাড়ি থামিতেই সমর চট্ করিয়া দরজা খুলিয়া নামিয়া গেল এবং খাঁটি প্রগত দেশের প্রথায় হাত ধরিয়া মেয়ে দুটিকে নামিয়া আসিতে সাহায্য করিল।

এবার আমার পালা,—বিস্ময়ে সমরের চেয়েও চক্ষু অধিক বিস্ফারিত করিয়া 'থ' হইয়া বসিয়া রহিলাম।

খানিকটা সময় পর্যন্ত সমর নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর একটা টানা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইল। প্রশ্ন করিলাম, "ব্যাপারখানা কি?"

সমর উত্তর না দিয়া প্রশ্ন করিল, "শৈল' আমরা কি বিয়ে করি?"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতে মাড়োয়াড়ির দিকে ইসারা করিয়া বলিল। ধর-ঐ যে একটা গোটা মানুষ জরির কাজ করা কাপড়ে ঢাকা একটা পুঁটুলি ঘাড়ে ক'রে বেড়াচ্ছে—এই ব্যাপারটাকে কি বিবাহ বলতে হবে?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "বিবাহ কথাটার ব্যুৎপত্তিগত মানে যদি হয় 'বিশিষ্টরূপে বহন করা, তা হলে বহন করবার জিনিসটি যতই জড়পদার্থ গোছের হয়, মানেটা ততই স্পষ্ট হয় না কি?"

সমর মুখটা কঠিন করিয়া বলিল, "ঠাট্টা নয়; ও রকম আমার দ্বারা হবে না। আমি চাই মানুষকে বিবাহ করতে, মানুষ অবাধ মুক্তির মাঝে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পেরেছে, যে বলবে, হাসবে, কথা কইবে, মুক্ত দৃষ্টিতে অকুণ্ঠিতভাবে পৃথিবীর পানে চেয়ে দেখতে পারবে, সে হবে আমার সঙ্গিনী, আমার মাথার মোট নয় —সে সত্যিই হবে সখী।"

"দেখলি তো? গাড়ির ছ'জন প্রাণীর মধ্যে মাত্র দু'জন নেমে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে কী পরিবর্তন। গাড়িটার আর জান আছে বলে মনে হচ্ছে? যদি বিশিষ্টরূপে বহন করতে হয় তো আমি করব ঐ প্রাণস্বরূপিণী নারীকে।...প্রাণের প্রাচুর্যে যার মধ্যে এতটুকু দ্বিধা নেই, মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্বন্ধ যে মানতে একটুও ইতস্তত: করবে না...আচ্ছা শৈল, এই তো দুই হাত ধরে তুললি, আমিও নামালাম হাত ধরে, এতটুকু কুণ্ঠা দেখতে পেলি? কথাবার্তায় এতটুকু জড়তা?...অপরিচয়ের মধ্যেও যে এত নিকট হতে পারল, বল্ তো—জীবনে যদি তাকে একেবারে আপন করে পাওয়ার সৌভাগ্য হয় তো...."

শেওড়াফুলিতে গাড়ি ঢুকিতে "সমর!" বলিয়া একটা আওয়াজ হইল, দুজনেই মুখ বাড়াইয়া দেখি আশিস হাত উঠাইয়া ছুটিয়া আসিতেছে।...সেদিন ঐ পর্যন্ত রহিল।

বেশি দিন নয় মাস তিনেক পরের কথা। সমর আর আমি সমরের জন্য শ্যামবাজারে মেয়ে দেখিতে গিয়াছি। মেয়েটি আই-এ পরীক্ষা দিয়াছে। সমরের কাকা প্রভৃতি একবার দেখিয়া আসিয়াছেন। আমরা দ্বিতীয় ব্যাচ্…সমর প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, অন্ততঃ আই-এর নিচে কন্যা গ্রহণ করিবে না।

যথা সময়ে, কিঞ্চিৎ জলযোগের পর, মেয়েটিকে সঙ্গে আনিয়া সামনের গালিচায় বসানো হইল। মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া আমি বিস্ময়ে আনন্দে যেন কি একরকম হইয়া গেলাম। সেদিনের রেলযাত্রায় চিত্রটা স্পষ্ট হয়ে উঠে ওদিকেও একটা সংযত বিস্ময়! সমরের দিকে চাহিয়া দেখি সে তখনও কুণ্ঠা ঠেলিয়া মুখটা তুলিতে পারে নাই; বুড়া আঙ্গুল দিয়া তাহার উরুতে একটা ঠেলা দিয়া কানে কানে বলিলাম, "কে দেখ্!"

সমর মুখটা তুলিল, মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া একটু ভ্রূকুটি করিয়া রহিল, যেন কি একটা মনে করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার পর তাহার মুখটা যেন ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। বাড়ি আসিতে পথে প্রশ্ন করিলাম, কেন রে, কি হ'ল?"

অনেক পীড়াপীড়ির পর বলিল, "নাঃ, টু ফরওয়ার্ড (Too forward), দেখলি না—সেদিন?"

আমি বলিলাম "ওকে ফরওয়ার্ড বলা চলে না, কলেজে পড়া, হয়তো একটু স্মার্ট বাজে সংকোচের ধার ধারে না…"

সমর আমার উপরে একেবারে চটিয়া উঠিল, বলিল, "ধার ধারে না বলে একেবারে ঘাড়ে এসে পড়বে ঐ সামান্য পরিচয়ে? অপরিচিতের হাতে হাত দিয়ে ওঠা-নামা করতে একটুও কেঁপে উঠবেনা তার হাতটা?"

কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিল, "এই যদি তোর স্মার্টের আইডিয়া হয় তো মাফ করো, ভাই!"



মেয়ে

"প্যাসেঞ্জারটা তালিত স্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। নামমাত্র স্টেশন, তবুও কী ভিড়। সেই ইতর ভদ্র, মেয়ে-পুরুষ, বোঁচকা বুঁচকি। কোন ক্লাস লক্ষ্য নাই, ছুটিয়া ছুটিয়া আসিয়া জমা হইতেছে, তাড়া খাইতেছে কিছু জমিয়া যাইতেছে, কিছু আবার অন্য কামরার উদ্দেশ্যে ছুটিতেছে। হুমকি, কথা-কাটাকাটি—

"আগে নামতে দাও।. আরে, নামতে দিন আগে মশাই, কি গেরো! দেখ, তবুও ঠেলে আসে!"

"গাড়ি যে এক্ষুণি ছেড়ে দেবে মশাই!"

"ছেড়ে দিলে আপনি পরের গাড়িতে উঠতে পারবেন, আমি নামতে পারব পরের গাড়ি থেকে?"

কথা-কাটাকাটির মধ্যেও নামিলও, এ উঠিয়াও পড়িল। সে যে কি রকমারি দাঁও প্যাঁচ, না দেখিলে বোঝা যায় না।

নামিবার দল কিন্তু এবার মারমুখো হইয়া পড়িয়াছে। নামিতেছে একটা চাপ, মাঝে পড়িয়া গিয়াছে একটা চৌদ্দ পনরো বছরের ছেলে।

"বাবা, আমার যে পা দুটো উঠে গেছে ভুঁই থেকে।"

খানিকটা পিছনেই একজন বৃদ্ধ।

"সামনের ভালোমানুষটির গলাটা জড়িয়ে ধর।"

"খরবদার!—কি রকম ভালোমানুষ দেখিয়ে দোব একেবারে।"

"বাবাঃ। কবে যে লড়াই থামবে।"

"আরে নাম বুড়ো, লড়াই না থামলে নামবিনি না কি?···আবদার! এদিকে গাড়ি দেয় ছেড়ে!"

প্ল্যাটফর্মের দিকের বেঞ্চটায় বসিয়া আছি, খানিকটা কোণ ঘেঁসিয়া দৃষ্টিটা দরজার খণ্ডযুদ্ধের পানেই, হঠাৎ জানালা দিয়ে একটা বেশ বড় টিনের সুটকেস আমার কানের কাছ দিয়ে খানিকটা ভিতরে আসিয়া পড়িল, পিছনে একটা রিষ্ট্‌ওয়াচ পরা হাত। অন্যমনস্ক ছিলাম, রাগিয়া উৎকট দৃষ্টিতে মুখ ঘুরাইয়া চাহিতেই, সুটকেসের-মালিক দীন মিনতিতে আমার বাঁ হাতটা চাপিয়া ধরিল, হাঁপাইতেছে ঃ "দোহাই!
—স্কুলমাষ্টার গ্র্যাজুয়েট সঙ্গে সঙ্গে লেডি দোহাই!"

একটা আঁচড় লাগিয়া গিয়াছে সুটকেসের কোণে, রাগটা সঙ্গে সঙ্গেই কাটাইয়া উঠিতে পারিলাম না, বলিলাম, "আমি তো স্কুলের ছাত্র নয় মশাই, কানটা যে ছিঁড়ে যেত এক্ষুণি!

আরও ব্যাকুল কণ্ঠে মিনতি ঃ "দোহাই! ওগো, এগিয়ে এসো না গার্ড হুইসেল দিলে, দোহাই।

"একেবারে যে জায়গা নেই উঠবেনই বা কি করে?"

বলিতে বলিতেই সুটকেসটা লইলাম, সেটা না রাখিতে রাখিতেই কাঁধের উপর একটা বিছানার গাঁট আসিয়া পড়িল, তাহার উপর একটা হ্যাণ্ডেল দেওয়া বাঁশের টুকরি। সব আমার চার্জে দিয়া এঁরা তখন দরজায়; লেডি উঠিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, উনি নিজে তখনও দুইটি ধাপ নিচে। গাড়ি হুইসিল দিল।

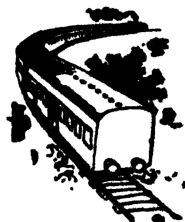
প্রতিদিনের ব্যাপার—প্রতি স্টেশনের, মনটাকে কেমন অবসাদগ্রস্ত করিয়া দিয়াছে। তবুও তো বসিয়া থাকা যায় না চুপ করিয়া! বাক্স-বিছানা সামনে জড়ো করিয়া রাখিয়া উঠিলাম। কতকটা বুঝাইয়া, কতকটা হুমকি দিয়া অতিকষ্টে দুইজনের ভিতর আসিবার একটু রাস্তা করিলাম। পুরুষ যুবা, বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হইবে, মেয়েটি তাহারই স্ত্রী, নব পরিণীতা। বয়স সতেরো-আঠারো, তবুও ছেলে মানুষই তো;—পরিশ্রমে আর এতগুলো পুরুষের মধ্যে কি রকম হইয়া গিয়াছে। বলিলাম, "তুমি যাও মা, ওখানে বসোগে।"

নিজের জায়গায়টা দেখাইয়া দিলাম। আমার সঙ্গে ছিল আমার ভাইঝি, মেয়েটি তাহার পাশে গিয়া বসিল। তাহার পর জামাকাপড় একটু গুছাইয়া লইয়া একবার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে দরজার পানে চাহিল। কষ্ট হয়, নূতন পরিণয়; কিন্তু উপায় তো আর ছিল না। নিজের জায়গার পাশেই মোটমাটের মধ্যে কোনরকমে দুইটা পা পুতিয়া বাক্স ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, যুবককে দরজার কাছেই কোন রকমে গুটিসুটি মারিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। কষ্ট হোক্, কিন্তু চোখে একটি তৃপ্তি আছে। বেশ টের পাওয়া যায়। চাহিয়া চাহিয়া কয়েকবার মেয়েটির দিকে দেখিল। গাড়ি এদিকে বেশ মোশন দিয়াছে।

গোলমালের জের খানিকটা চলিল। সেটি থামিলে শুনিলাম, মেয়েটি বেশ সপ্রতিভকণ্ঠে গলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে আমার ভাইঝির সঙ্গে। বোধহয় সুযোগ

হইয়াছে—আমার মুখটা দরজার দিকে ফেরানো। একবার ঘুরিয়া দেখিলাম, সে মেয়েই নয়, দিব্য আসন পিঁড়ি হইয়া মুখোমুখি হইয়া বসিয়াছে, মাথার একটু কাপড় নামিয়া গিয়াছে, ভ্রুক্ষেপও নাই সেদিকে ; হাত নাড়িতেছে, মাথা দুলাইতেছে, বেশ বোঝা যায়, গাড়ির সমস্ত ব্যাপারটা মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে—মনে হয়, গাড়িটা পর্যন্ত। যেন বাড়িতে বসিয়াই নিভৃত আলাপ জমাইয়াছে।

বেশ কৌতুকপ্রদ মনে হইল ; যেমন গল্পের বিষয়টি বাছিয়াছে, তেমনই বলার ভঙ্গীতে স্বকীয়তা সুস্পষ্ট। যাহা বলিবার প্রায় একটা প্রশ্নের আকারে বলে যেন ধরিয়া লইতেছে একটা স্বয়ংসিদ্ধ ব্যাপার, চিত্রগুলি বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে। অভিমতও বেশ জোরালো।—



"তা আমাদের তো ভরসার মধ্যে মাত্র বিঘে কয়েক ক্ষেত ? পারবে কেন অত দিতে বাবা ? শেষে অনেক কষাকষি, অনে—ক কষাকষির পর এইতে রাজি করানো গেল। এঁদের ওপর হাতে আর্মলেট, নিচের হাতে চারগাছি করে চুড়ি, একটা করে রুলি। এই হার পাঁচ ভরির। প্যাটার্নটুকু ভালো, কিন্তু ফাঁকি। এখন এই যাচ্ছে, ওরা দেখে যদি সিটকোন, দুটো কথা বলেন তো, সেটা কি ভদ্দরলোকের মতন ? ওঁরা এইটেকে সাত ভরি করে দেবার কথা বলেছিলেন তো ? তা কি করে হয় তুমিই বলো না ভাই ? দিতেন বাবা, যখন কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু দেশের অবস্থা যে কি হয়ে পড়ল, কারুর জানতে বাকি আছে ?···কি বন্যে ! কি বন্যে ! কি বন্যে ! যদি দেখতে তুমি ! এক মুঠো ধান তো ঘরে উঠল না। একে তো লড়াইয়ের এই দুর্গতি।···বলেন, আমিও শুনিয়ে দেব। ইসকুলে পড়া মেয়ে, কারুর তোয়াক্কা রাখি না।···"

ভাইঝি প্রশ্ন করিল "ম্যাট্রিকুলেশান পাস ?"

একটু চুপ করিয়া, মুখটা ফিরাইয়া দেখি, জানালার বাহিরে চাহিয়া আছে। অর্থাৎ প্রশ্নটা এড়াইয়া গেল। আবার মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "আর কেনই বা বলব না ?···তোমাদের বুঝে-সুঝে খোঁটা দেওয়া উচিত, এতো সেই ঠানদিদির আমলের কনে-বউ নয় ? সইতে যাবে কেন বাপ-মায়ের নিন্দে ? মা আসবার সময় এক পাশে নিয়ে গিয়ে এমনি করে হাত দুটি ধরে বললেন, 'শচী, মা আমার···'

হঠাৎ গলাটা গাঢ় হইয়া বন্ধ হইয়া গেল। একটু চাপা কান্নার শব্দ হইল, আমার ভাইঝি সান্ত্বনা দিল, "চুপ করুন, শীগ্‌গির তো আবার ফিরে আসছেন।"

একটু পরে কান্নার শব্দ ধীরে ধীরে থামিল। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মেয়েটি বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গাড়িটা খানা জংশনে থামিলে ওঠা-নামার সেই হট্টগোল্ আবার ছাড়িয়া দিল। মনটা বেশ হালকা হইল মেয়েটি আবার সহজ গলায় আরম্ভ করিল—"মা হাত দুটি ধরে ববলেন, 'শচী, মা, হারটি তো কথা-মাফিক আমরা দিতে পারলাম না ; তবে একটু সামলে উঠলেই আবার ওটুকু পুরো করে নতুন করে গড়িয়ে দোব্র। শ্বাশুড়ী তোর দেবে গঞ্জনা, একটু সয়ে যাস ; বুঝিয়েই বলিস, নিশ্চয় বুঝবে, মানুষই তো, দেখলে তো কি বনোটা ঘাড়ের ওপর দিয়ে গেল ! না বোঝে, সইবি চোখ-কান বুজে।···সইবার মেয়ে কিনা শচী। এমন মিষ্টি মিষ্টি করে শুনিয়ে দোব ! ইস্কুলে-পড়া মেয়ে আমি, খাতির বুঝি না (নিজেদের মেয়ে হাতে তুলে দিলে তোমাদের, সেটা বুঝি কিছু নয় ? তার ওপর গঞ্জনা ! ইস্ ! সে যুগ আর নেই)।"

কথাগুলির গুরুত্বেই মেয়েটি এবার চুপ করিয়া রহিল একটু। তাহার পর আবার শুনিতে লাগিলাম।

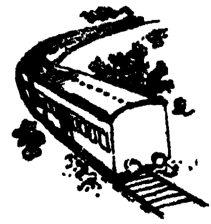
"ভাইবোনে তো আমরা ন'টি ? বোন এই দুজন বিদেয় হলাম, এখন বাপ-মায়ের ঘাড়ে তিনটি তো ? তা ভিন্ন দুটি ভাইয়ের তো খরচ যোগাতে হচ্ছে ? হয় কোথা থেকে ভাই ? সম্বল তো ওই ক'বিঘে ক্ষেত্ তাও দামোদরে খেলে। মানুষ ?—যখন দেখলে এমন একটা দৈব বিপদ ঘাড়ের ওপর দিয়ে বয়ে গেল, মানুষ হ'লে শুধু শাঁখা-শাড়ি নিয়ে বউ ঘরে আনতে, অন্তত এটুকু বলতে, যাক্ বেয়াই, গয়নাগুলো না হয় এর পরে দিও, একটু সামলে ওঠ আগে ;···বেশ, তাঁরা না হয় পাড়াগেঁয়ে মানুন, একটু লুভিষ্টি —তুমি তো বি-এ পাস, একটা ইস্কুলের সেকেণ্ড···মাষ্টার, ছেলেদের ভালোমন্দ শেখাচ্ছে, বিজ্ঞ, জ্ঞানী বলে সমাজে একটা খাতির আছে, তুমি কোন্ বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের বলতে পারলে ?···ওই দাঁড়িয়ে আছেন সামনে, আমি কিছু ভয় করে বলছি না। শুধু গয়না ? এক কাঁড়ি জিনিসপত্র—এসে পেঁছল না যে, নইলে দেখতে। পরের গাড়িতে দাদাকে পেঁছে দিতে হবে।···বে এখনও হয়নি, দিব্যি আছ ভাই, দেখবে, শ্বশুর বাড়ি মানেই শুধু দাও—দাও—আর দাও ; ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছে।

গলসি আসিয়া পড়িল। আপ্-প্ল্যাটফর্মের পাশেই একটি বেশ মাঝারি গোছের পুষ্করিণী, চারিদিকে গাছ-পালা। ছায়ায় বসানো তিনটি পালকি, জনকয়েক বেয়ারা বসিয়া শুইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

প্ল্যাটফর্মেও জন চারেক ভদ্রলোক অপেক্ষা করিতেছিলেন। হৈ-চৈ ঠেলাঠেলির মধ্যে বর-বধূ নামিল, জিনিসপত্রগুলো নামাইয়া দিয়া আমিও নিজের জায়গাটি দখল করিলাম। দলটি পুষ্করিণীর অভিমুখী হইল।....গাড়ি যখন ছাড়িল, দেখি দূরে পালকির দোরের কাছে ঘোমটাটি দু হাতে একটু তুলিয়া মেয়েটি আমাদের গাড়ির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

তাহার পর কয়েকবার এইখান দিয়া যাতায়াত করিয়াছি। গলসিতে গাড়ি থামিলেই ছায়াশ্যামল পুষ্করিণীর দিকটিতেই চাহিয়া থাকি। সমস্ত চিত্রটি জাগিয়া উঠিয়া কৌতুকে-কৌতূহলে মনটা আচ্ছন্ন করিয়া তোলে। সেই প্রগল্‌ভা নববধূ, গুরুগম্ভীর তাহার অভিমত সব,—বিদায়ের স্মৃতিতে গলা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠা—তাহার পর সেই শেষ দৃশ্য—পালকির দ্বারপথে দুইহাতে ঘোমটা তুলিয়া আমাদের গাড়ির দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকা।···আর একবার দেখা পাইলে বেশ হইত।

দুই বৎসর পরে আবার দেখিলাম। আমার ভাইঝির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, একটা কাজে বাপের বাড়ি আসিয়াছিল, তাহাকে পোঁছাইতে যাইতেছি।



বেশ খানিকটা দূর হইতেই গলসির সেই পুকুর—পাড়ের কোণটিতে একটা পাল্কি দেখিয়া মনটি একটু উৎসুক হইয়া উঠিল। গাড়ি প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিলে দেখিলাম, সেই দম্পতি, মেয়েটির কোলে একটি ন'দশ মাসের ফুটফুটে শিশু। আমাদের গাড়িটা প্রায় তাহাদের কাছাকাছি গিয়া দাঁড়াইল, আমি হাঁক দিয়াই ডাকিয়া লইয়াম যুবককে। শিশুটিকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী জানালা দিয়া তুলিয়া লইল। মোটঘাট তুলিয়া দুইজনে উঠিল, মেয়েটি আসিয়া আবার প্রায় সেই রকমভাবেই আমার ভাইজির পাশটিতে উপবেশন করিল। আমার এবার উঠিবার খুব বেশী দরকার ছিল না, তবে আমার পাশেই মেয়েটির বসিবার জায়গা হওয়ায় আমি ওই অজুহাতেই উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নইলে গলা খুলিবে না তো? যুবক দরজার কাছে বেঞ্চের কোণটিতে একটু জায়গা পাইল। এদিকে কান রাখিয়া আমি যুবকের সঙ্গে অল্পসল্প আলাপ জুড়িয়া দিলাম। ইনি আবার একটু মিতভাষীই। প্রজাপতি বি-সমেরই মিলন ঘটাইতে ওস্তাদ কিনা!

গল্প এবারে সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।—

"ওমা, তোমারও বিয়ে হয়ে গেছে! দিলেন বাপ-মা বিদেয় ক'রে শেষ পর্যন্ত? এ যে কি বিদেয় করা ভাই, মর্মে মর্মে বুঝবে এবার।"

ভাইঝি প্রশ্ন করিল, "সেই এসেছেন আর এই প্রথম—"

"না, অতটা এখনও হয় নি; এই তো কাছে-পিঠেই। কয়েকবার গেছি এসেছি। তা ভাই, তুমিই বলো না—আর কি হুট বলতে আমিই নাগিয়ে বাপের বাড়ি যেতে পারি?—এখন একজনদের সম্পত্তি তো? তায় ভগবান ওই গুড়োটি দিয়েছেন—

শ্বশুরের তো নয়নের পুত্তলি বললেই হয়।—চলে এখন আমার হুট বলতে বাপের বাড়ি যাওয়া ?···তাত বাবা-মা-ভাইদের একটু অভিমান হয়। তা যে দোষের তা বলছি না, বাপ-মা-ভাইই তো ? তবে, আমিই বা কি করি বলো ভাই ? দাদার ছেলেটির অন্নপ্রাশন, চিঠি এলো, লোক আসবে নিতে, আর হবি তো ঠিক সেই সময় এদিকে মেজো দেওরের ছেলেরও ভাত। জা-টি আবার আমার বড় নেওটা—দিদি না হলে একদণ্ড চলে না, মেজো দেওরও বউদি-অন্ত প্রাণ। গেলে বলবে—'দেখ, নিজের ভাইয়ের ছেলে, বউদি কেমন দিব্যি ছেড়ে চলে গেলেন।' শ্বশুর-শ্বাশুড়ী অবশ্য বললেন, 'বউমা, যাও, ভাইয়ের প্রথম সন্তান, দরকার যাওয়া !'—লোক ও'রা দু'জনেই খুব ভালো কি না—তা নিজের তো একটা আক্কেল বলে···"

হাসি পাইল। খুলিল মেয়ের স্বরূপ ?—এই দুইটা বৎসর যাইতে না যাইতেই।

আমার ভাইঝিও হাসিয়া বলিয়া ফেলিল, "আমি থাকলে তো চলে যেতাম।"

"সে ভাই, বলা সহজ, কাজে ততটা সহজ নয়, দেখতে পাবে ! কি বাঁধনে যে বাঁধে ! দেওরের ওই ছোট ছেলেটিকে তো এক দণ্ড না দেখলে পরে প্রাণ আই-ঢাই করে। এই চলে এসেছি, 'জেতি জেতি' করে সমস্ত বাড়িটা···"

স্বরটা গাঢ় হইয়া আসিল, গলা একটু থামিল। এবারে, অবশ্য মায়ের নিকট বিদায়ের সে ক্রন্দন নয়, তবে স্রোতের উল্টা গতিতে আমার সেই কথাই মনে করাইয়া দিল।

আবার আরম্ভ হইল—

"বাইরে মন বসানো কি কম শক্ত ভাই ? এর ওপর আবার বুড়ো শ্বশুর আছেন, শ্বাশুড়ী বড্ড পিটপিটে শুচিবেয়ে, সর্বদা সামলে থাকতে হয়।···তাই বলছিলাম—কত পরই যে করে দেন বাপ-মায়ে।···"

উল্টো আমাদেরই দোষ দেয় যে, হাসিতে এবার মুখটা কুণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল, অনেক কষ্টে সামলাইয়া লইলাম।

গাড়িটা খানা জংশনে আসিয়া দাঁড়াইল। আবার সেই হট্টগোল যুদ্ধ দানবের খণ্ড-যুদ্ধ। খানিকটা সামিল হইয়া যাইতেই হয়, গল্পের দিকে আর মন রাখা সম্ভব হইল না। গাড়ি ছাড়িয়া দিল, কতকটা শান্তি আসিল, আবার কানে আসিল—

"হ্যাঁ, সেই সোনাটা, হারে সেই দু'ভরি কম পড়ে গিয়াছিল না ? এখন পর্যন্ত তো সেটা পূরণ করেন নি। শ্বশুর অত্যন্ত ভালো লোক, কোন মতেই চাইবেন না মুখ ফুটে, আর পেছনে ওই যে মানুষটি দেখছ—মানুষ বললেও চলে, আবার জড়োপদার্থ বললেও চলে। লাজুক, মুখচোরার একশেষ—স্কুল মাস্টারই তো ? নিজের পাওনা-গণ্ডা নিজে বুঝে নিতে হবে তো ?—না, কি মনে করবেন তাঁরা, সামান্য দু'ভরি সোনা !" ···শোন কথা ভাই—দু'ভরি সোনা, আজকালকার বাজারে কম হ'ল।—কিছুনা কিছুনা করেও যার নাম দুশোটি টাকা। শেষকালে কিনা আমাকেই মেয়ে হ'য়ে লিখতে হ'ল···"

আমার ভাইঝি একটু বিস্মিত ভাবেই প্রশ্ন করিল. "আপনি লিখলেন ?"

মেয়েটি একটু অপ্রতিভ হইয়া পাড়িল যেন ; একটু লজ্জাস্মিত কণ্ঠে বলিল, "সে রকম ভাবে কি লিখলাম ? তা কি পারি কখনও ? মেয়েই তো, আর মা-বাপই তো তাঁরা ? ···গাছের ডালটাই না হয় আলাদাই হল—সম্বন্ধ তো ঘোচে না ?···লিখলাম—'মা, খোকার অন্নপ্রাশনের সময় একটা কিছু সোনা-দানা না দিলে একটু নিন্দে হবে। হেমার বিয়েতে হয়ে গেছে অনেক খরচ, তা অন্ততঃ ভরি খানেকের একটা কিছু যদি পারো দিতে দেখো। না পারো, তোমাদের আশীর্বাদই যথেষ্ট।"

মন্দ হ'ল ভাই ? যখন সাত মাসেরটি তখন খোকা বড্ড ভুগলো বলে ডাক্তারের মতে অন্নপ্রাশনটি পেছিয়ে দিতে হ'লো। মাস তিনেক সময় পেলেন, একটু সুবিধেও তো হ'ল ? তবু এটুকুও লিখতাম না ; হাজার হোক, মা-বাপই তো ? মনে করবেন, দেখ, ওই যে দু'ভরি সোনা পড়ে আছে, বেয়াই লিখলেন না, বেয়ান লিখলেন না, মেয়ে পাকে-প্রকারে আদায় করে নিচ্ছে।' লিখলাম এই আসছে বোশেখে ভাত তো ?—তা এঁরা কিছু দিতে পারবেন না। আর কোথা থেকে পারবেন বলো ভাই ? সম্বল তো ওই বিঘে কয়েক ক্ষেত আর ইস্কুলের চাকরিটি—তাও ইস্কুলের যা অবস্থা, এই লড়াইয়ের হিড়িকে এক মাস মাইনে পায় তো দু'মাস পায় না। এই সব দেখে বুঝে ওঁরা নিজেই যদি আক্কেল করে বাকি সোনাটুকু দিতেন তো আমার আর···"

গাড়ির গতি মন্দ হইয়া আসিতেছে। মেয়েটি একবার গলা বাড়াইয়া দেখিয়া লইল। হঠাৎই মুখটা একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শিশুটি আমার ভাইঝির কোলে ছিল, তুলিয়া লইয়া মুখের পানে চাহিয়া দুইটা চুম্বন করিয়া বলিল, "মামার বাড়ি এসে গেল খোকন !—দিদিমা—দাদু—মাসীমা ! সোনাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে···সাধ করে কি লিখি ভাই ? এই সোনার অঙ্গে একটু সোনা-দানা না হ'লে চলে ?—কখনও —মায়ের প্রাণ কখনও বাঁচে ?

* * *

গাড়ি আসিয়া স্টেশনে দাঁড়াইল।

একটি বৃদ্ধ ব্যাকুল ভাবে খোঁজাখুঁজি করিতে করিতে এদিকে আসিতেছেন। মেয়েটি শিশুটিকে কোলে লইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল, "ওই আমার বাবা, ভাই। এই রন্দুরে—বুড়ো মানুষ—ঐ কাহিল শরীর···"

স্বরটা হঠাৎ খুবই গাঢ় হইয়া পড়িল। বলিল, কি দোঠানা যে মেয়ের অদেষ্ট ভাই। মাকে চিঠিটা লিখে পর্যন্ত মনটা এত খারাপ হয়ে আছে···থাকলে কি আর দেয় না মানুষে !—কি জানি, তাঁর মনের অভিমান মেটাতে পারব কিনা···"

ছেলে কোলে, বাঁ হাতে আঁচল জড়ো করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে নামিয়া গেল।



রুচি রহস্য

বিবাহ হয়েছে রাজঘোটক। শুধু বরকনের বিষয়েই নয়, তাদের তো ভালো জ্যোতিষীকে দিয়ে কোষ্ঠী বিচার করিয়ে দেওয়া হয়েছেই বিবাহ, দুটি পরিবারের মধ্যেও নূতন-পুরাতনে রুচির একটি আশ্চর্য মিল রয়েছে, আহার-বিহারে, সব রকমেই। বেহাই বাড়িতে দেখা করতে এসে ছেলের বাপ ব্রজকিশোর চায়ের টেবিলে বসে বললেন···"এ সব অচল আজ, পার্টি থেকে আসছি। আমার মুড়ি আর পাঁপড়-ভাজা কই?" মেয়ের মা পদ্মাবতী অনুযোগের ·হাসির সঙ্গে বলবনে—কী জ্বালা! আছে তো সব, আপনার বেহাইয়ের না হ'লে চলে না।

···কিন্তু নতুন কুটুমের টেবিলে দিই কি ক'রে বলতো?"

স্বামীকে সাক্ষী মানেন শেষের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে স্বামী ব্রজঝিশোর বলেন—"নতুন কুটুম একটু না দেখেশুনে পতিদেবতার উইকনেশটুকু পর্যন্ত বাহির করে বসে আছে, কারো পাপের প্রায়শ্চিও এখন।"

একটু হাসি ওঠে।

পদ্মাবতী বলেন—"কী জ্বালা দ্যাখো দিকিন—"

—"দু বেহাই একজোট হয়ে···"

মেয়ে ভদ্রাকে ডেকে বলেন—'তুই-ই তাহলে দেখা ভাদু মুড়ির সঙ্গে পাঁপড় ভেজে তোর শ্বশুরকে। আমার দ্বারা হবে না বাপু। বৌমাকেই বলতাম; তা, তোকেই তো ভুগতে হবে, অব্যেস কর।"

স্বামীর দিকে চেয়ে বলেন, "তোমাকেও হুঁশিয়ার ক'রে দিচ্ছি, সেখানে গিয়ে মুড়ি পাঁপড়ভাজা ছাড়া কিছু নয়!"

"বাঃ রে !—" ব্রজকিশোর চোখ কপালে তোলেন, বলেন—"বোকা বেহাই করার সাজা নাকি ?"

হাসিটা আরও উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে।

এই সূরে ছোট মজলিসটি জ'মে ওটে। কখনও এ-বাড়ি ত কখনও ওবাড়িতে।

এই সূরে কলকাতাতে দিন পাঁচেক কাটল, যাওয়া-আসা, মেলা-মেশা, কুটুম থেকে কুটুমের আত্মীয়। সুই বাড়ির মিলের মধ্যে রয়েছে দুই কর্তার খাওয়া-খাওয়ানোর শখ, দেশী-বিলাতী মেনু মিলিয়ে। তাতেই প্রীতিভোজে-বনভোজে কোথা দিয়ে যে পাঁচটা দিন কেটে গেল, বোঝা গেল না। এরপর বাইরের প্রোগ্রাম ঠিক হোল। তার আবার দিন বাঁধা, যার জন্য কলকাতার অনেক কিছু আপাতত স্থগিত রাখতে হোল। ছেলে উমাশঙ্কর বাবা বৈদ্যনাথের দোর-ধরা। ওর, জন্ম মামার বাড়িতে, দাদামশাই দেওঘরের বড় ডাক্তার ছিলেন। দুটি মেয়ের পর মানৎ করে উমাশঙ্করকে পান তার মা হেমপ্রভা।

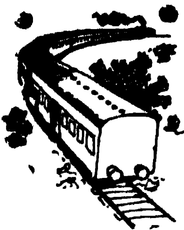
পিতা মারা যাওয়ার পর ওখানকার পাট অনেকদিন উঠে গেছে, তবে উমাশঙ্করের উপনয়নাদি সব কাজের পর সেখানে গিয়ে পুজো দেওয়া নিয়ম দাঁড়িয়ে গেছে। একটা শক্ত কোন অসুখ থেকে উঠলেও, একটা ভালো পাশ দিলেও। ও উপস্থিত গত বছর মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে হাউস সার্জন হয়ে রয়েছে !

বিবাহের ছয় দিনের মাথায় শিবরাত্রি পাওয়া যাচ্ছে, শিবপুজোর পক্ষে প্রশস্ত। কলকাতার পোগ্রাম কিছু কাটছাঁট করে দেওয়া হোল।

রেলে নয়, দু' বাড়ির দু'খানা মোটরে ক'রে আটজনের যাওয়া ঠিক হোল, ড্রাইভার ছাড়া। ছেলের-বৌ, দুই বেহাই, দুই বেহান, ব্রজকিশোরের পাচকঠাকুর মিশিরজী, প্রিয়নাথের চাকর মেওয়ালাল। দেওঘরে পুজো দিতে দেখাশোনা করতে চার-পাঁচদিন যা লাগে তারপর উমাশঙ্কর আর ভদ্রা মোটরে করে বেরিয়ে যাবে। মুখে অবশ্য কেউই 'হনিমুন' কথাটা বলল না। ওরা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড হয়ে দিল্লী যাওয়ার পথই ধরবে। বড় শালী তন্দ্রা বিয়েতে আসতে পারে নি, দেখতে চায়, তবে ওদের ঘুর পথে দেরাদুন-নৈনিতালে কিছুদিন কাটিয়ে যাওয়ার কথা। আরও যদি যেতে যেতেই কোন জায়গা ভালো লেগে যায়। দাঁড়ায় সেই 'হনিমুনই'; মুখে বললেই যেন অতিরিক্ত সাহেবিয়ানার মতো শোনায়। জ্যোৎস্নাপক্ষ চলছে, কোথাকার চাঁদ হঠাৎ মধুময় হয়ে উঠবে—ওটা হাতে রাখল। দেওঘর-দিল্লীর মাঝে সময় রাখল দিন পনের।

ফেরবার সময় মাত্র একটি গাড়ি, তেমনি মিশির বাদ যাচ্ছে। সে এদিককারই ব্রাহ্মণ, বাড়ি দেওঘর থেকে ক্রোশ পাঁচেক দূরে। কাজের ভিড়ের পর এক সপ্তাহ ছুটি নিয়েছে। এখানে রান্নার দিকটা সামাল দিয়ে ও'রা ফেরার সঙ্গে সেও বাড়ি চলে যাবে। ড্রাইভার নিয়ে তখন দু'জন থাকে। তা এমন কিছু অসুবিধা নয়। শীতের শেষ, সময়টা ভালো, প্রিয়নাথের গাড়িটা বড়, চলে যাবে।

বেশ কাটল কটা দিন। তারপর ফেরার সময় ব্যবস্থা খানিকটা উল্টে গেল।
ও'রা উঠেছিলেন যশিডিতে ব্রজকিশোরের এক মাড়োয়ারী মক্কেলের বাগানবাড়ীতে। সেখান থেকেই ত্রিকুট পাহাড়, তপোবন মঠ আশ্রম আর অন্যান্য স্থান দেখে বেড়ানো। তারপর দ্বুবেলা মন্দির। ওদিকে কলকাতা থেকে একটানা আসা—উমাশঙ্করের জন্য ন্বতন কেনা গাড়িটা মোটাম্বটি ভালোই বরদাস্ত করল ধকোলটা, তবে প্রিয়নাথের মোটর যাওয়ার আগের দিন বিকালে জবাব দিল।
বেশ জখম হয়েছে গাড়িটা দীর্ঘ পথ বেয়ে ফেরার উপযুক্ত করে তুলতে কমপক্ষে দিন পাঁচেক লাগবে। ব্রজকিশোর উকিল, প্রিয়নাথ ডাক্তার, কারুরই অতদিন বাইরে থাকা সম্ভব নয়। ট্রেনে ফেরার ব্যবস্থা করতে হোল।
বেশ ভালোই কাটল।



যে উদ্দেশ্য নিয়ে আসা তার কোনটাতেই কোনস্থানে খ্বঁৎ রইল না। এই সময় মন্দিরে বেশ ভিড়, কিন্তু সেখানে আশাতীত ভাবেই সব ম্বশকিল আসান হয়ে গেল মিশিরের জন্য। বৈবাহিক স্বত্রেই এখানকার একজন পাণ্ডা তার কুটুম্ব বলে জানা ছিল, শাখা-প্রশাখা ধরে একটু দ্বরপথে। তাকে খ্বঁজে বের করল। এদিকেও বৈবাহিক—বৈবাহিকার ব্যাপার শ্বনে লোকটা মানসিকের প্বজাটার যথাসম্ভব ভালো ব্যবস্থা তো দিলই করে, নিজেও উদ্যোগী হয়ে ; খাস শিবরাত্রিটাও খ্ব ভালোভাবে চালিয়ে দিল।
আহারের দিকটায়ও যে বিশেষ ক্ষোভ রইল না সেও মিশরের জন্যই।
দেশী, বিলাতী মোগলাই সবরকম মিলিয়ে খাওয়া অভ্যাস অথচ বাবা বৈদ্যনাথের এত কাছাকাছি, মনটা খ্বঁৎখ্বঁৎ করেই।
মিশিরকে জিজ্ঞাসা করা হোল, সে এদিককার লোক। এক্সপার্ট।
প্রায় দশ বারো বছর কলকাতায় বাঙালীর ঘার চাকরি করে লোকটা ঝান্ব হয়ে গেছে। এ প্রশ্নটা উঠবেই জানা ছিল, তার অভিমতও প্রস্তুতই ছিল। তব্ব সেটাকে গ্বর্বত্ব দেওয়ার জন্য জানাল সে নিজে "ধাম-রহস্য" তেমন জানে না, তার বৈবাহিককুটুমকেই প্রশ্ন করে জানাবে। বলল, করেছিল প্রশ্ন। সে বলেছে, শ্বধ্ব বৈদ্যনাথধামটুকুই বাবার 'ত্রিশ্বলের' ওপর পড়ে, এর বাইরে কে সিদ্ধ খাচ্ছে কে নিষিদ্ধ খাচ্ছে খোঁজ রাখেন না অত বাবা।

বাগানবাড়িটা আবার যশিডি সহর থেকেও মাইল দেড়েক দূরে।
ওদিক থেকেও একঘেয়েমিটুকু কাটল।
শুধু একঘেয়েমি কাটাই নয়, প্রাচুর্যও রইল ভালোরকমই। বৈচিত্রও।
বাবা বৈদ্যনাথ ভক্তদের জন্য আছেন। অন্যদের কাছে এর প্রচুর দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন-সামগ্রী—প্যাঁড়া, দই, মালাই, রাবড়ী আর এগুলিকে নিরুপদ্রবে পরিপাক করিয়ে দিতে সমর্থ এর জল। এদিক দিয়ে কোন ত্রুটিই রইল না। বাসায় দুবেলা ভরপুর আয়োজন তো রয়েছেই, তাছাড়া উমাশঙ্করের দাদামশাইয়ের পরিচয়ে অনেক পুরনো বাড়ির সঙ্গে হৃদ্যতা হয়েছে, দিনপাঁচেক যে কাটল তার মধ্যে সকাল বিকাল মিলিয়ে গোটাচারক নিমন্ত্রণও জুটে গেল। লোহা হজম করা জল, তারওপর প্রচুর ঘোরাঘুরি, কোথায় যে তলিয়ে যেতে লাগল সব কিছু, যেন বুঝতেই পারা গেল না!
তবু মানুষেরই মন, সবকিছু পেয়েও কোন্ অজ্ঞেয় অতলে আকাঙ্খার একটু সূক্ষ্ম কণিকা থেকেই যায় লুকিয়ে ; বুঝতে দেয় না। স্পষ্ট করে বুঝতে দেয় না। শুধু অপরিতৃপ্তির একটা অস্পষ্ট আকুতি জাগিয়ে, যা পাচ্ছি তাকে পূর্ণভাবে পাওয়ার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম একটা বাধা জাগিয়ে রাখে। এত মাঠ—নদী—পাহাড়,—এত ভালো দোল-খাওয়া রাস্তার মধ্যে এ অনুভূতিটা একদিন হঠাৎ এসে পড়েছিল শহরের একটা সরু, প্রায় অবহেলিত গলির মধ্যে দিয়ে আসবার সময় ; ছোট গলি, অনুভূতিটা স্পস্ট রূপ নিতে না নিতেই মোটরটা বেরিয়ে এল। সেই থেকে মাঝে মাঝে হঠাৎ জেগে উঠে। কখনও আসনে, কখনও পর্যটনে, কখনও বা কারুর কারুর স্বপ্নেও জেগে উঠে নিদ্রায় মধ্যে ব্যাঘাত ঘটতে লাগল।
এরপর কি করে কি হোল ঠিক বলা যায় না হয়তো বাবা বৈদ্যনাথই চান না তাঁর দ্বারস্থ হয়ে কেউ অপূর্ণতার অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যায়—এক সময় একটা বিশেষ পরিবেশে অস্পষ্ট অনুভূতিটা হঠাৎ উগ্রভাবেই স্পষ্ট হয়ে উঠল, তৃপ্তও হোল সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবেই।
প্রিয়নাথের মোটরটা জখম হয়ে কারখানায় গেছে। এঁদের ট্রেনেই ফিরতে হবে। উমাশঙ্কর আর ভদ্রা আহার সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে মোটরে বেরিয়ে গেল।
মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার। বিকালে বছরের এ-সময়টা সন্ধ্যাই হয়ে যায়। আহার সেরে একটু ভালো করে বিশ্রাম নিয়ে ওঁরাও ট্যাক্সি করে যশিডি জংশন চলে এলেন। দু'খানা লাগল। অনেকগুলি মালপত্র, তারওপর এখানে অনেক কিছু কেনাও হয়েছে। দিনটা বাদুলে, একটু একটু হালকা বৃষ্টিও পড়েছে মাঝে মাঝে। খানিকটা সময় হাতে রেখেই যাত্রা করলেন ওঁরা। মিশিরটা ছিল যেমন চৌকোশ, মেওয়ালালটা তেমনি হাঁদা-হাঁদা। এত মোটঘাট দেখে-শুনে নামিয়ে আবার হিসাব রেখে গাড়িতে তোলা—একটা হ্যাপাই তারপর ঐ চাকর, নিজেরাও বাইরের সফরে বিশেষ অভ্যস্ত নন।
হ্যাঙ্গাম বেড়েই গেল। শিবরাত্রির জের চলেছে ; বেশ ভিড়। একের মালপত্রের সঙ্গে অপরের মালপত্র মিশে যাওয়ার ভয়, খুব সতর্ক না থাকলে। তার ওপর

গাড়িটাও এল প্রায় ঘণ্টা দুএক লেট। বৃষ্টির ঝোঁকটাও বাড়তির দিকেই, ঝাপটা আসছে মাঝে মাঝে। বেশ একটু নাকাল হয়েই গাড়ি আসতে সবাই উঠে সামনে-সুমনে বসলেন। লেট গাড়ি, একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল। ব্রজকিশোর হাতঘড়িতে দেখলেন। পৌনে আটটা।

এর পর আরামই। ফার্স্ট ক্লাশের চারটে বার্থ ও'দেরই দখলে। দুটো কুলি আর মেওয়ালাল মিলে বাকস-পেটরা আর অন্য সব টুকিটাকি, বেঞ্চের নীচে, টেবিলে, হুকে ঠিকঠাক করে গুছিয়ে দিয়ে গেছে। মেওয়ালাল বিছানাও ওপর নীচে চারটে বার্থে পেতে দিল। ও'রা হাত-পা মেলে নীচের বেঞ্চ দুটায় বসলেন। একটাতে দু'জন বেহাই, একটাতে দু'জন বেহান। একটু ঢাকাঢুকি দিয়েই; এখনও শীত রয়েছে, এদিকে পাহাড় অঞ্চলে একটু বেশিই। বেশ জমে উঠল গল্প। ক'দিনে অনেক জমেছে মালমশলা, তেমনি একেবারে নূতন বেহাই-বেহান, গাড়ির মুক্ত নিশ্চিন্ত গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে সবার মনও বেশ মুক্ত হয়ে উঠেছে। মেওয়ালাল পাশের গাড়িতেই জায়গা পেয়ে গেছে।

ক্লান্তও রয়েছে সবাই। ঠিক হোল মধুপুরেই রাত্রের আহার সেরে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়বেন, দুই বেহাই ওপরে, দুই বেহান নীচে।

তারই প্রস্তুতিতে আগের স্টেশনে—গাড়ি পৌঁছালে মেয়ের মা পদ্মাবতী উঠলেন। সব ঠিক করাই আছে। বড় ফ্যামিলী-টিফিন-কেরিয়ারে লুচি, আলুর দম, ছোলার ডাল, রাজভোগ, বরফী-সন্দেশ, বৈদ্যনাথধামের জলের জেরটা এখনও রয়েছে, ব্যবস্থা ভালো সবই করা হয়েছে। ওখানকার প্যাঁড়াই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মিঠাই, সের চারেক একটা চ্যাঙারিতে লাল গামছা দিয়ে বাঁধা রয়েছে।

একটা টিনের বাক্সর মধ্যে প্লেট, গেলাস। দুই বেহানের মধ্যে হেমপ্রভাই ছোট, আটটা ছোট-বড় প্লেট বের করে দুটো বেঞ্চের মাঝখানে রাখলেন; বড়টায় লুচি, আলুর দম, ডাল দিয়ে। ছোটটায় রাজভোগ আর বরফী-সন্দেশ দিয়ে, বেঞ্চের নীচে মেঝে প্যাঁড়ার টুকরিটা বের করতে গিয়ে একটু টেনে যেন আঁতকেই নিজেকে একটু টেনে নিয়ে বলে উঠলেন—"ওমা একি! এ-টুকরি আবার কোথা থেকে এল—আর, কী বিটকেল একটা গন্ধ!"

পদ্মাবতী ঝুঁকে দেখে বললেন—"পেঁয়াজ তো। পেঁয়াজের বড়া…"

"পেঁয়াজের বড়া!„—উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন ব্রজকিশোর।

হেমপ্রভা বললেন, "তাই তো দেখছি! ছিল না তো আমিই তো সব বাঁধাছাঁদা করলাম সকালে। কোথা থেকে এল!…"

"তুমি বের করো আগে। যেখান থেকেই, আসুক, বৈদ্যনাথ পাঠিয়েছেন। বাবাঃ, গোটা একটা সপ্তা ধরে রাবড়ি, মালাই…লুচি পাঠা খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে।… নিন সাজান বেহান, ওসব রাবিশ মাল তুলে রাখুন।…আপনারাও নিন; বেহাইকেও

দিন—অত ঢাকঢাক-গুড়গুড় বুঝি না—সবার পেটের খবর রাখি···লজ্জা হয়, সরুন দিকিন, আমিই পরিবেশন করে দিচ্ছি···"

প্রিয়নাথ বললে—'না গো, তুমিই দাও। বেহাইয়ের মুখে নাল গড়াবে।···তাহলে আর এগুলো অত করে কেন? তুলে রাখো। একটা টেপা হাসি লেগে রয়েছে সবার ঠোঁটে। ব্রজকিশোরের একটু কম; দৃষ্টিতে আগ্রহের ভাগটাই বেশি। একবার বললেন—'পাঁপড় নয়, বেগুনি নয়, একেবারে পেঁয়াজের বড়া। বিশ্বাস করা শক্ত। কটা আছে?'

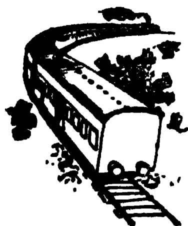
হেমপ্রভা টুকরিটা বের করেছিলেন, টেপা হাসির সঙ্গে গুণে বললেন—'তিরিশটে।'

'চার সাততে আটাশ; দুটো বাড়তি।' হিসেব করে ফেললেন ব্রজকিশোর।

"আমরাও সাতটা করে? রক্ষে করো।—অবশ্যি, বেয়ান যদি খান, বলতে পারি না?"

—পদ্মাবতী বললেন, 'আমি একটাও না। বাবাঃ এমনিতেই গা ঘিন ঘিন করছে।'

ব্রজকিশোর বললেন—'আপনি বেহাইয়ের নাল বেরুনের কথাটা চাপা দিতে চাইছেন।,



বৃষ্টিটা বেড়েছে। জানালার ওপর পৎ-পৎ বৃষ্টির ধারা এসে পড়ছে। ঠাণ্ডাটাও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। গরম রয়েছে বড়াপুঞ্জ এখনও। মনে হয় গাড়িতে ওঠবার কিছু আগে কাছাকাছি কোন দোকান থেকে ভাজিয়ে নিয়ে এনেছিল, তারপর প্ল্যাটফর্মে ভিড়ের জন্য কি ক'রে চলে এসেছে গোলমালে হাত বদল হয়ে।

বেহাইরা পাঁচটা করে। পদ্মাবতী তিনটে, হেমপ্রভা দুটো। ক'দিন অনেক মেলামেশায় অনেক লজ্জা কেটে গেছে, তবু মুখ ফিরিয়েই একটু তেরছা হয়ে বসেই খেলেন দুজনে। তাইতেও লজ্জা কেটে আসতে লাগল। গাড়ি যতক্ষণ মধুপুর এসে পেঁছাল, ততক্ষণে ব্রজকিশোরের এগারোটা, প্রিয়নাথের আটটা, হেমপ্রভার ছটা আর পদ্মাবতীর পাচটা হয়ে ঝুড়ি খালি হয়ে গেছে।

ঝুড়িটা জানালা গড়িয়ে বাইরে ফেলে দিলেন। একটা বেশ বড়গোছের ঢেঁকুর তুলে সহানুভূতির স্বরে বললেন—'আহা, কার শখের ডিনার কার ভোগে গেল।'

মধুপুর এসে গাড়িটা থামার সঙ্গে সঙ্গে পাশের গাড়ি থেকে মেওয়ালাল বেশ একটু হন্তদন্ত হয়েই উঠে এসে দরজায় থমকে দাঁড়াল। কাঁচুমাচু হয়ে বলল—'মা, আমার এক্‌ঠো টোকরি ছুটে গিয়েছিল—নতুন গামছায় বাঁধা···'

চারজনে ওর মুখের দিকে ফিরে একেবারে কাঠের পুতুল হয়ে গেছেন। "ওমা তোর।..." বলে পদ্মাবতী আরম্ভ করেছেন, ব্রজকিশোর উকিল, উপস্থাপিত বুদ্ধিটা বেশি, তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে বললেন—"তোর ছিল? তা বলতে হয়। গাড়িতে প্যাঁজের গন্ধে টেঁকা যায় না, আমরা জানলা গলিয়ে ফেলে দিলাম যে! এখন আর কি করবি ?"

হেমপ্রভাকে বললেন—"দাও গো, আমাদের প্লেটের খাবারগুলো দিয়ে দাও; উপোস করে থাকবে এতটা পথ ?"

'আর গোটাকতক প্যাঁড়াও দিয়ে দিন-বেশি করে।' প্রিয়নাথ বললেন 'আহা। দুঃখ করিসনি বাবু; গন্ধে অতিষ্ট ক'রে তুলেছিল একেবারে।...'

গামছাটাও ভাগ্যিস ফেলে দেওয়া হয়নি। গুছিয়ে, তাইতে করে বেঁধে দিয়ে দেওয়া হোল।

মেওয়ালাল হাঁদা হাঁদা ভাব নিয়ে মোটটা হাতে ঝুলিয়ে নেমে গেল।

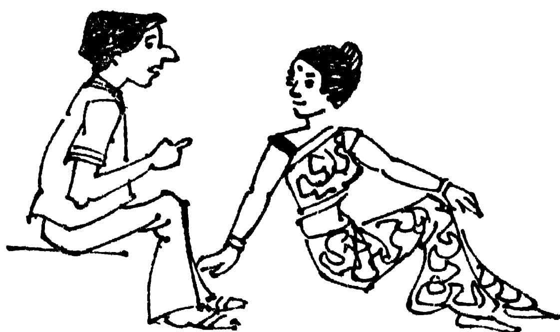
ব্রজকিশোর কতকটা যেন নিজের মনেই মন্তব্য করলেন—"পিঁয়াজীর শোক কী প্যাঁড়ায় মিটাতে পারে কখনও!"...আহা।"

একটা যে হাসি সবার বুকে গুড়গুড়িয়ে উঠেছিল, ঐটুক উস্কানিতে এল বেরিয়ে। প্রথমটা চাপা, সবার মুখ আলাদা আলাদা ঘোরানো, তারপর যে আড়ালটুকু আর ধরে রাখা গেল না, থেকে থেকে সবার মুক্ত হাসিতে কামরার হাওয়াটা ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলতে লাগিল। এতবড় বঞ্চনার মধ্যে ঠিক কোথায় উৎস হাসিটার ধরা যায় না, তবে চেপে রাখাও অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি শয্যায় আশ্রয় নিতে হল একটু চাপাচুপি দিয়েই তাতেও কি অবাধ্য হাসি বাগ মানতে চায় ?

চতুর্থ পর্ব

তিল-তাল-তালশাঁস



তিল থেকে তাল হয়ে গেল।

কলকাতার উপপ্রান্তে নূতন কলোনী গড়ে উঠছে।

আজকাল বিয়ের মেয়ে দেখায় আগেকার মতো সেইসব চিরপ্রচলিত প্রশ্ন নেই—"শুক্তোয় কি কি মশলা দিতে হয়?…শাকের ঘণ্টে কি সব আনাজ দিতে হবে?…এক সের দুধের পায়েসে কতটা নুন দিতে হবে?…চালের পায়েস আর সুজির পায়েসে মশলার কি তফাৎ?"

তার জায়গায়—"কতদূর পড়েছ?…নাচতে জান?…গাইতে?…তাহলে একটা গাও তো শুনি…কোনও বাজনা?—কোনটায় হাত আছে?…"

সদুত্তর না পেলে বাতিল। কোষ্ঠীর মিল-গরমিল হাতেই রয়েছে তার জন্য।

কলোনীর একটু পাশে বসু-মিত্তিরদের খানিকটা জমি ফাঁকা পড়ে আছে। তার ওপর করোগেটেড্ টিন দিয়ে ঘিরে স্টেজ—অডিটোরিয়ম্ খাড়া চ্যারিটিশোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। উন্নতিশীল পল্লী, ছেলে-মেয়ের অনেকগুলি 'ট্যালেণ্ট'। উৎসাহটা প্রধানত যুবকদের। তাদের টানে প্রৌঢ়রাও এসে পড়েছেন। যুগধর্মের খাতিরে তদূর্ধ্বেরাও বেশ কিছু। জমিটা রিটায়ার্ড সাবজজ ত্রৈলোক্য বসু-মিত্রমশায়ের। ছেলেদের ধরাধরিতে অর্ধেক মূল্যে ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছেন। ওরাও লেগে আছে, ওটাও ছাড়িয়ে নেবে আশা রাখে। চ্যারিটি করে, চাঁদা তুলে, এইখানেই পাকা স্টেজ,

অডিটোরিয়ম তোলা হবে। এইটাই প্রথম শো। বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। পঁচিশ টাকা থেকে নিয়ে তিনটাকা পর্যন্ত কোন সিটই খালি নেই। বাইরেও বেশ ভীড়। বঞ্চিতদের দিক থেকে ইঁটপাটকেল শুরু হয়ে গিয়েছিল। সামনে পেছনে দুটো মাইক বের করে দিয়ে "হ্যালো··· ! হ্যালো !" করে ভালোভাবে যাচাই করে তাদের ঠাণ্ডা করা হয়েছে। ভলেনটিয়াররাও ঘুরে ঘুরে শান্ত করছে। এক কথায় এই ধরণের শুভ উদ্যোগে সাফল্যের ভালোমন্দ সব লক্ষণগুলোই বেশ সুপরিস্ফুট। বসু-মিত্র কলোনীতে এধরণের একটা সমারোহ এই প্রথম।

পাঁচ মিশালী সাংস্কৃতিক প্রোগাম। নইলে কলোনীর উদীয়মান-উদিত সব 'ট্যালেণ্টরা' চান্স পায় না। সেতার, ব্যাঞ্জো, সরোদ, গীটার, মাউথ-অর্গান, ফ্লুট, তবলার লহরা ; বাদ্যের দিকে। মাঝখানে একটা কমিক। পরে গীত, রবীন্দ্রসংগীত, আধুনিক, একটা ক্ল্যাসিক। এরপর নাচ-সাঁওতালী, কথক, মনিপুরী। একটা করে। সবশেষে রবীন্দ্রনাথের মুক গীতিনাট্য, 'পূজারিণী'। স্থানীয় ট্যালেণ্টই বেশি। তবে, আকর্ষণ জোরদার করবার জন্য বাইরে থেকেও আনা হয়েছে। ক্ল্যাসিক ও মনিপুরগ্রুপটা সব। একজন নামকরা রবীন্দ্রসংগীত গাইয়ে।

বেশ ভালোভাবেই চলল মোটামুটি। বিরতিগুলিতে একটু চঞ্চলতা। যা হয়ই। বারতিনেক লোডশেডিংএ মিনিট দুই তিন করে একটু 'বিড়াল-ডাক', কানফাটানো শিষের আওয়াজ। যা গা'সওয়া হয়ে গেছে আজকাল লোডশেডিং-এর অঙ্গ হিসাবে।

সব শেষ হয়ে একটু বড় বিরতি। কিন্তু আশ্চর্য, অডিটোরিয়ম্ একেবারে স্তব্ধ, বোধহয় একটা আলপিন পড়লে তার শব্দটুকু শোনা যায়। একটু ছোট্ট ইতিহাস আছে তার।—

এইটেই শেষ এবং সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। কলকাতা থেকে একজন নামকরা আর্টিস্ট আনার কথাই ছিল। কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কৃত হল, কলোনীর মধ্যেই একটি নূতন ট্যালেণ্টের আমদানি হয়েছে, যে নাকি যে-কোন পেশাদার আর্টিস্টের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে। কলকাতারই এদিকে একটি কলেজের প্রফেসার। ডক্টর হিরন্ময় তরফদার এখানে বাড়ি করে খুব সম্প্রতি উঠে এসেছেন। তাঁরই মেয়ে। বাবার কলেজেই বি. এ. অনার্সের ছাত্রী। এদিকে নাচ, গান, ড্রামা, ইনডোর গেমস কোনটিই বাদ নেই। বয়স উনিশ-কুড়ি। সুন্দরী।

কলেজের ফাংসনে স্থায়ী আসন—গেমস, মিউজিক—সব তাতেই।

হঠাৎ আবিষ্কার, আগুন ছাইচাপা থাকতে পারে না বলেই। নয়তো, হিরন্ময়বাবু মাত্র মাসখানেক হোল গৃহপ্রবেশ করেছেন, তায় একটু রিটায়ার্ড-প্রকৃতির মানুষ, অল্পভাষী, দুটি মেয়ে তাদের শিক্ষাদীক্ষা নিয়েই থাকেন। তাদেরও কলেজ আর বাড়ি, আবিষ্কৃত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। মানুষটি রাশভারীও বয়সের তুলনায়।

অল্পভাষী হলেও স্পষ্টভাষী। তার ওপর ডক্টরেটটা বিদেশী হওয়ায় আরও একটু সন্দেহের বশেই মনে হয়। অনেক ঘুরিয়ে, কোথায় কাকে ধরলে কাজ হবে সন্ধান নিয়ে মেয়েটিকে পাওয়া গেছে ওঁকে রাজী করে।

যথাসময়ে ড্রপ তুলে শুরু হয়ে গেল পালা। দৃশ্য রাজপ্রাসাদের একটি সুসজ্জিত কক্ষ, একটু অলস ভঙ্গিতে রাজমহিষী উপবিষ্টা, পায়ের কাছে একজন সেবারতা পরিচারিকা। পূজারিণী 'শ্রীমতী' উইংসের দিক থেকে একটি থালায় আরতির পুষ্প-প্রদীপ সাজিয়ে ধীর পদসঞ্চারে নাচতে নাচতে প্রবেশ করে এগিয়ে এল। ভেতরের ব্যাক গ্রাউন্ড মিউজিক আর আবৃত্তির সঙ্গে সুভঙ্গিমায় বিলম্বিত লয়ের নৃত্য, এইটুকুতেই বেশ একটু সময় নিল। তারপর সামনে এসে করুণ মিনতির ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়েছে, রাজমহিষী চকিত হয়ে ঘুরে মুখ চোখ আর হাতের মুদ্রায় বিস্মিত আতঙ্কের ভাবটা ফুটিয়ে তুলেছেন, এমন সময় অডিটোরিয়মে হঠাৎ এক বিপর্যয়!



এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা এই ধরণের, বা, যে কোন প্রকারেরই উপভোগ্য জিনিস উপভোগের দৃষ্টিতে গ্রহণ না করে সমালোচকের দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। বংশীধর ওই শ্রেণীতে পড়েন। উনিও প্রফেসারই। কলোনীর প্রায় গোড়াপত্তন থেকেই আছেন। তেমন বেশি বয়সও নয়, তবে, একটু ব্লাডপ্রেশার আছে। যেটা, হয়তো এইসব পরিবেশে, দৃষ্টি তীক্ষ্ম ও প্রশ্ন-সংকুল হয়ে ওঠার জন্য একটু বেড়েই যায়। তার সঙ্গে সামিয়ানার ভেতরকার গুমট গরম যোগ দেওয়ায় বিরতি হতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সিগারেট ধরিয়ে ফাকায় খানিকটা দূরেই চলে গিয়েছিলেন। মাইকে শুরু হওয়ার শব্দ শুনে একটু হন্তদন্ত হয়েই প্রবেশ করে টর্চ ফেলে নিজের সীটে বসেই, সামনে দৃষ্টি পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। মিনিটখানেক মুখে কথা নেই, তারপর—ক্লাসে একসঙ্গে দেড়শো ছেলেমেয়ের মহড়া নেওয়া ভরাট গলায়—"একি কান্ড! এ্যাবসার্ড!"

অডিটোরিয়মে যাওবা একটু গুঞ্জন ছিল—ওঁর টর্চ ফেলে ফেলে প্রবেশ করায় যেটা একটু বেড়ে গিয়ে থাকবে—একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। স্টেজেও ওদিকে রাজমহিষীর দৃষ্টিতে নূতন ধরণের বিস্ময়।

মিনিট খানেকও নয়, তারপরেই প্রতিপ্রশ্ন—"কেন? কোথায়? কি হয়েছে?"—কাছাকাছি প্রথম সারির একটা দিক থেকে।

"শ্রীমতীর ঐ পোষাক!! সালোয়ার-পায়জামা-দোপাট্টা!···বন্ধ করে দিন এ ধাষ্টামো!"

এর পর আবার একটা স্তব্ধতা। হয়ত চমক লাগানো রূপসজ্জায় আর নৃত্য-কুশলতায় যাদের ক্ষণিক বিভ্রান্তি এসে গিয়ে অসঙ্গতিটুকু দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, তাদের দৃষ্টিটাও তীক্ষ্ণ হয়ে গিয়ে থাকবে। সবারই নয় নিশ্চয়ই। তবে, প্রথমটা একটা নিশ্চুপের পালাই গেল। তারপর প্রথম প্রশ্নকর্তা আবার মন্তব্য করলেন—"তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে? নাচটাই তো।··"

"হয়েছে বৈকি। যুধিষ্ঠিরকে হ্যাট—কোট প্যাণ্ট পরিয়ে নামালে হয়ই মহাভারত অশুদ্ধ"—পেছনে একটু পাশ থেকেই প্রশ্নটা হয়েছে, আরও শরীরটাকে একটু টেনে তুলে, ঘাড় ঘুরিয়ে জবাব দিলেন বংশীধর। বলে চললেন—"পূজারিণী হোল বৌদ্ধ যুগের কাহিনী। শ্রীমতী আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগেকার মেয়ে—নর্তকী বলে তার পরনে আজকের—হয়তো সিনেমা নর্তকীদের নকলে সালোয়ার-পায়জামা—এও বরদাস্ত করতে হবে?"

একটু কাঁপুনিও শুরু হয়ে গেছে উত্তেজনার ফলে। আবার একটু বিরতি, তবে সেকেণ্ড কয়েকের, চ্যালেঞ্জটা জোরালো বলে প্রশ্নকর্তা বোধহয় উত্তর খুঁজছেন, আর একটু পেছন থেকে প্রশ্ন ঠিকরে এল—"আড়াই হাজার বছর পেছনে ছুটে যায় কে সন্ধান নিতে?"

"চমৎকার যুক্তি!"—একেবারে ঘুরে দাঁড়ালেন বংশীধর—"তাহলে অজন্তা-ইলোরা রয়েছে কি করতে? আপনারা শ্রীমতীর সঙ্গে শিল্পের আদর্শকেও বলি দিচ্ছেন! বরদাস্ত হয় না!"

"উনি ডক্টরেটের জন্যে বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পোষাক—শিল্পের গবেষণা করছেন--একটু সমঝে-বুঝে কথা বলতে হবে!"—একেবারে পেছনে তিনটাকার সীট থেকে একটি যুবক হঠাৎ উঠে কথাটা বলে, তার ওপর সবার দৃষ্টি যাওয়ার আগেই ভীড়ের মধ্যে বসে পড়ল।

আবার সেকেণ্ড কয়েক থমথমে ভাব, তারপর সামনের পঁচিশ টাকার সীট থেকে ডক্টর তরফদার শান্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে একবার অডিটোরিয়মের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুখের চুরুটটা সরিয়ে বললেন—"বেশ তো, অজন্তা, অজাতশত্রু আর আমাদের রুচিবাগীশদের যুগ যখন এক নয়—তখন ওঁর গবেষণা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেমন চলছে চলুক না"---

"তাই?"—উগ্র দৃষ্টিতে চাইলেন প্রফেসর বংশীধর।

"অন্তত আজকের রাতটা। অজন্তার তাতে কতটুকু ক্ষতি হবে?"—উত্তর করলেন তরফদার। চুরুটটা দু' আঙুলে চাপা।

বংশীধর একবার সেই রকম উগ্র দৃষ্টিতে কি একটা প্রত্যাশা নিয়ে অডিটোরিয়মের উপর দিয়ে চোখ দুটো ঘুরিয়ে এনে বললেন—"বেশ, দেখছি আপনার রুচিবাগীশ বলতে আমি তাহলে একাই। চললাম আমার আপত্তি নিয়ে !"
—শেষের গোটা তিনচার কথা মুখে থাকতে থাকতেই দপ করে আলো নিবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল বিশৃঙ্খলা। তরফদারেরই মেয়ে, সেদিকটা হয়তো খানিকটা ভয় ছিল, তাঁর সমর্থন পেয়ে—"চলুক! চলুক!" চিৎকারের সঙ্গে অন্ধকারের সুযোগে মন্তব্যগুলোও রুচির সীমা ছাড়িয়ে উঠতে লাগল—"অজন্তার হাঁটু পর্যন্ত ঘাঘরা বেশ বরাদাস্ত হত ও'র · এক চিলতে সরু কাপড় !"···
এদিকেরও কিছু কিছু আছেই আটবে।—"কেন, মডার্ণ শ্রীমতীরও তো সালওয়ার-দোপট্টার পাখনা গজিয়েছে, নিয়ে আসুক না উড়ে গিয়ে !"
শ্রীমতী গোড়াতেই সেকেন্ড কয়েক হতভম্ব হয়ে একটা 'পোজে' পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থেকে রাজমহিষীর পরিচারিকার সঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল, যবনিকাও পড়ে গেছে। অডিটোরিয়মের মধ্যেও আবার নানা কণ্ঠের অকুণ্ঠ মন্তব্য, শিষ-বিড়াল ডাকে, বাইরেও করোগেটেড টিনের উপর ইঁট-পাটকেলের শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়ে নরকগুলজার, এমন সময় হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল।
লোডশেডিং শুধু অন্ধকারেরই দূত নয়, তার একটা শয়তানী রহস্যপ্রিয়তা আছে। নিজের সময় বুঝে আসে-যায়। এবার ছিলও বেশি, প্রায় মিনিট দশেক, যেন দাঁড়িয়ে তামাসা দেখে আলোর মধ্যে লুকিয়ে পড়া।
আলো আসার সঙ্গে আবার সব ঠাণ্ডা হয়ে এলো। মিনিট কয়েকের মধ্যে যবনিকা উঠে গেল। রাজমহিষী সেইভাবে শুয়ে, শ্রীমতী যে 'পোজে' স্টেজ ছেড়েছিল সেই 'পোজেই' দাঁড়িয়ে। ভেতরে আবৃত্তি আর মিউজিকের সঙ্গে আবার নৃত্য-সচল হয়ে উঠল।

এর মধ্যে শুধু একটা পরিবর্তন হয়েছে। শ্রীমতীর আর সেই সালওয়ার-পায়জামা নেই। তার জায়গায় অন্য সাজ, যেটাকে শান্তিনিকেতনী বলা যায়। এদিকে হয়তো অনেকেরই খেয়াল হয়নি, কিন্তু সবরকমের দর্শক আছে—আদর্শহীন, আবার আদর্শপ্রিয়ও—পেছনে, অডিটোরিয়মের মাঝামাঝি একটি যুবক, একটু যেন কম বয়সেরই, উঠে পড়ে বলল—"মাফ করবেন, আমি একটা প্রিন্সিপালের জন্যেই বলতে বাধ্য হচ্ছি—একজন করে আপত্তি করবেন আর ওমনি ড্রেস চেঞ্জ।"
খানতিনেক সীট পরে ওই লাইনের আরেকজন যুবা দাঁড়িয়ে উঠল—"তাহলে আমিও একটা প্রিন্সিপাল ধরেই বলি—যখন ও'র কথাই ঠিক ছিল, তখন গোড়াতেই ভুলটা কেন শুধরে নেওয়া হল না ?"
পাশের সীট থেকে আর একজন উঠে বলল—"ডক্টর তরফদার কেন তাহলে অমন ব্যঙ্গের সঙ্গে···"
আবার বুঝি শুরু হয়ে যায়। তার পেছন থেকে একজন যুবকই একটু বাড়টা

তলে মিহি গলায় টেনেটেনে বলল— "আপাতত তোমারা তেমাদের হিপি-প্রিন্সিপালের মাথা-তিনটে একটু পরেটে পরে নেবে দাদা ? দেখতে অসুবিধে হচ্ছে।"
হোহো করে জোর একটা হাসি উঠল চলতি রসিকতাটুকুতে, বিশেষ করে বলার ভঙ্গিতে। স্টেজটা আবার একটু থমকে গিয়েছিল, চালু হল।
এরপর বেশ নির্বঞ্ঝাটেই বাকি অনুষ্ঠানটুকু শেষও হয়ে গেল।
কিন্তু কাহিনীটা এইখানেই শেষ হল না ; এই ঘটনাটুকুকে অবলম্বন করে সম্পূর্ণ এক অপ্রত্যাশিত দিক নিয়ে এগিয়ে চলল এবং শেষও হল সেইভাবে। দুটি অংশের মধ্যে মিল—তাতেও গবেষণার কথা এসে পড়ে, তবে, সেটা ঐতিহাসিক নয়, মনস্তাত্ত্বিক ; নিপুণ গবেষকের এলাকার জিনিস।
বংশীধরের রক্ত-চাপটা ঠেলে উঠে অসুখে পড়ে গেলেন। এমন কিছু আশ্চর্যেরও কথা নয়। ইতর জনের পক্ষে ব্যাপারটা হয়তো তেমন কিছু ছিল না, কিন্তু যে মনেপ্রাণে সত্যনিষ্ঠ, তথ্যের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাসী, তার পক্ষে আঘাতটা গুরুতরই। এর উপর ডক্টর তরফদারের একটু ব্যঙ্গমিশ্রিত মন্তব্যটুকুও নিশ্চয় অগ্নিতে—হোমাগ্নি বলাই ভাল—ঘৃতাহুতির কাজ করেছে।
বাড়ি গিয়ে বিছানা নিলেন। মাথাধরা, চোখ-জ্বালা, একটু জ্বরভাব। সেটা আস্তে আস্তে কেটে গেল, কিন্তু থেকে থেকে দৃষ্টিটা স্থির হয়ে পড়ে। একটু যেন বেশি স্থায়ীও। তবে, গবেষকের দৃষ্টি, বাড়ির সবাই অনেকটা অভ্যস্ত, অতটা আমল দিল না এটাকে। ভাবল, ওটুকু কেটে যাবে।
এক, ভাইপো কমল ছাড়া। কমল কারণটা জানত ; বুঝল সোজা নয়। একটা প্রতিকারের জন্য অধীর হয়ে পড়ল।
এদিকে কাকার মতই শান্ত প্রকৃতির মানুষ। তবে, আদর্শে আঘাত লাগলে বংশীধর যেমন ধৈর্য রক্ষা করতে পারেন না, রক্তের চাপ মাথায় ঠেলে ওঠে, তেমনি কাকার কোনকিছু নিয়ে বিরোধিতায় কমলও নিজেকে নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না।
"উনি পোশাক নিয়ে গবেষণা করছেন—সমঝে বুঝে কথা বলতে হবে"—বলে যে যুবাটি অডিটোরিয়মে দাঁড়িয়ে উঠে সেদিন সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল, সে কমলই।
—কাকার চেয়ে কম বিচলিত হয়নি তবে, উঠে গেল না। রক্ত চাপের বয়স হলে বোধহয় যেতই বেরিয়ে তাঁর সঙ্গে, কিন্তু ও নিজেকে সংযত করে নিয়ে বসেই রইল।
তার মধ্যেও কাকাই। কাকা বাহিরে নিঃসঙ্গ খানিকটা রহস্যাবৃতই। তাঁকে সাধারণকে বোঝাবার জন্য, তাঁকে পরিচিত করে তাঁর অলৌকিকত্বে বিস্ময় উৎপাদন করবার জন্য, ওরও একটি ভক্তের দল আছে। কাকা ধিক্কার দিয়ে উঠে গেলেন, কমল বসে রইল, আবার একটা বড় রকম গুলতান সৃষ্টি করে সমস্ত জিনিসটাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে তাঁর অপমানের প্রতিশোধ নেবে। দলের গুটিকতক মিলে এই শুভ উদ্দেশ্য

নিয়ে একসঙ্গেই বসেছিল, শ্রীমতীর পোশাক বদল করে আসার সুযোগটা ছাড়ল না। ওর টিপ্পনিতেই তিনজনে দাঁড়িয়ে ওঠে প্রিন্সিপালের ধুয়া ধরে। তৃতীয়জন সোজা ডক্টর তরফদারকে টেনে আনবারই চেষ্টা করে। প্ল্যানটা সফল যে হোল না সেটা আলাদা কথা।

আর একটা কথা বলে না দিলে কমলের পরিচয়টা সম্পূর্ণ হয় না। ভালো ছেলে, একটা ঝোঁকের মাথায় পরীক্ষায় বসে, ভালভাবে পাস করেও কোন ভাল প্রশাসনিক চাকরি নিতে চাইছে না। কাকা একলা পড়ে যাবেন। এদিকে থেকেই তাঁর সঙ্গেই গবেষণার কাজ করবে, অভিপ্রায়টা এইরকম।

কটা দিন কেটে গেল। প্রেসারের ট্যাবলেট খেয়ে খেয়ে খানিকটা কমল, কিন্তু ওটুকু যেন আর যেতে চায় না। শুধু গবেষণাপ্রসূত স্থিরদৃষ্টি নয়। লক্ষ্য করল, মাঝে মাঝে যেন তা থেকে একটা স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। অলক্ষ্যে থেকে সবাইকে দেখাল। এবং, এর সঙ্গে অডিটো রয়মের ব্যাপারটার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, বিশেষ করে ডক্টর তরফদারের টিপ্পনীর, তাতে আর কারুরই সন্দেহমাত্র রইল না। সবাই মিলে প্রতিকারের উদ্ভাবনে লেগে গেল।



তারপর একদিন হঠাৎ দেখল প্রতিকারটা কাকা নিজেই করে বের করে নিয়েছেন। সকালবেলাটায় মেজাজটা বেশি করেই তিরিক্ষি হয়ে থাকছিল। এই সময় একটা ট্যাবলেট চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কাকিমা কমলকে দিয়েই পাঠিয়ে দেন। বারান্দায় বসেই গবেষণার বইখাতা ঘাটছিলেন, কমল এগিয়ে ধরতে একবার চোখ তুলে দেখে নিয়ে বললেন—"নিয়ে যা"।

বই খাতায় দৃষ্টি নামিয়ে দিলেন। অন্য কোন কোন দিনও বলেন এমনি করে, একটু জিদ করতে হয়, কমলই পারে। প্রশ্ন করল—"খাবে না?···ডাক্তার ঘোষ বলছিলেন···"

বংশীধর বেশ ভালো ভাবেই মুখ তুলে চাইলেন এবার একটু চেয়েও রইলেন। বললেন—"দরকার নেই আর।"

বিস্মিত হল কমল। দৃষ্টিতে সে ভাবতো একেবারেই নেই, বরং ঠোঁট দুটিও অল্প হাসিতে একটু এলিয়ে এসেছে। আরও একটু সেইভাবে চেয়ে থেকে বললেন—

"ডানদিকের দেরাজের মধ্যে থেকে এবারের 'ভগীরথটা' নিয়ে আয়, সামনেই দেখবি।"

'ভগীরথ' কলিকাতার এই প্রান্ত থেকে প্রকাশিত একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা, মাসকয়েক থেকে বেরিয়ে উগ্র সত্যনিষ্ঠার জন্য বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সমাজজীবনের কঠোর সমালোচক, একটু এদিক-ওদিক হলে কাউকে রেহাই দিচ্ছে না নিয়ে এলে বললেন—"ডাকঘর-পাতাটা বের করে নিয়ে পড়।"

নিজে আবার খাতাপত্রে দৃষ্টি নামিয়ে দিলেন।

'ডাকঘর'—বিভাগটা পাঠকদের চিঠিপত্রের জন্য। প্রথম প্যারাগ্রাফটায় তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিতেই সারা শরীরটায় যেন রোমাঞ্চ দিয়ে উঠল কমলের। নজরটা আপন হতেই শেষের দিকে গিয়ে পড়ল। ছদ্মনাম, "হতবাক।" সেদিনকার অডিটোরিয়মের ব্যাপারটা নিয়ে দেড় কলমে লেখা একটা চিঠি, "ভগীরথ সম্পাদকেষু" —বলে আরম্ভ করে সেদিনকার ব্যাপাবটা ঘেঁটে-ঘুঁটে একশা করে দিয়ে শেষের একটা প্যারায় ক্লাইমেক্সে তুলে দিয়ে মন্তব্য করেছেন লেখক—'শ্রীমতীর নৃত্য উচ্চাঙ্গের হয়েছিল একথা অস্বীকার করা যায় না, তবে, নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়, তথ্যনিষ্ঠার অভাবে এমন একটি নৃত্য-কুশলতা আমাদের যুগযুগ ধরে পালিত ঐতিহ্যের উপর তাণ্ডবনৃত্যেই পরিণত হোল। আরও ক্ষোভের বিষয়, আপত্তি উঠতে এই কলোনীরই একজন বিশিষ্ট নাগরিক এই তাণ্ডবে তাঁর সমর্থন জানালেন।'

সমস্তটুকু একটানা পড়ে গিয়ে কমল একটা দীর্ঘনিশ্বাসে এতদিনের আক্রোশের অর্ধেকটা বুক থেকে নামিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। একবার কাকার দিকে চেয়ে দেখল। তিনি তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে রয়েছেন।

উল্লাসটা চেপে রাখা শক্ত হয়ে উঠছে। চেনা হাত, তবুও আর একবার আড়ে চেয়ে নিয়ে সংযত কণ্ঠে মন্তব্য করল—"নাম নেই, কে যে লিখলে···মানে কি নিয়ে লিখছেন।···"

সোজা হয়ে বসলেন বংশীধর। কলমটা খাতার ওপর রেখে দিয়ে একটু কড়া দৃষ্টিতেই চেয়ে একটু রুক্ষ কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন—"সেদিন এই ধাষ্টামোর জন্যে কটা লোক অডিটোরিয়ম থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল বলতে পারিস?" হঠাৎ ভাবান্তরে—সেদিনকার স্মৃতি ফিরে এসে আবার বুঝি প্রেসারই আশঙ্কা করে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে কমল, আবার শরীরটা আলগা করে দিলেন বংশীধর, বেশ সহজ কণ্ঠেই বললেন—"দিলাম একটা বের করে। নিজের গায়ের ঝাল মেটানো। ওদের তো ভারি বয়ে গেল। যা রেখে দিগে।"

হাতে আবার কলম তুলে নিলেন।

চাপা উল্লাসে ভেতরটা যেন তোলপাড় করে দিচ্ছে কমলের। কত কি যে মনের মধ্যে ভীড় করে আসছে, ধরতে পারছে না। তার মধ্যে একটা প্রশ্ন স্পষ্ট। কাকা কি সত্যই এইখানেই দাঁড়ি টেনে দেবেন।

ভক্ত ভাইপো। অনেক প্রশ্রয় পায়, আবদারে—অভিমানে, অনেক সুযোগও নেয়

তার। কিন্তু এতবড় এক প্রতিশোধ নিয়েও যেমন আবার নির্বিকার হয়ে কাজে ডুব দিয়েছেন, 'মুডটা' বুঝতে না পেরে এগিয়ে গিয়ে এ নিয়ে আর কোন কথা তুলতে পারছে না। বিকালে দলটা জড়ো করে কলোনীর পার্কে বসে ঝালচানা আর উগ্র প্রস্তাব আর মন্তব্যের সঙ্গে আলোচনাও করল। সামনে এবার একটা চ্যারিটি ড্রামার তোড়জোড় চলছে। ভণ্ডুল করে দিতে হবে। বিশেষ করে তরফদার যদি তাঁর মেয়ে নিয়ে আসেন।

আইডিয়াটা ফটিকের। সবচেয়ে ছোট, তবে, সবচেয়ে বড় ভক্ত কমলের। খানিকটা হালকা হোল মন, কিন্তু যেন যথেষ্ট নয়। তারপর বাড়ি ফিরতে ফিরতে হঠাৎ একটা আইডিয়া এসে গিয়ে আবার একচোট রোমাঞ্চ জেগে উঠল কমলের দেহে।

সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে এসে অন্যদিন খানিকটা এদিক-ওদিক করে নিয়ে লেখার টেবিলে বসেন কাকা। আজ এসে দেখল, যেন অনেক আগেই বই-পত্রিকার ডাঁই জড়ো করে নিয়ে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে বসে গেছেন। শুভ লক্ষণ। গবেষণায় একটা বড় রকমের উদ্দীপনা এসে গেছে। চা এই সময় কাকিমাই দিয়ে যান, আজ নিজেই নিয়ে এল কমল।

ঘুরে দৃষ্টি তুলে একটা বইয়ের নাম করে প্রশ্ন করলেন—"এনেছিস ?"

একটা জীর্ণ পুরনো পুঁথির ফটোস্টাট—উই-খাওয়ার বাকীটুকু নিয়ে জোর রিসার্চ চলছে। খুব চাহিদা।

খুবই ভালো লক্ষণ।

চায়ের কাপ তুলে নিয়েছেন, সামনে রেখে দেওয়ার জন্য ইশারা করে সোজা হয়ে বসলেন বংশীধর। আলতোভাবেই প্রশ্ন করলেন—"ভগীরথখানা কোথায় রেখেছিলি ? দেখলাম না তো। ও নিয়ে আর মেলা যেন…কি যে বলে…"

চায়ে চুমুক দিলেন। এমন সুবর্ণসুযোগ জীবনে দুবার আসে না। কমল আরম্ভ করে দিল—"আমি বলছিলাম কাকা…"

"কি, শুনি ?…"

প্রশ্নের আকার দিয়ে আবার চুমুক দিলেন চায়ের কাপে।

"ইয়ে…তোমার—গিয়ে…বলছিলাম—এইখানেই ছেড়ে দেবে ?…আমি তোমার ঐ…"

"বুঝেছি, ভগীরথের চিঠিটার কথা।…আমার খারাপ মনে হোল জানিয়ে দিলাম আবার কি করতে হবে ?"

"তাহলে আমি বলি কাকা"—কথার টোনে খানিকটা সাহস পেয়েই শুরু করল কমল—"তাহলে আমিও বলি—কটা লোক জানল তোমায় ? এই তো নতুন একটা কাগজ।…বিশেষ ক'রে তাঁকে জানানো দরকার—টিপ্পনীটা আমার কানে লেগে রয়েছে এখনও—সে…মানে তিনি দেখেছেন ?"

কাপের কানাটায় আঙুল ঢুকিয়ে শুনছিলেন, একটু যেন হাসির মতো দেখা দিল ঠোঁটে। প্রশ্ন করলেন—"ঢাক পিটুতে হবে ?"

হালকা বিতর্কের ভাবটায় আরও একটু জোর পেল কমল, বলল—"ঢাক পেটাবার কথা হচ্ছে না। আমার কথা হচ্ছে, যে লোকটা—মানে যিনি সর্বসমক্ষে দাঁড়িয়ে অন্যায়ভাবে তোমার প্রতিবাদ করলেন—অভদ্র ভাষাতেই—আর কেউ জানলো বা নাই জানলো—তাঁর কাছে কাগজটা পৌঁছে দেওয়া দরকার নয় ?"

"কি ক'রে ?"—উত্তাপটা দেখে একটু যেন চমকে গিয়ে প্রশ্নটা ক'রে বললেন—"কী দরকার আমাদের ? 'ভগীরথ'—অফিস থেকে পাঠিয়ে ওরাই যদি বিতর্কটা চালাতে চায়, দেবে পাঠিয়ে। তখন না হয়—যদি তেমন দেখা যায়…।"

"সেও ভেবেছি কাকা। আপনি নাম দেননি, ওরা কাকে পাঠাবে ? ওদের কাছে নাম থাকলেও বোধহয় সেটা ব্যবহার করবে না, ওদের না বললে।" একটু হেসেই ফেললেন বংশীধর। বললেন—"তাহলে বেশ ভালই হয়েছে। ব্যাপারটা আপনি—আপনিই বেশ জুড়িয়ে যাবে। নিজেদের মধ্যে একটা মনোমালিন্য…"

"যাবে না জুড়িয়ে কাকা। ও…মানে, উনি যেরকম—কি বলব ?—নরম করে বললেও—যেরকম একরোখাই বলি—কলোনীর প্রত্যেকটি ফাংশনে এইরকম নাক গলাবেন। মেয়ে ভাল 'শো' দিতে পারে, ডিম্যাণ্ড হবেই।…আর, মনোমালিন্যের কথা যে বলছ, নাম দাওনি, সেদিকটা সেফ্ (Safe) আছে। "হতবাক্" তো সেদিন অনেকেই হয়েছিল।

তাতিয়ে দেওয়ারই উদ্দেশ্য। সেদিকে সম্পূর্ণ সফল না হলেও, বংশীধর একটা ক্ষীণ হাসি ধরে রেখে কতকটা গম্ভীরভাবেই বললেন—"তা বেশ, নিতান্ত না মানিস, পাঠিয়ে দে ডাকে এক কপি কিনে নিয়ে।"

কমল ওঁর চেয়ে একটু বেশি গম্ভীর হয়ে বলল—"ডাকে হবে না কাকা। একে তো ডাক আজকাল একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয় ; রোজ দেখা যাচ্ছে। যদি দেয়ই পৌঁছে তো কার হাতে দেবে, সে আবার এক অন্য ভাবনা। তুমি যখন চাওনা এ নিয়ে বেশি এক তুলকালাম হয়—আর ঠিকও তোমার কথাই—আমি নিজেই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা…"

"তুই ।"—একটু শিউরেই উঠলেন বংশীধর।

"হ্যাঁ, নিয়ে গিয়ে নাকের ওপর…" হঠাৎ—উত্তেজনাটা সামলে নিয়ে একটু আমতা-আমতা করে নরম হয়েই বলল—"সে তুমি নিশ্চিন্দি থাকো, এমনভাবে হাতে-হাতে দিয়ে এমনভাবে ঘুরে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসব…আর, আমাকে তো চেনেনও না, কে দিয়ে গেল, কে না। তারপর, অবশ্য, খাম খুলেই চক্ষু চড়কগাছ। তখন আমার পায় কে ?…"

শেষের দিকে নিজের কথা ক'টা উচ্চারণ করতে করতে—"তাহলে তাই করছি কাকা—ব'লে রাখলাম।"—ব'লে বেরিয়ে এল।

পরের দিন রবিবার। 'কুনো' মানুষ, থাকবেনই বাড়িতে। 'কুনো' কথাটা হঠাৎ মাথায় এসে যেতে একটু হাসি ফুটল মুখে, বিদ্রূপ, বা আক্রোশেরই হাসি। 'ভগীরথটা'

একটা বড় অফিস-খামের মধ্যে পুরে মুখ সেঁটে বিকালের একটু আগে রওনা হল। খামের উপর নামের আগে ইংরেজীতে 'ডক্টর' কথাটা যেন বিদ্রূপ-আক্রোশ ছড়ো করেই বেশ ফলাও করে লিখেছে ; কাকাকে যাই বলুক, 'নাকের উপরই ছুঁড়ে দেওয়া' তো।
একবার মনে হ'ল দলের একজনকে সঙ্গে নিক। ফটিককেই! দৃশ্যটা যা দাঁড়াবে কল্পনায় একা উপভোগ ক'রে যেন তৃপ্তি পাচ্ছে না। তারপর, কি ভেবে আর নিল না সঙ্গে।
দীর্ঘ পথও। দুটো বাড়ি কলোনীর প্রায় 'দূ' প্রান্তে।
কিভাবে দেবে এগিয়ে, কোন প্রশ্ন হ'লে কি উত্তর দেবে, কি ভাবে, কি ভাষায়—মনে মনে তার মহলা দিতে দিতে এগিয়ে চলল। যখন পেঁছিল সন্ধ্যা হতে অল্পই দেরি আছে।
দোতলা একহারা বাড়ি। নীচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সামনে একটু বাগান। একধারে করোগেটেড্ সীটের ছাউনি দেওয়া গ্যারেজ। একেবারে পেঁছে গিয়ে জড়তা একটু এসেই গেছে, সেটাকে জোর ক'রে ঠেলে রেখে বারান্দায় উঠে কলিংবেলটা টিপল কমল। একটু বিলম্ব, বুকটা ধক্‌ধক্ করছে। সামনের ঘরটায় চপ্পলের একটু খসখস শব্দ, তারপরে দোর খুলে—ডক্টর তরফদার নয়—একটি মেয়ে।



হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে বুকের ধড়ফড়ানিটা থেমে গেছে, মাথায় সব ওলটপালট হ'য়ে ক্ষণিক স্মৃতি—বিভ্রমের চোখে মাত্র একটি মেয়েই দেখল কমল··· কে যেন। ···কোথায় যেন দ্যাখা।···তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেদিনকার পূজারিণী নর্তকী শ্রীমতী।
অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি, একটা হালকা র‍্যাপার গায়ে দিয়ে বেরিয়েছিলো, নিঃসাড়ে খামসুদ্ধ হাতটা তার ভেতর সেঁদিয়ে গেছে। চোখ দুটো অবাক বিস্ময়ে মুখের ওপর আটকে গিয়েছিল, নরম হ'য়ে এসেছে একটু, মেয়েটি প্রশ্ন করল—"কাকে চান?"—বাবাকেই বোধহয়?—তিনি বাড়ি নেই।"

সবটুকু মিনিট খানেকের মধ্যেই ঘটে গেল। কমলের মুখে কথা ফুটল—"নেই তিনি ?···তাহলে তো !···কখন আসবেন ?"

মেয়েটি দেয়াল-ঘড়ির দিকে চেয়ে নিয়ে বলল—"তা—ঘন্টাখানেকের কাছাকাছি লাগতে পারে। বসবেন ?"

"বসা···মানে···ঘন্টাখানেক বলছেন···মানে···"

"কি দরকার আপনার ব'লে যাবেন ? আপত্তি না থাকলে·· না হয় কিছু কি এনেছেন ? রেখে যাবেন ?"

খামটা চাপ দিয়ে ধরায় একটু খসখসানি উঠে থাকবে, ভেতরের মুঠোয় ঐখানটা একটু উঁচুও—দৃষ্টিটা সেইদিকে গিয়ে পড়ল মেয়েটির।

"না, দেওয়ার কিছু নেই।···ইয়ে···আমি এসেছি···মানে, আমি এসেছি খুব সূক্ষ্ম একটি কৌতুক-হাসির ভাব ফুটে আছে মেয়েটির মুখে। তার সঙ্গে আরও সূক্ষ্ম-লজ্জার আমেজ। যেন অপরিচিত এই বয়সের কেউ তাকে দেখলেই তার এইরকম বিব্রতভাব লক্ষ্য করায় অভ্যস্ত। নিজেও একটু জড়সড় হয়ে গিয়ে বলল—থাক্ আমি মাকে ডেকে দিচ্ছি।"

চলে গেল। ঘেমে গেছে কমল এইটুকুতেই। একটা সোফায় গিয়ে বসল। একটু যে সময় পেল তাতে মন খানিকটা গুছিয়ে নিল। একবার এও মনে হোল, না হয় সরেই পড়ুক এই ফাঁকে। তবে, রইল বসেই। ঘরের ছবি, ফটো, আসবাবের ওপর চোখ বোলাচ্ছে—ভেতরে একটা এলোমেলো চিন্তার স্রোত,—একজন ভদ্রমহিলা প্রবেশ করলেন। গৌরবর্ণা, একটু স্থূলাঙ্গী। "আমার মা"—পরিচিত করে দিল মেয়েটি। কমল দু'পা এগিয়ে পায়ে হাত দিয়েই প্রণাম করতে "থাক্ থাক্"—বলে মাথায় হাত চেপে পাশে একটা সোফায় বসতে বসতে বললেন—"ও'র সঙ্গে দেখা করতে এসেছ ? ও'র কিন্তু দেরি হবে। একটা মিটিং আছে ও'দের···"

ছেড়ে দিয়ে ভেতরের দিকে মুখ করে ডাকলেন "সজলা !"

উত্তর দিয়ে দাঁড়ালো এসে মেয়েটি। অল্প একটু দেরি হোল ; অনেক সময় কাছ থেকে সরে গিয়ে উত্তর দিলে যেমন হয়।

"একবার বরং দেখনা ফোন করে ?"—মা বললেন।

একটু বড়ই ঘরটা। এককোণে টেলিফোন। মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে ডায়েল করে রিসিভারটা তুলে নিল।

একটু প্রশ্ন-উত্তর। কি উত্তর এলে কি করবে—কাঠ হয়ে ঐদিকে চেয়ে বসে আছে কমল, মেয়েটি রিসিভার ধরে থেকেই বলল—"বললেন, খানিকটা দেরি আছে।·· না হয় উনি ফোনে বলবেন ?"

—মেয়েটি কমলের দিকে চাইল। কমল মহিলাটির দিকেই চেয়ে কুণ্ঠিত ভাবে বলল—'একটু—কি যেন বলে—ডেলিকেট গোছের কথা···মানে···সেখানে একটা মিটিংইতো, অনেকে রয়েছেন···তার মধ্যে···"

"থাক, তাহলে তো আমাদেরও বলা চলবে না..."—মা মন্তব্য করলেন।
যেন অবাধ্য ভাবেই দৃষ্টি মেয়েটির দিকে গিয়ে পড়ল কমলের, সে টেলিফোনের রিসিভারটা ধ'রেই এদিকে চেয়ে প্রশ্নের দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কমল বলল "...না.. ইয়ে...আপনাদের শুনতে...মানে আপনাদের বলতে...মানে—আমার কাকা পাঠিয়েছেন। আমি হচ্ছি প্রফেসার বংশীধরের ভাইপো..."
হঠাৎ একটু যেন আড়ষ্ট ভাব এসে গেল সমস্ত ঘরটায়। ভদ্রমহিলার ভ্রূ একটু কুঞ্চিত হয়ে উঠল—একটু চিন্তা করে বললেন—"যেন নামটা শুনেছি। তবে, আমরা এখানে নতুন..."
"ঐ যে যিনি নাকি আমার সালোয়ার পরে নাচায় আপত্তি করেছিলেন সেদিন, যার জন্য আবার..."
"আমার সেই জন্যই আসা..."
—আর এগুনো বন্ধ করে ওর মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে বলে উঠল কমল। তারপর অবশ্য, মার দিকেই চাইল। উনি বেশ সহজ কণ্ঠেই বললেন—"উনি বলছিলেন বটে একদিন। তা, কি হয়েছে? আমি আবার যেতে পারিনি সেদিন। বাতটা বেড়েছিল।"
মেয়েটি রিসিভারটা রেখে দিয়েছে, তবে, অনড় হয়ে দাঁড়িয়েই আছে সেখানে। বলল—"তাই নিয়ে নাকি একটা লেখাও বেরিয়েছে। বাবা হাসতে হাসতে বলছিলেন আমায়..."
"সেই নিয়েই আসা আমার। কাকাই পাঠিয়েছেন"—আবার তাড়াতাড়ি মুখ বন্ধ ক'রে দিয়ে, যেন ফলাফল না ভেবেই মরীয়া হয়েই শেষ করে দিল কথাগুলো কমল। দৃষ্টি মেয়েটির মুখের ওপরই নিবদ্ধ হয়েছে। বাবা লঘুভাবে হেসে বললেও মেয়ে যে হাসিচ্ছলে নেয়নি, সেটা মুখ দেখলেই বোঝা যায়। মুখের সামনের ব্র্যাকেট থেকে বিদ্যুতের কড়া আলো এসে প'ড়ে মুখটা একটু রাঙা করেও দিয়েছে। দৃষ্টি না সরিয়ে, বা, সরাতে না পেরেই কথাগুলো বলল কমল। একটু যে মিনতির ম্লান হাসি ফুটে উঠল অধরে, সেটাকে বোধহয় সন্ধির হাসি বলা ভুল হবে না।
ঠিক এই সময় মা যেন একটু ব্যস্ত হয়েই বলে উঠলেন—"তা'হলে আমি বলি, তুমি একটু বসেই যাও বাবা, দরকারি কাজ হতে পারে।...তাহলে সজু, তুই একটু চা বসিয়ে দিগে যা।.. কোন চিঠি দিয়েছেন কি কাকা তোমার?"
"না, চিঠি কিছু দেননি, মুখেই বলবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন কাকা। বসছিই; আপনি যখন বলছেন।"
কোন অতিথি এলেই, পরিচিত অপরিচিত যেরকমই হোক, একটু চা এগিয়ে দেওয়া অনেক বাড়ির বাঁধা রেওয়াজ থাকে। বোধহয় সেই জন্য সঞ্জুলা মাকে ডাকতে যাওয়ার সঙ্গে চাকরকে চায়ের কথাও বলে দিয়েছিল। তৈরি প্রায় হয়ে গিয়েছিল, এনে একটা টিপয়ে রেখে সামনে ধরে দিল।

ইতিমধ্যে আবার এদিক-ওদিক অনেক আলাপ-আলোচনা হ'য়ে গেছে—কোথায় ওদের বাড়ি—কে কে আছেন—কতদিন থেকে আছে ওরা—কাকা প্রফেসার বলছে, ও নিজে কি করে—

টিপয়টা এগিয়ে দিয়ে একবার দেখে নিয়ে বললেন—"খালি চা দিবি? ওকে তো থাকতে হবে খানিকক্ষণ। তারপর আসতেও অনেকটা, যেতেও অনেকটা; যেমন বুঝলাম। ...একটু ভেতরে গিয়ে..."

"বলে দিয়েছি।" —উত্তর দিল মেয়েটি। চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরেছে, বললেন—"তুইও বোস একা একা কি করবি? উনি এলেই আমরা দু'জনেই উঠে যাব'খন। ...মেয়েটাকে ওদের মাসির বাড়ি রেখে গেছেন, ফেরার সময় নিয়ে আসবেন। তখন আমাদের উঠে গেলেই হবে, নয়কি?"

একটু আলাপ-প্রবণা স্ত্রীলোক, ফেনিয়ে বিস্তারিতভাবে কথা বলার অভ্যাস; দরকারি-অদরকারি মিশিয়ে। স্বামী সংক্ষিপ্ত-বাক্ হ'লে যেমন হয়তো হয়েই যেতে হয়। এর একটা গুণ, মানুষকে অল্পেই বেশ আপন ও অন্তরঙ্গ ক'রে ফেলা যায়। শেষের কথাগুলো কমলের দিকে চেয়েই বলেছিলেন, সে এর মধ্যে একটা বিষয় ঠিক করে ফেলেছে—ডক্টর তরফদার আসার আগেই তাকে উঠে যেতে হবে। বলল—"না, আপনারা উঠবেন কেন? কী এমন কথা যে..."

সজলা দোমনা হ'য়ে দাঁড়িয়েই আছে, উনি বললেন—"বোস্ না; দাঁড়িয়ে রই'ল কেন?"

সজলা সোফার চওড়া হাতলের ওপর বসে পড়ল। কমল প্রস্তুতির জন্য কাপে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বলল—

—"কাকা পাঠিয়েছেন ..মানে..."

—এটুকু ও'র দিকে চেয়ে শুরু করে সজলার দিকে ফিরে বলল—"ঐ যে আপনি লেখাটার কথা বললেন না? নজরে পড়তেই কাকা আমায় তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। ...মানে, সেদিন আপত্তি তো শুধু ও'রই ছিল, মনে হতে পারে তো ও'রই লেখা, বা কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন। কলেজ থেকে এসেই বললেন—কমল একটা বড় আনপ্লেজেন্ট ব্যাপার হয়ে গেছেরে—যা অডিটোরিয়মে হয়ে গেছে, সেইখানেই শেষ হয়ে যাক—কার দুর্মতি জানি না, নাম দেয়নি—এক লম্বা চিঠি 'ভগীরথ' কাগজটায়। আর এই কাগজওলারাও যা হয়েছে, একটু সেনসেশনাল কিছু পেলেই হোল...তুই এক কাজ করবি, কালই গিয়ে..."

"কিন্তু আমি বলি বাবা..." একবার এর দিকে চেয়ে একবার ও'র দিকে চেয়ে গড়গড় করে বলে যাচ্ছে, কোন্ পথে যাচ্ছে, কাকে মারছে, কাকে বাঁচাচ্ছে হু'স নেই, মার কথায় থেমে গেল কমল। উনি বললেন—"তিনি যখন নিজে লেখেননি, তখন ও'র অত কিন্তু হওয়া কেন? কি বলিস সজু?"

তীব্র উৎসাহের সঙ্গে শুনতে শুনতে সজলারও মুখের ভাবটা নরম হয়ে এসেছে, বলল—"তা বৈকি।"

উনি বললেন—"আর এদের বাবা সে মানুষও নয়। যাহোক, তখনই হয়ে গেল। এসব ছোট কথায় কানই দেন না। পুষেও রাখেন না মনে। কেউ যদি এইরকম নোংরামিতে আনন্দ পায়···কি বলো বাবা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাছাড়া আর কি।" —উত্তর করল কমল। একটা ঢোক গিলতে হোল।

সজলার মুখে মেঘের একটু আধটু যা লেগে ছিল, নিশ্চিহ্ন হয়ে সরে গেল; ব্র্যাকেটের আলোটা পড়ে অন্যরকম দেখাচ্ছে। বলল—"আর বাবা যে আমায় বললেন, তা হাসতে হাসতেই যেন··"

"হ্যাঁ বাবা, তুমি গিয়ে তাঁকে বলবে, এ নিয়ে যেন মনে কিছু···"

"আমি তাহলে উঠি এখন...মা। আপনি তাহলে বলে দেবেন···"

যেন হঠাৎ একটা দরকারি কাজ মনে পড়ে গেছে এইভাবে উঠে পড়েছে, সজলা বলল—"খাবার আসছে।"



উনি বললেন—"দেখেছ! একটা বাজে কথা নিয়ে কিরকম মন খারাপ হয়ে গেছে। নৈলে ছেলেমানুষ খাবারের কথা ভুলে যায় এই বয়সে।"

"আমিই নিয়ে আসছি"—বলে সজলা উঠে পড়ল। বোধহয় ছেলেমানুষ খাবারের লোভের কথায় ও মুখের দিকে চেয়ে একটু না হেসে পারল না।

সেই গোড়া থেকেই "ছেলেমানুষের" অনেক-বটা নমুনা তো দেখল, মাঝে মাঝে হাসি সামলে থাকা শক্তই হয়ে উঠে থাকবে।

মেয়েটিকে চটুল বললে অন্যায় হতে পারে, বাপের কড়া ডিসিপ্লিন; তবে, অমন একট চৌকস মেয়ে, তার দৃষ্টিটা তো প্রখর হতেই হয়।

রাস্তায় এসে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

কী কাণ্ডটা করে বসল, ভেবে কূল পাচ্ছে না কমল। একবারে সমারসল্ট। ··ডিগবাজি। কেন এমনটা হোল হঠাৎ? ভালো বলেই জানে নিজেকে, কাকার আদর্শে সেই দিকেই চেষ্টা, চোখকান বুজে এত মিথ্যা বলে যাওয়ার যে ক্ষমতা আছে তার, নিজেকে বিস্মিত করে তুলেছে। তাঁকে গিয়ে বলবেই বা কি।

গরম বোধ হচ্ছে। গায়ের র‍্যাপারটা ঢিলে করে দিয়ে কপাল-ঢাকা হিপি চুলগুলো উলটে দিল।…একটা আত্মগ্লানি ঠেলে উঠছে মনে। তাইতেই আত্মধিক্কারে মনে হোল, যখন সাজিয়ে মিথ্যা বলবার এমন ক্ষমতা, তখন—এতটা পথ—কাকার জন্যেও একটা গড়ে নেওয়া অসম্ভব হবে না তার পক্ষে। কিন্তু সেতো হোল ধীরেসুস্থে গড়ে নেওয়ার কথা, আসলে কেন এরকমটা হয়ে গেল, সেটা বুঝতে না পারলে তো নিজের মনে শান্তি পাচ্ছে না। অমন গোখরোর মতো চক্র ধরে এসে একেবারে নুইয়ে পড়া।

রাত হয়ে আসছে, আবার পা চালিয়ে দিল। কারণটা কী এমন হতে পারে চিন্তার মধ্যে হঠাৎ একটি মুখ উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠল। পেয়ে গেছে। সজলার মায়ের মুখ; সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মানুষটিও।

বড় ভালো লেগেছে। কী মিষ্ট কথাবার্তা। এটুকু সময়ের মধ্যে কত যেন আপন করে নিয়েছেন। আর চেহারাটিও কি তেমনি! ভাবতে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছে। ঘোরালো মুখ, হাসিভরা ভাসা ভাসা চোখ। বয়স বেশি নয় খুব; সজলাই বড় মেয়ে তো। কিন্তু অল্প পুরু ঠোঁট পানজর্দার অভ্যাসে রাঙা, তার ওপর ঐরকম কথাবার্তায় বেশ গিন্নিবান্নি গোছের দেখায়। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে, এখন যেন আরও স্পষ্ট হয়ে মনে পড়ছে—আলাপ আলোচনার মধ্যে কিছু সন্দেহের কিছু মন্দ এসে পড়লে কাটিয়ে-কাটিয়ে গেছেন। বিরূপ অপ্রীতিকর কিছু যেন কাছে ঘেঁষতে পারে না।

—কারণটা যেন পেয়েছে খুঁজে কমল। এ ধরণের মানুষের কাছে, তার মনের স্পর্শেই সব গ্লানি যেন কেটে যেতে বাধ্য। ছিল না কি তার মনে একটা গ্লানি, একটা আক্রোশ আর প্রতিহিংসার ভাব? অস্বীকার করতে পারে নিজের কাছে? মিলিয়ে গেল; সূর্য উঠতে আজ সকালের কুয়াশাটার মতো।

মনটা বেশ শান্ত হয়ে এসেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে মিথ্যার আকারে তার মুখ দিয়ে ঠিক কথাগুলোই বেরিয়ে এসেছে। ওর সংস্পর্শে আসার প্রভাবেই। এইবার কাকাকে কি বলবে সেটা ভেবে নিলেই হয় একটু মনস্থির করে।

গতিটা একটু শ্লথ হয়ে এল, করেই নিল চেষ্টা করে। তার পরেই নির্জন রাস্তার মাঝে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ চিন্তার স্রোত আবার ঘুরে গেছে।

—কিন্তু ওর যা কিছু লুকোবার চেষ্টা, মিথ্যা রচনা, বিহ্বলতা, কথার স্খলন—সব তো গোড়া থেকেই শুরু হয়ে গেছে, আর তার তো অন্য এক মুখের সঙ্গে সম্বন্ধ। সেখানেও ভাসা ভাসা চোখ, কিন্তু চোখে যেন একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন, ঠোঁটে একটি হাসির রেশ (হয়তো মিষ্টিই) মায়ের মেয়েই তো, কিন্তু…ভেতরে চলে যাওয়ার সময় ভালো লাগেনি কমলের সে হাসি (লেগেছিল কি?)।

আপাতত প্রশ্নটুকুর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা না করে, আবার চিন্তার মোড় ফেরাবারই চেষ্টা করল। এসে পড়েছে। পার্কটুকু পেরুলেই বাড়ি। কাকাকে কি বলবে ঠিক করা হয়নি। একটু বসেই ওটা ঠিক করে নিতে হবে।

ঢুকে পড়ে একটা বেঞ্চে বসতে যাচ্ছিল, ছাড়া-ছাড়া বেঞ্চের একটা বাদ দিয়ে, দ্বিতীয়টা থেকে একটা প্রশ্ন ভেসে এল—"কমল নাকি ? এত রাত করে ফিরলি যে ?"
কাকা। দুজনে বসে গল্প করছিলেন বলতে বলতেই উঠে এলেন। কমলও উঠে দাঁড়িয়েছে। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।
"বাড়ি চল, আর বসে কাজ নেই, নতুন হিম। আনপ্লেজেন্ট কিছু করে আসিসনি তো ? আমি বংকুকে ঐ কথাই বলছিলাম। বংকু বলে—তা করুক একটু আনপ্লেজেন্ট একটা ফরেন ডিগ্রিতো মাথা কিনে নিয়েছে একেবারে। ওদের একটু শিক্ষা হওয়া উচিত। ...তা, করিসনি তো বাড়াবাড়ি কিছু।"
"এলই না তো, করব কার কাছে ?"
—পিতৃব্য বন্ধুর সমর্থন পেয়ে খানিকটা বুকের পাটা ফিরে এসেছে, জুড়ে দিল—"বসে বসে একা-একা বৈঠকখানায়···।"
"থাক আর গিয়ে কাজ নেই।···কি বলিস বংকু ?"
বংকু সমর্থন করল—"থাক্, যখন একটা বাধাই পড়ল। হয়ে গেলে অবশ্য ভালোই হোত !"
বাড়ি এসে পড়ল।
ছেড়ে দেওয়ারই চেষ্টা করল কমল ক'দিন ধরে যা একটা বিধাদের মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে এল। তার পরিণতিটা তো এখনও বাকি। জানাজানি হয়ে গেলে অবস্থাটা কিরকম দাঁড়াবে, কাকার দিকে আবার তরফদারের দিকেও—সেই চিন্তা নিয়েই কাটাল ক'দিন। তার কাটান মন্ত্রও খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু তেমন মাথায় কিছু আসছে না, 'যা হয় হবে' গোছের একটা মরিয়া ভাব জমে উঠছে মনে, তেমনি, তারই পাশে পাশে আর একটা অনুভূতি, ওর জীবনে এই প্রথম—বিপদটার দিক থেকেই একটা আকর্ষণ—তার সঙ্গে ঐ লকোচুরি, ঐ মিথ্যা। সজলার হাসিও হয়তো আরও দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে, আরও ধারালো। মেয়েটাকে যেন বেশ বুঝে নেওয়া যায় না, তাই বুঝে নেওয়ার জন্যে যেন আরও টানে।···কিন্তু কমলের আকর্ষণ তো মা-ই, মনকে বোঝায় কমল। কী যে ভালো ! কটা দিন দেখেনি, মনে হচ্ছে যেন কত দিন। আর একবার দেখেই আসুক, অত চুল-চেরা বিচার না করে।
কাকা সেই উইয়ে-খাওয়া পুঁথিটার আধখানা লুপ্ত একটা সমাসবদ্ধ শব্দ থেকে কি একটা বড় তথ্য বের করেছেন। কাকা যখন কিছু—নেই-এর মধ্যে থেকে অনেক-কিছু একটা আবিষ্কার করে বসেন, তখন তিনি কল্পতরু ; কি চাও, চেয়ে নাও না !
এরপর কি করে এক রকম চাপা দেওয়াই প্রসঙ্গটা তুলে—মনের জ্বালায় ঘুম হচ্ছে না বলে—আর একবার—একটিবার চেষ্টা করার অনুমতিটা চেয়ে নেবে মনে মনে তার ভাবটা ঠিক করছে—একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে, একটা কথা মনে হতে একটু উত্তেজিত হয়েই উঠে পড়ে পায়চারি করতে শুরু করে দিল—

দরকার কি আর 'ভগীরথ' নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার?···মনটা সঙ্গে সঙ্গেই হালকা হয়ে উঠছে; পুলকিতও।···লুকোচুরি, মিথ্যা, ধাপ্পাবাজি—এসবের পাটই উঠে যায়।···ঐরকম একজন মানুষের সঙ্গে সাত্ত্বিক, সত্যনিষ্ঠ, জ্ঞানতপস্বী মানুষ একজন! অতটা যে অন্যায় করল তাঁর প্রতি বিশেষণ জুড়ো করে যেন আশ মিটছে না।···সম্মতি নিয়ে তার অপব্যবহার করলেই সেটা হবে মিথ্যাচার। নিজের দায়িত্বে রিস্ক নিয়ে গেলে তো এসবের প্রশ্ন আসবে না।

ঠিক করে ফেলল কমল। তাই করবে। তাতে যে-কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, হবে।

বসুমিত্রের বাড়িতে ফোন আছে। নিরিবিলি সংসার। নিজে, স্ত্রী, আর একটা চাকর। পরিচয় গোড়া থেকেই। কাকা মাঝে মাঝে ব্যবহার করেন, নিজে, আবার কমলকে পাঠিয়েও। ক্লাবের জন্যে জমিকেনা সূত্রে পরিচয়টা খানিকটা ঘনিষ্ঠতাতেই দাঁড়িয়েছে। দাদু-নাতির সম্বন্ধ। ভালোওবাসেন। কোন দরকার হলে ওপরে নীচে যেখানে থাকুন, একবার শুধু জানিয়ে দেওয়া।

আজই দেখুকনা। অনেক সময় আছে। একটু শুধু জেনে নেওয়া—তরফদার আছেন কিনা।

চাকরটা নীচে কাজ করছিল। বৈঠকখানায় ঢুকে—"দাদু, ফোন করছি একটু" বলে ফোনে গিয়ে রিসিভারটা তুলে ডায়াল করল কমল।

"কে? কাকে চান?"

প্রশ্ন ভেসে এল ওদিক থেকে; সজলার গলা। একটু থমকে গেল কমল গলার কথাটা খেয়াল হয়নি। তাকেও এমনি করে চিনিয়ে দেবে তো।

"কে? কাকে চান?"—আবার প্রশ্ন হল।

এটুকু বুদ্ধি যে কী করে যুগিয়ে গেল, কমল নিজেকে তোৎলা করে দিয়ে উত্তর করল—"ডা-ডাক্তার তরফদার বা-ব্বাড়ি আছেন?"

"ছিলেন তো ওপরে একটু ধরুন দেখছি।"

কমল তাড়াতাড়ি রেখে দিয়ে, কি ভেবে দুপা পেছিয়েও গেল। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে।

"কাকে ফোন করছিলে? ডাক্তারের কথাটা কানে গেল। খবর ভালো তো?"—বলতে বলতে ত্রৈলোক্যবাবু নেমে এলেন।

"ভালোই।" কমল উত্তর করল একটা ঢোক গিলে। বলল—"প্রেসারটা বেড়েছে একটু কাকার। ডাক্তারবাবু বললেন, ট্যাবলেটটা দু'দিন চলবে।"

ভেতরের দিকে কি একটা কাজ সেরে উনি ওপরে উঠে গেলেন।

কমল সরে এসে একটা সোফায় বসে পড়ল। বসেই রইল চুপ করে।···সজলার গলা। মিষ্টিই হবে, গানের গলাই তো, যদিও সেদিন অতটা খেয়াল হয়নি। না হওয়ারই কথা, সেদিন তো ব্যাপারটাই হয়ে গেল অন্যরকমই।···বেশ মিষ্টি বৈকি!

হতে পারে ফোনে আরও সরু হয়ে আজ আরও মিষ্টি শোনাচ্ছে।…থাক, যার গলা তারই আছে, তার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?…

—বিবেক বেশি বাড়াবাড়ি করলে মনের কাছে ধমকও খায়।…সজলা মেয়েটা নিজে অস্বস্তিকর হতে পারে; কিন্তু তার কণ্ঠস্বর কি এমন অপরাধ করেছে যে, শুনলে মহাপাতক হবে? তাছাড়া ও ওপরে কোথায় খোঁজ নিতে গেছে তরফদার আছেন কি নেই,—সেটাও তো জানা দরকার।…খট্ ক'রে অভদ্রের মতো ছেড়ে সে দিলে!

একটু দ্বিধা আছেই, সেটা কাটিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে আবার ডায়াল করল।

"কে?"

"আমি কমল।"

"আপনিই এখন ফোন করেছিলেন?"

"কই, নাতো।"

"তাহলে আমারই ভুল। আর একটু যেন তোৎলাও তো। যদিও গলাটা মনে হল ."

"জিজ্ঞেস করছিলাম—আপনার বাবা বাড়িতে আছেন?"

"না, তিন বেরিয়ে গেছেন, এই দেখে এলাম। কিছু দরকার আছে? বলে দিতে হবে?"

"না, তেমন কিছু নয়। ঐ যে, সেদিন কাকার কথাটা তো বলা হল না তাঁকে··"

"তা, আসুনই না একদিন। আপনার কথা বলছিলেন। আর মা তো আপনাকে কী চোখে যে…"

—হঠাৎ চুপ করে গেল। কমল প্রশ্ন করল—"হ্যাঁ, মার কথা কি বলছিলেন?"

"বলছিলেন—অনেকদিন আসেননি…মানে, কিরকম গল্পে মানুষ, দেখেছেন তো? মানে…তাহলে আসুন নিশ্চয় একদিন। হ্যাঁ, ভুলেই যাচ্ছিলাম বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে সামনের রবি আর সোমবারটা বাদ দিতে হবে।"

"কেন?" হঠাৎ—আগ্রহটা চাপবার চেষ্টা করে প্রশ্ন করল কমল।

"একটা সেমিনারে শিলিগুড়িতে যাবেন। তা'হলে আসবেন কিন্তু। মার বাতটা বেড়েছে, নৈলে নিজেই নেমে আসতেন। আসবেন কিন্তু। আর কিছু বলবেন কি?"

"না, তেমন আর কিছু…আর আসছিই তো।"

"তাহলে রেখে দিলাম। বেশ তো?"

খুটখুট ক'রে তুলে রাখার শব্দ হোল।

কমল সরে এসে একটা কুশান চেয়ারে বসে পড়ল। হাঁপাচ্ছে।

সজলার কথা একসঙ্গে এতখানি শুনতে পাবে কখনও, কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। অবশ্য, টেলিফোনের অন্তরাল বলেই সম্ভব হয়েছে। আর, সত্যই টেলিফোনে মিহি হয়েই কি এত মিষ্টি মনে হোল?

বেশ কিছুক্ষণ কণ্ঠস্বর নিয়ে পড়ে রইল মনটা। তারপর, এরমধ্যে থেকে সম্পূর্ণ

আর এক অনুভূতি ধীরে ধীরে জেগে উঠল মনে। সজলাকে, পাওয়া যায় না? আপন ক'রে নিতে পারা যায় না?

আশ্চর্য লাগছে, এ প্রশ্নটা কখনও, এই টেলিফোনের আগে মনে উদয় হয়নি। অথচ, রূপে, যৌবনে, শিক্ষায়, কথা-শিল্পে—সব মিলিয়ে এত অপরূপা, এত বাঞ্ছনীয়। ·· ও যেন ছিল কত সুন্দর! ও যেন ছিল উপন্যাসের সেই রাজকন্যা যে তার রূপসম্ভার নিয়ে মুগ্ধই করতে পারে, কিন্তু এতই অলভ্যা যে, তাকে পাওয়ার কথা কল্পনাতেও আনা যায় না।

আজ টেলিফোনের দীর্ঘ আলোপে সব ওলট পালট ক'রে দিয়েছে—রাজকন্যা দুর্লভা হ'তে পারে, কিন্তু একেবারে অলভ্যা হবে কেন?

মনে পড়ে গিয়ে পুলক জাগছে—আজ সজলাই যেন চেষ্টা করে টেনেটেনে রাখে সংলাপটা। অন্তত, এটা তো ভুল হওয়ার নয় যে, আজ তার কণ্ঠস্বরও ছিল স্খলিত মুক্ত হয়েও ব্রীড়াজড়িত দ্বিধাগ্রস্ত।



সজলাকে পেতেই হবে, নৈলে তার জীবনে রইল কি?

টেলিফোনের কথাগুলো সঙ্গীত হয়ে গিয়ে কানে রুণরুণ করছে। এখনই টাটকাটাটকি এ-সঙ্গীতের মূল উৎসয় গিয়ে পড়া যায় না? কণ্ঠের সঙ্গে দুটি চোখের সলজ্জ চাহনি, অধরে সলজ্জ স্ফুরণ!···

একবার দেখেই আসুক। ডক্টর তরফদার বাইরে। আর যদি এসেই পড়েন, তিনি তো খোঁজ করছিলেনই, এই মাত্র শুনল।

একটা অদ্ভুত আবেশ, কী একটা শুভলগ্ন হেলায় যেন হারাতে চলেছে। হয়ে আসুক একবার, অত না ভেবে পা দুটো চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

এরপর সুদূর নেপথ্যে আর একটা যে ঘটনাপ্রবাহ চলছিল, সেটা হঠাৎ সামনে এসে পড়ে, এটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অপ্রত্যাশিতে মসৃণ এক গতিবেগ নিয়ে নিজের পথ ধরে এগিয়ে চলল। সবটুকু শেষও হয়ে গেল।

উঠতেই, একটা চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠে পা দু'টো যেন অসাড় হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে কমল।

—কলিংবেল টিপতেই সজলা নয়, দোর খুলে এবার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে স্বয়ং তরফদার। যেন এইমাত্র বাইরে কোথাও থেকে এসে ঘণ্টির আওয়াজে ঘরে

দাঁড়িয়ে দোরের ছিটকিনি নামিয়ে দিলেন। মুখে মোটা চুরুট, মোটা চশমার পেছনে চোখ দুটো চকচক করছে, হাতে দু'কপি 'ভগীরথ'।
"কাকে চাও?"
উত্তর খুঁজছে কমল। ঠিক উত্তরটা কোন মতে জোগাচ্ছে না।
—কাল্পনিক চিত্রই একটা, কিন্তু অনড় হয়ে দাঁড়িয়েই রয়েছে, হঠাৎ পেছন থেকে—
—"এই যে, তুই এখানে? ··অম্বু এসেছে।"—ঘুরে দ্যাখে কাকা। চটকাটা ভেঙ্গে গেছে; তবু, ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল কমল। বুঝতে পারছে না এটাও ঐ ধরণেরই একটা কিছু কিনা।
"অম্বু হঠাৎ এসে পড়ল। তোকে খোঁজ করছে এসেই···। যা। আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে একটা ফোন করে আসছি।"
অনেকখানি কথায় সাড়ে হোল, প্রশ্ন করল—"আমাদের অম্বু?···হঠাৎ!"



—বেশ সাড় হয়েছে। মুখে অপ্রত্যাশিত আনন্দের একটু হাসির রেখা—"এ যেন মেঘ না চাইতেই জল!" অর্ধস্ফুটভাবে নিজের মনে কথাগুলো বলতে বলতে পা চালিয়ে দিল।
অম্বু ওর খুড়তুতো বোন। বয়সে বড়ও নয়, ছোটও নয়। মাত্র দু'একঘণ্টার এদিকে-ওদিকে জন্ম বলে কেউ কাউকে 'দাদা-দিদি' বলতে চায়না একেবারে সমভাব বন্ধুভাব। আলাপ-সংলাপও কতকটা ঐ ধরণের। কোন সমস্যায় পড়লে পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়ায়!···উমেশকে যে পছন্দ হয়েছিল, ভালোবেসে ফেলেছিল, এ-কথা কমলকেই জানাল অম্বু। শুধু সে নামটা পছন্দ নয়—কেমন যেন 'ঋষি-ঋষি'···'দাড়ি-দাড়ি'র কথা মনে করিয়ে দেয়—এটাও জানিয়ে, অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতোই বলে—"তা কি আর হবে ভাই? আমার কপাল। তুই কিছু দ্যাখ ভাই। নয় তো···"
যেমন বলে থাকে কেউ, তেমনি অন্তরঙ্গ কাউকে।
বাধা ছিল কিছু, কমলেরই চেষ্টাতেই অনেক কিছু সুরাহা হয়।
অম্বু-চরিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য তার ঘটকালি। ওটা যেন তার সহজাত।

কোনখানে একটু গন্ধ পেলেই সম্ভাবনার, উপস্থিত হয়ে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে, দরকার দেখলে যথাস্থানে ভাংচি, ভাঙন ধরিয়ে। কম বয়স থেকে হাত পাকাতে থাকে, তারপর নিজের বিবাহের পর এই পাঁচটা বছরে এখানে-সেখানে গোটা পাঁচেকের যশ নিয়েছে।···ওর শ্বশুরবাড়ি কাশী।

যখন সবচেয়ে অম্বুকেই দরকার ছিল, তখন তাকে সে কি করে ভুলে বসেছিল ভাবতে-ভাবতে পা চালিয়ে দিয়ে উপস্থিত হোল কমল।

অম্বু যেন মুখিয়েই ছিল ছিল। স্নান ক'রে বাথরুম থেকে সদ্য বেরিয়েছে, ওকে দেখেই—"হ্যারে কমু, তুই কী···"—ব'লে মা এসে পড়তে থেমে গিয়ে, বলল—"আমি ওপরে যাচ্ছি, আয়।···আমার চা'টা ওপরে পাঠিয়ে দাও মা। ওর সঙ্গে দু'টো কথা আছে, সেরে, নেমেই ভাতে বসব।"

ওর বছর দুয়েকের মেয়েটা কাকিমার কোলে। আগ্রহটা চেপে, তাকে একটু আদর ক'রে উঠে গেল কমল। চাকরটা একটা ট্রেতে করে দুটো কাপ চা নিয়ে গেছে। অম্বু তুলেও নিয়েছে একটা।

ঘরে ঢুকে, কিছু-একটা বলবার জন্যে যেন, বলল কমল—"তুই এবার একটু মুটিয়ে গেছিস অম্বু।"

"খবরদার টুকবিনি বলছি!"—একটু চোখ পাকিয়ে উঠল অম্বু। বলল—"তোদের দৃষ্টি বড় খারাপ। হ্যাঁরে কমু, জিজ্ঞেস করি, তুই একটা পুরুষ, না, কী?"

"হোল শুরু!···হঠাৎ?"

"টুকবিনি মোটে। যা বলছি শুনে যা। মিলিয়ে যা মনে মনে।···সেখানে খবর পেলাম···কি ক'রে জিজ্ঞেস করবিনি। তোর ভগ্নীপতি কি রকম পাড়ার গেজেট, জানিস। খবর পেলাম—গোধুলিয়ার অমুক বাড়ির অমুক ছেলের সঙ্গে কলকাতার বসু-মিত্তির কলোনীর অমুকের মেয়ের বিয়ে হতে যাচ্ছে। একেবারে ডানা-কাটা পরী—এদিকে নাচ, গান—হেন হুনর নেই যে জানে না। ভাবলাম বেশ ভালো কথা, দেশের একটা মেয়ে সঙ্গী হোল। তারপর হঠাৎ তোর কথা মনে পড়ে গেল—ঘরের কাছ থেকে অমন একটা মেয়েকে ছোঁ মেরে নিয়ে আসছে, সে মেনিমুখো বসে বসে করছে কি!···সাটেই বলছি এখন, পরে সব শুনবি। গাড়িতে ঘুম হয়নি। খিদেও পেয়েছে।···জানা বাড়ি, কাছেই, একদিন তোর ভগ্নীপতিকে নিয়ে গেলাম। ও বাইরে বসে গল্প করতে লাগল, আমি একথা-সেকথার পর তুললাম কথাটা। গিন্নি বললেন—উঠেছিল কথা, তারপর একটি চিঠি লিখে তারাই ভেঙে দিয়েছে। এঁরাও দোমনাই হ'য়ে ছিলেন,—মেয়ে নাকি একেবারে হালফ্যাসানের বিবি। আর গা করেননি। এই সেদিন এল চিঠি। ফটোটা পাঠাব-পাঠাব ক'রে পাঠানো হয়নি, এবার দেবেন পাঠিয়ে।

"দেখি চিনি কিনা", তারপর আমিও বলতে পারব—বলে ফটোটা আনিয়ে, একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে নিয়ে বললাম—"মনে হচ্ছে যেন সেই মেয়েটিই। আছে বটে

ঐরকম একটু বদনাম"—বলে ভাঙনটা পাকা ক'রে দিয়ে আরও দু'টো এধার ওধার গল্প ক'রে উঠে এলাম।

একটু মুখটিপে হাসির সঙ্গে কথাগুলো বলে, আবার গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল—"সব তো শুনলি, কি ব্যাপার বল দিকিনি এবার? ওদের সঙ্গে করণীয় হলে আমাদেরও তো স্ব-ঘর। চিনিস।"

"চিনব না কেন?"

"তাহলে?···সত্যিই হালফ্যাশানের বিবি?"

"তা কেন হ'তে যাবে? সবাই তাই?"

"তাহলে হাঁদাগঙ্গারাম হয়ে যে ব'সে আছিস—ওখানে হোল না, ও-মেয়ে পড়ে থাকবার?" যাওয়া-আসা ক'রে উঠে পড়ে লাগতে হবে না?"

চুপচাপ, আর কথা কয়না।

"বল কি বলবি।"

কথা নেই, মুখটা গোঁজ ক'রে বসে রয়েছে।

"বুঝেছি, তোর কম্ম নয়। মুখেই বাঘ-সিংহ মারতে আছিস। তোর মধ্যে পুরুষত্ব যদি কিছু থাকে ·।"

"বেশ তো ব'কে যাচ্ছিস।"—মুখ তুলল কমল একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলল—"কাকা যে এদিকে পথ বন্ধ করে বসে আছে, সে খোঁজ রাখিস?"

"বাবা! বাবা কি করেছেন?"

"নাচছিল, পোষাক নিয়ে এক ফ্যাসাদ তুলে, তারপর কাগজে তাই নিয়ে লিখে ওর বাবাকে চটিয়ে দিয়ে ··"

"না, তোরা সব সমান!"—একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইল অম্বু। বলল—"নাচছিল তা কোমরে একটা কিছু তো ছিলই, বাবার তা নিয়ে ··সবটা খুলে বল দিখিনি, শুনি! বাবা মাঝখান থেকে অমন কাজ করতে গেলেন কেন?"

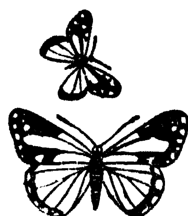
ওদের ভাইবোনের সম্বন্ধটা এই রকমই, একবার মুখ খুলে যেতে আগাগোড়া সব বলে গেল কমল। এমনকি গিন্নির স্নেহ আদর থেকে নিয়ে সজলার সঙ্গে ফোনে কথা পর্যন্ত, যা মনে ছিল। সবটুকু ছিল মনে। শেষ করে বলল—"কিন্তু হবার জো নেই ওম্বি। এগুসনি।"

"কেন জো থাকবে না? এই তো বললি ডক্টর তরফদারের কোন রাগ, আক্রোশ নেই।"

"ভেবে দেখেছি সে, কথাও।" কমল উত্তর করল "কিন্তু সে তো পরের মুখে শুনে। নিজে চোখে পড়লে···পড়বারই সম্ভাবনা বেশি—কাকার লেখার ওপরই আরও ছড়াতে পারে কথাটা কাকাকে সমর্থন করে বা বিরুদ্ধেই। শত্রুই করে তোলা তো!"

এদিকে কান রেখে একদিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে শুনছিল অম্বু, বকে উঠল—"থাম, বুঝেছি। অমন ঢের শত্রুকে মিত্র করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে তোদের অম্বা—

এমন গলায় গলায়, বেয়াই বলতে অজ্ঞান। আমার কাছে ভাঙা-জোড়ার সবরকম মন্ত্র আছে। তুই চুপ করে বসে দেখে যা ঠুঁটো জগন্নাথের মতন তাছাড়া আর কী বলতে ইচ্ছে করে ?···মানুষটা কী গো ! পুরুষ ?"
চুপ করে গিয়ে ডাগর-ডাগর চোখ দুটো ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে খানিকক্ষণ ধরে কি ভাবল। মাঝে মাঝে ঠোঁট দুটোও অল্প অল্প নড়ে উঠছে ভেতরের কথার তালে। একটু পরে গা-ঝাড়া দিয়ে বলে উঠল—"নে, হয়েছে। ও হয়েই গেছে ধরে নে। দু'জনে দুজনকে চাইছে ; মাঝখানে বাপ-কাকা দাঁড়ালেই হল যেন। বিয়ের আগে বিবির সঙ্গে একটু 'লভ' করতে চাস ? তাহলে বল, তারও দুতালি করে দিই"—চোখে ঠোঁটে একটু কৌতুক হাসি ফুটে উঠল।
কমল হেসে ফেলল। বলল, "পোড়ারমুখী। ললিতা দুতী হওয়ার সাধ হয়েছে।"
ভেতরের চিন্তা কানে না তুলে বলে চলল অম্বু—"সামনেই দুটো দিন আছে কাছাকাছি ; সেখানে একটা গাঁটছড়ার ব্যবস্থা করে এলাম কিনা। আগেরটাতে তোরটা সেরেই চলে যেতে হবে আমাকে। সাতাশে আর ও মাসের তেসরা। তার মাঝেই তোকে ঝুলিয়ে দিতে হবে।·· কেমন করে বলদিকিন ?"



চোখ দুটো কপালে তুলে আর একটু ঘোরাল। তারপর যেন নিজের প্ল্যানটায় সমর্থনের শিলমোহর বসিয়ে দিয়ে বলল—"ঠিক হবে। এখন তোকে শুধু ছকটাই বলে যাচ্ছি, তারপর গড়েপিঠে ঠিক করে নোব। মেয়ে চায়, মা চায়—গিয়ে বলব, কাকা অন্য জায়গা ঠিক করে ফেলেছেন শুনে আমি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলাম। সামনের সাতাশে এটা সেরেই আমায় চলে যেতে হবে—
ওরা তো একেবারে ঢেলে দিতে চাইছে। বাবা আবার লুভিষ্টি মানুষ তো—পাত্রকেও ঠেকানো যাবে না আমি চলে গেলে—আপনাদের মেয়ের টান বেশি হবে, কি শেষ পর্যন্ত ওদিকে মোটরের টান—বেটাছেলেই তো মুখে পণপ্রথাকে যতই ভাগাড়ে পাঠাক—"
অবাক হয়ে শুনে যাচ্ছে কমল ; বলতে বলতে একেবারে খিল-খিল করে হেসে উঠে, ওর কাঁধে একটা চাপড় দিয়ে বলল—"চেয়ে আছে দ্যাখো হাঁদাগঙ্গারাম !"

মনটা হালকা হয়ে এসেছে, কমল বলল—"সবতো বুঝলাম। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে সম্বন্ধটা ভেঙে দিলি কি করে। পারেও তো করতে। মোটর দিতে চাইছিল ওরা।"
"বলব—দেখলাম, মেয়েটা আমার মতন বাচাল।…চল, নাড়ি জ্বলছে আমার।"
বেশি হাসলে চোখে জল এসে পড়ে। আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে উঠে পড়ল। বলল—"আবার দুটো নাকে মুখে গুঁজে এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। বলে যার বিয়ে তার গা নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।"

"সাতাশে সাত দিন হোল হয়ে গেছে। দুটো বাড়িতে হৈচৈ তুলে অনেকখানি কলোনীতেও, কাজ সেরে চলে গেছে অম্বু। জ্যোৎস্না পথ, ঠাণ্ডা থাকলেও আজকাল পার্কে একটু রাত পর্যন্ত চলছে গুচ্ছের জটলা। সবার হাতেই একটা করে ঝাল চানার প্যাকেট।
ফুরিয়েও এসেছে। এক ফটিকের ছাড়া। তার দাঁতে ব্যথা, আস্তে আস্তে চিবুতে হচ্ছে। উঠে পড়ল সবাই।
একজন কতকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলল—"শুনছি, 'ভগীরথ'টা নাকি আর চালাতে পারছে না।"
"তাই নাকি?" একজন প্রশ্ন করল। বলল—"তাই বোধহয় আমাদের এ সপ্তাহেরটা আসেনি। বেশ ছিল কাগজটা; কলোনীটা গরম করে রেখেছিল কটা মাস।"
"যা যুগ যাচ্ছে! ভালো জিনিস ট্যাঁকবার জো আছে?" মন্তব্য করল একজন।
চলতে চলতেই কথা হচ্ছিল।
মিনিট দুয়েক গেল। তারপর কমল ফটিকের দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল—"দেতো রে ফটকে, তোর প্যাকেটটা কিরকম, একবার দুটো খেয়ে দেখি।"



ক্ষুধিত পাষাণ

১

লোকটি বাঙালী কি গুজরাটী বোঝা শক্ত। যদি গুজরাটী হয় তো নিশ্চয় বহুদিন কলিকাতায় থেকে বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রায় নিখুঁত ভাবে আয়ত্ত করেছে ; যদি বাঙালী হয় তো বহুদিন গুজরাটে থেকে ভাটিয়া-গুজরাটীদের সুতীক্ষ্ণ ব্যবসা-বুদ্ধিতে পরিপক্ক। এর মধ্যেও, কেমন একটা মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল, তাতে আমার নিজের অনুমানটা বাঙালীত্বেরই দিকে।

সেবার নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলন হল আমেদাবাদে। নিমন্ত্রিত হলাম। ভাবলাম একটু আগে গিয়ে শহরটা ভালো করে দেখে নিই, ভারতের "কমার্শিয়াল ক্যাপিটাল" বলে দাবি করে, তাপর সম্মেলন সেরে পশ্চিমাঞ্চলটা যতটা সম্ভব দেখেশুনে বাড়ি ফেরা যাবে। দুটো দিন হাতে রেখে, তিনদিন আগে ভোরে গিয়ে স্টেশনে নামলাম।

একেবারে নূতন পরিবেশ, তাই দূর ভ্রমণে অনভ্যস্ত, হালকা বেডিং আর সুটকেসটা নামিয়ে পায়ের কাছে রেখে অনভিজ্ঞ দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চাইছি, দেখি, হাত দশেক তফাতে ভিড়ের মধ্যে একজোড়া চোখ যেন আমার মুখের ওপর আটকে রয়েছে ; দৃষ্টিতে আগ্রহের ভাব সুস্পষ্ট। ডাকব কিনা ভাবছি, লোকটি আপনিই ভিড় ঠেলে উপস্থিত হল ; প্রশ্ন করল—"সম্মেলনের ডেলিগেট ?"

বললাম—"হ্যাঁ, দুদিন আগে এসে পড়লাম। ক্যাম্প নিশ্চয় এখনও খোলেনি, দু'দিনের জন্যে একটা ভালো হোটেল…নতুন জায়গা, পূর্বে কখনও আসিনি…"

"বুঝেছি। হোটেল, গাইড, যেমনটি খুঁজছেন। আমেদাবাদ আবার নতুন-পুরনোর মেশানো জায়গা তো। আসুন।"

ঝুঁকে পড়ে দুহাতে বেডিং আর স্যুটকেস তুলে নিল। প্রতিবাদে কান না দিয়ে বলল—"ঠিক আছে, এর জন্যে আবার কুলি? ফুঃ!"

"অন্তত স্যুটকেসটা…"

"আপনি আসুন তো।"

ভিড় একটু পাতলা হয়েছে। এগুন। তীর্থের পাণ্ডা না হোক, দেখলাম জাতটা ঐ, কোন হোটেলের এজেণ্ট হতে পারে, কথা বলচে না। আমি পেছনে-পেছন চললাম। বাইরে এসে—একটা ট্যাক্সি যেন ঠিক করাই ছিল, বেডিং স্যুটকেস তুলে দিয়ে বলল—"বসুন, স্যার।"

নিজে উঠে ড্রাইভারের পাশে বসে পড়ে গন্তব্য সম্বন্ধে গুজরাটী ভাষায় কি নির্দেশ দিল, তার মধ্যে স্যাহিবাগ, জলদি, কথা দুটো বুঝলাম। ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

বেশ খানিক ঘুরেফিরে প্রায় আধ ঘণ্টা পরে গেট দেওয়া কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকে একটা বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়াল। দোতলা। মোটামুটি বেশ বড় বাড়ি। গাড়ির শব্দে একজন উর্দিপরা আরদালি-গোছের লোক দাঁড়িয়েই ছিল। লোকটির নির্দেশে বেডিং স্যুটকেস নামিয়ে নিল। তারপর ভাড়া চুকিয়ে আমরা বারান্দায় উঠে পড়ে এগুলে আমাদের পেছনে পেছনে আসতে লাগল।

ডানদিকে একটা হলঘরের মতো বড় ঘর। তার শেষে পুরানো ধরণের চওড়া কাঠের সিঁড়ি। উঠে, ছোট-বড় কয়েকটা ঘর পেরিয়ে আমরা ডানদিকে একটা বড় ঘরে পৌঁছুলাম। দুপাশে দুটি ছোট ঘর, সামনে খানিকটা বারান্দা। ঘর তিনটি নূতন চুনকাম করা, দরজা-জানালায় নূতন পেণ্ট। ঢুকতেই একটা তাজা গন্ধ নাকে লাগল। ওদিকটায় আবদ্ধ ঘরের একটা ভ্যাপসা গন্ধ, বিশেষ করে, নীচের তলায়। পরিবর্তনটুকু ভালোই লাগল।

ঘরটি আধুনিক প্রথায় বেশ ভালো করে সাজানো, বাহারে একটি পিতলের ভাসে বড় বড় গোলাপ ফুলের তোড়া পর্যন্ত। পাশের ঘর দুটোর একটা স্নানাগার, একটা ল্যাভেটারি।

লোকটির সব যেন নখদর্পণে। ক্ষিপ্রগতিতে আমায় সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে, তালি দিয়ে হাত ঝেড়ে বলল—"আমি এবার একবার ওদিকটা দেখে আসি—আপনার ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ। কাকে পাব, কি রকম টেস্ট জানা তো ছিল না।…আসি।"

দু পা গিয়েই ঘুরে বলল—"দেখুন ভুল! ভেজিটেরিয়ান, কি নন-ভেজিটেরিয়ান?"

বললাম—"না, মাছ-মাংস চলে।"

"গুড।...আসি স্যার।...হ্যাঁ, ঐ কলিং বেলের সুইচ। টিপলেই লোক এসে যাবে।...চলিঃ।"

আবার বারান্দা থেকেই ফিরে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বলল—"আপনি ততক্ষণ স্নানটান সব সেরে রেডি হয়ে নিন। এসে সব কথা হবে।"

চলে গেলে, দরজার সামনে কুশন চেয়ারটা টেনে নিয়ে চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ। স্টেশন থেকে, এক রকম বলতে গেলে, মুখ বন্ধ করেই আসতে হল, নিশ্চয় পাছে কিছু জিজ্ঞেস করি বলেই নিজে ড্রাইভারের পাশে বসে এল। আর, এই হোটেল বাড়ি? যেন শ্মশানপুরি। কার হাতে পড়া গেল।

মাথাটা ঝিমঝিম করছে। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে ধীরেসুস্থে একেবারে স্নান পর্যন্ত সেরে নিলাম। বেশ ভালো ব্যবস্থাই। ঠাণ্ডা-গরম জল, দামী সাবান, তেল। ভালো করে স্নান করে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা আঁচড়ে নিয়ে কলিং বেলের সুইচ টিপতে যাব, দেখি একটা সুদৃশ্য ট্রে-তে করে চা আর ব্রেকফাস্ট নিয়ে বেয়ারাটা হাজির। টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে স্নানাগারের কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল এনে সব সাজিয়ে রেখে দিয়ে ওদের ভাষাতেই একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করল। তার মধ্যে পেগ্ (Peg) কথাটা বুঝতে পেরে আমি হাত নেড়ে 'নাহি' বলায়, সেলাম করে বেরিয়ে গেল।

আয়োজনটা বেশ ভালোই। পটে করে সুগন্ধী চা, দুটো টোস্ট, একটি অমলেট, দুটো ঢাকাই পরোটা, একটা করে তবক-দেওয়া এ-দেশী মেঠাই, দুটো আমাদের এদিকের রাজভোগ, একটা কাঁচের ডিসে খানিকটা জেলি আর একফালি আমের এ-দেশী আচার। একটা প্লেটে আঙুর, আপেল, কলা।

অতটা খাওয়া যায় না। তবু, বেশ সুস্থ বোধ হচ্ছে, যতটা পারলাম "সুবিচার" করে, বাথরুম থেকে মুখ হাত ধুয়ে এসে সুইচটা টিপে দিলাম। বেয়ারা এসে ওগুলো সরিয়ে নিয়ে যেতে এলে বললাম—"সাহেবকো সেলাম দেও।"

আমেদাবাদ শীতের জায়গা নয়। তবু, ডিসেম্বর মাস, বেশ একটা আমেজ আছেই, গেঞ্জির-ওপর এই ঘরেরই নরম মোটা তোয়ালেটা জড়িয়ে খোলা বারন্দায় দাঁড়াতে আবার আগেকার চিন্তাটা ঘিরে ধরল।...এদিকে সব এক রকম ঠিক, কিন্তু কার পাল্লায় পড়ে কোথায় এসে উঠলাম?

বাড়িটা একটা বড় চত্বরের মাঝখানে। সামনে একটু দূরে সবরমতী নদী। বোধ হয় আরও গা-ঘেঁষে ছিল, বাড়ির জমি সংলগ্ন ভাঙাচোরা একটা ঘাটের নিশানা থেকে যেমন বোঝা যায়, এখন বেশ খানিকটা সরে গেছে। পল্লীটা যেন শহরের একটু বাইরেই। দূরে দূরে কিছু নূতন বাড়ি উঠছে। তবে, এ বাড়িটা একাই আছে দাঁড়িয়ে। আর, পরিত্যক্ত বলেই মনে হয়। গেট থেকে ঢুকে মোটর থেকে যতটুকু দেখা গেল, তাতে মনে হল পুরনো আমলের ইঁট আর পাথর দিয়ে তৈরি কোন আমির, ওমরাহের বাড়ি হতে পারে। আমেদাবাদের ইতিহাস তো সেই রকম।

নদীর দিকেই ফিরে দাঁড়িয়ে আছি। তন্ময় হয়ে। মনটা এক একবার অতীতে ছাড়িয়ে পড়ে আবার রহস্যময় বর্তমানে গুটিয়ে আসছে, হঠাৎ থমকে উঠতে হোল—"ব্রেকফাস্ট সারা হোল স্যার?"

ঘুরে দেখি লোকটি পেছনে দাঁড়িয়ে। বলল—"কিরকম হোল স্যার। কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ন তো নয়, তবু—"

বললাম "বেশ ভালোই। গ্রেট ইস্টার্ন না হোক, তবু একটা হোটেলই তো হবে? তাই বলে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু…"

"বলছি স্যার।…চেয়ার দুটো বাইরেই টেনে আনি।"

কিছু বলবার আগেই, চেয়ার দুটোকে দু হাতে ঝুলিয়ে বাইরে সামনা সামনি বসিয়ে দিল।

বলতে ভুলে গেছি, বেশ শক্তসামর্থ ত্রিশ বত্রিশের মতো বয়েস। তখন হিট্‌লারি রীতিতে প্রজাপতি গোঁফ রেওয়াজ চলছে; নাকের নীচে সেইভাবে ছাঁটা গোঁফ। এক ইঞ্চি পরিমাণ।

দুজনে মুখোমুখি হয়ে বসে বলল—"গ্রেট ইস্টার্ন নয় ঠিকই। একদিন গ্রেট ইস্টার্নের মতন তাবড় তাবড় হোটেলকে আমার হোটেলের সমানে মাথা নোয়াতে হবে। এই বলে দিলাম স্যার।" বড় বড় চোখ দুটো চকচক করে উঠল। বলল—"আমার প্ল্যান তো ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট ক্যাপচার করা!"

"কিরকম?"

"রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' পড়া আছে স্যার?"

"একবার নয়, বহুবার; কিন্তু…"

"এই আপনার সেই 'ক্ষুধিত পাষাণ'।"

"সে কি!" একরকম শিউরে উঠেই বললাম আমি। তারপর চারিদিক থেকে যেন নূতন করে দৃষ্টি বুলিয়ে এনে কি বলব ভাবছি, ও বলল "আজ্ঞে হাঁ। এর প্রতিটি পাথর, প্রতিটি ইঁট 'ক্ষুধিত পাষাণ', কবি যেমন বলেছেন। আপনার তো পড়াই স্যার।"

কিছুক্ষণ কথাই সরল না আমার। সকাল থেকেই যে রহস্যের মধ্যে দিয়ে আসা, তাতে আচমকা ওর এই কথাটা আরও যেন বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। তারপর সামনে, ওপরে, পাশে চোখ ঘোরাতে সম্বিত ফিরে এল, বললাম—"কিন্তু, তাঁর অভিজ্ঞতা হায়দ্রাবাদের বগীচে। দূরে আরবিল পাহাড় থাকবে—সুন্ডার জায়গায় না হয় সাবারমতী রইল…"

একটু হাসল। বলল—"বগীচে আপ্রাল, তুলোর মাসুল—ওসবই কবির কল্পনা স্যার, কাহিনীটি সাজাবার জন্যে ওগুলো করে। আপনি পড়াশোনা করা লোক, এটা তো জানেন যে বিলেত যাওয়ার আগে আমেদাবাদের জজ মেজদা সত্যেন ঠাকুরের বাসায় থাকতে 'ক্ষুধিত পাষাণ' কাহিনীটি তাঁর মাথায় আসে?"

"বেশ তারপর?" প্রশ্ন করলাম। মনটা একটু গুছিয়েও আসছে।

"নিছক মিথ্যা কাহিনী নয় স্যার। তিনি ভুক্তভোগী, তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা আর এই বাড়িতেই বসে…"

"নিজের অভিজ্ঞতা এই বাড়িতে বসে?" আবার আমায় চমকে উঠে মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হোল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আর, হায়দ্রাবাদের বরীচে তুলোর মাসুল আদায়ীর বেনামীতে কাহিনীটা লেখবার একটা বড় রকম উদ্দেশ্যও ছিল…এই অধীনের আফিসের…"

"সেটা আবার কি?"

"বাড়িটা হয়তো আগে গবর্নমেণ্টেরই ছিল। যখন সত্যেন ঠাকুর জজ, কিছুদিন পরেই কিন্তু একজন ভাটিয়া ব্যবসাদার এটা কিনে নেয়। অত্যন্ত মামলাবাজ জাত ওরা স্যার। কে একজন বাঙালীবাবু ভুতুড়ে গপ্প ছেড়ে তার বাড়ি নষ্ট করছে—অ্যাটর্নিকে ফোন করে বলে দিত—দাও একটা মামলা ঠুকে। এটাও তো জানেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের শুধু কবি ছিলেন না—বিষয়বুদ্ধিও টনটনে ছিল…"



এবার বিস্মিত হওয়ার বদলে একটু হাসিই সুড়সুড়িয়ে উঠেছিল ভেতরে ভেতরে, বাধা দিয়ে বললাম—"মেনে নিলাম। কিন্তু তাতেও তো প্রমাণ হয় না যে, নিছক কবি-কল্পনা নয়, তাঁর একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এবং এই বাড়িতেই।"

"তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, স্যার, সেসব ঘটনা আজও হচ্ছে—এই বাড়িতেই, আর ঠিক যেমনটি তিনি লিখে গেছেন।"

"সেকি! আজও হয়ে যাচ্ছে সেই সব!" আবার ওর দিকে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলাম। তারপর দৃষ্টি আবার আপনা হতেই ঘুরে এলে বললাম—"তিনি নিজেই লিখেছেন, সে আড়াইশ বছর আগেকার কথা, তার পরেও এতদিন কেটে গেছে!…

অভিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন করে মূঢ় অনভিজ্ঞ কথা শোনে সেইরকম একটু হাসি নিয়ে শুনছিল, বলল—"আমরা দু'কলম ইংরিজী পড়ে লায়েক হয়ে উঠেছি, আমাদের মুনি ঋষিদের কথা হেসে উড়িয়ে দিই, কিন্তু ইওরোপ আমেরিকা—মানে, মর্ডান সায়েন্সও কি বলেছে না যে ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে ইথারে তার ইমপ্রেশন থেকে যাচ্ছে আর যত উৎকট ঘটনা ইমপ্রেশনে তত বেশী, তত স্থায়ী!"

"বেশ বলুন।" খানিকটা স্বীকার করে নেওয়ার ভাবেই বললাম। প্রশ্ন করলাম—"যার এখনও দেখতে পাওয়া…?"

"শুনতে পাওয়াও যায় স্যার। দিনের বেলা ততটা নয়, তবে এখনও ঐ ভাঙা ঘাটে নূপুর পরা পায়ের আওয়াজ কখনও কখনও শুনেছে লোক। দিনের বেলা ততটা নয় তবে সন্ধ্যার পর থেকে বাড়িটা যেন—কি করে বোঝাই--যেন ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে সারা মহলটা জুড়ে এখানে ওখানে চাপা হাসি সেতারের একটু ঝঙ্কার—উঠতে না উঠতেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আর রাত্তির যত এগুতে থাকে, কবি যেমন বলে গেছেন হুবহু একেবারে ঠিক সেইরকম—"সেই আরব তরুণী, সেই কাফ্রী খোজা, সেই পা লা মেহের আলির তফাৎ যাও তফাৎ যাও—সব ঝুট বলে—বাড়ির চারিদিকে পাক দিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি এবার ওদিকটা দেখিগে স্যার, এখনও একলাই। আপনি ততক্ষণ একটু রেস্ট নিন। লাঞ্চ সকাল সকাল এসে যাবে।"

২

উঠে গেল। আমিও খানিকটা চুপ করে বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠে বারান্দার রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। অস্বীকার করব না, বেশ কিছুটা অভিভূত হয়ে পড়েছি, এবং অনুভব করছি, সে ভাবটা যেন ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে আমাকে। রাতে ভালো ঘুম হয়নি, দিনটা দুপুরের দিকে এগুলে, এখানটা একটু গরমই। আমি উঠে বারান্দায় একটু পায়চারি করছি, হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠে খানিকটা বালি উঠিয়ে সাবারমতীতেই মিলিয়ে যাচ্ছে, আমার দৃষ্টিটা আপনা হতেই ভাঙা ঘাটের ওপর গিয়ে পড়ল। নিজের কাছেই লজ্জিত হয়ে আমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম এবার।

ক্লান্ত দেহ মন, কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, একটা টিনটিন রিনরিন শব্দে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখি বেয়ারা এসে শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপর খাবার গুছিয়ে দিচ্ছে; প্লেট, বাটি কাঁটা চামচের ঠোকাঠুকির শব্দ। বহু বিচিত্র পদের প্রচুর আয়োজন। বসে গেলাম।

বেশ ঝরঝরে বোধ হচ্ছে। একটা ছোট রিভলভিং বইয়ের র‍্যাক রয়েছে ঘরের একদিকে। ঘুরিয়ে দেখি কয়েকটা বাংলা ইংরাজী বইয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের একখন্ড রয়েছে। একটু আগ্রহভরেই পাতা ওলটাতে ওলটাতে দেখি 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটাও রয়েছে তার মধ্যে। বের করে নিলাম বইটা। গুরুভোজনের পর একটা আলস্যভাব এসেছে, বইটা হাতে করে শুয়ে পড়লাম। আগ্রহভরে প্রায় সমস্তটাই শেষ করে এনেছি, তারপর কখন ঘুম এসে গেছে বুঝতে পারিনি, উঠলাম যখন বিকাল গড়িয়ে গেছে। আকাশে সূর্যাস্তের শেষ রশ্মির আলো।

বুকটা হঠাৎ ছ্যাৎ করে উঠল। তখনই মনে পড়ে গেল, এমন কিছু নয়; ভেবেছিলাম বাড়িটার একবার সমস্তটা দেখে নিলে হয়। সন্ধ্যা হয়ে গেলে হবে না।

এই সময় বেয়ারা চা নিয়ে এল। খেয়ে নিয়ে উঠে পড়লাম। দেখলাম আমার এদিকটাই ফিটফাট, তারপরই সদ্য খানিক ঝাড়া মোছা হলেও, পাশ থেকেই অগোছাল,

অপরিচ্ছন্ন। বিশেষ করে পুরোনো আমলের প্রাসাদ, জানালা ঘুলঘুলির এমন ব্যবস্থা যে আলো বড়ই কম। দু-একটা ঘর পেরুতেই আকাশের আলো যেন ফুরিয়ে গেল। এই সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার হোল ; উপরো উপরি দুটোই বলতে পারি—একটা খুব মিহি বেহালার ছড়ের টানের মতো আওয়াজ। কোথা থেকে উঠল, ঠিক করবার জন্যে কান খাড়া করি, আর নেই। ধোঁকাই নিশ্চয়। এগুতে, হল ঘরটায় এসে পড়লাম। বড় বলেই একটু আলো আছে। আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো, তবে সবই পুরানো এবং ঝাড়ামোছাও নয়। আমি পেরিয়ে ওদিকে যাব, একটা মানুষপ্রমাণ আরশি দেয়ালে টাঙানো, বা গাঁথা রয়েছে মনে হোল, আমার ছায়ার সঙ্গে আমার পাশেই যেন আর একজন কার ছায়া পড়েছে। আমি তাড়াতাড়ি ছেঁড়া কার্পেটের ওপর দিয়ে দুটো ঘর পেরিয়ে ওদিকের বারান্দায় চলে গিয়ে রেলিঙের পাশে দাঁড়ালাম। বুকটা ধক ধক করছে।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে ; আলো স্বচ্ছ বাতাস। দৃষ্টিভ্রমই। মনটা সুস্থির হয়ে আসতে তার কারণটাও বোঝা গেল। এই রকম পরিত্যক্ত বাড়িতে, দেখাশুনার অভাব পুরনো আয়নার পেছনকার পারা নষ্ট হয়ে এখানে ওখানে যে ছোপ ধরে যায়, তাতে দাগগুলো একত্র হয়ে কিছু একটা আকার নিয়ে এইরকম বিভ্রান্তি ঘটায়। এও তাই।

'এও তাই নিশ্চয়'—বলে ভ্রান্তিটা একরকম অপসারিত করলেও কিন্তু আর একবার হলঘরে ঢুকে সুনিশ্চিত হওয়ার উৎসাহ হোল না। দুটো কামরা ঘুরে অন্যদিক দিয়ে আমার আশ্রয়ের দিকে এগুলাম। যাওয়ার সময় উল্টোদিকে আবার একটু বেহালার ছড়ের টান, এবার তার সঙ্গে যেন চাপা ঘুঙুরের আওয়াজ। পা চালিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখি, লোকটি বারান্দায় দাঁড়িয়ে। বললে "আপনি রাত্রে কি খান জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম। আপনি নেই দেখে, কলিংবেল টিপে বেয়ারাকে দেখতে বলেছিলাম। আর সন্ধ্যে হয়ে এল, বেরুবেন? হ্যাঁ, কি মেনু বলুন তো—পোলাও, কি লুচি, কি..."

"ওসব কিছু নয়। খানচারেক রুটি, একটু ছোলার ডাল, একটা দেশী তরকারি, আর ..."

"বুঝেছি, আর বলতে হবে না। ঐ কম্বিনেশন। অস্ফুট, একটা কথা—উইথ ইওর লীভ (with your leave) কিছু কানে গেছে কি? প্রায় এই সময় থেকেই আরম্ভ হয় কিনা..."

"কৈ কিছু নাতো?" আমি চাপা দিয়ে দিলাম। কলিংবেল-নুপুরে বিভ্রান্তির কথাটা কি ভেবে আর বললাম না।

বললে—"গুড। কিছু না হলেই ভালো ; দু'দিনের গেস্ট আমরা। আচ্ছা আসি। ডিনারের ব্যবস্থা ক্যানসেল করে দিয়ে আবার অন্য রকম করতে হবে।"

উঠে আবার ঘুরে বলল—"ভেবেছিলাম পাশে একটা লোক বসিয়ে রাখি। তাহলে যেমন বলছেন, দরকার হবে না?"

বললাম—"পাগল ? লোক রাখবেন কেন ?"

চলে গেলে বারান্দাতেই একটু পায়চারি করলাম। নদী থেকে বেশ একটা ঝিরঝিরে হাওয়া উঠে আসছে ; একটু গা সিরসির করে, অথচ বেশ মিষ্টি, মন থেকে এতক্ষণের গ্লানি যেন মুছে দিল। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এল। আর একটু বাইরে থেকে আমি ভেতরে এসে বাতিটা জ্বেলে দিলাম। বেশ কড়া বাল্ব দিয়েছে, ভেতর বাহির আলোয় আলো হয়ে উঠল।

কিন্তু কি করা যায় একা একা ? খালি মাথাতেই তো যত উপদ্রব। নজর পড়ে গেল আবার বাইরের র‍্যাকটার ওপর। গল্পগুচ্ছের পাশেই নীল জ্যাকেট মোড়া 'টেনিশন'। মনটা লাফিয়ে উঠল, টেনিশন আমার প্রিয় কবি। তখন 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর একটু ছেড়ে গিয়েছিল। প্রথমে মনে হোল, আগে ওটুকু শেষ করে নিই। তারপর মাথায় একটা আইডিয়া এল—হয়তো ক্ষুধিত পাষাণ পড়ার জন্যে অনুরূপ পরিবেশের জন্যই আমার বিভ্রান্তিটুকু ঘটে গেল। বরং টেনিশন দিয়ে চাপা দিয়ে দিই।

একটু হাসিও পেল ; আর যাই হোক, লোকটির বেশ জ্ঞান আছে মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে। যা সব ঘটছে বলল, সেগুলোকে আরও ফুটিয়ে ঘোরালো করার জন্য আলতোভাবে গল্পগুচ্ছ সাজিয়ে রাখা। আবার তার পাশেই টেনিশন। 'জীবন স্মৃতি'তে কবিগুরু লিখেছেন—বিলাত যাওয়ার আগে সতের বৎসর বয়সে যদিও টেনিশন বোঝবার ক্ষমতা ছিল না। তবু মেজদাদার বাসায় নির্জনে তার ঐ ছিল সম্বল, কি করে একটা সূক্ষ্ম অব্যক্ত আনন্দ পেতেন।

চমৎকার একটি আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে দুজনকে একত্র করে। সোফায় হেলান দিয়ে, পিঠে কুশন দিয়ে আমি আরাম করে বসলাম।

সূচী দেখে পছন্দমতো কবিতা বের করে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে দিলাম। প্রায় আধাআধি এসে তন্ময় হয়ে গেছি। হঠাৎ একটা চমক লাগার সঙ্গে দৃষ্টি বই থেকে উঠে গেল। কী যেন একটু বিপর্যয় ঘটে গেছে হঠাৎ স্তব্ধ পুরীটাতে। নূপুরের সিঞ্জিনী তুলে হলঘরের কাঠের সিঁড়ি ভেঙে দ্রুতপদে নেমে যাওয়ার শব্দ। কয়েক জোড়া চরণ থেকেই। সঙ্গে সঙ্গে চাপা কণ্ঠস্বর। কয়েকটা দ্রুত সেকেণ্ড—হাসি কি, আতঙ্ক, কি নিত্যদিনের সাধারণ জীবনের একটা কিছু বোঝবার আগেই গেল থেমে। কাঠ হয়ে বসে রইলাম। কলিংবেলের বিভ্রান্তি টেনে আনবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কেন জানি না, তাতে কোন স্বস্তি পেলাম না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক আর কিছু নয়। আমার মনটাও বইয়ে বসে এসেছে, আবার সেই কাণ্ড। এবার থেকে থেকে হয়েই চলল। সাবরমতীর হাওয়াটাও একটু সতেজ হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে যেন 'ক্ষুধিত পাষাণে'-এর ঘটনাগুলো জীবন্ত হয়ে উঠে, জীবন্ত হয়ে ওঠা বায়ুর সঙ্গে মিশে প্রেতলোকের একটা অভিনব খেলায় মেতে উঠেছে।

কান পেতে শুনতে গেলেই যায় থেমে। আমি আবার টেনিশনে মন বসাবার চেষ্টা করলাম।

বৃথা। মনে হচ্ছে, সুপ্তির বিস্মৃতি ছাড়া কোন উপায় নেই। উঠে কলিংবেলের সুইচটা টিপে দিলাম। বেয়ারা উপস্থিত হতে প্রশ্ন করলাম—"খানা তৈয়ারি হ্যায় ?" মাথা দোলাতে বললাম—"হাজির করো।"
এবার লোকটিও সঙ্গে এসে একটা চেয়ারে বসল। একটু এদিক-ওদিক গল্প জুড়ে দিল। সংক্ষিপ্ত আহার ; শেষ হয়ে গেলে একটু হাত কচলে বিনয়ের সঙ্গে বলল—"উইথ্ ইওর লীভ্ স্যার",·· ইয়ে—সেরকম কিছু দেখা, কি কানে শোনা···"
"কৈ কিছু না তো !" আমি উঠে পড়ে বললাম।
"তাহলে স্যার, এসবের আর একটা যে থিয়োরি আছে—কেউ পায়, কেউ পায় না—মন ঠিক এক পর্দায় বাঁধা না থাকলে। তাহলে কোন লোক বসিয়ে রাখবার দরকার হবে না ?
"কিছু না।" তাচ্ছিল্যভাবে কথাটা বলে আমি আঁচাতে চলে গেলাম বাথরুমে।
বেরিয়ে দেখি লোকটি চলে গেছে। বারান্দায় বেরিয়ে খানিকটা তাজা বাতাস বুকে পুরে নিয়ে ভেতরে চলে এলাম। নীল অল্প শক্তির বেডরুম ল্যাম্পটা জ্বেলে কড়া আলোটা নিবিয়ে দিয়ে পায়ের কাছে মোটা নরম সুজনীটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। বেশ ঘুম হয়েছিল। যতক্ষণ তন্দ্রার ঘোর, ততক্ষণ সেই বেহালার ছড়ের সূক্ষ্ম টান ঘুমপাড়ানি সুরেরই কাজ করে থাকবে। তারপর, কতক্ষণ পরে জ্ঞান নেই একেবারে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম, খাটটা হঠাৎ খটখটিয়ে নড়ে উঠেছে। দুটো ভুল হয়ে গিয়েছিল মনের চাঞ্চল্যে—শোবার সময় দেয়াল ঘড়িটা দেখা হয়নি, আর, ঘরের দরজাটাও বন্ধ করা হয়নি। উঠেই সেদিকে নজর যেতে মনে হোল কে একজন দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মেয়েছেলেই ; চুনরি-ঘাঘরার প্রান্তটা দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।
গা যেন অসাড় হয়ে আসছে। আরও দুটো ভুল হয়ে গেছে—প্রথম তো এই পরিবেশে নূতন করে 'ক্ষুধিত পাষাণ' পড়ে আর একটা একটু বেশিই—বারান্দায় একজন লোক বসিয়ে রাখতে মানা করা। সুজনী সরিয়ে উঠে কলিংবেলটা বাজাতে ছড়ের টানটা দমকা হাওয়ায় দোল খেয়ে একেবারে ঘাড়ে এসে পড়ল, আরো দ্বিগুণ হয়ে। আর তন্দ্রার সেই ঘুমপাড়ানি নয়। যেন কার অভিমানে ভরা ক্রন্দন—কেঁদেই চলেছে, আমার মনে শব্দের প্রতিধ্বনি জাগিয়ে, আমার পৌরুষের কাছে কাতর ভিক্ষা—"আমায় বাঁচাও, আমায় উদ্ধার করো এই অন্তহীন বন্দীদশা থেকে।"
কোথা থেকে কি হয়ে গেল, একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল আমার মনে—শান্ত, সংকল্পে দৃঢ়। আগেকার সব গ্লানি নেমে গিয়ে অনুভব করছি, মাথাটাও পরিষ্কার হয়ে এসেছে।···যাব। কাপুরুষের মতো গুটিয়ে বসে না থেকে, অশরীরী আহ্বান হলেও সেই অশরীরীর সম্মুখীন হতে হবে। যদি, লোকটি যেমন বলল, আর কিছু না হয়, মাত্র ইথারের কল্পনাই হয় তাহলে ইথারের দেহ থেকে এই দুরপনেয় অভিশাপ মুছে ফেলতে হবে। বিজ্ঞান এগুচ্ছে, অনুসন্ধান করলে একটা প্রতিকার পাওয়া যাবেই।

তুলার মাসনুদ আধারী ভদ্রলোকের মতো আমার অভিসারের প্রস্তুতি নয়। যেমন ছিলাম, খাট থেকে নেমে পড়ে এগুলাম। কোন দূতী নয়, ঘুড়ের টান অনুসন্ধান করে। কোথা থেকে উঠছে জানি না, তবে অবিরত সামনে থেকে আমার এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পথ দেখিয়ে। বহুদিনের কথা, বহু বৎসরই হয়ে গেল, শুক্লপক্ষ কি কৃষ্ণপক্ষ ছিল মনে নেই, তবে আকাশে পূর্ণচন্দ্র থাকলে ঘরের ভেতরে যেমন একটা আলোর আভা ছড়িয়ে থাকে সেই রকম অস্পষ্ট আলোতে এগিয়ে চলেছি আমি। চোখও আসছে সয়ে। অনেকক্ষণ এ-ঘর, এ-গলি সে-গলি ঘুরে এক সময় একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। বহু পঠনে পরিচিত সেই ঘর। একটা ঘননীল রেশমের পর্দা ঝুলছে! আমার ধমনীতে সব রক্ত যেন স্তিমিত হয়ে গেল! কতক্ষণ সংকল্প-সংশয়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না, এক সময় মনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে খুব সন্তর্পণে পর্দার একটুখানি সরিয়ে ভেতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। অবিকল 'ক্ষুধিত পাষাণে'-এর' সেই দৃশ্য—সেই মুক্ত কৃপাণ কোলে রেখে কাফ্রী খোজা, ওদিকে তক্তের ওপর সুসজ্জিতা আরব তরুণী। মনের চাঞ্চল্যে অস্পষ্ট আলোকে তার ঊর্ধ্বভাগ দেখা গেল না, তবে তক্তের ওপর লম্বিত স্ফীত জাফরাণ রঙের পায়জামার নীচে দুটি শুভ্র চরণ বেশ সুস্পষ্ট। পাশে কাঁচের আধারে আপেল-আঙুরগুচ্ছ আর সুরাপাত্রও স্পষ্টই।



চাকিতে সেটুকু চোখে পড়ল। পরক্ষণে কম্পিত হস্তে পর্দাটা আর একটু সরাতে গিয়ে ওপরের বালাগুলোর "ছিক" করে একটু শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাফ্রী খোজা চমকে জেগে উঠতে কৃপাণটা কোল থেকে পড়ে গেল ঝনাৎ করে। আমি সঙ্গে সঙ্গে পর্দা ছেড়ে পেছনে হটতে গিয়ে চিৎকার করে উঠলাম—কে আমায় পিছন থেকে জাপটে ধরেছে! ঘুরে দেখি, বেয়ারাটা। বলল—"ডরো মৎ সাহেব। সব ঝুট্ হ্যায়! বিলকুল ঝুট।"

হাত ধরে আস্তে আস্তে নিয়ে এল আমার ঘরে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শেষ রাত্রে একবার ঘুমটা ভেঙে যেতে শুনলাম—কে যেন ঐ কথা বলে বাড়ির চারিদিকে চক্কর দিয়ে ফিরছে—"সব ঝুট হ্যায়—তফাৎ যাও—তফাৎ যাও।" বেয়ারা নয়, তার গলাটা নরম। এ যেন চেঁচাতে চেঁচাতে রুক্ষ, কর্কশ হয়ে গেছে।

এর পর যখন উঠলাম, দিন অনেকখানি এগিয়ে গেছে, দেয়াল ঘড়িতে আটটা। দীর্ঘ নিদ্রায় বেশ সুস্থ সহজ বোধ করছি। রাত্রের সব অভিজ্ঞতা বড় অদ্ভুত মনে হচ্ছে, হাস্যকরই। নিছক একটা দুঃস্বপ্নই নয়তো! সব সেরেসুরে প্রস্তুত করে নিলাম নিজেকে।

৩

আমার রাতের রহস্য মিটে গিয়ে আগের দিনের রহস্য নিয়ে পড়লাম। এবার আরও জটিল এবং মর্মন্তুদ। অন্তত ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্যে তো বটেই।

প্রস্তুত হয়ে নিয়ে সুইচ টিপতে বেয়ারা এসে দাঁড়াল। লোকটা হিন্দী গুজরাটী মিশিয়ে কথা বলে, বিনীতভাবে জানায়, বার দুই এসেছিল, ঘুমুচ্ছি দেখে ফিরে গেছে।

বললাম—"ঠিক হ্যায়। ব্রেকফাস্ট। আওর সাহেবকা সেলাম দেও।"

আধাআধি খাওয়া হয়েছে। লোকটি এসে উপস্থিত হোল। টেবিলের পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলল, "বড্ড দেরি করে ফেলেছেন আজ স্যার। রাত্তিরে কোনরকম ডিসটারবেন্স · "

বেয়ারা নিশ্চয় বলেছে, আর লুকানো যায় না।

"হয়েছিল একটু। একটা স্বপ্ন দেখে।" একটু লঘুভাবে হাসলাম আমি। বললাম "যা এক আষাঢ়ে গল্প হাঁকিয়েছিলেন।"

তারপর সহজ কণ্ঠেই বললাম—"হ্যাঁ, যা বলছিলাম—আমার বিলটা নিয়ে আসুন।"

"আজই যাবেন স্যার?"

"হ্যাঁ। ক্যাম্প খুলে দিয়ে থাকবে। না থাকে ওঁরা করবেন কোন ব্যবস্থা। কিছু আলোচনা করার আছে সেশন শুরু হওয়ার আগে। দেরি হবে আপনার?"

ভদ্র তাগাদা হিসাবেই শেষেরটুকু জুড়ে দিলাম।

"যাঃ, একদিনের মামলা, দেরি কিসের?"

উঠে গেল। আমি আহার শেষ করে হাতমুখ ধুয়ে শোফায় বসেছি। বিলটা নিয়ে এসে পাশে বসল। একটা কুশন চেয়ার টেনে নিয়ে তার ওপর রেখে দিয়ে বলল—"এই যে স্যার, তাড়াতাড়িতে হয়তো কোনও আইটেম্ ছেড়ে গেল···তা থাকগে।"

চোখ বুলুতে গিয়ে চক্ষু স্থির। ইংরাজীতে লেখা, বাংলায় তর্জমা করে দিচ্ছি—

১।	সুসজ্জিত কক্ষ লাইট সমেত—একদিন	২৫·০০
২।	প্রাতরাশ—	১৫·০০
৩।	মধ্যাহ্নভোজন—	২০·০০
৪।	অপরাহ্ন চা—	১০·০০
৫।	প্রেতলোক কর্তৃক চিত্তবিনোদন—	১০০·০০
	মোট	১৭০·০০

অবাক হয়ে গেছি। শেষ দুটো আইটেম থেকে চোখ তুলতে পারছি না। একটু দেখে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম—"বেশ।...কিন্তু এই আইটেম তো বোঝা গেল না। Spirit world entertainment?"

"ঐ যে স্যার, যেটাকে আজকাল ইথারে ইমপ্রেশন্ বলে উড়িয়ে দিতে চাইছে। যার জন্যে আপনার স্বপ্ন, আর বেয়ারার আপনাকে ধরে সামলে নিয়ে আসা।"

"বুঝেছি। ঐ হোল আপনার চিত্তবিনোদন? কিন্তু তাতে এত খরচ কেন? প্রেতলোকে তাদের না আছে বাপের শ্রাদ্ধ, না আছে মেয়ের বিয়ে।" বিরক্তিটা চাপবার চেষ্টা করেও ব্যঙ্গের মধ্যে একটু বেরিয়েই গেল।

ঘাড়টা নামিয়ে নিয়ে চুপ করে বসে রইল। কি ভাবছে। যেন একটু লজ্জিত। আমিও আর কিছু না বলে চুপ করেই আছি, এক সময় মুখটা তুলে কুণ্ঠিতভাবে বলল—"তাহলে একটু ভেঙে বলি স্যার। যদি আশা দেন। ট্রেড সিক্রেট (Trade secret) কিন্তু।

"কিসের আশা, বলো।"



"গোড়াতেই বলেছি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট ক্যাপচার করবার জন্যে একটা কম্পানী ফ্লোট (float) করতে চাই। রবীন্দ্রনাথের নাম তো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। যদি গোটাকতক শেয়ার নিয়ে উৎসাহ দেন।"

"কিন্তু ট্রেড সিক্রেটের স্বরূপটা না জানতে পারলে কি করে হবে?"

"এক্ষুনি জানতে পারবেন স্যার।"

উৎসাহভরে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। একটু পরেই একটা ফুলস্ক্যাপ সাইজের বাঁধানো খাতা এনে চেয়ারের ওপর রেখে পাতা খুলে দিয়ে বলল—"এই দেখুন স্যার খরচের বহর। এর ওপর যৎসামান্য প্রফিটের মার্জিন রেখে বিলটা করেছি।"

আমায় বিলটা দেখতে দিয়ে নিজে সোফার গায়ে হেলান দিয়ে নেতিয়ে পড়ল।

ইংরাজীতেই বাংলা তর্জমা করে দিলাম—

১। আরব তরুণীর ভূমিকায় মিস্ হেনা হাজরা ফিল্ম স্টার, সানরাইজ ফিল্ম্‌স, আমেদাবাদ—৩০০·০০

২। কাফ্রী খোজা—লতিফ বেপ্‌রোয়া—২০০·০০

ঐ ঐ

৩। পাগলা মেহের—দৌলৎ আলি—১০০·০০

ঐ ঐ

৪। নেপথ্য সঙ্গীত—ধীরাজ চট্টরাজ—২০০·০০

ঐ ঐ

৫। ভাড়ায় সাজসজ্জা—৫০·০০

৬। আলোক—৫০·০০

মোট—৯০০·০০

এবার তালিকাটায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মনটা গুছিয়ে নিতে অনেকক্ষণ গেল। লোকটি সোফায় হেলান দিয়ে, কি ভেবে গুনগুন করে একটা সুর তুলতে যাচ্ছিল, "হুঁ।" বলে আমি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মাথা তুলতে, সোজা হয়ে বসল, ঘুরে বললাম—"দেখেছি, তোমার ট্রেড সিক্রেট।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আশা পেয়েছি বলে আপনাকেই দেখালাম। আর সবার বিজে শুধু খোলাখুলি ঐটুকুই থাকবে—স্পিরিট ওয়ার্লড এনটারটেনমেন্ট। কেমন বুঝছেন স্যার?"

"ভালোই।" বলে একটু হাসিও টেনে আনতে পারলাম ঠোঁটে ভগবান কৌতুকবোধটুকু দিয়ে এই রকম নিরুপায় পরিস্থিতিতে শেষরক্ষা করিয়ে দেন। যেখানে একটা হইচই ওঠানো যেত, একটু হেসেই বললাম—"দেখা যাচ্ছে, তাহলে বাড়িটা 'ক্ষুধিত পাষাণ' নয়, ক্ষুধিত পাষাণ আসলে হচ্ছেন…"

"কী যে লজ্জা দিচ্ছেন স্যার!" বাধা দিতে হাত কচলে বলল—"একটা আইডিয়া এল মনে—গল্পটার মস্ত বড় একটা ট্রেড পসিবিলিটি (Trade possibility) আছে… ইণ্টারন্যাশনাল…" 'ভালো আইডিয়া' একটু হাসি নিয়ে উঠে পড়লাম, "সুইচ টিপে বেয়ারাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে বলে দিন। বিলটা ক্লিয়ার করছি।"

ট্যাক্সিটা ছাড়বার সময় আবার মনে করিয়ে দিল—"ঐ শেয়ারের কথাটা স্যার…"

বললাম—"ভেবে দেখতে হবে বৈকি।"

একটি ছাতা ও একটুখানি বিবেক



বাসে ওঠার পর থেকেই মনটা বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে। মুখপাতে নিজের ওপরেই; বাসটা ছাড়তে যখন খেয়াল হোল, বর্ষাকাল, অথচ ছাতাটা ভুলে এসেছি। এরপর যা হোল তা এমন কিছু নূতন নয়। তবে মনের অপ্রসন্নতার জন্যই বরদাস্ত করা আরও শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। এক্সপ্রেস বাস, ব্যবস্থা অনুযায়ী এখান থেকে গন্তব্য স্থান পর্যন্ত এই কিঞ্চিদধিক শ'খানেক মাইলের মধ্যে মাত্র চারটি বিরতি, কিন্তু এক-চতুর্থাংশ না যেতে তিনটি হয়ে গেল। লোক উঠছে; এসব যাত্রীর সঙ্গে নাকি ড্রাইভার-কনডাকটারের অন্যরকম হিসাব; তাদেরও জানা, এঁদেরও জানা। ভিড় বেড়ে যাচ্ছে। আমার পক্ষে বিশেষ অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে, সময়ের এই অপব্যয়। একটা কাজের জন্য তাড়াতাড়ি পৌঁছান দরকার ব'লে নানা অসুবিধার মধ্যে ভোরের এই বাসটা ধরেছি; ছাতার ভুলটাও তার মধ্যে এসে পড়ে। হাত ঘড়ি উলটে দেখলাম, এর মধ্যেই মিনিট কুড়ি খুইয়েছি। এখনও সমস্ত পথ বাকি। তৃতীয়বারের পর আপত্তি

করতে চতুর্থবারের বেলা ড্রাইভার নেমে সামনের চাকাটায় কি ঠোকাঠুকি করল, যার জন্য আরও কিছু বেশিই সময় গেল। আবার উঠে বসতে বসতে আমার দিকে একবার আড়ে চেয়ে ছিল। সেটা ভাষায় রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায়, এর চেয়ে বড় অস্ত্র আছে তার হাতে। চুপ করে বসে রইলাম সামনের দিকে চেয়ে। সকালটা পরিষ্কার ছিল। পূব দিকে একটা মেঘ জমে উঠছে। ছাতায় মনটা দিয়ে বাসের কথা ভোলবার চেষ্টা করছি, ওদিক থেকে একটা বাস আসছিল, তার ড্রাইভার গতিবেগ একটু কমিয়ে গলা বাড়িয়ে খবর দিয়ে গেল—"সামনে ম্যাজিস্ট্রেট চেকিং হ্যায়।"

অবৈধ ফালতু যাত্রীদের নামানো, তারপর একটা চৌমাথায় ছোট স্টপে পেঁছে ম্যাজিস্ট্রেট চেকিং—আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক গেল।

এরপর, অতিরিক্ত ভিড়ের চাপেই সামনের একটা চাকার হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে গাড়ি খানিকটা একপেশে হয়ে গিয়ে প্রায় এক্সিডেন্ট করে ফেলেছিল, কোনরকমে সামলে গেল। তবে যাত্রীদের নামিয়ে চাকা খুলে অন্য চাকা পরাতে, তাদের আবার উঠে নিজের নিজের জায়গা নিতে এবার সময় গেল আরও বেশি।

নিয়মিত তিনটে স্টপ পেরিয়ে যখন চতুর্থ, অর্থাৎ মাঝখানের শেষ স্টপে এসে পেঁছলাম, তখন প্রায় ঘণ্টা দুয়েক বিলম্ব হয়ে গেছে। এটা তিনটে "রুটের" জংশন, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা বড় প্রাঙ্গণের মধ্যে। তার ভেতর অফিস, চা আর খাবারের দোকান, হাত-পা ধোওয়ার ব্যবস্থা, সব রয়েছে। এরপরেই আমার বাসের শেষ ডিপো, যেখানে যাচ্ছি। তবে কাছে নয়, প্রায় পঞ্চাশ মাইলের মাথায়।

মাঝে কয়েক পশলা বৃষ্টি হোল। ঝাপটায় কিছু কিছু ভিজতে হোল; এতে ছাতার কথাটা জেগে জেগে উঠে মনটাকে বেশ একটু ঐদিকেই টেনে রাখতে লাগল একরকম করে।

এখানে এসে মন-মেজাজ একটু গুছিয়ে নেওয়ার কথা মনে হোল। ঠিক ছিল, যেখানে যাচ্ছি সেখানেই দিনের আহারটা সারব। তার সময় থাকবে। এখন, এ বাসের যেমন মতিগতি দেখছি, ঘণ্টা-দুই তো গেলই, বাকি পথটায় আরও কত টেনে নেয় বলা যায় না। এখানে বিরতিটাও একটু বেশি হবে। হোটেল নেই, তবে খাবারের দোকানটা, চায়ের স্টলটা ভদ্রগোছের ব'লেই মনে হয়। বোধহয় বাস কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানেই। স্টেট বাস।

গুছিয়ে নেব কি, এখানেই মেজাজ গেল আরও বিগড়ে।

বেশ একটু ভিড় নামল। বেশ তাড়াহুড়োও, গাড়িটা লেট যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি মুখে হাতে জল দিয়ে এক কাপ চা চেয়ে নিয়ে টেবিলে বসলাম। স্টলের চা যেমন হয়। চুমুক দিতে দিতে মনে হোল, কখন পেঁছাব, ক্ষিদেও বেশ পেয়েছে। অন্তত একটু ভালো করে খাবারটা খেয়ে নিই। মনে পড়ল বিশেষ ক'রে, সামনে একটা কড়ায় টাটকা বড়বড় সিঙাড়া ভাজতে দেখে। লাল হয়ে উঠেছে। চারটের অর্ডার দিয়ে দিলাম। গামলায় বড়বড় রসগোল্লা ভাসছে, তারও তিনটে। সিঙাড়ায় কামড় দিতেই

বুঝলাম টাটকা নয়। বাসি সিঙাড়া আবার নতুন ক'রে ভাজছে, ভেতরের আলুগুলো টকে গেছে। বুঝলাম, অমন মন ভোলানো লালচে ভাব দু'বার ক'রে ভাজার জন্যই। মাথায় আগুন ধ'রে গেছে। ডান দিকে একটু তাকাতে দোকানদার মালিক একটা টেবিলে বাক্স রেখে খদ্দেরের সঙ্গে লেনদেন করছিল। সিঙাড়াগুলো চেপে রাখতে একবার আড়চোখে চেয়ে নিল। আমি তখন ঠিক ক'রেই ফেলেছি, তবু মনে হোল রসগোল্লাটাও পরখ ক'রে দেখে নিই। ভালো থাকে, এ বিভুঁইয়ে আর গোলমালের মধ্যে যাব না। বাসে হর্ণ দিয়েছে বৃষ্টি নামবারও লক্ষণ।

রসগোল্লা বোধহয় দু'দিনের পচা। শোনা ছিল, এরা বাজারের দোকান থেকে খারাপ মাল নিয়ে এসে ভিড় আর তাড়াহুড়ার সুযোগে চালিয়ে দেয় অনেক সময়।
আর একটা হর্ণ। টেবিলের সামনের লোকও মাত্র একজন দাঁড়িয়ে। আমার কিন্তু জিদ ধ'রে গেছে তখন। হর্ণ, যাত্রীরাও তাড়াহুড়া করে প্রায় সবাই উঠে গেছে, আমি একটু চেপে বসেই বললাম—"পচা খাবার আপনি যাত্রীদের খাওয়াচ্ছেন। নিশ্চয় কর্পোরেশনের সঙ্গে কনট্রাক্ট করা দোকান, কমপ্লেন্ট বুক (Complaint book) আছে, বের করুন, আমি লিখে রাখব। রসগোল্লা তো একেবারে পচা।"
"পোচা বলছেন আপনি।"—চোখ কপালে তুলল লোকটা। গোলগোল ভাঁটার মতো চোখ, নিখুঁৎ অভিনয়ের জন্যই যেন তৈরী। হাঁক দিল—"আরে ভজুয়া!"
খদ্দের নেই, এদিকে আমি ঐভাবে চেপে ব'সে আছি, ছোঁড়াটা কখন সটকে পড়ে গা ঢাকা দিয়েছে; দোকানের ওদিক থেকে বেরিয়ে এল।
"তুমকো না হাম্ ভোজ্‌কা রসগুল্লা পোখরামে ডাল্ দেনে বোলাথা? যাও, আভি সব ফেঁকো।"
ক্রোধের অভিনয়ও নিখুঁৎ। তারপর আবার আমার দিকে চেয়েও—
পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বয়স হবে। বেশ বড় একটি, ভুঁড়ি, চোখের কথা বলেছিই; যেমন বিস্ময়ে, তেমনি ক্রোধে, অমনি আবার ক্রোধ ঠাণ্ডা করে দিতেও। অপরাধীর সলজ্জ এবং সনম্র হাসির ভাব ফুটিয়ে বেশ বাঁচুমাচু হয়ে বলল, বাংলাতেই বলল—"একঠো ভোজের ফরমাইস্ ছিল বাবু। বর্ষার লিয়ে বরিয়াতির লোক সোবাই এলোনা তাদের। তাই জন্যে সোব মাল লিলে না জাহান্নামিরা। এ-হারামজাদাকে পুকুরে ফেলে দিতে বললুম—আমারও ভোজ খেয়ে তবিয়ৎ খারাপ ছিল, দেরিতে এসেছি..."
ঘন ঘন দু'টো হর্ণ দিল; এদের সঙ্গে যোগাযোগ তো থাকেই। ঠিক এই সময় ঝিরঝির করে বৃষ্টিও নামল।
মন ঠিক না ভিজলেও, সত্য মিথ্যা যাই হোক একটা যুক্তি তো, ওদিকে নিজেকেও দেখতে হয়, কনডাকটার হাঁকছে, চাকাও একটু ঘুরেছে বাসের, দু'দিক বজায় রেখে, তারই মধ্যে খানিকটা রোয়াবস্ত দেখিয়ে উঠে পড়তে পড়তে বললাম—"ওসব ঢের শোনা আছে। আপনি কমপ্লেন্ট বুক বের করলেন না। ইংরিজী হিন্দী কাগজ আছে, গিয়েই আপনাদের কাণ্ড সব..."

"হুজুর, আপনাকোর ছাতা ?"
"আনিনি।"—ব'লেই তাড়াতাড়ি নেমে পড়ব, 'হাঁ-হাঁ' ক'রে উঠল—'তাকি হোয় ?···আরে ভজুয়া, জলদি ছাতাঠো নিকাল দে বাবুকে।"
ভজুয়া িয়ে আসতে বললাম—"পেঁাছে দিয়ে আয় বাসে।"
"আরে, না, না, লিয়ে যান বাবু। নেমে জরুরৎ হবে।"
"আর, তোমার ?"—প্রশ্ন করলাম।
"ছোড়িয়ে দিন আমার কথা। সোন্দায় ফিরবেন, দিয়ে যাবেন। না ফিরেন তো ক্ষতি না আছে।"
তাগাদা, হর্ণ, চাকাও আবার ঘুরেছে। একটু ধমকই দিল ওদের লোকটা—"আরে ঠহরিয়ে সাহেব। দেখতে নেহি কোন হ্যায় ?"—দেখছ না মানুষটা কে হচ্ছে ?
বেশ জোরে বৃষ্টি নামল। কিন্তু জলের ঝাপটায় ভিজে, কিছু ওর শেষের এই সাড়ম্বর পরিচয়ে ভিজে, ওখানকার আক্রোশের অনেকখানিই ওখানে নামিয়ে উঠে এসে নিজের সীটে বসলাম।



আমার এ কাহিনী আসলে কিন্তু বাস-যাত্রার দুর্ভোগ দুর্গতি নিয়ে নয়। ও তো একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা, কমবেশি করে ; বাসে একবার উঠলে হোল কিছুক্ষণের জন্য। আমি বলছি ছাতাটার কথা, ওর শুভাগমন হোল কি ক'রে সেইটুকু বলতেই বাসের অবতারণা। আজ চার মাস রয়েছে আমার কাছে। না, আত্মসাৎ করিনি। বরং বলা যায় ওই আমার আত্মসাৎ করেছে। এর মধ্যে ক'বার ফিরিয়ে দেওয়ার কাছাকাছি এসেছি, কিন্তু পারিনি। কিছু একটা হয়ে যাচ্ছে, ভালোর দিকেও, আবার মন্দর দিকেও। ছাতা, হারাবার জিনিস বলেই জানতাম। একটা ছাতা উল্টে একটা মানুষকে যে ছিনেজোঁকের মতো কামড়ে থাকতে পারে এরকম অভিজ্ঞতা পূর্বে কখনও আর হয়নি। পরের ছাতা, মাঝে মাঝে উৎকট বিবেকদংশন, হাতছাড়া কিন্তু কোন মতেই করতে পারছি না ; হ'তে চাইছে না বললেই বোধ হয় অবস্থাটার সঠিক বিবরণ হয়।
নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ব্যাপারটা আলোচনা করতে গিয়ে যে কথাটা সবচেয়ে প্রথমে আমার মনে উদয় হোল তা এই যে, লোকটা আমায় ঘুষ খাওয়াল। ঐ যে বললাম, কম্‌প্লেন্ট বুক না দিক, আমি দৈনিক কাগজগুলোয় লেখালেখি করব ব্যাপারটা নিয়ে, সেই

জন্যই। যদি আমায় বৃষ্টি থেকে বাঁচাবারই ইচ্ছা ছিল তো, যেমন বললাম, ছোঁড়াটাকে সঙ্গে দিয়ে বাস পর্যন্ত পেঁছে দিলেই তো যথেষ্ট হোত, এরপর নামবার সময় কি অবস্থায় নামব তা নিয়ে ওর এত মাথাব্যথা কেন যে, অপরিচিত মানুষ, কবে আবার ফিরব না ফিরব, হঠাৎ এমন দাতব্য করে বসল। একটা বাজে বাঁশের বাঁটের ছাতা হলেও কথা ছিল, দিব্য প্ল্যাসটিকের মুঠি দেওয়া প্রায় নূতন একটা ছাতা।

বৃষ্টি জোরে নেমেছে, বন্ধ জানলাগুলো ঝাপসা হ'য়ে গিয়ে মনটা বেশি রকম অন্তমু'খী হ'য়ে উঠায় ঐ একটি চিন্তাই তার সমস্তটুকু জুড়ে রয়েছে। একটা ভালো কাজ করতে যাচ্ছিলাম; পচা-বাসি জিনিস খাইয়ে, পথের মাঝে কত লোকের বিপদ ঘটাচ্ছে—কত শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন—যতটুকু পারলাম, প্রতিশোধ করা যেত, লিখে রেখে কর্তাদের নোটিসে এনে; লোকটা উলটে চাল দিয়ে বন্ধ করল। গাড়ির বিলম্বের সুযোগ নিয়ে দুটো বানানো মিষ্ট কথা বলে। নিশ্চয় বাঁধা বুলি— কাদের ফরমাস ছিল, পুরো বরযাত্রী এলো না—ছোঁড়াটাকে পুকুরে ফেলে দিতে বলেছিল বাসি মাল। ভুলে গেলাম সংকল্প। অথচ, অথচ তিনটে রুটের জংশনে, অনেক বাস যায় এখান থেকে। বিলম্ব হয়েছে, না হয় আর একটু হোতই।

এরপর; খবরের কাগজেও যাতে না লিখি তার জন্য ছাতাটা সুযোগ বুঝে দিল গছিয়ে। হাতে করে নিলাম। ঘুষ!

অবশ্য, ছাতা কিন্তু আত্মসাৎ করছি না আমি, ফিরিয়েই দেব, প্রথম সুযোগেই। তবু যেন কোথায় কি করে একটু বাধছে। বিবেক, কি দুর্বলতা, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ছাতাটা জানলার গায়ে ঝুলিয়ে রেখেছি। যতই ওদিকে না চেয়ে মনটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি, ততই নজর ওর ওপর গিয়ে পড়ে, ওকে কেন্দ্র করে চিন্তাটা জটিল হয়ে উঠছে।

সমস্ত জটিলতা ছিন্ন করে, সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে যা' হক একটা সংকল্পে উপস্থিত হওয়া দরকার হয়ে পড়েছে, নয়তো এই চুলচেরা বিবেক নিয়ে থাকতে গেলে এ অশান্তি কাটবে না। আর যতই বিলম্ব করব ততই এই চুলচেরা বিচারের হাতে গিয়ে পড়তে হবে। আমি ঠিক করে ফেললাম। সবচেয়ে আগে এই কাজ, টাটকা-টাটকি। খবরের কাগজের আফিসটা বাস ডিপোর থেকে বেশী দূরে নয়। এত দেরী হয়েছে, না হয় আরও একটু হবে।

নেমে আমি একটা ট্যাক্সি করে সোজা চলে গেলাম। সম্পাদকের সঙ্গে ভালোরকম জানা-শোনা আছে।

যেতেই একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলেন—"হঠাৎ এই অসময়ে—এরকম আলু-থালু বেশে?"

"আরে মশাই, দুর্ভোগের কথা।"

"দু'মিনিট। পাশের ঘরে এ্যাসিস্টেণ্টকে একটা কথা বলে আসছি—প্রেসে মেটার যাচ্ছে।" তখনই ফিরে এসে বললেন—"বলুন, কি করতে পারি।"

এর মধ্যেই কিন্তু আমার সংকল্প শিথিল হয়ে গেছে, বিবেকের একটি প্রশ্নে—"লোকটার ছাতা ফিরিয়ে দেওয়ার আগে কি তার বিরুদ্ধে লেখা ঠিক হবে ?"

অতি-সূক্ষ্ম একটু দ্বিধা। বললাম—"আলুথালু বেশের আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে ? বাস থেকে এই নামলাম, দু'ঘণ্টার ওপর লেট। এদিকে একটু কাজ ছিল, ভাবলাম বলে যাই আপনাকে। একটা বেশ কড়া করে..."

"লিখছি তো মাঝে মাঝে। টাইমের ঠিক নেই, তার ওপর চিঠি আসছে—হোটেল-ক্যাণ্টিনগুলোতে এন্তার পচা-বাসি চালাচ্ছে..."

ছাতাটা একটা হুকে টাঙিয়ে রেখেছি, নজর গিয়ে পড়ল, যেন টেনে নিলে নজর ; বললাম—"অতটা অভিজ্ঞতা এখনও হয়নি, বোধহয় লোক বুঝে টাটকা-বাসির ব্যবস্থা। হোক, একটু দেখবেন। ভাবলাম, এদিক দিয়ে যখন যাচ্ছি, একটু বলেই যাই। আবার আসব পরে। নমস্কার।"

বিস্মিত হয়ে পড়েছি নিজের আচরণে। যা করতে গেলাম তা তো হোলই না, উলটে লোকটার স্বপক্ষেই খানিকটা বলে এলাম। যেন মুখ দিয়ে বেরিয়েই গেল কথাগুলো। আর আশ্চর্য, যেই না ছাতাটার ওপর নজর পড়া। ঘুষ আর কাকে বলে ? তাহলে, এত যে ঠেলে রাখবার চেষ্টা করছি, সেটা কি মনকে শুধু চোখ ঠারা ? আসলে আরও অন্তরের সঙ্গে ওটাকে গ্রহণ করা ?

বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি না পাওয়ায় একটা রিকশা করতে হোল। বাড়িতে আসতে অনেকখানি পথ। বৃষ্টিটা মাঝে বেশ ধরে গিয়েছিল, কিছুটা আসতে প্রবল বেগে আবার নামল। ছাতাটা খুব কাজ দিল। খুলে সামনেটা আড়াল করে না ধরলে ভিজে নেয়ে যেতে হোত। একটু কৃতজ্ঞতা এসেই পড়ে—মনে হোল, চিঠিটা লিখে এলে অন্যায়ই হোত।

আরও কিছু উপকারই করে কৃতজ্ঞতার গল্পটা ভারি করল পাল্লাটা। কিন্তু যত কৃতজ্ঞতা ততই এদিকে দ্বন্দ্ব—একটা ঘুষকেই তো ক্রমে যেন বেশি করে আমল দেওয়া হচ্ছে না ? স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে না ?

দিতেই হবে ফিরিয়ে।

একটা কাজ এসে পড়ে বাড়ি ফিরতে দিন পাঁচেক দেরি হয়ে গেল। উপকার দিচ্ছে, তবু মনে হচ্ছে এ-ছাতার সঙ্গে আরও পাঁচটা দিন কাটাতে হলে পাগল হয়ে যাব।

ভাবলাম ঐ বাসের ড্রাইভার বা কনডাকটারকে দিয়ে পাঠিয়ে দিই ছাতাটা দোকানীকে। বাসটা তিনটের সময় এদিক থেকে ছাড়ে। বাজারে কিছু কাজও ছিল ঐ পথেই।

কনডাকটারকে বললাম ; লোকটা আমায় সেদিন ছাতা নিয়ে আসতে দেখেছিল। খুব আগ্রহের সঙ্গে রাজী হোল। এত বেশি আগ্রহের সঙ্গে যে মনটা খুঁৎখুঁৎই করতে

লাগল। তবু ঠিক করেই ফেললাম, দেব। বললাম, "তাহলে আমি এক্ষুণি একটা বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে তোমায় দিয়ে দিচ্ছি।"

তিন কোয়ার্টারটাইম দেরি রয়েছে বাসের তখন। বাজার কাছেই।

কিনলাম একটা ছাতা। তারপর আরও কিছু জিনিস, কয়েকটা দোকান ঘুরে, তাড়াতাড়ি করতে হোল। গোটা চারেক ছোট বড় প্যাকেট হোল, আর কাগজের খোলে পাক দিয়ে রাখা নূতন ছাতাটা। একটা ট্যাক্সি পেয়ে গিয়ে উঠে পড়লাম।

এরপর যা হোল তাকে এমন অস্বাভাবিক কিছু বলা যায় না। একটা ছাতারই হিসাব রাখতে পারিনি কখনও, কত যে হারিয়েছি! যখন বাস ডিপোয় পেঁছুলাম—ঝিরঝির করে বৃষ্টিও পড়ছে—নেমে দেখি ট্যাক্সির পিঠের কাছে রাখা প্যাকেটগুলোর মধ্যে নূতন ছাতাটা নেই। কয়েকটা দোকান ঘুরেছি তাড়াহুড়োর মধ্যে, ভিড়ও ছিল, কোন দোকানে সে ছেড়ে গেছে মনেও পড়বার কথা নয়।

একটু সান্ত্বনা রইল, গেছে তো নিজেরটাই গেছে ওরটা তো যায়নি।

তার পাশে একটা ক্ষোভও, গেলে অন্তত অব্যাহতি পাওয়া যেত।

পাঁচ দিন পরে যখন যাত্রা করলাম, বেশ একটা স্বস্তি অনুভব করছি, এ-ছাতার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ টেনেটুনে আরও হোল ঘণ্টা দুয়েক। তারপর ফিরে গিয়েই কাগজে একখানি চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া।

বৃষ্টি ক'দিন থেকেই বন্ধ; পেঁছে সোজা ছাতা নিয়ে নেমে পড়লামও। তারপর দোকানের দিকে পা বাড়াব, নিজের ভেতর থেকেই একটা প্রশ্ন—"ছাতাটা ফেরাতে যাচ্ছি কেন?"

এত অপ্রত্যাশিত আর নূতন ধরণের যে, শুধু থমকেই গেলাম না, দোকানের আড়াল হয়ে বাসের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর নিজের সঙ্গেই নিজের যেন তর্ক লেগে যায়—

বললাম—"ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছি ওর ছাতা বলে।"

—"ওর ছাতা' কে বললে একথা? একটা মানুষ নিজের ছাতা এত দামী, আজকালকার বাজারে বোধহয় পনেরো ষোল টাকার কম হয় না—দাতব্য ক'রে দেবে? ছাতা হারিয়ে ফেলারই জিনিস, কেউ ফেলে গেছে, তোমার দিয়ে মুখ বন্ধ করলে।"

—"বেশ তো সে লোকটার হাতে গিয়ে আবার পেঁছাবে।"

—"জোর ক'রে বলতে পারলে পেঁছাবেই? পচা মাল বিক্রী ক'রে পয়সা করেছে যে মানুষ সে অত সাধু হয়ে উঠবে?"

ডিপো থেকে বেরুবার পর এই প্রথম বিরতি, অল্পক্ষণই; বাস ছাড়ার হর্ণ দিল। একসঙ্গে দুবার; অল্প বিরতি জানি। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলাম। ছাতা দেওয়া হোল না।

কিন্তু আত্মবিতর্কটাও তো সম্পূর্ণ হয়নি। লোকটা যার ছাতা সে এসে চাইলে যদি নাই ফিরিয়ে দেয়, বলে, দোকানে ভিড় থাকেই, কে নিয়ে গেছে কি ক'রে বলবে—তাহলে সে ওর বিবেক, ও জানে, আমি নিজে কেন পরিষ্কার থাকব না?

আরও অনেক কিছুই হতে পারে। হয়তো লোকটা সত্যই ওরকম নয়। আমি মনের বিরক্তিতে, রাগের বশে গোড়া থেকেই একটা ধারণা গড়ে নিয়েছি, নয়তো ও যা বলল—ভোজের ফরমাস, বরযাত্রী কম আসা—সত্যও তো হ'তে পারে তা? হয়তো ছোঁড়াটারই দোষ। দিতে বলেছিল পুকুরে ফেলে, দেয়নি। কিংবা নিজেই লাভ করবার জন্যে মালিক ভাঁড়ি:য় কিছু ফেলে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল টাটকার সঙ্গে, আমার ভাগ্যে পচাই পড়েছেল। কামড় দিয়েছিলাম তো একটাতেই; আর দুটো যে ছিল পচা একথাই বা কি ক'রে বলতে পারি?
বাসেই আরম্ভ হয়েছিল যুক্তিগুলো, তারপর সময়ের দূরত্বে যেমন হয়ে থাকে, এগুলোই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল, ওর সদ্ব্যবহারের কথাই বড় হয়ে উঠে একটা অন্য ধরণের অশান্তিতে ভরে উঠতে লাগল মনটা।

সে দ্বন্দ্বও কেটে গেছে। মাস দুয়েকের পর আবার ঐ পথে আসি। ছাতা নিয়েই। দিয়ে দেব। বিশেষ দরকার না থাকলেও চায়ের সঙ্গে গোটা-চারেক রসগোল্লাও অর্ডার দিতে হবে। কেমন যেন লোকটার স্বপক্ষেই প্রমাণ সংগ্রহ করতে ইচ্ছা করছে। ছাতাটা ফিরিয়ে দিয়ে বলতে ইচ্ছা করছে—সেবারে খুব উপকার করেছিলেন। আরও দুটো কথা বাড়ি:য়।
একটা লোকের সম্বন্ধে অন্যায় চিন্তা করাটাও তার প্রতি অবিচারই।
দোকানে গিয়ে দেখি বাক্সর সামনে সে নয়, অন্য লোক। বেচে ও অন্য একটা ছেলে।
এদিক-ওদিক একটু খোঁজ নিতে জানা গেল, বাসি-পচা বেচবার অনুযোগে লোকটাকে চুক্তি বাতিল ক'রে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শালা-ভগ্নীপতি দুজনকেই। ঐ সম্বন্ধই ছিল দু'জনের মধ্যে।
যাক, চুকে গেল ব্যাপারটা, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। একটু অনুশোচনা, আমার এই দুর্বৃত্ত দমনে কোন হাত রইল না।
তাও যাক। উপস্থিত সমস্যা, আমি এ ছাতার থেকে কি ক'রে পরিত্রাণ পাই?
ছাতা হারাবার ব্যাপারে আমি একক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এত ছাতা হারিয়েছি জীবনে নিজের আর অপরের নিয়ে যে, একত্র করলে একটা দোকান খোলা যেত। কিন্তু এই একটা ছাতা সম্বন্ধে মনটা এত সতর্ক এত সজাগ যে হাজার চেষ্টা করেও কোন মতে কাছছাড়া করতে পারছি না!
চোখের বাইরে সরিয়ে রাখবার জন্য কয়েকটা ছাতা একের পর এক ক'রে কিনলাম, হারিয়ে গিয়ে আবার এই ছাতাকেই টেনে বের করাচ্ছে।
একটা আতঙ্কেরই সৃষ্টি হয়ে গেছে।
এও যেন স্বর্গোদ্যানে আদম ইভের অরিজিন্যাল সিনের (Original Sin) মতো হয়ে দাঁড়াল; একবার দুর্বল মুহূর্তে পা পিছলে আর কোনমতেই সামলানো যাচ্ছে না।



সেই দিনটি

রায়গিন্নি এসে সভয়েই আরম্ভ করলেন—"হ্যাঁগা বান্‌, এ আবার কি শুনেছি, জামাই নাকি থাকতে পারছেন না!"

বন্দনা ভাঁড়ার ঘরে ছিল, বেরিয়ে এসে বলল—"হ্যাঁ মাসিমা, বলছিল, ট্যুরে যাওয়ার অর্ডার বেরিয়েছে, মাসিমাকে বোল, এবার যেন কোন ব্যবস্থা না করেন। আমি হাতের পাটটুকু সেরে বলতেই যাচ্ছিলাম, বলল—আপিসের কাজ..."

"ওমা কী অলুক্ষুণে কথা জামাইষষ্ঠী আগে, না আপিস আগে।"—রায়গিন্নি শিউরে উঠে বারান্দার বেঞ্চটাতে বসতে বসতে ব'লে চললেন—"আপিস হোল তিনশ' প'য়ষট্টি দিনের ব্যাপার, জামাইষষ্ঠী একটা দিন। সেই জামাইষষ্ঠী ছেড়ে আপিসের ট্যুরে বেরিয়ে যেতে হবে? ছিষ্টিছাড়া কথা যে মা! না, ও হবে না। আজ একমাস ধরে তোমার মেসোমশাই হয়রান হচ্ছে—কোথায় বেলডাঙার সোনামুগের ডাল, কোথায় দেরাদুনের চাল—পোলাওয়ের জন্যে, পোড়া দেশে পাওয়া তো যায় না, কাল ওদের যতীন কলকাতা থেকে আসছে, তাকে ভীমনাগের সন্দেশ আর মগরার দই আনতে লিখে দেওয়া হয়েছে—অমনি বর্ধমানে নেমে ভেতরে গিয়ে সীতেভোগ..."

বন্দনা হেসে ফেলল, বলল—"ওসব তোমার মেয়ের ভোগেই আছে মাসিমা, এখন থেকেই মুখে জল আসছে.."

"তুই হাস্‌ছিস্‌ বান্‌, কিন্তু আমার মনে যে কী হচ্ছে শুনে অব্‌ধি। ধুতি-চাদর, জামার,

কাপড়, জুতো-মোজা সব কেনা হয়ে গেছে, তোর মেসোমশাই নিজে ঘুরে ঘুরে বাজার-হাটকে পছন্দ ক'রে কিনেছে, এখন ছেলে বলে কিনা আমি ট্যুরে চললাম, নিকুচি করেছে এমন আদাড়ে ট্যুরের।"

"কি করবে মাসিমা, পরের দাস..."

"ছুটি নিক্।"

"শ্বশুর মারা গেলেন, অনেক ছুটি নেওয়া হ'য়ে গেছে...।"

"বেশ, না দিতে চায় ছুটি, এবার বলুক মাস্-শাশুড়ি মারা গেছে। অশৌচ অবস্থায় তো কাজ করতে পারে না। কেরেস্তান নয় তো বাছা যে জামার ওপর একটা কালো পটি বেঁধে সারা দুনিয়া এক ক'রে বেড়াবে।... না বানু, এই বাড়িতে আমি বারো বছর ধরে জামাইষষ্ঠী ক'রে আসছি, আপিস কোন্ ছার, পৃথিবী উল্টে গেলেও আমি জামাই-ষষ্ঠী ছাড়তে পারব না। জামাই এলে তুমি বুঝিয়ে বোলো। আপিস না শোনে আমি নিজে গিয়ে পৌঁছুব। দরকার পড়লে আমি চাকর সংগে ক'রে...হাট-বাজার করা মেয়ে বাছা, আমার আটকাবে না..."

হেসে ফেলল আবার বন্দনা। এবার মুখে মুঠোটা চেপে।

"তুই হাসছিস মা, আমার কিন্তু যা হচ্ছে ..?"

"ও মাসিমা, এইমাত্র যে কাল্ হ'য়ে অশৌচের ব্যবস্থা করলেন।"

একটু অপ্রতিভভাবে রায়গিন্নিও হেসে ফেললেন। তারপর ওর কথাই ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন—"সে তো আরও ভালোই হবে, ভূত হয়ে সবার ঘাড় মটকাতে গেছি..."

দুজনেরই হাসির মধ্যে আদিত্য চাকরের সংগে দৈনিক কাঁচা-বাজার নিয়ে ঢুকল। পুরণো চাকের বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক, রায়গিন্নি জামাইয়ের সামনাসামনি হ'য়ে কথা বলায় অভ্যস্ত নয়। আদিত্য ঢুকতেই মাথার কাপড়টা কপালের মাঝামাঝি টেনে দিয়ে একটু গলা নামিয়ে বন্দনাকে উদ্দেশ্য করেই বললেন—"না বানু, তুমি জামাইকে বুঝিয়ে বলবে, নইলে ভরাডুবি হব আমি।"

সম্পর্কে কেউই নয়, অথচ বন্দনারা এসেছে পর্যন্ত এই দু'বছর ধ'রে মেয়ে আর জামাই; উপরি পাওনা একটি নাতনীও রয়েছে, আদরের পুতুলি, স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই।

পাশাপাশি দুটি ফ্ল্যাটবাড়ী। দুখানি ক'রে ঘর, একটি ছোট রান্নাঘর, ছোট ভাঁড়ার ঘর, স্নানাগার ইত্যাদি। একটি ছোট উঠোনও আছে। স্বামী-স্ত্রী, গুটি দুই ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, এক কথায় ফ্যামিলী-প্ল্যানিং-এর মতো একটি ছোট-খাটো সংসারের বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যায়। রায়গিন্নি যে বারো বছরের কথা বললেন, এই বারো বছরে এসেছেও সেই ধরণেরই পরিবার। দুই বৎসর ছিল অনাদি, তার স্ত্রী আর মা, রায়গিন্নিরই সমবয়সী। মেয়ে, জামাই, তার ওপর আবার বেয়ান, খুব জমেছিল দুটো বছর। জামাই-এর সম্পর্ক ঐ একটি দিন, জামাইষষ্ঠীর দিন, তবে ঐ

একটি দিনই সমস্ত বৎসরটাকে স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধার সূত্রে গ্রথিত ক'রে রাখত। তারপর থেকে মেয়ে-জামাই বদল হলেও এই সম্পর্ক যাতে না ছিন্ন হয়ে পড়ে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এসেছেন দু'জনে। বিশেষ ক'রে গৃহিনী। কর্তা বেটাছেলে, তাঁর যেটুকু সতর্কতা তা গৃহিণীর মুখ চেয়েই অনেকটা, যদিও একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়ে জামাইষষ্ঠীর দিন যতই এগিয়ে আসতে থাকে তাঁর মনটাও ভিতরে ভিতরে আনচান করতে থাকে, কি ক'রে দিনটিকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে, গৃহিণীর মনের মতো ক'রে। সতর্কতার একটা অঙ্গ এই যে, এক ভাড়াটে ছেড়ে যাচ্ছে জানতে পারলেই বাড়িওলার থেকে ওঁদেরই মাথা-ব্যথা পড়ে বেশী। দুজন বুড়োবুড়ি কিম্বা ওঁদের বয়সের হলেও তো চলবে না। তাদের মেয়ে-জামাই থাকলেও না। তারা তাদের জামাই অপরকে ধার দিতে যাবে কেন?

এ-ছাড়া পাঞ্জাবী আছে, মাদ্রাজী আছে, তাদের সংগে অত গলাগলি চলবে না, জামাই করা তো দূরের কথা।



এত বেছে বেছে ভাড়াটে মেয়ে-জামাই এনে তোলায় নানা অসুবিধা। কর্তাকেই বেশী খোঁজ রাখতে হয়, ঘোরাঘুরি করতে হয়, তবে রায়গিন্নিরও দুর্ভোগ কম যায় না, সে দুর্ভোগের মধ্যে বার-দুই বাড়িওলাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুষ দিতে হয়েছে, একবার পনেরো দিনের ভাড়া, আর একবার পুরো একমাসের।

দীনেশ জামাই হঠাৎ বদলি হয়ে উঠে গেল। শহর জায়গা, বাড়ীরই অভাব, ভাড়াটের অভাব নেই, একজন মাদ্রাজী মুখিয়েই ছিল, রায়গিন্নি নিজের মানুষই আসছে, নিজেই নিয়ে রাখছেন বাড়ি বলে কিছু আসবাবপত্র ঢুকিয়ে দখলে রাখলেন বাড়ি। একমাস পরে অপূর্ব-জামাইকে পাওয়া গেল। টাকাটা গচ্ছা দিতে হোল রায়গিন্নিকে। অপূর্ব চারটে জামাইষষ্ঠী সামলে দিয়ে গেল। নিজে, স্ত্রী অরুণা, কখনও এক বিধবা পিসি, কখনও মা; দেশে বড় সংসার পারাপারি করে থাকতেন এসে দুজনে।

একেবারে শেষে মাস চারেক তাঁরাও না আসতে পারায় রায়গিন্নিই দেখা-শোনা করেন।

তাদের গল্পই করছিলেন রায়গিন্নি বন্দনার সঙ্গে।

ট্যুরটা দুটোদিন পেছিয়ে দিতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি আদিত্যকে।

কাল জামাইষষ্ঠী। রাত্তিরের রান্নাবান্না সকাল সকাল সেরে তারই জোগাড় করছিলেন রায়গিন্নি। বন্দনা রয়েছে। চার বছরের মেয়ে সুষমাও বারান্দার একপাশে জামাই-ষষ্ঠীর আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত। মা—দিদুর চেয়ে বেশিই ব্যস্ত, কেন না এঁরা তবু দুজন, সে আবার একা মানুষ। দুটি বেশ বড় বড় ডলপুতুল—মেয়ে আর জামাই আদায় করেছে রায়গিন্নির কাছ থেকে, নইলে তার ছেলে আদিত্যকে জামাইষষ্ঠীর জামাই হতে দেবে না, ঘরে বন্ধ করে রাখবে তালাচাবি দিয়ে।

নিজের মনেই বিড়বিড় করে বকার সংগে মেয়ে-জামাইয়ের সাজ-গোজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে।

রায়গিন্নীর কালকের কুটনো কোটা শেষ হয়ে গেছে। নিতান্ত কম নয়, পাশাপাশি ক'জন মেয়ে-বৌকেও বলেন রায়গিন্নি, যাদের নিজের বাড়িতে জামাইষষ্ঠীর হ্যাঙ্গাম নেই। রান্নার ব্যবস্থা মোটামুটি সেরে মিষ্টির আয়োজন করছেন। কলকাতা-বর্ধমান থেকে যা সব আসবার এসে গেছে, বাড়িতে হবে ক্ষীরের ছাঁচ আর চন্দ্রপুলি। ভাঁড়ার ঘরের সামনে একটা কুরুনি হাঁটুতে চেপে নারকেল কুরছে বন্দনা, রায়গিন্নি কড়ায় শুকনো খোওয়া তৈরী করছেন। সংগে সংগে গল্পও চলছে—

"··তাই বলছিলাম মা, দেখলাম তো কম নয়—এই জামাইষষ্ঠী নিয়েই ভালোমন্দ কতরকম মানুষ। তোদের নিয়ে হোলও তো পাঁচ ঘর—দীনেশ, অপূর্ব, অভয়, ষষ্ঠীচরণ আর এই তোরা। কেউ দুই কেউ চার কেউ আড়াই, কেউ মাত্তোর মাস-ছয়েক এই ক'রে বারো বচ্ছর হ'য়ে গেল। তোরা এসেছিস, আবার কতদিনের মেয়াদ কে জানে বাছা। যেমন আমার মন্দ কপাল, যারাই না এসেছে ভাড়াটে হ'য়ে তাদের সবারই বদলির চাকরি। তা একরকম মন্দই বা কি বলু, অনেকের সংগেই তো পরচে হোল। আর, বলতে নেই, ঠিক মনের মতনটি না হ'লে কেমন যেন মনও উঠে যায় বাছা, মনে হয় একটু নতুন জল নামুক দরিয়ায়, হয় না মনে?—বলুনা তুই।···এই তোরা এসেছিস, খুঁজতেও হয় নি। 'বাড়ী খালি আছে?' বলে জামাই এসে দাঁড়ালেন, তারপর থেকে যতই দিন যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন ভগবান নিজে ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন পাঠিয়ে।···না, বাছা, আর সুখ্যেৎ করব না, ন্যাজ মোটা হ'য়ে যাবে···"

হাতনাড়া বন্ধ ক'রে একটু হেসেই খুন্তিটা তুলে নেন রায়গিন্নি। তখনই হয়তো মন্তব্যের মধ্যে জামাইও এসে পড়তে হুঁস হওয়ায় বলেন—"তা তোদের কি বলছি নাকি—না, বলার সম্বন্ধ? আমার বলার মানুষ রয়েছে বলেই বলছি।···দেখনা, কেমন ক'রে সব আদায় ক'রে নিলে। বলি, হ্যাঁ বেয়ান, তোমার বাসনা পুরল না, বাকি আছে এখনও?"

শেষের ক'টা কথা সুমনাকে লক্ষ্য ক'রে বলা, সেও ব্যস্ততার মধ্যে হাত থামিয়ে ঘুরে বলল—"আমাল মেয়ে-জামাইয়ের একছেট্ খাট-পালং চাই।"

একেবারে ফুকরে হেসে উঠলেন দু'জনে। বন্দনা তার মাঝেই বলল—"নিন, খুব বেছে বেছে বেয়ান ক'রেছেন, সামলান এখন!"

হাসির তোড়টা সামলে আবার খুন্তি নাড়তে নাড়তে রায়গিন্নি আরম্ভ করলেন—"এ শিশু, যেমনটি দেখে-শোনে তেমনি বলে, ওর কি দোষ? তবে ষষ্ঠীচরণ, তোদের আগে যারা গেল, তার সেই কোন্ সাতপুরুষের মাস-শাশুড়ী—তা ঠিক কি এইরকম তার খাঁই হ'তে হয় মা—দাঁও বুঝে! তবে বলি তোকে তার কথা, দিব্যি মনে করিয়ে দিয়েছে ক্ষুদে বেয়ান।"

খোওয়াটা হয়ে গেছে। কড়া নামিয়ে জুড়োতে দিয়ে পিঁড়ের ঘুরে বসলেন রায়গিন্নি, বলে চললেন—"অথচ নিজের মাস-শাশুড়ী নয়—দূর সম্পর্কের কে। অম্বুলে রুগী, একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে সারতে এসেছে। কাঁকলাসের মতন চেহারা খিটখিটে মাগি, আর কি মতলববাজ। যেদিন শুনল আমার কাছে, মেয়ে বলেছি কাতুকে—কাতু বৌটার নাম—ইচ্ছেটা জামাইষষ্ঠী করব ষষ্ঠীচরণকে দিয়ে, সেইদিন থেকে বায়নক্কা শুরু ক'রে দিলে—'আমার নিজের জামাই, ষষ্ঠীর দিন এগিয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম, এখন আপনি বলেছেন আপনার ঠ্যাকা পড়েছে, লোক পাচ্ছেন না—তা দেখি ষষ্ঠীকে ব'লে ..."

"শুধু ভাঁওতা মা বানু। তিনকুলে কেউ নেই. পরকে আপন ক'রে নিয়ে প'ড়ে আছেন, উনি করবেন জামাইষষ্ঠী। ছেলে, বৌ ঐ শতকে খোওয়ারী—সব একরকম মা! ষষ্ঠীচরণের মা, যে নাকি গোড়ায় দিনকতক এখানে থেকে গুছিয়ে-গাছিয়ে দিয়ে যায়—মানুষটি বেশ সাদাসিদে ছিল। সে চ'লে যেতে এ মাগির ওসকানি পেয়ে একটু একটু করে ছেলে-বৌও নিজমূর্তি ধরতে লাগল। আমিও তিতিবিরক্ত হয়ে এলাকাড়ি দিলাম মা। এই তখন, একেবারেই বেহাত হয়ে যায় দেখে নরম হয়ে এল। তিনজনেই। তবু আদায় করলে-বৈকি, ট্রানজিস্টার থেকে শুরু করেছিল, আমি দেখলাম, একেবারে খালি যায় বছরটা, একট ব্রতর মতনই দাঁড়িয়ে গেছে তো, একটা হাতঘড়িতে এসে রক্ষা হোল..."

বন্দনা মাথা নীচু ক'রে নিয়ে বলল—"আমিও এবার আপনার জামাইকে দোব উস্‌কে, আজকাল সবার স্কুটার গাড়ীর ওপর ঝোঁক হয়েছে..."

"দ্যাখো মতলব বেটির!—খিল খিল ক'রে হেসে উঠলেন রায়গিন্নি। বললেন—'তা তুমি পার, নইলে অমন ধুর্ত্ত মেয়ে গর্ভে ধরো?...তা হ্যাঁরে সুমু—ক্ষুদে বেয়ান, তোর জামাই আর কিছু বায়না ধরেছে না যে। পেছনে ওসকাবার লোক যেমন।"

"আমাল জামাই তন্দ্রপুলি খাবে, খিল দাও নারকোল দাও"

ও'র বলার আগে নিজের মনেই উঠে পড়েছিল সুমনা। ফ্রক দোলাতে দোলাতে গটগট্ ক'রে এসে হাত পাতল। দুজনেই আবার সজোরে হেসে উঠলেন।

খানিকটা ওর কথাই চলল—"কী মেয়ে হয়েচে দ্যাখ দিকিন্ মা বানু—না, কালেরই ধম্ম!..." একটু ক্ষীর আর নারকেল কুরো একটা ডিশে তুলে দিয়ে বললেন—"যা, জামাইকে কিন্তু বলবি, অত আবদার নয়..."
"ঘুঁটেল ঘরে বন্ধ ক'রে দোব।"
—বাপ-মার কাছে শুনে শুনে যে কথাটা অভ্যাস হয়ে গেছে।
এবার জামাইয়ের দুর্দশার কথায় দুজনে একেবারে দুলে দুলে হেসে উঠলেন।



আজকের পাট হয়ে গেছে। কালকে ঝি এলে তাকে দিয়ে নারকেলের কুরটুকু পিষিয়ে নিয়ে চন্দ্রপুলি, তার সঙ্গে ক্ষীরের ছাঁচ। সব গুছিয়ে তুলতে তুলতে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"কী যেন বলছিলাম?"
"বলছিলেন কালের ধর্ম"
—বন্দনা জুগিয়ে দিল।
"না বাছা, দীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাক—ছেলে হোক, মেয়ে হোক, ঢেলে দিক, তেমনি বুঝে নিক নিজের পাওনা-গণ্ডা। আর, তোদের মেয়ে, সে কি ষষ্ঠীচরণের সেই কোন্ সাতপুরুষের মাসির মতন অত চশমখোর হতে পারে গা?......খোরাটা কোথায় রাখলাম আবার?..."
"এই যে।" পাশের একটা ঝুড়ির আড়ালে ছিল, এগিয়ে দিল বন্দনা।
"দ্যাখো ভীমরতি, এক্ষুনি নিজেই রাখলাম।"
আরও অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন যেন।
তারপর চুপ করে থেকেই আরও ছোটখাটো ভুল করতে করতে খোরায় ক্ষীরটুকু তুলে রাখবার মধ্যে একবার মুখটা তুলে বললেন—"দিয়েছিলেন মা বানু এ পোড়া কপালীকেও দিয়েছিলেন, কিন্তু দুটো বছরও কোলে ধরে রাখতে পারিনি, এই ষষ্ঠীতে তার ঠিক বাইশ বছরে..."
—একটা দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে কথাটা মিলিয়ে দিয়ে রান্নাগিন্নি বাঁ হাতে আঁচল তুলে নিয়ে চোখ মুছলেন। কবে, কোন্ মায়ের ঘটা করে জামাইষষ্ঠী করা দেখে সাধটা মনে উঠে এই বারো বৎসর ধরে মেয়ের নামে একবার করে চোখের জল মুছে যাচ্ছেন।



দেবী নারদ সংবাদ

আবার দেবাসুরের মধ্যে সংগ্রাম বাধবার উপক্রম হয়েছে। দেবতারা নিরতিশয় উদ্বিগ্ন। এবার উদ্বেগের একটা বিশেষ কারণ, অসুরেরা সংগ্রাম বাধাবার সময়টা বেছে নিয়েছে খুব সূক্ষ্ম বিচারের সঙ্গে। দেবী শারদীয়া পুজা গ্রহণের জন্য সপরিবারে মর্ত্যে গমন করেছেন। দেবতাদের নিজের শক্তি কতটা অনেকবারই তার পরীক্ষা হয়ে গেছে। দেবীহীন স্বর্গকে এই ক'টা দিনেই আয়ত্তে এনে ফেলতে মোটেই বেগ পেতে হবে না অসুরদের।

দৈত্যপুরী থেকে রণপ্রস্তুতির হুঙ্কার ভেসে আসছে মাঝে মাঝে, ইন্দ্র-বন্দ্র-বরুণ প্রভৃতি দেবতারা ভীত হয়ে বৈকুণ্ঠে নারায়ণ সমীপে এসে উপস্থিত হলেন। নারায়ণ নিশ্চিন্ত আরামে লক্ষ্মীর পদসেবা উপভোগ করছিলেন। চিন্তিত হয়ে নারদকে স্মরণ করলেন। নারদ যথারীতি বীণাবাদনের সঙ্গে হরি গুণ গান করতে করতে এসে উপস্থিত হলে বললেন—"ভক্তবর, তোমায় এখন আমার গুণকীর্তন থামিয়ে ঝটিতি মর্ত্যে গিয়ে দেবীকে ডেকে আনতে হবে। কঠিন কাজ; পিত্রালয় তার সঙ্গে পুজা—দু'টিতেই স্ত্রীজাতির অতিরিক্ত লোভ; তুমি ছাড়া আর কারুর দ্বারা হবে না। অবিলম্বে অবতরণ করো মর্ত্যধামে। সময় নেই আর আদৌ।"

"যথা আজ্ঞা প্রভু"—বলে লক্ষ্মী নারায়ণ উভয়কে প্রণাম করে নারদ বিদায় হলেন।

পৃথিবীতে পূজার বিরাট আয়োজন; ঘণ্টা কংস ঢক্কানিনাদের জন্য কান পাতা যায় না, তার সঙ্গে মর্ত্যের ভাষায় 'লাউড স্পীকার' নামে রুদ্র নিনাদি এক যন্ত্র যোগ দিয়ে আরও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। আলোক সজ্জার দিকেও একটা উগ্রতা দৃষ্টিকে সাহায্য করার চেয়ে বরং অনেক ক্ষেত্রে চক্ষুপীড়ারই কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক দিন পরে মর্ত্যলোকে এসে একটা নূতন পরিবেশের মধ্যে পড়ে নিশ্চয় আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, এইরূপ মনে করে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে দেবীর সান্নিধ্য লাভের জন্য প্রয়াস করতে লাগলেন মুনিবর। কিন্তু দেবী কোথায়?

মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরলেন নারদ। মণ্ডপে মণ্ডপে মণ্ডপারণ্য সপ্তমী-অষ্টমী শেষে নবমী আগতপ্রায়, ওদিকে অসুরদের কার্যকলাপের দিকে মনটা পড়ে রয়েছে; ব্যর্থ অন্বেষণে মন ক্লান্ত, অবসন্ন, স্বীয় দৌত্যের বিফলতা সম্বন্ধে নারায়ণকে অবহিত করাই প্রয়োজন মনে করে ফিরেই যাচ্ছিলেন নারদ—অবস্থা বুঝে তিনি যদি কোন ব্যবস্থা করতে পারেন, মণ্ডপারণ্য ছাড়িয়ে একটি শান্ত পরিবেশের মধ্যে এসে মনে হোল এখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে মনের গ্লানি কিছুটা নামিয়ে যাত্রা করলেই যেন ভালো হয়। তারপরেই দূরাগত কংস-ঘণ্টা-ঢক্কার স্তিমিত শব্দে মনে হোল এখানেও বোধ হয় দেবীর পূজার আয়োজন। বর্তমান পূজায় একটা অতেঙ্কের মতোই হয়ে গেছে, তবু শেষ চেষ্টা হিসাবে অগ্রসর হলেন। অল্প একটু অগ্রসর হতেই মনে হোল যেন তাঁর যাত্রা এতক্ষণে সফল হয়েছে। শান্ত পরিবেশটিকে অনাড়ম্বর শ্রদ্ধাসূত্রে পূজার আয়োজনে আরও স্নিগ্ধ করে নিয়ে দেবীর সন্ধ্যারতি হচ্ছে। ঋজু মেরুদণ্ড পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপ আবর্তিত করছেন সপরিবারে দেবীর মঞ্চের সম্মুখে, চারিদিকে ভক্ত পূজকের দল শ্রদ্ধাদীপ্ত অপার্থিব দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দেবীর দীপ্ত আননের দিকে।

ভক্তপ্রবর নারদকে দেখে মৃন্ময়ীর মুখে প্রসন্নতা ফুটে উঠল।

দেবীকে পেয়ে গেছেন নারদ। নিশ্চিন্ত মনে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে আরতি দর্শন করতে লাগলেন।

তারপর পূজা শেষে স্বীয় দৌত্যের উদ্দেশ্য নিবেদন করলেন চরণে প্রণিপাত করে। দেবলোকে সমূহ বিপদ, তাঁকে সব ছেড়ে গিয়ে আবার সদ্য সদ্য অসুর নিধনে উদ্যোগী হতে হবে। দেবতারা সবাই দিশাহারা হয়ে তাঁর প্রতীক্ষা করছেন।

প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গে শিরস্পর্শ করে মুনিবরকে আশীর্বাদ করে দেবী বললেন, "বৎস, আমি সবই অবগত আছি। পূজায় লুব্ধ হয়ে আমি পূজাগ্রহণেই সমস্ত চৈতন্য কেন্দ্রীভূত করে রাখি তো সৃষ্টি থাকে না। তুমি বহু মণ্ডপে বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে পূজার বিকৃত রূপ দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরেছ, কিন্তু আমি সেখানেও আছি ভক্ত হৃদয়ের মধ্যে দেবলোকে তো আছিই। সুতরাং দেবতাদের এতটা উদ্বেগ নিরর্থক।

নারদ বললেন, "তুমি যে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত একথা কে না জানে মা। তবু বিপদ যখন আসন্ন আশু প্রতিকারের প্রয়োজন তখন তোমার প্রত্যক্ষ বর্তমানতা প্রয়োজন হয়েই

পড়ে। দেবতাগণের পক্ষে নারায়ণ সেই-জন্যই আমায় পাঠিয়েছেন। আমি এখন ফিরে গেলে সেখানে মুখ দেখাব কি করে বলেন ?"

দেবী স্মিত হাস্যের সঙ্গে বললেন—"তোমার কথাটা যথার্থই বৎস। আমার সব শক্তি আত্মস্থ করে আমায় আবার রণচণ্ডী রূপে নামতে হবে। তবে, এটাও তো বুঝতে পার, কাল নবমী পূজা শেষ না হলে আমার এ স্থান থেকে সম্পূর্ণ ভাবে অন্তর্হিত হওয়ার কোন উপায় নেই।"

"কেন মা ? এত বিপদেও………"

দেবীর শান্ত, প্রসন্ন দৃষ্টি মণ্ডপটা একবার ঘুরে এল। বললেন—"বৎস, তুমি মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে এসেও এরূপ প্রশ্ন করছ ? ভক্ত হৃদয়েই আমার স্থান! আড়ম্বর নেই, কিন্তু এখানেই যে আমার প্রকৃত পূজা এটা তোমার মতো ভক্তের অজ্ঞাতে থাকা………"

"আর লজ্জা দিও না মা।' বাধা দিয়ে বললেন নারদ ; প্রশ্ন করলেন—"কিন্তু উপায় কি মা ? সেও তো তোমাকেই বলে দিতে হবে।"

এবার দেবীর ওষ্ঠাধরে একটি অন্য ধরণের স্মিত হাস্য ধীরে ধীরে ফুটে উঠল—চটুল, রহস্যময়। বললেন—"বৎস, যুদ্ধবিগ্রহে কুটনীতিরও আশ্রয় নিতে হয়। আমি কল্যকার পূজা শেষ হলেই বিজয়াকে নিয়ে দৈত্য বিজয়ে অবতীর্ণ হব। ইতিমধ্যে তুমি তোমার নিজের শক্তি খানিকটা কাজে লাগাও…"

"আমার শক্তি মা।……অধম ভক্তকে।………"

দেবীর ওষ্ঠাধরের স্মিত হাস্য এবার একটি প্রসন্ন কৌতুকে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। নারদের শিরস্পর্শ করে স্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—"হ্যাঁ তোমার শক্তি! কলহ বিবাদ সৃষ্টিতে তোমার মতো আর কে আছে ? তুমি ছদ্মবেশে দৈত্য শিবিরে প্রবেশ করে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করো গিয়ে। আমার আশীর্বাদে তুমি হবেই সফল।"

এর পরে আবার মায়ের দৃষ্টি ঘুরে এসে স্নিগ্ধ কারুণ্যে পূর্ণ হয়ে এল। বললেন—"নারায়ণাদি দেবতাদের বোল, আমার সব শক্তিই আছে, শুধু দীন ভক্তের আড়ম্বরহীন অর্পিত ভক্তিপূত পূজা—নিশ্চয় ছেড়ে যাওয়ার শক্তি নেই। যাও, তাঁরা বুঝবেন।"



আমোদ

ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকিয়া জমিদার হরকিঙ্কর রায় বললেন, "প্রসন্নকুমারকে আপনি ডেকে নিন, আর উচ্চশিক্ষার উচ্চ আশাটি ছেড়ে দিন"—একটি দীর্ঘপত্র তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত করিয়া তাহার খানিকটা অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিলেন, "পড়ুন এখানটা" ও সঙ্গে সঙ্গে হস্তপদাদি গুটাইয়া বসিয়া রহিলেন।

প্রদর্শিত অংশটুকু পড়া শেষ হইলে চিঠিখানি মুড়িয়া ও তদ্দারা কপালে দুই-তিনবার আঘাত করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "এই কপাল, কপাল ; আমি চেষ্টা করলে কি হবে, হর? তা তুমি যখন এতদূর ঠেলেঠুলে আনলে তখন পাশটা করিয়ে দাও, না হলে তোমারও পণ্ডশ্রম। তারপরে টেরী বাগিয়ে সিগরেট্ খেয়ে যা খুসি তাই ক'রে মরুগগে। বলে—'কপালে লিখিতংধাতা"—

রায় মহাশয় কথায় জোর দিবার নিমিত্ত জাজিমের উপর নখ দিয়া একটা অর্দ্ধচন্দ্র টানিয়া বলিলেন, "আর একটি পয়সা আমা হতে হবে না ঠাকুরমশায়, কড়ি দিয়ে উঞ্ছবৃত্তি বাড়ানো রায়বংশের কুষ্ঠিতে লেখেনি। আপনি ডেকে নিন ; এখনও জাতব্যবসায় লাগান। না হয়, পারেন—পড়ান, সে কথাও মন্দ নয়।"

'সে কথা মন্দ' না হইলেও হরকিঙ্করকে টেক্কা দিয়া 'সে কথা' কার্য্যে পরিণত করার

বিপদ্ ভট্টাচার্য্য মহাশয় চিন্তা করিয়া বলিলেন—"তবে তাই হোক্, যাই একটা চিঠি লিখে দিতে। নিজের পায়ে কুড়ুল মার্‌লে, আমি আর কি কর্‌ব ?"

তল্পী-তল্পা সমেত বাড়ী আসিয়া প্রসন্নকুমার যখন পিতাকে প্রণাম করিল, তিনি আশীর্বাদের বিনিময়ে তাহার মাথাটা ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন ও সেথায় হাল্‌ফ্যাশানের কোন পরিচয় না পাইলেও চৈতন্যের অন্তর্দ্ধান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফাস্টো কেলাসে টিকি মানায় না, না বাবা ?"

প্রসন্ন কোনপ্রকার উত্তর করিতে সাহস করিল না। তারু নাপিত হাজির ছিলই, প্রসন্ন কাপড়-চোপড় ছাড়িলে, সে ভট্টাচার্য্যের আদেশমত গোক্ষুরপ্রমাণ একগোছা টিকি মাথার মাঝখানে ছাড়িয়া বাকিটা বেশ করিয়া কামাইয়া দিল। প্রসন্ন একবার মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কিরে" ?

তারু নাপিত বলিল, "বুঝতে পারছিনে, তোমার মাথার টিকি কোথায় দাদা-ঠাকুর ?"

প্রসন্ন গলাটা আরও নামাইয়া বলিল, "বাবাকে বলিস নে ; বিশু দুষ্টুমি করে কেটে দিয়েছে। আমি ঘুমিয়ে ছিলুম আর—" তারু বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের বিশ্বম্ভর ? রায় মশায়ের ছেলে ?"

প্রসন্ন বলিল, "আবার কে ?"

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রসন্নর আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, তাহার পাঠ জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। সকলের মূলে যে বিশ্বম্ভর তাহাও তাহার জানিতে ও বুঝিতে দেরী লাগিল না। সন্ধ্যা হইতে ইতঃস্তত করিতে-করিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আহারাদির পর প্রয়োজনমত সাহস সঞ্চয় করিয়া প্রসন্ন বলিল, "বাবা আমার তো কোন দোষ নেই। বিশু নিজে ফেল করে ৩।৪ জন মিলে আমার পেছনে লেগেছে।" পিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া সে পুনরায় বলিল, "এ একটা বছর আমি ছেলে পড়িয়ে চালিয়ে নেব না হয়।"

পিতা তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "জমিদারের সঙ্গে টেক্কা দেয় কি বাবা ? বাপ্-পিতেমো যা করে এসেছে তাই করো। আর দুঃখ করে কি হবে ?"

অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত বইগুলোকে বুকে চাপিয়া প্রসন্ন ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল।

পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রসন্নকে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠতে হইল। প্রাতঃকৃত্যের বর্দ্ধিত কলেবর ফর্দ্দটি সমাপন করিতে প্রায় ৭টা বাজিয়া গেল। তাহার পর দাওয়ার উপর কুশাসন পাতিয়া তাহাকে 'পুরোহিত-দর্পণে'র গোড়ার বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করিতে হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় উঠিয়া গেলে, সে পা টিপিয়া টিপিয়া দুয়ার পর্য্যন্ত গমন করিল এবং তিনি অনেকটা দূরে চলিয়া গেলে ঘরের মধ্যে গিয়া তাহার অতীতের

পাঠ্যপুস্তকগুলিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া অসীম বাৎসল্যের সহিত থাকে থাকে গুছাইয়া সিন্দুকে ভরিতে লাগিল। দু-একটা মলাটের উপর কয়েক বিন্দু অশ্রু যখন চেষ্টা সত্ত্বেও ঝরিয়া পড়িল, তখন আর সেখানে তিষ্ঠান তাহার দায় হইয়া উঠিল। বাবার আসিবার সময় হইয়া আসিয়াছিল। চক্ষের সমস্ত জল টিপিয়া বাহির করিয়া চক্ষু দুইটা ভাল করিয়া মুছিয়া সে আসনের উপর বসিয়া 'পুরোহিত দর্পণ' হইতে পড়িতে লাগিল, "ওঁ গজেন্দ্রবদনম্ চারুচন্দ্রানি ভাননম"...।

পঞ্চম দিবসের পড়া ধরিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় উৎসাহভরে পত্নীকে বলিলেন, "গিন্নি, এই পূর্ণিমায় রায়বাড়ীর সত্যনারায়ণ পুজো পরশা করবে; লোককে বলতে হবে—'হ্যাঁ নারাণ ভট্টাচার্য্যের পৌত্র বটে।"

পূর্ণিমায় রায়বাড়ীর সত্যনারায়ণ পূজার পুরোহিত প্রসন্নই হইল। বিপুল উৎসাহভরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুত্রের বর্দ্ধিত শিখায় একটী সপুষ্প গ্রন্থি দিয়া তাহার উর্দ্ধাঙ্গ বিধিমত চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া দিলেন।



পুজার দালানের এক কোণে বিশ্বম্ভর ও তাহার বন্ধুদ্বয় কর্ত্তার অগোচরে থাকিয়া বেজায় চাপা হাসি শুরু করিয়া দিয়াছিল। হাসিতে হাসিতে বিশ্বম্ভরের গায়ে গড়াইয়া সত্যেন বলিল, "আমি ভাবছি, কবেই বা ওর টিকি-গাছটা গজাল, কবেই বা বড় হলো, আর কবেই বা পত্রে পুষ্পে সুশোভিত হয়ে উঠল।"

হাসির মধ্যে তাহার পিঠে এক চাপড় কষিয়া বিশ্বম্ভ বলিল, "দূরে পাষণ্ড, তবে আর ব্রহ্মতেজ বলি কাকে?" ইহাতে হাসির মাত্রা এতটা বাড়িয়া গেল যে, প্রসন্নের কানেও একটু আওয়াজ পৌঁছিল।

ব্রহ্মতেজের কথায় সত্যেন বলিল, "ঐ তেজেই তো হাতের কুশগাছটা শুকিয়ে গেছে। আবার আঙুলের কায়দা দেখিয়ে হাত চালানো দেখ!"

সত্যেন বিশ্বম্ভরের দেহ হইতে পীতাম্বরের দেহে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "তাই ত আমিও ভাবছি। এখন ও কসরৎ দেখাচ্ছে কি ভেল্কি দেখাচ্ছে বল্ তোরা; আমার সংশয় দূরে

কর্।" প্রসন্নের উপর দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া বিশ্বম্ভর বলিল, "কেয়া মানিয়েছে দেখেছিস্, যেন বুড়ো দাদাঠাকুরটি।" বাধা দিয়া সত্যেন বলিল, "কিছু না, ওকে পুরো বৃদ্ধ সাজাতে পারে শর্ম্মা ; আমার মাথায় একটা গ্র্যান্ড মতলব এসেছে।"

বিশ্বম্ভর ও পীতাম্বর সৌৎসুক্যে সত্যেনের মুখের নিকট মুখ আনিয়া বলিল, "কি সেটা বল শীগ্গির, তোর প্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের দিব্যি।" সত্যেন আবার হাসিতে ভাঙিয়া পড়িয়া বলিল, "ওকে, ওকে গুরুমশায় কর্—সোনায় সোহাগা হবে, অমন বুড়ো সাজতে আর অন্য কেউ পারে না।"

এ মতলবের পুরস্কার স্বরূপ সত্যেন যে একটা প্রচণ্ড চড় বকশিস্ পাইল, তাহাতে তাহার মুখটা ক্ষণিকের জন্য বিকৃত হইয়া গেল। সত্যেন যে একটা জিনিয়াস্ এ বিষয়ে বিশ্বম্ভর ও পীতাম্বরের মতভেদ রহিল না।

পরদিন ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরর সহিত সাক্ষাৎ হইলে বিশ্বম্ভর তাঁহাকে বলিল, যে, "তাহার বাবা প্রসন্নের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর এটা তাহাদেরও স্বপ্নের অগোচর ছিল যে, প্রসন্নটা এমন উৎরাইয়া যাইবে। কাল প্রসন্নের কথাই ভাবিতে ভাবিতে তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল—প্রসন্ন একটা পাঠশালা খুলিলে পারে না? এতে পয়সাও আছে, লেখাপড়ার চর্চাটাও থাকিয়া যাইবে। আর সব দিকেই ভাল। এই আমাদের বাড়ী হইতেই ত একপাল ছাত্র পাইবে।" বাটী যাইতে যাইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাবিতে লাগিলেন—প্রসন্নটা সত্যই খুব বাঁচিয়া গিয়াছে। এমন শুভার্থী যে বিশ্বম্ভর সে কি মিথ্যা দোষারোপ করিয়া পিতাকে পত্র লিখিতে পারে।

বিশ্বম্ভর প্রভৃতির আগ্রহে ও উদ্যমে গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় বারোয়ারী পূজার আটচালার একপার্শ্বে পাঠশালা বসিল। পিতৃভক্ত প্রসন্ন নবীন জীবনের উৎসাহের শিখাটি একেবারে নিভাইয়া গুরুগিরি শুরু করিয়া ছিল।

মাসখানেক পরে সত্যেন একদিন পাঞ্জাবী-পমসু পরিয়া একটা ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রসন্নের পাঠশালায় হাজির হইল। প্রসন্ন অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

একটু হাসিয়া সত্যেন বলিল, "সবই ভুলে গেলি, এই ত দুঃখ। তা তুই না বললেও এই আমি বসলুম।"

প্রসন্ন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "তুই আসবি আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আজ চারমাস একটা খবর নিস্‌নে—"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সত্যেন বলিল, "বেশ বল, প্রসন্ন, আজ চারমাস বিশুর সঙ্গে মন কষাকষি, আর আজ স্পষ্টাস্পষ্টি হয়ে গেল—শুধু তোকে নিয়ে।"

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল "কি রকম?"

"কিরকম আর কি?—বিশুকে তুইও চিন্‌লি, আমিও চিন্‌লাম। যাক্ সে সব কথা। প্রসন্ন, তুই এই গুরুগিরি ছাড় আজই। আমি তোর খরচ দেব, আবার স্কুলে ফিরে

চল, সবাই আপশোষ করে তোর জন্যে।" শেষকালের কথাগুলি সত্যেন বলিল প্রসন্নের হাত ধরিয়া নিতান্ত আগ্রহ ভরে। মলিন হাসি হাসিয়া প্রসন্ন বলিল, "আর হয়না ভাই, অনেক এগিয়েছি।"

সত্যেন নিরাশভাবে হাতটা ছাড়িয়া দিল, বলিল, "কি আর বলব তবে? এই দিকেই উন্নতি কর।" অতঃপর একটা বালকের দিকে চাহিয়া বলিল, "যাও তো খোকা, গুরুমহাশয়ের বাড়ী বলে এস তাঁর একজন বন্ধু আজ খাবে।" প্রসন্নকে বলিল, "আজ একেবারে চটাচটি, আমি স্পষ্ট বললুম একজনের জীবনটা নষ্ট করা তোর অন্যায়। ওর আর মুখ দেখছিনে।" প্রসন্ন চুপ করিয়া রহিল। পাঠশালের চারিদিকে চাহিয়া সত্যেন বলিল, "তোর পাঠশালের একটা ঘর থাকা দরকার। কোন জিনিস-টিনিস রাখতে হলে ঘাড়ে করে বাড়ী না নিয়ে গিয়ে এইখানেই রেখে দিলি। ঐ কোণটায় ঠিক হবে।" প্রসন্ন বলিল, "কোন দরকার হয় না ভাই।" "একটা ঘর থাকলে তার আর দরকার হয় না? কি বলিস। এই ধর ঝড়-বৃষ্টির দিনেও ত ছেলেগুলোকে পুরতে পারবি; বর্ষা আসছে। আরও কত কাজে লাগতে পারে। লাগিয়ে দে জানলি? আর খরচের ভারটা রইল আমার ওপর। এই ছোট-ছোট ছেলেদের একটু উপকার করতে পারলে আমি যদি একটু সুখ পাই ও তুই আমায় বঞ্চিত করবি?" প্রসন্ন লজ্জিত হইয়া বলিল, "না, না, কি বলিস তুই?" সেইদিনই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রসন্নের পাঠশালার এক কোণে দরমার বেড়া দেওয়া একটা ছোট ঘর খাড়া হইল।

হাসিতে হাসিতে বিশ্বম্ভরের সম্মুখীন হইয়া সত্যেন বলিল, "নে বকশিস কর; মজাটা জমিয়ে এনেছি।"

আগ্রহের সহিত বিশ্বম্ভর বলিল, "কি করে এলি শুনি?"

বিজয়োৎফুল্লভাবে সত্যেন বলিল—"পরশার তামাক খাবার ঘর খাড়া করে দিয়ে এলাম—যা ছাড়া গুরুমশাইগিরি মিছে।"

"আরে ধ্যোৎ, তোর সেই জিন হয়েছে এখন ঘোড়া হলেই হয়। আগে হাতে হুঁকো তোলা।"

"হুঁকো ত ধরেছে বললেই হয়। আচ্ছা তুই বল, যেদিন তামাক টানতে পারবে, সেদিন ওকে ডেকে সত্যনারায়ণের পুজো দেওয়াবি? কর্ মানসিক।"

সত্যেন খুব হাসিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর বলিল—"এ আর শক্ত কথা কী? কিন্তু ওকে তামাক ধরানো সোজা নয় বলে দিলাম।"

"আর সে তেজ নেই চাঁদের, তবে আর গুরুমশায় বানালুম কেন?" বিশ্বম্ভর তবুও সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িতে লাগিল। সত্যেন বিরক্তির ভান করিয়া বলিল—"একেই বলে অনধিকার চর্চা; সে ভাবনা তো তোর নয় বাপু। কালে ওকে আমি বোতল ধরাব। তুই মহাসমারোহে পুজোর আয়োজন কর।"

পরদিন সত্যেন প্রসন্নের পাঠশালায় উপস্থিত হইল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই রাত্রে

বিশ্বম্ভরের বাড়ীতে থাকবার জন্যে জবাবদিহি দিল "আমি সন্ধ্যের সময় জামা-কাপড় আনতে যেতেই আমার হাত ধরে বসলো, কোন মতেই আসতে দেবে না। বলে, বল ক্ষমা করলি? বড় মুস্কিলে পড়ে গেলাম। শেষে বললুম, আমি থাকতে পারি যদি নিজের কাজের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিস।" প্রসন্ন হাসিয়া বলিল, "কি আর এমন করেছে বিশু? তোর আবার—" সত্যেন বলিল, 'না, তুই বুঝিসনে প্রসন্ন, আমি বড় বদলোক। যাক যখন অমন করে বললে তখন ওর ওখানে থাকা থাক কি বল?" "নিশ্চয়।" ছাত্রদের প্রতি নজর ফিরাইয়া সত্যেন বলিল—"আমায় গোটাকতক ছেলে দে, নিয়ে বসি। ভারি মহৎ কাজ তোর, প্রসন্ন।" তিন চারিটি ছেলেকে পড়াইয়া উঠিবার সময় সত্যেন বলিল—"খাটুনি আছে তোর।" তৃতীয় দিবস এইরূপ ভাবে পড়াইয়া কেরোসিনের বাক্সতে ঠেস দিয়া সত্যেন বলিল—"বড় ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয়। তবু ত ছাড়তে পারছিনে, বেশ লাগছে।" একটু চুপ করিয়া গলা নামাইয়া আবার বলিল—"তুই যদি কিছু মনে না করিস ত প্রসন্ন, একটা হুঁকো কিনে এই ঘরটিতে রেখে দিই।" একটা বদ্ অভ্যাস হয়ে গেছে জানিসই ত। প্রসন্ন বেশি আপত্তি করিল না। সন্ধ্যার সময় সত্যেন হুঁকো, তামাক, টিকা, দেশলাই প্রভৃতি ঘরের কোণে রাখিয়া আত্মগ্লানির স্বরে বলিল—"পাপ, পাপ একটা, কখনও ধরিসনে প্রসন্ন।" এই উপদেশ বাক্যে প্রসন্ন সন্তুষ্ট হইল। তাহার পর সত্যেন ঘরে ঢুকিয়া বাহির হইয়া আসিয়া স্বস্তির "আঃ" উচ্চারণ করিলে প্রসন্নের মনটা কিরূপ হইতে লাগিল ও তাহার পর কর্মের অন্তে ও ক্রমে মধ্যে প্রসন্নের শরীরটাও কিরূপ ম্যাজ ম্যাজ করিতে লাগিল এবং তামাকের গন্ধেই যেন আরাম বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে প্রায় সপ্তাহকাল মনের সহিত যুদ্ধের পর একদিন সমস্ত দিন অঙ্ক কষাইয়া শরীরটা এলাইয়া পড়ায় সত্যেন তাহাকে দুইটি টান দিতে সেও গ্রহণ করিতে কিরূপে বাধ্য হইয়াছিল এবং দুই টানের বেশি দিতে ও গ্রহণ করিতে উভয়েই কিরূপ দ্বিধাবোধ করিয়াছিল সে কথা বাঙালী পাঠককে না বলিলেও চলে।

মোট কথা, প্রসন্ন একদিন তামাক ধরিল। জমিদার বাড়ীতে একদিন সত্যনারায়ণ পুজোও হইল। পুজার অন্তে প্রসন্ন পুরোহিতের সামনে একটি সজ্জিত হুঁকো গম্ভীর ভাবে ধরিয়া সত্যেন দুই বন্ধুকে একচোট খুব হাসাইল।

গোপনের চেষ্টা সত্ত্বেও একথাটা আর একজন বোধহয় জানিল। সে ক্ষান্ত। শুধু ক্ষান্তর মনেই একটু আঘাত লাগিল। সে প্রসন্নের পাঠশালার একটি ছাত্রী। নূতন নয়, প্রায় শুরু হইতে সেও পড়ে। তবে দৈনিক পোড়ো নয়। নিজের ও ভাইয়ের অসুখ মিলাইয়া তাহাকে গড়ে এক সপ্তাহ উপস্থিতির পর এক সপ্তাহ অনুপস্থিত থাকিতে হয়। ইহার উপর যে তাহার কোন হাত নাই, সংসারে অবস্থাজ্ঞাপন প্রসঙ্গে একথা সে গুরুমহাশয়কে একাধিকবার বলিয়াছে। একলা মা তাহার ঐ ভানপিটে ভাইটিকে কি সামলাইতে পারে? তাহাতে আবার যখন জ্বরে পড়ে। এসব কথা শুনিয়া প্রসন্ন মনে মনে ভাবিত—তোমার মত গিন্নিবান্নি মেয়ে ত আমি দেখিনি।

কখনও কখনও মুখ ফুটিয়াও বলিত। তাহার প্রভাবও অনুভব করিত সর্বক্ষণ। যে কটাদিন পাঠশালায় উপস্থিত, প্রসন্নের মাথার উপর যেন একটা মস্ত বোঝা চাপিয়া থাকিত। কিছুতে একটা খুঁৎ হইবার জো নাই। নিজের লেখাপড়ায় ষোল আনা ত্রুটি করিয়া সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকের ত্রুটি সামলাইয়া ফিরা—এই ছিল ক্ষান্তর কাজ। প্রসন্নকে সব শাসন নীরবে সহ্য করিয়া যাইতে হইত। এমন গিন্নিবান্নি মেয়েকে পড়া জিজ্ঞাসা করা প্রসন্ন বেচারার সাহসে বড় একটা কুলাইত না। যে কদিন বা কুলাইয়া উঠিত, ক্ষান্ত বলিত, আমি একটা মানুষ না হয় আপনার বাড়ী গিয়ে পড়া দিয়ে আসতে পারি, ঐ দেখুন রেখো শেলেটে এক কলসী জল ঢেলে বসেছে, ওকে সামলান আগে—ইত্যাদি ইত্যাদি।



এ যেন এক অভিনব সংসার লইয়া তাহারা উভয়ে আসিবে। যেদিন ক্ষান্ত আসিত না, প্রসন্ন প্রথমটা খুব উৎসাহের সহিত কাজ করিয়া যাইত; কিন্তু একটু মধ্যেই দমিয়া যাইত। না আসিবার প্রকৃত কারণ আন্দাজে জানিতে পারিলেও কোন একটা ছেলেকে পাঠাইয়া সঠিক বৃত্তান্ত জানিতে হইতই। যেদিন ক্ষান্তর নিজের অসুখ না হইত, প্রসন্ন খবর পাঠাত, সে তাহার বাড়ীতে যাইয়া পড়িয়া আসিতে পারে। সম্ভব হইলে কোন কোনদিন সে নিজে চলিয়া আসিত, কাঠের বাক্সটাতে ঠেস দিয়া প্রসন্ন চাহিয়া থাকিত—ক্ষান্ত আসিতেছে, প্রকাণ্ড শ্লেটের কাল গায়ে তাহার নিরলংকার শুভ্র হাতখানি পড়িয়া আছে। ঘাড়ে অসংযত কেশরাশির একটা বিপুল বিশৃংখল গ্রন্থি। পায়ে দুগাছা মল। প্রসন্ন লক্ষ্য করিত যে মলের শব্দ সতেজ ও ঘন, সেদিন মুখটাও গম্ভীর। সেদিন প্রসন্নকে শক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হইত। কেন সে একজনের পড়ার ক্ষতি করিয়া তাহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছে, পেরসাদ যে পাঁচদিন ধরিয়া কামাই করিতেছে, তাহার জন্য কটা লোক পাঠানো হইয়াছে—ইত্যাদি। এক একদিন মনটা ভালও থাকিত। সেটাও প্রকাশ পাইত পায়ের মলের বোলে এবং মুখের ভাবে। সেদিন দূরে

হইতে ক্ষান্ত হাসিয়া ফেলিত এবং প্রসন্নের মুখেও সে হাসি প্রতিফলিত হইত। এইরূপ ভাবে হাসিতে হাসিতে একদিন পাঠশালের দাওয়ায় উঠিয়া সঘনে মাথা হেলাইয়া ক্ষান্ত বলিল, "না গুরুমহাশয়, আমি আর আপনার বাড়ী পড়তে যাব না, তাই এখন এলুম।"

প্রসন্ন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হলো আবার?"

কৃত্রিম রাগের সহিত ক্ষান্ত বলিল, "যান, সবাই কেন বলবে আমাদের বড় ভাব?"

লজ্জায় আধমরা হইয়া প্রসন্ন প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর গুরুমহাশয়ের কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া গম্ভীরতার চেষ্টা করিয়া বলিল, "কে বলেছে বল ত?"

আপনার ভাইয়ের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষান্ত বলিল, "কেন ঐ ড্যাকরা। যা বলবেন পিঠোপিঠি বলে বলে; আপনিও কিছু বলবেন না। বেশ আমিও আর যাচ্ছিনে।" তাহার ভাই দিদির অবস্থা দেখিয়া শ্লেটের আড়ালে হাসিতেছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষান্ত বলিল, "হতচ্ছাড়া ছেলে, বোম্বেটে।"

ছুটিতে বন্ধুর বাড়ী আসিয়াই সত্যেন পাঠশালায় হাজির দিল। প্রসন্ন তখন উপুড় হইয়া শুইয়া ক্ষান্তর লেখা শোধরাইয়া দিতেছিল। বাম হস্তের উপর ভর দিয়া ক্ষান্ত একমনে দেখিতেছিল।

সত্যেনকে দেখিয়া ছেলেরা চুপ করিয়া যাওয়ায় প্রসন্ন চাহিয়া দেখিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া সত্যেনকে বলিল, "আয় দাঁড়িয়ে রইলি যে।"

ক্ষান্ত উঠিয়া পাঠশালের একপ্রান্তে গিয়া বসিল, বাক্সর উপর বসিয়া মৃদু হাসিয়া সত্যেন বলিল, "বাঃ, বেড়ে আছিস কিন্তু।"

অতিমাত্রায় লজ্জিত হইয়া প্রসন্ন বলিল, "কি রকম"

"অমৃতরোগের 'কৃপণের ধন' দেখেছিস ত? আমার কুন্তলার কথা মনে পড়ে গেল।" অধিকতর লজ্জিত প্রসন্ন চুপ করিয়া রহিল। গলা নামাইয়া সত্যেন বলিল, "আমার কালচাঁদ আছে ত? তাঁরই টানে দৌড়ে এসেছি"। "আছেন"। "তা হলে" —ঘরের দরজার কুলুপের দিকে চাহিয়া সত্যেন বলিল, "তা হলে চাবিটা দে।' ঘর খুলিয়া জল-বিহীন হুঁকাতে তামাক খাইয়া সত্যেন বাহিরে আসিল। প্রসন্নের কাঁধে গোটা দুই তিন থাবড়া মারিয়া বলিল, "চট্‌পট্‌ চট্‌পট্‌; পুড়ে যাবে।"

সন্দিগ্ধ নেত্রে ক্ষান্ত চাহিয়াছিল। প্রসন্ন একবার চকিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "আজ অসম্ভব ভাই।" বিস্তর পীড়াপীড়ি করিয়াও সত্যেন রাজি করিতে পারিল না।

বাসায় গিয়া সত্যেন দেখিল পীতাম্বরও আসিয়াছে। সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই বিশ্বম্ভর থিয়েটারী সুরে কহিল, "কি সংবাদ দূত?" সত্যেন কহিল, জবর সংবাদ, তুই কখন এলি পীতু?" "আঃ। কি সংবাদ তোর বলনা আগে" বলিয়া বিশ্বম্ভর সত্যেনের মুখটা নিজের মুখের দিকে ফিরাইয়া লইল।

সত্যেন বলিল, "গুরুমশায় যে বেজায় প্রেম লাগিয়ে দিয়েছে ওদিকে।" সাগ্রহে বিশ্বম্ভর বলিল 'কার সঙ্গে।" সত্যেন একটু রসিকতা করিয়া বলিল, 'বাবা তোমাদের দেশের

মেয়েদের আমি চিনি কোত্থেকে ?" পীতাম্বর বলিল, "তবেতো দেখতে যেতে হচ্ছে।" বিশ্বম্ভর কহিল, "কালই আমি চিনে আসছি।" সত্যেন চিন্তান্বিত ভাবে বলিল, "সে ত হবে ; এখন যে এক বিপদ উপস্থিত, তার কি উপায় ?" পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করিল, "কি বিপদ আবার ?" "আমি ভাবছি ও যদি এইরকম প্রেম করতে থাকে, আর পরে বিয়েও হয়, ত আমাদের সখের পাঠশালাটি যায় যে। এই যে গাধার খাটুনিটা খাটলাম সে কি এরই জন্যে ? তখন প্রসন্ন কি আর ছেলে ঠেঙাতে চাইবে ? লক্কাপায়রাটি হয়ে দাঁড়াবে একেবারে।"
তখন এযে এক ভীষণ বিপদ, তাহাতে সকলেই সম্মত হইল। একটা উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরামর্শ চলিল। অবশেষে একটা উপায়ও স্থির হইল।

পরদিন উঠানে বসিয়া প্রসন্ন একটা নারিকেল কাটিতেছিল। সহর্ষমনে বাটীতে প্রবেশ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "ছেলে ত বিশ্বম্ভর, বুঝলে গা ? বেঁকে বসেছে, 'আমি টাকা নিয়ে বে করব না।' ঐ পাড়ার রাধুর মেয়েকে পছন্দ হয়েছে ; ওই যে— যে মেয়েটি কখনও কখনও আমাদের পরশার কাছে পড়তে আসে গো। বলে, একটা গরীব বিধবার এতে উপকার হবে।"
একটা কোপ নারিকেলে না পড়িয়া প্রসন্নের হাতের উপরে আসিয়া পড়িল। বিশ্বম্ভরের প্রশংসা ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি প্রসন্নের হাতটা ধরিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আঃ, আর এই এক ছেলে, তোর এখন সাত তাড়াতাড়ি নারকোল কাটবার কি দরকার ছিল বাপু ?"
হাতটাকে পিতামাতার তত্ত্বধানে ছাড়িয়া দিয়া প্রসন্ন অসাড় হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে একটা বিষাদের সুর ঘনাইয়া উঠিতেছিল। আজ হঠাৎ একটা কথার আঘাতে অভিনবরূপে এক অভিনব সম্বন্ধে ক্ষান্ত তাহার মানসপটে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। বিষাদময় আতঙ্কে তাহার মনটা ভরিয়া উঠিতেছিল। একদিন শীঘ্রই একদিন এক কথায় এই বন্ধন ছেদ করিয়া ক্ষান্ত তবে চলিল ? বিশ্বম্ভরদের যত অত্যাচার তাহার একে একে মনে হইতে লাগিল। তাহার জীবনটা দুই পায়ে মাড়াইয়া তাহাদের খেলা। অথচ তাহার অপরাধ ? প্রসন্ন পাঠশালায় গেল না। ক্ষান্ত বসিয়া বসিয়া অবশেষে গুরুমহাশয়ের বাড়ী আসিল। মুখটা ভার, গুরুমহাশয়ের আজকাল প্রায়ই এইরকম। প্রায়ই ত আজকাল বাড়ী আসিয়াই পড়িয়া যাইতে হয়।
আসিয়া দেখিল গুরুমহাশয়ের হাতে পটি বাঁধা। কপালে ভ্রূ উঠাইয়া শিহরিয়া ক্ষান্ত বলিল, "উঃ, কি হল, গুরুমহাশয় ? হাতটা গেছে নিশ্চয়ই ? হুঁ, আমি জানি গেছে, যা অসাবধান আপনি। একজন্যে পাঠশালায় যাননি না ? তা কি করে জানবো ? আপনি যে আজকাল প্রায়ই যাননা। আমারই আসতে হয়। খুব কষ্ট হচ্ছে না ?

"কি ওষুধ দেওয়া হলো?" ক্ষান্ত খুব সন্তর্পণে প্রসন্নের হাতটা তুলিয়া লইল। প্রশ্নগুলির উত্তরের অপেক্ষায় প্রসন্নের মুখের পানে একটু চাহিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "খুব জ্বালা করছে নিশ্চয়ই?" একটা দীর্ঘশ্বাস, ত্যাগ করিয়া প্রসন্ন বলিল, "না তেমন লাগেনি।"

ঠোঁট ফুলাইয়া ক্ষান্ত বলিল, "হ্যাঁ, লাগেনি! নিজের কষ্ট লুকোতে আপনি অদ্বিতীয়।" গুরুমহাশয়ের কথা বিশ্বাস না হওয়ায় তাঁহার মাকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "গুরুমহাশয়ের খুব লেগেছে নাকি, জ্যাঠাইমা?" স্নেহদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, মা লেগেছে বই কি; যা অসাবধ ন ছেলে।" তিরস্কারপূর্ণ অথচ সহাস্য নয়নে ক্ষান্ত বলিল, "হ্যাঁ, আমিও বললাম—ঐ রকম আপনার।"

আজই একটু পূর্বে যে দারুণ কথাটা প্রসন্ন শুনেল, তাহা তাহার নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছিল। ক্ষান্তর হাতটা ধরিয়া গলা নামাইয়া বলিল, "আমার কষ্ট হলে তোমার কি ক্ষান্ত?"



"বাঃ রে কার না হয়? আমার হাত কেটে গেলে মার কষ্ট হবে না?—আপনার হ'ত না?—আপনিই বলুন না। তা আমার কি হাতটা জ্বালা করবে? হাঃ হাঃ তা নয়, তবে মনে কষ্ট হয়। মা বলেন, 'মনের কষ্টই কষ্ট।"

ক্ষান্তর মুখের পানে চাহিয়া প্রসন্ন ভাবিতেছিল, 'বিশু বলেছে বলে কি সত্যই বে করতে পারে? এরা এত গরীব। ওরা জমিদার—এ খালি আমায় একটু কষ্ট দেওয়া।"

প্রসন্নের হাত ক্রমে ক্রমে সারিয়া গেল। একদিন বাড়ীতে ঢুকিয়াই ভট্টাচার্য্য মহাশয় হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হাঃ-হাঃ জমিদারী খেয়াল আর কাকে বলে? ওগো শুনছো, আমাদের বিশুর আবদার? বলে না, আমার বে'তে প্রসন্ন পুরুত হবে; পুরোনো বন্ধু, ওর মনটাও খুশী হবে। আমায় বলে, 'ওকে এখন থেকে বড় বড় কাজে দিন্ ঠাকুরমশায়; আমি বেশ টের পাচ্ছি, কালে ও মস্ত বড় একজন পুরুত হবে। তা প্রসন্ন কে বেগ পেতে হবে না; প্রায় সবই জানে।"

প্রসন্নর বুকটা যেন ধসিয়া গেল। তবুও মনকে সান্ত্বনা দিল,—এ সবই দুষ্টুমি, তাহাকে শুধু ভয় দেখানো।

বিবাহের আর দিন নাই। জমিদার বাড়ী উৎসবের আয়োজনে দিন দিন গুলজার হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে পাড়াটাও সরগরম হইয়া উঠিল। প্রসন্ন নৈরাশ্যহত মনটাকে সাহস দিতে লাগিল—"ওরে বিশু, আমি সব বুঝি।"

ক্ষান্ত আর আসে না। প্রসন্নের পাঠশালাও আর ঠিক চলে না, এক-একদিন সে যায়। ক্ষান্তর বাড়ীর পানে যে রাস্তাটা চলিয়া গিয়াছে সেই দিকে স-আশ নয়নে চাহিয়া থাকে। ছেলেরাও ঢিলা পাইয়া অনেকেই গরহাজির থাকে। যে কয়জন আসে—সংখ্যার স্বল্পতা-বশতঃ ছুটি পায়।

আর একদিন বাকি। বিকালে সন্ধ্যার কাছাকাছি একটা 'বসুমতী' হাতে করিয়া পীতাম্বর ও সত্যেন প্রসন্নের সহিত দেখা করিতে আসিল। লাল কালীতে দাগ দেওয়া একটা অংশ তাহার সামনে ধরিয়া সত্যেন বলিল, "বিশু একটা মস্ত কাজ করলে, প্রসন্ন,—'বসুমতী'-তে আমরা ছাপিয়ে দিলুম। সে যাই হোক্ জমিদার বাড়ীতে যে দাঁওটা মারছ তার অংশ দিচ্ছ কিনা ?"

প্রসন্নের মুখটা মলিন হইয়া গেল ; তবে আর সত্যই আশা নাই। সত্যেনের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া প্রসন্ন রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "সতু! আমি তোদের কী করেছি ভাই ? শুধু পাশ করে গিয়েছিলুম বলে এত অপরাধ ?"



ঘটা

মামার বাড়ীতে এসেই রন্তু মস্ত এক উৎসবের মধ্যে পড়ে গেল। উৎসবটা ঠিক মামার বাড়ীতেই না হলেও একেবারেই পাশের বাড়িতে, তার উপর কাজের জন্য এ বাড়ীর সবাই ও-বাড়ীতে এত যাওয়া-আসা করছে যে মনে হচ্ছে দুটো বাড়ী যেন এক হয়ে গেছে।

খুব বড় না হোক বাপ-কাকা-দাদাদের মত, তবু এই বছর সাতের মধ্যে ঘটা কয়েক রকম দেখেছে বৈকি; নিজেরই তো জন্মতিথি হয়ে গেল এই ক'দিন আগে, তারও আগে হ'ল দাদার পৈতে, পিসীর বিয়ে। আরও ঘটা দেখেছে কত, নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছে, কিন্তু এ ধরনের ঘটা ঠিক দেখেনি। মামার বাড়ীর মতই বেশ বড় বাড়ী, তার সামনে প্রকাণ্ড দুটো সামিয়ানা পড়েছে, তার নীচে কত কি ব্যাপার। একটাতে কেত্তন-গান হচ্ছে, তিনজন মেয়ে আর খোল কত্তাল আরও কি সব বাজনা। একটাতে পুজো হবে, তার জন্য কত কি সব সরঞ্জাম। চারখানা পালঙ্ক, গদি, বালিশ,

চাদর-দেওয়া, মশারি-ফেলা। কত ঘড়া, কত থালা, কত ঘটি, কত গেলাস সাজানো হয়েছে, একদিকে বাছুর সুদ্ধ কি চমৎকার গোরু একটা, মালা পরানো; একদিকে একটা ধপ্‌ধপে সাদা ষাঁড়, তার গলাতেও মালা; পুজোর জায়গায় কাপড়, শাড়ী, নৈবিদ্যি, কত ফুল, ধুপ ধুনো আরও কত কি—সব বড় বড় পুজোতেই যেমন হয়। আরও খানিকটা সরে দশ-বারোজন বই খুলে মিষ্টি সুরে দুলে দুলে কি সব পড়ছে।

পুজো আরম্ভ হ'ল—সেও কতক্ষণ ধরে। পুরুতের পাশে বসেছে নেড়ামাথা, মোটা-সোটা, টকটকে রং ধপ্‌ধপে কাপড় পরা একজন লোক। আরও ঐরকম নেড়ামাথা টকটকে রং, ধপ্‌ধপে কাপড়-পরা তিনজন ঘোরাঘুরি করছে আর মাঝে মাঝে এসে বসছে। পুজোর পাশেই প্রকাণ্ড সতরঞ্চির উপর সাদা ধপ্‌ধপে চাদর পাতা, তাতে অনেক লোক রয়েছে বসে।

বাড়ীর ভিতর প্রকাণ্ড উঠানের উপর মস্ত বড় চাদর টাঙিয়ে একদিকে রান্না হচ্ছে, বড় বড় কড়ায় কত রকম রান্না। একদিকে হচ্ছে খাবার তৈরি—কচুরি, রসগোল্লা, পান্তুয়া, সন্দেশ, বোঁদে। এক জায়গায় বড় কাঠের বারকোশে ময়দা ঠাসা হচ্ছে।…দই এসেছে! দই এসে গেছে শব্দ হল, রন্তু ময়দা ঠাসা দেখছিল—বেশ লাগে তো, খোকাকে চটকাবার মত। নিজেরও ইচ্ছে করে ঠাসি—শব্দ শুনে ছুটে এল। হাঁড়িতে হাঁড়িতে কত দই। ভাঁড়ার ঘর থেকে ক'জন মেয়ে বেরিয়ে এল। "এদিকে নিয়ে এসগো, একেবারে ঘরে তোল।"…বলতে না বলতেই—"ক্ষীর কোন ঘরে রাখা হবেগো?" রন্তু ঘুরে দেখে ছোট হাঁড়ি করে হাঁড়ি হাঁড়ি ক্ষীর।

কত কি যে হচ্ছে, ঘুরে ঘুরে দেখে যেন থৈ পাচ্ছে না রন্তু।

এক জায়গায় পিসির মত কত মেয়ে। পিসির চেয়ে বড় আবার পিসির চেয়ে ছোটও—সব্বাই এত্ত পান সেজে জমা করে যাচ্ছে। কত গেলাস, কত খুরি, কত পাতা, কত আসন! ঘটা অনেক দেখেছে বৈকি রন্তু, কিন্তু এরকম ঘটা ত দেখেনি।

বিকেলে পুজো হয়ে গেল। এবার কাপড়, বাসন, পালং—সব নাকি দিয়ে দেওয়া হবে। কিছু কিছু বাসন তখুনি কত লোকে এসে নিয়ে গেল। একজন খাতা দেখে নাম ডেকে ডেকে বলছে আর সবাই নিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক রইলও পড়ে, আরও সবই এসে নিয়ে যাবে। একখানা বিছানা-সুদ্ধ পালং আর অনেকগুলো বাসন রন্তুর মামার বাড়ীর লোকেরা এসে নিয়ে গেল।

তারপর রাত্তিরে সে কি নেমন্তন্নর ঘটা! কত আলো, কত লোক, হৈ-হল্লা! এতবড় নেমন্তন্ন আর কখনও দেখেছে কি রন্তু? কৈ, মনে পড়ে না তো। খুব খেলেও রন্তু। ওকে নেমন্তন্নর কেউ পান দেয় না। ছেলেমানুষ, জিভ মোটা হয়ে যাবে বলে। এখানে একটার বদলে দুটো পান।

কিসের এত ঘটা তা জিজ্ঞেস করেছিল রন্তু ওর দিদিমাকে। "ও-বাড়ীর কত্তা আশি বছরে সগ্যে গেলেন কিনা, তাই ছেলেরা দানসাগর সেরাদ্ধ করেছে। খুব বড় বড়

চাকরি করে ত ছেলেরা, অনেক টাকা, দু'খানা মোটর।" আরও জিজ্ঞেস করেছিল রন্তু, সেরাল্দ যেমন দেখেনি তেমনি সগ্‌গও ত দেখেনি কখনও। কাউকে যেতেও দেখেনি। দিদিমা বললে, "সে নাকি এর চেয়েও ভাল জায়গা, আর রোজ রোজ সেখানে নাকি এর চেয়ে কত বড় বড় ঘটা হয়, কত রং-বেরঙের আলো। রন্তুরা যদি আর ক'দিন আগে এসে পড়ত তো দেখতে পেত কত বাজনাবাদ্যি করে, কত পয়সা দো-আনি ছড়াতে ছড়াতে কত সাজিয়ে গুছিয়ে সবাই সগ্‌গে নিয়ে গেল ওবাড়ীর কত্তাকে। সবাই যায় সগ্‌গে, আগে ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমা, দাদামশাই-দিদিমারা যায়, তারপর তার ছেলেমেয়েরা, তারপর তার ছেলেমেয়ে—সবাই যখন বুড়ো হয়ে ওঠে। পুণ্যির জোর থাকলেই যায়। যেমন টাকার জোর থাকলে তবে ত কলকাতায় গিয়ে বাড়ী করতে পারে লোকে। তবে একবার গেলে আর ফিরতে চায় না। আর কেনই বা ফিরবে? অত ঘটা, অত বাজনাবাদ্যি সেখানে। দেখা হয় বৈকি সেখানে। ছেলেমেয়েরা যাবে, তারপর তার নাতি-নাতনীরা, তারপর আবার তার ছেলেমেয়েরা বুড়ো হলে। কি করতেই বা আসবে অমন চমৎকার জায়গা ছেড়ে?

বুড়ো না হলে যায় না, যেতেও নেই। তাইতেই না দিদিমা ওরকম করে ধমক দিয়ে উঠল রন্তুকে, যখন সে বেচারি সব শুনেটুনে যেতে চেয়েছিল সেখানে।



রন্তুরা আসতই মামার বাড়ীতে, আরও একটা মস্তবড় ঘটা রয়েছে যে এখানে। রন্তুর দাদামশাইয়ের জন্মতিথি। দাদামশাইও আশী বছরে পড়লেন কিনা, তাই এবারে নাকি খুব ঘটা করে হবে আর সেইজন্যই রন্তুরা সবাই এল এবার। নইলে অতদূর থেকে ত রোজ রোজ আসা যায় না, এই তিন বছর পরে তারা এসেছে। মা বলেন—ঠিক এই তিন বছর পাঁচ মাস পরে। আরও পরে আসত, তবে পাশের বাড়ীতেই নাকি এতবড় কাজ হচ্ছে—দানসাগর ত আজকাল আর কেউ করে না বাপ-মায়ের জন্যে—

নিজের মোটরগাড়ি করবে, বড় লোকেদের পার্টি দেবে না, বাপ-মায়ের দানসাগর করবে ? তাই অতবড় একটা কাজ হচ্ছে বাড়ীর পাশেই, আর ওদের সঙ্গে খুব ভাবও ত, দু'দিন আগেই সবাই চলে এল।

বেশ লাগছে এখানে রন্তুর। গ্রেট দ্বিতীয় ভাগ বাক্সয়, সবাই দেশের চেয়ে আরও ভালবাসে, তারপর এই ঘটার উপর ঘটা। দাদুর জন্মতিথি এসে গেল বলে, আর মাত্র আটটি দিন আছে। তারপর এবাড়িতেও কত আলো, কত ঘটা, কত নেমন্তন্ন।

রন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না। আর মোটে তিন দিন বাকি, তবু এ বাড়ীতে ত ঘটার কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ও বাড়ীর কত্তার দানসাগরের ঠিক তিন দিন আগে ওরা এসেছিল। তখন থেকেই কত কাজ পড়ে গেছে ও-বাড়ীতে বাসন-কোসন কিনে কিনে আনছে বাজার থেকে—আরও কত সব জিনিস। পালং চারটে বড় বড় মোটর-গাড়ি করে এসে পড়ল, তাতে ফিতে জড়ান হ'ল, তারপর বিছানা পাতা হ'ল। বাইরে উঠোন পরিষ্কার করছে কত 'মুনিস' এসে। তার পরদিন সামিয়ানা এসে পড়ল। কত হৈ হৈ করে কত লোকে দাঁড় করাল সে দুটো। মুনিসদের বাড়ীর মেয়েরা এসে পুজোর জায়গা নিকোচ্ছে গোবর দিয়ে। আরও কত কাজ, রাত্তিরে বড় বড় আলো জেলে করছে সবাই। তার পরদিন বাড়ীর উঠানের উপর চাদর টাঙিয়ে কাজ আরম্ভ হয়ে গেল, উনুন তৈরি, ওদিকে উনুন জেলে খাবার তৈরী, এদিকে কুটনো কোটা, কত হৈ হৈ রৈ রৈ। তার পরদিন সকাল থেকে তো কথাই নেই।

ওর মামার বাড়ীতে কিন্তু কৈ সে রকম ত কিছু হচ্ছে না। কাল হয়ে গেলেই ত পরশু, কিন্তু সামিয়ানাও আসছে না, খাট-বাসন-কোসন এসবও কিছু আসছে না। মুখটা চুন করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে রন্তু। আরও একটা দিন গেল, কাল সকাল হলেই জন্মতিথি, কিন্তু কোথাও কিছু নেই!

এসে পর্যন্ত দেখছে এ বাড়ীর সবাই ওদের কাজে ব্যস্ত। শুনে এসেছিল মামার বাড়ী গিয়ে সবার কাছে খুব আদর পাবে, তা ত হয়ই নি, দু' এক জন ছাড়া সবার সঙ্গে ভাল করে জানাশোনাও হয় নি যে জিজ্ঞেস করে—দাদুর জন্মতিথি এসে পড়ল অথচ ঘটার কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন। একটু জানাশোনা হয়েছে ছোটমামার সঙ্গে, আর সেই যেন দাদুর জন্মতিথির জন্য একটু ব্যস্ত, কয়েকবার তার মুখেই শুনল জন্মতিথির জন্য এ জিনিসটা এখন এসে পড়ল না, ও জিনিসটা এসে পড়ল না। তবে ব্যস্ত বলেই তাকে জিজ্ঞেস করবার সুবিধে হচ্ছে না। তবু ওরই মধ্যে একবার একলা পেয়ে জিজ্ঞেস করল—"দাদুর জন্মতিথিতে ঘটা হবে না ?"

ছোটমামা কোথায় যাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়াল, একটু যেন রেগে গিয়ে একটু হেসেই বলল, "এই দেখো। বোকা ছেলে কাজে বেরুচ্ছি পেছু ডেকে দিলে। সেই জন্যই ত যাচ্ছিরে হাবা, ঘটা যখন হবে তখন দেখবি।"

হন্ হন্ করে চলে গেল। সেই থেকে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে সাহসও হচ্ছে না,

কে কাজে যাচ্ছে কে যাচ্ছে না কি করে জানবে? ছোট মামা আদর করে তাই তবু একটু হেসে বকলে, আর কেউ হলে তো চোখ রাঙিয়ে বকত।

মুখ বুজে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে রন্তু। এক একবার মনে হচ্ছে হয় ত কোথাও কিছু নেই, একেবারে হুড় হুড় করে সব এসে পড়বে। যেমন গল্প শুনেছে আলাদীন পিদিম জেলে দিলে আর হুড় হুড় করে সবকিছু এসে পড়ল—প্রকাণ্ড বাড়ী, খাট পালং, নানা রকম খাবার, হাতি ঘোড়া। কিংবা যেমন সিনেমাতে দেখছে, কিংবা যেমন ম্যাজিককে দেখলে সেদিন—কোথাও কিছু নেই, টুপির মধ্যে থেকে ম্যাজিকওলা বের করতে লাগল—রুমাল, জামা, হাঁস, তার ডিম, সন্দেশ, টাকা। মামার বাড়ী এক আশ্চর্য জায়গা সে তো শুনে এসেছেই—ছড়ায়, গল্পে; ওদের দেশের চেয়ে এদেশটা কত বিষয়ে কত নূতন তাও তো দেখে আসছে; এ বিশ্বাসটা করতে মোটেই বাধল না রন্তুর, বরং যতই সময় যেতে লাগল, এখনই কি হয়ে বসে, এইবার বুঝি হু হু করে যোগাড়যন্ত্র আরম্ভ হয়ে যায়—এই রকম একটা আশার সঙ্গে বিশ্বাসটা যেন বেড়েই যেতে লাগল। কোথায় হঠাৎ আরম্ভ হয়ে পড়বে তারই সন্ধানে যেন বাড়ীর এখানে-ওখানে চুপ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।



কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুই না ঘটতে দেখে ওর বিশ্বাসটা যেন কমে আসতে লাগল, যেন স্পষ্ট করে কিছু একটা জানতে না পারলে আর স্বস্তি পাচ্ছে না। এই নৈরাশ্য, তার উপর আর একটা নূতন জিনিস মনে হয়ে ওর এক এক সময় বোধ হচ্ছে যেন কান্না ঠেলে আসছে গলায়।

—দাদুর কথা ভাবছে রন্তু। আহা খুব বুড়ো হয়ে গেছেন, নয় শুয়ে আছেন, না হয় বারান্দাটিতে চেয়ারে বসে আছেন, নিজে কিছু করতে পারেন না, সামান্য কাজও ডেকে ডেকে করাতে হয়, কেউ যদি একটু না ভাবে তাঁর জন্মতিথির এত বড় ঘটাটা, তিনি নিজে হাতে কি করে করবেন? এক একবার দূর থেকে একটু আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে—চোখ বুজে গড়গড়ায় তামাক খেতে খেতে কত কি যেন ভাবছেন দাদু—নিশ্চয় এই সব কথাই বড় অসহায় বলে বোধ হয় ওঁকে, গলায় কান্না ঠেলে আসে রন্তুর।

ঘুম পাচ্ছে। একটু পরেই দিদিমা ছোটদের ডেকে খাওয়াতে বসাবেন; তার পরেই ঘুমিয়ে পড়বে রন্তু। দাদু চেয়ারে চোখ বুজে বসে তামাক খাবেন, জন্মতিথির কি

হবে কেউ ভাববে না সেকথা, আহা! রন্তু দাদুকে ভালবাসে তাই তার মনে এত কষ্ট, আর দাদুর ত নিজের জন্মতিথি, তাঁর মনে যে কি কষ্টটা হচ্ছে তা কি বোঝে না রন্তু? তার পর ভাবল একটু গোড়া বেঁধে এগোনাই ভাল, সব কথা ত ঠিকমত জানেও না, এই ত দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে যা ভেবেছিল তা হচ্ছে না; প্রশ্ন করল—"পাঁচ মামা ত তোমার নিজেরই ছেলে দাদু?"

দাদু যে হঠাৎ অমন করে গড়গড়ার নলটা মুখে থেকে সরিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন কেন রন্তু তা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল; দাদু হেসেই বললে—"ধরে নিলুম আমারই, তা কি বলতে চাস তুই? লজ্জায় পড়ে গেছে, রন্তু একবার মাথাটা ঘুরিয়ে চারিদিকটা দেখে নিল কেউ শুনছে কিনা। তার পর বলল—"বলছিলাম তা হলে তোমার বেলায় ও-বাড়ীর কত্তার মত ঘটা হচ্ছে না কেন? তোমার ত একজন ছেলে বেশী দাদু।"

এবারেও একটু হেসে উঠলেন দাদু, বললেন—"তার যে শ্রাদ্ধ ছিল, ছেলেরা ঘটা করে দানসাগরের উজ্জুগ করেছে।"

একটু আবার ভাবতেই হ'ল, তারপর মাথাটা আর একটু এগিয়ে দাদুর কাঁধে রেখে বলল,—"আমিও সেই কথাই বলছিলাম দাদু। তুমি মামাদের ডেকে বলে দাও না—জন্মতিথিটা থাকগে, তোরা বরং সেরাদ্দই করে দে আমার, দানসাগরের উজ্জুগ করে।··· আহা, এরা সবাই কতদিন পরে এসেছে ঘটা দেখবে বলে।"



প্রবঞ্চনা

প্রজাপতি-সংহিতার আধুনিকতম সংস্করণে লেখা হইয়াছে,—প্রয়োজন বুঝিলে মেয়ে অসাবধান হইয়া হাতের রুমালটি ফেলিয়া দিবে ; ছেলে সেটি সাবধানে তুলিয়া ধরিয়া দাসত্ব-গৌরবের অভিনয় করিয়া বলিবে—"আপনার রুমালটা…"
মেয়ে সেটি গ্রহণ করিয়া বলিবে—"থ্যাংকস", অর্থাৎ ধন্যবাদ। ছেলে প্রবল কুণ্ঠার সহিত বলিবে—"নীড্ নট্ মেনশ্যন।" অর্থাৎ উল্লেখ করে লজ্জা দেবেন না। ইহার পর দুজনে না চাহিবার চেষ্টা করিয়া আর একবার সলজ্জভাবে চাহিয়া ফেলিবে।
অতঃপর সংহিতাকার নিজেই কর্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়িয়া স্থানকালপাত্র হিসাবে ব্যবস্থা করিবেন।
বিমলেন্দু কলিকাতার একটি কলেজে তৃতীয় বাৎসরিক শ্রেণীর ছাত্র। একদিন কলেজের প্রাঙ্গণে ঐ শ্রেণীর নবাগতা ছাত্রী অর্চনা রায়ের রুমালটি কুড়াইয়া দিবার তাহার একটু সুযোগ ঘটিয়া গেল। বিমলেন্দু ছেলেটি বুদ্ধিমান, বুঝিল দুর্যোগের মত সুযোগও কখনও একা আসে না। সে তক্কে তক্কে রহিল এবং এক সপ্তাহের মধ্যে আরও তিনটি অনুরূপ সুযোগ দৈব অথবা তাহার পুরুষকারের বলে ঘটিয়া গেল। চতুর্থ দিবসে

শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধন্যবাদাদির পরও সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে কিছু অতিরিক্ত আলাপ হইল।

বিমল প্রশ্ন করিল—"আপনার কোন্ ইয়ার ক্লাস?" জানা জিনিস লইয়া এরকম অন্ধ সাজিতে গেলে মনের কথাটি বড়ই স্পষ্ট হইয়া ওঠে। অর্চনা সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারিল না, একটু লজ্জিত হইয়া মুখটি ঘুরাইয়া লইল। তখন বিমলেন্দুও সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল—"ও, ঠিক ত! আপনাকে আমাদের থার্ড-ইয়ারেই কোন কোন ক্লাসে যেন দু-একবার দেখেছি বলে মনে হচ্ছে—"

কথাটাকে একটু টানিয়া সত্যরূপ দেওয়া যায়। যতক্ষণ চলে প্রতি মিনিটে বিমলেন্দু অর্চনাকে দু-একবার দেখে। ব্যাপারটা অর্চনার এমন কিছু অবিদিতও নয়; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই মিথ্যার প্রতিবাদ করা ত দূরের কথা, সামান্য অবিশ্বাসের ভাবও দেখাইল না।

বিমল দুটা সিঁড়ি উঠিয়া আবার প্রশ্ন করিল—"আপনার রোল নম্বর?"

অর্চনা উত্তর করিল—"সাতাশী।" সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নও করিল "আপনার?"

বিমলেন্দুর দুই আঙুলে ধরা নোট্ বুকটা সিঁড়িতে পড়িয়া গেল, সেটা কুড়াইয়া লইয়া বলিল—"অষ্টআশী" অর্চনা শুধু একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল—"ও"। তাহার এই অসামান্য কথাটি যেন মোটে জানাই ছিল না।

মিথ্যাকে আমরা প্রবন্ধ বক্তৃতাতে যতই লাঞ্ছনা করি না কেন, এসব ক্ষেত্রে কার্য অগ্রসর করিয়া দিতে অমন বস্তু আর নাই। দিব্য একটি নির্বিঘ্ন প্রচ্ছন্নতার আড়াল দিয়া যেন দর্পণে উভয়ে উভয়ের মর্নটি যেন দেখিয়া লইল।

তাহার পরদিন বিমলেন্দুর ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের জন্য আবার দু-জনের হঠাৎ সিঁড়ির গোড়ায় দেখা হইয়া গেল। বিমল নমস্কার করিয়া বলিল—"আজ দেখছি যে আপনারও বড্ড লেট হয়ে গেল, আমি ভাবলাম বুঝি আমার একারই দেরী হ'ল।"

অর্চনা তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে হাতঘড়িটার দিকে চাহিয়া বলিল—"হ্যাঁ, দেখুন না; একটা মাড়োয়ারী ম্যারেজ প্রসেশ্যনের জন্য গাড়ীটা আট্‌কা পড়ে গেল। প্রায় আধঘন্টা ধরে নিরুপায় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা—সে যে কি বিড়ম্বনা..."

বিমল বলিল—"সে আর বলতে? আমারও খানিকটা দেরী হয়ে গেল। পনের মিনিট দেরী, প্রফেসর গুপ্ত নিশ্চয় প্রেজেন্ট করবেন না; যাব কিনা ভাবছি, এমন সময় আপনাকে দেখে কতকটা ভরসা হল।"

অর্চনা উঠিতে উঠিতেই একটু সলজ্জ হাসির সহিত জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল। বিমলেন্দু একটু হাসিয়া বলিল—"মানে, তিনি লেডি-স্টুডেন্টের অসম্মান করতে পারবেন না ত?...আর তার পরেই আমার রোল নম্বর—প্রেজেন্ট না করে উপায় থাকবে না।"

অর্চনা এই ফন্দির জন্য মুখ ঘুরাইয়া হাসিতে গিয়া একটু দুলিয়া উঠিল। আরও দুইটা সিঁড়ি উঠিয়া কিন্তু সে রাঙা মুখটা গম্ভীর করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বিমল মুখ তুলিয়া চাহিতে, বলিল—"তাঁর দয়ার সুবিধা নেওয়া হবে, তার চেয়ে

একটা পার্সেণ্টেজ হারান ভাল। এ পিরিয়ডটা কমনরুমে গিয়ে বসতে যাচ্ছি। আপনি ত ক্লাসে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখবেন, আপনাদের—স্কলারদের আবার এ্যাটেণ্ডেন্স নিয়ে কড়াকড়ি অনেক··· ।"

বিমলেন্দু সেকথার উত্তর দিয়া অর্চনার চেয়েও মুখটা গম্ভীর করিয়া অতিবড় ধার্মিকের মত বলিল—"ঠিক বলেছেন—তাঁর প্রিন্সিপালটা আমাদের ভাঙান উচিত হবে না। না, চলুন আমিও তাহলে কমনরুমে গিয়ে বসি।"

এইরূপে প্রফেসর গুপ্তর প্রতি অন্যায় করিয়া ফেলিবার ভয়ে দুইজনে নামিয়া কমনরুমে গিয়া বসিল। অবশ্য কমনরুমে বিশেষ কিছু কথাবার্তা হইল না। কারণ উভয়েই প্রফেসর গুপ্ত সেই পিরিয়ডে যে বইখানি পড়াইতেছেন সেইটি খুলিয়া বসিল। বিমলেন্দু দশ-বারো বার খুব সন্তর্পণে দুটি বাঁকাইয়া দেখিল, অর্চনা প্রচণ্ড মনোযোগের সহিত পাঠে নিরত। অর্চনাও পাঁচ-ছয়বার চকিতের জন্য বই হইতে মুখ তুলিয়া দেখিল, বিমলেন্দু বইয়ের সঙ্গে প্রায় মিশিয়া গিয়াছে। বাহ্যজ্ঞান শূন্য বলিলেও চলে! কেউ কাহারও ব্যাঘাত করিল না। সত্যই ত, তাহারা গুপ্তসাহেবের প্রিন্সিপাল ভাঙিবে না বলিয়া না হয় ক্লাসে যায় নাই, তাহা বলিয়া পড়ায় ফাঁকি দেওয়া ত তাদের উদ্দেশ্য নয়।

শুধু, পিরিয়ড শেষ হইলে উঠিয়া দাঁড়াইতে বিমলের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। যেন কত যুগের জন্যেই না বিদায় লইতেছে এইভাবে একটি নমস্কার করিয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—"আচ্ছা, তাহলে আসি মিস রায়। আপনার ত ছুটি এ পিরিয়ডে ?"

অর্চনা বলিল—"হ্যাঁ, এর পরের পিরিয়ডে আমার হিস্ট্রি।"

টেবিলের উপরে বই-খাতার তাড়াটা ঠুকিতে ঠুকিতে বিমল বলিল—"আমার এ পিরিয়ডে ফিলসফি। ভাবছি ছেড়ে দেব ; ছেড়ে দিয়ে হিস্ট্রিই নেব।"

হঠাৎ ফিলসফির উপর এত বিরাগ কেন, আর হিস্ট্রির উপরই বা এত টান কিসের, সে সম্বন্ধে কিছু বলিল না। অর্চনাও অবশ্য জিজ্ঞাসা করিল না।



সপ্তাহখানেক পরের কথা।

বিমলেন্দু এবং অর্চনা একটি বেঞ্চের দুই প্রান্তে বসিয়া আছে। মাঝখানে দুইজনের বই।

কলেজের বেঞ্চ নয়। বেঞ্চের সামনেই একটু দূরে একটি কৃত্রিম হ্রদের কিনারা গোল হইয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। মাথার উপরে একটি হলদে ফুলের মাঝারিগোছের গাছ তাহার ঘন ছায়াটা জলের গায়ে তুলি বুলাইতেছে। কিনারা হইতে হাত দুয়েক পরেই গুটিকতক রাঙা কহলারের গুচ্ছ,—দুইটি ফুটিয়া পরস্পরের পাপড়িতে জড়াজড়ি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ওপারের বেঞ্চে একটা পশ্চিমা, বোধহয় মালী। দিবানিদ্রা সারিয়া এইমাত্র উঠিয়া বসিল।

আজ কলেজে কি একটা কারণে হঠাৎ ছুটি হইয়া গেছে। ইহারা দুইজনে বাসায় ফেরে নাই এখনও।

বিমলেন্দু বলিল—"তোমার মধ্যে আমার যা সবচেয়ে ভাল অর্চনা, তা তোমার এই বিদ্রোহ। তোমায় বুঝতে দিইনি—মেয়ে কলেজ ছেড়ে তুমি যেদিন আমাদের কলেজের ফটক পেরিয়েছ সেই দিনই আমি তোমায় আমার মনের মধ্যেও শ্রদ্ধায় অভ্যর্থনা করে নিয়েছি।"

অন্য রকম কথা হইতেছিল। প্রফেসরদের পড়ানো—শেলী, কীটস, হুইটম্যান, রবীন্দ্রনাথ—আই-এর চেয়ে বি.এ.তে. বিমলেন্দুর আরও ভাল রেজাল্ট করিবার সম্ভাবনা—এর মধ্যে একটু বিরতি দিয়া হঠাৎ বীররসের অবতারণায় অর্চনা একটু যেন লজ্জিত হইয়া গেল। বিমলেন্দুর ভাবের ঘোর লাগিয়াছে, একটু থামিয়া বলিল—"আসল কথা হচ্ছে, তোমার এ এ্যাটিটিউডটুকু আমার জীবন-স্বপ্নের সঙ্গে বড় মিলে গেছে। যা কিছু পুরাতন, যুগজীর্ণ—ব্যক্তিগত রুচিতে, সামাজিক আচারে বা ধর্মের ছদ্মনামে—সে সমস্তর বিরুদ্ধেই আমার অভিমান। আমি সে সমস্তকেই ঘা দেব। এ অভিমানের পথে যারা আমার সঙ্গী, আমার কমরেড, তাদের ওপর যে আমার কত শ্রদ্ধা, তা প্রকাশ করে বলার ভাষা নেই, অর্চনা।"

শেষ পর্যন্ত অর্চনাকেও কথাগুলা স্পর্শ না করিয়া পারিল না; মেয়ে হইলেও, এই যুগের মেয়ে ত—এই যুগের অগ্রণী মেয়ে, বলিল—"আমি বিদ্রোহের কথা বলতে পারি না বিমলবাবু, তবে মেয়েদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থাতে আমার মন সায় দিল না; কলেজের মধ্যেও যেন মোগল-হারেমের রুদ্ধ হাওয়ার গুমোটে আমি হাঁপিয়ে উঠলাম; আমার জীবন-দেবতা আমায় এই পথ দেখিয়ে দিলেন; আমি পা বাড়াতে দ্বিধা করলাম না। আমি বিদ্রোহী কিনা জানি না, তবে আমি যে দ্বিধা-সঙ্কোচ ঠেলে আপনাদের সঙ্গে এসে দাঁড়ালাম, এটা করলাম আমি চিরদিনের বঞ্চিত সমগ্র নারীর অভিযোগ হিসেবেই।" বলিতে বলিতে মুখটা তাহার দীপ্ত হইয়া উঠিল।

এভাবটা কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না—হইবার কি কথা? ফাল্গুনের হাওয়ার মধ্যে মাঝে মাঝে যেমন একটা চৈতীর হল্কা বহিয়া যায় এও সেই রকম।

একটু পরে আবার অর্চনার দৃষ্টি নরম হইয়া আসিল। একটু যেন অভিমানের সুরে অনুযোগ করিল—"আপনারা আমাদের কতই না বঞ্চিত করছেন দেখুন ত।—

এই চমৎকার নীল আকাশ, মুক্ত হাওয়া, জল-স্থলের এই কত রকম সৌন্দর্য, চারিদিকের কত বিচিত্র জীবন, —পুরুষের বিরুদ্ধে আমাদের নালিশ কি…"

বিমলেন্দু হঠাৎ বাধা দিয়া প্রতি-অনুযোগের স্বরে বলিল—"আমি বঞ্চিত করেছি অর্চনা ?"

অর্চনা একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল ; বলিল—"না, আপনার কথা বলছি না ; আপনি ত আমায় এর সন্ধান দিয়ে নিয়েই এলেন, আমি বলছি সাধারণ স্ত্রীজাতি আর পুরুষের কথা। ভাবুন ত আমাদের মেয়েরা কতটা বঞ্চিত থাকে।"

বিমল বলিল—"তাঁরা ইচ্ছে করেও থাকেন অনেকটা।"

"কেন ?"

"ধর, তুমি ত রোজ এখানে একবার করে আসতে পার ; কী, আসবে ?"

অর্চনা একটু হাসিয়া বলিল—"কলেজ কামাই হবে যে ?"

বিমল বলিল—"আমি পারি, যদি এরকম পরিপূর্ণ সৌন্দর্য পাই অর্চনা। বরং কলেজে বসেই আমার মনে হয় আমি এখান থেকে কামাই করছি।"

"পরিপূর্ণ" কথাটার উপর জোর দিল এবং পরে বলিল—"তোমরা বাঁধন ভালবাস অর্চনা, হাজার সৌন্দর্যের জন্যেও বাঁধন কাটতে নারাজ।"

আর একটু পরে সামনের পুষ্পস্তবকের উপর নজর রাখিয়া বলিল—"বোধহয় তোমরা নিজের মধ্যেই পরিপূর্ণ বলে সন্তুষ্ট এবং তৃপ্ত থাক।"

অর্চনা মুখ ঘুরাইয়া তেমন ভাবেই প্রশ্ন করিল—"সবাই কি ?"

তাহার উদ্দেশ্য ছিল বলা—"সবাই কি সন্তুষ্ট থাকে।"

বিমলেন্দুর মনের সুর আরও উঁচু পর্দায় বাঁধা। চোখাচোখি না থাকায় সাহসের সহিত বলিল—"অন্তত তুমিও নিশ্চয়।" তাহার অর্থ ছিল—"তুমি ত নিজের মধ্যেই নিজে পরিপূর্ণ।"



অর্চনা বইগুলো কোলে তুলিয়া লইল ; বিমলেন্দুর কথাটাকে নিজের মনোগত প্রশ্নের উত্তর ভাবিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"আপনি ভুল বলছেন বিমলবাবু।"

বিমল একটু জোরের সহিত বলিল—"না, বলছি না ভুল, অর্চনা কোথায় তোমার অপূর্ণতা, বল কিসে ?"

অর্চনা নিজের ভ্রমটা বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় রাঙিয়া উঠিল। অনেক চেষ্টা করিয়া বিমলের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া বলিতে পারিল—"কোথাকার কথা যে কোথায় এসে পড়ল—উঠবেন না? আমার গাড়ী বোধহয় কলেজে এসে গেছে এতক্ষণ।"

বিমলেন্দু ডাকিল—"রুচি।"

নূতন কাহাকেও ডাকিল না, সে আজকাল অর্চনাকে এইভাবে ডাকিতেছে। এ শ্রেণীর লোককে যদি অমৃত দেওয়া হয় ত সেটাকেও ক্ষীর করিয়া লইয়া ছাড়িবে।

সেই জলের ধারের জায়গাটি। শেষের দিকের দুইটি পিরিয়ডে ছুটি ছিল, সব শেষের পিরিয়ডে প্রফেসর বোস হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন।

আজ ছয়দিন পরে, কিন্তু এই ছয়দিনে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। অর্চনা হইয়াছে রুচি। রুচি প্রবল হইলে বিমলেন্দু কখনও 'অরুচি' বলিয়াও ডাকিয়া ফেলিতেছে। বিমল দর্শনশাস্ত্র ছাড়িয়া ইতিহাস লইয়াছে। আজ এখানে আসার ইতিহাসটুকুও এই ব্যাপারটির সহিত জড়িত। অর্চনার নিকট হইতে পুরাতন নোটগুলি টুকিয়া লইবে, তাই দুইজনে এই নিরিবিলিটুকু আশ্রয় করিয়াছে।

অর্চনা নোটের পাতা উল্টানোর মাঝে থামিয়া উত্তর করিল—"কি?"

বিমলেন্দু প্রত্যুত্তর কিছু দিল না। জড়াজড়ি করিয়া যে রাঙা কহলার দুইটি ছিল, তাহারা আর নাই। সেই শূন্যতাটুকুর দিকে চাহিয়া রহিল।

অর্চনা নোটের পাতা আরও খানিকটা এদিক-ওদিক উল্টাইল। তাহার পর মৌনতার অস্বস্তিটা কাটাইবার জন্যই বোধহয় প্রশ্ন করিল—"গ্রীষ্মের ছুটির আগে যে সোশ্যাল পার্টি হবে তাতে আপনি কোন পার্ট নিলেন না কেন বিমলবাবু? অত করে বললে সবাই।"

বিমল ধীরে ধীরে চক্ষু তুলিয়া প্রশ্ন করিল—"তুমিও একথা জিজ্ঞেস করে জানবে রুচি?"

অর্চনা একটু চিন্তা করিল, আবার নোটের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে তাহার পর একটা পাতা আঙুল দিয়া মুড়িয়া ধরিয়া বলিল—"বুঝলাম না।"

"বিচ্ছেদটা কি একটা উৎসব রুচি?"

অর্চনা প্রথমটা বুঝিতে পারিল না, তাহার কথাটার অর্থ তাহার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া তাহার মনটিকে ভারাক্রান্ত করিয়া দিল। সে মুখ ফিরাইয়া একদিকে চাহিয়া রহিল। সত্যই ত, এই গ্রীষ্মাবকাশের দীর্ঘ তিনটা মাস আর যাহার কাছেই উৎসব সূচিত করুক—অন্ততঃ এ কলেজের দুইটি প্রাণীর কাছে যে করে না তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে?...ওদের সবার সামনে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন—সেই মিলনকেই ওরা আমন্ত্রণ করিতেছে এই উৎসবের দ্বারা। ওরা যে নাম দিয়েছে 'বিদায় অভিনন্দন' ওটা ভুল—ওদের বিদায়ে দুঃখ নাই বলিয়াই এটা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু যে দুজনের পক্ষে এ বিদায় সত্যই বিদায়—এই অবকাশ যাহাদের মধ্যে শতাবধি দিনব্যাপী শতযুগের দাহন আনিবে তাহাদের কি উৎসবের অবসর আছে?

অর্চনার আশ্চর্য বোধ হইল যে, এদিকটা ভাবে নাই কেন এবং যে এই ভাবনায়ই মুহ্যমান, তাহার সামনে একটু অপ্রতিভও হইতে হইল।

সেদিন দুজনে বাহিরে-বাহিরে কথা আর বেশী কিছু হইল না, তবে দুজনের মনের মধ্যে যে সমস্ত কথা নিঃশব্দে উঠিয়া মিলাইয়া যাইতে লাগিল সেসব একই প্রকৃতির।

কলেজ বন্ধ হওয়ার সময় হইয়া গেল। জলের ওধারটার সবুজ ঘাসের উপর দু-একটি করিয়া সাহেবদের ছেলেমেয়েরা আসিয়া খেলা করিতে লাগিল, তাহাদের 'আয়া' আর 'বয়'-রা মোড়ার উপর বসিয়া গল্প করিতেছে।

দুজনে উঠিল। কথার অভাব হইয়া পড়িয়াছে আজ, অথচ উঠিবার সময় যে দীর্ঘশ্বাসটুকু পড়িল সেটাকে ঢাকিতে কিছু বলিতে হয় যেন।

অর্চনার সামনের একটি কহলারের কুঁড়ির দিকে চাহিয়া বলিল—"আচ্ছা, কলেজ যখন খুলবে তখনও এসব ফুটতে থাকবে?"

বিমল বলিল—"কি জানি রুচি? তিনমাস একটা যুগ যে।"

সে-রাত্রে অর্চনার নিদ্রা হইল না। কিন্তু সে তো আর কালিদাসের যুগের মেয়ে নয় যে, বিরহের সূচনাতে শৃঙ্গার পরিত্যাগ করিয়া বীণার তার বাঁধিতে বসিয়া যাইবে।

সকালে উঠিয়া ছোটভাই প্রবীরকে ডাকিয়া বলিল—"বীরু, তোমার বইগুলো নিয়ে এস ত, যেরকম অমনোযোগী হয়ে উঠছ দিন দিন...।"

প্রবীর ছেলেটি ভাল, ইংরেজী পড়া বেশ ভালই দিল। ইতিহাস আনিতে বলা হইল, বেশ সন্তোষজনক উত্তরই দিল। অর্চনা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল—"মুখস্থ করবারগুলো ত একরকম চালিয়ে দিলে, অঙ্ক নিয়ে এস ত দেখি।"

সহজ অঙ্কে আটকাইবে না বুঝিয়া, বেশ বাছা বাছা গোটাকতক অঙ্ক দিল। তাহাতে বেশ মনের মত ফল পাওয়া গেল। ভিতরে ভিতরে ভাইয়ের উপর খুশী হইয়া অর্চনা প্রকাশ্যে রাগতভাবে বলিল—"আমি জানি কিনা—দেখছি এদিকে বেশ গা ঢেলে দিয়েছ।"

অভিভাবক ঠাকুরদাদা। নামজাদা উকিল ছিলেন। লোকে বলে বড় পাকা মাথা। ছিল বোধ এক সময়, এখন সেটি সম্পূর্ণ রূপে নাতনীর হাতে সমর্পণ করিয়া নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করিতেছেন। গঙ্গাস্নান, কালীঘাট ও ভাইটামিন আর পরমায়ুতত্ত্বের আলোচনায় অবসরটা বিভক্ত।

অর্চনা বলিল—"ঠাকুরদা! বীরুর অবস্থা দেখেছ?—অঙ্কেতে ও ডাহা ফেল করবে; এই সামার ভেকেশনের পরেই ওদের পরীক্ষা, মাস তিনেকও নেই। নিজের মোটেই সময় নেই যে দেখি; কি যে হবে..." বড়ই চিন্তান্বিত ভাবটা। বীরুর ডাক পড়িল। আসিলে ঠাকুরদাদা বলিলেন—"অঙ্কটা ঠিক তৈরী নেই শুনছি। তুমি রোজ রাত্তিরে আমার কাছে এসে ব'সো তো এরিথমেটিক নিয়ে।"

অর্চনা একটু চুপ করিল, তাহার পর বলিল—"হ্যাঁ তুমি আবার ঐ কর। একে ভাল

ঘুম হয় না রাত্তিরে, তার ওপর আবার ওর সঙ্গে ব'কে ব'কে···আমি বলছিলাম একটা না হয় 'টিউটর রেখে দাও না।"

টিউটর সম্বন্ধে ঠাকুরদার চিরকালই আপত্তি; বলেন—ও ত বাজারের নোটের সামিল—শুধু হাত পা আছে, চলে বেড়ায় এই যা তফাৎ। কাল পর্যন্ত অর্চনারও এই মত ছিল। গত রাত্রি হইতে বদলাইয়াছে। বলিল—"বরাবর না হয়, অন্ততঃ তিন মাসের জন্যে একটু সামলে দিক, তারপর···"



ঠাকুরদা চিন্তিতভাবে বলিলেন—"টিউটর?···তা তুমি যখন বলছ···নিজে মেকআপ্ ক'রে নিতে পারবে না বীরু তুমি? সেই হত ভাল—আত্মচেষ্টা···"

বীরু উৎসাহভরে উত্তর দেওয়ার আগেই অর্চনা বলিল—"না, পারবে না।"—এমন জোরের সহিত বলিল যে বীরু চুপ করিয়া রহিল।

"তা হলে দেখ···তোমাদের মাস্টার কেউ রাজী হবেন বীরু? তিন মাসের জন্যে? জিজ্ঞাসা কয়ে দেখবে আজকে।"

বীরু উত্তর দিবার আগেই অর্চনা আবার জোর দিয়া বলিল—না, না, হবে না রাজী; স্কুলের মাস্টারদের বাঁধা টুইশ্যন থাকে।"

বীরু আবার চুপ করিয়া গেল। ঠাকুরদাদা বলিলেন—"হয়েছে। তোমাদের কলেজের কোন ছেলে পাওয়া যাবে না? জিজ্ঞাসা করে দেখো না, সামনে তিনমাসের ছুটি পড়ে রয়েছে।"

"তুমি কথাগুলো একটু ভেবে বলত ঠাকুরদা। আমি জিজ্ঞাসা করতে যাব?—আমার সেখানে কার সঙ্গে জানা শোনা?"

"তবে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেবে? দাঁড়াও, আমি নাহয় দেখি দুচারজনকে জিজ্ঞেস করে।"

ঠাকুরদাদার হাতে গেলেই ত বেহাত হইল! কলেজে এতটা অপরিচয়ের ভাবটা দেখান ভাল হইল না। একটু চিন্তা করিয়া অর্চনা বলিল—"বোসো ঠাকুরদা, এক কাজ

করা যাবে, একটা বিজ্ঞাপনের মত লিখে পিওনকে দিয়ে আমাদের কলেজের নোটিশ-বোর্ডে টাঙিয়ে দেবখন। যারা চায় তোমার সঙ্গে দেখা করুক, তুমি বেছে নিও।'
"তুমিও থাকবে ত?"
"না আমার দ্বারা হবে না।"
"থাকলে ভাল হ'ত। লোক বাছা একটু শক্ত কি না।"



লোক বাছা একটুও শক্ত হইল না, কারণ অতবড় কলেজের মধ্য হইতে একটিমাত্র ছেলে আসিয়া ঠাকুরদাদার সহিত দেখা করিল। তিনি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া কাগজ পড়িতেছিলেন। ছেলেটি বারান্দায় উঠিয়া একটি নমস্কার করিয়া বলিল—"এই কি উমেশবাবুর বাড়ী? তাঁর সঙ্গে মানে, তিনি" "...আমিই উমেশবাবু, কি দরকার আপনার?' "আমাদের কলেজের নোটিশবোর্ডের একটা এ্যাডভারটাইজমেণ্ট'...ঠাকুরদাদা উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন—"ও হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক, আমার চাই একটি টিউটর। কোন ইয়ারে পড়েন আপনি?' ছেলেটি ঢোক গিলিয়া বলিল—"থার্ড ইয়ারে।' বেশ ছেলেটি, দীর্ঘ সবল চেহারা, শাদা ছিমছাম পরিচ্ছদ, মুখে বেশ একটি বুদ্ধির দ্যুতি। একটা আবেদন লইয়া আসিয়াছে; কিন্তু কোথাও হীনতার ভাব নাই, একটু সলজ্জ বলিতে পারা যায়।
বৃদ্ধের ভাল লাগিল, বলিলেন—"বসুন বসুন ঐ চেয়ারটায়। থার্ড ইয়ারে পড়েন। তাহলে আমাদের অর্চ্চনার সঙ্গে আলাপ আছে নিশ্চয়?'
ছেলেটি অজ্ঞের মত একটু ভ্রু কুঞ্চিত করিল মাত্র, যেন মনে করিবার চেষ্টা করিতেছে।
"চেনেন না? কটি ফিমেল স্টুডেণ্ট থার্ড ইয়ারে?"
ছেলেটি ভ্রু দুইটি একটু তুলিয়া বলিল—"ও মিস রায়ের কথা বলছেন? তিনি কি এই বাড়ীতেই..."
"আমার নাতনী কিনা। এই ত ছিল একটু আগে। অর্চু..."
প্রবীর আসিয়া বলিল—"দিদি এইমাত্র গাড়ীতে করে বেরিয়ে গেল।"
"কোথায় গেল হঠাৎ?...যাক্ আলাপ হবেই। হ্যাঁ, কলেজে আর আলাপ হবে কি

করে? অত সময় ত আর পাওয়া যায় না।...এই ছেলেটি আপনার ছাত্র। তোমার মাস্টারমশাই, বীরু, প্রণাম কর।...কি নাম আপনার?"
"বিমলেন্দু দত্ত।"
"থার্ড-ইয়ার, বি এসসি?"
"আজ্ঞে না, আর্টস।"
"কি কি সাবজেক্ট নিয়েছেন? আর সাবজেক্টের জন্যও ভারি বাধা? ছাত্র আপনার মোটে ফিফ্থ ক্লাসে পড়ে।"
"ম্যাথমেটিক্স আর হিস্ট্রি।"
"অর্চুরও এই কম্বিনেশন।"
বিমলেন্দু চোখ তুলিয়া সামনের গাছটার ডগায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কি একটা দেখিতে লাগিল।
ঠাকুরদা মনে মনে হাসিয়া নিজের মনেই বলিলেন—"দেখ এ-যুগ আর সে-যুগ! শ্যামবাজারে মেয়ে স্কুল খুলল, মাইলখানেক পথ ঘুরে কলেজে গেছি—একটু পাশ দিয়ে যাবার লোভে। আর এরা এক ক্লাসে পড়ে, এক কম্বিনেশন, নাম পর্যন্ত জানে না। ভাল্‌ই।" এযুগের এ বেচারীরা একটু লাজুক বেশী। মেয়েরা যতই বাহির হইয়া আসিতেছে, ইহারা ততই যেন অন্তর্মুখী হইয়া পড়িতেছে। অথচ শরীরের চর্চাও করে সব পুরুষের চেয়ে বেশী। পুরুষালি ভাব আছে, ইঞ্চি ইঞ্চি করিয়া সযত্নে বুকের ছাতি বাড়ায়—চওড়া ছাতি চিতাইয়া দাঁড়ায়। এই ছেলেটি ওদেরই টাইপ। বেশ ভাল লাগিতেছিল বিমলেন্দুকে। নূতন পড়িয়ে হিসাবে কথাবার্তা একটু বেশীই হইল বরং—টুইশ্যন পরিধির বাহিরেও গড়াইয়া গেল।
"অনার্স নেওয়া হয়েছে?...অর্চু নিলে না। মেয়েদের অতটা দরকারও নেই।"
"হুঁ, ম্যাথিমেটিক্সে অনার্স। হাই এডুকেশনের যা অবস্থা। পড়ে লোকে করবে কি? আপনার উদ্দেশ্যটা কি? ঠিক করেছেন কিছু?"
"দেখি, কমপিটিভ এগজামিনেশান দেওয়ার ইচ্ছে আছে কোন একটা।"
বিমলেন্দুর আর যাহাই দোষ থাক, আত্মশ্লাঘাটা নাই। কথাটা নিজের কানেই একটু গালভরা শুনাইল বলিয়া জুড়িয়া দিল, "কোনরকম ব্যাকিং-এর জোর নেই কিনা যে এমনি এমনি চাকরি কোথাও পেতে পারব।"
বাঃ, বেশ ছেলে, ঠাকুরদাদার উত্তরোত্তর এর সাহচর্যটি বেশী করিয়া ভাল লাগিতেছিল—প্রজাপতি কি অবতীর্ণ হইলেন বৃদ্ধের মধ্যে? একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু কুণ্ঠাও হইতেছিল। অবশেষে একটু ঘুরাইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, স্টুডেন্ট কেরিয়ার ভাল হলে ওদিবেই চেষ্টা করা ভাল।"
মুখের দিকে একটু সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিলেন, কিন্তু কোনো উত্তর না পাইয়া সোজাসুজিই জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার ম্যাট্রিক, আই-এতে কোন প্লেস ছিল?"
বিমলেন্দু একটু লজ্জিতভাবে উত্তর দিল—"আজ্ঞে না, প্লেস কোন ছিল না, তবে..."

একটু থামিয়া বলিল—"ম্যাট্রিকে একটা ডিভিশনাল স্কলারশিপ পেয়েছিলাম, আই-এতেও পাচ্ছি একটা স্কলারশিপ, তবে ঠিক প্লেস থাকা বলা যায় না।" বলিয়া মাথা একটু নীচু করিল।

"বড় আনন্দ হলো শুনে। অল-ইণ্ডিয়া কম্পিটিশনে যাবেন। ওদিকে আমাদের বাঙালী ছেলেরা বেশী এগুচ্ছে না, ঠিক হচ্ছে না এটা।···বীরু তোমার মাস্টার মশাইকে চা-টা এনে দাও।—অল-ইণ্ডিয়াতেই দেবেন। কই, আমরা তিন-চার জেনারেশনে যে জায়গাটা হাসিল করলাম বাঙালী জাতটার জন্যে, আপনারা তা রাখতে পারছেন কই?"

বিমলেন্দু লজ্জিতভাবে কহিল—"অপবাদটা আপনাদের দেওয়া নিতান্ত অসঙ্গত নয়, তবে কারণ ত একটা নয়—জানেনই ত।"

"তা হোক, তবু আপনাদের মত ভাল ছেলেদের জাতের প্রতি একটা কর্তব্য আছে। না, চেষ্টা করতে হবে, আমি আপনার রেজাল্ট ওয়াচ করতে থাকবো।" হাসিয়া বলিলেন—"আপনি বোধহয় ভাবছেন—আমি করতে এলাম মাস্টারি, আমার উপর এ আবার কোত্থেকে এক মাস্টার জুটে গেল রে বাবা। কি জানেন? বসে বসে কাগজে দেশের দুঃখ-দুর্দশার কথা পড়ে বড় দমে যেতে হয়। বুড়ো হয়ে আর বেশী ঘোরা-ফেরা, সভাসমিতি চলে না যে এ নিয়ে একটু চর্চা করব; তাই একটা রোগ দাঁড়িয়ে গেছেই—ইয়ংম্যান কাউকে কাছে পেলেই—"



বীরু চা-জলখাবার লইয়া আসিল। অনেক রকম কথা হইল। নানান রকম খবর রাখে ছেলেটি, আর যাহা বলে—নিতান্ত ভাসা ভাসা নয়। ওঠার সময় ঠাকুরদাদা বলিলেন—"তাহলে আপনি পড়াতে আরম্ভ করে দিন যত শীঘ্র পারেন। ছাত্র আপনার অঙ্কে একটু কাঁচা, ঐদিকটা একটু একটু করে হেল্প করে যাবেন। আমি আবার বেশী কোচিং পছন্দ করি না। হ্যাঁ, টারমসের কথা ··"

এমন সময় বাড়ীর গাড়ীটা ফটক পার হইয়া গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে অর্চনা।

সে ভাবিয়াছিল, এতক্ষণে বিমলেন্দু নিশ্চয়ই চলিয়া গিয়া থাকিবে। তাহাকে ঠাকুরদাদার সহিত বারান্দায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সংকোচে দুজনের নিকটই সংকোচে গাড়ী হইতে নামিতে পা উঠিতেছিল না। কিন্তু তখন আর তাহার ফিরিবার পথ নাই।

ঠাকুরদাদা উৎফুল্ল ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"এই যে অর্চুও এসেছে। নেমে এস। ইনিই বীরুর টিউশনের জন্য এসেছেন।...কোথায় ঘুরছিলে অর্চু তুমি? এত সকালেও ঘেমে উঠেছ, মুখখানা রাঙা হয়ে গেছে।...চেন বোধহয় এঁকে? তোমাদের ক্লাসেই পড়েন। কি যে বেশ নামটা বললেন আপনার?"

নিজের নাম বলা যে অবস্থা বিশেষে এত শক্ত বিমলের তাহা জানা ছিল না। গলার কাছের এলোমেলো অক্ষরগুলো কোন রকমে গুছাইয়া বলিল—"বিম—বিমলেন্—দু।"

হাতের রুমালটা কপালের ঘামের উপর চাপিয়া অর্চনা অজ্ঞের মত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইল—একটু পূর্বে বিমল নিজে যেমন দাঁড়াইয়াছিল, কোন মতেই মনে পড়িতেছে না নামটা।



জানকী-মাঈ

একটা দরকারি কাজ নিয়ে পাটনায় এসেছি, কয়েকদিন লাগবে। বারান্দার টেবিলের সামনে বসে কাজ করছি, ডাকপিয়ন এসে একটা চিঠি দিল। প্রশ্ন করল, "দেখুন তো, আপনার কি না ?"

ঠিকানার বানানে একটু ভুল আছে বলেই প্রশ্নটা। দেখে নিয়ে বললাম, "হ্যাঁ, আমারই।" ও চলে গেল।

উল্টে দেখি, ছোট-বড় আঁকাবাঁকা অক্ষরে আমার নাতি শঙ্করের লেখা। বাংলা স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে সবে উঠেছে। লিখছে—

"মেজোদাদু, আমাদের বাড়িতে জানকী-মাঈ এসেছেন। আর শুধু তিনদিন থাকিবেন। সব কাজ ফেলে যত তাড়াতাড়ি পারো চলে এসো। পাড়ায় তুলকালাম পড়িয়া গেছে। প্রণাম নেবে। সেবক শঙ্কর।"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ছেলেমানুষের লেখা, একটা যে কিছু গলদ আছেই, বেশ বোঝা যায়। কিন্তু মা-জানকী বাড়িতে এসেছেন, তিনদিন মাত্র থাকবেন, পাড়ায় হৈ-চৈ পড়ে গেছে—এর মানে কী ? একটু স্থির হয়ে ভাববার চেষ্টা করলাম, 'জানকী' বলে আমাদের কে আছে বাইরে ? না হয় সীতাই, জানকী নামটা বাঙালির ঘরে শুনিনিও··· কই, কেউ তো নেই এরকম নামের···

খেয়াল হল এখানে আসা পর্যন্ত বাড়ির কোন খবর নেওয়া হয়নি। টেবিলের ওপর থেকে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে একটা ট্রাংক কল বুক করে দিলাম। একটু পরে ওদিক থেকে উত্তর এল। শঙ্করের মেজোদিদি শর্মিলা ধরেছে। বললাম, "এক্ষুনি শঙ্করের একটা চিঠি পেলাম, বাড়িতে জানকী-মাঈ এসেছেন। কী ব্যাপার বল দিকি?"

টেলিফোনে প্রথমে একটু হাসি ভেসে এল। তার পরেই, "আমার কাছে আমল না পেয়ে শেষে তোমায় ধরেছে?···ওসব আর আজকাল কেউ বিশ্বাস করে? তুমিই বলো মেজোদাদু—কোনওই কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই···"

শর্মিলা কলেজে পড়ে, তায় আবার সাইকোলজি, অর্থাৎ মনস্তত্ত্বের ছাত্রী। একটা ধমক দিতে হল, "ডেঁপোমি ছেড়ে সটে বল কী হয়েছে। তিন মিনিটে পাঁচ টাকা খরচ করাচ্ছিস্, মনে থাকে যেন।"

বলল, "কোথা থেকে একটা হনুমান জুটে মেজদিদির মেয়ে বুবুনের ভক্ত হয়ে উঠেছে, আঁচড়ায় না, কামড়ায় না, তাই থেকে···"

"বুঝেছি। সাবধানে থাকতে বলবি, যতই ভক্ত হোক।"

রেখে দিলাম রিসিভারটা।

চিন্তাটা কিন্তু লেগেই রইল। ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল। ওদের বাবার অফিসের কাজে ট্যুরে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। তাড়াতাড়ির মধ্যে জিজ্ঞেস করাও হল না গেছে কি না। বাঁদর, হনুমান, এরা বড়দের কাছেই তাড়া খায়, তাই তাদের যেমন ভয় করে তেমনি চটাও তাদের ওপর। কচি-কাঁচারা ঘাঁটায় না বলে ওরাও কিছু বলে না, বরং পছন্দই করে, বাধা না পেলে ওদের প্রথায় আদর করতেও দেখা যায়।

বুবুনের বয়স বছর-আড়াই। অত্যন্ত মিশুকে, আদুরে, সবার কোলে-পিঠেই ঘোরে। ব্যাপারটা তা-ই হয়ে থাকবে। আমাদের এটা আবার খাস মিথিলা, মা-জানকীর দেশই··· যতই ভাবি, ভাবনার ফিকিরিই বের হয়। এই সেদিন আবার সীতাপঞ্চমী গেল, সীতা-বিবাহের দিন। একটা বিশ্বাস চালু আছে এদেশে, এই সময় সীতা নাকি স্বর্গ থেকে নেমে আসেন। কারও কারও ওপর 'ভর' হয়। অবশ্য ওসব মেয়েলি কথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু এই বিশ্বাসেই নিশ্চিন্ত হয়ে যদি একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসে হুজুগের মাথায়!

নিজের মাথাটা উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। শেষে একটা ঠিকও করে ফেললাম। গঙ্গার পুলটা হয়ে পাটনা-দ্বারভাঙ্গা এখন মাত্র তিন ঘন্টার রাস্তা। আজ সন্ধ্যা হয়ে আসছে, কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ি প্রথম বাসে। স্বচক্ষে দেখেশুনে সব ঠিকঠাক করে দিয়ে একদিনেই ফিরে আসতে পারব।

শঙ্করের ভাষায় পাড়ায় যে একটা বেশ তুলকালাম পড়ে গেছে, তার নমুনা পাওয়া গেল। আমি পৌঁছলাম বেলা দশটায়। গেট পেরিয়ে রিকশা থেকে নেমে দেখি,

বাড়ির দোরগোড়ায় সিঁড়ির ওপর পাঁচ-ছ'জন এদেশী স্ত্রীলোকের জটলা। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে; হাতে বা কোলের কাছে থালায় কিংবা কুলোয় ফুল, কিছু মিষ্টি —প্যাঁড়া, বাতাসা, লাড্ডু। একটা করে 'বদ্ধি'। অর্থাৎ মাঝে-মাঝে জরি-জড়ানো লাল সুতোর মালা, ধূপকাঠি, পান, সুপুরি। সবার একরকম না হলেও মোটামুটি এই। তবে ফলের মধ্যে শুধু পাকা কলা।

দোর প্রায় বন্ধ করেই রেখেছে। আমি পৌঁছতে জায়গা করে দিতে ভেতরে গিয়ে আর-এক দৃশ্য। উঠোনের মাঝখানে একটা রংচঙে আসন-পাতা জলচৌকির ওপর বুবুন পা ঝুলিয়ে বসে, ফ্রকের ওপর গোটা চার-পাঁচ 'বদ্ধি'র মালা ঝুলছে, ডান হাতে একটা প্যাঁড়া। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পায়ে আলতা পরানোর সঙ্গে গুনগুন করে গান গাইছে, দু'একটা শব্দে মনে হল কবি বিদ্যাপতির লেখা গান। আরও চার-পাঁচজন পূজারিনী অপেক্ষা করছে, দু'একজনের মুখ চেনাও। দেখেশুনে একটু অপ্রতিভই হয়ে পড়েছি, তবু কিছু একটা বলবার জন্য ওকেই উদ্দেশ করে বললাম, "বাঃ, বুবুন আমাদের যে সত্যিই জানকী-মাঈ হল দেখছি। তা, তোমার রামচন্দ্র কোথায়?"



আড়াইটে বছরও বোধহয় এখনও পুরো হয়নি, মেয়েটা কিন্তু এর মধ্যে কথার ঝুড়ি হয়ে উঠেছে। "নামতন্দোর? নামতন্দোর, বনে গেথে।" উত্তর করল বুবুন। কারও শেখানোই হবে নিশ্চয়, কিন্তু পা দুলিয়ে প্যাঁড়াটায় কামড় দিয়ে বলার ভঙ্গিতে সবাই আধঘোমটার মধ্যে দুলে-দুলে হেসে উঠল। উঠোন পেরিয়ে ঘরের দিকে যেতে-যেতে বললাম, "তা তুই সঙ্গে গেলিনি যে?"

"প্যাঁলা···মিট্টি!"

সেইজন্যেই যায়নি, ছেলেমানুষ, অত ভেবে বলেনি নিশ্চয়, কিন্তু এবার যা হাসি উঠল, তাতে সমস্ত বাড়িটাই যেন দুলে উঠল। ঘরে ঢুকব, সেখানে আমাদের প্রতিবেশী ঘরের বাঙালি মেয়েদের আর-এক জটলা। চৌকাঠের এদিক থেকেই ফিরে এসেছি, ওপর থেকে শঙ্করের মা কথা মুখে করেই নেমে আসছেন ব্যস্ত হয়ে, "আপনি এসে গেছেন মেজোকাকা? বাঁচলাম। কী আতান্তরে যে পড়ে গেছি। পুজো দেবার

ঘটা—কাউকে বারণ করতে পারি না, আর সত্যিই সে কাণ্ড যদি দেখেন। কী যে করে গোদা হনুমানটা এসে…"

বলে ফেলে যেন শুধরে নিয়ে জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "সবাই বলছেন মহাবীরজি নিজেই এসেছেন…" আমায় পেয়ে যেন আরও গুছিয়ে বলতে পারছেন না।
বললাম, "চলো, ওপরেই, এখানে গোলমালে হবে না। অচিন্ত্য ট্যুরে গেছে?"
বললেন, "হয়তো ফিরতে দেরি হবে। আজ জামাইও এসেছেন, তরুণ; নিয়ে যাওয়ার কথা ওদের। ও'র বদলিটাও হয়ে গেছে, যা চাইছিলেন। খুব ঘটা করে প্রীতিভোজ দিয়েছিল ফেয়ারওয়েল-পার্টিতে, তার সঙ্গে সিনেমার স্লাইড। উনি এলেই দু'বাড়ির ছেলেমেয়েরা ঘেরেঘুরে বসে, হুল্লোড় পছন্দ করেন তো, তাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কাটিয়ে, কলেজে এক বন্ধু আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন।"
"মেয়ে দু'জন?" প্রশ্ন করলাম আমি।
"শ্রাবণী আর শর্মিলা নীচের ঘরেই আছে। আমাদের পাড়ার অনেকে আসছেন তো রোজই, তাঁদের সঙ্গে গল্প করছে।"
"হুঁ; ভেতরের দিকে নিশ্চয়, তাই আমায় দেখতে পায়নি।"
কথা কইতে কইতে ওপরের ঘরে এসে পড়েছি। একটা চেয়ারে বসে বললাম, "এবার বলো তো, ব্যাপারটা কী? বাঙালির মেয়েরাও পুজো দিতে আসেন?"
"আসেন বইকি, যাঁর মনে একটু শ্রদ্ধাভক্তি আছে। এদেশী মেয়েরা চলে গেলে এঁরা দেবেন। তবে, ওরকম নয়। পাঁচখানা ফ্রক পেয়েছে, কিছু এদিক-ওদিক খেলনাও। আবার নাক সিঁটকোবার লোকও আছে, বিশেষ করে কলেজের কয়েকটা মেয়ে। ওই করতেই আসে তারা। ঘরের মধ্যে এদেরই কণ্ঠ শুনেছেন নিশ্চয়?"
আমি হেসে ফেললাম। বললাম, "তাদের মধ্যে তোমার মেজো মেয়ে শর্মিলাও আছে নিশ্চয়? কাল টেলিফোনে…"
"জানি মেজোকাকা, ভাঙে তো মচকায় না," বাধা দিয়ে বললেন বৌমা, "এদিকে আড়াল হয়ে ঠাকুর-দেবতার ছবির সামনে জোড়হাতে দাঁড়িয়েও আছে।"
"পরীক্ষার সময় তো? বেশ, বলো তুমি।"
"কী বলব কাকা, আমার তো ভয়ে হাত পা অসাড় হয়ে আসছে।" বলে আর যা-সব বললেন তা মোটামুটি এই :

প্রথমেই লক্ষ্য করবার জিনিস, ওদের ভাগলপুরে হনুমানের খুব উৎপাত থাকলেও এখানে একেবারে নেই। দৈবাৎ একটা যদি কোথাও ছিটকে এসে পড়ল তো একটু-আধটু তাড়া খেলেই শহর ছেড়ে পালায়। এ-ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম। বুবুনকে নিয়ে শ্রাবণী শ্বশুরবাড়ি থেকে আসার পর হঠাৎ একটা গোদা হনুমান এসে শহরে এমন উৎপাত লাগিয়ে দিল, যেন তিষ্ঠোনো যায় না। কারও অনিষ্ট করা নয় বিশেষ, শুধু এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি, এ-ছাত থেকে ও-ছাত, সুবিধে পেল তো কারও ঘরের মধ্যেই ঢুকে পড়ল। ঠিক যেন মনে হয় কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যতই পাচ্ছে না,

ততই খেপে উঠেছে, তাড়া খেলে দাঁত খিঁচুনো, তেড়ে আসা—ওই পর্যন্ত। তারপর একদিন এই ব্যাপারটা হল।

এ-জায়গাটা মাঝ-শহরের একটু এদিকে বলে গোদাটা আসে না। একদিন বিকেলে সবাই উঠোনের মাঝখানে বসে গল্প করছেন, ভাগলপুরের হনুমানেরই গল্প, বুবুন ও-বাড়ির তুতুনের সঙ্গে খেলা করছে, বুবুনই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "মহাবিলুজি! মহাবিলুজি! তলা খাবি?"

সবাই দ্যাখে, ওপরে পুজোর ঘরের ছাতের আলসের ওপর একটি হনুমান কখন এসে বসে আছে। সবাই ভয়ে উঠে পড়ে। উঠে উঠোনের একদিকে জড়ো হয়েছে। ততক্ষণে বুবুন ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে পুরো একছড়া কলা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে হনুমানটার সামনে উপস্থিত। একটু হুঁশ ফিরে আসতে সবাই ছুটেছে। শ্রাবণী বলল, "ভয় নেই, আর কিছু করতে হবে না, তামাশাটা দেখে যাও শুধু।"

বুবুন সামনে উবু হয়ে বসে, "তলা খাবি, তলা খাবি" বলে কাঁদি থেকে একটা করে ভেঙে দিচ্ছে, মাঝে-মাঝে মাথায় হাতও বুলিয়ে দিচ্ছে, গোদাটা চুপ করে বসে খোসা ছাড়িয়ে খেয়ে যাচ্ছে। এদিকে সবাই দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে আড়ষ্ট হয়ে। শেষ হয়ে গেলে বলল, "এবাল দা, আল নেই। আবাল তাল আথবি, তলা দোব।"

যেন বিশেষ কিছু হয়নি, এইভাবে বুবুন লাফাতে লাফাতে ফিরে এল।

গোদাটা যেমন এসেছিল, দু'লাফে ওদিক দিয়ে কোথায় চলে গেল।

ততক্ষণে নীচের সবার পুজো শেষ হয়েছে। সংক্ষিপ্ত পুজোই। বাঙালি মেয়েদের আরও সংক্ষিপ্তই—একটা কিছু উপহার, প্রণাম, বেশি বয়সের যাঁরা, তাঁদের মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে।



বিবরণটা শেষ করে বউমা বললেন, "এই কাণ্ড মেজোকাকা। আরও আছে, ও'দের বিদায় করে আসি, নইলে কথা উঠবে যে, বাড়িতে মা-জানকী এসেছেন, গিন্নির তাই মাটিতে পা পড়ে না! এর মধ্যেই একটু হিংসের ভাব এসে গেছে, চেনেনই তো আমাদের জাতটাকে! ওই নিন, জামাইও এসে গেছেন। আপনিও তাহলে চলুন। পুজোর ঘরে একটা কাজে এসেছিলাম, ঘরটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। এসেই যে ঘরে ঢুকে পড়েনি, আমার বাবার ভাগ্যি!"

নীচে আসতে রঞ্জন প্রশ্ন করল, "আপনি হঠাৎ যে দাদু ?"

নাতি-নাতজামাই দেখলে আমার ঠাট্টার জন্যে মুখ চুলকোয়। বললাম, "আসার সময় কোথা থেকে এক সঙ্গী এনে হাজির করেছ শুনলাম, যুগলরূপ দেখবার জন্যে ছুটে এলাম।"

ও উত্তর দিতে যাচ্ছিল, "তোলা রইল দাদু ! মা রয়েছেন এখন।"

বললাম, "হঠাৎ আসা নয়। তোমাদের দলেরই একজনের হঠাৎ এক চিঠি কাল—'জানকী-মাঈ এসেছেন, মাত্র তিনদিন থাকবেন।' আসতেই হল ছুটে। কী ব্যাপার বলো দিকিন ?"

হাসিঠাট্টার ভাবটা কেটে গিয়ে সবাই গম্ভীর হয়ে পড়েছি। তার মধ্যে রঞ্জন বলল, "একেবারে অতটা নয়, এটা আবার সীতার দেশ বলে বাড়াবাড়ি দেখছি, তবু খানিকটা আশ্চর্যই বইকি। বুবুন তো সেখানেও একজন হিরোইন হয়ে উঠেছে।"

তারপর শ্রাবণীর দিকে চেয়ে বলল, "তুমিই বলো না, আমার কিছু বেফাঁস বেরিয়ে গেলে দাদু তো মুখিয়েই আছেন।"

বাইরে কিছু মতামত না দিলেও, একেবারে মা-জানকীর মা হওয়ার জন্যে ভেতরে ভেতরে শ্রাবণীর একটু গুমোর এসে পড়া স্বাভাবিকই। বলল, "বাঁদর-হনুমানেরা ছোটদের কিছু বলে না, এটা জানা কথা, তবু বুবুনের বেলায় একটু বাড়াবাড়িই বইকি। সেখানেও এই রকম একটা হনুমান নিয়েই, মুখ দেখে তো চেনবার জো নেই, তবে পাড়ার অনেকের মতেই খোদ মহাবীরজিই। ভাগলপুরে তো ওদের উৎপাতের অন্ত নেই, তাই দেখেছেন আমাদের বাড়িটা আগাগোড়া গ্রিল দিয়ে মোড়া। বাবা আর তাঁর ছেলের (রঞ্জনের দিকে চেয়ে নিয়ে) সামনে পড়লে তাড়াই খায়, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ভয়ও দেখায়, কিন্তু বুবুন যদি এল তো একেবারে অন্য চেহারা। এঁরা তাড়ালেও যাবে না, মুখ খিঁচিয়ে ভয়ও দেখাবে না, একেবারে কাঁচুমাচু হয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে—কত যেন কাকুতিমিনতি—কলা দু'চারটে থাকেই ঘরে—এরকম তো হচ্ছেই রোজ দু'তিনবার করে। বুবুন 'মহাবিল, তলা থাবি, তলা থাবি' বলে গ্রিলের মধ্যে দিয়ে হাত বাড়িয়ে কলা দেবে, ও খেতে খেতে মুখ তুলে দাঁত খিঁচুবে, ওটা তখন ওদের হাসি, চোখের ভঙ্গি করে চাইবে—কথা তো কইতে পারে না, ওই বোধহয় ওদের ভাষা।

"এদিকে বুবুন গায়ে-মাথায় সমানে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে, মুখে ওই 'আল খাবি ? আল নেই, দা। আবাল বিতেলে আথবি।"

"ঠিক বিকেল চারটের সময় আবার একবার আসবেই হনুমানটা। তখনও বাবা আর ইনি অফিস থেকে আসেননি তা, থাকলেই একটু আগলে দাঁড়াবেন, ওর সেটুকুও পছন্দ নয় যেন, একেবারে খালি আসর চাই…"

খানিকক্ষণ চলল এই আলোচনা, তারপর খাবার টেবিলে বসেও। ততক্ষণে ভেবেচিন্তে আমিও একটা মতলব ঠিক করে নিয়েছি। বললাম, "এ একটা উটকো, কোথা থেকে এসে পড়া হনুমান কি স্বয়ং মহাবীর, সেটা জাতভাই বলে রঞ্জনেরই চিনে নেওয়ার

কথা। তবু, তোমাদের বিশ্বাস, রামায়ণ থেকে মহাবীরজিই নেমে এসেছেন। এ-কথাটা মেনে নিলেও তোমাদের সাবধান হওয়া দরকার। তোমাদের দু'জনকেই বলছি। প্রথমত, কলা ছড়াতে ছড়াতে যদি বাড়িটা এই রকম তীর্থস্থান হয়ে পড়ে, পাড়া ছেড়ে সমস্ত শহরের তীর্থ, এইরকম পুজোর ঘটা, তাহলে বাড়ি ছেড়ে তোমাদেরও পালানো ছাড়া উপায় থাকবে না। এই হল প্রথম কথা। দ্বিতীয়ত, যদি রঞ্জনের আন্দাজই ঠিক হয়, ওদের মেজাজ ও-ই ভাল জানে, তাহলেও তোমাদের সাবধান হতে হবে। বুনো জানোয়ার, কোনও কারণে হঠাৎ খেপে উঠতে কতক্ষণ? তাই বলি, তোমরা আস্তে আস্তে এরকম ঢালাও কলার সাপ্লাইটা বন্ধ করো। একটা, দুটো, ব্যস। যদি জানকীভক্ত মহাবীর না হয়ে কদলীভক্ত হনুমান হয় তো আসা ছেড়ে দেবে।"

ওরা তিনদিন পরে চলে যাচ্ছে, তার সঙ্গে আমার চিকিৎসা চালু রাখবার জন্যে আমিও থেকে গেলাম। বাড়ির পেছনে একটা ছোট বাগান আছে, আমার শখ। গুটিতিনেক কাঁদি কলা পড়েছে, তবে কাঁচা, সেজন্যই হোক, বা মা-জানকীর সম্পত্তি বলেই হোক, সেদিকে নজর দেয়নি।

দুপুরবেলা সবাই ঘুমিয়েছি, হনুমানটা এসেছিল কি না জানি না, তবে বিকেল চারটের পর আমরা চা খাচ্ছি, আবার সকালের সেই ব্যাপার। হনুমানটা লাফ দিয়ে সেই জায়গাটায় এসে বসল। বুবুন কোথায় খেলছিল, "মহাবিল, তলা খাবি? তলা খাবি?" বলে ছুটে এসে দেখে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। এবার কিন্তু ওই পর্যন্ত। পুজোর কলা যা জমা হয়েছিল, আমার কথামতো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেরিয়ে এসে মুখ চুন করে আমাদের দিকে চেয়ে হাত ঘুরিয়ে বলল, "দা, দা, তলা নেই। মহাবিল কী খাবে?"

চেহারা দেখলে দুঃখ হয়। শ্রাবণী উঠে পড়ে বলল, "অনেক কলা খেয়ে মহাবীরজির অসুখ করেছে, জাদু। একটা দিচ্ছি, দাও তো। বলো আবার কাল আসতে।"

পাকা মেয়ে। মুখ চুন করে প্রশ্ন করল, "ওছুদ নেই?"

রঞ্জন বলল, "ওকে ভোলাবে? এখন হাজির করো ওষুধ।"

শ্রাবণী বলল, "ওষুধ দরকার হবে না। আর কলা না খেলে আপনিই ভাল হয়ে যাবে। যাও, লক্ষ্মীটি।"

নিরাশ হয়ে মন্থর গতিতে উঠে গেল বুবুন। কী হয় দেখবার জন্যে আমরা উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলাম ছাতের দিকে।

তারপর যা হল তা সত্যি দেখবার মতো। বুবুন ওপরে গিয়ে কলাটা দিতে, ছাড়িয়ে খেয়ে নিয়ে কাতর দৃষ্টিতে ওর মুখের পানে চাইছে হনুমানটা, মাথা ঘুরিয়ে দেখছে ফ্রকের পকেটে লুকিয়ে রেখেছে কি না, কুনকুন করে কান্নার মতো একটা টানা আওয়াজ করে যাচ্ছে, বুবুন সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছে, "তেঁদো না খোনা, অথুক কলবে, তেতো ওছুদ খেতে হবে…।" গায়ে-পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে একবার ওর মাথাটা টেনে নিজের মাথার সঙ্গে চেপে ধরল। ওর মা যেমন করে ওর আবদার ভাঙাবার চেষ্টা করে।

সবাই একেবারে নির্বাক হয়ে গেছি। তখন কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার আরও বাকি। হনুমানটা কান্নার মতো সেই শব্দটা করতে করতে মাথাটা নিচু করে বুবুনের পায়ের ওপর ঘষতে লাগল। বুবুনও কীরকম হয়ে গিয়ে ওপর-নীচে বিহ্বলভাবে চাইছে। শ্রাবণী বলল, "আর যেন দেখা যায় না! কী করি বলো দিকিন মেজোদাদু? এততেও যদি মানুষের রামচন্দ্রের সেই মহাবীরজি বলে বিশ্বাস..."
রঞ্জন বাধা দিয়ে বলল, "কোনও সার্কাসের শেখানো হনুমানও তো হতে পারে। পালিয়ে..."



"তুমি চুপ করো দৈবজ্ঞিমশাই! নাস্তিক!" চোখ পাকিয়ে ধমক দিয়ে উঠল শ্রাবণী। বলল, "যা বোঝো না, তাতে ফোড়ন দিতে এসো না। আমি আর-দুটো দিয়ে আসি।"
দুর্বল মন তো, আমিও একটু কীরকম হয়ে গেছি, বললাম, 'তা হলে দিবি তো। বেশিই নিয়ে যাস। আস্তে আস্তে সওয়াতে হবে।'
পরদিনও সকালে-বিকেলে এই রকম করা হল। মহাবীরজি জানকী-মায়ের পায়ে মাথা ঘষছে—কথাটা ছড়িয়ে পড়ে দর্শকের ভিড় গেছে বেড়ে, এদেশী, বাঙালি—শর্মিলার সঙ্গে কলেজের মেয়েরাও আর তত 'আধুনিক' নয়। আলোচনার ধারাটাও আসছে বদলে, এমন সময় আর-এক কাণ্ড!
শ্রাবণীরা আজ সন্ধ্যের গাড়িতে ফিরে যাবে। এদিকে আর-এক ব্যাপার হচ্ছে কাল থেকে। হনুমানটা দু'দিন সকালে এসেছে আগের মতো, কিন্তু কাল বিকেলে আসেনি, আজও সাড়ে-পাঁচটা হয়ে গেল, এল না। আমরা চা খেতে খেতে এই আলোচনা করছি, শ্রাবণী ভেতরে গোছগাছ করছে। শর্মিলা বলল, 'তা হলে বোধহয় ভাগলপুরে আগেভাগে খবরটা দিতে গেছে।'
বৌমা বললেন, "গেছে নয়, গেছেন বল্। দেখছিস ঠাকুর-দেবতারই কাণ্ড!"
শর্মিলা বলল, "তা হলে আমিও বলি, তোমাদের হতচ্ছেদ্দা দেখে অভিমানেই..."

এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে হঠাৎ শ্রাবণীর গলার আওয়াজ একেবারে সপ্তম, "কোথায় গেল সে হতভাগা মেয়ে? আস্ত রাখব না তাকে। তার জানকী-মাঈ হওয়া আমি ঘোচাচ্ছি।…বুবুন, কোথায় গেলি?"

হাতে কলার কাঁদির লম্বা ডাঁটাটা, মাত্র দুটো কলা লেগে রয়েছে। তুলে ধরে বলল, "এই দ্যাখো কী করেছে। মেজোদাদুর বাগানের সবচেয়ে সেরা কানাইবাঁশি কলার কাঁদিটা পাকিয়ে সেখানে নিয়ে গিয়ে সবাইকে দেখাব বলে কোণের ঘরে একেবারে আলমারির পেছনে লুকিয়ে রেখেছিলাম।…বুবুন, কোথায় গেলি? বেরিয়ে আয় বলছি।…দু'দিন থেকে দুপুরে ঘুম ভেঙে দেখি পাশে নেই—উঠে-উঠে গোদাটাকে খাইয়েছে। এই খালি ডাঁটা যদি ওর পিঠে না ভাঙি…।" রাগে মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছে, হাতের ডাঁটাটা কাঁপছে। এত হঠাৎ আর এতই প্রত্যক্ষ যে, সবাই অবাক হয়ে গিয়ে কী যে বলব যেন ভেবে পাচ্ছি না।

আমিই একটু চেষ্টা করলাম মোড়টা ফেরাতে। বললাম, "ও তো দু'দিন থেকে আসছেই না। তা ছাড়া এদিকে অমন করে লুকিয়ে রেখেছিলি বলছিস…ও বেচারি ছেলেমানুষ…"



ঘুরে আমার দিকে চেয়ে ঝেঁঝে উঠল শ্রাবণী, "তোমার আদরের 'মা-মণি'কে চেনো না তুমি যখন মেজোদাদু, তখন তার হয়ে ওকালতি করতে এসো না। সমস্ত বাড়ির অলিগলি ওর নখদর্পণে। আর আমার নিজের একটি একটি করে গোনা তিরাশুটা কলা ওই পেটে সেঁধিয়েছে এই দুটো দিনে। অত বড় কানাইবাঁশি কলা এক একটা, তার নড়বার ক্ষমতা আছে যে, লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটে আসবে?…না, এসব আমায় ভুলিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র, আমি কিন্তু ভুলব না।…কোথায় গেলি, বেরিয়ে আয় বলছি বুবুনি।… বেশ, আমিই তবে এই আসছি।"

পা বাড়িয়েছে। "থাম, আমি দেখছি, অত মা-গিরি ফলাতে হবে না," বলে আমিও উঠতে যাব, শঙ্কর পাশেই মুখ চুন করে বসে ছিল, আমার জামায় টান দিল ঝুঁকে প্রশ্ন করলাম, "তোমার আবার কী?"

সবাই থমকে গেছে। একবার সবার ওপর দিয়ে নজর বুলিয়ে এনে কানে কানে যা বলল, তাতে আমার মুখে একটু হাসি আর সবার দৃষ্টিতে কৌতূহল ফুটে উঠল।

হাসিটা স্পষ্ট করে নিয়ে রঞ্জনের দিকে একটু চেয়ে নিয়ে বললাম, "শঙ্কর বলছে, সেদিন সাহেবগঞ্জে ফেয়ারওয়েল পার্টিতে যেমন ঘটা করে রঞ্জনকে প্রীতিভোজ খাইয়েছে, বুঝলে সেই রকম বিদায়ের সময় তার ভক্তকে কলার কাঁদিটা…"

বৌমা মুখ টিপে ঘাড় হে'ট করে তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন। তারপর সবার মুখেই যে হাসিটা ফুটি-ফু'ট করেছিল, সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়ে সবাই দুলে-দুলে হেসে উঠল। রঞ্জনও বাদ গেল না। শ্রাবণী তার দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি হেনে হাসি-হাসি মুখটা ঘুরিয়ে চলে গেলে সে-ও শঙ্করকে উদ্দেশ করে ওদের সম্বন্ধের মধুর সম্ভাষণ উচ্চারণ করে হাসতে হাসতেই চলে গেল।

শঙ্কর বেশ হতভম্ব মেরে গেছে। বয়সে অত বড় ভগ্নীপতিকে ঠাট্টা করার সাহস নেই, অতটা বুদ্ধির দৌড়ও হয়নি। ভাগ্নীটিকে ভালবাসে। তার বিপদে ভেবেচিন্তে একটা সমাধান করেছে মাত্র, স্নেহশীল মামার সরল বিশ্বাসেই। সবাই উঠে গিয়ে বারান্দা খালি হয়ে গেলে, বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, "রাগ করলে নাকি মেজোদাদু?" পিঠে হাত দিয়ে উত্তর দিলাম, "না রাগ করলে কেউ হাসে? তুমি খেলোগে যাও।"



কী ছিল বিধাতার মনে…

অফঃস্বলের একটি ছিমছাম ছোট শহর। মর্যাদায় জেলার সাবডিভিশন। দুটি স্কুল, একটি মেয়েদের। একটি কলেজ সম্প্রতি খুলেছে। বছর দুই হল।

প্রথম ব্যাচের মধ্যে ঢুকল কাজল। এখন দ্বিতীয় বার্ষিকে রয়েছে, আর তিনটি মেয়ের সঙ্গে।

সেশনের মাঝামাঝি আর একটি মেয়ে এসে ভর্তি হল, নাম দীপা। বাবা শশীশেখর, আই-এ-এস, সাবডিভিশনের কর্তা হয়ে এসেছেন।

কলেজে কো-এডুকেশন। দ্বিতীয় বার্ষিকে ঐ পাঁচটি মেয়ে আবার দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। তিনটি আর্টস, দুটি সায়েন্স। দীপা আর কাজল সায়েন্সের ছাত্রী। দুজনের খুব ভাব হয়ে গেল। গভীর অন্তরঙ্গতা।

অথচ মিলের মধ্যে ঐটুকু ছাড়া আর সব বিষয়েই দুজনে আলাদা। "কাজল" কালো বলে নয়, বেশ ফর্সাই। নিঃসন্তান মাসির কি করে নামটা বড় মিষ্টি লাগে বলে তুলে রাখা ছিল, বোনঝি পেল। দীপা কালো না হলেও ফর্সাও বলা যায় না। কুঁতিয়ে—কুঁতিয়ে মাজা শ্যামবর্ণ। বড় অফিসারের মেয়ে, একটু মডার্ণ; ঠাটঠমক আছে। গার্লস স্কুলের হেডমাস্টারের মেয়ে কাজল নাজুক, হেডমাস্টারের বাড়ির

ডিসিপ্লিনের জন্য হোক, বা জন্মগত স্বভাবেই হোক, নিতান্ত সাদামাটা। ক্লাসে ছেলেমেয়ে মিলিয়ে সেই প্রথম, তবু যেন ব্যাক বেঞ্চারের মতোই লাজুক, স্বল্পবাক। কলেজের 'ডিবেটে' দীপা অংশগ্রহণ করে, বেশ ভালভাবেই করে ; কাজল হলের এক কোণে চুপ করে বসে শোনে। একটু জড়োসড়ো হয়েই।

মুখ খোলে, যখন দুজনে একত্র হয়। হয়ও খুব বেশি। দুটো বাড়ি খুব কাছাকাছি। সাবডিভিশনাল অফিসারের সরকারি কোয়ার্টার্স অর্থাৎ দীপাদের বাসাটা বেশ একটা বড় কম্পাউন্ডের মধ্যে। তার পরেই, দুটো বাড়ির পর কাজলদের বাড়ি। বিকালে কম্পাউন্ডের মধ্যেই কাটে দুজনের। ছুটির দিন অন্য সময়েও। বাড়ি থেকে একটু সরে, এক পাশে একটি চমৎকার সবুজ লন্। দুটি লোহার গার্ডেনবেঞ্চ পাতা। পেছনে ভালো ক'রে ছাঁটা একটা মেহদি গাছের বেড়া, কোয়ার্টার্স্‌টাকে আলাদা ক'রে রেখেছে। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে গল্পগুজব করার জায়গা। লনে একটি ব্যাড্‌মিন্টন্ কোর্ট আছে। বিকেলে পাঁচ-সাতটি মেয়ে জোটে প্রতিদিন। খেলার ঝোঁকে যদি কণ্ঠস্বর একটু মাত্রা ছাড়িয়ে ওঠে তো ক্ষতি হয় না। অথবা, যদি বয়েসধর্মের দু-একটা টীকা-টিপ্পনি।

গোড়ার দিকে কাজলের ভূমিকা ছিল প্রায় শুধু দর্শকের। ক্রমে খোঁচা দিয়ে দিয়ে তারও খানিকটা রূপান্তর ঘটিয়েছে সবাই। নামে খেলতে, কণ্ঠস্বরও একটু বল্গাহীন হয়ে পড়ে কখন কখনও। তবে, ওর সব কিছু তোলা থাকে যেন সব শেষে দীপার অপেক্ষায়। দলটা পাতলা হয়ে গেলে ভদ্রা থাকে কিছুক্ষণ। তারপর শুধু ওরা দুজন কোয়ার্টার্সে আলো না জ্বলা পর্যন্ত, কত কী যে গল্প হয় ওরাই জানে—কলেজের গল্প, বয়সের গল্প—তার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান। গল্প করে কুলিয়ে উঠতে পারে না দুজনে। আর্টসের আর একটা মেয়ে রমলা জোটে কোন কোন দিন, খানিকটা দূরে বাড়ি, তার ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে আসে। একটু মুখফোড়, কৌতুকপ্রিয়, এসেই জমিয়ে তোলে। একদিন উঠে যাওয়ার সময় বলল—"এবার তোমরা আসর ছেড়ে কর্তা-গিন্নিকে একটা একলা থাকতে দেবে না ? দেখছ না অবস্থাটা ?"

একটু হাসি উঠে সবার নজর ওদের দুজনের ওপর গিয়ে পড়ল। ভদ্রা বলল—"দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবে ?" রমলা বলল—"কিম্বা ভাবী নাট্যের রিহার্সাল ?"

রমলার আবির্ভাব মানেই খেলায় বিরতি। দীপা কোর্ট ছেড়ে, খালি দেখেই হোক, বা অভ্যাস বশেই হোক, কাজলের পাশে এসে বসেছে, র‍্যাকেট ঘোরাতে ঘোরাতে বলল—"তোদের কাররই হল না। সেদিন ষষ্ঠীতলায় "জয়দেব" যাত্রায় জোড়া হয়ে সঙ্গীদের নাচ দেখলি নি ?

—"কে কার বর, কে কার কনে, বেছে নাও মনে মনে…"

বাঁ হাতটা দিয়ে ওর কাঁধটা জড়িয়ে ধরতে কাজল বিব্রত হয়ে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ক'রে বলল—"রক্ষে করো! এমনি যা জ্বালাচ্ছ এর ওপর আর বর হয়ে কাজ নেই।"

কথা বড় একটা কয় না, বরং কইতে জানে না বলেই বিব্রত ভাবটা বেশি করে ফুটে ওঠে। বেশ একচোট হাসি ওঠে ছলকে।

সবাই চলে গেলে ওদের গল্প আরম্ভ হল। দীপা যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। হাতটা তখনও কাজলের কাঁধে অন্যমনস্কভাবে রাখা রয়েছে, সে আলাদাভাবে সেটা নিজের কোলের ওপর নামিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল—"রাগ করলি ?·· কড়া ক'রে ফেলেছি ?"

দীপা হেসে ফেলল। বলল—"দ্যাখো পাগলামি !"



সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল—"একটা কথা ভাবছিলাম কাজু।·· দ্যাখ, এই তো বেশ তালের মাথায় বললি কথাটা—বেশ আসর জমানো কথাই—বেশ জমেও উঠল হাসিটা, কিন্তু মুখ থেকে রা বের করবিনি। কখনও এর জন্যে আড়ালে কথা ওঠে—গোমড়ামুখী, ক্লাসের সেরা মেয়ে, স্কলার, তার গুমোর।—এ পর্যন্তও কানে গেছে—আমার সঙ্গে এত দহরম-মহরম, আমি আই-এ-এস মেয়ে বলেই···"

"হয়েছে ?" কোলের হাতটা দু হাতে চেপে বাধা দিল কাজল। একটু হেসে বলল—"অমনি মেয়ের ভাব উথলে উঠল। তুই তো বিশ্বাস করিস না এসব, তা হলেই হোল।" কোলের হাতটা নিয়ে আস্তে আস্তে রাখল।

দীপা একটু চুপ করে কি ভাবল সামনের দিকে চেয়ে। তারপর ঠোঁটে একটু হাসি নিয়ে ওর দিকে চেয়ে বলল—"বিশ্বাস করি না নিশ্চয়, তবে যা বললাম তার মধ্যে ভাবের সঙ্গে ভাবনাও আছে অনেকখানি কাজল···"

"ভাবনাটা কি নিয়ে ?"

"তোকে এবার একটু চনমনে, মুখফোড় হতেই হবে কাজল, নৈলে···"

"ওদের কাছে বদনাম ?···আমার অনেক কথা মনে আসে দীপা, অনেক কিছু হবার, অনেক কিছু করবার, কিন্তু এক কাকা ছাড়া এত কড়াকাড়ি বাড়িতে।···থাক্ বড় সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছি। কেন হঠাৎ চনমনে হয়ে ওঠার কথা বলছিলি তাই বল।···"

"জানিস, তুই যখন ডিবেটে জবাব দিস, আমি মনে মনে তোর জবাবের জবাব শানাতে থাকি, তারপর ··"

"দ্যাখো শয়তানি !" দীপা শিউরে চোখ কপালে তুলল। প্রশ্ন করল—"তা দিস না কেন ? পরেও তো দিতে পারিস।"

"শোনো কথা। তখন তো আর ডিবেটে প্রতিপক্ষ নয় তুই। তোর মুখ দেখলেই সব গুলিয়ে ফেলি।" দুজনেই হেসে উঠল।

দীপা হাসি থামিয়ে বলল—"শোন্, যা করেছিস করেছিস, আর ডিবেটে চুপ করে থাকলে চলবে না। তোদের কনজারভেটিভ বাড়ি। সেদিন বড় কাকিমা এসেছিলেন আমাদের বাড়ি। ওঁদের সবচেয়ে বড় আলোচনা ছেলেমেয়েদের বিয়েতে? (একটু হেসে) আমি আমাদের জাতিগত স্বভাবটা ছাড়িনি—তুইও যেন ছাড়িসনে—আমারই বিয়ের কথা হচ্ছে ভেবে একটু নিরাপদ আড়ালে কান পেতে দাঁড়িয়ে ছিলাম—টের পেলাম—না, কাকিমা তোর বিয়ের জন্যেই ধীরে-সুস্থে পাত্র খুঁজছে—তোকে নাকি আর রাখা যায় না—এরপর তাদের ইচ্ছে হয় তো পড়াক কত পড়াবে। তাহলে তো শিয়রে সংক্রান্তি, এসে পড়লে করবি কি? ধর্, যদি আমার মতই বর জুটে গেল কপালে…"

'তোকে ডেকে নোব সামলানোর জন্যে।"

"বেহাত হয়ে যাবার ভয় নেই?"

"পালটা জবাব দিলেই হবে।"

"তা তুমি পার। মিনমিনে ডাইন, ছেলে খাওয়ার রাক্ষস!"

দুজনেই খিলখিল করে হেসে উঠল।

বেশি হাসিতে দীপার ডাগর চোখে জল এসে যায়। মুছে নিল দীপা। তার পরেই আবার গম্ভীর হয়ে পড়ল; এবার একটু যেন বিষণ্ণও, যার জন্যে কাজল প্রশ্ন করল—"আবার কি নতুন ভাব-ভাবনা এল?"

দীপা বলল—"আছে বৈকি একটু কাজু। আসলে তুই মানুষটা এই রকম সব দিকেই চৌকস। কিন্তু কেউ জানলে না, কাউকে দেখাতে পারলাম না…"

"আবার সেই‥"

বাধা দিতে যবে, তার আগেই দীপা সজাগ হয়ে বলে উঠল—"হ্যাঁ, যা বলতে যাচ্ছিলাম—তোকে দেখেই মনে পড়ে যায়, তারপর সঙ্গে সঙ্গে ভুলেও যাই—তুই রবীন্দ্রনাথের 'দুই পাখি' কবিতাটা পড়লি? বলেছিলাম যে?"

"মুখস্থও করে ফেলেছি।"

"হয়ে গেছে মুখস্থ এর মধ্যে? কই বলিসনি তো!"

"মাস্টারকে শুধু মুখস্থ শোনালেই হবে না তো। মনে সাড়া জাগতে পারছি কই?"

"নাঃ, তোর সত্যি হবে না কাজু; তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়। নে, ওঠ্।"

"আমিও তাই একটা ঠিক করে নিয়েছি। এখন তুই যদি রাজী হোস।"

"আবার কি?"

"ওসব হাঙ্গামে না গিয়ে দুজনে গলা জড়াজড়ি করে 'কে কার বর কে কার কনে' করে যদি কাটিয়ে দিই তো কেমন হয়?"

"মন্দ কি?" দীপা হেসে উত্তর করল।

বলল—"অন্ততঃ খাঁচা-আকাশের দ্বন্দ্বটা ঘুচে যায়। ওঠ্!"
অলক্ষ্যে বিধাতা একটু হাসলেন। খেয়ালি পুরুষ, দ্বন্দ্বটা একেবারে না মিটিয়ে শুধু পাল্লাটা দিলেন উল্টে।



অনেক দিন হয়ে গেছে, প্রায় নয় বৎসর। এর মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে যা প্রত্যাশিত, স্বাভাবিক ভাবেই ঘটবার কথা, আবার এমন অনেক, যা ছিল স্বপ্নেরও অগোচর।
যা প্রত্যাশিত তার মধ্যে কাজলের যথাকালে বি. এস. সি. অনার্সে প্রথম স্থান নিয়ে পাস করা। যা প্রত্যাশিত তা রজতের বাবার একরকম উপযাচক হয়েই পুত্রের জন্য কাজলকে চেয়ে নেওয়া; পাস করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। রজত ইলেক্‌ট্রনিক্সে একটা বড় মানপত্র পেয়ে অ্যামেরিকার একটা বড় কারখানায় কাজ পেয়েছে। দেনাপাওনার কথা নেই; জোর তলব, ভাববারও সময় নেই। বাড়ির আর সবাই যত কনজারভেটিভ, কাজলের কাকা তার বেশি লিবারেল। খাঁচার দরজা আলগা হতে দেরি হল না। একদিন রজত এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল পাখীটাকে।
এর পরই, যা একেবারেই অবিশ্বাস মনে হবে দীপাকে ঢুকতে হলো পিঞ্জরেই। তাই বলতে হয় বৈকি, পাস করার পর দু মাসও গেল না। অমন প্রাণচঞ্চল মেয়ের ঐটুকু নিঃসঙ্গতা বোধ হয় বিধাতারও ভালো লাগল না।
বলেছি, কাজলের বাড়িতে আর সবাই কনজারভেটিভ, শুধু কাকা ঘোর লিবারেল; দীপাদের সংসারে আর সবাই—বিশেষ করে মেয়েদের দল লিবারেল, অনেকটা আধুনিক আইডিয়ার, শুধু কর্তা শশিশেখর নিজে কনজারভেটিভ। একজন পদস্থ অফিসার, আই. এ. এস. বলে আশ্চর্য মনে হলেও। তাঁরও সমন্ন-সীমা ছিল মেয়ের বি. এস. সি. পাস দেওয়া। মনে মনে একটি ছেলে ঠিক করে, পাকা করেই রেখেছিলেন, নির্বাচনে মতভেদ হ'তে পারে ব'লে ভাঙেন নি কারুর কাছে, দীপার পাস করার পর আর দেরি করলেন না।
গঙ্গার পশ্চিম ধা'র একটি এই রকম গোছানো-গাছানো শহর কলকাতা-হাওড়ার কথা ছেড়ে দিতে হয়, নৈলে গঙ্গার তীরের শহর পুরাতনকে খানিকটা রাখেই আটকে আচার-ঐতিহ্যের মধ্যে। না, খুব বড় হলেও দুই ভাইয়ের একটি একান্নবর্তী সংসার।

কর্তা বাইরে একটি কলেজে প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, বছর তিন হল অবসর নিয়ে বাড়ি এসে বসেছেন। ভাঙ্গা জমিদার পরিবার। ছোট ভাইও বেশ উচ্চশিক্ষিত, তবে কাজ করতে হয় না। সম্পত্তি দেখাশোনা করেন, তার সঙ্গে নিঃশুল্ক হোমিওপ্যাথি সঙ্গী আছে। বাড়িতে দুই ভাই মিলিয়ে তিনটি ছেলে, দুটি মেয়ে। অ্যালোপ্যাথি-অঙ্গের কিছু ঢুকতে দেন না ছোট ভাই, ফ্যামিলি প্ল্যানিং পর্যন্ত নিষিদ্ধ। ফলে, দুটি ছেলে, আর একটি মেয়েরই নাতিনাতনিতে বাড়ি জমজমাট। বিবাহ হল তৃতীয় পুত্র সত্যপ্রিয়র সঙ্গে। এম-কম-এ উচ্চ স্থান নিয়ে পাস করেছে। পার্টনারশিপে একটা ভালো কারবারে বসাবার কথা ভাবছেন কর্তা। কনজারভেটিভ হোক, কিন্তু শশিশেখর অবুঝ নন। একদিন মোটরে করে সবাইকে ভাবী জামাতার বাড়ি দেখিয়ে আনলেন। দীপাও বাদ গেল না। ভদ্র, সম্ভ্রান্ত, সমৃদ্ধ পরিবার। একেবারে হাল ফ্যাশানের মতো আধুনিক নয় বলে কারো আপত্তির কিছু রইল না বিশেষ আকর্ষণ হয়ে রইল পাত্র সত্যপ্রিয়। প্রিয়দর্শন, চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তির সঙ্গে একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে। বাড়ির ছোট, ছেলে, তার ওপর তাকে কেন্দ্র ক'রেই এই সমারোহ বলে একটু সলজ্জ। এর জন্য বেশি ক'রে দীপার মারই স্নেহ আদায় করে নিল, কাছে বসিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে, স্নেহের অবান্তর প্রশ্নাদি করে কাটালেন কিছুক্ষণ বেশ। পিঁড়িতে বসবার আগেই অর্ধেকটা বিবাহ হয়ে গেল সত্যপ্রিয়র।

সঙ্গিনীদের দিয়ে দীপাকে প্রশ্ন করানো হ'লে বলল—"আমি কি বলব? আমায় পিঁজরে ঢোকাবার ব্যবস্থা হচ্ছে, জানি ঢুকতেই হবে।"

এসব ক্ষেত্রে মেয়েরা যেমন বলে থাকে দুদিক বাঁচিয়ে। একদিন কর্তা অখিলেশ সাত-খানা মোটর সহযোগে ছেলেকে নিয়ে এসে পুত্রবধূকে নিয়ে গেলেন।

এরপর বছর নয়েক আর দুই সঙ্গীতে দেখা হয় নি। বছর চার আগে মাত্র চারদিনের জন্যে কাজল এসেছিল স্বামী-স্ত্রীতে, ছোট ভাইয়ের বিবাহে। দীপা তখন সত্যপ্রিয়র সঙ্গে দার্জিলিঙে। হঠাৎ এসে হঠাৎ চলে যাওয়া, দেখা হয় নি। প্রথম-প্রথম চিঠিপত্র একটু ঘন ঘনই। তারপর কমতে কমতে এখন কালেভদ্রে একটি। চিঠি যেতে-আসতেও তো অনেক সময় নেয়। ভুলে যেতে হয়। তা ছাড়া সময়ও থাকে না হাতে। কাজল ওখানে গিয়ে ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে একটা ভালো কাজ পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরি সায়েন্সের ক্লাস করছে। দীপার একান্নবর্তী পরিবারে অনেক কাজ। তার ওপর একটি ছেলে চার বছর হল, একটি বছর দেড়েকের। পা হয়েছে, বাড়ি মাত করে বেড়ায়। বাড়িতে ঝি-চাকরের অভাব নেই, তবু সামলাতে হয়। ওরা যতটা চায় ততটা না পেলেও বাড়ির শাসনে একেবারে বঞ্চিত করা চলে না।

আসতে অনেকবারই লিখেছে দীপা, একেবারেই দেশ ছেড়ে দেওয়া। এবার ছিল কড়া চিঠি। সামনের সরস্বতী পুজোয় খোকনের হাতে খড়ি, আসতেই হবে দুজনকে। এবার না এলে এই শেষ চিঠি। দুটিকে সামলাতে শরীর ভেঙে গেছে, আর দেখা নাও হ'তে পারে।

এটা অবশ্য শুধু ভয় দেখানোই। মেয়েরা ভালো থাকলে বলে শরীর ভালো নেই, ভালো না থাকলে বলে, "কী এমন হয়েছে? বেশ তো আছি।"
এল দুজনে। কাজলের কোলে একটি দু'বছরের মেয়ে। বারো দিনের জন্যে এসেছে। বাড়িতে দু'দিন কাটিয়ে এল। এখানে দুদিন থেকে বাড়ি ফিরে গিয়ে আরও দুটো দিন কাটিয়ে পশ্চিম ভারতের অজন্তা ইলোরা প্রভৃতি কয়েটি স্থান দেখে দিল্লী হয়ে ফিরে যাবে। সব প্লেনে ঘোরাফেরা। ট্যুর-প্রোগ্রাম ঠিক করা আছে।



পুজার আগের দিন এল ওরা; সত্যপ্রিয়ই মোটরে করে নিয়ে এল, দীপাকে সঙ্গে নিয়ে। একটু এখানে ছন্দপতন হবেই, তবে বুদ্ধিমতী মেয়ে, সামলে-সুমলে রইল কাজল। মাথার চুলে ববটা করেনি, সেখানে ফোলা-ফাঁপা শ্যাম্পু করে থাকে ও, এখানে এসে তাও দিয়েছে ছেড়ে। শাড়ি-ব্লাউজ, মেয়েদের চম্পল, পায়ে আলতাও পড়ে নিয়েছে, লিপ্স্টিক এখানে চলেই গেছে, ও তাও দিল না। বেরোবার আগে দীপা-সত্যকে পান দেওয়ার সময় নিজেও একটা মুখে দিয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিল। একটু আড়াল হয়ে আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক করে নিচ্ছিল, দীপার নজর পড়ে যাওয়ায় সে একটু হেসে টিপ্পনি করল—"বুঝেছি।"
একটু সমস্যা দাঁড়াল রজতকে নিয়ে। ধুতি পরার অভ্যাসটা একেবারেই গেছে। বিশেষ ক্ষতি ছিল না, কারই বা আছে আর? তবে, পুরাতনপন্থী বাড়ি, তায় নেমেই সরস্বতী পুজা। একেবারে পাটভাঙা নূতন ধুতি কোমরে রাখাও কঠিন। প'রে, সেফ্টিপিন দিয়ে আটকে রাখা গেল। কাজল সচেতন করে দিল—"দেখো, গুনে গুনে যত্ন করে রেখো। হারালে ওখানে আর চাওয়া যাবে না—'কেন? কি জন্যে?—সাত বখেরায় পড়ে যেতে হবে।"
সকাল থেকেই পুজা। মূর্তি গড়ে খুব সমারোহের সঙ্গেই হয় এ বাড়িতে। তার ওপর খোকনের হাতে খড়ি, গোলমালের মধ্যে কোথা দিয়ে শেষ হয়ে গেল দিনটা যেন বুঝতেই পারল না কেউ। বিকালের প্রসাধন সেরে সন্ধ্যার সময় দুই বন্ধুতে গিয়ে ওপরে দীপার ঘরে মুখোমুখি হয়ে বসল। দীপা বলল—"এবার তোর ওখানকার, কথা সব বল্—কেমন আছিস, কী বৃত্তান্ত। উঃ, কত দিন পরে এলি রে।"

"কেমন দেখছিস ?" একটু হেসে প্রশ্ন করল কাজল।
"দেখবার কিছু রেখেছ ? সব তো শাড়ি ব্লাউজ চপ্পলে ঢাকা দিয়ে দিয়েছ।...তুমি ওখানে এমনি ক'রে শাড়ি ব্লাউজে ঘুরে বেড়াও, আমায় বিশ্বাস করতে হবে ? গেছি আর কি ?...হাঁটু পর্যন্ত স্কার্ট, স্কিন কালার মোজা, হাই হীল জুতো—বল্ ঠিক বলছি কিনা..."
"একেবারে অতটা নয়, তবে অফিসের পোশাক কতকটা এরকমই রাখতে হয় ভাই। লাইব্রেরির কাজে কখনও কখনও কাঠের সিঁড়ি লাফিয়ে উঠতে হয়। শাড়ি চলে না। হাই-হিল জুতো নয়, একধরনের বিশেষ চপ্পল আছে, পরে নিয়ে......"
"বব্ করিস নে যে ?" মাথার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল দীপা। বলল—"তোর চুলটাও তো মোটা, অমন ঘন, লম্বা ঢেউ-খেলানো...এই দ্যাখ্! কত জিজ্ঞেস করার আছে, ভুলে ভুলে যাচ্ছি—ঢেউয়ের কথায় মনে পড়ে গেল—সমুদ্রে বীচে গিয়ে ঢেউ নেওয়া। ওখানকার একটা বড় পাস্‌টাইম—যাস তোরা ?"
উৎসাহিত হয়ে ওঠে কাজল। বলল—যায়। তবে, বলার সময় কণ্ঠস্বর যেন কি করে একটু স্খলিত হয়ে পড়ল।
"সেই রকম বেদিং কস্ট্যুম পরে তো ?" উৎসুক প্রশ্ন করল দীপা।
"তা কি করা যাবে ? সবারই ঐ ড্রেস।...যস্মিন দেশে যদাচার..... "
"আচার মাথায় থাক বাবা।"
আর না এগিয়ে বলল—"থাক্ সত্যিই তো, কে কাকে দোষে ?...তুই তোর ঘরকন্নার কথা বল্।"
"সেদিকে হাঙ্গাম নেই দীপা। ছোট্ট দুজনের গৃহস্থালিতে গ্যাস, ইলেক্‌ট্রিসিটি—সব যেন মেশিনে হয়ে যায়। একটা মস্ত বড় সুবিধা হয়েছে দুজনের অফিস টাইম একরকম। আটটা থেকে বারোটা, ডিনারের জন্যে ঘণ্টা দুই। খাওয়া সেরে একটু রেস্ট নিয়ে দুজনে বেরিয়ে যাই দু দিকে।"
"বাসে ?"
"নাঃ, মোটরে। শহরের বাইরে অনেক দূরে দূরে তো। দুজনকেই রাখতে হয়েছে মোটর......"
"নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে যেতে হয় তো ?"
"বেশ অভ্যেস হয়ে গেছে।"
যেমন উৎসাহের স্রোতে বলে যাচ্ছিল কাজল, সেই ভাবেই বলে একটু হাসল।
"তোর বাচ্চাটা ?"
"কেন, সে ব্যবস্থাও তো ওখানে রয়েছে। মার্কিন মুলুকটা কাজ আর এড্‌ভান্‌স্‌ড্ আইডিয়ার জায়গা দীপা। বেবি-সীটার রয়েছে, তার চার্জে নিশ্চিন্ত হয়ে দিয়ে চলে যাও, তারপর যথা সময়ে এসে বুঝে নাও নিজের মেয়ে।...দ্যাখ না, তিন বছরের মেয়ে...কেমন মিশে গেছে।...মা বলে...যে একটা...যে একটা—" কথাগুলো এগিয়ে

আসতে হঠাৎ থেমে গেল। ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"বাঃ দিব্যি আমার বকিয়ে যাচ্ছে—দ্যাখো! নিজের কথাও বলবি তো? তুই কেমন আছিস তাই বল্।"
ওপরতলায় জানালার পাশে ব'সে গল্প করছে—নীচে উঠানে, ঘরে ঘরে সন্ধ্যার কর্মব্যস্ততা, ছেলেমেয়েদের লুটোপুটি দেখে নিয়ে বলল—"বেশ লাগছে দীপা। তবে, আমার তো নতুনই, তুই এত জটলার মধ্যে···বলছিলাম—সবাই তো নিজের নিজের নিয়ে থাকতে···তোর দিকে,···অবিশ্যি সত্যবাবু আছেন···তবু···"
"এখানে তোর সত্য বরং গৌণ, কাজু। কী ভালোবাসেন যে সবাই, বাড়ির ছোট বউই তো···বিশেষ ক'রে শ্বশুরে—দ্যাখ্ না, বুড়ো মানুষ দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছেন···টুকলাম কবার···পড়বেন অসুখে—এখন ছোট বৌমা ছাড়া···পিঞ্জরেই, কাজু—আমরা বলাবলি করতাম না?—পড়েছিও উলটোপালটা ঘরেই—কিন্তু কী মায়ার পিঁজরে যে···আর আকাশের কথা যেন ভাবাও যায় না।"



এর পরই একটা ব্যাপার হল যাতে দীপাকেও একটু সংকুচিত হয়ে উঠতে হল, যদিও কাজলের বেদিং কস্টুম জাতীয় নয়। দীপার দেড় বছরের কোলের ছেলেটি হামাগুড়ি দিতে দিতে সিঁড়ির মাথায় উঠে এসেছে, একবার গলা তুলে মাকে দেখে নিল, তার পরেই টলতে টলতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার কোলে। দীপা গল্পের মধ্যে যেন অভ্যাসবশতই অন্যমনস্ক হয়ে ব্লাউজের বোতাম খুলতে যাচ্ছিল, একটু অপ্রতিভ হয়েই আবার লাগিয়ে দিয়ে বলল—"এখন একটু যাও সোনা, মাসি এসেছে, গল্প করছি।"
কাজলও একটু অবাক হয়ে গেছে, প্রশ্ন করল—"বুকের দুধ খায়?···এখনও!"
একটু অপ্রতিভ ভাবেই হাসল দীপা, বলল—"এ বাড়িতে দু বছর পর্যন্ত বুকের ছাড়া অন্য দুধ খাওয়া মানা···"
"কেন, কত রকম দুধ রয়েছে আমাদের ওখানে ভিন্ন ভিন্ন বয়সের লেবেল সাঁটাও।"
"তাই খাওয়াস তুই?"
"কেন, বেবি-সিটার, ফিডিং বটল রয়েছে কি করতে?···আর বুকের দুধ দিলে মায়ের শরীর···"

"ওরা কোলে এলে আর মায়ের শরীর। খুড়শ্বশুরের কড়া হুকুম—দু বছর পর্যন্ত একেবারে…হোমিওপ্যাথ তো।"
"বুঝলাম…কিন্তু…কিন্তু কথা হচ্ছে…"
নধর-নাধর ছেলে। গলায় মিহি সোনার চেনে এক ধুকধুকি। একটু অবাক হয়ে চেয়েছিল কাজলের দিকে, কাজল হাত বাড়িয়ে বলল—"এসো তো জাদু আমার কাছে…"
"ভুভু ?"
"ওরে দুষ্টু!"
এবার হাসিটা যেন একেবারেই ফিকে হয়ে গেল। দুই বন্ধুরই। কী করে প্রসঙ্গটা বদলাবে ভেবে পাচ্ছে না। ফিকে হাসিটুকুও যেন ধরে রাখা যায় না ঠোঁটে। হঠাৎ রজতের আবির্ভাবে আপনিই নেয় সামলে।
খুব মিশুকে, বাড়ির সঙ্গে একেবারেই মিশে গেছে, সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—
"এই যে আপনারা এখানে। আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান। দুই সখীর বিশ্রম্ভালাপে বাধা দিলাম না তো ?"
"এতক্ষণ দুষ্মন্তের মতো লুকিয়ে কান পেতে ছিলেন না তো ? তার চেয়ে এ বরং ভালো। আসুন।"
দীপার কথায় হাসি পড়ে গেল একটু। রজত এসে একটা সোফায় বসে পড়ল। দুই সখীরই একটু টানা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল।
এবার খেয়ালি বিধাতা যেন জোর করেই, পাল্লা ঘুরিয়ে সোনার খাঁচার দিকের পাল্লাটা দিলেন ভারি করে পালটে।
আমার সহৃদয় পাঠিকারা কোন দিকে, একটু জানতে ইচ্ছে হয়।



মরণাপন্ন

মোটরের শব্দ শুনে ঘর থেকে বেরতে বেরতে দেখি ডাক্তারবাবু বেশ একটু হন্তদন্ত হয়েই মোটর থেকে নামছেন। মুখটাও শুকনো। এগিয়ে আসতে আসতে অবশ্য সে ভাবটা অনেকটা সামলে নিলেন, মনে হল চেষ্টা করেই। নমস্কার বিনিময় হয়ে গেল বারান্দায় উঠে, ডাক্তারি দৃষ্টিতে মুখের দিকে এক নজর চেয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—

"কেমন আছেন?"

এবার বেশ সহজভাবে, একটু হেসেও। বললাম, আপনার ওষুধ দু'ডোজ খাওয়ার পর থেকে সে ভাবটা একেবারে কেটে গেছে। আর খেলাম না। মানাই ছিল আপনার। চেয়ারে গিয়ে বসলাম দুজনে। চা আনতে বলে দিলাম। দু একটা এদিক-ওদিক কথার পর বললাম, "কিন্তু আপনি আজ যে হঠাৎ এলেন। এ সময়টা ভিড় থাকে, বড় একটা বেরোন না। অবশ্য তেমন আর্জেণ্ট কিছু থাকলে আপনাদের তো নিয়ম বলে কোন জিনিস নেই।"

"ছিলও দু'একটা···সেরকম।"

—একটু হেসে সে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, "তা যাওয়ার সময় একটু ঘুরে গেলেও চলবে।"

এর পর প্রসঙ্গটা একেবারেই গেল ঘুরে। অনেক ব্যাপার নিয়ে থাকেন রোটারি ক্লাব, মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, আরও সব। ভাল কাহিনীকারও—সেই সবের দিকেই চলে গেল আলোচনা।

ও'র গল্পের ঢংটা জানা আছে। বিষয় থেকে বিষয়ান্তর আর অনর্গল। আজ কিন্তু মনে হচ্ছে মাঝে মাঝে যতি ভঙ্গ হয়ে গিয়ে কী যেন খ‍ুঁজছেন। আমার কথার মধ্যে একটা কী যেন শোনবার চেষ্টা। যেন, যা চাইছেন, গল্পের মধ্যে তার একটা খ‍ুঁট হাতে পড়লে সমস্তটা পরিষ্কার হয়ে যায়। পেয়ে ও গেলেন।

একজন খুব বড় সাহিত্যিক মারা গেলেন কলকাতায়। আজকের কাগজে তাঁর ছবি আর জীবনীর সঙ্গে সেইটে সবচেয়ে বড় খবর যা নিয়ে আলোচনা করছে এখানকার শিক্ষিত বাঙালী মহলে। জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল কিনা। তারপর আমি উত্তর দেওয়ার আগেই বলে উঠলেন—"এই দেখুন, ভুলেই যাই, আপনাকে জিজ্ঞেস করব মনে করে। দেশে গেলেই আমায় অনেকে জিজ্ঞেস করে ঐ কথা, অর্থাৎ আপনার সঙ্গে পরিচয় আছে কিনা আমার। তারপরেই তাদের প্রশ্ন—উনি তো বরাবরই বেহারে মানুষ। ও'র জীবন-কথায় যা বেরোয় তা থেকে জানা যায় সেখানে একটা অজ পাড়াগাঁয়ে ও'র জন্ম। তবু তিনি একজন বাঙলা ভাষার লেখক হ'য়ে উঠলেন কি করে।'

ডাক্তারবাবু লেখক কথাটার আগে একটা বড় বিশেষণ যোগ করে দেওয়ায় আমার একটু সুবিধা হল। 'হো-হো' করে হেসে উঠে বললাম, "বলুন তাঁরা, আমি কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই এত ঘটা করে এত তোড়জোড় করে আরম্ভ করেছিলাম, যাতে আমার এতবড় লেখক হওয়ার কথা যে আপনার এর চেয়েও গালভরা বিশেষণের লাইন লাগিয়ে দিলেও কুলুত না।"

"সত্যি নাকি? শুনতে হবে তো।" ও'রও আমার হাসির ছোঁয়াচ লেগে গেছে। সিগারেট নিভে গেছে। ধরিয়ে নিয়ে বললেন—"বলুন। শুনিনি তো।" বললাম, "সেখানে বাবা নীলকুঠীতে কাজ করতেন। তখনও ওটা রয়েছে বেহারের জায়গায়। কুঠীরই ব্যবস্থায় বছরে একবার করে খাতাপত্র পরীক্ষা করতে ও'দের কলকাতার অফিস থেকে একজন অডিটার আসতেন। একবার এলেন অরবিন্দ নামে একজন ভদ্রলোক। বয়স কম। চল্লিশের এদিকেই এখনকার আন্দাজে মনে হয়। শৌখিন, সুপুরুষ। আমাদের কাছে কলকাতার খাঁটি বাঙালী—এটাই একটা পরম আশ্চর্য ব্যাপার ছিল। তার ওপর একেবারে একটা নতুন জিনিস শুনতাম, অরবিন্দবাবু ছিলেন সাহিত্যিক মানুষ। কথাটার মানে জানতাম না, তবে বেশ ওজনদার। তাতে তাঁকে আরো একটা রহস্যে ঘিরে রাখত। উনি যতদিন ছিলেন, রোজ সন্ধ্যায় আমাদের বাইরের খোলা উঠানে সাহিত্যচর্চা হত। তখন আমার বয়স কত হবে?—এই ধরুন আট-নয়ের

মধ্যে। হাতে খড়িটা হয়ে গেছে, বাবা লেখাপড়ার জন্যে দেশে পাঠাবার কথা ভাবছেন—এই সময়টা আর কি···
মজলিসে থাকতেন বাবা, কাকা, আমার এক জ্ঞাতিদাদা। ছোটদের মধ্যে, যতদূর মনে পড়ে আমি একাই থাকতাম। দু বাড়ি মিলিয়ে আরও ছেলে ছিল। কেউ এসে কিছুক্ষণ বসল। উঠে গেল। আমি কিন্তু একভাবে ডানহাতে ভর দিয়ে বসে থাকতাম। ও'রা কে কি বলছেন মুখ ঘুরিয়ে শুনছি। কিছুই অবশ্য বুঝছি না। কিছুক্ষণ সাধারণভাবে আলোচনার পর অরবিন্দবাবু নবীন সেনের 'রৈবতক' কাব্যগ্রন্থখানা নিয়ে বসতেন। একটা ছোট আধ-হাতটাক উ'চু টেবিলের ওপর একটা পরিষ্কার তোয়ালে পাতা। পাশে একটা শ্বেতপাথরের রেকাবিতে এক রাশ বেলফুল। ভাল করে মলাট দেওয়া বইটা খুলে আরম্ভ করে দিতেন।



এমনি আলোচনার যদিও বা এক আধটা শব্দের মানে ধরতে পারতাম, পাঠ আরম্ভ হলে আর এক বর্ণও নয়। অরবিন্দবাবু চমৎকার পাঠ আবৃত্তি করতে পারতেন—হাত ঘুরিয়ে গলার স্বর উ'চু নিচু করে। শুধু চোখে দেখা আর কানে শোনাই ছিল আমার আনন্দ। কয়েকটা করে সর্গ পড়া হত। বই শেষ হয়ে গেলে আবার গোড়া থেকে পড়া হত। প্রতিদিন পাঠের শেষে আবার একটু গল্প-গুজব হত। বোধ হয় মাস দেড়েক ছিলেন উনি। একদিন পাঠ শেষ হয়ে গেলে, কি মনে হতে হয়ত কেউ বসে না আমিই বসে থাকি দেখে—জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বোঝ তুমি খোকা ?
কি বলব ? লজ্জিতভাবে মুখটা নামিয়ে নিলাম। উঠতে যাচ্ছিলেন, কাঁধে একটু চাপ দিয়ে বললেন, হবে হবে। উনিও কি বুঝতেন তোমার বয়েসে ? বাবাকেও কি একটা বললেন মনে নেই। সেই হল কাল।"
কথাটা বলে আমি একটু হেসে উঠতে ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করলেন, "হাসলেন যে অমন করে ?"
ভালই তো বললেন, "ফলেও গেছে···" বললাম, "কিছু কিছু হয়ত। কিন্তু সেই থেকে একটা ব্যাপার হল যার জন্যে বিপদ ছাড়া আর কি বলব ? বেহারের পাড়াগাঁ, বাবা হাতেখড়িটা দিলেন। কিন্তু তখনও বাঙলা শিখব কি হিন্দি শিখতে হবে শেষ পর্যন্ত,

ঠিক না হওয়ায় কোন ভাষারই একটিও আমার পেটে ঢোকেনি। লিখতে পড়তে কিছু জানি না, অথচ সাহিত্যিক হওয়ার জন্য প্রাণটা ছটফট করছে। আমি একটা রাস্তা বের করে নিলাম। স্মৃতিশক্তিটা ছেলেবেলায় ভালই ছিল। 'রৈবতক' শুনে শুনে কতকগুলো শব্দ, তাদের মাধুর্য বা গাম্ভীর্যের জন্যে মাথায় আটকেই গিয়েছিল। আমি আরও স্টক বাড়ানোয় উঠে পড়ে লেগে গেলাম।"

—"ভালই তো।" ডাক্তারবাবু মন্তব্য করলেন। এবার একটু হেসেও হয়ত আমার একটু হাসির ভাব মিলিয়ে বলার জন্যেই।

বললাম, "ভাল তো নিশ্চয়ই। কিন্তু মাথার মধ্যে আটকেই থাকে, তবে তো। কিন্তু নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মত তোড়ে নেমে এসে যে বিপদ ঘটাতে লাগল এলো-পাথাড়ি।"

চা এল। দুজনে দুকাপ তুলে নিলাম।

বললাম, "আমার জ্ঞাতি বড়দাদা সাপ্তাহিক বসুমতী আনতেন। তেমন কিছু থাকলে সবাইকে পড়ে শোনাবার অভ্যাস ছিল। তা থেকেও বেছে কথা মুখস্থ করে ব্যবহার করার একটা অভ্যেস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সেটা 'সাহিত্যিক-সাহিত্যিক' বলে একটা টিটকারি দিয়ে সবাই বন্ধ করে দিল।"

"ভাবলাম, যাক। রোগটা কেটে গেছে ভালই হয়েছে। কিন্তু এখন দেখছি জেরটা একেবারে লুপ্ত হয়নি।"

"কি রকম ?"—প্রশ্ন করলেন ডাক্তারবাবু।

—"আপনি ডাক্তার, স্বীকার করবেন, বংশের ধারাটা কিভাবে ঘুরেঘুরে আবার ফিরে আসে বলা যায় না। আমার এটা আবার এসেছে একপুরুষ বাদ দিয়ে। আর ডিরেক্ট লাইনেও নয়..."

—"কি রকম ?" ডাক্তারবাবু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে থেমে এমন আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্নটা করলেন, মনে হল যা খুঁজছিলেন তার কিছু একটা ইঙ্গিত পেয়ে গেছেন।

বললাম, "আমার ভাইপোর নাতি—বয়সটা আমার সেই সময়ের মত। এক—আধ বছর কমই হবে—কিন্তু বেহারের পাড়াগাঁয়ের নয়। খাস কৃষ্ণনগরের ছেলে। খুব স্মার্ট ইনটেলিজেন্ট চোখ দুটো, ভেতরে ভাল ব্যাটারি থাকলে টর্চ যেমন জ্বলে সেই রকম জ্বলছে। আমার মত একেবারে আকাট নয়। কিন্ডারগার্টেনের ছাত্র। শুনলাম, তারও ঐ রোগ আছে। চলছে বলছে, হঠাৎ একটা দু মন ভারী কথা বলে মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে চেয়ে রইল। তুমি বোঝ না বোঝ সে তোমার ভাবনা।

দেখলামও ওরা এই দুদিন হল এসেছে। সবাইকে জড়ো করে এ গল্প সে গল্প থেকে আমার ছেলেবেলার গল্পে এসে পড়েছি। দেখি, বাপন কখন এসে এক পাশটিতে বসে গেছে। ওর বড় বড় চোখ জাগিয়ে এক মনে শোনার ভাব দেখে আমার যেন ছেলেবেলার নিজেকে মনে পড়ে গেল। সেই রকম ডান হাতে ভর দিয়ে মুখের ওপর চোখ তুলে...। ওর মা-মাসিদের 'দাদু', সুতরাং সুবিধার জন্য তাকেও দাদু বলেই।"

ডাক্তারবাবুও শেষের দিকটা সিগারেট হাতে উগ্র কৌতুহলের সঙ্গে শুনছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন। "আমায় দেখাতে পারেন ছেলেটিকে ?"
আগেই বলেছি, উনি যেন কি একটা মেলাবার চেষ্টা করছিলেনই গোড়া থেকে। এখন আবার এমন ভাবে বলে উঠলেন কথাটা, আমায় একটু হেসে বলতে হল, "আনিয়ে তো দিচ্ছি, কিন্তু আপনার ভাবে মনে হচ্ছে, শার্লক হোমসের মত কি একটা আবিষ্কার করে ফেলেছেন হঠাৎ। ব্যাপার কি বলুন তো ?"
—"আপনি আনলে তো, আবিষ্কারটা পাকা করে নিই আগে।"
একটি পুষ্ট দল হয়েছে। বাড়ির উঠানে হুটপুটি করে খেলছিল। ডাক দিতে খেলার তালেই লাফাতে লাফাতেই এসে সামনে দাঁড়াল। খুব সপ্রতিভ হাসি হাসি মুখ, চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। দৃষ্টি একটু আটকে যায়ই।
প্রশ্ন করলেন, "তোমার নাম বাপন ?"
মাথা দোলাল। বলল, "ভাল নাম উদন।"
আমি শুধরে ওকে বললাম, "উদয়ন আর কি।"
—"বেশ মেলেও চেহারার সঙ্গে।"—মন্তব্যটুকু করে ওকে বললেন, "এস তো আমার কাছে।—আসবে ?"
ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়ে ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।
উনি পিঠে হাত দিয়ে টেনে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, "বড় হয়ে দাদুর মত সাহিত্যিক হবে না ?"
কথাটা বুঝল না, "কি হব ?"—বলে ওঁর মুখের দিকে চাইতে উনি বললেন, "দাদু যেমন বই লেখেন না দেখেছ তো ?"
একটু উৎসাহিত হয়ে উঠে মাথা দুলিয়ে বলল,—"আমিও লিখব।"
উনিও বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। আরও যাচ্ছে মিলে।
—পরে শুনছি। ভাল করে—
ওকে কথাটা বলে আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "দেখুন, গোলমালে ভুলেই যাচ্ছি। আমি আপনাকে ফোন করেছিলাম। এই একটু আগে; এসে পরেই বেরিয়ে পড়ি। কেউ বলেনি ?"
বললাম, "চাকরটা এসে বললে। আমি তখন বাগানে। বললে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে এসেছে। বোধহয় ব্যস্ত ছিল। "কে করেছে ও—ও বলেনি।"
আমারও জিজ্ঞেস করা হয় নি। গিয়ে দেখি, "কে রিসিভারটা তুলে রেখেছে।"
কিন্তু উত্তরটা তো পেয়ে যাই আমি। ডাক্তারবাবু ওপরে চোখ তুলে ভেবে নিলেন। বললেন,—"শুধু কে—"
বাপন এদিকটা আরও আগ্রহের সঙ্গে শুনছিল। একবার ওঁর, একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল, "আমিই তো ফোন তুলে বললাম তোমায়।"
বেশ বাহাদুরির ভাব। একটা কাজের কাজ করেছে।—"ফোন করতে জান তুমি ?" উনি প্রশ্ন করলেন। আমি বললাম, "ওদের বাড়িতে সেখানে ফোন আছে যে। বন্ধ রাখতে হয়। খোলা পেলেই—"

শার্লক হোমসের সব মিলে গেছে। হাসি হাসি মুখে একবার আমার দিকে চেয়ে নিয়ে বাপনকে আরেকটু বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "তুমিই উত্তর দিলে না? এই রকম ভারি ছেলেমানুষি গলা বটে।"
শেষেরটুকু আমায় বলে; ওকে আর একটু বুকে চেপে প্রশ্ন করলেন, "এবার কি বলছিলে, কি কি কথা হয়েছিল বল তো ভাই। মনে আছে?"
ঘাড় কাত করে বলল, সব মনে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হ্যালো কে?"
ফোনে বলল, "দাশগুপ্ত। বিভূতিবাবু নেই?"
আমি বললাম, "আছেন।"
তুমি বললে, "তুমি কে?"
আমি বললাম, "নাতি।"
তুমি বললে, "কেমন আছেন দাদু?"
আমি বললাম, "ভাল। মরণাপন্ন……"



আমরা দুজনে বারান্দা ফাটিয়ে হো হো করে হেসে উঠলাম।
খুব অপ্রতিভ নয়। যেন এত হাসিতে একটু যোগ না দিলে মানায় না। এই তো বেশ ডাগর চোখে দুটো তুলে একটু হাসল ও। বলল—"বললাম তো। বলিনি? আরও বলতাম, তুমি তো রেখে দিলে।"
—"মরণাপন্ন কথাটার মানে জান?"
—"না। কিন্তু বেশ মিষ্টি তো।"
আবার দুজনে আমরা হেসে উঠলাম।
ডাক্তারবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "অনেক গুলো আর্জেন্ট কেস ফেলে রেখে এসেছি—কেন, এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। এবার উঠি।"
দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছি। উনি বাপনের কাঁধে হাত চেপে বললেন, "মানেটা কি তা আমিও জানিনা। দাদুর কাছে শুনবে। উনি বই লেখেন কিনা। আমি তো ডাক্তার। বলব, বেশি মিষ্টি খেতে নেই। যাও খেল গে—"
কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে বাপন লাফাতে লাফাতে ভেতরে চলে গেল।

শতায়ু



শ্যামাচরণ বাইরের বারান্দায় নিজের ইজিচেয়ারটিতে চুপ করে একা বসে আছেন, অলস অবসরের চিন্তা নিয়ে। চিন্তাটার মূলে আনন্দই, তবে একটা বিষাদের সুর উঠে মাঝে-মাঝে সেটাকে মলিন করে দিচ্ছে। বিষাদের চেয়ে আতঙ্কের বললেই বোধহয় ঠিক হবে। সম্প্রতি দেশের এই অঞ্চলের বাঙালি অধিবাসীদের পক্ষে থেকে তাঁর নবতিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁকে একটি অভিনন্দন দেওয়া হল। ব্যক্তিগতই হোক, বা কোনও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেই হোক, পত্র-মানপত্রগুলি ভাষার ঝংকারে, ভাবের উচ্ছ্বাসে মুখর। অথচ, একমাত্র নব্বইটা বছর কোনওরকমে বেঁচে থাকা ছাড়া এমন কী কৃতিত্ব তাঁর, যার জন্যে এই প্রশংসাবাণীর স্তূপ!

তবু, অনায়াস বা স্বল্পায়াসলব্ধ সম্পদের যে একটা বিশেষ মোহ থাকে, তার বশে আলতোভাবে পত্র-মানপত্রগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে পাশে রেখে রেখে যাচ্ছিলেন। আনন্দ হয় বইকি কিছু না করেও সবার হৃদয়ে এতখানি স্থান পাওয়া।

হঠাৎ একটি সুচিত্রিত মানপত্রের শেষের দিকের পঙ্‌ক্তিতে দৃষ্টি আটকে গেল। পঙ্‌ক্তিটি সাধুবাদের ক্লাইম্যাক্স, স্বভাবতই একটু দীর্ঘ; একেবারে শেষে লেখা আছে—'ভগবান আপনাকে শতায়ু করুন।' শ্যামাচরণ বার-দুই পড়ে গেলেন। তারপর সব পত্রগুলো তুলে তুলে আবার শেষের লাইনগুলো পড়লেন। আলতোভাবে পড়া, তাড়াতাড়িতে

ছেড়ে গিয়েছিল। ওই এক ধরণের কথা—শতায়ু হতে হবে। ভগবান তাঁকে শতায়ু করুন। সবগুলো পাশে রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন শ্যামাচরণ। তাঁকে আরও দশটা বছর বাঁচতে হবে। দূর অতীত থেকে মনটা ঘুরিয়ে আনছেন, কত দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে উজান ঠেলে এই দীর্ঘপথ আসা। কী প্রতিকূল কাণ্ড। মাঝে মাঝে অনুকূল হয়ে ওঠে আনন্দ, উল্লাসের রেশও বহন করে এনেছে বইকি, অস্বীকার করবেন কী করে। তবে আজ এই আতঙ্কিত মানসপটে সবগুলোর পিছনেই যেন একটা গূঢ় অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে মনে হয়; তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা—বাঁচিয়ে রাখা বিরাটতর দুর্ভাগ্যের জন্যে। জীর্ণ তরীখানা মেরামতের ধাক্কায় আরও জীর্ণই হয়ে উঠেছে, এই পরিস্থিতিতে ভগবানের দরবারে সবার আরজি—লোকটাকে আপাতত আরও দশটা বছর বাঁচিয়ে রাখা হোক। এর ভিতরে যেন একটা অনুচ্চারিত কিছু ইঙ্গিত রয়ে গেছে—এরপর তখন আবার দেখা যাবে—আর মাত্র একপ্রস্থ কাগজ খরচই তো।

শ্যামাচরণ চেষ্টা করছেন অভিনন্দনের রাশি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার, কিন্তু পারছেন না। একটা এলোমেলো হাওয়া রয়েছে। পাতাগুলোকে একটু-আধটু তুলে দিয়ে ওই পঙ্‌ক্তিগুলো যেন আরও চোখের সামনে উঁকি দিচ্ছে।
চেষ্টা করছেন চিন্তার মোড়টা ঘোরাবার।

এই দীর্ঘ আয়ুর অভিজ্ঞতাতে দেখেছেন, ভগবানের অনেক ভুলত্রুটি থাকলেও, একটা মস্ত বড় গুণ, তিনি সবার সব কথায় কান দেন না; এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। খুবই ভাল করেন। কান দিতে গেলে জগৎসংসারটা রাজারানির একটা জড়পিণ্ডে পরিণত হয়ে গিয়ে সৃষ্টি নিশ্চল, অনড় হয়ে যেত। ··চিন্তা আবার মোড় নিয়ে আতঙ্কটাকে আস্তে আস্তে ফিরিয়ে আনে।·· যতদিন স্বরাট ছিলেন ভগবান, ততদিন ভালয়-মন্দয় একভাবে চলে যাচ্ছিল। দেখেছেন, ওঁর নিত্যনূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার একটা বাই বা বাতিক আছে, এবং তাতে নিজের জালে মাঝে-মাঝে নিজেই জড়িয়ে পড়েন। কোনও বিস্মিত অতীতে মানুষ নামে একটা জীব সৃষ্টি করে বসেছিলেন ঝোঁকের মাথায়। ভুলই; তবে, যতদিন স্বরাট-পুরুষ ছিলেন, নিজের হুকুমে সবাই ওঠবোস করছিল, একরকম চলে যাচ্ছিল। তারপর সম্প্রতি 'ডেমোক্র্যাসি' নামে এক অবয়বহীন দৈত্যের আমদানি করে আর হালে পানি পাচ্ছেন না। সর্বপ্রথম তো তাঁর স্বরাটত্ব অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশ করে সবাইকেই স্বরাট করে তুলেছে। কারও কাউকে মানবার দরকার নেই। সাধনমন্ত্র নিয়েছে 'ভোট'। জিনিসটাকে কেউ চেনে না, কেউ বোঝে না, শুধু চিৎকারসর্বস্ব ভোটে একজোট হয়ে অক্ষম অপদার্থকে রাজা করে তুলেছে, সাধু-সক্ষমকে ভোটের বলে টেনে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে!

চিন্তার সূত্র ছেড়ে দিয়ে একটু আত্মলীন হওয়ার চেষ্টা করেন শ্যামাচরণ। নব্বইয়ের কোঠায় এসে আজকাল এইরকম হয়েছে শ্যামাচরণের। কিছু একটা আরম্ভ করেন, তারপর সেটা দুঃখ অভিমান নৈরাশ্যের পথ ধরে আপনিই এগিয়ে যায়, থেমে গিয়ে আবার গুছিয়ে নিতে হয় মনটাকে।···হ্যাঁ, কী যেন ভাবছিলেন?

চিঠি, মানপত্রের স্তূপের ওপর নজর পড়তেই আবার মনটা যথাস্থানে ফিরে এল।...হ্যাঁ, ঠিকই তো, ভাবছিলেন, ডেমোক্র্যাসি...ভোট...এগুলোও এক একটা ভেণ্ট নয় কি? ভোট যে অশুভই হতে হবে এমন কোনও কথা তো নেই, নইলে খুঁড়িয়ে নেংচে সংসারটা এখনও চলছে কী করে?...এগুলো তো সবই শুদ্ধ অন্তঃকরণের প্রেম-প্রীতি। মমতাই, যা এতর মধ্যেও সৃষ্টিকে মোহনীয় করে রেখেছে।

ও'র ভয়ও তো সেইখানেই। শিথিল ইন্দ্রিয়-গ্রাম, অন্তরের অন্তস্তল থেকে মন বলছে, ঢের তো হল, আর কেন?

বিজ্ঞানের যুগ। মনোবিজ্ঞান বলছে, সু কু যে-রকমই হোক, মানুষের ইচ্ছা একমুখী হলেই তা ফলপ্রসূ হতে বাধ্য। আতঙ্ক সেইখানেই, আর কেন? ঢের তো হল।



বধূমাতা এসে উপস্থিত হলেন ভেতর থেকে। হাতে একটা ওষুধের শিশি, পাছে গ্যাসের একটুও বেরিয়ে যায়, সেজন্য দু'হাতে শক্ত করে চাপা। "মেজোকাকা, আপনি অমন চুপ করে বসে আছেন যে। থাক, আগে এটা খেয়ে নিন, ঝাঁঝটা বেরিয়ে যাবে।" বলা বাহুল্য, এটাও শ্বশুরের আয়ু-মহীরুহের মূলে বারিসিঞ্চন মাত্র, বিশেষ কোনও রোগের প্রতিকার বা প্রতিষেধক নয়।

ঝাঁঝের উগ্রতায় মুখের কুঞ্চনটা সাধ্যমতো দমন করে, হালকাভাবেই হাসবার চেষ্টা করে শ্যামাচরণ বললেন, "দ্যাখো না মা, তুমি এ-দিকে চারদিকে ওষুধের গণ্ডি কেটে দিয়ে যমরাজকে বাইরে রুখে রাখবার চেষ্টা করছ, ও-দিকে এই শতায়ুর জন্যে একরাশ চিঠি-মানপত্র...কত দিন আর সামলাতে হবে এই বয়েসে?"

"বুঝেছি।" আজকাল তিনি প্রত্যেক কথা অত্যন্ত মন দিয়ে শোনেন মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে রেখে। বাধা দিয়ে বললেন, "বুঝেছি, আর বলতে হবে না। তা, ওসবে আপনি কান দেবেন না মেজোকাকা। ওসব ছেঁদো কথা, এইরকম মিটিং মজলিস করে বলেই লোকে, গায়ে না মাখলেই হল। বলে যেতে দিন, আপনি তার জন্যে ভয়..."

"ছে'দো কথা…বলতে হয় বলছে !"—শ্যামাচরণেরই এবার বিস্মিত হওয়ার পালা। বাধা দিয়ে মুখের পানে একটু অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললেন, "তাঁরা সবাই কত ভালবাসেন, বয়সের জন্যে শ্রদ্ধা করে বলেছেন, আরও কিছুদিন থাকি তাঁদের মধ্যে·· তাঁদের সবার আশীর্বাদই…আমার শুধু ভয়…শরীর ক্রমেই যেন…'

''তা হলে আমায় বলতেই হল মেজোকাকা, যদিও এসব কথা প্রকাশ করে বলা উচিত নয়।'' বলি কি না-বলি করে মুখটা একটু নামিয়ে নিয়ে তখনই আবার তুলে বললেন, "'আশীর্বাদ—এ-কথা স্বীকার করি মেজোকাকা। তাঁরা সবাই কত মহৎ, কত বড় —কিন্তু আসলে এসব—যাকে আমরা বলি, 'নজর-লাগা', তাই। একটা লোক দুটো বছর বেশি বেঁচেছে, আর অমনি…''

বুঝতে যেটুকু দেরি হল, শ্যামাচরণ শিউরে উঠে বললেন, 'নজর-লাগা, বউমা! কী বলছ তুমি। রক্তের সম্বন্ধ নেই, তবুও আত্মীয়ের চেয়ে পরমাত্মীয় এঁরা···'

"শিউরোবেন জানি মেজোকাকা। এইজন্যে বলতে চাইনি। কিন্তু বলুন তো, মায়ের চেয়ে আত্মীয় জগতে কে আছে?'

যুক্তিতর্কের সূক্ষ্মতায় কোন পথ নেবে, একটু ধাঁধায় পড়ে গেছেন শ্যামাচরণ। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ''তা মায়ের চেয়ে আত্মীয় আর কে হতে পারে?''

'পারে না তো?'' উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন বধূমাতা। বললেন, ''কিন্তু শাস্ত্রে বলছে মায়েরও লাগে ছেলেমেয়ের ওপর।…ছেলে আমার এত সুন্দর…এত ভাল·· নীরোগ শরীর। ব্যস্, দুদিন পরে দেখুন সেই ছেলের হয় পেটের ব্যামো, না হয় পালাজ্বর।'' এর পরেই শ্বশুরের পরাভূত দৃষ্টিতে নিজের বিজয়টা বুঝে নিয়ে, আর সময় না দিয়ে একটানা বলে গেলেন, ''বলবেন ওসব মেয়েলি শাস্ত্র, আমি মানি না। কিন্তু ফলছে বলে মেনেও তো নিতে হচ্ছে মেজোকাকা, ছেলে বিয়ে করে বউ নিয়ে এল, মা আগে দেখবেন না···জামাই বিয়ে করে মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে, সবাই এগিয়ে নিয়ে যাক, মা পেছনে।··যত বড় শাস্তি…মানে যত বড়ই·· কী যে বলে···মানে, আমি কোনওমতেই মানব না বলে যিনি যতই জিদ ধরে থাকুন···এই নটবরকাকার কথাই ধরুন না মেজোকাকা, অমন বিলেতফেরত মানুষ তো···মুখের জোরে—ওসব…ওসব রাবিশ —মানি না·· ''

জড়িয়ে পড়েছেন, সূত্র বেড়ে যাচ্ছে দেখে শ্যামাচরণ বললেন, "বেশ মেনে নিলাম সুনজর কুনজর হয়ে পড়তে পারে—যদিও কুনজরের এখন দরকার আমার—তা আমায় করতে হবে কী মা?''

"কিছু করতে হবে না আপনাকে মেজোকাকা। এরকম যে হবে আমার তো জানাই, আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।···ভেবেছিলাম, না হয় আরও দুটো দিন দেখি—ক'টা হয়ে গেল, আপত্তিই করবেন তো—কিন্তু, যেমন দেখছি আর ফেলে রাখা চলে না।··· তার আগে মেজোকাকা, এই নথিপত্রগুলি···" মনে হল যেন আগুনে দেওয়ার কথা বলতে যাচ্ছিলেন, সামলে নিয়ে বললেন, "এগুলো···এগুলো সিন্দুকে···কী যে বলে,

তুলে রাখি এখন মেজোকাকা, যত দেখবেন ততই ওইসব কুচিন্তা এসে জুটবে মাথায়।" ওগুলো গুটিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। ভেতরে একটু দূর থেকে শ্যামাচরণের কানে ভেসে এল, "নজর-লাগা আর কাকে বলে বলুন তো দিদি?" প্রতিবেশিনী কেউ এসেছেন, তাঁকে সাক্ষী মানছেন।

নতুন পরিস্থিতি নিয়ে মনে নাড়াচাড়া করছেন শ্যামাচরণ, বধূমাতা বেরিয়ে এলেন। এবার রাঙা সুতোতে বাঁধা একটা বড় মাদুলি। দেখে মনে হয় কোনও গাছের ফল। একটু এবড়োখেবড়ো, মাঝখানটা একটা সরু তামার পাত দিয়ে মোড়া। জিনিসটাই মাদুলি হিসাবে এত বড় আর এত রুক্ষ যে, তাতে আকার-আকৃতি দোষগুলো ঘোচাতে পারেনি। যেন চেয়ে আছে। উদ্দেশ্য বুঝে একটু ভীতভাবেই চেয়ে ছিলেন শ্যামাচরণ।

বধূমাতা এগিয়ে এসে বললেন, "এটা পরে ফেলুন মেজোকাকা·· না, না, সব কথায় ওজর-আপত্তি শুনব না আমি।"

"কিন্তু জিনিসটা কী? বেশ একটু যেন অদ্ভুত।"

"আপনি গুরুজন, কথার ওপর কথা বলতে পারি না। কিন্তু মা-কালীর খাঁড়াটাই বা কী এমন সুন্দর বলুন। ··না, হাতটা বাড়ান মেজোকাকা।"

"চারটে রয়েছে মা," মৃদু আপত্তির একটু হাসির চেষ্টা করে বললেন শ্যামাচরণ। প্রশ্ন করলেন, "চারটে রয়েছে, আর জায়গা কোথায় যে পরাবে?"

"জায়গা ঢের আছে। সে আমি দেখছি, আপনি হাতটা তো বাড়ান আগে।"

এরপর হবে অভিমান, কথা যাবে কমে, তারপর অনশন। একে তো প্রায় আছেই, অনেকগুলি ব্রত চলছেই অর্ধাশনে। ওঁর বোধহয় বিশ্বাস, নব্বুইয়ের পর শ্বশুর পুরনো দেবতাদের এক্তিয়ারের বাইরে চলে যাচ্ছেন। তাই সম্প্রতি নূতন একজনের 'দোর' ধরেছেন, যিনি অত্যন্ত কড়া হাকিম, সমস্ত দিন উপবাসের পর সন্ধ্যাবসানে গুড় আর গুটিকতক ভিজে ছোলা।···এক কথায় নিজের আয়ু কমিয়ে এনে শ্বশুরের মাথায় জড়ো করছেন বধূমাতা। হাতটা বাড়িয়ে দিলেন শ্যামাচরণ।

সন্তুষ্ট হয়েছেন, পরাতে-পরাতে মাদুলির ইতিহাসও বললেন বধূমাতা।

আমড়া-আঁটিই। কিছুদূরে কোনও এক শ্মশানকালীর মন্দিরের গা-ঘেঁষে একটি আমড়াগাছ আছে। আমড়া সাধারণত বেশ ফলন্ত গাছই হয়ে থাকে, কিন্তু এ-গাছটা বছরে মাত্র গুনেগেঁথে এগারোটি ফল দিয়ে থাকে। অমাবস্যায় সমস্তদিন উপবাসী থেকে ঝাঁকড়াগাছ থেকে অনেক খুঁজেপেতে নিয়ে আসতে হয়। দাম নিলে মাদুলির তেজ নষ্ট হয়ে যায়। বিল্টার মা বিল্টাকে দিয়ে সংগ্রহ করে আনিয়েছে।

বিলটার মা'র কথা সবিস্তারে বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। সংক্ষেপে, সে এ-বাড়ির প্রায় চল্লিশ বছরের পুরনো ঝি। এসব বিষয়ে অথরিটি। বাড়ির সব ছেলেমেয়েকে তাবিজ-মাদুলিতে বোঝাই করে দিয়েছে। তার ওপর কোনও কথা চলে না।

কনুইয়ের কাছাকাছি জায়গা করে নিল মাদুলিটা।
পূর্বেই বলেছি, রাঙা সুতো আর তামার পাতটুকু এর রুক্ষতা আর আকারের 'গুরুত্ব' ঘোচাতে পারেনি। একটা আধা-হাত ফতুয়া গায়ে থাকে। টেনে দিলে ঢাকে না। শ্যামাচরণ ছোট নাতনিকে ডাক দিলেন। বধূমাতা যেন পূর্বাপর সবটুকু আন্দাজ করেই মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন, প্রশ্ন করলেন, "কেন মেজোকাকা?"
শ্যামাচরণ একবার দেখে নিয়ে বললেন, কুণ্ঠিতভাবেই, "বড্ড যেন...কী যে বলে, বেরিয়ে রয়েছে···সবাই দেখাশোনা করতে আসে..."



"তা হলে আপনাকে সব খুলেই বলতে হল মেজোকাকা যদিও বলা একেবারে বারণ। মাদুলিটার বিশেষ গুণ, যদি কেউ ভাল চোখে দেখে তা হলে দু'গুণ বেড়ে যায় তার ফল। আর যদি কেউ কুনজরে দেখে, মাদুলি উলটে তারই অনিষ্ট করে। ওই জন্যে, যাতে সবার চোখে পড়ে যায়, এই ব্যবস্থা। আপনি যদি ফুলহাতা-পাঞ্জাবি পরে ঢেকে রাখেন তা হলে তো···" ছেড়ে দিয়ে যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, এইভাবে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, এ-মাদুলি ধারণ করলে টকটা খাওয়া বারণ মেজোকাকা। আপনার আবার ওদিকেই ঝোঁকটা বেশি, তাই বলে দিতে হল।"
উনি একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, "তোমাব ঠাকুরই তো সবটুকু চেঁচে নিয়েছেন মা, পাব কোথায় আর যে খাব?"
মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন। ঠাকুরদেবতা নিয়ে মস্করা পছন্দ করেন না।
নাতনি বোধহয় কিছু কাজ করছিল। একটু বিলম্বে উত্তর পেলেন, "আসছি মেজোদাদু।"
বললেন, "থাক, আর কাজ নেই।"
মেয়েটি যে মায়ের খুব বাধ্য এমন নয়, কিন্তু জানেন উনি, মাঝখানে এসে পড়লে মায়েরই পক্ষ অবলম্বন করবে।
বলা বাহুল্য, চিঠি-মানপত্রের ওপর বিলটার মা'র মাদুলি চেপে বসে অবস্থার আরও

অবনতিই ঘটিয়েছে, উন্নতির তো কথাই আসে না। মন দুর্বল হয়ে পড়লে কুচিন্তাগুলোই ভিড় করে আসে। যে-মার্দলটাকে মেয়েলি ব্যাপার বলে অগ্রাহ্য করে এসেছেন, সে আবার নিজের সপক্ষে যুক্তি দিয়ে সব ভণ্ডুল করে দেওয়ার চেষ্টা করে।… তাদের মধ্যে একটা গূঢ় শক্তি না থাকলে তারা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের পথ ধরে এতদিন চলে আসছে কী করে? এই ও'র কথাই ধরা যাক। এই শীর্ণ দেহযষ্টিটুকু নিয়ে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন পেরুবার কথা নয় তবু যে এই নব্বইটা বছর ঠেকিয়ে দিলেন…

জোর করেই ঘুরিয়ে নেন মনকে। এই দেহযষ্টিকেই আরও দশটা বছর টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ আয়োজন! এই বা কোন্ সুযুক্তি?

হীরালালের নাতি এসে খবর দিল, "দাদু এইমাত্র এলেন বম্বে থেকে। বললেন, আপনি যেন না বেরিয়ে যান, হাত-পা ধুয়ে চা খেয়ে এক্ষুনি আসছেন।"

এলোমেলো চিন্তার মধ্যে একটু যেন চকিত হয়েই মুখের দিকে চাইলেন শ্যামাচরণ। প্রশ্ন করলেন "কে দাদু?"

তখনই সচেতন হয়ে উঠে বললেন, "ও, হিরু এসেছে? ওকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দাও গিয়ে। বলবে, চাটা এখানেই খাবে। যাও ছুটে।"

মনটা বেশ উৎফুল্লই হয়ে উঠেছিল, আবার শতায়ু ফিরে এসে ঝিমিয়ে দিল। হীরালাল বাল্যবন্ধু। খুবই অন্তরঙ্গ। ওইরকম পাঁচজন ছিলেন ও'রা। কী আনন্দেরই দিন সব গেছে। একসঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকা, সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে। কর্মহীন অবসরবহুল বার্ধক্যের দিনগুলো একটা দিনের জন্যেও দুর্বল হয়ে ওঠেনি। তারপর এই নব্বইয়ে পেঁছিতে এক এক করে তিনজনকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। এখন এসে দুটিতে ঠেকেছেন। যেতে হবেই, তবে তিনিই বা আগে যাবেন না কেন? কেন এভাবে তাঁর পথ আগলে রাখার আয়োজন?

হীরালালকে বলতে হবে। প্রাণচঞ্চল পুরুষ। যদি কিছু উপায় বাতলে দিতে পারেন। কিন্তু বাধাও তো বিস্তর। সেইদিকেই মনটা গেছে, হীরালাল হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত হলেন।

মেজো ছেলে বম্বেতে চাকরি করে। যেদিন শ্যামাচরণের সম্বর্ধনা, সেইদিনই একমাত্র নাতনিটিকে দেখতে আসে। বন্ধুর খবরটাও পান বিলম্বে। সখেদে কথাগুলো মুখে করেই নামলেন রিকশা থেকে।

চা-জলযোগের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ হল দুই বন্ধুতে—শ্যামাচরণের সম্বর্ধনার, হীরালালের বম্বে প্রবাসের। অনেককিছু দেখে এসেছেন ঘুরে ঘুরে, অজন্তা, ইলোরা পর্যন্ত—ছেলের বদলির চাকুরি আবার কবে সুযোগ হবে, সময়ও তো হয়ে এল…

অভেদাত্মা হলেও দুটি বিষয়ে দুই বন্ধুর বিস্তর প্রভেদ। শ্যামাচরণ যেখানে অকৃতদার হীরালাল এক-এক করে তিনটি সংসারে বৃহৎ পরিবারের কর্তা। সর্বপ্রকারে সুখী, সদানন্দ পুরুষ।

এ-প্রভেদটা অবশ্য সুখেরই প্রভেদ। শ্যামাচরণ অকৃতদার থেকে যে অভাবটা সৃষ্টি

করেছেন (বন্ধু হাসিচ্ছলে বলেন, কাপুরুষতার জন্যই), সেটা বন্ধুর পরিবারে অনেকাংশে পূর্ণ হয়েই যায়। অবস্থানের যা একটু দূরত্ব, সেটা ঘুচিয়ে এক সংসারই, উৎসবে-ব্যসনে আরও এক হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রভেদটা কিন্তু অপূরণীয়। হীরালালের সবরকম তুক্-তাক্, দৈব বা মাদুলিতে অসীম বিশ্বাস। সমস্ত পরিবারটি মাদুলি কবচে মোড়া। এই সবের প্রেসক্রিপশন নিয়ে বিলটার মা এ-পরিবারেও ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান।

গল্প বেশ জমেই উঠেছে। তার মধ্যে নিজের সমস্যার কথাটা তুলবেন কি না ভাবছেন শ্যামাচরণ, মাঝে মাঝে অন্যমনস্কও হয়ে পড়ছেন, একবার হীরালালই ঠুকলেন, "আজ যেন একটু ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পড়ছ, শ্যামা, কী ব্যাপার বলো তো ?"

"ঝিমুবার একটু কারণ হয়েছে ভাই। কিন্তু তোমায় বলে তো কোনও ফল নেই।"

"তবু···। বাড়ির সবাই ভাল তো ?"

"তা একরকম···কিন্তু···"

"কিন্তুটা কি হিরে রাস্কেলটাকে শুনতে নেই ?"

"এই ঝিমুনিটাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে দরখাস্ত গেছে ওপরে।"

"তার মানে ?"

"মানে আর কী ? সম্বর্ধনায় যা সব হল, তা না হয় হলই, তার ওপর রোজ একগাদা করে চিঠি, মানপত্র—ভগবান শতায়ু করুন। শতায়ু করা ছাড়া ভগবানের ঢের কাজ আছে। তবু এক এই নব্বইয়ে পৌঁছতে যে হয়রানিটা হল··"

বধূমাতার কথাটা বাদ দিয়ে বলে যাচ্ছিলেন, হীরালাল পিঠে একটা চাপড় বসিয়ে দিয়ে বললেন, "বুঝেছি, আর বলতে হবে না। এ-রোগে ধরবেই, জানা কথা। তোমায় মেলাংকলিয়ায় ধরেছে," হাসতে-হাসতে বললেন, "জীবনে তো কিছুই করলে না, বুড়ো বয়েসে এ-রোগে ধরবেই। তা ভেবো না, এ-রোগেরও দাওয়াই আছে। বিলটার মা'র কানে তুলে দিলেই হবে।"

কাঁধে একটু চাপ দিয়ে উঠে পড়তে পড়তে বললেন, "এখন যাই ভাই। ছোটরানি ছিলেন না। দেখা না করেই চলে এসেছি। পরিণামটা তো বুঝতেই পারো।"

"হ্যাঁ, এসো।" শ্যামাচরণও উঠে পড়লেন। হাসতে-হাসতে বললেন, "পরিণামের খানিকটা তো আমারও ওপর দিয়ে যাবে।"

দুটো দিন আরও কেটে গেল।

হীরালাল এসেছেন। যতক্ষণ থাকেন, গল্পগুজবে হাসি-মস্করায় প্রফুল্লই থাকেন শ্যামাচরণ। বরং ওঁর দ্বারা কিছু হবার নয় জেনে একটু বেশি প্রফুল্ল থাকবার চেষ্টাই করেন। উনিও মেলাংকলিয়াটা কেটে আসছে দেখে আর খুঁচিয়ে বাড়াতে চান না। নানারকম গল্পগুজবে সময়টা কাটিয়ে চলে যান। শ্যামচরণও গিয়ে ওঁর সংসারের জীবনপ্রবাহে মিশে যান। তারপর একা থাকলেই আবার সেই অবস্থা।

ডাকের গোলমাল। থেকে-থেকে যেন ঝাঁকে-ঝাঁকে চিঠি আসছে। কয়েকটা বিলম্বিত মানপত্রও এল। শেষের দিকে ওই সব ধরুন—শতায়ু হতে হবে। আতঙ্কে এদিকে নিঃসাড়ে আয়ু কমেই যাচ্ছে। কিন্তু তাতে তো সান্ত্বনা পাওয়া যায় না।

তারপর একদিন মনে হল, সদ্য সদ্য আয়ুর না হোক, দুশ্চিন্তার বোঝাটা যেন ঘাড় থেকে নেমে গেল।

সেও, একান্ত বিলটার মা'র এলাকা না হোক, দৈবই। আর প্রত্যক্ষ। এমন বিস্ময়কর প্রত্যক্ষ যে, জীবনে আর তেমন-কিছু দেখেছেন বলে মনে পড়ে না শ্যামাচরণের।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। বাইরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে ছিলেন শ্যামাচরণ। হীরালাল এই সময়টা আসেন, কিন্তু আসতে পারবেন না, বলে পাঠিয়েছেন।

সমস্ত দিনটা মেঘলা গেছে। হাওয়ার সঙ্গে কুয়াশার মতো একটু-একটু জলের কণা ভেসে আসছে। শ্যামাচরণ আরাম-কেদরাটা ভেতরে নিয়ে গিয়ে দরজার সামনে গা এলিয়ে বসলেন। একলাই রয়েছেন। হীরালালের ছোট মেয়ে অসুস্থ। তিনি আসবেন না।

আজও ডাকে দুটি চিঠি আর একট মানপত্র এল। আয়ুর ব্যালট-বাক্সে আরও তিনটি ভোট।

এই সময় ডাক্তার-ভাইপো কী একটা ক্যাপসুল দেয় গিলে খাওয়ার, আয়ু বৃদ্ধির জন্য। একটু শিরশিরে ভাব ধরে।

একা থাকলেই ওঁর সেই এক চিন্তা। তার ওপর অকালসন্ধ্যার সঙ্গে আর সব মিলে মনটা নিজের মধ্যে গুটিয়ে আসছে, এমন সময় ভাইপোর অফিসের একটি লোক একটা চিঠি নিয়ে উপস্থিত হল।

লোডশেডিং। এখনও কারেন্ট আসেনি। খামটা খুলতে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে শ্যামাচরণ প্রশ্ন করলেন, "কিসের চিঠি ?"

"চিত্রগুপ্ত-পুজোর স্যার। যাবেন দয়া করে।" উত্তর দিল লোকটি।

"চিত্রগুপ্ত ? যমরাজের…?"

"হ্যাঁ স্যার। তিনি কায়েত তো। আমরা কায়েতরা পুজো করি।"

"কিন্তু আমি তো কায়েত নই," এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে একটু হেসে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন—

"কিন্তু দেবতাই তো স্যার, সব দেবতাই…", বলে লোকটি একটু হাসল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেকথা ঠিক বইকি। আমি সে ভেবে বলছি না।" অপ্রতিভ হয়ে সামলে নিলেন শ্যামাচরণ। আরও সামলে নেওয়ার জন্যেই বললেন, "আমাদের ওদিকে তেমন প্রচলন আছে কিনা জানা নেই, তাই…তবে মানা হয় বইকি—যেমন, আজকাল ছট্, মহাবীর, সন্তোষী মাঈ…"

"ইনি হলেন আয়ুর দেবতা স্যার।"

"আয়ুর দেবতা, না ? হ্যাঁ, তা তো হবেনই। যমরাজের খাসনবিশই তো…"

একটু হাসবার চেষ্টা করতে গিয়ে, হঠাৎ কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন শ্যামাচরণ। বললেন, "বেশ, বেশ। কিন্তু আমি যেতে পারি না কোথাও। ঠাকুরকে আমার প্রণাম জানানো রইল।···আসুন।"

লোকটি ঘুরে বারান্দার পিঁড়ি থেকে নেমেছে, শ্যামাচরণ ডাক দিলেন, "শুনুন।"

এসে দাঁড়ালে প্রশ্ন করলেন, "আমাদের চাঁদা দেওয়া হয়েছে তো?"

"হ্যাঁ স্যার, সাহেব এগারো টাকা দেন। দিয়ে দিয়েছেন।"

"দিয়ে দিয়েছেন তো? বেশ, তা হলে আসুন।···পুজো কখন শুরু ঠাকুরের?"

"সকালে একবার হয়ে গেছে। আবার একটু পরেই আরতি-ঘণ্টার সঙ্গে হবে।"

"বেশ, আসুন।"

ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন শ্যামাচরণ। একটা কাঁপুনি ধরেছে, কিন্তু সেটা এই হঠাৎ ঠাণ্ডার জন্যে নয়। মাথায় কতকগুলো এলোমেলো চিন্তা একযোগে এসে ভিড় করেছে। লোকটি গেট খুলে বেরিয়ে যাবে, দাঁড়িয়ে পড়ে শ্যামাচরণ ফের ডাক দিলেন, "শুনুন।"



এলে, না বসেই প্রশ্ন করলেন, "চিত্রগুপ্ত আপনাদের···মানে···আমাদের হিন্দুদের খুব জাগ্রত দেবতা, নয় কি?"

"না হলে চলে স্যার? এতগুলি মানুষের, জীবজন্তুর জীবন-মরণের হিসেব রাখতে হচ্ছে—জলে মাছ, গাছে পাখি, তার ওপর দেখছেন, এই নিত্য অ্যাক্সিডেন্টের হিড়িক।"

অফিস-বসের কাকা, গম্ভীর প্রকৃতির বলেই জানে লোকে, তিনি এত আগ্রহী হয়ে ডেকে প্রশ্ন করছেন, লোকটি বেশ ফলাও করে বলে যাচ্ছিল, উনি বাধা দিয়ে বললেন, "তা বইকি, তা বইকি। আমি বলছিলাম·· মানে, বাংলায় এ-ঠাকুরের বেশি চল নেই কিনা, হওয়া উচিত। হবেও শিগ্গির। আমি জিজ্ঞেস করছি, আর সব ঠাকুরের মতো বিশেষ মানত করে বিশেষ পুজো দিলে··"

"সে কী বলছেন স্যার? আমরা এই করে করে প্রায় একশো বছর নিয়ে এলাম। আমার দাদামশায় আর ক'টা মাস গেলেই..."

একটা ধাক্কা খেয়ে কাঁপুনিটা একটু বেড়ে গেল শ্যামাচরণের। অবশ্য ক্রমবর্ধমান অন্ধকারে লক্ষ্য করবার মতো কিছু নয়, আগেরটুকুও ছিল না, চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, "তা তো হবেই, ঠাকুরের কথা যেমন বলছেন।...তা হলে আর একটু অপেক্ষা করুন। আমি এলাম বলে।"

লোকটি মুখে যাই বলুক, কাজে যাই করুক, দাদামশাইয়ের দুরবস্থার কথা চিন্তার সঙ্গে একজনের স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওই অভিশাপ মাথা পেতে নেওয়ার কথাই ভাবছিল, শ্যামাচরণ একটি দশ আর একটি পাঁচ টাকার নোট হাতে দিয়ে বললেন, "প্যাঁড়া, বরফি, যা পছন্দ ঠাকুরের তাই দিয়ে ঠাকুরের ভাল করে পুজো দিয়ে দেবেন। যান।"

লোকটি দরজার মাঝামাঝি পর্যন্ত গেছে, আর একটা কথা জেনে নেওয়া ঠিক হবে কি না হবে ভাবতে ভাবতে আবার একটা হাঁক দিলেন, "শুনুন একটু।"

এসে দাঁড়ালে প্রশ্ন করলেন, "যেমন আয়ু দিতে পারেন, এই যেমন আপনার দাদামশাইকে দিয়েছেন, তেমনি আবার নিতেও...মানে কমিয়ে দিতেও তো পারেন?"

একটু বিস্মিত হয়েই চাইল লোকটি, কুণ্ঠিত হাসি হেসে বলল, "কী বলছেন স্যার! আপনার কাছে এরকম পুজো পেয়েও আপনার প্রতি এতখানি নির্দয় হতে পারেন? দেবতাই তো!" দু' পা গিয়ে আবার ঘুরে বলল, "ইনিই আবার সদ্য ফলদাতা। বেশি নয়, দুটো কলমের আঁচড়মাত্র তো।"

নমস্কার করে চলে গেল।

এত সদ্য যে, তার কল্পনাও করতে পারেননি শ্যামাচরণ। তার সময়ও পেলেন না বলা ঠিক হবে বরং।

টাকা দিয়ে দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল, লোকটি চলে গেলে আবার এসে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে নিজের চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন। মানুষ যাই বুঝুক, যাই বলুক, তার বুদ্ধির দৌড়ই বা কতটুকু? কিন্তু দেবতা, তিনি তো অন্তর্যামী, তিনি তো বুঝবেন ভক্তের বেদনা কোথায়।...আর, মস্ত বড় একটা আশার কথা, এটাও দেখেছেন, পুরনো দেবতাদের যেখানে দরজায় আঘাত দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয়, নতুনরা সেখানে অল্প আয়াসেই অভীষ্ট সিদ্ধিতে তৎপর হয়ে ওঠেন। মনটা কৌতুক-প্রবণই শ্যামাচরণের, লঘু চিন্তার আমেজে মস্তবড় কখনও মনে হয়েছে, যেন পুরাতনদের ঠেলেঠুলে ভক্তের হৃদয়ে স্থান করে নেওয়ার একটা চতুর অভিসন্ধি থাকে।

আজ চেষ্টা করেই সবরকম লঘুচাপল্য থেকে মনটা ঘুরিয়ে নিয়ে দেবতায় সমর্পণ করতে হবে শ্যামাচরণকে। হে দেব, মানুষে না বুঝুক, তুমি তো সর্বজ্ঞ...

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উতরে গিয়ে রাত্রি একটু গাঢ়ই হয়ে উঠেছে। আকাশ একেবারেই

নক্ষত্রহীন। বাতাসের সেই শীকরকণা আরও ঘন হয়ে উঠেছে, হাঁটুর নীচের কাপড় হয়ে যাচ্ছে সিমসিমে ভিজে। শ্যামাচরণ কিন্তু উঠলেন না। কীরকম একটা অলস আবেশ এসে গেছে মনে, কেদারাটা পেছনে হাত-দুয়েক টেনে বসেই রইলেন খোলা দরজার সামনে। পুজারতির ঘড়ি-ঘণ্টার শব্দ উঠল।···পড়েই আছেন। কতক্ষণ, ঠিক হুঁশ নেই। তবে, রাত্রের পুজো, খুব বেশি সময় না নিয়ে সব শেষ হয়ে গিয়ে চারদিক চতুর্গুণ স্তব্ধ হয়ে গেল। আর ঠিক এই মুহূর্তটিতে সেই আশ্চর্য ঘটনাটা শুরু হয়ে গেল, তাঁর সেই অলৌকিক অভিজ্ঞতা—

লোডশেডিংয়ের উচ্চশক্তির বাতিটা একটা কড়া আলোর ঝলকে অন্ধকারটাও চতুর্গুণ করে দিয়ে গেছে, শ্যামাচরণের দৃষ্টির সামনে সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক আলো ফুটে উঠল। এবার যেন আর গুণিত হিসাবেও ধরা যায় না। কোনও কৃত্রিম আলোর আধার থেকেও নিষ্ক্রান্ত নয়। সামনে একজন যে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরই শরীর থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতির্মণ্ডল। কিছুক্ষণ অচঞ্চল দৃষ্টি নিয়ে বসে রইলেন শ্যামাচরণ, ভয় কি বিস্ময়, কি পুলক বুঝে ওঠার শক্তি হারিয়েছেন। যেন মনের কথা বুঝেই উনি বরাভয়ের দক্ষিণ হস্তটা তুলতে সে-ভাবটা একেবারে কেটে গিয়ে সহজভাব ফিরে এল। প্রশ্ন করলেন, "কে আপনি দেব ?"

"এখুনি তুমি যার পুজো পাঠিয়েছিলে। শেষ করে এলাম।" "সন্তুষ্ট হয়েছি। বর চাও।"

সদ্য সাফল্যে, তাও এত প্রত্যক্ষ, একটা অদ্ভুত পুলক মনে ঠেলে উঠে অত্যন্ত সহজ সাবলীল করে তুলেছে শ্যামাচরণকে। একটু হাসি মুখে নিয়েই বললেন, "আপনি অন্তর্যামী, কী আমার বেদনা সেটা তো আমার চেয়ে আপনিই বেশি জানবেন প্রভু।"

"তবু শুনি। পুজোর দরকার হয় না আমাদের। তবুও তো করোই।" একটু হাসলেন।

"এমন একটা অবস্থা যাচ্ছে, যাতে সবার আশীর্বাদ অভিশাপের রূপ ধরে এসে দাঁড়াচ্ছে।" সাহস পেয়ে বলে চললেন শ্যামাচরণ, "নব্বইয়ে পৌঁছতেই আমি ক্লান্ত, শিথিলাঙ্গ, এর ওপর তাঁরা চান শতায়ু হয়ে বেঁচে থাকি। এক-আধজনের নয়, সবার সম্মিলিত শুভেচ্ছা একমুখী হয়ে, অধুনা পৃথিবীতে সম্মিলিত ভোটের মতো··"

"বুঝেছি। তা হলে তাঁদের আশীর্বাদ তাঁদেরই ফিরিয়ে দাও না। চাও তো এ-শক্তি আমি দিতে পারি।' চোখের দৃষ্টি আর অধরের স্মিত হাসিতে যেন একটা পরীক্ষার ভাব।

শ্যামাচরণও প্রস্তুতই। বললেন, "যেটাকে নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার জন্যে অকল্যাণ বলে মনে করি, সেটা উলটে তাঁদের ওপর চাপিয়ে দোব প্রভু ?"

"তা হলে ?" আবার সেই পরীক্ষার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

"যদি আমার ওপর ছেড়ে দিলেন তো বলব, তাঁরা সবাই পূর্ণায়ু হোন। অর্থাৎ, অটুট স্বাস্থ্যে জীবনের সুখসমৃদ্ধি উপভোগ করে যথাকালে প্রসন্ন মনে বিদায় নিন। তাতে যদি তাঁদের শতায়ুই হতে হয়···'

"বেশ। আমি তুষ্ট হয়েছি তোমার উত্তরে। তোমার সব অভীষ্টই পূর্ণ হবে। আরও কিছু?"

এতখানি প্রশ্রয় পেয়ে সাহস বেড়ে গেছে শ্যামাচরণের। আরও এইজন্যে যে, যেখানে ভেবেছিলেন, যমরাজের দক্ষিণহস্ত ভীমাকার, ভয়াবহ কিছু হবেন, সেখানে দেখছেন একেবারে এক ঘরোয়া দেবতা। প্রশ্ন করার সময় একটি চাপা হাসি অধরপ্রান্তে লেগে থাকায় মনে হয়, জন্ম-মৃত্যুর মতো গুরুগম্ভীর বিষয়ের দপ্তর নিয়ে থাকলেও বেশ শান্ত, সরস মন। একটু কৌতুকপ্রবণও। যেন মনের সব কথা জেনেও কৌতুকবশেই প্রশ্ন করার ভাব।

বললেন, "যদি এতই সদয়, তা হলে আর-একটা নিবেদন প্রভু। যদি অভয় দেন।"

"দেওয়াই আছে।" সে-হাসিটুকু আর-একটু বেড়ে গিয়ে সাহসটাকে এগিয়ে দিচ্ছে।

শ্যামাচরণ বললেন, "আপনি এদিকে আয়ু কমাবার বর দিয়ে যাচ্ছেন, আর আমাদের বাড়ির ঝি, বিলটার মা তুকতাক মাদুলি কবচের জোরে সেটা বাড়াবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে।"



এবার হাসিটুকু আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। বললেন, "তোমার কথা ধরেই বলতে হয়, সে তোমার উপকার করছে জেনেই ওসব করছে, আর তুমি তার অনিষ্ট..."

"না, না, দেব।" একটু শিউরে উঠলেন শ্যামাচরণ, বললেন, "আমি এ-ধরণের কোনও চিন্তাই আনতে পারি না মনে। চল্লিশ বছর ধরে সে-বেচারি আগলে রয়েছে আমাদের দুটি পরিবারকে, আর আমি..."

"তা হলে?"

"তা হলে...তা হলে ..কী যে বলব..."

"আমি বলি?" বিপর্যস্ত ভাব দেখে হাসিটা যেন অধর ছাপিয়ে পড়বে এবার।

শ্যামাচরণ বললেন, "আপনি যা বলবেন তার চেয়ে বড় কথা আর কী হবে, দেব ?"
এবার যেন ও'র মনের অন্তস্তল থেকে কথাগুলো টেনে বের করে নিয়ে বললেন, "আমি বলি, তোমার শতায়ুর বোঝাটা ওরই মাথায় দাও না চাপিয়ে। বুঝুক আরামটা। অভ্যেস যাক ছেড়ে..."
এবার আরও স্পষ্ট, সরব হাসির মধ্যে অন্তর্ধান করে গেলেন।
ঘুমটা ভেঙে গিয়ে চকিত হয়ে উঠে পড়লেন শ্যামাচরণ। নিজের হাসিতেই উঠেছেন জেগে। এখনও মুখে লেগে রয়েছে একটু একটু।
স্বপ্নই। কিন্তু সদ্য ঘটনাবলীর সঙ্গে মিশে গিয়ে এতই প্রত্যক্ষ যে, তা, সাক্ষাৎ-দেবতার বরে সব ভার যেন নেমে গেছে।
বধূমাতা বাড়ি নেই। মনে হচ্ছে, থাকলে, তাঁকে দিয়ে পত্র—মানপত্রগুলো আনিয়ে নিলে দেখা যাবে, শেষ পঙ্‌ক্তিগুলোও অবলুপ্ত। ...তা হলে আর এই মাদুলিগুলোই বা কেন ? ...বাঁ হাতটা ডান হাতের ওপর গিয়ে পড়ল।

আজ কি 'পড়তা' পড়ে গেছে, যেন স্মরণ করতে সঙ্গে সঙ্গেই বধূমাতাও রিকশা থেকে নামলেন। গিয়েছিলেন হীরালালের বাড়ি বম্বের গল্প শুনতে ; হীরালালের মেয়েও যান তাঁর সঙ্গে।
"এই যে বউমাও এসে গেছ !" বেশ উল্লসিত হয়ে উঠলেন শ্যামাচরণ, বললেন, "এক্ষুনি তোমার কথা ভাবছিলাম। একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখলাম এইমাত্র। এত স্পষ্ট যে, এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে, স্বপ্নই ছিল।"
"আসছি মেজোকাকা, হাত-পা ধুয়ে।' বধূমাতাও বেশ প্রফুল্ল। ভেতরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে ঘুরে বললেন, "এক্ষুনি দিদির মুখে যা সব শুনে এলাম, সেও যেন স্বপ্নই। ...আপনি একটু ভেতরে এসে বসুন মেজোকাকা। যা বাদুলে হাওয়া !"
বেশ শোনাবার 'মুড'-এ পেয়েও গেছেন বধূমাতাকে। অন্যদিন হলে এর জন্যেই একরাশ অনুযোগ শুনতে হত।
ফিরে এসে একভাবে বসে শুনেও গেলেন বিশ্বাস আর শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে। মাঝে মাঝে কপালে জোড়-হাত উঠে যাচ্ছে। "...এমন স্বপ্নও কলিকালে দেখা যায় কাকা ! দয়া হলে অবশ্য সবই সম্ভব। কিন্তু ও কী ! আপনার মাদুলিগুলো মেজোকাকা ?"
একটা কেরোসিনের অপর্যাপ্ত আলোর কথা হচ্ছিল, হঠাৎ বালব জ্বলে ওঠার ডান হাতে নজর পড়ে গেছে—থমকে উঠে প্রশ্নটা করে তখনই আবার নিজেই বলে উঠলেন, "এও তা হলে ঠাকুরেরই দয়া ?"
শ্যামাচরণ প্রস্তুতই ছিলেন। ও'র ভেতরে গিয়ে ফিরে আসার মধ্যে, অবস্থা অনুকূল দেখে ওগুলো তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলে কাহিনীর শেষের দিকটায় মনে মনে একটু কারচুপিও করে রেখেছিলেন। দেবতার বরকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে, একটু হেসে, শান্ত

কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ মা, দয়া বলতে হয় বইকী। তোমায় এখনও সবটা বলা হয়নি তো। আমার হাতের ওপর নজর পড়তে (এই যেমন তোমার পড়ে গেল না ?) বললেন, 'হ্যাঁ রে, তোকে শতায়ু করে আগলে রাখার পুণ্যে তোদের ঝিকেও শতায়ু হয়ে পরে বেঁচে থাকবার বর দিলাম, তখন ওই জঞ্জালগুলো (আমরা ভক্তি করে যা-ই বলি, ওদের কাছে তো মিছে জঞ্জালই মা) ওগুলো আর মিছে বইছিস কেন ?"

"তাই বললেন বুঝি ?" উল্লসিত হয়ে উঠেছেন বধূমাতা।

"বললেন, বইকি মা, মনে হচ্ছে। শেষের দিকে এই কথা বলতে বলতে অন্তর্ধান করে গেলেন।"

"দুটো বরই তো হল তা হলে কাকা। ও-ও মুফুতে একটা পেয়ে গেল···লোকে তপস্যা করেও শতায়ু হতে পায় না। কাল কাজ করতে এলেই সুখবরটা দিতে হবে। সবার আয়ু বাড়িয়ে বেড়াচ্ছে বেচারি···আহা।"



সকালে বেড়িয়ে এসে বিলটার মা'র গলা শুনে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে পড়লেন শ্যামাচরণ। গলাটা প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়া। দরজার আড়াল থেকে দেখেন, বধূমাতা উঠোনের সিঁড়িতে বসে, ও পা দুটোর ওপর কপাল চেপে বলে যাচ্ছে, কী পাপে ঠাকুরের কাছে তার এই সাজা যে, তাকে একশো বছর বাঁচতে হবে ? এই শরীর, যা উপার্জন হয় ডাক্তার-বদ্যি-ওষুধেই শেষ হয়ে যায়। ছেলেটার বিয়ে দিলে, বউ এসেই পর করে দিয়েছে, মনের এতটুকু শান্তি নেই। "একদিনও বাঁচতে নেই চাহেইছি হে মাঈজি, কোন্ পাপসে তেক্‌রা উপর আরও পঁচাশ সাল।"···

বধূমাতা সান্ত্বনা দিচ্ছেন, "পাপ করবি কেন ? বাবুর সেবা করছিস, সেই পুণ্যে ঠাকুর বর দিয়েছেন, লোকে তপস্যা করে বর পায় না।"

স্বপ্নের এত সদ্য ফল, শ্যামাচরণ কোনও রকমে হাসি চেপে উঠোনে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কী ব্যাপার বউমা, ও অমন করে…"

ও'র গলা শুনে উলটে ও'র পায়ে এসে পড়ল। "হাঁমরা বাঁচাউ মালিক। হম্ ছাতি চির কর খুন দেবেই দে'ওতাকে (আমি বুক চিরে রক্ত দেব দেবতাকে)।"

আর হাসি চেপে রাখা শক্ত হয়ে উঠেছে। পা দুটোয় টান দিয়ে বললেন, "পা ছাড়। রক্ত দিতে হবে না, চাস না যখন অত পরমায়ু! দেখি আবার একটা পুজো দিয়ে, যদি দেন স্বপ্ন। এর পর আমার কপালে যা হবার হবে। কী আর করব।"

বধূমাতা হঠাৎ উঠে অমনভাবে মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলেন কেন? শ্বশুরের কারচুপি ধরে ফেললেন নাকি?

চারটে মাদুলির চার মন বোঝা গা থেকে নেমে গেছে।

আগে যে ভয়টা বিলটার মা'কে করতেন, সেটা স্থানপরিবর্তন করেছে। এখন মাদুলি-তাবিজের কথা দূরে থাক, বিলটার মা'ই নিজেই তাঁকে দূরে রেখে চলে।

পত্র-মানপত্রগুলো আর সেই বিভীষিকা নিয়ে আসে না। বরং, বিনা মেহনতের উপার্জন, ভালই লাগে, উলটেপালটে দেখেন মাঝে মাঝে।

ভগবানের এই একটি সদ্‌গুণের ওপর বিশ্বাস রেখে বেশ কাটিয়ে যাচ্ছেন শ্যামাচরণ। অর্থাৎ তিনি সবার সব কথায় কান দেন না। এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।

চিঠি



প্রীতিভাজনেষু অর্ধেন্দু,

ইংরাজিতে নস্টালজিয়া বলে যে একটা কথা আছে, বাংলায় 'স্মৃতি-বিলাস' বললে বোধ করি কাছাকাছি যায়—আজকাল সেটা আমায় মাঝে মাঝে পেয়ে বসে। এটা এদিকে একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে নব্বই বছর পেরিয়ে আসার পর থেকে। স্বাভাবিক ভাবেই। কাজ যা ছিল সব ফুরিয়ে এসেছে, ইন্দ্রিয়গুলো শিথিল, অথচ গীতায় ভগবান নাকি 'কর্মযোগে' বলে দিয়েছেন—হাত-পা, চোখ-কান যতই গররাজি হোক, মস্তিষ্কের পরিচালনায় সূক্ষ্মভাবে কাজ তোমায় করে যেতেই হবে। দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব কথাই, তবে তোমাদের আধুনিক সূত্র ধরে এক কথায় স্পষ্টও হয়ে যায়। অর্থাৎ আর সব কিছুর ধর্মঘটের অধিকার বা স্বাধীনতা থাকলেও মস্তিষ্ক বেচারির নেই। অফিসে যেমন পিয়ন-আর্দালি থেকে সবার স্বাধীনতা থাকলেও—অর্থাৎ যারা আন্ডার-স্টাফের মধ্যে পড়ে—বড় কর্তাকে চেম্বার আগলে বসে থাকতেই হবে।

স্মৃতি রোমন্থনের কথায় আসা যাক। খুঁজে-হাতড়ে বের করে অনেক জিনিসই

পুরনো করে ফেলেছি। সেদিন শীতের মধ্যাহ্নে বাগানের মিঠে রোদে পিঠ দিয়ে চোখ বুজে আসছে। হঠাৎ তন্দ্রার গোলাপী স্তূপের মতো একেবারে জীবনের ও-প্রান্তে একটা অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেল। সবটুকু যে একটানা মিষ্টি, এমন নয়, তবু তোমায় বলি—

১৯১২ সাল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা শেষ করে এসে···থাক। আগে কিন্তু আমার সহপাঠী বীরেশ এবং তার ভাইদের কিছু পরিচয় দিতে হয়, কেননা এই কাহিনীতে তাদের কিছু ভূমিকা আছে। বীরেশ এবং তার তৃতীয় জ্যেষ্ঠ দীনেশের একটু বেশি করেই। ওরা ছিল সাত ভাই। যে-সময়ের কথা সে সময় দু'জন নেপথ্যে। আমি যখন থার্ড ক্লাসে, অর্থাৎ সে সময়ের ম্যাট্রিক থেকে দু' ক্লাস নীচে পড়ি, ও'দের পিতা শ্যামাকান্ত সপরিবারে দ্বারভাঙ্গায় আমাদের পাড়ায় বাড়ি ভাড়া করে বসবাস আরম্ভ করে। দ্বারভাঙ্গার কাছে বাইরের একটা চাকলায় তহশিলদারের কাজ করতেন। সম্মানের পোস্ট। অবসর নিয়ে এসে বসে রয়েছেন। বাংলায় বাড়ি ছিল হালিশহরে।

তুমি লক্ষ্য করে থাকবে সব পরিবারের নিজের নিজের পরিবারগত বিভিন্নতা থাকলেও এক-একটা পরিবারের মধ্যে এমন একটা বিশিষ্টতা থেকে যায় যেটা ইংরাজিতে ফ্যামিলি ট্রেট বলা হয়। বীরেশদের ছিল একটা নিরীহ দোষ, হামবড়াইভাব। দম্ভ বা ঔদ্ধত্য জাতীয় কিছু নয়। একটা 'সবজান্তা ভাব', আমি জানি, সুতরাং আমার কাছে বুজরুকি চলবে না। মেনে নিতে হবে আমার কথা। ছোট কথা, হালকা কথা, যা বেশ গালভরা নয়—এমন কোন কথার দিকে যাওয়া কারুর অভ্যাস ছিল না। একটা উদাহরণ দিলে আমার বক্তব্যটা পরিষ্কার হবে।

যখনকার কথা তখন আমাদের দু'বাড়ি মিলিয়ে রোজ বেশ জমাট আড্ডা চলছে। ও'রা এসে আরও জমিয়ে দিলেন। এই সবজান্তাপনায় সবচেয়ে এগিয়ে ছিলেন ধনেশ। ভাইয়েদের মধ্যে উনি ছিলেন দ্বিতীয়। রংটা কালো। বয়স তখন ত্রিশের কাছাকাছি। মাথায় কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল। কোঁচা দুলিয়ে একটু মুরুব্বিয়ানা-চালে চলাফেরা করতেন। স্বল্পভাষী। স্বল্পভাষী হলেও কিন্তু যা বলতেন, আর যেমনভাবে বলতেন তাতে তাঁর ওপর আর কোন কথা চলত না। তাঁর জ্ঞানেরও কোন সীমা বাঁধা ছিল না। বিশেষ করে বাংলার সাহিত্য, শিল্পকলা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা—এইসব বিষয়ে তিনি ছিলেন অথরিটি। তখন মোহনবাগান সদ্য আই. এফ. এ. শীল্ড জিতেছে। আমাদের এসব বিষয়ে জ্ঞান তখন অপ্রত্যক্ষই। সুতরাং অবস্থাটা বুঝতেই পার।

সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সেইদিনই ও'র কাছে শুনলাম—রবীন্দ্রনাথ কালো ছিলেন। একটু রসিকতা করে হেসে বললেন—"আমার মতন মিস-কালো নন অবশ্য, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কেউই নয় তা—তবু রবিবাবুকে কালোই বলতে হবে বইকি।"

আমার খুব একটা আঘাত লাগল। বয়সের অনেক প্রভেদ, সমীহই করতাম, একটু কাঁচুমাচু হয়ে বললাম—"কিন্তু মেজদা, আমার তো ধারণা ছিল······"
"তুমি নিজে দেখেছ?"—বাঁ হাতের আঙুলে গোঁফের ডগাটা ঘোরাতে ঘোরাতে, ঠোঁটের ওই কোণে একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে, এমনভাবে বললেন যে ও'রও দেখা আছে কিনা প্রশ্ন করতে সাহস হল না। সাহিত্য নিয়ে আমিই তখন যা একটু নাড়াচাড়া করতে শুরু করেছি। অবস্থা দেখে আর কেউই এগুলো না।
উনি বিপক্ষকে একেবারে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দিতেন। ওইটুকু বলেই নিরস্ত না হয়ে প্রশ্ন করলেন—"মাইকেলের ছবি দেখেছ?···ফর্সা না কালো?"
তখন "বসুমতী" গ্রন্থাবলীগুলো বেরুত। বোধহয় আরও দু-একটা ঐরকম গ্রন্থাবলীতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি বড় বড় অনেক লেখকের ছবি দেওয়া হোত। মোটা গোঁফে গালপাট্টার মাইকেলকে কালোই মনে হোত। অবশ্য মনেই হওয়া। কি বলব ভাবছি, উনি মুখের ওপর সেইরকম দৃষ্টি ফেলে চেয়েই ছিলেন, বললেন—"রবিবাবু ছিলেন মাইকেলের কনটেমপোরারি।"



তখন ও বিষয়ে অতটা তথ্যগত জ্ঞান ছিল কিনা মনে পড়ছে না। থাকলেও গালভরা 'কনটেমপোরারি' কথাটার অভিধান ঘেঁটে মানে বের করবার সময় নেই। ফলে, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলকাতায় পড়বার জন্য গিয়ে না ওঠা পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে মাইকেলের সঙ্গে ব্র্যাকেটে কালো হয়েই রইলেন।
তুমি স্যাবাথ নাম দিয়ে সেই বিখ্যাত ছবিটা দেখেছ? একজন খুব বিখ্যাত ইউরোপীয় চিত্রকরের নামটা এখন কলমের ডগায় ঠিক আসছে না। 'স্যাবাথ' হচ্ছে রবিবার। জানই তো ও দিনটায় ক্রিশ্চানরা একেবারেই কোন কাজকর্ম করে না। ছবিটা হচ্ছে—একটা খোলা মাঠ, তার মাঝখানে একটা ঘোড়া চার-পা তুলে ছুটোছুটি করছে···মুক্ত বন্ধন···সমস্ত দেহমনে ছুটির উল্লাস।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা শেষ করে আমারও ওই অবস্থা। রাগ করো না, তোমাদের এ-কালের এই সস্তা পরীক্ষা না। টেস্টের আগে থেকেই যে ধকলটা গেছে—রাত জাগা পর্যন্ত। এবার ছুটি! ছুটি। ছুটি।

আমি চিরকালই 'বারমুখো', অজানা নয় তোমার। এবার লম্বা একটা দৌড় দিয়ে না আসতে পারলে নিষ্কৃতি নেই। একজন সঙ্গী দরকার। উত্তরবর্তী জীবনে এ ধরনের নিরুদ্দেশ যাত্রায় কোন সঙ্গী আমি নিতাম না। তখন কিন্তু এই প্রথম, বাড়ির লোকেই বা ছাড়বেন কেন? সহপাঠী বীরেশকে নাচিয়ে তুললাম। পরের অভিজ্ঞতায় অবশ্য দেখা গেল, নাচাবার দড়িটা তার হাতেই ছিল, কিন্তু সেকথা এখন থাক। বীরেশ আমার সঙ্গে পরীক্ষাও শেষ করেছে। সহপাঠী হলেও বীরেশ আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড় ছিল। ওর বাবার চাকরি থাকতে ওদের পড়াশুনা বেশ নিয়মিতভাবে হয়নি। লম্বা, ডম্বল-ভাঁজা শরীরে ওকে বয়সের চেয়ে একটু বড়ই দেখাত। ভাইয়েদের মধ্যে চতুর্থ, ছোট তিনজনের সঙ্গে আমিও ন'দা বলেই ডাকতাম। হুজুগপ্রিয় সব ভাই—কথাটা তুলতে রাজি হয়ে গেল। পরের প্রশ্ন, তাহলে কোথায় যাওয়া যায়? কলকাতা-দিল্লী তো নয়। কাছেপিঠে কোথাও। আমার অনেকদিন থেকেই রাজনগরের দিকে নজর ছিল। একটু গোড়া থেকেই পরিচয় দিই, নইলে বুঝবে না।

মহারাজ রামেশ্বর সিং, অর্থাৎ দ্বারভাঙ্গার শেষ মহারাজার পিতা ছিলেন অতি ধুরন্ধর ব্যক্তি। যখন গদিতে বসলেন তখন স্টেটের আয় পঞ্চাশ লক্ষ। তীক্ষ্ন বিষয়বুদ্ধি, উনি সেটাকে বাড়িয়ে প্রায় দ্বিগুণ করে তুললেন, এক কোটির কাছাকাছি। বম্বের দু-একটা কাপড়ের মিল কিনে নিয়ে, নিজেও কয়েকটা দাঁড় করিয়ে, দায়গ্রস্ত নেটিভ স্টেটদের ঋণ দিয়ে ওই উপায়ে বাংলা-বিহারের অনেক জমিদারি হস্তগত করেন, আরও নানা কৌশলে। জান, আমি দিনকতক ওঁর একান্ত সচিবের কাজ করি। বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন অসাধারণ পুরুষ। শিরস্ত্রাণ, ওঁদের "পগের" মধ্যে মা লক্ষ্মীকে বন্দিনী করে রেখেছিলেন বলত সবাই। কিন্তু তিনি তো কোনকালেই চিরকাল আটকা থাকার মেয়ে নন। একটা ছিদ্রপথ রাখেনই খুলে। মহারাজ রামেশ্বর সিংয়ের অ্যামবিশান বা উচ্চাভিলাষ ছিল জয়পুর-যোধপুর আদি নেটিভ স্টেটের মর্যাদালাভ। এর জন্যে ভাইসরয় থেকে আঞ্চলিক গবর্নর পর্যন্ত কতজনকে তোয়াজ করতে কত অর্থ-সম্পত্তি যে বেরিয়ে গেছে 'পার্টি' দিতে, ভেট দিতে, যার মধ্যে অন্তঃপুরবাসিনীদের মণিমুক্তার দামী দামী কণ্ঠহারও ছিল—তার হিসাব হয় না। সে-কাহিনীর শেষও নেই, সুতরাং রাজনগরের কথায় ফিরে আসা যাক।

নেটিভ প্রিন্স হলে দ্বারভাঙ্গার মতো একটা জেলাশহরে প্রভিন্সিয়াল গবর্নমেন্টের আওতায় বসবাস করার কোন মানে হয় না। তাই নিজের আসল রাজধানী, রাজনগর নিজের স্টেটের মাঝখানে। রাজনগর—নামটা অবশ্য আগে থাকতেই ছিল, একটা চাকলা, বা জমিদারির তহসিল হিসাবে।

তখনকার টাকার মূল্যে প্রায় দু' কোটি টাকা খরচ করে শহরের পত্তন হয়। মহারাজ

কখনও থাকেন দ্বারভাঙ্গায়, কখনও কখনও সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ওখানেই উঠে যান। বেশি দূরে নয়, রেলে তিনটে স্টেশন ; ত্রিশ-বত্রিশ মাইল উত্তর-পূর্বে।
দেখা হয়নি, ঐটেই আগে দেখে আসতে হবে।
কিন্তু উঠব কোথায়? একেবারেই নতুন জায়গা। মেজভাই দীনেশের শরণাপন্ন হলাম। সবার মতো আমিও মেজদা বলতাম। বললাম—এই এই ব্যাপার, উঠি কোথায় বুঝতে পারছি না। এক কথাতেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বললেন—"তোমরা গিয়ে বিশ্বাস মশাই-এর বাসায় ওঠ।"
"একটা চিঠি দেবেন?"
"দরকার হবে না। বাবার নাম করে বলবে, তাঁর কাছ থেকে আসছি। উনি বাবার আণ্ডারে কাজ করতেন। আর বীরু তো রইলই সঙ্গে।" চাকলার নামও করেছিলেন। এখন মনে পড়ছে না।
সিগারেট প্রায় থাকতই হাতে। একটা টোকা মেরে বললেন, ও'র নিজের প্রথায় একটু হেসে—"তা বলে তুমি যেন বোকার মতন 'আণ্ডারে কাজ করার' কথাটা বলে ফেল না —ও'র প্যালেটেবল্ নাও হতে পারে।" ইংরাজিটা ভালো জানতেন। প্রায় বেরিয়েও পড়ত মুখ দিয়ে। একটু অর্ধপূর্ণ হাসিও দেখা দিত ঠোঁটে।
"তা কখনও বলি?"—একটু কৃতজ্ঞ হাসি হাসলাম আমি।

পরদিন একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে দু'জনের জামা-কাপড় আর টুকিটাকি ভরে সকালেই বেরিয়ে পড়ে প্রায় সাড়ে আটটার সময় রাজনগর স্টেশনে নামলাম। শহর লাগোয়াই, জিজ্ঞেস করে করে অল্প সময়ের মধ্যে পেঁছে গেলাম বাসায়। স্টেশনের একটু পরেই কমলা নদী। পাকা পুল আছে।
বিশ্বাসমশাই অফিসের পোশাকেই বেরুচ্ছিলেন। বারান্দা থেকেই প্রশ্ন করলেন—"কে? কোথা থেকে আসছ?"
বেশ সুপুরুষ। টানা-টানা চোখ, প্রশান্ত দৃষ্টি। আমি বললাম—"দ্বারভাঙ্গা থেকে আসছি আমরা—প্যালেস দেখবার জন্যে। শ্যামবাবু বললেন—আপনাকে বললেই হবে—তিনি……"
মেজদার কথাটা মনে পড়ে যেতে থেমে গেলাম।
"কে শ্যামবাবু?" একটু চোখ তুলে মনে করে নিয়ে বললেন, "ও, মনে পড়েছে—আমার সেরেস্তায় কিছুদিন হেডক্লার্ক ছিলেন।…প্যালেস দেখতে এসেছ? তা দেখবে।……"
ভিতর থেকে একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে এসে দাঁড়াল। ওই রকমই মুখের আদল। স্টেটের পাল্কিগাড়ি অপেক্ষাই করছিল। আমাদের একটু পরিচয়, আসার উদ্দেশ্য দু'কথায় বলে, উনি চলে গেলে সেই ছেলেটি যার নাম রণেন এগিয়ে এসে বললেন—"আসুন, উঠে আসুন। বাঁচালেন মশাই। মাসখানেক ধরে এসে বসে আছি, একটা

বাঙালীর মুখ চোখে পড়ল না। রাজধানী অথচ বাঙালী নেই, ভাবতে পারেন?
আসুন, ভেতরে আসুন।"

চেয়ার-সোফা দেওয়া বৈঠকখানাতে গিয়ে বসলাম আমরা। বেশ আলাপী একটা ছোকরা—চাকরকে ডেকে চায়ের কথা বলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেশ জমিয়েও তুললেন।

"—বুঝেছি। আর বলতে হবে না। দড়ি-ছেড়ে বলদ······আর বলতে হবে না,··· ফ্রিডম নেওয়ার জন্যে মাপ করবেন। আমারও ওই দশা, অবস্থাটা বুঝি···বি-এর টেস্ট দিয়ে—ওই যেমন বললাম, ভাবছি দড়ি-ছেঁড়া দামড়ার মতন কার বাগানে গিয়ে ঢুকি···মনে হোল বাবা বদলি হয়ে এসে রয়েছেন—দিনকতক কাটিয়ে আসি, অন্তরাত্মা ঠাণ্ডা হবেন··· ওমা, এ চব্যচুষ্যের চেয়ে হোটেলের পাচক ঠাকুর মিশরজীর নেনুয়ার ঘ্যাঁট আর দোতলা অড়হরের ডাল ঢের ভালো···একটা কথা কইবার লোক নেই।···"

খুব আমুদে রসিক।



এরই মধ্যে আমাদের দু'জনের চা-জলখাবার সারাও হয়ে গেল। আলাপ প্রায় একতরফাই। এক-একজন লোক থাকে, যখন ঠিক হাসছে না, তখনও চোখে যেন হাসি লেগে থাকে; সেইভাবে বলে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে কোন একটা কথায় তিনজনের মুখেই হাসি ছলকে উঠছে। আমরা অনভিজ্ঞ, বাইরে এই প্রথম বেরুনো, উনি বয়সে-বিদ্যায়ও বেশ খানিকটা এগিয়ে; কোথা দিয়ে সময়টা যে কেটে গেল, যেন বোঝাই গেল না।

কর্তার অফিসের জন্য রান্নার পাট বোধহয় ও'দের সকাল-সকাল সেরে নিতে হয়। আমাদের হঠাৎ এসে পড়ার জন্য কিছু অতিরিক্ত আয়োজন হয়ে থাকবে। দেয়ালঘড়িতে যখন এগারটা, চাকর এসে জানাল—ভিতরে আহারের জায়গা হয়েছে।

এসব অঞ্চলে, বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত পরিবারে সে সময় পর্দার খুব কড়াকড়ি। আমাদের জন্য নয়, তবে অফিসের কোন লোক তো এসে পড়তে পারে। সেই অভ্যাসেই রণেনের মা এতক্ষণ বাইরে এসে আমাদের খোঁজ নেননি। খাবার সময় এসে একটা চেয়ারে বসলেন।

বয়সও হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে। সুন্দরী; রণেন রংটা ও'র কাছেই পেয়েছেন। স্বল্প এবং মৃদুভাষিণী। রণেন এটাও যে ও'র কাছ থেকে পাননি, এটা বেশ বোঝা যায়।

কথার মধ্যে সংসারভার নির্জিতা বাঙালী গৃহিণীর—বিশেষ নির্জিতা না হলেও যে একটা ক্লান্ত অনুক্ষেপের ভাব থাকে, অপরিচিত, বা স্বল্প পরিচিতের কানে তুলে দেবার যে একটা প্রবণতা—সেটা বেশ আছেই—"পাচকঠাকুর থাকে না—ওদের মতন ক'রে অখাদ্য রাঁধতে চাওতো তুমি বেশ ভালো মনিব—পছন্দ না হয়, শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে চাও, তাহলে অন্য লোক দ্যাখো।··· কেমন রেঁধেছে বাবা?"

ন'দা বাইরে গেলে একটু লাজুক।

দুঃখের কথায় মানুষকে যেমন কাছাকাছি এনে ফেলে আর কিছুতে তেমন পারে না। কেমন যেন একটা আত্মীয়তা বোধ করে, কতকটা ওর সুরটা বজায় রাখবার জন্যে বললাম, "ঠিক করেই এনেছেন আপনি তবে ডালে নুন কম দিয়ে বসেছে মনে হয়।···না ন' দা?"

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মনে হল নিজের কথার সার্থকতায় খুশীও হয়ে উঠছেন একটু। চকিত হয়ে উঠে বললেন—"দেখছ? করবেই একটা না একটা ভুল; আমি জানি।"

এবার যা করলেন সেটা ও'র দিক দিয়েও যেন সদ্য আত্মীয়তাভাবের জন্যেই। ঠাকুরকে একটা ডাক দিয়ে তখনই সামলে নিয়ে বলে উঠলেন—"না তুমি থাকো।···রমলা, তুই একটু নুন দিয়ে আয় তো মা শিগ্গির।"

আমি আর একটু মুক্ত-জিহ্বা হয়ে উঠলাম, বললাম—"তাহলে আর একটু মাছের কোর্মাটা আনতে বলে দিন।"

রণেনও মাঝে মাঝে জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন, বললেন—"বাঃ ভালো হয়েছে তো, বন্ধুর কথাও বলে দিন, উনি তো হেঁট করেই রয়েছেন।"

একটি মেয়ে বাঁহাতে নুনের টিপ আর ডান হাতে একটা ডিবেয় চারটে মাছের দাগা দিয়ে গেল। ওই বাপ-মার মেয়ে, ওই ভায়ের বোন, খুবই সুন্দরী।

বাতাসটা যেন হঠাৎ একটু স্তব্ধ হয়ে গেল।

গৃহিণী একটু সময় নিলেন, তারপর আবার সেই সংসার-নির্জিতা বাঙালী গৃহিণী।

বললেন—ক্লান্ত এবং মৃদু কণ্ঠেই—"দেখলে তো? একটিকে পার করেছি—এটি এখনও ঘাড়ে রয়েছেন—বলে রেখেছি চারিদিকে, কিন্তু লাগছে কই কোথাও? —এখানে এসে খোঁজখবর নেওয়া আরও মুশকিল হয়েছে—বাঙালীর ছেলেই বা কোথায়? তোমাদের দ্বারভাঙ্গায় শুনেছি অনেক বাঙালীর বাস—তেমন ভালো ছেলে যদি থাকে—মেয়ে তো দেখেই যাচ্ছো, তোমার বাবা·· রণুকেও বলি—তা একটু চাড় আছে এদিকে?"

আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওই আলোচনাই চলল। বেরিয়ে এসে আঁচাচ্ছি, রণেন চাপা গলায় হাসতে হাসতে বলল—"আর রণু বেচারি যে দুটো পাস দিয়ে তিনটে দিতে চলেছে, তার কথা ভাবছে কে? সে নিজের ভাবনা ভাববে, না বোনের ভাবনা ভাববে?—বলুন তো?···আছে আপনাদের দ্বারভাঙ্গায় তেমন···?"

আমাদেরও হাসির মধ্যে টেনে নিয়েছেন।

তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে হেসে শুরু করেছি—"আগে ঘটক বিদায়ের কথা···"

অফিসের পিয়ন এসে রণেনের হাতে একটা চিঠি দিল। পড়ে, প্রথমে একটু গম্ভীরই হয়ে গিয়ে তখনই আবার হাসি হাসি মুখ করে বললেন—"আমার পক্ষে তো ভালই হল।···এই দেখুন।" হাত বাড়িয়ে চিঠিটা আমার হাতে দিলেন।
লেখা আছে—মহারাজের আজ যাবার কথা ছিল কিন্তু গেলেন না। প্যালেস দেখা হবে না।
ও'র মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে একটু চেয়ে থেকে প্রশ্ন করলাম—"কবে যাবেন তাহলে?"
"তা কি খোদ মহারাজই জানেন? তাহলে আর মহারাজ কিসের?" একটু হাসবারই চেষ্টা। আমায় বিহ্বলভাবে মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে আবার গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন—"অত ভাববার কি আছে?···এ পিয়ন ফিরে যেতে না যেতে এখনি হয়তো অন্য পিয়ন এসে অন্য চিঠি দেবে—রাজার মত উল্টে গেছে, ঘণ্টাখানেকের ভিতরেই বেরিয়ে যাবেন।"
এবার আমার মুখে একটু হাসি দেখা দিয়ে থাকবে, বললেন—"মিথ্যে বলছি? অন্তঃপুরে রানী বলেও একজন আছেন···তিনি আবার দ্বিতীয় পক্ষের; শোনা যায় মনমেজাজে কৈকেয়ীর সহোদরা—আবদার ধরলেই হল···।"
বলবার ভঙ্গীতে হাসিটা আমার একটু স্পষ্ট হয়ে এসেছে। কি একটা বলতে যাব, উনিই গম্ভীর হয়ে বললেন,—"না না মস্করা থাক। দুটো দিন না হয় থেকেই গেলেন? এই পাণ্ডববর্জিত দেশে পড়ে রয়েছি···"
উৎসাহের মুখেই বাধা, তায় অনিশ্চিতই, রাজার খেয়ালের ওপরে—আমি টেনে টেনে বললাম—"আশা নিয়ে বেকার বসে থাকা···"
কথা পড়বার জো নেই, লুফে নিয়ে ভ্রূ কপালে তুলে বললেন—"বেকার!···কিন্তু, বেকার আপনাকে থাকতে দিচ্ছে কে? এত কাজ পড়ে আছে চারিদিকে যে!"
একটু বিস্মিতভাবে চারিদিকে নজর ফেরাতে যাব, বললেন—"এত কাছে চারিদিকে নয়—দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, পাটনা, মোতিহারী—যেখানে যেখানে ভালো মেয়ে জানা আছে—বসে বসে চিঠি ঝাড়তে থাকুন না—এইরকম পাত্র—রূপে কার্তিক গুণে···"
আর গাম্ভীর্য ধরে রাখতে পারলেন না, হেসে আবার কি বলতে যাবেন—ন'দা সমস্যাটা মিটিয়ে দিল। এতক্ষণ চুপ থেকেই মনে মনে কি যেন ভাবছিল, একটু দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলল—"একটা কাজ করলে কি রকম হয়? দু'টো দিন পাটিয়ারি থেকে যদি ঘুরে আসি।"
পাটিয়ারি জায়গাটা কোথায় জিজ্ঞেস করতে পরিচয় যা দিল তা বেশ লোভনীয়ই, বিশেষ করে ভ্রমণের মুড়ে বাধা পেয়ে যখন দোটানায় পড়ে গেছি। পাটিয়ারি এখান থেকে মাইল সাতেক দূরে একটি গ্রাম। উত্তর-পশ্চিমে, অর্থাৎ হিমালয়ের তরাইয়ের আরও খানিকটা কাছাকাছি। একেবারে গ্রামের মধ্যে নয়, মাইলখানেক আরও উত্তরে ওদের পঞ্চাশ-ষাট বিঘা জমি আছে। নীল চাষ হত। ওর বাবা যখন রাজ্যের

তহশিলদার তখন সাহেবের বাংলোসুদ্ধ বেনামিতে কিনে নেন। ওর সেজদাদা ধীরেশ সেখানে থেকে দেখাশোনা করেন।
"একাই ?"—আমি প্রশ্ন করতে একটু হেসে বলল—"একা ছাড়া দোকা কোথায় পাবেন ? তুমি তো জানই মেজদারই এখনও বিয়ে হয়নি…তবে একাতেই ফুরসৎ নেই—শিকার।… আরও মাইলখানেক উত্তরে গিয়ে কমলা নদীর ওপারে বিরাট জঙ্গল—হরিণ, বুনোশুয়োর …না পাখি নেই, তবে চিতল মাঝে মাঝে দেখা যায়—আর নদীতে কুমীর · সে কুমীরের ঘটা বলে বোঝানো যাবে না।"
কথাগুলো যেন কি করে আটকে ছিল ন'দার বুকে—বলতে বলতে ওদের ভাইয়েদের যা স্বভাব,—মুখর হয়ে উঠল। শুনতে শুনতে রণেনেরও মুখের ভাবভঙ্গি বদলে গেছে—উৎসাহের সঙ্গে বলল—"এত কাছে এমন একটা জায়গা আছে, জানতাম না তো। আর, শিকার ? আমার ভয়ানক শখ…বাবার বন্দুকও রয়েছে। তাহলে বাবাকে বলে কালই একটা রাজার টমটমের ব্যবস্থা করি ?"
"টমটম ? কালই ?" ন'দার সুরটা হঠাৎ একটু যেন নেমে গেল।



ন'দা বলেই একটু খটকা লাগায় আমি বললাম,—"আমরা না হয় ঘুরেই আসি। ওদিকেও বলে-করে ব্যবস্থা করে আসতে পারব।"
"তাহলে—টমটম… ?"
"আবার টমটম ?…এইটুকু তো পথ। এখনই বেরিয়ে পড়লে—ঘণ্টায় দু'মাইল—পাঁচটার মধ্যেই পৌঁছে যাচ্ছি।"
"তুমি কি বল হে ?"—আমায় প্রশ্ন করল।
বেশ পরিষ্কার মনে হচ্ছে, কোথায় যেন কি একটা থেকে যাচ্ছে। একে এখানেই অনিশ্চিতের মধ্যে পড়ে থাকতে মন চাইছে না। টমটমের ফ্যাসাদ তুলতে গেলে আরও অনিশ্চয়তা। আমি বললাম—"তা বইকি, সাতটা মাইল আর কি ? গল্প করতে করতে কেটে যাবে। ওই ঠিক। আর দেরি করা নয়।" ঘর থেকে ব্যাগটা নিয়ে

এসে, "তাহলে আসি।"—বলে ও'র দিকে চেয়ে একটু বিদায়ের হাসি হেসে বেরিয়ে পড়লাম। উনি গেট পর্যন্ত এসে বললেন—"ফিরে আসছেন কিন্তু নিশ্চয়। আমি বন্দুক পরিষ্কার করে রাখি।"

"তাহলে কোন্ সাহসে আসব ?"

তিনজনেই হেসে উঠলাম।

প্যালেস-এরিয়ার পরও প্রায় মাইল দুয়েক রাস্তা ভালোই, তারপর খারাপ হতে হতে কমলার একটা সুঁতির সামনে এত জঘন্য হয়ে পড়েছে যে, দু'জনের মুখ শুকিয়ে গেল। সুঁতিটা শুকনো। একটা আম বাগানের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেছে; কিছু গাছ শুইয়ে দিয়ে ওদিকটা বেশ দেখা যায় না। গোরুর গাড়ির চাকার দাগ দেখে দেখে আমরা বাগানটা পেরিয়ে গিয়ে যা দেখলাম তাতে বুক পর্যন্ত শুকিয়ে গেল।

প্রায় দুই-তিন মাইল পর্যন্ত যতটা দেখা যায়, এইরকম রাস্তা। এইরকম ভাঙাচোরা, উঁচু-নীচু, যতটা আন্দাজ করা যায় শেষ পর্যন্ত। একটু আধটু যে কথা চলছিল আমাদের, সুঁতি পেরুতে বাগানের পর শেষ হয়ে গেছে। দাঁড়িয়েও পড়েছি, ন'দা একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে। কতকটা মুখ রক্ষার জন্যেই বলল—"এই জন্যেই আমি টমটমের কথা তুলতে বারণ করেছিলাম। ঠিক করিনি ?"

"তুমি জানতে ?"—প্রশ্ন করলাম, যেটা স্বভাবতই এসে পড়ল মুখে। অপ্রতিভই হয়ে পড়েছে, ইচ্ছা ছিল না ঠোকবার।

বলল—"কি করে জানব বল ভাই ? সেই কবে, বাবা যখন কিনলেন নিলেমে, একবার দেখতে এসেছিলাম সবাইয়ের সঙ্গে। তখন আমার বয়স কতই বা ? নতু জন্মায়নি, পাতু বছর চারেকের। মনে পড়ে ? তুমিই বল ?"

খুবই অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে। একটার পর একটা অদ্ভুত যুক্তি বিন্যাস দেখে, আমার যা স্বভাব—একটা হাসি গুড়গুড়িয়ে উঠে মনটাকে তরল করে আনল। আর একটা দিকে চলে গেছে মনটা। সেই কথা তোমায় বলি এবার—যে ধরনের বেড়ানোকে আনন্দ বলা যায় না, তাতেও যে আনন্দ পেয়েছি আমি—যার কথা আমার লেখাতে কিছু কিছু পেয়ে গেছ—তার কারণ, পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকুল, অভিনব হলে তো কথাই নেই—অবিশেষ বা প্রতিকুল হলেও একটা বিস্ময়, আনন্দ তাকে অভিনব করে তুলে আমায় চালিয়ে নিয়ে যায়! মাথার ওপর নিঃসীম, নীল আকাশ, দু'ধারে কমলার পলি-ফ্যালা স্রোতে গাঢ় সবুজ ফাগুন-চৈত্রের ফসল—সামনের উঁচু-নীচু রাস্তাটা সব গ্লানি ভুলিয়ে যেন সামনের দিকেই টানছে আরও।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি, ন'দার প্রশ্নে চটক ভাঙল।

"তাহলে কি করবে ? ফিরেই যাবে ?"

বললাম, "ফিরে যাওয়াটা কি আর ঠিক হবে ?"

বলল—"তা তো হবেই না।...অত বারফাটকা দেখিয়ে বেরিয়ে এসে। বলো ?"

মুখে হাসিও ফুটল এতক্ষণে।

চলেছি দু'জনে। মন তাজা হয়ে সেই পথই রাজপথ হয়ে উঠেছে। আমার অন্যমনস্কতা ভেদ করে মাঝে মাঝে ন'দার কথা এসে পড়ছে কানে। আর সব চাপা দিয়ে কমলার উপর এবার সব দোষ চাপাবার পালা তার "জানই···এই এক নদী কোন বছর কোন দিকে যে ভাঙবে, কোন দিকে গড়বে·· "

কমলার আর একটা সুঁতির ধারে এসে পড়েছি। কালো পলিমাটির ক্ষেতে খেসারি আর মটরের গাছগুলো লকলক করছে। ছেলেবেলায় পাণ্ডুতে থাকতে আমাদের বাল্য-রসনার প্রিয় খাদ্য। ন'দার বাক্যস্রোত চলেছেই—"মহারাজার যে কি দুর্মতি হল·· এমন জায়গায়···জেনেশুনে রাজধানীটা···"

বললাম—"উনি থাকুন না ও'র দুর্মতি-সুমতি নিয়ে। একটা জিনিস খাবে? ছেলেবেলায় পাণ্ডুতে থাকতে খেতাম আমরা। একবার দেখলে হত এখন কি রকম লাগে?"

"কি? তুমি আবার কি আবিষ্কার করলে এই তেপান্তর মাঠের মধ্যে?"

বললাম—"দাঁড়াও, নিয়ে আসি। খেয়ে দেখ।"

নেমে গিয়ে কচি কচি ফলের সঙ্গে বেশ এক মুঠো ডগা তুলে নিয়ে এসে, বেশিটা নিজে রেখে গোটাকতক ওর হাতে তুলে দিয়ে বললাম—"দ্যাখ খেয়ে, দেহাতি মেওয়া।"

একটা দলা পাকিয়ে নিজের মুখে ফেলে দিলাম। ন'দা কি ভেবে একটু শুঁকে নিয়ে আমারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বার দুই চিবিয়ে নিয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে বলে উঠল—"চমৎকার হে! আর ফুল অফ ভিটামিন—আজকাল যা নতুন ধুয়ো উঠেছে! ···তুমি সবটা খেও না।"

জানি না মন থেকে, না কি আমার মন রাখা। আরও খানিকটা ওর হাতে দিয়ে বললাম—"দাঁড়াও, আরও একমুঠো তুলে আনি তাহলে।"

একটা কথা বলা হয়নি তোমায়। এই রাস্তা—ভাঙাচোরা, উঁচুনীচু, বালি, পাঁক, মাঝে ক'জায়গায় পুকুর করে দিয়ে গেছে কমলা, ঘুরে আসতে হল—ফলে, পাঁচটার মধ্যে বাসায় পোঁছানো দূরে থাকুক, এখানেই প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল আমাদের। ক্লান্তও হয়ে পড়েছি। পরিবেশের সঙ্গে ন'দার 'ভিটামিন' মিলে মনের সহনশক্তিটা বাড়িয়ে দিলেও পা-দুটোর সহনশক্তি আর নেই-বললেই হয়।

ন'দাকে অবশ্য সে কথা বলা যায় না। ওর মনও একভাবে সাড়া দিয়ে নাও থাকতে পারে; সবল ব্যায়াম করা শরীর, মনেও স্ফূর্তি এসে গেছে, ওর পা দুটো চঞ্চল হয়ে ওঠারই কথা। তবু নেমে গিয়ে আবার এক মুঠো ভিটামিন তুলে এনে, এবারে ওকে খানিকটা বেশি করে দিয়ে বললাম—"এগুলো একটু এখানে বসে শেষ করে নিলে কেমন হয়? বেশ জায়গা নয়?"

বলল—"আমরা আন্দেকেরও বেশি এসে গেছি মনে হয়। এটুকুর জন্যে আবার বসবে ?"
বললাম—"শুক্ল পক্ষ। ক্ষতি কি ?"
বলল—"বেশ তাহলে একটু তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া যাক বসে। খিদেও পেয়েছে।"
এখানে নদীর পাড়টা একটু উঁচু। সুঁতিটা আগেরগুলোর চেয়ে চওড়া। জলের ধারা ছেড়ে ছেড়ে গোটা পাঁচ-ছয়। অগভীরই, তবে মাঝখানেরটায় মনে হয় কোথাও কোথাও হাঁটু পর্যন্ত জল আছে। ব'সে পড়ে টাটকা শস্যের শীষ দু'টো-একটা করে টেনে আস্তে আস্তে চিবুচ্ছি। ন'দাও। ওর গুলো ফুরিয়ে গেলে বলল—"এবার না হয় উঠবে ?" তখনই আবার কি ভেবে বলল—"তাহলে না হয় তোমার থেকে আরও গোটাকতক দাও। একটু নুন থাকলে চমৎকার হত হে।"



নিঃশব্দেই একটা ছোট গুচ্ছ ওর হাতে তুলে দিলাম। আমাদের নীরব চর্বিত-চর্বণের মাঝেই সূর্যাস্ত হয়ে সন্ধ্যা একটু গাঢ় হয়ে এল। দু'দিন আগে পূর্ণিমা গেছে, চাঁদ উঠতে একটু দেরি হবে। আকাশে দূরে দূরে গোটাকতক নক্ষত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমার গুলোও শেষ হয়ে গেলে ন'দা, "এবার · " বলে আরম্ভ করতে আমিই উঠে পড়তে পড়তে পূরণ করে দিয়ে বললাম—"হ্যাঁ, এবার উঠতে হয়। ঘাসেই পেট ভরিয়ে ফেললাম, সেজদা আবার কি বলবেন"—একটু হাসলাম।
ন'দা যেন কি একটু ভেবে উত্তর করল—"সেখানেই বা কি জোটে দ্যাখ। বিনা নোটিসে গিয়ে পড়া তো।···আচমকা।"
এই কাহিনীর গোড়াতেই তোমায় বলেছি, আমি বরাবরই একটু নস্টালজিক, অর্থাৎ স্মৃতিবিলাসী ; আজকাল বয়সের সঙ্গে নতুন কিছু সঞ্চয়ের শক্তি-সুযোগ দু-ই কমে এসে আরও যেন বেশি করেই হয়ে পড়েছি। স্মৃতিগুলো কখনও কখনও অলস মুহূর্তে উত্তর-জীবনে অনুরূপ যা কিছু আহরণ হয়েছে—উপন্যাস-কাব্য-অলঙ্কারে —তার সঙ্গে মিশে গিয়ে কল্পনায় আরও মোহনীয় হয়ে ফুটে ওঠে।
সেদিন নিথর সন্ধ্যায় সেই নদীতীর মনে হয় উদ্দাম বর্ষার শেষে কমলা যেন কাব্যের এক কলহান্তরিতা নায়িকা, দয়িত-বিরহের পর ক্লান্ত, বিষণ্ন, কিছু অনুতপ্ত, উপবাস-ক্লিষ্ট-তনু বালুশয্যায় গা ঢেলে দিয়ে আছে পড়ে। সেদিন সুঁতির জলে তারার যে

প্রতিবিম্বটি খণ্ডিত বীচি-ভঙ্গে চিকচিক করছিল—মনে হয় সে কমলার আলুলায়িত কেশের ফাঁকে তার কর্ণভূষণের হীরকখণ্ডটি।

এবার নদীতীরের কাব্য সেখানেই রেখে পথে ওঠা যাক। পথে লোক চলাচল বরাবর কিছু কিছু আছেই। আমরা নেমে সুঁতির যখন মাঝামাঝি, দুটি লোকের সঙ্গে দেখা, ওদিক থেকেই আসছে। একজনের কাঁধে একটি বছর চার-পাঁচের ছেলে, রঙচঙে একটা ধুতি পরা। তেল চুকচুকে কালো রঙ আর হলদে কাপড়ের ওপর দৃষ্টি না-আটকে গিয়েই পারে না। প্রশ্ন করলাম—"পাটিয়ারি আর কতটা দূর হবে ভাইয়া ?"

দাঁড়িয়ে পড়ে একজন ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—"পাটিয়ারি ? আপনারা এসেই গেছেন। এই গাছিটুকু পেরলেই পাটিয়ারি।"

'গাছি' হচ্ছে এখানকার ভাষায় আমবাগান। নদীর তীর থেকেই আরম্ভ হয়েছে। নিতান্ত 'টুকু' নয়। প্রায় পো'টাক পথ হাল্কা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে। পেরিয়েও গ্রামের চিহ্ন একটু-আধটু যা চোখে পড়ল, তাও মনে হল অন্তত আধ মাইল হবে। আবার পথশ্রান্তি। আমার মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে গেল—"দেখেছ। মিছিমিছি ঠকাবার কি স্বার্থ ছিল ওর ?"

ন'দা বলল—"ঠকায়নি। আমি কিছু কিছু জানি তো। বাবা যখন চাকরিতে··· মাঝে মাঝে যেতাম তো।·· ওদের কোশ হল ডালভাঙা কোশ—একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে চলতে শুরু করলে যখন পাতাগুলো শুকিয়ে আসে তখন এক কোশ পূর্ণ হয়।"

ক্লান্তিটা কেটে গিয়ে দুজনেই বেশ একটা হাল্কা মেজাজে এসে পড়েছি। ন'দার কথায় আমিও একটু হেসে বললাম—"তাহলে শোন, সেদিন কি কথায় মা আমাদের আধবুড়ি ঝিটিকে বয়সের কথা জিজ্ঞেস করতে বলল—"ঠাকুরমারা যেবার দলের সঙ্গে গঙ্গাসাগরে চান করতে যাওয়ার সব ঠিক করে আর যাওয়া হল না—আমি কোথা দশ মাসে জন্মাব হঠাৎ আট মাসে হয়ে পড়লাম কিনা। নাও উল্টে তোমার ঘাড়ে হিসেবের চাপ।"

দু'জনেই একটু হেসে উঠলাম।

ন'দা বলল—"তা যদি বললে তো কোন হিসেবের বখেরা না করে হেসেখেলে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলেই ভালো। এই দ্যাখো না—সাত-আট মাইল মনে করে আমরা তো প্রায় মাইল দশেক মেরে দিলাম।"

"ন'দা তোমার পেটে এই ছিল ?" বলে একটু হাসি হাসি চোখে ওর দিকে ঘুরে চাইতে ন'দা একটু অপ্রতিভ হয়ে ঘুরে আমার কাঁধে একটা চাপড় দিয়ে বলল—"নাহে ···তা নয়, পাঁচটার জায়গায় যে রাত্তিরই হয়ে গেল···দূর বলেই তো···"

"নইলে বুড়ির মতন আমাদের এত বয়স হয়ে যেত না, তাই না।"—আমি হাসতে হাসতে বললাম। হাল্কা রসিকতায় কখন পথটা শেষ হয়ে গেছে, আমরা গ্রামের প্রান্তে এসে পড়লাম। পথটা এখানে দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে গেছে। দ্বিধাগ্রস্ত

হয়ে দাঁড়িয়েই পড়েছি, এবার আমাদের পিছন থেকে একজন ভদ্রলোক এসে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"কোথায় যাবেন আপনারা ?"

এর পরই আমরা কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করে দিলেন—"ও, বুঝেছি! আপনারা তো বাঙালী দেখছি—আর বলতে হবে না—স্বতঃ প্রমাণসু—চটার্জিবাবুর বাড়ি খুঁজছেন ? ওই চটার্জিবাবুর বাড়ি—বাঁদিকের রাস্তাটা ধরে বরাবর··· !"

জ্যোৎস্না উঠে গেছে। কিছু দূরে একটা সাদা বাড়ি লি-লি করছে, "নমস্কার"—বলে পা বাড়িয়েছি, বাধা দিয়ে বললেন—"একটু দাঁড়ান—আর তো এসেই পড়েছেন—তাড়াতাড়ি কিসের ?"

ট্যাঁক থেকে একটা ছোট কৎবেলের নস্যের ডিবা বের করে একটি টিপ নাকে গুঁজে দিয়ে বললেন—"আপনারা তাহলে বাঙালী!—বাঃ, বেশ হল—কতদিন যে বাঙালীর মুখ দেখিনি—এক ওই চটার্জিবাবু ছাড়া—অতি সজ্জন পুরুষ—তাহলে, আপনারা বাঙালী ? কোথা থেকে আসছেন উপস্থিত ?···থাক সে কথা এখন—কাল সেসব হবেখন—আমি প্রায়ই তো যাই ওখানে—জিজ্ঞেস করছিলাম—নবদ্বীপের কামাখ্যা তর্কবাগীশের নাম শুনেছেন ?···দাঁড়ান বলছি···"

ডিবেটা হাতেই রয়েছে। বাঙালীর দুর্লভ দর্শন পাওয়ার উল্লাসে বোধ হয় ভালো করে নেওয়া হয়নি। এবার একটু নীচু হয়ে মুখটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে বেশ মোটা এক টিপ দু' নাকে গুঁজছেন, একটু ভাল করে দেখবার সুযোগ হল। পণ্ডিত মানুষ, মাথায় সুপুষ্ট শিখা, পরনে হলদে রঙের কাপড়, গায়ে গোলাপী রঙের পাতলা উড়ানি ভেদ করে গোলাপী রঙের পৈতে দেখা যাচ্ছে। এবার কৌটাটি আবার ট্যাঁকে গুঁজে দিয়ে দুটো হাত ঝেড়ে বললেন—"জিজ্ঞেস করছিলাম, নবদ্বীপের কামাখ্যা তর্কবাগীশকে জানেন ?—আপনাদের জানার কথা নয়—অনেকদিন স্বর্গত হয়েছেন (যুক্ত কর কপালে ঠেকিয়ে)—আপনারা তখন জন্মাননিও হয়তো। তবে, নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন···তাও শোনেননি ? সে কি! দেশ বিখ্যাত নৈয়ায়িক—তখন সারা ভারতবর্ষেও তাঁর জুড়ি নেই!—আমি ছিলাম তাঁর শিষ্য।···হ্যাঁ, তাঁর নিজের শিষ্য—সাত বছর ধরে তাঁর পায়ের কাছে বসে ন্যায় অধ্যায় করেছি—একাধিক্রমে সাতটা বছর।—তপস্যাই বলতে পারেন!"

"শুনে আনন্দ হল। প্রণাম"—অব্যাহতি পাবার জন্য ফাঁক খুঁজছিলামই, ঘুরে পা বাড়াব, এই সময় সামনের দিক থেকে আর একজন পণ্ডিত গোছেরই মানুষ এসে পড়তে উনি ন'দার জামার খুঁটটা ধরে আটকে রেখে তাঁকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন—"ওহে শোন শোন, এঁরা হচ্ছেন বাঙালী—আমার গুরুদেবের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম···"

"তাঁরই শিষ্য-প্রশিষ্য নাকি ?"—উনি আমাদের দিকে চেয়েই প্রশ্ন করলেন—"ন্যায়ের ছাত্র নাকি ?"

"না, আমরা ন্যায়ের 'ন'-ও জানি না। ইস্কুলে পড়ি, এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে একটু বেড়াতে বেরিয়েছি, তা..."—ন'দার কণ্ঠস্বরটি ভীত কাতর হয়ে উঠেছে, যেন ঘাটের কাছে এসে কোন পাগলের পাল্লায় পড়ে ভরাডুবি হতে চলেছে।
উনি বললেন—"ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছেন ? বেশ, বেশ। আমার জামাইও মধুবনী থেকে দিলে...কবে রেজাল্ট বেরুবে জানেন ?"
একটু আতঙ্কিতই হয়ে পড়েছি। পণ্ডিতজী বললেন—"তাহলে আপনারা ওঁর সঙ্গে কথা কন। আমার আবার শিষ্যবাড়িতে সত্যনারায়ণের পুজো আছে। কাল আমার টোলের অধ্যাপনা সেরে আসছি চটার্জিবাবুর বাড়ি। গল্প হবে নবদ্বীপের।"
ন'দা বলল—"তাড়াতাড়ি করতে হবে না আপনার। আমরা আরও সপ্তাহখানেক আছি।"
"যান। ওই বাড়ি দেখা যায়।"—একটু হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন তিনি।
ইনি একটু হেসে বললেন—"বড় বাঙালী ভক্ত ন্যায়চঞ্চু মশাই। আর, হওয়াই উচিত ; অত বড় গুরুর শিষ্য ! আচ্ছা আসুন, রাত হয়ে যাচ্ছে।"
ন'দা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—"ভয় পাইয়ে দিয়েছিল হে ! সব বিপদ কাটিয়ে বাড়ির কাছে এসে..."
বললাম—"ন'দা, তেমন কিছু নয় নিশ্চয়। শুনেছি—ক্রমাগতই নিজের মনে ন্যায়ের সূত্র ভাঁজতে ভাঁজতে ওঁরা একটু মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।"

এবার তোমায় যা বলতে যাচ্ছি তাতে মনে হতে পারে ধান ভানতে বুঝি শিবের গীত এনে ফেললাম। কতকটা অবশ্য তাই। তবে বেশি গলা ভাঁজতে না গিয়ে অল্প কথাতেই শেষ করব।
বলছিলাম, "আমাদের ভারতীয় সংবিধান ভালোয়-মন্দয় যাই হোক, (ক'বার তো কাটাকাটিই হয়ে গেল), বহুবিবাহটা বন্ধ করে একটা কাজের মতো কাজ করেছে, মেয়েদের মুখ চেয়ে। আর, নিশ্চয় দেহপণ্যের বৃত্তি বন্ধে।"
বহুবিবাহের কথা।
কৌলিন্য প্রথা, যাতে একটা আকাট মুর্খ শুধু কুলের দাবিতে গণ্ডার পর গণ্ডা বিবাহ করে শ্বশুরের অন্নেই বছর কাটিয়ে দিতে পারত—সে পাপ বোধ হয় একেবারেই গেছে নিজের ভারে নিচে চাপা পড়ে, আমাদের দেখতে হয়নি। কিন্তু তেমন গুরুতর কিছু প্রয়োজন না ঘটলেও, এক পত্নী বর্তমানে, বা অবর্তমানেও অন্য একটি গ্রহণ—বা দুটি বা ততোধিক—এর কুফল আমি আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় অনেক প্রত্যক্ষ করেছি। বিশেষ করে যদি কিছু সন্তান-সন্ততি দিয়ে যান। এতে পত্নী-ভারাক্রান্ত (পত্নী অভ্যাসগ্রস্ত বলব ?)—দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে পড়েন—

কার কি হল, কে কোথায় আছে, তার হিসাব রাখতে পারেন কী ? ফলে সংসারটি ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে। শ্রীহীন, কারুর সঙ্গে কারুর যোগ নেই।

জীর্ণ চৌহদ্দি দেয়াল পেরিয়ে আমরা একটা ঘরের মধ্যে গিয়ে উঠলাম। ঘরটা বড়ই, কিন্তু প্রায় অন্ধকারই। অন্তত বাইরের জ্যোৎস্না থেকে এসে প্রথমটা তাই মনে হল। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই। তখুনি চোখ একটু সয়ে আসতে দেখি, ঘরটার একেবারে ও-প্রান্তে একটা কালি-পড়া লণ্ঠনের পাশে একটা খাট পাতা। একজন শুয়ে আর মাথার কাছে একজন লোক বসে তার সঙ্গে যেন গল্প করছে। আমরা দু'জনেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি। আমি মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম—"এই বাড়ি ?"
ন'দা সেইভাবেই বলল—"মনে তো হচ্ছে। ও'রাও তো বললেন।"
ততক্ষণে বোধ হয়, মাথার কাছে যে লোকটা বসে ছিল, সে কিছু বলতে, খাটের লোকটা উঠে পড়ে ঘুরে দেখে বলল—"কে ?"
দু'জনে এগিয়ে গেলাম। ন'দা বলল—"আমরা সেজদা।" এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল। আমিও করলাম।
"হঠাৎ কোথা থেকে ? এটি কে ?"
ন'দা পরিচয় দিল আমার।
'কোথা থেকে আসছিস ? একটা চিঠি দিয়ে আসতে হয়···বাড়ির খবর কি ? অনেকদিন চিঠি পাইনি···আমার চিঠি না পেলে, চিঠি দিতে নেই ? আমি তো দেখছিস একা···"
ওদের প্রশ্নোত্তরের মধ্যে আমি ঘরটা একনজর দেখে নিলাম। আমার জন্মস্থান পাণ্ডুতে থাকতে নীলকুঠির সাহেবদের বাড়ির একটা আইডিয়া ছিল। প্রকাণ্ড একটা হলের চারিপাশে ছোট বড় মাঝারি আকারের দু'তিনটে ঘর। সবটাই এক চালের মধ্যে, ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে মোটা খড়ের ছাপরের উপর খাপড়া।
এই মধ্যিখানের হলটার মধ্যে ন'দার সেজদা রয়েছেন একেবারে কোণের দিকে একধারে। সেই ক্ষীণ আলোয় এইটুকু মোটামুটি দেখা হয়েছে।
ও'র যেন হঠাৎ চৈতন্য হল—"দ্যাখো তো এভাবে আসে ?" বলেই—"বাহাদুর !" বলে একটা হাঁক দিলেন।
একজন নেপালী পাশের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বললে—"দেখো সুনরাকে দোকানমে কেয়া মিঠাই মিলতা হ্যায়। জলদি লাও।"
ন'দার কাছে কি শুনে আসা, কি দেখা—বেরিয়ে পড়ে পথের যত ধকল, তারপর ঘরে ঢুকে এই দৃশ্য—সব একসঙ্গে মিলে গিয়ে একটা যেন পাষাণ ভারের মতো আমায় চেপে ধরল। চোখের পাতাদুটো খুলে রাখতে পারছি না। আগেই ও'র আদেশে লোকটা একটা খাটিয়া এনে দিতে আমরা দু'জনে পাশাপাশি বসে পড়েছি—আমার কানে ও'দের কথাগুলো মৃদু হতে হতে কখন ঢুলে শুয়ে পড়েছি, কখন একটা ছোট বালিশ এনে মাথার নীচে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এসব কিছুই জানি না।

ন'দা—"ওঠ হে ওঠ" বলে একটু ঠেলে তুলতে উনি বললেন—"দুটি খেয়ে নিয়ে আবার শোবে।...খাড়া আট মাইল পথ, অব্যেস নেই—কী ভুল যে করেছ বীরু!"

গলা ভাত, আলুভাতে, বড়ি ভাজা, শেষে ঘন করে জ্বাল দেওয়া খানিকটা মোষের দুধ। আমার পাতে, তখন-না-খাওয়া, দুটো করে লাড্ডু আর শুকনো পান্তুয়া এখানে বলে গুলজামুন।

যে লোকটা পরিবেশন করল তিনজনকে, সেই রেঁধেছে। নেপালীটা সতরঞ্চির উপর একটা কাঁথা পেতে দুটো বালিশ দিয়ে রেখেছিল। আমি আঁচাবার পরই শুয়ে পড়লাম।

একটি ঘুমেই রাত কাবার হয়ে গেছে। শেষের দিকে কি একটা এলোমেলো স্বপ্ন দেখে যখন ঘুম ভাঙলো, তখনও পাতলা কুয়াশার সঙ্গে একটু অন্ধকার লেগে রয়েছে। ওঁরা দু'জনে অকাতরে ঘুমুচ্ছেন। সেজদার আবার নাক ডাকে। কোথায় আছি সম্বিৎ হতে একটু দেরিই হল। তারপর আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে পড়লাম আমি। প্রথমেই যে অনুভূতিটা স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার মনে, অভিভূতও করে তুলল, তা এই যে, আমি যেন হঠাৎ কি করে সভ্য জগতের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথায় এসে পড়েছি।...হলঘরটা রাতের অস্পষ্ট আলোয় যতটা মনে হয়েছিল, তার চেয়ে অনেকখানি বড়। বাইরের দিকের দুটো দেয়ালে দুটো বড় বড় জানালা, শার্শির। একটায় একটা পাল্লা রয়েছে, তবে তার চারটে কাচের তিনটে নেই; একটাতে আধখানা আটকে আছে। অন্যটাতে একেবারেই কিছু নেই। বাঁশের বাতা দিয়ে বন্ধ করা। ঘরে ঢুকতে একটি দরজা। বেশ ফাঁদালো, উঁচু। মোটা সেগুন কাঠের পাল্লা। তবে একটাই আছে মাত্র। ডানদিকের ফাঁকটা বাঁশের ঢ্যাড়া দিয়ে বন্ধ করা। বন্ধ পাল্লাটা খুলে বাইরের বারান্দাটায় এলাম। টানা বারান্দার প্রায় অর্ধেকটা ভেঙে পড়ে ঝুলে আছে। একরাশ খড় খাপড়া নীচে পড়ে রয়েছে, সরানো হয়নি।

কুঠিটার চারিদিকে চৌহদ্দি দেয়াল দেওয়া। মাঝে মাঝে ভেঙে গিয়ে অল্পই আছে তায়। চৌহদ্দির মধ্যে একটা বাগান ছিল কোন সময়। এখন গরু-ছাগলে-খাওয়া গোটাকতক কি ফুলের গাছ এখানে ওখানে আছে দাঁড়িয়ে। চারিদিকেই কেমন যেন একটা দৈন্য-অবহেলা-বিশৃঙ্খলার ভাব। কোথায়, কবে যেন এই ধরনের একটা কিছু দেখেছি—চিত্রে কি বাস্তব অভিজ্ঞতায়—মনে করতে পারছি না। অথচ বিভীষিকার যে একটা দুর্নিবার আকর্ষণ থাকে, তার জন্যে মনটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতেও পারছি না।

"কে এখানে?"—পিছন থেকে ভারি গলায় প্রশ্নটা কানে যেতে চমকে উঠে ঘুরে দেখি—একটা যেন প্রেতমূর্তি; বাঁ-হাতে একটা বন্দুক ঝোলানো, আমার মুখের ওপর চোখ ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। একটা খণ্ড মুহূর্ত। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে

উঠলেন—"ও। বিভূতি ?" আমারও বিভ্রমটা সঙ্গে সঙ্গে কেটে, উত্তর দোব উনিই আবার প্রশ্ন করলেন—"উঠে পড়েছ? ঘুম হয়েছিল ?"

উত্তর করলাম—"এই মাত্র উঠলাম। আপনি এত সকালে? বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে শিকারে যাচ্ছেন ?"

"জঙ্গল অনেকদিন কমলা চেটে নিয়েছে। দেখি, এদিক-ওদিকে যদি দুটো হরিয়াল কি ঘুঘু পাই। যাবে ?"

"না, আপনি যান। আমি ততক্ষণ এদিকে···

ততক্ষণ কি করব ভেবে বলবার আগে উনি দেওয়ালের ওদিকে শিশুগাছটায় একটা কিছু দেখে একটু তাড়াতাড়িই নেমে এগিয়ে গেলেন।

আমি সেইরকম নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। স্মৃতির দ্বারে টোকা দিয়ে দিয়ে যেটা খুঁজছিলাম সেটা পেয়ে গেছি। একটা চিত্রই, তবে সম্প্রতি আকার গ্রহণ করে বইয়ের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। ধীরে ধীরে স্পষ্টও হয়ে উঠছে।

তুমি Daniel Defoe-র Robinson Cruso বইখানা পড়েছ? একটা বিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চার অর্থাৎ রোমাঞ্চ-কাহিনী। ঝড়ে সেকালের পালতোলা জাহাজ-ডুবি হয়ে একা কয়েক বৎসর তাকে একটা নির্জন দ্বীপে কাটাতে হয়। প্রথমাংশে সঙ্গী একটি বন্দুক আর একটি কুকুর।

বইটা আমাদের পাঠ্যপুস্তক ছিল। চিত্রিতই। হঠাৎ ডালপালা-খড় খড়ি দিয়ে তৈরী শক্ত খুঁটি পুঁতে পুঁতে ঘেরা তার বাসার সামনে বন্দুক-হাতে তার চিত্রটা মনে পড়ে গেল—চামড়ার জামা, তারই প্যান্টলুন, তারই টুপি।

অবশ্য, চিত্রের সঙ্গে যে হুবহু মিল থাকবেই এমন হতে পারে না। তবে ঝলঝলে ময়লা জামা, বোতাম আছে কি নেই, ঢিলেঢালা ময়লা কাপড়, মাথায় একমাথা বড় বড় অবিন্যস্ত কেশ, হাতে বন্দুক—চিত্র আর বাস্তব আমার অভিভূত কল্পনায় এত কাছাকাছি এসে পড়তে লাগল যে, আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ। তারপর দূরে একটা বন্দুকের আওয়াজ হওয়ায় একটু চকিত হয়ে উঠে ভিতরে চলে এলাম।

আমাদের পাটিয়ারি অভিযানের আর বিশেষ কিছু বলার নেই। আর ঘটনাও এমন কিছু নয়। সেই কথাই বলি এবার তোমায়। সেজদা বেশ অপ্রতিভ হয়ে পড়েছেন। এইরকম পরিস্থিতির মধ্যে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকলে লোক না হয়েই পারে না। ন'দাও স্বভাবতই। চা আর সুনরার দোকানের শুকনো পান্তুয়া আর লাড্ডু দিয়ে জলযোগ শেষ করছি তিনজনে, নীরবেই, উনি একবার একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন —"তাহলে বিভূতি···ইয়ে···কি ঠিক করেছ? সেই জঙ্গলও নেই—কমলা-কুশীর পেটে এখন—বাড়িটাও ঠিক করব বলে এখনও হয়ে ওঠেনি—তবু আমি বলব, যখন পড়েছই এসে দুটো দিন···কি যে বলে, না হয় থেকেই যেতে"—

এসে অরে একদণ্ড মন টিকছে না, তার ওপর সেই গল্পের বেহাইয়ের নৌকো ঠেলে দিয়ে

দ্যটো দিন থেকে যেতে বলায় এত কাছাকাছি ওর কথাগুলো যে একটা দিন গায়ের ব্যথা মেরে নেওয়ার জন্যে ইচ্ছাটুকু ছিল সেটাও পরিহার করে একটু মিনতির স্বরেই বললাম—"না সেজদা, মহারাজের খাম খেয়ালি দশা কেটে গেলে যদি প্যালেসটা দেখে যেতে পারি···কি বলো ন'দা ?"

ন'দাও যেন দম বন্ধ করে শুনছিল, বলল—"তা বইকি। বাড়িটা হয়ে গেলে আবার এলেই হবে। দেখা তো রইল।···"

"তাহলে সেই কথাই থাক।" —বেশ প্রফুল্লই হয়ে উঠলেন সেজদা। এসেছি পর্যন্ত অবাঞ্ছিত অতিথি সমাগমের যে একটা অপ্রসন্ন ভাব লেগে ছিল সেটা দমকা হাওয়ায় মেঘের মধ্যে সরে গিয়ে হঠাৎ রহস্যপ্রবণও হয়ে উঠল—"বাড়িতে তোরা নাকি একটা বউদি আনার প্ল্যান করছিস ভেতরে ভেতরে?···বলে দিস সেজদা ও-পাঠ পড়বার নয়।··· আউর গুলজামুন হ্যায় তো লে আও দোঠো করকে বাহাদুর।···তাহলে বলি শোনো বিভূতি। প্যালেস প্যালেস করছ···তার চেয়ে এত কাছে এসেছ তোমরা, জনকপুরে গিয়ে রাম-সীতার মন্দিরটা দেখে এসো না। লোকে দেশ-বিদেশ থেকে···"

"জনকপুর!"—আমি একটু চকিত হয়েই চাইলাম তাঁর দিকে। অসম্ভাব্যতার জন্যে মনে স্থানই দিইনি তাঁর কথা। বললাম—"সে তো অনেক দূর আর···"

"দূর তো আমেরিকাও ছিল, জনকপুরের চেয়েও, অজানা; তা বলে কলম্বস কি···?"

একটু হাসলেন। বললেন—"বীরু বলেনি সে কথা তোমায়? আমি যে সেখানে একটা স্টেটে ম্যানেজার ছিলাম। একটা চিঠি দিচ্ছি। রাজার হালে থাকবে। যতদিন ইচ্ছা। দেখেশুনে চলে আসবে। কাছে ধনুখা—রামচন্দ্র যে হরধনু ভঙ্গ করেন সেটা পড়ে আছে।"

বেশ মুখর হয়ে উঠেছেন, বেশ প্রফুল্ল।

"তাহলে কিন্তু তোমাদের খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। না, না, আবার হেঁটে? কী বলে যে ও'রা ছেড়ে দিলেন তোমাদের···"

"টমটম দিতে চেয়েছিলেন"—আমি বললাম।

"তবু ভালো। গরীব দাদা তোমাদের, টমটম কোথায় পাবে? তবে, ছৈ-দেওয়া বলদগাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমার হালের বলদ।···এখান থেকে সোজা পথ খজৌলি স্টেশন—সেখান থেকে জয়নগর—নেপাল বর্ডার—ব্রিটিশ-ইনডিয়ার শেষ স্টেশন—আমার স্টেটের গোমস্তাকে চিঠি দিচ্ছি, রাত্রের ব্যবস্থা করে রাখবে। ভোরেই উঠে বেরিয়ে পড়লে দিন থাকতে থাকতেই পেঁছে যাবে জনকপুরে।"

নেপালী বাহাদুর হরিয়ালের মাংস আর পরোটা যা রেঁধে ছিল তার লোভে আর একটা দিন থেকে যেতেই ইচ্ছা করছিল। কিন্তু চা-জলযোগ শেষ করেই উনি আমাদের যাত্রার ব্যবস্থায় এত তৎপর হয়ে উঠলেন যে সে কথা তোলবার অবসরই পাওয়া গেল না।

আমাদের দিক থেকেও প্রস্তুত হওয়ার কিছু ছিল না। খেয়ে ও'র কাছ থেকে চিঠি দু'খানা নিয়ে আমরা গাড়িতে উঠে পড়লাম।

আমাদের আসার যাত্রাটা যেমন সব বিষয়ে প্রতিকূল ছিল, ফিরে যাওয়াটা তেমনি সব বিষয়ে অনুকূল হয়ে উঠল। এতই অনুকূল যে, শেষের দিকে যা একটু প্রতিকূলতা করল, তাও পরিণামে আনুকূল্যে—সবচেয়ে বেশি আনুকূল্যে দাঁড়িয়ে গেল। মোটা তোষকের গদি, তার ওপর কম্বল, সতরঞ্চি আর চাদর পেতে পরিষ্কার বিছানা, দু'জনের জন্যে দুটো তাকিয়া—হরিয়ালের মাংস, পরোটা, গাঢ় দধি আর মিষ্টান্ন দিয়ে পরিতৃপ্ত আহার, প্রথম সুঁতিটা পেরোবার পর গাড়ির দোলা লেগে লেগে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। উঠলাম যখন দেখি আমরা সে সুঁতিটার ধারে যেখানে আমাদের 'ভিটামিন' সেবা শেষ করি। জায়গাটা বড় চমৎকার। শান্ত, নিস্তব্ধ। গাড়ির ছইয়ের ভিতর দিয়ে একটা ঝিরঝিরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। সবল লোকের ঘুমটা বোধ হয় বেশি; ন'দা একটু এপাশ-ওপাশ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। আমি উঠে চুপ করে বসে রইলাম।

অনন্ত নীল আকাশের নীচে দিক্‌লুণ্ঠিত হরিৎ-শস্যের সমারোহ—এই সবুজ-সমুদ্রকে দোল খাইয়ে একটা বাতাস—চেয়ে চেয়ে কী একটা অনির্বচনীয় আনন্দের যেন কূল পাচ্ছি না। পাটিয়ারিতে থাকতে যে গ্লানিটা মনে জমে উঠেছিল, কখন মিলিয়ে গিয়ে একটা করুণা মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাবই ধীরে ধীরে মনটাকে আপ্লুত করে দিচ্ছে—আমরাই কি তাঁকে হঠাৎ আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করে তুললাম না? আর আসার সময় সেই প্রসন্ন দৃষ্টি—সেটাই তাঁর মূল সত্তার পরিচয় নয় কি?

একটা তেমাথার সামনে এসে গাড়োয়ান জানাল—খজৌলি, কি রাজনগর—বাবু জিজ্ঞেস করে নিতে বলেছেন। প্রশ্নটা একটু অদ্ভুত ঠেকল যেন। বললাম—তিনিই তো বলে দিয়েছেন জয়নগর যেতে হলে সোজা খজৌলি স্টেশনেই যেতে হবে।

ন'দা একটু যেন ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। বলল—"হ্যাঁ, ঠিক কথা—জনকপুরে আগে যাওয়াই ঠিক করলে?"

বললাম—"সেইরকম বলেই তো চিঠি দিলেন। তাই না?"

"তাহলে চলো।"—কেমন যেন খাপছাড়া কথা, আর উৎসাহের অভাব। সদ্য ঘুম থেকে ওঠার জন্যও হতে পারে। অতটা খেয়াল না করে আমি আবার দু'দিকের অবারিত মাঠের ওপর মনটাকে ছড়িয়ে দিলাম। ন'দা, আর কিছু না বলে চুপ করে বসে রইল। একটু যেন চিন্তিত।

এ রাস্তাটুকু বেশ ভালো, কমলার কৃপাদৃষ্টি এদিকে কোথাও পড়েনি। রাজনগর বাদ দিলে এ রাস্তাটা জ্যামিতির ত্রিভুজের একটা ভুজ, সুতরাং ছোট। দু'জনে দুরকম চিন্তা নিয়ে বসে আছি, অর্ধেকেরও বেশিটা চলে এলে ন'দা আবার প্রশ্ন করল—"তাহলে জনকপুর যাওয়াই স্থির করলে?"

এবার একটু বিরক্তিই বোধ হল। সে ভাবটা মুখে প্রকাশ করতে না দিয়ে, বরং একটু হাসি ভাবই টেনে এনে বললাম—"তাই ঠিক করেই তো বেরুনো গেল।...কেন বার বার এ কথা বলছ বল তো?"

"বলছি...বলছি"—ন'দাও একটু হাসবার চেষ্টা করল—"বলছি...হল গুরুজন, বড় ভাই, তবে সেজদার কথা আমরা আদ্দেক বাদ দিয়ে থাকি।"

বিরক্তিটা চেপে রাখা দুষ্কর হয়ে উঠেছে। অন্য কেউ হ'লে বোধহয় মুখ থেকে বেরিয়ে যেত—"তোমার কথা পুরোপুরি নিয়েই বা কি ফল হল ?" হেঁয়ালির মাঝখানে পড়ে একটা জিদও এসে গেছে। মিনতির সঙ্গেই, তবে একটু জোর দিয়েই বললাম—"না ন'দা, চলোই ; অমন চিঠি দুটো রয়েছে। আর, সবকিছু বাদ দিলেও জনকপুরটা তো থাকবে। কোথাও উড়ে যাবে না।"

"তাহলে চলো।"—ন'দা চুপ করে আবার কি ভাবতে লাগল।

সামনে একটা বড় আমবাগান পড়ে ছিল, বেরিয়ে আসতে দেখি আমরা প্রায় এসেই পড়েছি। প্রায় আধ মাইল দূরে পরিষ্কার মাঠের ওদিকে রেলের সিগ্ন্যাল, নিশ্চয় খজৌলি স্টেশনের ডিসটেণ্ট সিগ্ন্যালটা। মনটা যেন লাফিয়ে উঠেছে। গাড়োয়ানকে বললাম—"জোরসে হাঁকো।"

বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছি। শেষ বাঁধা কমলার সেই ধারাটা, সেটা রাজনগর স্টেশনের কাছ দিয়ে বয়ে গেছে। ছেড়ে ছেড়ে অগভীর জল আর ভিজে বালি। জোরে হাঁকিয়ে গাড়ি নেমে পড়ল। গাড়োয়ান গরু দুটোর ল্যাজ মলে মলে এগিয়ে চলেছে। আমার চোখ সিগন্যালের দিকে। যখন প্রায় পেরিয়ে এসেছি, আর একটি ছোট জলস্রোত, অগভীর—সিগন্যাল মাথা নীচু করল—অর্থাৎ দূরে গাড়ি ছেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এদিকে কমলা আমাদের রথনেমী গ্রাস করল। সারথির একক চেষ্টায় কিছু হল না। কুরুক্ষেত্রে যুযুধান কর্ণের অবস্থা। আমরাও নেমে পড়ে যোগ দিলাম। যতই চেষ্টা করি, কমলা ততই যেন গ্রাস করে যায় রথনেমী··· । ইঞ্জিনের বাঁশি কানে যেতে আমরা ব্যাগটা নিয়ে দৌড়লাম। ট্রেনটা আমাদের সামনে দিয়েই স্টেশনে গিয়ে ঢুকল। বেশি নয়, আর শ'চারেক গজ পেরুলেই হয়। কিন্তু বাঁশি বাজিয়ে ছেড়ে দিল গাড়িটা।

দাঁড়াও একটু। লিখতে গিয়েও সেদিনের কথা সব এসে পড়ে যেন হাঁপ ধরে যাচ্ছে।

সমস্ত দিনে মাত্র গোটাদুয়েক গাড়ি আসে যায়। এইটেই ছিল সব শেষ। স্টেশনে খোঁজ নিয়ে জানা গেল এটা জয়নগরে পেঁছালেই সেখান থেকে রাজনগরের গাড়ি ছেড়ে দেবে। সব মিলিয়ে আর ঘণ্টাখানেক।

স্টেশনে পায়চারি করতে করতে বেশ একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলল ন'দা—"কমলাই আমাদের শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে দিলে গাড়ির চাকা বালির মধ্যে বসিয়ে দিয়ে।"

"তার মানে ?"—চকিত হয়েই প্রশ্ন করলাম আমি।

ন'দা বলল—"জয়নগরের গোমস্তাকে সেজদা লিখেছে—জনকপুরে ভালো করে খবর নিয়ে তবে আমাদের যাত্রার ব্যবস্থা করতে। নেপালে রাজনৈতিক অবস্থা নিতাই পালটায়, এখন বোধ হয় একটা গোলমালই চলছে।"

"তাই নাকি ? কই, বললেন না তো আমাদের সে কথা সেজদা !"

"হ্যাঁ তাই। স্পষ্ট বলা তো অভ্যেস নয় ও'র, বললাম না তখন তোমায় ?"

তোমায় এই একটু আগে বললাম না, ফেরার যাত্রাটা আমাদের ভালই হয়েছিল ?

বেলা শেষ হয়ে এসেছে, সূর্য অস্তপ্রায়। দূরে উত্তরে—তা এখান থেকে প্রায় শ'খানেক মাইল দূরে বইকি—পূর্ব থেকে পশ্চিমে যতদূর দৃষ্টি যায় হিমালয়ের শিখর শ্রেণী সূর্যের শেষ রশ্মি পড়ে ঝলমল করছে, পরিষ্কার আকাশের নীচে রেখায় রেখায় স্পষ্ট। মহিমাময় অপার্থিব যেন স্বর্গের প্রান্ত থেকে খসে-পড়া! চেয়ে আছি। ভাবছি—সুযাত্রাই বইকি। আর কাল থেকে নিয়ে সবটুকুই বা নয় কি সে? কাল, নদী তীরের সেই সন্ধ্যাটি।...তারপর পটিয়ারির অভ্যর্থনা অমন না হলে তো পড়ে থাকারই কথা এখনও। আজকের সমস্ত পথটুকুই ছিল মনোরম। সব শেষে কমলার রথনেমী গ্রাস! সে তো অভিশাপ রূপে আশীর্বাদই·· নয়তো (ন'দা যেমন বলল)—সীমান্তের একটা গন্ডগ্রামে ছয়-সাত দিন আটকেই থাকতে হতো অনিশ্চিতের মধ্যে। তারপর জনকপুর—সে আরও অনিশ্চিত। হয়তো বিপদসঙ্কুলই।

এখনও শুভযাত্রার চরম শুভটুকু নেপথ্যেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

রেলগাড়ি থেকে নেমে বাসায় পৌছতেই রণেনের সঙ্গে দেখা। সামনের ছোট বাগানটিতে ঘোরাফেরা করছিল—আমাদের দেখেই উল্লসিত হয়ে বলে উঠল—"বাঃ! ফিরে এসেছেন?··কাল আপনাদের যাওয়ার ঘণ্টা তিনেক পরেই বাবা এসে উপস্থিত। হঠাৎ কি কাজে সন্ধ্যের আগেই দেউড়ি-সুদ্ধ সবাইকে দ্বারভাঙ্গায় যেতে হবে। ও'কেও সঙ্গে যেতে হবে। মাত্র একটা দিনের জন্য। তারপরেই বাসন্তী দুর্গা পুজোর ষষ্ঠী। বোধন পড়ে যাচ্ছে, আর এখন দিনদশেক কোথাও নয়। আপনাদের কথা শুনে আপশোস করতে লাগলেন।"

আশা-নিরাশার জোট পাকিয়ে যাচ্ছে। জিভে ঠোঁট ভিজিয়ে প্রশ্ন করতে যাব, উনি বললেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ··সে সব বাবা বলে দিয়ে গেছেন। দেউড়ি খালি আপনারা অন্দরমহল পর্যন্ত ভালো করে সব দেখে নিতে পারবেন। তবে একটি দিনের মধ্যে।"

সেই একটি দিন আমার জীবনে অনন্যই হয়ে রয়েছে।

অন্দরমহল, সে তো রাজমহলই। তবে, দুর্গামন্দির—গঙ্গার উত্তরে এদিকে আর কোথাও এমনটি আছে বলে জানা নেই।

